প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৬২

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

কাশ্মীর ও তিব্বতে

১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাশ্মীর ও তিব্বতের ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ বরস্থানের ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন। কাশ্মীর ও তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিখ্যাত মন্দির মঠ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক বর্ণনা। কাশ্মীরের রাজনৈতিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক তথ্য। তিব্বতের হিমিস মঠে যীশুখৃষ্টের অপ্রকাশিত জীবনকাহিনীর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ।

মূল্য পাঁচ টাকা

ভারতীয় সংস্কৃতি

(**India and Her People** পুস্তকের অনুবাদ।)

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ১৯০৫ সালে "ব্রুকলীন ইনিষ্টিটিউট অফ আর্টস য়্যাণ্ড সায়েন্সেস" নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ বক্তৃতা মালা

মূল্য চার টাকা

মরণের পারে

(**Life beyond Death**-নামে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ।)

এই গ্রন্থে মানুষের পুর্ব্বজন্ম জন্মান্তরবাদ, পরলোকতত্ত্ব, মৃত্যুর পরে বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর বিভিন্ন প্রকার গতি ও অবস্থা সম্বন্ধে দার্শনিক মনীষা ও সিদ্ধযোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

দেহবিমুক্ত নানাপ্রকার জীবাত্মার অনেকগুলি আলোকচিত্রের সমাবেশে সুদৃশ্য

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বৈদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬, ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবিমলরতন সিংহ, কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—ফাল্গুন, ১৩৬২

সূচীপত্র

১।	'বিশ্ববাণী'র নববর্ষ		১
২।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর (কবিতা) ...	শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী	২
৩।	ভক্তিযোগে মুক্তি-সাধনা	স্বামী অভেদানন্দ	৪
৪।	বুদ্ধ (কবিতা) ...	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু ...	১৬

জামসেদপুর—ব্র্যাঞ্চ

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

(স্থাপিত—১৯১৮)

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিখুঁত ভাবে ইণ্ডিয়ান মেয়ামতি কাজ আমাদের বৈশিষ্ট্য

হেড অফিস—পি ৬, মিলন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১

ফোন—২৫-১৮০৫ (পাঁচ লাইন)

শাখা—বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক ও গৌহাটি

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ✱ বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সূচীপত্র

৫।	ব্যাবিলনে ইহুদীদের নির্বাসন কাহিনী		১৭
৬।	ইহুদীজাতির পরিচয়		১৮
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ধর্মসমন্বয়	যতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৪
৮।	স্বরূপ-প্রাপ্তি (কবিতা)	কালীপদ ঘোড়ই	৩০
৯।	দেবতার অন্তরালে বাংলা-সাহিত্য ...	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৩১
১০।	যীশুখৃষ্ট ও রামকৃষ্ণ	হীরালাল বিশ্বাস	৩৫
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী-বিতান ...		৪৩
১২।	রাজস্থানে প্রস্তর যুগের কারখানা-কেন্দ্র আবিষ্কার		৪৪
১৩।	পরলোকে ডাঃ গুপ্তেন্দ্রনাথ সেন ...		৪৫
১৪।	সৌরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক খনন-কার্য্য		৪৭
১৫।	সঙ্ঘবার্ত্তা ...	...	৪৮

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন: বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে নতুবা পূর্ব্বের ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না।
প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, মূলক্ষেত্র চারু পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকদের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

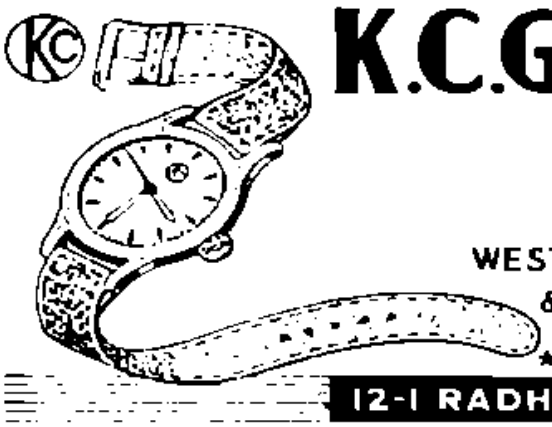

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

গুণের আদর আছেই * * *

শহর বা গ্রামে সর্বত্রই

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"
রেডিও

তার অতুলনীয়
গুণ ও সৌন্দর্যের জন্যই বিখ্যাত

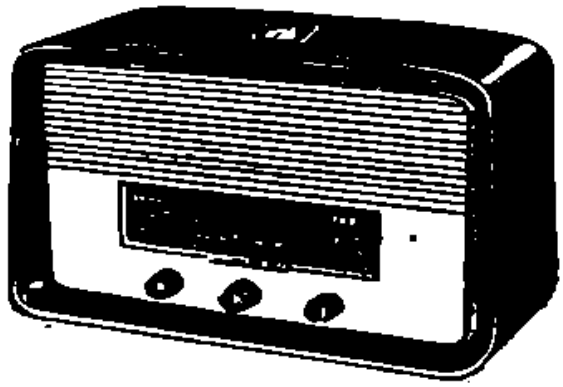

মডেল ৫২২২

পাঁচ ভাল্ব, তিন ওয়েভব্যাণ্ডযুক্ত, ডি-সি বা এ-সি মেইনের জন্য সুন্দর দু'রঙা প্লাষ্টিকের ক্যাবিনেট। দাম নেট্ ৩২৫৲ এ ছাড়াও বিভিন্ন দামের ও ধরণের সুন্দর সুন্দর বহু মডেল আছে।

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেডিও

দি গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড্
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • দিল্লী

ডাক্তার **ইন্দুমাধব মল্লিক,** এম. এ, এম. ডি, বি. এল, আবিষ্কৃত
পেটেণ্টেড

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে একরকমের সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন আলানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।
ম্যানেজার—ইক্-মিক্-কুকার, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টাদশ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৬২ | প্রথম সংখ্যা

'বিশ্ববাণী'র নববর্ষ

অশেষ মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার করুণায় "বিশ্ববাণী" পত্রিকা এই ফাল্গুন মাসে অষ্টাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। সর্ব্বান্তর্যামী সেই পরমদেবতার উদ্দেশে এই শুভক্ষণে আমরা বারবার ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি। নূতন বৎসরে বিবিধ উন্নত বিষয়ের ভাববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া 'বিশ্ববাণী' আমাদের স্বদেশবাসী সুধীসমাজের চিত্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হউক—বিশ্বদেবতার নিকট ইহাই আমাদের অন্তরের আকুল প্রার্থনা। সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর অর্চ্চনায় ও সেবায় "বিশ্ববাণী" যেন তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে।

যে সমস্ত সত্যদ্রষ্টা দিব্যদ্রষ্টা মহান্‌পুরুষ নিজেদের তপস্যা ও প্রজ্ঞার অপার্থিব আলোকে ভারতবর্ষকে মানব-সভ্যতা ও মানব-সংস্কৃতির আদি জন্মভূমির গৌরব দানে মহীয়সী করিয়াছেন বৈদিকযুগের সেই প্রাচীন ঋষি ও মহর্ষিবৃন্দ 'বিশ্ববাণী'র উপরে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের অজস্রধারা সর্ব্বদা বর্ষণ করুন। যুগে যুগে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্ম্মসংস্থাপক লোকোত্তর পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন—তাঁহাদের কল্যাণদৃষ্টি 'বিশ্ববাণী'র উপরে সর্ব্বদা অবিচলিত হইয়া থাকুক। সমস্ত সিদ্ধযোগী ও ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারা তাঁহাদের শুভেচ্ছার শক্তিতে বিশ্ববাণীর অগ্রগতিকে নির্ব্বিঘ্ন করুন। ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মসাধনার মর্ম্মকথা প্রচারের দ্বারা 'বিশ্ববাণী' পত্রিকা যেন নিজের মহান ব্রতকে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিতে পারে।

নূতন বৎসরের প্রারম্ভে 'বিশ্ববাণী'র অবলম্বনে আমাদের এই সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সাফল্যের জন্য বারবার পরমদেবতাকে প্রণাম ও ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিতেছি :—

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ।
—(অথর্ব্ববেদ, দশমখণ্ড, ৮ম সূক্ত, ১ম মন্ত্র)

যস্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্।
দিশো যশ্চক্রে প্রজানীস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ।
—(অথর্ব্ববেদ, ১০।৭।৩৪)

ওঁ নমোস্তেঽস্তু পরমাত্মন্ নমোনমোস্তে।
হরি ওঁ তৎসৎ॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর

শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী

বিশ্ব-প্রকৃতির প্রিয় লীলাভূমি শ্যামলা বঙ্গদেশ,
নানা বরণের নিবিড় মধুর নাহি যার শোভা শেষ।
সেথা বয়ে যায় হিমাচল হতে অবিরত কলগানে,
উচ্ছল-স্রোতা নদী ভাগীরথী মহাসাগরের পানে।
সেই ভাগীরথী পূর্ব্বকূলেতে বিরাজে দক্ষিণেশ্বর,
সকল ধর্ম্ম মিলন-তীর্থ জনগণ-মনোহর।
ছিল এইস্থান অখ্যাত এক বিজন পল্লীগ্রাম,
শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমায় আজি মহান তীর্থধাম।
অতি পবিত্র এ মহাতীর্থ পরম পুণ্যভূমি,
হেথাকার প্রতি দৃশ্য ও স্থানেরে অবনত শিরে নমি।
মহীয়সী নারী রাণী রাসমণি স্থাপিত এ দেবালয়,
খ্যাতি যে ইহার ছড়ায়ে গিয়াছে আজিকে ভারতময়।
তাই হেথা আসে নানা দিক হতে সাধু ও ভক্তগণ,
হেথায় আসিয়া ধর্ম্ম-আবেশে হয়ে যায় নিমগন।

• • • • •

এ দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথী-তীরে পঞ্চবটীর তলে,
শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা-হোমের আগুন এখনো জ্বলে।
হেথায় দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ সুকঠোর সাধনায়
জাগালেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মের চেতনায়।
শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি-আহ্বানে অনুরাগে আরাধনে
মূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বজননী আসিলেন এইখানে।
হেথায় বিশ্বজননীর সাথে কতদিন কতবেলা
ক্ষুদ্র শিশুর মতন ঠাকুর করেছেন কত খেলা।
দেখেছেন সদা শ্রীরামকৃষ্ণ বাহিরে অন্তরে তাঁর
কত রূপে কত ভাবের লীলায় ভবানীরে বারবার।

• • • • •

সকল ধর্ম্মের সাধনে সিদ্ধ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
সবার মুক্তিপথেরে দেখায়ে করেছেন সবে ধন্য।

শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বাউল ভক্ত বেদান্তী জ্ঞানী
শুনেছে যে সবে ঠাকুরের কাছে ধর্ম্মের নববাণী।
দেখেছে যে তারা ঠাকুরের মাঝে আপন ধর্ম্ম-রূপ,
সব সাধনার অনুভূতিরাশি অনুপম অপরূপ।
যেজন এসেছে ঠাকুরের কাছে, সেইতো পেয়েছে শান্তি।
ঘুচে গেছে তার জীবনের জ্বালা সংশয় মোহ ভ্রান্তি।
কতনা সাধক ঠাকুরের কাছে সাধন-নির্দ্দেশ পেয়ে,
তাঁহার দিব্যপরশে যে গেছে সিদ্ধ মুক্ত হয়ে।

• • • • •

নরেন্দ্র রাখাল কালী বাবুরাম যোগেন শরৎ শশী
হরিনাথ লাটু তারক সারদা নিরঞ্জন আদি আসি'
শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে নিয়েছে ত্যাগের দীক্ষা
দিন পরে দিন গুরুর সকাশে পেয়েছে সাধনে শিক্ষা।
সর্ব্বত্যাগী অন্তরঙ্গ সেসব শিষ্যেরা মিলে
শিখেছে হেথায় ধর্ম্ম-সাধনা সংযম ধ্যানবলে।
দেশে দেশে তারা করিল বিজয়ী ঠাকুরের দেওয়া ধর্ম্মে
ঠাকুরের বাণী হলো প্রাণময়ী তাদের জীবনে কর্ম্মে।
আদ্যাশক্তি অংশেতে জাতা জননী সারদা-মাতা
ধর্ম্মভাবের সহায়িকা হয়ে ঠাকুরের সনে হেথা
করেছেন কত নরনারীগণে করুণা কল্যাণে ধন্য
এখানে কৈলাসে করেছে প্রকাশ সারদা-শ্রীরামকৃষ্ণ।
সাধু সজ্জন পাপী তাপী দীন সকলে পেয়েছে ঠাঁই,
দেখেছে সকলে ঠাকুরের কৃপা প্রেমে কোন ভেদ নাই।
পরমদয়াল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের অতল সিন্ধু
অনাথ তাপিত আশ্রয়দাতা দলিত দীনের বন্ধু।
সকলের তরে আগমন তাঁর, তিনি যে জগদ্‌গুরু
প্রণমি শ্রীরামকৃষ্ণচরণে হে দেব কল্পতরু।

ভক্তিযোগে মুক্তি-সাধনা

স্বামী অভেদানন্দ

সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে চিরমুক্তি লাভ করা—ইহাই পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমতের অনুসারে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মমত ছাড়াও পৃথিবীতে আরও কতকগুলি ধর্ম্মমত আছে। সেই সমস্ত ধর্ম্মমতগুলি হইতেছে—জোরোয়াস্তারের (Zoroaster) প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম (পারসীদের ধর্ম্মমত) ইহুদী ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়। অরথুস্ত্রীয় ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা দ্বৈতভাবের মতে ধর্ম্মসাধনা করিয়া থাকে। এই সকল প্রত্যেক ধর্ম্মমতের উপাসকেরা বিশ্বাস করেন—"ঈশ্বর মহান্ শক্তিশালী সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ। বিশ্বজগৎ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র (extra-cosmic)। তিনি বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি ইহার একমাত্র শাসক।" এই সমস্ত ধর্ম্মের মতে ঈশ্বর পুণ্যবানদের পুরস্কার দান করেন এবং পাপীরা তাঁহার নিকট হইতে পাপকার্য্যের শাস্তি পাইয়া থাকে। এই সকল মতের সমস্ত উপাসকেরাই অবিসম্বাদীভাবে প্রচার করেন—"মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইয়া চিরকাল সেখানে বাস করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এবং কোন বিশেষ মানুষ সম্ভবতঃ স্বর্গে যাইতে পারে।"

পারসী ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি এই সমস্ত উপাসকেরা বলেন—"স্বর্গধামে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সিংহাসনে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। সেই ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহিমা ও গুণ গান করা, অবিশ্রান্তভাবে সুরধারা প্রবাহিত সঙ্গীত শ্রবণ এবং সকল দুঃখ ও অশান্তি হইতে মুক্ত হইয়া চিরকাল ধরিয়া সুখ ও আরাম উপভোগ করার অপেক্ষা আর কোন অবস্থাই মহত্তর ও উচ্চতর অবস্থা হইতে পারে না।" দ্বৈতবাদী এই সমস্ত ধর্ম্মমতাবলম্বী লোকদের বিশ্বাস—"যাহারা সদ্ভাবে জীবনযাপন এবং ঈশ্বরের নির্দ্দেশ পালন করেন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় তাঁহারা পুণ্যময় জীবনের পুরস্কারস্বরূপে এই অবস্থা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মপরায়ণ নয় ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করে না তাহারা কখনই স্বর্গে যাইতে পাইবে না। তাহাদিগকে অনন্তকাল ধরিয়া নরকে নানা-প্রকার শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অরথুস্ত্রীয়, ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা অনন্ত কালস্থায়ী স্বর্গে অবস্থান এবং অনন্ত কাল-ব্যাপী নরকভোগের অবস্থা যথাক্রমে মানুষের মুক্তির অবস্থা অথবা পাপকার্য্যের ফলভোগ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে মানুষের মুক্তির অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদই বরাবর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

মহাপুরুষ স্পিতমো অরথুস্ত্রীয়ের (Zoroaster)[১] মতাবলম্বীদের (পারসীদের) ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম—'জেন্দাবেস্তা' (Zend-Avesta)। এই মতের লোকেরা 'মুক্তি' (Salvation) অর্থে স্বর্গে থাকিয়া অবিশ্রান্ত সুখ উপভোগ করা বলিয়া মনে করে। এই ধর্ম্মের প্রধান উপাস্য দেবতার নাম 'আহুরামাজদা' (Ahura Mazda)। এই ধর্ম্মমতের লোকেরা বিশ্বাস করেন—যাহারা সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং যাহারা আহুরামাজদার আদেশ পালন করেন, তাঁহার নিকট হইতে পুণ্যময় জীবনের পুরস্কারস্বরূপে শুধু

১। পারসী জাতির ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-মহাপুরুষ স্পিতমো অরথুস্ত্র বা জোরোয়াস্তারের জীবনকাল অনুমান [illegible] খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। তাঁহার জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এখনও কোনও সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। জোরোয়াস্তারের জীবন ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এ যে তারাপুরওয়ালা এবং আরও কয়েকজন পারসী মনীষীর লেখা তথ্যপূর্ণ কয়েকটি পুস্তক আছে। Great Saviours of the World, Vol I পুস্তকে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জোরোয়াস্তার সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রবন্ধ আছে।

সেইসব মানুষেরই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "যাহারা সমস্ত বাসনা কামনা আহুরা মাজদা সমগ্রভাবে পূর্ণ করেন—সে ব্যক্তি যে প্রকারেরই লোক হউক না কেন, তত্রাচ সে সুখী!" ইহাই আহুরা-মাজদার বাণী। জেন্দাবস্তা শাস্ত্রের মতে—"মৃত্যুর পরে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের আত্মা প্রথম রাত্রে সৎচিন্তাময় স্বর্গে (Good-thought Paradise) অবস্থান করে। দ্বিতীয় রাত্রে পবিত্র বাক্যময় স্বর্গে (Good-Word Paradise) এবং তৃতীয় রাত্রে তাহারা সৎকর্মময় স্বর্গে (Good-Deed Paradise) বাস করে।

তৃতীয় রাত্রির শেষে প্রভাতকালে তাহাদের আত্মা পুনরুত্থিত (resurrect) হয় এবং আহুরা-মাজদার (ঈশ্বরের) সিংহাসনের সম্মুখে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে তাহারা চিরসুন্দরী কুমারীদের সহিত অনন্তকাল ধরিয়া নানাবিধ সুখ ও আরাম উপভোগ করে" ॥ "অপর পক্ষে, যাহারা দুরাচার ও অধার্মিক—মৃত্যুর পরে তাহাদের প্রথম রাত্রে অশুভ-চিন্তার নরকে (Evil-Thought Hell) অশুভ-বাক্যের নরকে (Evil-Word Hell) এবং অশুভ-কর্মের নরকে (Evil-Deed Hell) যাত্রা হইয়া থাকিতে হয়। তাহার পরে ঐ সমস্ত লোকদের আত্মাকে চিরান্ধকারময় স্থানে অনন্তকাল অবস্থান করিতে হয়। সেই নরকে তাহাদের বিষাক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। এইভাবে তাহারা শেষ-বিচারের দিন পর্যন্ত (Last Day of Judgment—কিয়ামৎ) সেখানে থাকে। তাহার পরে ইহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বকৃত পাপ-কর্মের জন্য অনুতপ্ত তাহাদের আত্মারাই শুধু আহুরা-মাজদার করুণায় এই অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করে।" মুক্তি লাভ এবং স্বর্গে বাস ও নরকে শাস্তিভোগ সম্বন্ধে পারসীদের এইসব মতবাদই পরবর্তীকালে ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মে অনেক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ইহুদী ধর্মের ইতিহাসের আদিম কালে ঐ মতের লোকেরা স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না। মানুষের আত্মার মুক্তিলাভের চিন্তায় কখনও তাহারা নিজেদের মস্তিষ্ককে উৎপীড়িত করিতে চাহিত না। পুণ্যের পুরস্কার লাভ ও পাপের শাস্তি-ভোগ সম্বন্ধেও প্রাচীন কালের ইহুদীদের কোনও বিশ্বাস ছিল না। মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহারা কোনও নৈতিক কারণ খোঁজ করিত না। যে সমস্ত ব্যক্তি ওলড্ টেষ্টামেণ্ট (Old Testament) গ্রন্থকে বিচার ও সমালোচনার দৃষ্টিতে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সমস্ত ঘটনার সম্বন্ধে অবগত আছেন। ৫৮৬ হইতে ৫৩৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ এই সময়ের মধ্যে ইহুদীদের মধ্যে শত শত ব্যক্তিকে ব্যাবিলনের দুর্ধর্ষ রাজা নেবুকাডনেজারের (Nebuchadnazer—জন্ম ৬০৫ এবং মৃত্যু ৫৬২ খৃষ্টপূর্বাব্দ) আদেশে ব্যাবিলনে নির্বাসনে[১] পাঠাইয়া দিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। (৫৮৬ খৃষ্টাব্দে পারস্যের রাজা সাইরাস ব্যাবিলন রাজ্য ধ্বংস করেন এবং ঐসব ইহুদীদের নির্বাসনের অবস্থা হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদের স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন)। ব্যাবিলনে নির্বাসিত অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিবার ফলে ইহুদীজাতির ধর্মনেতারা (Rabbis and Doctors) ঈশ্বরের (জিহোভার) বিধান অনুযায়ী পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তিদান সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও পারসীদের ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত স্বর্গ ও নরকের যেরূপ ধারণা আছে—তাহাও তাঁহারা সেই সময় হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওলড্ টেষ্টামেণ্টে মাত্র দুইজন ব্যক্তিরই স্বর্গে গমনের কথা বর্ণিত আছে। ইহুদীদের মতে শুধু এই দুইজনই (সশরীরে?) স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন!! ইহাদের দুইজনের নাম এনখ (Enoch) এবং এলিজা (Elijah)। কিন্তু এই দুইটি দৃষ্টান্ত

১। Babylonian Captivity অথবা ইহুদীজাতির বহু সহস্র লোকদের ব্যাবিলনে নির্বাসিত হইয়া সেখানে প্রায় দুইশত বৎসর কাল অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার ঐতিহাসিক বিবরণ বিশ্বভারতীর এই সংখ্যার অন্য একটি প্রবন্ধে পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইতি—অনুবাদক।

হইতে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, যাহার দ্বারা বিশ্বাস করা যাইতে পারে—ব্যাবিলনে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক মুক্তির সম্বন্ধে ইহুদীদের মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত ছিল।

ইহুদীদের মতন খৃষ্টানরাও পরবর্ত্তীকালে অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট হইতে স্বর্গ ও মুক্তির সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্বাস ধার করিয়া লইয়াছেন। অনন্ত নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ও অনন্তকাল ধরিয়া শাস্তিভোগ হইতে অব্যাহতি লাভ এবং স্বর্গে যাইয়া পরমপিতা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করাই খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বীদের মুক্তির অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা। খৃষ্টানদের কথিত এই স্বর্গসুখ কি প্রকার তাহা আমরা জানি। তাহাদের দ্বারা বর্ণিত সেই স্বর্গসুখ হইল—অবিশ্রান্তভাবে বীণা বাজাইয়া যাওয়া এবং বিরক্তিহীন সঙ্গীতের সুরালাপ শ্রবণ করা। স্বর্গের এই ব্যাপার সম্বন্ধে এক সময়ে গোঁড়া খৃষ্টানদের গার্জ্জগুলিতে একটি স্তোত্র গান করা হইত। সেই স্তোত্রটিতে খুঁটিনাটিভাবে বর্ণিত স্বর্গের কথা বলা হইয়াছে। ঐ স্তোত্রটির একটি লাইন এইরূপ :—

"Where congregations ne'er break up
And Sadbaths never end."

অর্থাৎ—"যেখানে ভজনগায়কমণ্ডলীর ভজনগানের ধারা কখনও থামিয়া যায় না। আর বিশ্রামবারের যেখানে কোনও শেষ নাই।" আমার মনে হয়—অতি অল্পলোকের কাছেও এই রকম স্বর্গের পরিবেশের মধ্যে থাকাকে বাঞ্ছনীয় অবস্থা বলিয়া মনে হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর আগে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের কোনও অপরিচিত অঞ্চলে একজন খৃষ্টান মিশনারী অজ্ঞাতকুলশীল রেডইণ্ডিয়ানদের কাছে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। মিশনারী মহাশয় সেখানে তাঁহার শ্রোতাদের কাছে বিশ্বাসীদের নিকট প্রমেটদের প্রতিশ্রুত মহাসুখের রাজ্য (Promised Land) সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—সেখানে আহার (সুরা) পান, পশুবলিদান করিতে কিম্বা কোনও নারীকে বিবাহ করিবারও সুযোগ নাই। মিশনারী মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া একজন রেডইণ্ডিয়ান শ্রোতা তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়! আপনার বর্ণিত ঐ রকম স্থানে যাওয়া অপেক্ষা বরং আমি বলি, সেখানে বাস করার ব্যাপার আমার কল্পনায় সবচেয়ে বীভৎস বলিয়াই মনে হয়।"

মুক্তিলাভের অর্থে মুসলমানরা বুঝিয়া থাকেন—নরকের (দোজখ্) শাস্তিভোগ এড়াইয়া স্বর্গে (বেহেস্ত) গমন করা। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতন মুসলমানেরাও স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা প্রাচীন পারসীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে খৃষ্টানদের অপেক্ষা মুসলমানদের স্বর্গ আরও স্থূল বা বাস্তবতার চিত্রে বর্ণিত। মুসলমানদের বর্ণিত স্বর্গ এই প্রকার :—

"সেখানে সুসজ্জিত অনেক উদ্যান আছে। সেই সমস্ত উদ্যানের পথপ্রান্ত দিয়া নির্ম্মল বারিরাশিতে উচ্ছ্বসিতা নদীসকল অবিশ্রান্ত স্রোতে প্রবাহিতা হইতেছে। তাহা ছাড়াও সেখানে বিশুদ্ধ মধু সুস্বাদু দুগ্ধ এবং উৎকৃষ্ট সুরার পূর্ণ আরও অনেক নদী সর্ব্বদা বহিয়া যাইতেছে। আর সেখানে আছে—অপূর্ব্ব সুন্দর শোভাময় বৃক্ষশ্রেণী ও তাহাদের স্নিগ্ধ সুশীতল সুনিবিড় ছায়া। ঐ সমস্ত বৃক্ষ হইতে সুমধুর স্বাদপূর্ণ নানারকম ফল সর্ব্বদা উৎপন্ন হয়। আর সেইসব ফল খাইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেহের পরিপুষ্টি ও কান্তি বজায় থাকে। সেখানে যাইয়া ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা তাহাদের পিতামাতা সতী স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাদের সহিত আবার মিলিত হয়।"

মুসলমানদের ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান আরব দেশে। আরবদেশের অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় ও উষর মরুভূমিতে পূর্ণ। সেখানে বৃক্ষ লতা ও অন্য কোন উদ্ভিদেরা খুবই দুর্লভ। নদী হ্রদ প্রভৃতি জলাধারও সেখানে দেখা যায় না। অতএব এইরকম দেশের লোকদের নিকট বৃক্ষলতার ছায়াময় ও নদ-নদীপূর্ণ স্থান যে একান্ত বাঞ্ছনীয় হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেইজন্য এইরকম বৃক্ষলতাশোভিত এবং

নরনারীর বারিস্রোতে পূর্ণ স্থানের বর্ণনা মরুদেশ-বাসী আদিম মুসলমানদের কল্পনাকে যে আকৃষ্ট করিবে, তাহা একান্তভাবেই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বাঙলা দেশের নিম্নবর্তী কোনও স্থানের অধিবাসী। আমাদের জন্মভূমি ও বাসভূমি বাঙলা-দেশে বৎসরের প্রায় চারশত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। প্রত্যেক বৎসরে বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বাঙলা দেশে শত শত গ্রাম নদীর প্রবল বন্যার স্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়। সেইজন্য আমাদের বাঙলাদেশের অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টিপাত হয় এমন কোন শুষ্ক স্থানে বাস করাই পছন্দ করে। আমার মনে হয় ইংলণ্ডবাসী নরনারীদের মধ্যে কেহই জলরাশিতে সিক্ত ও স্যাঁতসেঁতে স্বর্গে যাইতে চাহিবেন না।

প্রাচীন গ্রীক ও রোম্যানদের মধ্যেও স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে নিজ নিজ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। গ্রীক ও রোম্যানদের স্বর্গের ইংরাজী নাম ইলিসিয়ান ফিল্ডস্ ("Elysian Fields", গ্রীক নাম—*Elysium*) এবং তাহাদের নরকের নাম টার্টারাস (*Tartarus*)। গ্রীক ও রোম্যানদের কথিত এই স্বর্গ কোনও কল্পিত স্থান বলিয়া মনে হয়। সেই স্বর্গের স্থান কোথায় তাহা আজও কাহারও দ্বারা ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা পৃথিবীর বহু নিম্নে কোনও লোকের মধ্যে অবস্থিত। আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করেন—সেই স্থান হইতেছে চন্দ্রলোক।

যাহা হউক, এই স্বর্গে "যে সূর্য্য ও তারকাসকল কিরণ দেয়, তাহাদের আলোক আমাদের এই পৃথিবীতে আলোকদানকারী সূর্য্য ও তারকাদের আলোক অপেক্ষা আরও অধিকতর দীপ্তিমান। সেখানে দিবাভাগ সবসময়ে শান্ত এবং বায়ু নির্মল থাকে। আর সেখানে একটি স্বর্গীয় মৃদু আলোকের ধারার স্পর্শে সমস্ত পদার্থই এক অভিনব সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হয়। মনোহর অনেক বৃক্ষবন, শ্যামল ক্ষেত্ররাজি এবং বিবিধপ্রকার বিকশিত পুষ্পরাজি সুশোভিত উদ্যানে সেখানে অনেক চমৎকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে আঁকাবাঁকা উপকূল-সমন্বিত 'এরিডেনাস' (Aridanus) নামক নদী সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। তাহার দুই কূলে 'লরেল' *(laurel) নামক অনেক মনোহর বৃক্ষ বিরাজিত। যে সমস্ত বীর স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন—যে সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাসী ও ভক্ত চিরকাল পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন—যে সমস্ত শিল্পী মূর্ত্তি ও চিত্রে অনন্ত সৌন্দর্য্যকে রূপায়িত করিয়াছেন—আর যে সমস্ত কবি অ্যাপোলো (Apollo—গ্রীকদের সূর্য্যদেবতা) দেবতার প্রিয় কোনও বিষয়ে কবিতা লিখিয়া কাব্যসৃষ্টির আদর্শকে অক্ষুণ্ণ করেন নাই—তাঁহারাই এই স্বর্গীয় নদীর দুই কূলে বাস করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে কোনও ব্যক্তি যে প্রকার আমোদ-প্রমোদে সুখ উপভোগ করিত—এই স্বর্গে আসিয়া তাহাদের সেই সমস্ত আমোদ প্রমোদের উপভোগ আবার নূতন আকারে দেখা দেয়। এই স্বর্গে অর্ফিয়ুস (Orpheus) দীর্ঘাকার ও শুভ্রবর্ণের বেশে সজ্জিত হইয়া চিত্তহারিণী রাগিণীর মাধুর্য্যধারা তাঁহার বীণার আলাপে প্রবাহিত করেন—আর উপস্থিত সকলে সেই বীণা হইতে নিঃসৃত বিভিন্ন সুরের অনুসরণে গান গায় ও নৃত্য করে। এই স্বর্গেই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাহাদের প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত আবার মিলিত হয়। বন্ধুরা আবার এখানে তাহাদের প্রিয় বন্ধুদের দেখিতে পায় এবং তাহাদের পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব আবার নূতনতা লাভ করে। কবিরা এখানে তাহাদের রচিত কবিতাবলী আবৃত্তি করিয়া যায়। রথের সারথীরা নিপুণভাবে তাহাদের অশ্বদের চালাইয়া গন্তব্যস্থলে চলিয়া যায়।" গ্রীকদের ও রোম্যানদের বর্ণিত এই স্বর্গের সহিত সোয়েডেনবার্গের** মতাবলম্বী লোকেদের ধারণাগত

*। ইহাসুগন্ধি লোরেলবৃক্ষ—গ্রীকদেশবাসী প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ও ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মী সাধক। জন্ম—ডেলফি-এ ২৯ জানুয়ারী ১৬৮৮। মৃত্যু লণ্ডনে ২৯ মার্চ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। ইনি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও ধর্ম্মীবাদ সমর্থক একটি নূতন মতবাদী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

স্বর্গের সহিত অধিকাংশ বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। গ্রীক ও রোম্যানদের মতে পার্থিব জীবনে গৃহীত ও নির্ব্বাহিত সমস্ত প্রকার বৃত্তি ও কার্য্য এখানে আসিয়া মানুষেরা আবার নূতনভাবে আরম্ভ ও সম্পন্ন করিতে থাকে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোম্যানদের স্বর্গের এরূপ বর্ণনা যদি সত্য ঘটনাই হয়—তাহা হইলে আমার জানিতে ইচ্ছা হয়—কত জন রাঁধুনী, মেথে-মজুর, স্কুল-মাষ্টার, উকিল, ব্যারিষ্টার, গৃহরক্ষক ঘণ্টা-বাজানো বালক বেয়ারা প্রভৃতি আরও অগণন জীবিকার্জ্জনকারী নরনারীদের ঐ স্বর্গে যাইয়া অনন্তকাল ধরিয়া নিজের নিজের বৃত্তিগত কাজ করিতে হইবে?

টিউটন জাতীয় লোকেরাও গ্রীক ও রোম্যানদের মত 'ইলিসিয়াম' নামক স্বর্গের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। তাহাদের মতে—ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান লোকেরা মৃত্যুর পর সেই স্বর্গে যাইয়া পুণ্যের পুরস্কার লাভ করে। তাহা ছাড়া তাহারা একটি নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে—যেখানে পাপী ও কাপুরুষ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরে যাইয়া শাস্তিভোগ করিতে হয়।

নরওয়ের প্রাচীন কালের অধিবাসীদের স্বর্গ হইতেছে—'ওডিন' (Odin) নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার ধাম। এই স্বর্গের বর্ণনায় প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার (সুইডেন ও নরওয়ে দেশের) অধিবাসীদের চাল-চলন আচার-ব্যবহার মন-মেজাজের বর্ণনা ফটোগ্রাফের ছবির মতন দেওয়া আছে। এটি একটি বিশেষ প্রকারের স্বর্গ। সেখানে ঐ দেশের মৃত লোকেদের আত্মারা চিরকাল ধরিয়া মাংসাদি আহার সুরাপান ও জীবজন্তুর শিকার-কার্য্যে মত্ত থাকে। ঐ দেশের ধর্ম্মপরায়ণা যেসব নারী মৃত্যুর পরে এই স্বর্গে গমন করে—সেখানে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একমাত্র কার্য্য পুরুষদের পানপাত্র সুরায় পূর্ণ করিয়া দেওয়া। ইহাদের মতে, "যেসমস্ত লোকের সম্মুখ যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা দেবতাদের প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যায় (Valhalla) নামক এই স্বর্গে যাইবার অনুমতি পায়।" "সেখানে তাহারা প্রত্যেক দিন ঘোড়ার বেশে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে ওডিন-দেবতার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে চলিয়া আসে। তাহার পর যে পর্য্যন্ত না পরস্পরকে অস্ত্রাঘাতের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া মারিয়া ফেলে সে পর্য্যন্ত তাহারা ক্রমাগতই যুদ্ধ করিতে থাকে।" কিন্তু ওডিন দেবতার অলৌকিক শক্তির বলে তাহারা আবার সবল সুস্থ দেহ পাইয়া জীবন্ত হয়—তাহাদের দেহের রক্তাক্ত স্থানগুলি সারিয়া যায় এবং তাহারা আবার সতেজে দাঁড়াইয়া উঠে। তাহার পরে সেখানে একটি বন্য শূকর আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ঐ লোকগুলি অস্ত্র লইয়া শূকরটিকে তাড়া করিতে করিতে শীকার করে, অবশেষে তাহাকে মারিয়া ফেলে। ইহার পরে মৃত শূকরটির মাংসকে পোড়াইয়া খাওয়া হয়। এইভাবে তাহারা সেই স্বর্গে প্রতিদিনই পশুমাংস আহার ও সুরাপানের উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে। এই রকম আনন্দের উৎসব সেখানে রোজই চলিয়া থাকে। আমার সন্দেহ হয় যে, শান্তিপ্রিয় নিরামিষভোজী ব্যক্তিরা এই রকম স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করেন কি না। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নিম্নশ্রেণীর জন-সাধারণের মধ্যে কোনও একটা লোকের খবরের কাগজ পড়ার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। সেই লোকটা একদিন স্বর্গবাসের সুখ সম্বন্ধে বর্ণনাকারী কোনও একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যে স্বর্গে যাইলে খবরের কাগজ পড়িতে পাওয়া যায় না, সেরকম স্বর্গে আমি কিছুতেই যাইতে চাই না।"

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে বাসকারী একজন (এখন মৃত) লোককে আমি জানিতাম। সেই লোকটি প্রতিদিন একতাল করিয়া আফিম খাইত। তাহার ধারণা ছিল—স্বর্গে অনেক বাড়ী আছে এবং সেইসব বাড়ীর সমস্ত দেওয়ালগুলিতে আফিমের খুব পুরু প্রলেপ লাগানো আছে। আর সেখানে যাইলে প্রচুর আফিম ও সুমিষ্ট খাদ্য খাইতে পাওয়া

যায়। আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই এই জাতীয় স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক।

কোন কোন যুবককে আমি জানি। তাহারা মনে করে, স্বর্গে যাইলে অতি সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া যায়। আবার কোন কোন যুবতীর কথাও ঠিক এইরূপ শুনিয়াছি। তাহাদের বিশ্বাস—"স্বর্গে যাইলে বিশ্বাসী ও প্রেমশীল স্বামীর সহিত বিবাহ হইবে এবং অনেক ভালো পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার ও বিবিধ রত্নের ভূষণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সেখানে দুঃখ ও অশান্তির নাম গন্ধ নাই। তাহা ছাড়া সেখানে জীবন শুধু অবিশ্রান্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে পূর্ণ। সেখানে আদৌ শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না। রান্না-করা বাসনমাজার কোনই হাঙ্গামা সেখানে নাই। ঘরবাড়ীর মেজে ও অন্য স্থান ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার করিতে কিম্বা অন্য কোন অপ্রিয় কাজকর্মও সেখানে করিতে হয় না।"

এইভাবে আমরা দেখিলাম বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীদের রুচি ইচ্ছা পছন্দ অপছন্দের অনুসারে নানা রকমের স্বর্গও আছে! এইসব স্বর্গ আর কিছুই নয়। এক এক প্রকৃতির নরনারীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ভোগ করিবার জন্য মনোগত ইচ্ছা ও বাসনার প্রকাশ মাত্র। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার অনুযায়ী নিজেদের মনের মতন অথচ অপ্রাপ্ত ভোগ্য বিষয় উপভোগের বাসনা-বশে মনে মনে এক এক রকম স্বর্গের 'সৃষ্টি' করিয়া থাকি। যদি বিশেষ কোনও বিষয় বা পদার্থ আমাদের একান্ত প্রিয় ও উপভোগ্য বলিয়া থাকে—তবে অবিশ্রান্তভাবে তাহা উপভোগ করিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিয়া থাকি। প্রত্যেক মানুষের মনের ইহাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমস্ত দুঃখক্লেশ বাদ দিয়া অবিশ্রান্ত নিছক সুখভোগের একটি ছবি আমাদের প্রত্যেকেরই মনে বিরাজিত। সেই ছবির সঙ্গে আমাদের নিজ নিজ কল্পিত স্বর্গের সহিত অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। বাহিরে এই সমস্ত স্বর্গের পরস্পরমতন কোথাও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ঐ প্রকারের স্বর্গ শুধু কল্পনাবিশ্বাসে স্বর্গাভিলাষী লোকেদের মনের মধ্যেই সর্ব্বদা বিরাজ করে। এইসব স্বর্গের অস্তিত্ব নিদ্রার ঘোরে দেখা স্বপ্নরাজ্যের মতনই অলীক। স্বর্গের সম্বন্ধে কোন না কোনও প্রকার ধারণা প্রচলিত আছে—এমন কোন সমাজে জন্মগ্রহণ ও জীবনযাপন করিলেই অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে স্বর্গের সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা ধারণা ও বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে।

আবার বিপরীত কোনও বস্তু বা ভাব হইতেই স্বর্গের সম্বন্ধে মানুষের মনে নানারকম বিশ্বাস ও ধারণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি নরক অথবা মৃত্যুর পরে মানুষের শাস্তিভোগের বিশ্বাস জন-সমাজে প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে স্বর্গের সম্বন্ধেও কোনও ধারণা অথবা বিশ্বাস মানুষের মনে কখনই জাগিয়া উঠিত না। কোনও গোঁড়া খৃষ্টান অথবা মুসলমান মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইবার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে উল্লসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে করে—যাহারা তাহাদের ধর্মশাস্ত্রের আদিষ্ট বিধি ও অনুশাসন পালন করে না, তাহাদের নরক অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট লোকে গতি হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে—অন্যধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের নরক-যন্ত্রণা ভোগের পরিমাণের কল্পনার অনুসারে তাহার স্বর্গ-সুখ উপভোগের পরিমাণ সে নির্দ্ধারিত করে। যদি সমস্ত অখৃষ্টান ব্যক্তিরা স্বর্গ কিম্বা ঐরূপ চিরসুখের আলয়রূপী কোনও স্থানে মৃত্যুর পরে যাইয়া উপস্থিত হয়—তাহা হইলে স্বর্গের প্রতি খৃষ্টানদের আর কোনই আকর্ষণ থাকিবে না। তাহা ছাড়া ঐ বর্ণনায় আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন—"একটি অতিশয় উচ্চ ও স্বচ্ছ প্রাচীরের দ্বারা খৃষ্টানদের স্বর্গকে নরক হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই স্বচ্ছ প্রাচীরের মধ্য দিয়া পুণ্যাত্মা ও স্বর্গবাসী খৃষ্টানেরা পাপী ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদের অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ দেখিতে পাইবে। এইরূপ পাশাপাশি দুইটি বিপরীত অবস্থা না থাকিলে স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মা খৃষ্টানদের স্বর্গের

সুখ আদৌ উপভোগ করা হয় না।" কারণ, ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবমাত্রেরই সুখ তাহার দুঃখের সহিত তুলনা করিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে। যদি দুঃখের সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সুখকে ঠিক সুখ বলিয়া উপভোগ করিতে পারিতাম না।' এইজন্যই আমেরিকার একজন খৃষ্টান ধর্ম্মাচার্য্য গীর্জ্জায় একদিন তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ দানের প্রসঙ্গে শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কি মনে কর যে, নরকে তোমাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের যন্ত্রণাভোগ তোমাদের স্বর্গে সুখভোগের উপরে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে?" তাহার পরে তিনি নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন, "না, তাহা হইবে না। বরং ইহাতে ঈশ্বরের ন্যায়পরতা ও সুবিচার দেখিয়া স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মারা আনন্দই পাইবে।" জোনাথান এড-ওয়ার্ডস নামে আমেরিকার আর একজন ক্যালিভিনিষ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক এ সম্বন্ধে ঐ উক্তির অপেক্ষা আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন, "বিপরীত কোনও অবস্থার দৃশ্য দেখিয়াই সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" যদি ইহাই প্রকৃত সত্য ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমি বরং অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিব। কারণ খৃষ্টান স্বর্গবাসীদের ঐ প্রকার নারকীয় উল্লাস উপভোগ করা অপেক্ষা নরকের শাস্তিভোগ মহত্ত্বের পরিচায়ক।

এ-সমস্ত ছাড়াও আরও বলা যাইতে পারে—অনন্ত কাল স্বর্গবাসের সঙ্গে অনন্ত কাল শাস্তি-ভোগেরও কোনও বীভৎস স্থানের সম্ভাবনা অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেলের বর্ণিত নরকের সম্বন্ধে যুক্তিহীন মতবাদের বিরুদ্ধে এখন অনেক লোকের দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা এখন আর অনন্ত নরক-ভোগের বিষয়ে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তবুও তাঁহারা চিরস্থায়ী কোন স্বর্গের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তবে যাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না—তাহাদের কি অবস্থায় মৃত্যুর পরে থাকিতে হয়?—সে সম্বন্ধে কিছু না জানার জন্য এসম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বলিতে সাহস করেন না। এসম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বলুন অথবা না বলুন, পরোক্ষভাবে তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মৃত্যুর পরে পাপীরা এখন কোনও স্থানে যাইতে বাধ্য হয়, যেখানে অনন্ত কালের জন্য তাহাদের কোন না কোনও রকম শাস্তি ভোগ করিতেই হয়। নতুবা 'চিরস্থায়ী' কোনও স্বর্গের অস্তিত্ব তাঁহাদের মতে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং Salvation বা মুক্তির অর্থে ইহাই খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের মতে বুঝাইতেছে—স্বর্গে যাইয়া চিরকাল সুখভোগ করা আর যাহারা পরিত্রাণ পায় না, তাহাদের চিরকাল শাস্তিভোগ করিতে হয়। ইহা ছাড়া মৃত্যুর পরে (খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের মতে) মানবাত্মার আর কোনই গতির অবস্থা থাকিতে পারে না।

ঈশ্বরের আদেশ আজীবন পালনের ফলে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পুরস্কার স্বরূপে মুক্তিলাভের মতবাদ জরথুস্ত্রীয়ান, ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই শুধু দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মতাবলম্বীরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিহিত নিয়ম ও আদেশ পালনের ফলেই ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মুক্তিকে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদের মধ্যে যাহারা আবার অত্যন্ত গোঁড়া, তাহারা মনে করে শুধু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুশাসন প্রভৃতি পালন করিলেই হইবে না, মুক্তি লাভ করিতে হইলে যীশুখৃষ্টকে "স্বয়ং ঈশ্বর ও একমাত্র পরিত্রাতা" বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা চাই। খৃষ্টান ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে সেণ্ট পলই (St. Paul) সর্ব্বপ্রথমে "শুধু যীশুখৃষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ স্থাপনেই মানুষের মুক্তিলাভ" (Salvation by Faith) এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই মতবাদের মর্ম্মকথা হইতেছে—'কোনও ব্যক্তি আজীবন নানা প্রকার পাপ ও কুকর্ম্ম করা সত্ত্বেও যীশুখৃষ্টের প্রতি যদি তাহার পরিত্রাতা ও পাপনাশকারী বলিয়া অন্ত

বিশ্বাস থাকে—তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মৃত্যুর পরে স্বর্গে চলিয়া যাইবে এবং সেখানে চিরকাল সুখে ও শান্তিতে অবস্থান করিবে'। খৃষ্টানদের মধ্যে এই বিশ্বাসটি সাধারণভাবেই প্রচলিত। এই রকম মতবাদের দ্বারা হয়তো মুক্তিলাভের পথ 'খুব সহজ ও নিরিবিলি' করা যায়—কিন্তু এরূপ যুক্তিহীন ও অসঙ্গত মতবাদ প্রচারের দ্বারা জনসমাজে অত্যন্ত বিষময় ফল হইয়া থাকে। তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ভারতবর্ষে খৃষ্টানধর্ম-গ্রহণকারী শত শত নরনারী। ইহারা ইউরোপে ও আমেরিকায় খৃষ্টান সমাজের দেখাদেখি নানাবিধ কুকর্ম ও পাপকার্যের অনুকরণ করে—আর মনে করে, যেহেতু যীশুখৃষ্টের প্রতি অন্ধবিশ্বাস তাহাদের আছে—অতএব তাহারা নিশ্চয়ই পাপ ও কুকর্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বর্গে যাইবে। কেননা, খৃষ্টান মাত্রেরই বিশ্বাস যে, খৃষ্টানদের সমস্ত পাপ দূর করিবার জন্যই যীশু আপনার জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন।

বেদান্তের মতে স্বর্গে যাইয়া সেখানে সুখ ও আমোদ উপভোগ করা কখনই মুক্তিলাভের অবস্থা নয়। অবশ্য বেদান্তে স্বর্গ এবং অন্যান্য উচ্চতর লোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। বরং বেদান্ত স্বীকার করে যে, স্বর্গ এবং আরও অনেক উচ্চতর লোক আছে—যেখানে পুণ্যাত্মা নরনারীরা মৃত্যুর পর গমন ও কিছুকাল অবস্থান করেন। কিন্তু বেদান্ত স্পষ্টই বলে—স্বর্গে গমন ও সেখানে সুখভোগ হইতে প্রকৃত মুক্তিলাভের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। পুণ্যাত্মা নরনারীরা মৃত্যুর পরে যে সমস্ত শান্তিময় ও সুখকর স্থানে গমন করে সংস্কৃত ভাষায় তাহাদিগকে 'লোক' বা 'ধাম' বলা হয়—(যেমন ইন্দ্রলোক, পিতৃলোক দেবলোক, ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক প্রভৃতি)। পুণ্যকর্মের ফলে অবশ্য মানুষ দেবলোক ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি লোক বা ধামে গমন করে। কিন্তু তাহার দ্বারা নিঃশ্রেয়স মুক্তিলাভ হয় না। সেইজন্য বেদান্তের মতে—এইসব লোক বা স্বর্গে যাওয়া কখনই মুক্তিলাভের সমান অবস্থা নয়। কারণ এই সমস্ত 'লোক' কখনই চিরস্থায়ী নয়। ইহারা সকলেই আপেক্ষিক প্রপঞ্চের অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তি স্থিতি পরিণতি ও প্রলয় বা অবসান নিশ্চয়ই আছে। বেদান্তের মতে পাপের ফলের ন্যায় পুণ্যেরও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল আছে। পুণ্যের ফলে পুণ্যশীল নরনারীরা স্বর্গে কিম্বা দেবলোকে যায়। তাহাদের পুণ্যফলের পরিমাণ অনুযায়ী ঐসব লোকে থাকিয়া তাহারা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ ও আমোদ উপভোগ করে। কিন্তু যখন সেই পুণ্যের ফল শেষ হইয়া যায়—তখন তাহাদিগকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীতে আবার তাহারা নূতনভাবে কর্ম করিতে থাকে এবং সৎকর্মের দ্বারা মুক্তির পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়।[২]

স্বর্গাদি লোক কখনই চিরস্থায়ী ও অনন্ত নয়, যেহেতু ইহাদের আদি উৎপত্তি ও শেষ আছে। অতএব ইহাদের পরিণতি ও অবসানও অবশ্যম্ভাবী। মানুষ পাপকর্মই করুক আর পুণ্যকর্মই করুক—তাহার ফল কখনই অনন্ত হয় না। যাহা কিছু পরিমিত তাহার ফলও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিমিত হইবেই। পাপ অথবা পুণ্য তাহার ফল নিশ্চিত-রূপেই পরিমিত—তাহাদের ফল কখনই অনন্তকাল স্থায়ী কিছুতেই হইতে পারে না। পাপ ও পুণ্য উভয়েই উৎপত্তি ও অস্থায়ী—অতএব তাহাদের ফল অনন্ত বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণরূপে মুক্তিবিরোধী ও অসঙ্গত কার্য। সারাজীবন ধরিয়া সৎকার্য ও পুণ্যকর্ম করিয়া গেলেও কখনই তাহার ফল

২। "ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি
দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"
—গীতা নবম অধ্যায়, ২০-২১

অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না। মানুষ সারাজীবন পাপকার্য করিলেও তাহার ফল চিরস্থায়ী হয় না—তাহা অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু তাহা বিপুল হইলেও তাহার একটা পরিমাণ ও সীমা আছেই। এই কারণে সেই পাপের ফলভোগ একদিন শেষ হইয়া যাইবেই। এইজন্যই খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের মতন স্বর্গে গমন ও সেখানে অবস্থিতিকে বেদান্ত মুক্তি বলিয়া স্বীকার করে না। কেননা, এই সমস্ত স্বর্গ বা লোক প্রপঞ্চের অন্তর্গত—তাহাদের উৎপত্তি আছে এবং তাহারা ধ্বংসশীল। এই জন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।"

—(গীতা, ৮।১৬)।

অর্থাৎ—হে অর্জুন! (ব্রহ্মার অবস্থান-স্থল) ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নবর্তী যে কোনও লোক বা ধাম কখনই চিরস্থায়ী নয়। অতএব এই সমস্ত লোকের অধিবাসীদের শীঘ্রই অথবা দীর্ঘকাল পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইবে।" সুতরাং বেদান্তের মতে—এই সমস্ত লোকে গমন ও অবস্থিতি কোনক্রমেই মুক্তিপদবাচ্য নহে।

'মুক্তির যথার্থ ও সর্বোচ্চ অবস্থা' বলিতে বেদান্তের মতে স্বর্গে গমন কিম্বা সেখানে অবিশ্রান্ত সুখভোগ করার অবস্থাকে বুঝায় না। সগুণ ও অশেষ মহিমান্বিত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভও বেদান্তের মতে চরম মুক্তির অবস্থা নয়। দেশ কাল নিমিত্তের এবং সমস্ত প্রপঞ্চের পরপারে যাহা সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য শুভাশুভ সর্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত—সেই নিষ্প্রপঞ্চ অবস্থায় সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও অবাধিত মুক্তির অবস্থায় চিরপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই বেদান্তের মতে প্রকৃত ও সর্বোচ্চ মুক্তির অবস্থা। যে সমস্ত নিয়মনীতি শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাদের সর্বতোভাবে অতিক্রম করিতে পারিলে বেদান্তবর্ণিত এই মুক্তিলাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়। এই অবস্থায় জীবাত্মা নিজের দিব্যস্বরূপ উপলব্ধির ফলে সমস্ত সীমা ও অসম্পূর্ণতার পারে যাইয়া অসীম আনন্দে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় বেদান্তবর্ণিত এই মুক্তির অবস্থা 'মোক্ষ' অর্থাৎ জীবাত্মার নিঃশ্রেয়স মুক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। সম্ভবতঃ এই অবর্ণনীয় মুক্তির অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই যীশুখৃষ্ট তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "তোমরা সত্যকে উপলব্ধি কর, এবং সত্যই তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে*।"

এই নিঃশ্রেয়স মুক্তি শুধু পুণ্যকর্ম ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে লাভ করিতে পারা যায় না। কোনও ব্যক্তিবিশেষে, কোনও মতবাদে, কিম্বা কোনও শাস্ত্রে অথবা কোনও ধর্মগ্রন্থের উক্তিতে শুধু বিশ্বাসী হইলেই এই সর্বাঙ্গীন ও চরম মুক্তিলাভ হয় না। কোনও প্রকার ফল কামনা না রাখিয়া একান্ত নিঃস্বার্থভাবে এবং অহেতুক অবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধানুরাগের সহিত নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা এবং সর্ববিধ স্বার্থপরতা অপবিত্রতা ও অজ্ঞানতাকে জয় করিতে পারিলেই এই চরম মুক্তি আসিয়া থাকে। পারমার্থিক সত্যতত্ত্বে যে ব্যক্তি একান্তভাবে শ্রদ্ধাবান জিজ্ঞাসু অনুরাগী ও সাধনতৎপর—তাহারই কাছে এই চরম মুক্তি আগত হয়। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদ যুক্তিহীন প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ থাকে না, যাহার অন্তর সম্প্রদায়গত সমস্ত গণ্ডী ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় সত্যাহুভূতির অতি উচ্চস্তরে অবাধে বিহার করে, সর্ববিধ সংস্কারমুক্ত সেই সিদ্ধসাধকই শুধু এই চরম ও পরম মুক্তিলাভ করিয়া ধন্য হন।

'মৃত্যুর পরেই প্রকৃত মুক্তিলাভ হয়'—একথা আদৌ সত্য নয়। এই জন্মেই এই দেহেই সুযোগ্য

* "And ye shall know the truth, and truth shall make you free."

—Gospel according St. John, VIII, 32

সাধক সর্বোচ্চ মুক্তির অবস্থা লাভ করিতে পারেন। মুক্তিলাভের জন্য যে ব্যক্তি এই জন্মে অবিশ্রান্তভাবে ও আন্তরিকতার সহিত সাধনা করে নাই—মৃত্যুর পরে সে ব্যক্তি কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি চিরজীবন রিপুর অধীন ও ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে আসক্ত, মৃত্যুর পরেও সেই ব্যক্তি ঐরূপ অবনত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। বেদান্তের মতে—ব্রহ্মতত্ত্বকে চরম ও পরিপূর্ণ সত্য বলিয়া উপলব্ধির দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানতা, স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য বন্ধন ছিন্ন ও অপূর্ণতাকে জয় করিতে পারিলেই সঙ্গে সঙ্গেই এই মুক্তি লাভ হয়। মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা (মুমুক্ষুত্ব) এবং পারমার্থিক ও শাশ্বত সত্যের প্রতি অবিশ্রান্ত ও আন্তরিক অনুরাগ মুক্তি লাভের পূর্বে মানুষকে অতি অবশ্যই অর্জন করিতে হইবে। প্রেমের শক্তি সুবিপুল। প্রেমের শক্তি অপেক্ষা সমগ্র বিশ্বজগতে আর কোনও মহত্তর ও প্রবলতর শক্তি নাই। কোনও বিষয়ের প্রতি নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ অনুরাগ থাকিলে কোন বাধা ও প্রতিকূলতাই মানুষকে প্রেমাস্পদের দিকে যাইবার জন্য নিবৃত্ত করিতে পারে না। প্রকৃত প্রেমের সেই শক্তি—যাহা ভক্ত ও ভগবানকে পরস্পরের কাছে আনিয়া দেয়, তাঁহাদের একত্রে মিলাইয়া দিয়া একাকার করিয়া ফেলে। প্রেমের শক্তিতে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইয়া গিয়া নিবিড় মিলনের আবেশে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উভয়েই আত্মহারা হইয়া যান। এই প্রেমের শক্তিতে প্রেমিকের সমস্ত বন্ধনের শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া তাহাকে একেবারে মুক্ত করিয়া দেয়। যদি শাশ্বত ও পরম সত্যের প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে, সমস্ত অসার অনিত্য ও নশ্বর বিষয় ও বস্তুর প্রতি আমাদের সমস্ত আসক্তি ও আগ্রহ একেবারে দূর হইয়া যাইবে।

দেশকালের অতীত পরম শাশ্বত সত্য ছাড়া আর কোনও অসার বিষয়ের প্রতি আমাদের মনপ্রাণের আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে তাহাদের দ্বারাই আমাদের আভ্যন্তরিক চরিত্রকে প্রকাশ ও নির্ণয় করিয়া দেয়। কোন্ কোন্ বিষয় ও বস্তুতে আপনার অনুরাগ আছে আমাকে জানাইলেই আমি আপনাকে বলিয়া দিব—আপনার জীবন কোন্ স্তরে অবস্থিত আছে। যদি আমরা পরম শ্রেয়ঃকে ভালবাসি তাহা হইলে আমাদের জীবন উচ্চতম স্তরে অবস্থান করিবে। যদি আমরা জাগতিক বিষয়-বস্তুকে ভালবাসি তাহা হইলে জানিতে হইবে আমাদের জীবন সাংসারিক স্তরের অন্তর্গত হইয়া আছে। যদি আমরা শুধু নিজেকেই ভালবাসি তাহা হইলে আমরা স্বার্থপরায়ণ। যদি পরাধীনতাই আমাদের প্রিয়বস্তু হয় তবে আমরা প্রকৃতিগতভাবে ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। মুক্তি অথবা স্বাধীনতায় আমাদের অনুরাগ থাকিলে আমরা কখনই বন্ধন বা পরাধীনতার মধ্যে থাকিতে পারি না। সুতরাং বিশ্বজগতের সমগ্র অস্তিত্বের কেন্দ্র-স্বরূপ পরম শাশ্বত সত্যতত্ত্বে আমাদের অনুরাগ ও প্রেম থাকিলে আমরা ক্রমশই ইহার নিকট হইতে নিকটতর সান্নিধ্য লাভ করিতে করিতে অবশেষে আমরা ইহার সহিত চরম একত্ব লাভ করিব। আর সেই পরম শাশ্বত সত্যতত্ত্ব স্বরূপতঃ সর্বথাই এক ও অদ্বিতীয়—তাহার স্বরূপ কখনই বহু বা বিভিন্ন হইতে পারে না।

এই পরম সত্যস্বরূপকে বেদান্তে 'ঈশ্বর' 'বিশ্ব-পিতা' প্রভৃতি আরও বহুবিধ নামে অভিহিত করা হয়। বেদান্তে ইহারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—"রসো বৈ সঃ।"—(তৈত্তিরীয় উপনিষদ) অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি রসস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ। সেই ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত অবাঙ্ মনিপ্রাণ ও নিরপেক্ষ। "সেই অখণ্ড রসস্বরূপকে উপলব্ধির দ্বারা মানুষ অসীম আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধন্য হয়।" ("রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্) যেখানেই অনাবিল ও প্রকৃত প্রেমের অবস্থিতি সেখানেই প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ। আর সেই অনাবিল প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত বন্ধন হইতে মানবাত্মার চিরমুক্তি। এই অনাবিল প্রেম

যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে সমস্ত অজ্ঞানতার উচ্ছেদকারী পরম জ্ঞানও প্রকাশিত—সেখানেই সমস্ত অসার অনিত্য হীন বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া মানবাত্মার পরম সত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা। আর এই অবস্থাতেই দেখা যায় চিরশান্তি ও চিরআনন্দ। কেননা, এই অবস্থায় সমস্ত অজ্ঞানতা দুঃখ তাপ মোহের চিরবিলুপ্তি। এই ব্রহ্মভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেমের অপার্থিব আলোকরাশির প্লাবনে অজ্ঞানতার সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়—আর মানবাত্মার মধ্যে দেখা দেয় শাশ্বত সত্যের চিরজ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য।

কি প্রকারে মানুষের সাধারণ ভালবাসা কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়া অবশেষে ভগবৎপ্রেমে পরিণত হইয়া যায়—সেই উপায়টি জানিতে পারিলেই এই অনন্ত প্রেমস্বরূপে চিরস্থিতি লাভ করার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনপদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও ভালবাসা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর ধারণা আছে, তথাপি ভগবৎপ্রেমের স্বরূপ কি তাহা অতি অল্প লোকেই জানেন। স্বার্থপরতার বশে সাংসারিক সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র বিষয়ে মানুষের হৃদয় হইতে ভালবাসার ফলে নানাবিধ বন্ধন দুঃখ ও অশান্তিই আসিয়া থাকে। কিন্তু যখন ইহা সম্পূর্ণভাবে স্বার্থলেশশূন্য হইয়া কোনও মহান্ ও উদার বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়—তখন ইহার ফলে মুক্তি শান্তি ও আনন্দ দেখা দেয়। স্বার্থপূর্ণ মনোভাব হইতেই যাবতীয় দুই অনিষ্টকর ও অশুভ ব্যাপার উৎপন্ন হয়। আর নিঃস্বার্থ ও উদার প্রেম হইতে সমস্ত কল্যাণকর ও মহৎ গুণ ও ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। ভালবাসা বিপথগামী হইলেই তাহার ফলে মানব-সমাজে নানা অমঙ্গল ও পাপজনক ব্যাপারের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু এই ভালবাসা যখন চিরন্তন সত্যস্বরূপের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহার ফলে কল্যাণ ও শান্তির উদ্ভব হয়—এবং তাহা হইতেই মানবাত্মা যাবতীয় হীন প্রবৃত্তি ও দুরাচারিতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যে অবরুদ্ধ-স্রোতা নদীর ন্যায় প্রেম নিহিত হইয়া আছে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সেই প্রেমের স্রোত বাহির হইয়া আসিবার পথ খুঁজিতেছে—যাহাতে সে অবশেষে অনন্ত প্রেমস্বরূপ অসীম মহাসমুদ্রে চির সম্মিলন লাভ করিতে পারে। যদিও এখন অসংখ্য মানব এই চিরমিলনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, তথাপি একথা সত্য যে—মানবাত্মা মাত্রেই শীঘ্রই অথবা বিলম্বে অনন্ত প্রেমস্বরূপের সহিত চিরমিলনের পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাইবে। মানুষের হৃদয়ে প্রেমনদীর যে স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া আছে—তাহার প্রত্যেকটি বিন্দুর মধ্যেই ভগবৎপ্রেমের শক্তিকণা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু উদ্দেশ্যের ও মানসিক পরিণতির বিভিন্নতার কারণে এবং চরিত্রগত বৈচিত্র্যের জন্য ইহার প্রকাশ ও ফলের অনেক তারতম্য ও পার্থক্য হইয়া থাকে। স্বার্থগত সুখ ভোগ-চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে মানুষমাত্রেরই যে ভালবাসা, তাহা পশুভাবময় ও দৈহিক লালসাময়ি। পরস্পরের সুখ বিধানের জন্য যে ভালবাসা তাহা মানবীয় ভালবাসা বা স্নেহ মমতা ও প্রণয়। কিন্তু শুধু প্রেমাস্পদের পরিতৃপ্তির জন্য স্বার্থগন্ধলেশশূন্য ইহার যে প্রকাশ তাহা স্বর্গীয় ও দিব্যভাবময় প্রেম। শাশ্বত সত্যস্বরূপের প্রতি অহেতুক অনুরাগ প্রকাশের ফলেই শুধু ইহা সম্ভব হইতে পারে। আর এই শাশ্বত সত্যস্বরূপ সেই সর্ব্বব্যাপী অসীম পরম সত্তা, ইহা সমস্ত মানব ও সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী ও আত্মসত্তা। অতএব ইহার প্রতি একান্ত ও অবিশ্রান্ত প্রেমের ফলে সাধক ব্যক্তি সমস্ত নরনারী ও সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন প্রেমশীল হইয়া পড়েন। সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামীর প্রতি একান্তভাবে প্রেমশীল ও অনুরাগী হইলে প্রেমযোগে সিদ্ধ সাধকপুরুষের সমস্ত কার্য্য ও চিন্তার উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে সর্ব্বজীবের কল্যাণসাধন। তখন আর তাঁহার মধ্যে কোনও স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থ করা অথবা কাহারও উপকার করিলে তাহার জন্য কোনও প্রতিদান পাইবার প্রবৃত্তি থাকে না।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের প্রকৃত প্রেম কখনও

কোনও প্রতিদান চায় না। যেখানেই ভালবাসা অথবা প্রেমের প্রতিদান পাইবার আশা থাকে, সেই প্রেম কখনই অপার্থিব প্রেম হইতে পারে না। এই প্রকার কামনামলিন ভক্তি বা ভালবাসা কখনও মানুষকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে না। বরং ইহা মানুষের সংসারবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দিয়া তাহার জীবনকে পরিণামে অশান্তিময় ও দুঃখে জর্জরিত করিয়া ফেলে। স্বার্থপরতা হইতেই সমস্ত নীচ ও মলিন বাসনার উৎপত্তি হয়। সাংসারিক মলিন বাসনা ও স্বার্থকামনার দাস হইয়া থাকিলে ভগবৎপ্রেমের সুধাপান করা মানুষের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? হে মানব! যদি অবাধ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে হৃদয় হইতে যাবতীয় হীন বাসনা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য কামনার সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া দাও।

ঈশ্বরপ্রেমই শুধু মানুষকে সমস্ত ভয় হইতে মুক্ত করিতে পারে। একই লোকের প্রতি ভয় ও ভালবাসা কখনও কোন ব্যক্তির হৃদয়ে একত্রে অবস্থান করে না। নিজের স্বার্থসুখে আসক্তির জন্যই মানুষের হৃদয়ে ভয়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যথার্থ প্রেমে স্বার্থসুখের আসক্তি নাশ করিয়া দিয়া বিশ্বজনীন সত্যস্বরূপের প্রতি মানুষকে অনুরক্ত করিয়া তোলে। প্রেম ও ভয় দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুরবর্তী খুঁটির মতন একেবারে বিপরীত প্রকৃতির বস্তু। যেখানে ভয় আছে সেখানে ভক্তি নাই; যেখানে ভক্তি থাকে সেখানে ভয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। সাধারণ নরনারীদের জীবনেও দেখা যায়—একজন যখন অন্যের প্রতি সত্য সত্যই প্রণয়াসক্ত হয়, তখন সমস্ত ভয় লজ্জা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। এমনকি সে মরিতেও ভীত হয় না। কারণ, তাহার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে পরলোকে নিশ্চয়ই প্রণয়াস্পদের সহিত আবার সে মিলিত হইবে। যদি সংসারের সাধারণ নরনারীদের মোহাসক্ত প্রণয়ের ফলে তাহারা ভয়ভাবনাহীন হইতে পারে, তাহা হইলে পরম সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি প্রেমানুরাগী হইলে মানুষ সংসারে আর কাহাকে ভয় করিবে? ভগবৎ-প্রেমের শক্তি সর্ববিধ ভয়কেই জয় করে।

ভগবৎপ্রেম কোনও মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইলে সেই মানুষ সমস্ত কর্তব্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। সাধারণ নরনারীদের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা কাহারও প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলে সেই প্রণয়াস্পদের আকর্ষণে পিতামাতা স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা ও বাড়ীঘরের সম্বন্ধে মোটেই খেয়াল রাখে না। সেইরূপ যখন কোনও ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমে আত্মহারা হইয়া যায় তখন তাহার আর কোনও করণীয় কর্তব্য থাকে না। ঈশ্বরের মত ঈশ্বর-প্রেমিকও সাংসারিক সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন। কোনও পুরুষ বা নারী তাহার প্রণয়াস্পদের জন্য যেমন কুল মান গৃহ সবই ত্যাগ করে—ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেমে অবিচ্ছিন্নরূপে মিলিত হইবার জন্য ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মারাও তেমনি সমস্ত পার্থিব সুখ সম্পদ স্বাচ্ছন্দ্য চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন। ভগবানের প্রতি যথার্থ প্রবল ভক্তি ও অনুরাগ আসিলে সংসারের প্রতি মানুষের আর কোন মোহ ও আসক্তি থাকে না।

ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগ ও ঈশ্বরপ্রেম একত্রে অবস্থান করে ও একত্রে প্রবাহিত হয়। সেইজন্য প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক শুধুই পরম সত্যস্বরূপ ঈশ্বরেরই অভিলাষী হন, তাঁহার আর কোনও বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাঁহার মন সর্বদাই ঈশ্বরমুখী এবং সেইজন্য অবশেষে তিনি প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হন।

ভগবৎপ্রেমের আতিশয্যে ভক্তদাধক আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলে ভাব ও সমাধির অবস্থায় উন্নত হন। এই অবস্থায় তিনি অনন্ত প্রেমস্বরূপ ও অসীম সৌন্দর্যস্বরূপ ভগবানের সহিত নিবিড় মিলনে ও আলাপনে আত্মহারা হইয়া থাকেন। তখন ভক্তের সমস্ত সত্তাই ঐশ্বরিক সত্তায় পরিণত হইয়া যায়। তখন হইতে তিনি চিরকাল আনন্দ-স্বরূপ প্রেমস্বরূপ ভগবানের সহিত নিজের একাত্মতা

উপলব্ধি করিতে থাকেন। তখন তাঁহার আর কোনই বন্ধন থাকে না। মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় তিনি চিরতরে অধিষ্ঠিত হন। তখন তিনি স্বর্গাদি লোকে গমন বা স্বর্গীয় সুখভোগকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করেন। এই জীবনেই তিনি অসীম-আনন্দভোগের অধিকারী হন। এই চরম মুক্তির অবস্থা হইতে তিনি ক্ষণেকের জন্যও বিচ্যুত হন না। বরং তিনি জাগতিক সমস্ত অবস্থাকে ও নিজের হৃদয় মনকে জয় করিয়া তাহাদের প্রভু হইয়া যান। তিনি তখন ব্রহ্মাস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আর জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। আর বিশ্বজগতের মূল-তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মে প্রেমযোগে যুক্ত হইয়া তিনি পরম শান্তে অনন্তকাল ধরিয়া দিব্যানন্দে অবস্থান করিতে থাকেন।*

* পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের *Salvation through Love* নামক বক্তৃতা স্বামী যোগানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদ।

বুদ্ধ

সৌরেন্দ্রমোহন বসু

সেদিন আকাশ চন্দ্রতারকা ভরা,
অন্ধতামস কেটে গেছে বহুদূর ;
তুমি গৌতম হেরিলে এ রূপ-ধরা—
মৃত্যু জরার এ যে শুধু তরপুর।

স্বপ্নমায়ার হেথা বৃথা ঘর বাঁধা,
দুঃখ সুখের আঘাতে আলোকে রচা ;
এ রাজপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁধা—
অমৃত গরল এই নিয়ে কেনা বেচা।

কোথা অমৃত ? কোথা সে পরম সুখ ?
কোথা হবে এই চির দুঃখের লীন ?
কোথা নাহি এক মায়াবন্ধনে দুখ্—
কোথায় বাজিছে চির মুক্তির বীণ্ ?

এরই লাগি' তুমি ত্যজিলে এ সুখপুরী,
ছুটিলে একাকী বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ;
সহজ তুমি করিলে সে মাধুকরী—
স্বর্ণ-আসন ত্যজিয়া ও রাজপুরে।

নীরবে নিশীথে বোধিদ্রুমমূলে ব'সে,
কি আজানা আশে হইলে তুমি যে হারা ;
আপনার মাঝে কোন অমৃতরসে—
হেরিলে চক্ষে সবই বন্ধন-কারা।

হেরিলে আলোক কোন সে মুক্তিপথে,
কোন্ রূপ তোমা সকল ভুলালো আজি ?
আরোহী হইয়া তব নির্ব্বাণ-রথে—
বসিলে নীরবে শুদ্ধ-বুদ্ধ সাজি'।

ব্যাবিলনে ইহুদীদের নির্ব্বাসন-কাহিনী

ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার (Nebuchadnezzar the Second—জন্ম ৬০৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ—মৃত্যু ৫৬২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ।) ৫৮৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে জেরুজালেম অধিকার করিবার পরে বহুসংখ্যক ইহুদী নরনারী ও শিশুকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে ঐ সমস্ত ইহুদীদের অনেক বৎসর নির্ব্বাসনের জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। ৫৩৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পারস্যের রাজা সাইরাস (বা সিরাস—Cyrus the Great—জন্ম ৫৫৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ এবং মৃত্যু ৫২৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ।) সসৈন্যে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যকে আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। তখন সেখানে ইহুদীদের উপরে দয়াপরবশ হইয়া সাইরাস ইহুদীদিগকে মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য কয়েক শত ইহুদী ইচ্ছা করিয়াই তখন দেশে ফিরিয়া যায় নাই। বিশেষ কোনও কারণে তাহারা ব্যাবিলনে থাকিয়া গিয়াছিল।

বহু বৎসর ধরিয়া এইভাবে ঐসব ইহুদীদের ব্যাবিলনে পারসীকদের সহিত পাশাপাশি বাস করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে পারসীকদের (জোরোয়াস্তারের ধর্ম্মমতাবলম্বীদের) ধর্ম্মগত অনেক রকম বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান ঐ সমস্ত ইহুদীদের ধর্ম্মমতে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। ইহুদীরা এইরূপে পারসীকদের প্রভাবে জোরোয়াস্তারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনেক বিধি বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রকারে স্বীয় ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের ব্যাপারকে ইহুদীদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসে "দায়াস্পোরা" বলে। (Diaspora—ইহা গ্রীক শব্দ—ইহার ইংরাজী অর্থ dispersion of members of one religion among people of another faith; esp. that of the Jews after Babylonian Captivity)।

—(Routledge's Universal Encyclopædia, p. 299)

ধর্ম্মমতে বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যাবিলন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত এই সমস্ত ইহুদীদের সহিত পূর্ব্বতন গোঁড়া ইহুদী সাদ্দিকিউদের সহিত মতভেদ ও বিরোধ হইতে লাগিল। কারণ সাদ্দিউকিরা আশঙ্কা করিয়াছিল, ঐসব ইহুদীদের সংস্পর্শে তাহাদের অচলায়তনের (Ghetto) 'পবিত্রতা' নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার ফলে ঐ-সব ইহুদীরা সাদ্দিকিউদের সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। সাদ্দিকিউরা এই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ইহুদীদের "ফারিসী" নামে অভিহিত করিতে লাগিল। ইহা হইতেই ইহুদীদের মধ্যে ফারিসী "Pharisee" সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন বলেন এবং লিখিয়াও থাকেন, ইহুদীদের এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের "ফারিসী" নামের উৎপত্তি—পারসীক জাতিদের সহিত তাহাদের দীর্ঘকালের বসবাস ও তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রভাবিত হওয়ার জন্যই উহারা 'ফারিসী' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। হিব্রু ভাষায় 'Pharisee' শব্দের অর্থ 'Separatedgroup' বা 'বিচ্ছিন্ন দল'।

সাদ্দিউকী এবং ফারিসীরা ছাড়াও পরবর্ত্তী কালে ইহুদী জাতির মধ্যে আর একটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই নূতন সম্প্রদায়ের নাম 'এসিনী' (Essenes)। *Religion of Israel* নামক গ্রন্থে ডক্টর এ কুয়েনেন বলিয়াছেন—"এসিনীরা জনবহুল ও কোলাহলপূর্ণ নগরের ভোগবিলাসময় ও দুর্নীতি-মলিন পরিবেশ হইতে অনেক ক্রোশ দূরে

নির্জন গ্রামে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া বাস করিত। Dead Sea-র নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাহাদের প্রধান বাসভূমি ছিল।" এসিনীরা ছিল সর্ব্বত্যাগী ও কঠোরতপা সন্ন্যাসীর দল। সংযম তপস্যা ও পবিত্রতাই ছিল ইহাদের জীবনের আদর্শ। যীশু খৃষ্টের দীক্ষাগুরু মহাত্মা জন দি ব্যাপটিষ্ট এসিনী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একজন বিখ্যাত সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন।

ইহুদী জাতির পরিচয়

যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় দাড়ে পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে প্রাচীন ইহুদীরা জুডিয়া হইতে ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় নেবুকাডনেজারের দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। ইহুদীদের সেই সুদীর্ঘ নির্ব্বাসনের কাল ঐতিহাসিকদের মতে ৫৮৬ হইতে ৫৩৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত। ইহুদীদের এই নির্ব্বাসনের সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গেলে ইহুদী জাতির প্রাচীন ও সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপে জানা দরকার। সেইজন্য আমরা ইহুদী জাতিদের পরিচয় সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা এখানে বলিতেছি:—

ইহুদীরা বহু প্রাচীন একটি জাতি। প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই জাতির ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহুদীরা সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে সেমেটিক (Semetic) শাখার অন্তর্গত। ইহাদের পূর্ব্বতন জাতীয় নাম 'হিব্রু' (Hebrew)। এই হিব্রু জাতির ব্যবহৃত ভাষা হইতে হিব্রু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। হিব্রু ভাষার সহিত প্রাচীন ফিনিসিয়া, আসিরিয়া ও আরব দেশের মূল ভাষার অনেক মিল আছে। কালের অগ্রগতির সহিত হিব্রু ভাষা ও হিব্রু সাহিত্যের আকারগত ও রচনার ভঙ্গী অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট য়্যারামিক (Aramic) ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন।

ইহুদীদের আদিম বাসস্থান ইস্রায়েল (Israel) রাজ্য। বাইবেলের ওলড্ টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্ট পুস্তকে ইহুদী জাতির সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা দেওয়া আছে। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের দুহাজার বৎসরেরও অধিক প্রাচীনকাল হইতে অনেক ঘটনা সেই বর্ণনায় আছে বলিয়া ইহুদী খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঐ সব ঘটনার সমস্তই যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বর্ত্তমানে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন না। সত্য ঘটনার সহিত কিম্বদন্তী ও কল্পিত কাহিনীর সংমিশ্রণ বাইবেলের ঐ সব বর্ণনায় অনেক জায়গায় আছে বলিয়া এখনকার দিনে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন। ইহুদী জাতির সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ-লেখক জোসেফাস ফ্লেভিয়াস, ফিলো, সোলিনাস, পর্ফাইরী, এফিফেনিয়াস ইউসিবিয়াস, জেরুম, ওরালিসরাজ প্রভৃতি মনীষী। ইহুদী, গ্রীক ও রোম্যান (খৃষ্টপূর্ব্ব তিনশতক হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে জীবিত) লেখকেরা ইহুদীদের সম্বন্ধে অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আধুনিক কালে ইহুদীদের জাতীয় ইতিহাসের সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর কুয়েনেন (Kuenen—*Religion of the Israel* গ্রন্থের লেখক), ডক্টর লুইস দি জেল (A Study of Primitive Christianity প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক), উইলিয়ম আকসন (কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য ঐতিহাসিক বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ) প্রভৃতি

স্বনীয় মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিবলের সুবিখ্যাত ছয়খণ্ডে বৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ Decline and Fall of the Roman Empire—রোমান শাসনকালে ইহুদীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছে।

যাহা হউক, প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহুদীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে দেওয়া হইতেছে।

ইহুদীদের ধর্মমতের নাম Judaism—যাহার বাংলা ইহুদী ধর্ম। ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ইহুদীদের ইতিহাসের সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। কথিত আছে, ঐ সময়ে ইহুদীরা মেসোপটেমিয়া হইতে ক্যানান (Canaan) দেশে গমন (migration) করিয়াছিল। এই ঘটনাকে ধরিয়া ইহুদী প্রফেট ও ইহুদীদের ধর্ম ও সমাজের সংহিতাকার মোজেসের (Moses) নেতৃত্বে ইজিপ্ট হইতে ইহুদীদের চলিয়া আসিবার কাল (Exodus) নির্ণয় করা যাইতে পারে। ১২২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে জোশুয়া নামে ইহুদী-নেতা প্যালেস্টাইন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইস্রায়েলের রাজা ডেভিড ইহুদী জাতির মধ্যে একজন বিশিষ্ট ধর্মনেতা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল অনুমান ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। ৭২১ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী সুমেরিয়া অকল সার্গন-এর (Sargon আসিরিয়ার রাজা—রাজত্বকাল ৭২২ হইতে ৭০৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ) দ্বারা ধ্বংস হইয়াছিল। অনুমান ৫৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে জেরুজালেম নগর ক্যালডিয়ানদের (Chaldeans) দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ৫৪৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে জেরুজালেম সহর পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। ১৬৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিরিয়ানদের দ্বারা আবার জেরুজালেম আক্রান্ত ও ধ্বংস হইয়াছিল। পরে ম্যাকাবিয়ানরা আবার ইহার উদ্ধার সাধন করে।

১৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে সেলিউসাইডস (ম্যাসিডনের অধিবাসী প্রাচীন রাজবংশীয় লোকেরা) ও ম্যাকোবিয়ানদের বিদ্রোহ হইয়াছিল। ১৪২ খৃষ্টপূর্বাব্দে সাইমন রাজপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্বাব্দ ৩৭ হইতে ৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত জুডিয়ায় হেরোদের রাজত্বকাল বলিয়া এখন প্রচলিত আছে। ৭০ খৃষ্টাব্দে টাইটাসের নেতৃত্বে জেরুজালেমে ইহুদীদের বিখ্যাত ধর্মমন্দির ধ্বংস করা হইয়াছিল। ৬৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে জেরুজালেম রোমানদের অধীনে আসে। ১৩০ খৃষ্টাব্দে রোমান-সম্রাট হাড্রিয়ানের (Hadrian জন্ম ৭৬ খৃষ্টাব্দ। রাজত্বকাল ১১৭ হইতে ১৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মৃত্যু ১০ই জুলাই ১৩৮ খৃষ্টাব্দ) দ্বারা রাজ-বিদ্রোহের অপরাধে ইহুদীদের জাতিহিসাবে জীবনযাত্রার স্বাধীনতা নিষ্ঠুরভাবে অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। সে-সময়ে হাড্রিয়ানের অনুচরদের দ্বারা অনেক ইহুদী ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

জারিসী ও সাদিউকী নামে ইহুদীদের দুইটি সম্প্রদায়ের লোকেরা যীশুখৃষ্টের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষা-পরায়ণ ছিল। ইহাদের নেতাদের চক্রান্তে মহামানব যীশুখৃষ্ট জেরুজালেমের রোমান শাসনের নিকট (কোনও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও) রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে যীশুকে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ক্রুশকাষ্ঠে পেরেকের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই কারণে যীশুর ধর্মমতাবলম্বীদের সমস্ত ইহুদীদের উপর অবজ্ঞা ঘৃণা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার মনোভাব বাড়িতে থাকে। কিন্তু সে সময়ে খৃষ্টানরা রাজনৈতিক ব্যাপারে তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। এজন্য ইহুদীদের উপরে প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টানরা প্রতিশোধ লইবার তেমন সুযোগ পান নাই।

যীশুর দেহত্যাগের পরে তাঁহার সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্যরা (Apostles) গুরুর প্রতি একান্ত অনুরাগের বশে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে সিমোন পিটার বা সেণ্ট-পিটার ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রধান। পিটারের ভাতার নাম জোনা। যীশুর অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য সেণ্ট অ্যানড্রুজ (Andrews) সিমোন পিটারের সহোদর ভ্রাতা। সেণ্ট পিটার অ্যান্টিয়ক (Antioch) সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে যীশুখৃষ্টের ধর্মপ্রচার করিয়া

বহু ব্যক্তিকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত (baptized) করিয়াছিলেন। তাহার পরে অত্যাচারী রোম্যান সম্রাট নীরোর (Nero—রাজত্বকাল ৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) রাজত্বকালে রোমে তিনি খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। এখানে রোম্যানদের অধীন ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের শত শত নরনারী পিটারের নিকট হইতে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কুখ্যাত ও অত্যাচারী সম্রাট নীরো এবং তাহার অনুচরেরা নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের প্রতি অনেক দিন ধরিয়া দারুণ নির্যাতন চালাইয়াছিল। রোমে নবদীক্ষিত অনেক খৃষ্টান নরনারী ও শিশুকে তাহারা নীরোর আদেশে মাসের পর মাস এমনকি ক্ষুধার্ত বাঘ ও সিংহের খাঁচায় ফেলিয়া দিয়া ভক্ষণ করাইয়া ছিল। এদিকে নীরোর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত অসন্তোষ জন্মিয়া উঠিল। মার্কাস ভিনিনাস, গালবা প্রভৃতি নীরোর সেনাপতিরা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া অভিযান করিল। নিজেকে অসহায় দেখিয়া নীরো অবশেষে আত্মহত্যা করিল (৬৮ খৃষ্টাব্দে)।

অতঃপর রোমের ভ্যাটিক্যান পাহাড়ে খৃষ্টান ধর্মের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র ও মঠ স্থাপিত হইল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে গ্রীস ও রোমে শুধু সাধারণ নরনারীরাই নয়—শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বহু নরনারী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিল। ৩২৬ খৃষ্টাব্দে রোম্যান সম্রাট কনষ্টানটাইন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কনষ্টান্টাইন খৃষ্টান ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া রোমে খৃষ্টানধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করিলেন। তিনি খৃষ্টানধর্মের বিরোধী ইহুদী পেগান প্রভৃতি জাতিদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষী ঘৃণাপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিলেন। কনষ্টান্টাইনের রাজশক্তির সাহায্যেই ইউরোপে খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠিল। নানাস্থানে খৃষ্টান বিশপ ও প্রচারকেরা প্রবল উৎসাহে খৃষ্টানধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইউরোপের ফ্রান্স জার্মানী স্পেন বেলজিয়াম পর্তুগাল প্রভৃতি দেশেও খৃষ্টানধর্ম রাজধর্ম হইয়া পড়িল। অনুমান ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রোম হইতে কয়েকজন বিশপের প্রচারের ফলে ইংরাজরাও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিল।

গ্রীক, রোম্যান (ইটালীয়ান), জার্মান, ফরাসী স্পেনীয়ার্ড পর্তুগীজ ইংরাজ প্রভৃতি শক্তিশালী জাতিরা খৃষ্টান হইবার পর হইতে ইহুদীদের উপরে নানাস্থানে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া নানাভাবে নির্যাতন হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতেই ইহুদীদের উপরে দুর্ভাগ্যের সূচনা দেখা দেয়। নিজেদের স্বদেশ হইতে শত শত ইহুদীরা প্রাণভয়ে পৃথিবীর নানা দেশে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইউরোপের নানাস্থানে 'যীশু-খৃষ্টের হত্যাকারী জাতি' বলিয়া ইংরাজ ফরাসী স্পেন রাশিয়ান ইটালিয়ান প্রভৃতি খৃষ্টান জাতিরা ইহুদীদের উপর দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। সমস্ত ইউরোপের নানাস্থানেই শত শত ইহুদীকে অপমান ও নির্মমভাবে হত্যা করার তাণ্ডব লীলা অবাধে চলিতে লাগিল।

ইংলণ্ডে ইংরাজদের শাসন কর্তৃপক্ষ ও ধর্ম-যাজকেরা ইহুদীদের প্রতি অষ্টম শতাব্দীতে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া ঘৃণা ও অত্যাচার করিতে লাগিলেন। সেখানে তাহাদের নাগরিক অধিকার ও রাজনীতি-গত ব্যাপারে সুযোগ দেওয়া হইত না। অতি লঘু অপরাধে আদালতে ইহুদীদের কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইত। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময়ে সেখানে শত শত ইহুদীকে নির্মমভাবে প্রহার ও হত্যা করা হইল (১১৮৯ খৃষ্টাব্দে)। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে সমস্ত ইহুদীকে দূর করিয়া দেওয়া হইল। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে পিউরিটান দলের নেতা অলিভার ক্রমওয়েল (জন্ম ১৫৯৯—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) নিজের রাজনৈতিক শক্তির সাহায্যে ইহুদীদিগকে আবার ইংলণ্ডে আসিবার সুযোগ দিলেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আর শাসিত রাশিয়ায় সর্বাপেক্ষা গোঁড়া খৃষ্টান সম্প্রদায় গ্রীক চার্চের অবাধ আধিপত্য ছিল। গ্রীক

চার্চের নেতারা রাশিয়ান সম্রাট জারের সাহায্যে নানাভাবে উৎপীড়িত করায় ইহুদীরা দলে দলে সেখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমেরিকা যুক্তরাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ১৮৮২ সালে আমেরিকায় ইহুদীদের জনসংখ্যা আরও বাড়িয়া উঠিল। তাহার কারণ জার শাসিত রাশিয়া হইতে অত্যাচারিত আরও অনেক শত ইহুদী সে সময়ে আমেরিকা-যুক্তরাজ্যে চলিয়া আসিয়াছিল। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের শাসক-মণ্ডলী কিছুকাল পরে ইহুদীদিগকে শুধু আশ্রয়প্রার্থী প্রবাসীর হীন অবস্থা হইতে তাহাদের নাগরিকরূপে উন্নীত করিলেন। সেখানে অন্য সমস্ত আমেরিকাবাসীদের সহিত ইহুদীদেরও ক্রমে রাজনৈতিক ব্যাপারে সমান অধিকার ও নাগরিকত্ব দান করা হইল। এই ঘটনার ফলে ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যের শাসন কর্তৃপক্ষও ইহুদীদের নাগরিকত্ব ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সেখানকার অধিবাসীদের সহিত সমান সুযোগ দিতে লাগিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই মহাযুদ্ধে ঘটনার আবর্ত্তনে এক দিকে ইংরাজরা ও অন্যদিকে জার্মাণরা ছিলেন। সে সময়ে জার্মানীতে প্রবাসী ইহুদী সম্প্রদায় এই যুদ্ধে জার্মান সরকারকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করে নাই। তাহার ফলে জার্মানরা ইহুদীদের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিতে লাগিল। এই ইহুদী-বিদ্বেষ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে র‍্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীতে ন্যাৎসী (Natzi) রাষ্ট্রনৈতিক শাসনতন্ত্রের অভ্যুদয়ে চরম হইয়া দেখা দিল। তাহার ফলে গোয়েবলস্, হিমলার, গোয়েরিং, প্যাপেন, রিবেনট্রপ প্রভৃতি হিটলারের প্রধান সহকর্মীগণ ও ন্যাৎসী সোস্যালিষ্ট পার্টির লোকেরা এবং জার্মান জনসাধারণ ধনী দরিদ্র বণিক বিদ্বান পুরুষ স্ত্রী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণী নির্ব্বিশেষে ইহুদীদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। অপমান লাঞ্ছনা প্রহার সম্পত্তি-নাশ দোকানপত্র লুঠ ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া হত্যা প্রভৃতি কোনও প্রকার নৃশংসতাই আর ইহুদীদের উপরে বাকী থাকিল না। সুবিধা পাইলেই সেজন্য ইহুদীমাত্রেই জার্মানী হইতে পালাইয়া যাইতে লাগিল। এই সমস্ত নির্য্যাতিত ইহুদীদের মধ্যে অনেক প্রধান শ্রেণীর মনীষী ও মহাজ্ঞানী পণ্ডিতও ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন (জন্ম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে) অন্যতম।

পৃথিবীর নানাদেশে এইভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিয়া নির্য্যাতন ভোগ করিলেও ধন মান শিক্ষা ও প্রতিভায় ইহুদী জাতিরা মোটেই উপেক্ষিত নয়। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, আধুনিক যুগে অনেক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি শিল্পী ঐতিহাসিক ও রাজনীতিজ্ঞ চিন্তানায়ক ইহুদী জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবিষয়ে যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এখনও ইহুদী জাতি বিশ্বে জ্ঞান ও বিদ্যার সাধনায় একটি গৌরবময় ধারা বহন করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ইহুদীদের মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক অনেক ব্যাঙ্কার (Banker) ও ব্যবসায়ী আছেন। প্রায় আজ ত্রিশবৎসর ধরিয়া ইহুদী সম্প্রদায়ের ধনী বিদ্বান ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রচেষ্টায় জেরুজালেমে ইহুদীজাতিকে আবার একত্রে আনিয়া সেখানে পুনর্বসতির জন্য এখন চেষ্টা হইতেছে।

যীশুখৃষ্টের প্রায় সমসাময়িক মনীষী ফ্লাবিয়াস জোসেফাস (জন্ম ৩৭ খৃষ্টাব্দ—মৃত্যু ১০০ খৃষ্টাব্দ) ইহুদী জাতীয় ব্যক্তি। ইনিই ইহুদীদের প্রাচীন কালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির প্রথম লেখক। গ্রীস ও আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রথম শতাব্দীতে বাসকারী ইহুদী ফিলো (Philo—জন্ম অনুমান ২০ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ৫৪ খৃষ্টাব্দ) একজন বিখ্যাত দার্শনিক মনীষী। বাইবেলের সেন্ট জনের গস্পেলের প্রথম অধ্যায়ে শব্দব্রহ্মবাদের (Word) সম্বন্ধে দার্শনিক মতের উপর ফিলোর প্রভাব সুস্পষ্ট। খৃষ্টান ধর্ম্মের

প্রধান প্রচারক সেণ্ট পল (৫-৬২ খৃষ্টাব্দ) ইহুদী। পল টার্সাস ও ডামাস্কাসের অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টান ধর্মের প্রচারক (Aposth) হইবার পূর্ব্বে সেণ্ট-পলের নাম ছিল সল (Saule)। সে সময়ে তিনি রোম্যান সম্রাটদের অধীনে একজন আঞ্চলিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জার্ম্মানীবাসী ইহুদী মনীষী স্পিনোজার (Spinoza—জন্ম ১৬৩২ এবং মৃত্যু ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ) নাম দার্শনিক সমাজে বিশেষ গৌরবের সহিত সুপরিচিত। জার্ম্মানীর বিখ্যাত কবি হেনরিক হাইনে (Heine—জন্ম ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৭৯৯—মৃত্যু ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬) জাতিতে ইহুদী। সমাজতন্ত্রবাদ মতবাদের উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক এবং *Capital, Communist Manifesto* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কার্ল মার্কস (Karl Heinrich Marx—জন্ম ১৮১৮ এবং মৃত্যু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) ইহুদী জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্স এর বিখ্যাত মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞ গ্যাম্বেটা (১৮৩৮-১৮৮২) ইহুদী ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স প্রবাসী ইহুদী দার্শনিক আঁরি বের্গসোঁ (Henri Bergson জন্ম ১৮৫৯—মৃত্যু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে) বিজ্ঞানসম্মত 'গতিবাদ'-এর জন্ম দার্শনিক চিন্তাজগতে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞানী ও Psycho Analysis-এর (মনোবিকলনবাদ) প্রবর্ত্তক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডও (জন্ম ১৮৫৬—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ) জাতিতে ইহুদী ছিলেন। আলবার্ট আইনষ্টাইনের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক ওয়াইজম্যান প্যালেষ্টাইনে ইহুদী জাতির পুনর্ব্বাসন আন্দোলনের (Zionist Movement) নেতা ছিলেন। রাশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিকোলাই লেনিনের (প্রকৃত নাম—Vladimir Ulyanov—জন্ম ১৮৭০-মৃত্যু ১৯২৪) অন্যতম প্রধান সহকর্ম্মী লিয়ন ট্রটস্কি (Brenstein Leon Trotsky—জন্ম ১৮৭৭) ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবে অন্যতম নেতারূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ষ্টালিনের চক্রান্তে ১৯২৯ ট্রটস্কি জানুয়ারী মাসে রাশিয়া হইতে নির্ব্বাসিত হন, পরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থান কালে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ট্রটস্কি ইহুদী জাতীয় ছিলেন।

ধর্ম্মব্যাপারে ইহুদীরা একেশ্বরবাদী বা Monotheist. ইহুদীদের উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বরের নাম য়াভে (Yaweh) অথবা জিহোভা (Jehovah)। ইহুদীদের মতে এই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার। তিনি বিশ্বজগৎ সমস্ত নরনারী ও সকল প্রাণী ও পদার্থের একমাত্র স্রষ্টা অধিপতি ও শাসক। নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও জিহোভা বিশ্বজগৎ হইতে (extra-cosmic) সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। তিনি চতুর্থ স্বর্গে ও ইডেন উদ্যানে (Fourth heaven and Garden of Eden) অবস্থান করেন। জিহোভা নিজের ভক্তদের পুণ্যের পুরস্কার ও অবিশ্বাসী পাপীদের দণ্ড দেন। নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অভিহিত হইলেও ইহুদীরা ঈশ্বরকে একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের ন্যায়ই বর্ণনা করে। ইহুদীদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহারাই একমাত্র ঈশ্বরের প্রিয়জাতি (Chosen People) এবং তাহাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম। পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতের লোকদের মতন ইহুদীরাও অত্যন্ত গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণচিত্ত।

ইহুদীদের জাতীয় ভাষার নাম—হিব্রু। (Hebrew)। কিন্তু তাহারা বহুকাল হইতে উহার অপভ্রংশ ইদ্দিশ (Yiddish) ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলে। এই ইদ্দিশ ভাষায় ইংলণ্ড আমেরিকা ও ভারতবর্ষে বাসকারী প্রবাসী ইহুদীরা নিজেদের জন্য কয়েকটি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছাপাইয়া থাকে ও'সেগুলি পাঠ করে। ইহুদীদের জাতীয় উপাসনাগার ও ঈশ্বরের স্থান খৃষ্টান ও মুসলমানদের গীর্জ্জা মসজিদ অথবা বেরিয়াল গ্রাউণ্ড ও গোরস্থান হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। ইহুদীদের ধর্ম্ম-উপাসনার মন্দির সিনাগগ (Synagogue) নামে পরিচিত। প্রত্যেক সিনাগগের মধ্যে সর্ব্বশেষ অভ্যন্তরীণ একটি বৃহৎ কক্ষ আছে। সেখানে বেদীর উপরে একটি সিন্দুকের

দুইপাশে পক্ষবিস্তৃত দুইটি দেবদূতের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই উপাসনা-ঘরটি ইহুদীদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। সেজন্য ইহুদীরা এই ঘরটিকে —'Holy of Holies' বা 'Sanctum' 'Sanctorum' বলিয়া থাকে।

ধর্মগত বিশ্বাস মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠানে পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্মমতাবলম্বীদের মতন ইহুদীরাও গোঁড়া পরধর্মবিদ্বেষী ও পরধর্মতে অত্যন্ত অসহিষ্ণু। অপর ধর্মের লোকেদের ইহুদীরা 'জেন্টাইল' (Gentile) বলিয়া ঘৃণা করে। ইহুদীরা মনে করে, একমাত্র তাহারাই ঈশ্বরের (জিহোভার) সর্বপ্রকার করুণা অনুগ্রহ ও প্রসন্নতার অধিকারী। তাহাদের বিশ্বাস জিহোভার একমাত্র প্রিয়জাতি বলিয়া জিহোভা ইহুদীদের ধর্মকে রক্ষা ও সংস্কারের জন্য আব্রাহাম ইসহাক জেভিড সলোমন মোজেস এলিয়স প্রভৃতি প্রফেটদের নিজের দূতরূপে তাহাদের নিকটে মাঝেমাঝে পাঠাইয়া দেন। ইহুদীরা বিশ্বাস করে—ইজিপ্ট হইতে মোজেসের নেতৃত্বে কানান দেশে ইহুদীরা চলিয়া আসিবার সময়ে পর্বতের কোনও গুপ্ত ও উন্নত স্থানে উঠিয়া মোজেস জিহোভার নিকট হইতে ধর্মের জন্য দশবিধ অনুশাসন (Ten Commandments) ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা (Torah) লাভ করিয়াছিলেন। ইহুদী ধর্মে সন্ন্যাসবাদ অথবা ব্রহ্মচর্য্যের স্থান নাই। এইজন্যই ত্যাগ বৈরাগ্য সংযম ও পবিত্রতার মূর্তি যীশুর সহিত ইহুদীদের বিরোধ হইয়াছিল।

ইহুদী জাতি বারটি শাখায় (tribe) বহু প্রাচীন কাল হইতে বিভক্ত ছিল। এখন মাত্র 'কোহেন' ও 'লিভি' নামে উহাদের দুইটি শাখার লোকেরাই বর্তমান। অন্য সমস্ত শাখার লোকেদের সংখ্যা খুবই অল্প—এমনকি নাই বলিলেই হয়। ইহুদীদের বিশ্বাস—"জিহোভা কোনও এক সময়ের শুভক্ষণে তাহাদের জাতির পরিত্রাতা Messiah-কে (গ্রীকদের নাম Sosiosh) পাঠাইয়া দিবেন। এই মেসায়া নাকি তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়া ইহুদীদের সমস্ত শাখার লোকদের আবার জেরুজালেমে আনিয়া একত্রিত করিবেন। আর তিনি তখন আবার ইহুদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতিরূপে পরিণত করিবেন। সেই মেসায়ার উদ্দেশে ইহুদীদের গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরা এখনও পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন !!

দুর্বলতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতাই মানুষের সমস্ত দুর্গতির অধমতির কারণ। যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, যাহার মন নির্ভীক সবল ও পবিত্র নয়—তাহার দ্বারা কোনই মহৎ কার্য্য হয় না। দুর্বল ভীরু স্বার্থান্ধ অলস ও কাপুরুষের কখনই ধর্মলাভ হয় না। শক্তিমান বীর্যবান আত্মবিশ্বাসী ও পবিত্রহৃদয় ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ধর্ম্ম-সমন্বয়

শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৈদিক যুগের ঋষিরা ঘোষণা করিয়াছিলেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" অর্থাৎ—"সত্য স্বরূপতঃ এক, কিন্তু জ্ঞানীরা সেই সত্যকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।" প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদের সাক্ষাৎ অনুভূতির এই বাণী হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় বহন করিতেছে। ধর্ম্মের চরম ও পরম প্রতিপাদ্য সেই সত্য—যাহা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন। সেই সত্য অনাদি অনন্ত শাশ্বত ও নিত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাহাই একমাত্র মূলতত্ত্ব। এই সত্যকে সাক্ষাৎ-ভাবে উপলব্ধি করাই ধর্ম্ম। সত্য স্বরূপতঃ এক ও অদ্বিতীয় হইলেও—তাহাকে লাভ করিবার সাধন-পথ অসংখ্য। এক এক শ্রেণীর সাধকের সাধনার দৃষ্টিভঙ্গী ও সাধন-পথ এক এক প্রকার। সেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিভিন্ন মতের সাধকগণ সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। সত্যকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার অবিশ্রান্ত ও আন্তরিক চেষ্টার নামই সাধনা।

সাধারণতঃ কোনও সাধকের পক্ষে এই সত্যকে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমগ্রভাবে দেখিবার শক্তি থাকে না। সাধনার সমস্ত পথের মধ্য দিয়া সমগ্র ভাবে সত্যকে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য ধর্ম্মসাধনায় রত সাধকমাত্রেরইথাকা কখনই সম্ভব নয়। এক এক শ্রেণীর ভাব মত ও পথের এক একটি পৃথক পথে সাধনার দ্বারা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে এক একটি বিভিন্ন রূপে সাধকেরা উপলব্ধি করেন। তাহাদের প্রত্যেকের এই সমস্ত উপলব্ধি সত্যতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ উপলব্ধি নয়। এই সমস্ত উপলব্ধির প্রত্যেকটিতেই সত্যকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে।

প্রত্যেক ধর্ম্মমতে সত্যতত্ত্ব অবশ্য আংশিক ভাবে আছে। কিন্তু সেখানে সত্য কখনই সমগ্রভাবে নাই। সকল সম্প্রদায়ে সাধক মহাত্মারা নিজ নিজ সাধনার স্বাতন্ত্র্যে সত্যকে যে উপলব্ধি করিয়াছেন—তাহা চরম ও পরম পরিপূর্ণ সত্যতত্ত্বের এক একটি দিক বা aspect। যাহা পরিপূর্ণ চরম সত্যতত্ত্ব—তাহা সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাগালের পারে। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য যে আছে তাহা কোনও পক্ষপাতহীন যুক্তিবাদী ব্যক্তিই অস্বীকার করেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ ও সর্ব্ববিধ কুসংস্কারমুক্ত সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বান্তঃকরণে ও অসঙ্কোচে বলিবেন—সত্যের সমগ্রতা ও প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে সার্ব্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক। কোনও ধর্ম্মমতই অথবা কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই নিজের সীমানার মধ্যে সত্যকে একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পারে না। সত্যকে সমগ্রভাবে দেখিতে ও জানিতে হইলে সেজন্য সকল সম্প্রদায়ের মতবাদের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে—মনকে সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কারমুক্ত করিতে হইবে। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের সমস্ত অনুভূতিকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে—আমরা বুঝিতে পারিব—একই সত্য এক এক মহাপুরুষের মধ্যে এক একরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত মহাপুরুষের প্রত্যেকের অর্জ্জিত আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে একত্রে মিলাইয়া দেখিলে ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন রূপ এবং সত্যের সামগ্রিক প্রকাশকে মানুষ সাক্ষাৎকার করিতে পারে।

ধর্ম্মসাধনার মধ্যে এই বৈচিত্র্য ও অপরূপতাকে অনেক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যঋষিরা তাঁহাদের তপস্যালব্ধ বিচিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকেরা সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের এই মহতী শিক্ষাকে সম্প্রদায়গত মতবাদ আচার নিয়ম ও বিশ্বাসবিধির মোহে ও অজ্ঞানতায় কিছুতেই বুঝিতে পারে না অথবা বুঝিতে চায় না।

প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপাসকদের বিশ্বাস "আমাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষই ধর্ম্মের তত্ত্বকে ঠিকভাবে জানিয়াছেন ও দেখিয়াছেন। আমাদের ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক-মহাপুরুষ ছাড়া আর কেহই কোন কালে ধর্ম্মের তত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করেন নাই। আমাদের সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ধর্ম্মমতই মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়। আমাদের সম্প্রদায়ের বাহিরে যে সমস্ত ধর্ম্মমত আছে—সেগুলি মোটেই ধর্ম্মমত নয়। সেগুলি অসত্য অধর্ম্ম ও অপবিত্রতার আকর। আমাদের দলের লোকেরাই শুধু ঈশ্বর দর্শন করিবার অধিকারী এবং তাহারাই শুধু ও মুক্তিলাভ করিবে। আর অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। কোন ক্রমেই কখনও তাহাদের সদ্গতি হইবে না !!"

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যে এইরূপ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী পরধর্ম্মবিদ্বেষ ও পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা থাকায় জন্য পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রকৃত রূপটি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ বিকৃত মনোভাবের ফলে লোকেরা ধর্ম্মের মূলনীতির (fundamental principle) কথা মনে রাখিতে পারে না। তাহার পরিবর্ত্তে নিজনিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত আচার অনুষ্ঠান নিয়মনীতি ও মতবাদকেই ধর্ম্মের সারবস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতার জন্য ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শকে তাহারা ভুলিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্ত্তে নিজেদের যুক্তিহীন মতবাদ ও অনর্থ আচারকে ধর্ম্মসাধনার ব্যাপারে প্রাধান্য দান করে। তাহার ফলে ঈশ্বরপ্রেম ধর্ম্মপ্রাণতা ও সত্যান্বেষণের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মান্ধতা ও ধর্ম্মবিমূঢ়তাই ধর্ম্মসাধনার নামে জনসমাজে বিরাজ করিতে থাকে। ইহারই বিষময় ফলে ধর্ম্মের নামে এক সম্প্রদায়ের লোকেদের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করে। ক্রমে তাহার ফলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ প্রচণ্ড হইয়া শত শত লোককে অপর সম্প্রদায়ের লোকেদের দ্বারা নির্য্যাতিত ও নিহত হইতে হয়। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় পৃথিবীর নানাদেশে এইরূপ বীভৎস ব্যাপার বারবার ঘটিয়াছে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবীর নানা দেশে প্রত্যেক ধর্ম্মমতের লোকেদের মধ্যে ধর্ম্মের নামে এই প্রকার দ্বেষ হিংসা এবং পরমতে অসহিষ্ণুতা ও অপরের ধর্ম্মমতকে নিন্দা ও বিদ্রূপ করা অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়াও নানা দেশের শত শত শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা দেখা দিতে লাগিল। আবার অন্যদিকে তথাকথিত ধর্ম্মবিশ্বাসী ও ঈশ্বরভক্তদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল ধর্ম্মানুষ্ঠানের ও ধর্ম্মবিশ্বাসের নামে যুক্তিহীনতা তামসিকতা বুদ্ধির জড়তা ও নানাবিধ কুসংস্কার। এইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে সেই ভীষণ ধর্ম্মগ্লানির সময়ে এমন একজন অলোকসামান্য পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল—যিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির সুবিপুলতা ও বৈচিত্র্যের দ্বারা মানব-সমাজে আবার ধর্ম্মের প্রকৃত রূপকে জীবন্ত আকারে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মান্বেষীদের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত অলোকসামান্য মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্যা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) বুধবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙলা দেশে হুগলী-জেলায় কামারপুকুর গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান। একটি দরিদ্র অথচ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দম্পতীর কনিষ্ঠ পুত্ররূপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যাহাকে আমরা 'উচ্চশিক্ষা' বলিয়া থাকি তাহার সংস্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও আসেন নাই। বাল্যকালে তিনি অতি সামান্যই লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাবসম্পর্ক-হীন। আধুনিক যুগের কোনও প্রকার ফ্যাসান ও রীতিনীতি তাঁহার জীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার যুগে বাস করিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনযাত্রা ছিল

সম্পূর্ণরূপে খাঁটি ভারতীয়। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর জাতীয় প্রকৃতির জাতীয় ভাবধারার ও জাতীয় ঐতিহ্যের মানবীয় রূপ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সেজন্য বলিয়াছিলেন: "বহুকাল পরে আবার দেখিলাম দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে বাঙলার স্বভাববর্ষ আপনার প্রাণকে মূর্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।"

অতিশয় পবিত্র চিত্ত ও অনুপম শুদ্ধ-সংস্কার লইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর-প্রেম ও ধর্মপ্রাণতা তাঁহার সমগ্র সত্তায় ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। ঐশ্বরিক অনুভূতির আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই দেহবোধবিস্মৃত হইয়া প্রায়ই ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়িতেন। আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা কিশোর বয়স হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেজন্য আর তিনি লেখাপড়ায় মন দিতে পারিলেন না।

কলিকাতা হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বর নামক একটি স্থান আছে। সেখানে রাণী রাসমণি নামে পুণ্যশীলা ও ঐশ্বর্যবতী নারী সুরম্য উদ্যানযুক্ত ভবতারিণী কালী ও রাধাকান্তের মন্দির (১২৬২ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঘটনা-চক্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মন্দিরে প্রধান পূজারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকেও তাঁহার বড়দাদা রামকুমারের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৬২ শ্রাবণ হইতে ১২৯২ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অবস্থান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শুধু দীর্ঘকালের জন্য নয়—ইহা তাঁহার জীবনের বিশেষ সৌরবময় অধিকাংশ জীবনকালকে অধিকার করিয়া আছে। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৫খ্রীঃ মাসে) নিদারুণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিরতরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ত্যাগ করেন। ১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট ১৮৮৬) তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামকুমারের মৃত্যুর (১২৬৩) পরে রাণী রাসমণি ও তাঁহার তৃতীয় জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস অতঃপর যুবকবয়সী শ্রীরামকৃষ্ণকে ভবতারিণীর মন্দিরে পূজারীর কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে কয়েক মাস কালীপ্রতিমার পূজা করিবার পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আর সাধারণ পুরোহিতদের মতন বাঁধা নিয়মে ও গতানুগতিক ভাবে জগন্মাতার পূজা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। জগজ্জননীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিবার জন্য ক্রমেই তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে এমন হইল যে, মন্দিরে পূজা করিতে বসিয়া আট দশ ঘণ্টা তিনি জগজ্জননীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন অবস্থায় আর তাঁহাকে দিয়া মন্দিরের পূজার কার্য করানো যায় না দেখিয়া মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজাকার্য হইতে রেহাই দিলেন। মথুরবাবু অতঃপর পূজকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহারই উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। হৃদয় সেই হইতে অনেক বৎসর ধরিয়া (১৪ বৎসর) শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিল।

প্রথম হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃতি ও চালচলন দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও স্নেহপরায়ণ হইয়াছিলেন। মথুরানাথ বুঝিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ বয়সে যুবক হইলেও একজন অসাধারণ ধর্মাত্মা ও শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষ। মন্দিরে সাধারণভাবে পূজার্চনাদি করিবার পরিবর্তে নিভৃতে সাধনতপস্যা করাই এখন শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে এখন অধিকতর প্রয়োজন। কারণ এই মহাপুরুষের তপস্যার ও ভক্তির বলে জগজ্জননী এই মন্দিরে নিশ্চয়ই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।

মথুরানাথের অনুমানই সত্য হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ

এখন মন্দিরে পূজার কার্য্য হইতে ছাড়া পাইয়া প্রকৃত জগজ্জননীকে পাইবার জন্য অবিশ্রান্ত সাধনায় ডুবিয়া গেলেন। প্রায় এক বৎসর আগে হইতেই তিনি পঞ্চবটির উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কখনও বেলতলায় কখনও বা একটি আমলকী গাছের তলায় গভীর ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। ধ্যান করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মোটেই বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। দিনরাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে সে সম্বন্ধে তখন তাঁহার কোনই হুঁস থাকিত না। যখন ধ্যানের গভীরতা হইতে মন কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতে ফিরিয়া আসিত তখন আকুল প্রাণে ও কাতর স্বরে তিনি জগন্মাতাকে ডাকিতেন। দুই চক্ষু হইতে অবিরত ধারে অশ্রু ঝরিয়া তাঁহার বুক তখন ভাসিয়া যাইত।

এইরূপ অবিশ্রান্তভাবে সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া নিবিড় ভক্তি অনুরাগের বলে দিনের পর দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে জগজ্জননীকে বিচলিত করিল। জগজ্জননী আর তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের কাছ হইতে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। জগতের জ্ঞানাবরণ ভেদ করিয়া চিরসৌন্দর্য্যস্বরূপিণী জগজ্জননী অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময়ী ও আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন। সেই হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানে জগজ্জননীকে নানারূপে ও নানামূর্ত্তিতে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদিকে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। জননী ও পুত্রের মধ্যে সেই হইতে চলিতে লাগিল অবিরাম ভক্তি ও স্নেহের বিনিময় ও আলাপন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই হইতে দেখিতে লাগিলেন এই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে প্রত্যেক দিকে প্রত্যেক স্থানে প্রতি প্রাণী ও পদার্থে প্রতি অণুপরমাণুতে জগজ্জননীর পরিব্যাপ্তি ও অপরূপ লীলা। বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র বিরাজিতা সেই বিশ্বময়ী বিশ্বজননী। তিনি সমস্ত বিশ্বজগতের-প্রসবিত্রী ধরিত্রী পালয়িত্রী। তিনি ইহার আধেয় ও আধারা। তিনি এই বিশ্বজগতের বিধাত্রী ও পরম-কারণস্বরূপা।

জগজ্জননীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এইভাবে স্নেহ ভক্তি ও ভাব-বিনিময়ের অবিশ্রান্ত খেলা চলিতেছিল। কিছুকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে জগজ্জননী এক অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগাইয়া দিলেন। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমতগুলির এইসব বিরোধী মতবাদ বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতার পশ্চাতে কোনও চিরন্তন ঐক্যতত্ত্ব আছে কি না—আর সমস্ত ধর্ম্মমতের গন্তব্য একই সত্যস্বরূপ ঈশ্বর অথবা তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসুক ও ব্যাকুল হইলেন। গভীরভাবে বিচার ও চিন্তার পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন—এই সমস্ত ধর্ম্মমতের সমস্ত দিক ও অংশ খুঁটিনাটিভাবে রীতিমত পন্থায় সাধন ও উপলব্ধি করিলে তবে ইহার গভীর রহস্য জানিতে পারা যাইবে। এইজন্য সাকার-নিরাকার সগুণ-নির্গুণ-জ্ঞান ও ভক্তি-মূলক সমস্ত প্রকার ধর্ম্মমতগুলি একে একে সাধনা করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইলেন।

এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বারো বৎসর সময় লাগিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে জটাধারী নামে রামাৎ সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ-পুরুষের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের পূজা আরাধনা ও ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দুই তিন বৎসর হইতে দক্ষিণেশ্বরে কালী-বাড়ীর নিকটে দেবমণ্ডলের ঘাটে বাস করিতে-ছিলেন। যোগেশ্বরী সেখান হইতে প্রতিদিন আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও সাধনতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যাইতেন। সিদ্ধান্তপন্ডিতা যোগেশ্বরীর নিকটে রামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হইলেন। তাহার পরে একে একে তন্ত্রের চৌষট্টি প্রকার সাধনায় তিনি একে একে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তন্ত্র সাধনার পরে রামকৃষ্ণদেব বৈষ্ণব ধর্ম্মের সখ্য বাৎসল্য মধুর প্রভৃতি মতে এক একটি ভাব সাধনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু কে ছিলেন—তাহা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীই এই

বৈষ্ণবীয় সাধনান্তেও তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন। কারণ যোগেশ্বরী বৈষ্ণব মতেও সিদ্ধা ছিলেন। যথাবিধি বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন ভাবের সাধনায় নিযুক্ত থাকিবার পরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে বিবিধ প্রকারে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন লাভ করিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মমতের সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে উনত্রিশটি বিশেষ ভাব প্রকাশিত হইল। ভক্তি-রসের সাধনার পরাকাষ্ঠার অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই অপরূপ অবস্থার ইতিপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভিন্ন আর কোনও মহাপুরুষ অবস্থিত হন নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত ভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রায় এক বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বরে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিচয় হইয়াছিল। শ্রীমৎ তোতাপুরীজীর নিকটে যথাবিধানে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-বেদান্ত মতের সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীজী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন তাঁহার ন্যায় এমন উচ্চস্তরের সিদ্ধপুরুষের যে অবস্থায় আসিতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল—যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবেদান্তের সাধনায় সেই চরম অনুভূতি নির্ব্বিকল্প সমাধিকে সত্যই একদিনেই লাভ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনা। তোতাপুরী মুগ্ধ হইয়া দেখিতেন অদ্বৈত-অনুভূতির প্রসঙ্গ উঠিলেই বিনা চেষ্টাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া যান! তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এগারো মাস থাকিবার পরে তীর্থদর্শনের উদ্দেশে অন্যস্থানে গমন করেন। তাহারই কিছুকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে একভাবে দীর্ঘ ছয় মাসকাল অদ্বৈত ভাবের ঘনীভূত অবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

এইভাবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সাকার-নিরাকার সগুণ-নির্গুণ ভক্তি-জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত ভাবের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইহার পরে হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে অন্য সমস্ত মতের সাধনায় তিনি নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দ রায় নামে সুফীমতাবলম্বী সিদ্ধ মুসলমান ফকীরের নিকটে শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সেইমতে যথাবিধি সাধনা করিতে লাগিলেন। তিন দিন যাবৎ ঐ মতে তিনি সিদ্ধিলাভের পরে জানিলেন—হিন্দুর নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং মুসলমানের নিরাকার আল্লা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। ইহার পরে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যীশু ও মেরীমাতার ছবি দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনদিন ধরিয়া যীশুখৃষ্টের আধ্যাত্মিক সত্তা তাঁহাকে জ্ঞানমগ্ন ও ভাবাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। চতুর্থ দিনে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটিবনে আসনে বসিয়া থাকিবার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যীশুখৃষ্টের দর্শন পাইয়াছিলেন। তাহার পরে নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের অনুভূতির আবেশে তিনি সমাধি-মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইভাবে সমস্ত ধর্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অবশেষে সুস্পষ্টভাবে ও প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিলেন :—"ঈশ্বর স্বরূপতঃ এক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের দ্বারা বিভিন্ন নামে রূপে ও ভাবে সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আরাধিত হইতেছেন। এইসব ধর্ম্মমতগুলির পার্থক্য ও ভিন্নতা শুধু তাহাদের মতবাদ আচার অনুষ্ঠান নিয়মনীতি বিশ্বাসবিধি ও উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে। কিন্তু সকলের চরম গন্তব্য এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর। আপাতঃবিরোধী এই সমস্ত ধর্ম্মমতের ও অনুষ্ঠানের পশ্চাতে স্বমহিমায় বিরাজ করিতেছে —সেই পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ—অখণ্ড অক্ষয় ঐক্যতত্ত্ব। যে সমস্ত সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের শাশ্বত আদর্শ ও মূল-নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়—সেই সমস্ত সম্প্রদায় বা মতই ধর্ম্মলাভের এক একটি পথ। আত্মসংযম সত্যনিষ্ঠা সত্যান্বেষণ ঈশ্বরপ্রেম বিবেকিতা পবিত্রতা সুচিন্তা সৎকার্য্য মানবপ্রেম জীবে দয়া সকলের প্রতি মৈত্রী করুণা ও বিদ্বেষহীনতার ভাবই ধর্ম্মের মূলনীতি। যে সমস্ত নরনারী ধর্ম্মের এই মূল-

নীতিকে আন্তরিকতার সহিত অবিশ্রান্তভাবে কাজে কর্ত্তব্যে আচার-আচরণে পালন করে তাহারাই যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাসী ও ধর্ম্মানুরাগী। তাহারা যে কোনও জাতি বর্ণ দেশ সম্প্রদায় বা সমাজের অন্তর্গত হউক না কেন—তাহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে লাভের ফলে মুক্তি ও শান্তি লাভ করিবে। পবিত্র-হৃদয় সত্যনিষ্ঠ সংযতচিত্ত ব্যক্তিরাই ধর্ম্মকে লাভ করে। তাহাদের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।"

সমস্ত প্রকার ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মমতের বৈচিত্র্যকে একটি পরিপূর্ণ অখণ্ড ঐক্যতত্ত্বে সমন্বয়-সাধন করাই বহুবিধ ভাবপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে প্রতিষ্ঠা ও প্রদর্শনের জন্যই হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতের মধ্যে অমিত গৌরবদীপ্ত শ্রেষ্ঠতায় বিরাজ করিতেছে। শঙ্কর রামানুজ রামানন্দ কবীর নানক দাদু রজ্জব এবং রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি ভারতবর্ষে শত শত ঋষি যোগী ও সিদ্ধমহাত্মা হিন্দুধর্ম্মের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে প্রমাণিত করিবার জন্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সমস্ত সাধনা ও অনুভূতির নদীধারা অবশেষে বিগত শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-সমুদ্রে আসিয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনুভূতির আলোকে প্রকাশিত হইয়াছে—"যাহা প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম, তাহা কখনও কোনও ব্যক্তি বর্ণ জাতি সম্প্রদায় দেশ ও কালে আবদ্ধ নয়। কোনও প্রকার অনর্থ আচার মুক্তিহীনতা গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে নাই। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম দেশ জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সমস্ত সীমা ও গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকালিক সার্ব্বজনীন উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে।" হিন্দু-ধর্ম্মের এই প্রকৃত ও মহান আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র জীবনে রূপায়িত হইয়াছে বলিয়া—শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবন ও বাণী কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সর্ব্ব-ভোভাবে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস। যে কোনও সম্প্রদায়ের যথার্থ ধর্ম্মান্বেষী সাধকেরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে নিজেদের সাধন-পথের সহায়তা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের এই অপরূপতাকে নিজ অনুভূতির দৃষ্টিতে দেখিয়াই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন ;—

"বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে—তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a search-light of infinite power thrown upon the whole mass of Indian thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence of India."

অর্থাৎ—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনন্ত শক্তিময় একটি আলোকচ্ছটা—যাহা ভারতবর্ষের যুগযুগ সঞ্চিত ধর্ম্মভাবরাশির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন। তিনি তাঁহার একক জীবনে ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্ম্মজীবনের সমগ্র কল্পটি সমগ্ররূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।"

—(পত্রাবলী, প্রথমখণ্ড, ১১২ সংখ্যক পত্র)।

তাহা ছাড়াও স্বামিজী বারবার বলিয়াছিলেন :—"সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ভাব এমনটি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও কোথায় হয় নি।... সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নতুন সম্প্রদায় স্থাপনের জন্যে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) আসেন নি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আধ্যাত্মিকতার অপরিমেয় শক্তির আধার। তাঁহার জীবনকে উপলব্ধির ফলে মানুষ ধর্ম্মভাবে ও ঈশ্বরপ্রাপ্তায় নিজেকে অনুপ্রাণিত করিয়া দিতে পারে। মহাত্মা গান্ধী সেজন্য বলিয়াছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত্রের অজ্ঞান আধ্যাত্মিক সাধনারই কথা। তাঁহার জীবন আমাদিগকে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে দেখিতে

সক্ষম করে। 'ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু এবং অন্য সমস্ত মিথ্যা'—এইভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে কোন ব্যক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না। তাঁহার ভালবাসা কোনও দেশের মধ্যে অথবা কোনও গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার জীবন অহিংসতার ব্রত-সাধনা শিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ।" বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সার্ব্বভৌমিক ভাবের পরাকাষ্ঠার সমাবেশেই শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন সমন্বিত। রোমাঁ্যা রোলাঁ সেজন্য বলিয়াছেন, "Sri Ramakrishna was the consumation of spiritual ideas of India for the last five thousand years. . . . He was intensely individual and at once universal." শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের সার্ব্বমানবিকতা লক্ষ্য করিয়া ফরাসী মনীষী সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয়ও সেজন্য বলিয়াছিলেন, "Ramakrishna's name is the common property of the whole mankind." আর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন—সেই বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া আমরাও বলি :—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
যেখানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে,
নূতন তীর্থ রূপ নিলো এ জগতে।
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি।
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"

স্বরূপ-প্রাপ্তি

শ্রীকালীপদ কোঙার

কতক জনম শুধু শ্রীগুরু চরণ ছাড়া হয়ে
করেছি সেবন এই পৃথিবীর দুঃখ-হলাহল,
সুখ চেয়ে পাছি ভেবে প্রাণ ভ'রে করি আলিঙ্গন
কেবল লভেছি ব্যথা, জ্বালা, শোক সুতীব্র অনল।
অমৃতের পুত্র হয়ে অমৃতত্ব করে অস্বীকার,
ভ্রান্তপথে অগ্রসরি, পশুত্ব সে লভেছি কেবল,
পূর্ব্ব জনমের শোক, মৃত্যু-দুঃখ আজিও মনের
অবচেতনার জেগে মৃত্যুভয় তোলে অবিরল।
অমৃত যে,—কভু যার জরা নেই, মৃত্যুহীন সদা,
সে চেতনা দেহ ধরি মৃত্যুভয়ে আজি কম্পমান!
হে প্রভু, কি তব লীলা, বুঝিবারে নাহি কোথা মোর।
রক্ষা কর ভ্রান্তি হতে, মৃত্যুভয় হতে কর ত্রাণ।
এ দেহে কি নাই সেই পূর্ব্বপুরুষের রক্তধারা,
যারা পেয়েছিল তোমা সুকঠোর সাধনার বলে,
'বেদমন্ত্র' দিয়েছিলে তুই হয়ে তুমি যাহাদের;
তবে কেন বদ্ধ রবো ইন্দ্রিয়ের বাসনা-শৃঙ্খলে?
সংসার নরককুণ্ডে নাহি রব।—আমি অনির্ব্বাণ
তোমার প্রেমের দীপ হৃদে জেলে হবো অগ্রসর,
আঁধার বিলুপ্ত হবে ও দীপের প্রদীপ্ত অনলে,
লভিব তোমায় আমি। এ মিলন রবে নিরন্তর।

দেবতার অন্তরালে বাংলা-সাহিত্য

অমিলকুমার হালদার

প্রাচীন পুঁথিপত্রের পৃষ্ঠায় জীবনযাত্রার প্রতিলিপি উৎকলিত থাকায় তৎকালীন বাঙালী জীবনের ছায়াময় পরিচয়, তাহাদের কর্মশক্তির বর্ণনা, আহার-বিহার, বিলাস-ব্যসন, ধ্যান-ধারণার একটা সামগ্রিক রূপচিত্র আমরা অপরোক্ষ করিয়া থাকি। এই রূপচিত্র 'গাথা সপ্তশতী', 'সদুক্তি কর্ণামৃত', 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়', 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল', 'হৈম্বচরিত' ইত্যাদি গ্রন্থাবলী হইতে খৃষ্টীয় দশম দ্বাদশ শতকের চর্যাপদ অবধি, এমনকি কিছিদধিক ত্রিশতাব্দীর পরবর্তী রচনা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও গভীরভাবে মুদ্রিত। বাংলাসাহিত্য দশম শতাব্দীর চর্যাপদের সন্ধ্যাভাষা আলোকে—বাংলা ভাষার শ্রুণ অবস্থাতেই—একটা ধর্মচেতনাকে অবলম্বন করিয়া, শাখা, পল্লবের ইঙ্গিত বহন করিয়া আসিয়াছে। ধর্মচেতনায় সর্বমানবীয় শিল্পকলার প্রথম উন্মেষ, আদিম মানবসমাজ স্ব-সত্তা-সচেতন হইলে অলৌকিক শক্তির, মানবশক্তির বহির্ভূত এক স্বয়ম্ভু দেবতার কল্পনা করিয়া নিজের অভাব-অভিযোগ, বিষাদ-উল্লাস, ঐহিক ক্ষতির কামনায় উপাসনা ও অর্চনা করিয়াছে, তাহাও নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী। তাই কালে কালে প্রতীক পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। ঘটপূজা, মূর্তিপূজা, বৃক্ষপূজা—সেই ক্রমবিবর্তনের ইঙ্গিত মাত্র। অবশ্য দুই ধর্মের—আর্য ও অনার্য—সংমিশ্রণে এবং সংমিশ্রণের পূর্বে ও পরে দুই সংস্কৃতি আচার ও আচরণের মধ্যে পরিস্ফুট। এই দুই জাতির মিলনে আর্যাবর্তে এমন এক নূতন জাতি গঠিত হইয়াছিল, যাহার মধ্যে বৈজাতীয় প্রভাব বিদ্যমান—আর্যীকরণ বলিয়া যে কথাটি প্রচলিত তাহাতে ইহার প্রবলতম সাক্ষ্য রহিয়াছে। বৈদিক ঋষি-কবি, (উপনিষদের ভাষায়—'কবির্মনীষী'), পরিদৃশ্যমান বিশ্বে এক সর্বব্যাপী দেবতার কল্পনা করিয়াছিলেন, যে দেবতা সৃজন ও প্রলয়ের অধিকর্তা, তমসার পরপারে জ্যোতির্লোকে যে দেবতার অধিবাস;—এখানে অনার্যজাতির অনার্য কৌমসমাজের পাহাড়-দেবতা, বৃক্ষদেবতা, প্রাণি-দেবতার একটা অন্তরায়ত চেতনার সূক্ষ্ম অংশ কি মিলায় নাই?

পৃথিবীর সর্বদেশের সাহিত্যই ধর্ম ও দেবতাকে আশ্রয় করিয়া উন্মেষিত হইয়াছে। তাহার কারণ প্রাচীন মানবের দৈবনির্ভরতা এবং দৈববিশ্বাস। দৈবানুগ্রহেই তাহার মর্ত্যজীবনের বিপদসঙ্কুলতার পরিত্রাণ হইতে পারে এবং দেবরোষে তাহার অভাব-অনটন, ক্লিষ্ট-ক্লেশের আধিক্য অবশ্যম্ভাবী—এই সর্বজনীন চেতনায় দেবতাকে তুষ্ট করিবার প্রেরণা তাহারা লাভ করিয়াছিল। সেইজন্যই লিপি আলেখ্যে, এমনকি মূর্তিশিল্পের স্বল্পাবশিষ্ট নিদর্শনের মধ্যেও সেই অনুভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

বাংলা দেশের ধর্ম ও ধর্মকোলাহল স্মরণাতীত-কাল হইতেই শোনা যায়। বাংলাদেশে আর্যবসতি, প্রাচীন অকল বলিয়া অথবা যেজন্যই হৌক, অনেক পরবর্তীকালে আরম্ভ হওয়াতে আর্যোত্তর জাতি-কর্তৃক ভূরি ভূরি লৌকিক দেবদেবী ভূমিষ্ঠ হইবার অপূর্ব সুযোগ পাইয়া, অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তাই বাংলার তেত্রিশকোটি দেবতার বাসস্থান। বাংলাদেশে এমন গ্রাম নাই—আয়তনে তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক—যেখানে অন্ততঃ পঞ্চাশটি দেবতার স্থান নাই। এখানে একটি দেবতার একশত আটটি নাম আছে; শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আছে, কালীরও আছে, শিবেরও আছে, দুর্গারও আছে, জগদ্ধাত্রীরও আছে। (দুর্ভাগ্যের বিষয় বহুসংহিতার এইরূপ গ্রামদেবতার পুরোহিতকে পতিত শ্রেণীভুক্ত

করা হইয়াছে)। এই দেবতাগুলি চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়া যাওয়ার কালে কালে দেব-ভীতি উৎপাদিত হইল; ঐ দেবতাগুলি বাংলার পুরুষ অপেক্ষা নারীর অকপটচারে বহুদিন লালিত হইয়াছে এবং বাংলায় এমন নরনারী, অন্ততঃ এমন নারী নাই যে, উহাদের নিকট বাবেকের জন্যও মানৎ করে নাই। প্রাচীন ধর্মপ্রাণ ও ভক্তিমান বাঙালী রীতিমত খরচ-খরচা করিয়া অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের পূজা দিত, এখনও দেয়। কারণ তাহাদের বহু শত বৎসরের মজ্জাগত ও অত্যন্ত বিশ্বাস—এইভাবে ঐসব দেবতাদের পূজা দিলে পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ—আর উহারাই তো অন্যান্য দেবতা! বাংলার বারো-মাসে তেরো পার্বণ, তাহাও দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত; এখানকার ব্রত-ব্রত, পূজা-উৎসব এমনকি বাঙালীর নামকরণ সমস্তই দেবতাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া রচিত হইয়াছে;—আর দেবতাকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যই বা হইবে না কোন দুঃখে? আজিকার ইংরেজী শিক্ষিত প্রকৃত বাঙালীও গৃহবহির্গমনের সময়ে দেবতার নাম স্মরণ করে—যে কোন শুভ কাজে দেবতাই অগ্রে স্মরণীয়। সাহিত্য পঠন-পাঠন এবং রচনাকে প্রাচীনকালে অত্যধিক পবিত্র শুভকর্ম বলিয়া গণ্য করা হইত; সেইজন্য লেখক এবং পাঠক স্বকর্ম-প্রতিষ্ঠার অগ্রে দেবতাকে নমস্কার করিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেবতার স্থান সর্বোপরি—মানব ও মানবধর্ম তাহার অনুসারী মাত্র।

ঐ দেবতা তান্ত্রিকসাধনার কায়ারূপে পরিণমিত। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কায়াসাধন-প্রক্রিয়া এক সময়ে সর্বভারতে বিকাশলাভ করে, এবং ঐ তন্ত্রগুলি প্রধানতঃ কাশ্মীরে ও বাংলায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া তন্ত্রের সেই সাধন-সঙ্কেতই চর্যাপদ ও দেহকোষে সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সহজযান ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বাংলাদেশ বোধহয় কিছু বিরূপ ছিল, দুই একটি পদে তাহার আভাস আছে। সিদ্ধাচার্যেরা সকলেই সহজযানী; জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতি ইঁহাদের ঘৃণা সরহপাদের একটি পদে এইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে:—

'নগ্ন হইলে যদি মুক্তি হইত তবে আগে শিয়াল-কুকুরের, লোম উপড়াইলে যদি সিদ্ধি হইত তবে আগে যুবতীর নিতম্বের, পুচ্ছগ্রহণে যদি মোক্ষ হইত তবে অগ্রে মযূর-চামরের, যদি উচ্ছিষ্ট ভোজনে জ্ঞান হইত তবে আগে ঘোড়ারই মুক্তি লাভ হইত।'

এই সাধনরীতিকাগুলিতে দেহের মধ্যে দেবতার সন্ধান করা হইয়াছে। দেহের দেহলীতে যে দেহাতীতের প্রতিষ্ঠা তাহাকেই সিদ্ধাচার্যেরা ধর্ম-শিক্ষার্থী তরুণযোগীকে বারেবারে উপদেশ দিয়াছেন। শবরপাদের উক্তাদি অন্যান্য আভীরের যে কামলীলা বর্ণনা এখানে আছে তাহাও ঐ সুগভীর দৈহিক চর্যা অর্থাৎ যোগকৌশলের সঙ্কেতবহ। এই পদকর্তারা দেহ ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে স্বীকার করিবে না, এই দেহতরঙ্গিণী-তটে পূজা উপচারের আয়োজন সম্ভার করিয়া বাংলার প্রথম সাহিত্যিক তাহার সাধনারম্ভ করিলেও ঐ দেহপূজা, বা দেহস্থ আত্মদর্শনরূপ সমীক্ষামূলক কাব্য-রচনার যোগসূত্র প্রায়শঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া—আদিরসরূপে লালিত হইয়া—একেবারে পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব-কবির কাব্যে, এবং সহজিয়া সাহিত্যের মধ্যে একটুখানি উঁকি দিয়াছিল। সেই—

'শুন রজকিনী রামী,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি'।—

অথবা—

'পিয়া যবে আওব এ' মঝু গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজদেহে'—ইত্যাদি।

—এই যে দেবধর্ম ও দেবীধর্ম নর ও নারীতে আরোপ করা এবং সেই উপায়ে তাহাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা বাংলার নিজস্ব সাধনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—'বাঙালীই একা নরদেবতা ও নারীদেবীকে পূজা করিতে শিখিয়াছিল।'

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' ধর্মঠাকুরের পূজা-

পদ্ধতি অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মসম্ভূত দেবতাকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, যদিও ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে বাদবিসম্বাদের অন্ত নাই। এই ধর্মঠাকুর যিনিই হউন, বাঙালী পণ্ডিতের ভক্তিপুষ্পে তিনি বস্তুজগৎ হইতে ব্রহ্মজগৎ, তথা হইতে ভাবজগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুকাল পূজা পাইয়া আসিয়াছেন; পরবর্তীকালে আর একবার ইহার উপর পালিশ করা হইয়াছিল—সেই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে। সমস্ত মঙ্গল কাব্যই দেবতা-নির্ভর। দেবতাকে বাদ দিলে মঙ্গলকাব্যের কাব্যত্ব হয়ত কতকটা কিছুটা থাকিবে কিন্তু তাহা আদৌ 'মঙ্গল' হইবে না; সেইজন্য একটা সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল—যাহা হইতে বিচ্যুতি-ব্যতিক্রম প্রায়ই নাই। তৎকালীন লৌকবাংলার ও বাংলার সমাজের পরিচয় এবং বাঙালী মানবের ধ্যানধারণার সুস্পষ্ট থাকায় তাহারই ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু ফুটিয়াছে—যেমন, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে—সে যেন আকস্মিক দৈবানুগ্রহের ফলস্বরূপ। এই মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রায়ই কোনও দেব অথবা দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন, তাই দেবদেবী-মাহাত্ম্য প্রকট করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; মানুষ সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির গৌণ সহায়ক।

এই পর্যায়ারম্ভের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে যে দেবদেবীর লীলামাধুর্য বাঙলা অনুবাদিত গ্রন্থে একবার চকিত চমকে দেখা দিয়াছিল, সেগুলিও উল্লেখ করিতে হয়। এই অনুবাদিত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রধান। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের হাতে অনেকাংশে তুরীয়লোকে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্বের ক্রান্তিরেখায় সঞ্চরমান এবং ভাগবতে ঐ দেবত্বই পরিপূর্ণ দেববিগ্রহ ধারণ করিল—তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইলেন; অবশ্য মহাভারতে ঐ দেবতাটির দেবায়ন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া কাশীরামদাস প্রতি পদে পদে স্মরণ করাইয়াছেন,—

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।'

এই সুযোগে অনেক অদ্ভুত অংশ ঐ গ্রন্থদ্বয়ে সংযোজিত হইয়াছিল—তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের মানবত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া প্রায় পলায়ন করিতে হইয়াছে।

বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান বলিয়া এবং ধাতুগত অর্থে ইহা অনাভূমি বলিয়া মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তি এখানে এত স্বাভাবিক; সুতরাং মঙ্গলকাব্যগুলি ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত। বাংলায় জঙ্গল ছিল প্রচুর, এখনও কিছু কিছু আছে। বাঙালীকে এইখানে বাস করিতে হইতেছে। সেইজন্য এই জঙ্গলের ও অনাভূমির ভয়কে কাটাইবার জন্য অরণ্যদেবতা মঙ্গলচণ্ডী, সর্পদেবতা মনসা, ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়, কুম্ভীরদেবতা কালুরায়, বাঘের দেবতা লক্ষ্মী, কৃষিদেবতা শিব ইত্যাদির পরিকল্পনা করিতে হইয়াছে—এবং ঠিক ঐ ঐ সব দেবতাকে অবলম্বন করিয়া একএকখানি কাব্যও রচিত হইয়াছে; যেমন, চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল—আমার সুরচনীর পাঁচালী, শিবায়নকাব্য, শনির পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী—কতগুলি নাম করিব? এই যে দেবতাগুলির নাম করিলাম ইহারা প্রায়ই লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—অবৈদিক ও অপৌরাণিক; অনেকের মধ্যে হয়ত পুরাণের অংশ যদিও বিকৃতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই মানুষকে কষ্ট দিয়া পূজা-আদায় করিতে সদাসচেষ্ট; —ভাগবতী বাতাবরণে ইহারা যেন উপদেবতা—অপদেবতার আবির্ভাব। ইহারা বাংলাসাহিত্যের কলেবর পুষ্টির সহায়তা করিয়াছে, নিঃসন্দেহ; কিন্তু মৌলিক সৃজনশক্তির আত্মিক উল্লাসময়তায় সাহিত্যের উচ্চকোটিতে যে প্রাণ-প্লাবন আসিয়া থাকে তাহা হইতে আমাদের সাহিত্য তিন শতাব্দী পিছনে ছিল; ইহার ব্যতিক্রম কেবলমাত্র চাঁদসদাগর, মনসামঙ্গলের নায়কের মধ্যে মানুষীশক্তির

বিদ্রোহ সূচনা অনতিস্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল—সেও ক্ষণকালের নিমিত্ত।

উপরোক্ত দেবতাগুলির বাহনও প্রাণীজগৎ হইতে গৃহীত ; যেমন বিড়াল, হংস, মহুয়, সিংহ, ব্যাঘ্র, পেচক, সর্প, গর্দভ, ঘোটক, গোধিকা প্রভৃতি ; অর্থাৎ এই কবিরা বলিতে চাহেন যে, অমর্ত্যলোক হইতে উক্ত দেবদেবীগুলি মর্ত্যের বাহনে পল্লী-মানুষের নিকট নামিয়া আসিয়াছেন। আসল কথাটি কিন্তু সেই ঔপনিষদিক ইঙ্গিত বা ক্রমবিকাশের আদিপর্বের ইতিকথা, আদি মানুষের ঊর্ধ্বচারী মায়ারাজ্যের মননাতিরেক।

চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যে রাধাকৃষ্ণ প্রকৃত জনজীবনে ও বিদেহলোকের মধ্যে ওঠানামা করিতে করিতে চৈতন্যোত্তরকালে দেখাদিত হইয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা দিল এবং সেই দেখা দিবার প্রত্যক্ষ কারণ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-প্রভাব। তথাপি এই দেবায়নের বীজ জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে উঁকি দিয়াছিল, বিদ্যাপতির মধ্যেও তাহারই এক রূপকল্প এবং জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস যাদুঘোষে গিয়া তাহার প্রৌঢ় পরিণতি ;—যদিও বৈষ্ণব গীতিকাব্যে অর্থাৎ পদাবলী শাখায় ভগবদ্বৈমর্ম্যের কথাটা ঈষৎ চাপা—আমি জীবনী বা চরিতকাব্যের কথাই বলিতেছি ; ইহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ; চৈতন্যমঙ্গলের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এইপথে ইন্ধন যোগাইয়াছে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—এই বীজমন্ত্র উপাসনার অবলম্বন হইয়াছিল বলিয়া, যাহা হওয়া স্বাভাবিক, বাঙালী কবি মুখরিত কণ্ঠে গাহিলেন—'প্রণমহো কলিযুগ সর্বযুগ সার'। তবু অতীত দিকচক্রবালে শতসহস্র দেবদেবীর ধূলিধূসরিত কাব্যসাথী হইতে এখানে দিব্যভাব আস্বাদনের একটা প্রয়াস পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যে প্রয়াসে পরোক্ষে নহে প্রত্যক্ষের উপর অলৌকিকতার আরোপ-প্রবণতা। এই স্রোত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অবধি অব্যাহতভাবে চলিয়াছে ; ঐ সেতু-প্রান্তে কিছু কিছু শক্তিশৈথিল্য দেখা দেয় বটে কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধবধি দেবতার অতি-প্রভাব অক্ষুণ্ণই ছিল—কবিওয়ালাদের আসরেও তাহা অম্লানরেখ। চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ অবধি সেই একই স্রোত, কোথাও তাহা উদ্দাম তরঙ্গতাড়িত, কোথাও বা মন্থরগতি, আবার কোথাও বা শীকরকণায় মুক্তার মতো প্রতিফলিত ; এই দেবতা কোথাও হিংস্র খর্পরধারিণী পূজালোলুপ ; আবার কোথাও বা প্রেমময়ী, আশ্রিতপালিত, কোথাও বরাভয়দায়িনী, ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতিকা-মূর্তি। শেষদিকের দুই কবি—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—ইহার সার্থক উদাহরণ। এই কবিযুগল বাংলা সাহিত্যের দুই সেতুতে অবস্থিত ; ভারতচন্দ্রের শিব প্রমথেশ হইলেও রসিক ; তাই—

'আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো
বিয়ার কালে এয়োর মাঝে হইল দিগম্বর লো।'

পক্ষান্তরে রামপ্রসাদের গৌরী বাঙালী ঘরের অতিশয় দুরন্ত বালিকার মত ক্রীড়াপরায়ণা, প্রাণ-সুরমূর্ছনা দিগন্ত প্রসৃত মাঠে-ঘাটে নদী-নালার উপর দিয়া ছুটিয়াছে, যাইতে যাইতে পথের দুইমুঠি ধূলি মুড়াইয়া গায়ে মাখিয়া বিভূতি মাখার আনন্দ সে উপভোগ করে। হঠাৎ একসময়ে বিবাহোত্তর জীবনে তাঁহার সেই উমা গৌরীই—মহাকালী তারা-রূপ ধারণ করিল। রামপ্রসাদ ঐ দৈবতরূপের উপাসক, তাঁহার তারা নিরাকারা হইয়া যায়—'তারা আমার নিরাকারা'। তিনি ষড়ৈশ্বর্যময়ী, আবার স্নেহ করুণাও তাঁহাতে বিদ্যমান। বিদ্যমান বলিয়াই রামপ্রসাদ ঐ দেবীকে ত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভর হইতে পারেন না, বরঞ্চ পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে তাঁহারই পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করিয়া অপূর্ব তৃপ্তি অনুভব করেন।

বাংলার লোকসাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়—সেই ছড়া, ব্রতকথা, চণ্ডী-কীর্তন, কবিগান, পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যে দেবতার স্থান কোন কোনটিতে গৌণ এবং কোনটিতে মুখ্য। যেমন ছড়ার মধ্যে

দেবতা বড় একটা নাই, অবশ্য দেবমূলক ছড়াও অনেক রচিত হইয়াছে, আবার প্রতকথার মধ্যে দেবতাই একমাত্র উপজীব্য ; এক কথায় দেবতা লোকসাহিত্যের বাহন, কিন্তু ঐ বাহন কখন কখন সাহিত্যের ঘাড়েও চাপিয়াছে। রূপকথা, উপকথা'র মধ্যে যে অবিশ্বাস্য দৈত্য ও দেবতার মাহাত্ম্য আমরা পাই তাহাতে অলৌকিক নহে লৌকিক ব্যাপারেরই আধিক্য সূচিত হইয়াছে।

বাঙালী চিরদিন দেবনির্ভর। এক চর্য্যাপদ ছাড়া বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে দেবতাকে সর্ব্বত্রই সমীহ করিয়া চলিতে হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলেই এই দেবতা উচ্চস্তর দেবতাদের অস্বাভাবিক পরিশীলনে সদাঙ্মুখ। তাঁহার প্রতিষ্ঠার জন্য পুরোহিতেরও অনেক সময় প্রয়োজন হয় নাই, খুল্লনা নিজেই চণ্ডীর ঘট স্থাপন করিতেছে ; বোধহয় বাঙালী নারীর কমনীয় সুদর্শনমুখ-লোভ সম্বরণ করা এই দেবদেবীদের পক্ষে অসাধ্য !

বাঙলা সাহিত্যে দেব অপেক্ষা দেবীর সংখ্যাই অধিক। ইহাতে বাঙালীর অন্তঃপুরের উপরে আলোকপাত করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারীর অকপটভাবে উহারা লালিত ও পুষ্ট, নারীরাই উহাদের প্রধানা পূজারিণী, চাঁদসদাগরের নিকট মনসা সুবিধা করিতে পারে নাই, অবশেষে সে বেহুলাকে ধরিল—বেহুলার অনুরোধে তাঁদের পৌরুষ নত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

নানা ধর্মমত সমন্বয়ে এই দেবতার অনেকেই উদ্ভূত, বৌদ্ধ হিন্দুর সংমিশ্রণে ধর্ম্মঠাকুর, হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে সত্যপীর, বৈষ্ণব ও শাক্তের সংমিশ্রণে কালী ও কৃষ্ণ একাকার হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাক্-আধুনিক পর্ব্বে দেবতা ও ধর্ম্মই ; দেবমাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপ্রচারই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

এই ঐশ্বরিক প্রবণতার চাপে পড়িয়া বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতি প্রত্যাহত, বহিও কলেবর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। এতগুলি দেবতার পোষ্যমাত্র বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতাই সূচিত করিতেছে। এই প্রাচীনপর্ব্বে পুরুষের পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা কুত্রাপি নাই—দেবতা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য দেবতার পীঠস্থানে পর্য্যবসিত এবং ঐ সমস্ত দৈবানুগ্রাহী লেখকের কল্পনা সীমাবদ্ধ—তাহারই রন্ধ্রপথ দিয়া কিছু কিছু মানব জীবনের নির্দ্দেশ ও অন্তঃশক্তির বিবরণ ফুটিয়াছে, সেজন্য লেখক অথবা পাঠক কেহই প্রস্তুত ছিলেন না ; বরঞ্চ পাঠক তাহা পাইয়া ঈষৎ নাসা কুঞ্চিত করিয়া থাকিবে। 'মনসার ভাসান-গান' বাঙালীকে অঙ্গসিক্ত করিয়াছিল—উহার মধ্যে বর্ণিত কাহিনী অংশ সর্ব্বৈব উপভোগ্য হইলেও মনসার পূজা দিতে সে সর্ব্বপ্রথমে প্রণোদিত হইয়াছে। এখনও সুদূর পল্লীঅঞ্চলে ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসার পাঁচালী, কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবায়ণ ব্যাপী পাঠ ও পূজা করা হয়। নিষ্ঠাবান্ বাঙালীর ঘরে ঐ সমস্ত গ্রন্থ সিন্দুর রঞ্জিত হইয়া দেবতার প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে—সে দেবতাকে যেরূপ মান্য করে এই পুস্তকগুলিকেও ঠিক একইভাবে শ্রদ্ধা করে। এইজন্য বাঙালীর সকলই দেবতা—উঠিলেও দেবতা, বসিলেও দেবতা, দেবতা নহিলে তাহার সবকিছু অচল ;—উনবিংশ শতাব্দীর যুগে মানবতা-বোধের প্রাক্‌কাল অবধি বাংলা সাহিত্যে সহস্রমুকুরেই সেই দেবতার রূপ বিচ্ছুরণ।

সাধনা না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না। অনেকেই একঘেয়ে। যে সময়ের কোরেছে সেই-ই ঠিক লোক।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীহীরালাল বিশ্বাস

প্রভু যীশুখৃষ্ট ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুজনেই ধর্মসংস্থাপক অবতারপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টা মহামানব। দুজনেই পৃথিবীর হাজার হাজার লোকের কাছে একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। শত শত নরনারী এঁদের প্রত্যেকেরই প্রতি অনুরক্ত। তাঁরা এই মহামানবদের আপন আপন ধর্মমতের প্রবর্ত্তক-পুরুষ ব'লে বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের বাইরেও অসংখ্য নরনারী—যীশুকে একজন ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মগুরু ব'লে ভক্তিশ্রদ্ধা কোরে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণও তাঁর সঙ্ঘের উপাসকেরা ছাড়াও—আরও অনেক শত লোকের কাছে একজন সত্যিকার মহাপুরুষ ও ধর্মগুরু ব'লে নমস্য হয়ে আছেন।

যীশু ও রামকৃষ্ণ এই দু'জন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাবের ও জীবনযাপনের সময় ও স্থান একেবারেই আলাদা। দুজনেই দুটি ভিন্ন দেশে জন্মেছিলেন। যীশুর জন্মস্থান বেথলেহেমে (প্যালেষ্টাইনে)। আর রামকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল কামারপুকুরে—বাঙলাদেশে হুগলীজেলার একটি গ্রামে। যীশু জন্মেছিলেন আজ প্রায় দুহাজার বছর আগে—আর রামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন একশো বছরের কিছু কাল আগে (১৮৩৬)। জাতিহিসাবে যীশু ছিলেন ইহুদী—আর রামকৃষ্ণ জাতিতে বাঙালী ব্রাহ্মণ—ভারতবর্ষের লোক।

অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই দু'জন মহামানবের জন্ম জীবনকাল ও লীলাস্থানের মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকলেও তাঁদের জীবনের ঘটনা ধর্মভাব ও উপদেশের মধ্যে একেবারে প্রায় হুবহু মিল রয়েছে। বাইবেলে আমরা যীশুর জীবন-কথা পড়ি—আর কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে প'ড়ে থাকি রামকৃষ্ণের জীবনের কাহিনী। আর ঐ সব বইয়ে তাঁদের দুজনের উপদেশও রয়েছে।

প্রভু যীশু আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুজনেই যেন একই ভাবের দুটি আলাদা রূপ। দুজনের জীবনের গান একই সুরে বাঁধা। ধর্ম্মের যে আদর্শ ও সাধনের উপায় দুজনে তাঁদের শিষ্য ও অনুরাগীদের শিখিয়ে গেছেন তাদের ভেতরকার তত্ত্ব ও প্রকৃতি একই। দুজনেই দুজনের জীবনে দেখিয়ে গেছেন ত্যাগ বৈরাগ্য সংযম পবিত্রতা ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রীতির একেবারে চরম অবস্থা। দুজনেই ছিলেন ঈশ্বর-প্রেম ও করুণার মূর্ত্তি। ঈশ্বরপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠায় যীশু ও রামকৃষ্ণ দুজনেই হয়ে গিছলেন ঈশ্বরের সঙ্গে একেবারে একাকার। তাঁদের সমস্ত সত্তার সকল দিককেই চির উজ্জ্বল কোরে রেখে দিয়েছে ঈশ্বরের দিব্যশক্তি ও দিব্যমহিমা।

এই দুই ঈশ্বরসর্ব্বস্ব মহামানবের জীবনকথা ও বাণীর সাদৃশ্য দেখলে আমরা বুঝতে পারবো—যীশু আর রামকৃষ্ণ দুজনেই ছিলেন সেই একই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত মহাসমুদ্রের দুটি উন্নত তরঙ্গ। অনেকে ব'লে থাকেন, "আধ্যাত্মিক স্বরূপতার দিক দিয়ে প্রভু যীশু আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ অভিন্ন ও এক।" তাঁদের সেই বিশ্বাসের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। এই দুই মহা-মানবের উদ্দেশে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম কোরে এখন তাঁদের মতৈক্যের সাদৃশ্য দেখতে চেষ্টা কোরছি।

প্রথমেই ধরা যাক—যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকালের ঘটনাকে। যীশু ও রামকৃষ্ণ দুজনেরই বাবা ও মা গরীব। দুজনেরই বাপমার বাস রাজপ্রাসাদে কিম্বা অট্টালিকায় নয়—অতি সামান্য রকমের তাঁদের ঘরবাড়ী। যীশু জন্মালেন আস্তাবলে

—আর রামকৃষ্ণ জন্মালেন চেঁকিশালে। তাঁদের দুজনেরই ভোর রাত্রে জন্ম হয়েছিল—এই রকম শোনা যায়। দুজনেরই বাপ মা মনেপ্রাণে ধর্ম-পরায়ণ ও ভক্তিমান ঈশ্বরবিশ্বাসী। ছেলেবেলা থেকেই দুজনের মধ্যে ধর্মভাবের আশ্চর্য প্রকাশ। দুজনেই ছিলেন পবিত্রতা ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্মনিষ্ঠার মূর্তি। দুজনেরই ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরের আবেশে ভাবসমাধি হতো। দুজনেই অতিসাধারণ লেখাপড়া শিখেছিলেন—কেউই পণ্ডিত ছিলেন না।

জেরুজালেমের মন্দিরে (মন্দিরে) বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ধর্মসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হচ্ছিল। এগারো বছরের ছেলে যীশু তাঁদের সেইসব তর্কের বিষয় অতি সহজে বুঝিয়ে তাঁদের অবাক করে দিয়েছিলেন। কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ীতে কি একটা ব্যাপারে অনেক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এখানেও ঐসব পণ্ডিতরা শাস্ত্রের কোন কোনি বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের তখন বারো বছর বয়েস। পণ্ডিতদের ঐসব কথা তিনি সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। তারপরে পণ্ডিতদের তিনি বলেন, "আপনাদের ঐ প্রশ্নগুলোর জবাব এই রকম নয় কি?" পণ্ডিতরা তো শুনেই অবাক্। যে ব্যাপার তাঁরা এতক্ষণ ধ'রেও মীমাংসা করতে পারছিলেন না—এই ছোট ছেলেটি সেসব বিষয় দু' এক কথায় কেমন করে মিটিয়ে দিলে? কে এই অদ্ভুত ছেলেটি?

ভগবানের ডাক শুনে যীশু অল্পবয়সেই বাড়ী ঘর বাপ মা ছেড়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চ'লে গেলেন। কেউই তাঁর খোঁজ-খবর পেলে না। তারপরে আঠারো বছর বাদে তাঁকে দেখতে পাওয়া গেলো জর্ডন নদীর ধারে একটা ঘাটে। সেখানে মহাত্মা জন দি ব্যাপ্টিষ্ট ধর্মের বাণী প্রচার করছিলেন। যীশু এলেন জন দি ব্যাপ্টিষ্টের কাছে সন্ন্যাসী হবার জন্যে। তখন যীশু ত্রিশ বছরের যুবক। রামকৃষ্ণদেবও নিজের বাড়ী ঘর ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে কুড়ি বছর বয়স থেকে বাস করতে লাগলেন। এখানেই তিনি ধর্মের সাধনায় প্রায় বিশ বছর ধ'রে লেগে প'ড়ে ছিলেন। সেসব কথা অনেকেই জানেন। কাজেই এখানে ওসব কথা বলার আর দরকার নেই। এই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে সিদ্ধপুরুষ তোতাপুরীর কাছ থেকে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী হবার দীক্ষা নিয়েছিলেন। যীশুর সন্ন্যাস-দীক্ষা হলো জর্ডনের তীরে—রামকৃষ্ণের সন্ন্যাস নেওয়া হলো ভাগীরথীর তীরে। তারপরে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ফলে পঞ্চবটীর তপোবনে যীশু আর রামকৃষ্ণের দুই সত্তা আধ্যাত্মিক যোগে এক হয়ে গেলো। জর্ডনের স্রোত আর ভাগীরথীর স্রোতে মিশে গিয়ে হয়ে গেলো একাকার।

ঈশ্বরকে যীশু ডাকতেন—'Father' (পিতা) ব'লে। রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে ডাকতেন 'মা' ব'লে। যীশু ঈশ্বরকে 'পিতা' 'জগৎপিতা' রূপেই ভালবাসতেন। রামকৃষ্ণের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলো ঈশ্বরের মাতৃভাব। ঈশ্বর রামকৃষ্ণের কাছে স্নেহময়ী মা, জগন্ময়ী জগজ্জননী। যীশু নিজেকে 'ঈশ্বরের পুত্র' (Son of God) ব'লে পরিচয় দিতেন। রামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলতেন, "আমি মা আনন্দময়ীর ছেলে। আমি মায়ের, মা আমার।" আবার এছাড়াও রামকৃষ্ণ বলতেন, "যিনিই ঈশ্বর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই আমার মা।" যীশু নিজের স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বলতেন, "আমি আর আমার পিতা এক" (I and my Father are one)।" রামকৃষ্ণও নিজের দেহ দেখিয়ে বলতেন, "এটা একটা খোল মাত্র। শুদ্ধবোধানন্দময়ী মা এর মধ্যে বিরাজ করছেন।" আবার কখন কখন বলেছেন, "আমুন রামকৃষ্ণ, অমুকের ছেলে রামকৃষ্ণ এর ভেতরে আর নেই। এখন এর মধ্যে আছেন শুধু জগজ্জননী।" তাছাড়াও অনেকেই জানেন জগজ্জননী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অনেকবার বলেছিলেন, "তুই আর আমি এক। জীবশিক্ষার জন্যে তুই ভাবমুখে থাক।" যীশুর একমাত্র অবলম্বন ছিলেন পরমপিতা পরমেশ্বর। রামকৃষ্ণদেবের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান আশ্রয় ও সম্বল

জগজ্জননী জগদীশ্বরী। যীশু নিজের জীবনের অনুভূতিতে প্রকাশ কোরেছিলেন বিশ্বপিতা ঈশ্বরের পিতৃভাবকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর অনুভূতি ও জীবনের আলোকে প্রকাশ কোরেছিলেন ঈশ্বরের মাতৃভাবকে। একজন 'পিতা পিতা' বলতে বলতে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল ও ভগবৎপ্রেমে বিভোরি। আর একজন 'মা, মা' বলতে বলতে ভগবানের জন্যে আকুল অধীর, আর ভক্তিপ্রেমের আতিশয্যে তন্ময় আত্মহারা।

প্রভু যীশু আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ কখনো নিজেদের গুরু ব'লে প্রচার করেন নি। ঈশ্বরের শক্তিই তাঁদের দুজনের ভেতর দিয়ে মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলো। তাঁদের দুজনেরই সাংসারিক অস্তিত্ব ছিল না। তাঁদের সমস্ত অস্তিত্ব ঈশ্বরের অসীম অস্তিত্বে একেবারে একাকার হয়ে গিছলো। দুজনেরই অন্তরে ছিলো ঈশ্বরের চিরনিভৃত চিরগোপন শাশ্বত সিংহাসন। দুজনের দেহই ছিলো ভগবানের চলন্ত মন্দির। শুধু তাই নয়, প্রভু যীশু আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুজনের মধ্যেই ঈশ্বরের মহিমা করুণা জ্ঞান ও কল্যাণশক্তি মূর্তি ধ'রে জেগে উঠেছিল। তাঁরা দুজনেই ঈশ্বরের অদৃশ্য হাতের লেখা দুটি জীবন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ। আর সেই জীবন্ত শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য হয়েছেন—তাঁদের দুজনেরই Apostles বা অন্তরঙ্গ সর্বত্যাগী সিদ্ধযুক্ত প্রধান প্রধান শিষ্যরা। প্রভু যীশুর প্রধান প্রধান শিষ্য—সিমোন পিটার, ব্যাণ্ড্রুজ, জন, জেমস, ম্যাথু, বার্থলিমু, টমাস, থেডিয়াস প্রভৃতি বারোজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রধান প্রধান শিষ্য —নরেন্দ্র, রাখাল, হরি, কালীপ্রসাদ, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন ঘোষীন লাটু প্রভৃতি সিদ্ধযোগী মহাত্মারা।

প্রভু যীশুর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য—সিমোন বা সেণ্ট পিটার। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সর্বপ্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য—নরেন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দ (আমাদের চিরবরেণ্য 'স্বামিজী')। প্রধান শিষ্য সেণ্ট পিটারকে প্রভু যীশু বলেছিলেন, "পিটার, তুমি বিরাট প্রস্তরের মতন অবিচল। ঐ অবিচল প্রস্তরের ওপরেই আমি আমার আধ্যাত্মিক রাজ্যের আয়তনকে নির্মাণ কোরবো।" অতিপ্রিয়তম ও প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "নরেন! তোর ভেতর দিয়েই এখানকার শক্তি খেলবে।" রাখাল কালীপ্রসন্ন শশী বাবুরাম প্রভৃতি সমস্ত বালক শিষ্যদের দেখবার ভার নরেন্দ্রের হাতে দিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, "নরেন্দ্রই সঙ্ঘের নেতা। ওর কথা আমারই কথা। ওকে তোরা মেনে চলবি। ও যা কোরতে বলবে, তাই তোরা কোরবি।"

প্রভু যীশু ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুজনেই যে ধর্ম প্রচার কোরেছেলেন—সে ধর্ম আপাগোড়া সংযম সত্যনিষ্ঠা পবিত্রতা ও ভক্তির ধর্ম। আপাগোড়া চারিত্র অনুভূতির ধর্ম। তাঁদের সেই ধর্ম পালনের মধ্যে আজেবাজে আচার-নিয়ম কিম্বা কোনও আজগুবি বিশ্বাসের জঞ্জাল মোটেই ছিল না। এরকম বিশ্বাস ও সাচ্চা ধর্ম কখনও গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণচিত্ত লোকেদের কাছে ভালো লাগে না। কেননা তারা ধর্মের খোসা ও ছোবড়া নিয়ে থাকতেই ভালবাসে। ধর্মের সারবস্তু কেমন—তা জানবার ইচ্ছা বা চেষ্টা তাদের মধ্যে মোটেই নেই। ঐজন্যে যাজে আচার-নিয়মে অন্ধ সাদিউকী ও ফারিসীরা প্রভু যীশুর ধর্মমতকে বুঝতে পারে নি। তারা অবথা যীশুকে নিন্দা কোরেছে, ঘৃণা কোরেছে, তাঁকে গালাগালি দিয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের বেলাতেও তাই হয়েছিল। আমাদের দেশে সাধারণ লোকেদের মধ্যে ধর্মের আসল বস্তুটি দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের লোকেরা দেশীয় ভাগই ধর্মের প্রাণবস্তুর সম্বন্ধে জানতে চায় না। কেননা তাদের মধ্যে চিন্তাশীলতা যুক্তিবিচার ও অন্তর্দৃষ্টিতা নেই। তাদের মন এলোমেলো। শুধু ভাবপ্রবণতা ও আজগুবী কতকগুলো বিশ্বাসেই তাদের ধর্মজীবনের পরিচয়। যে সমস্ত নিয়ম মেনে চললে অন্তর শুদ্ধ পবিত্র, আর মন ঈশ্বরমুখী ও একাগ্র হয়,

সেইসব নিয়ম তারা কিছুতেই পালন কোরতে চায় না। তারা শুধু মেনে চলে কতকগুলি লোকাচার দেশাচার ও গ্রাম্য কুসংস্কার। তাই রামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বরপ্রাণতা সংযম ও পবিত্রতার জীবন আমাদের দেশের আচার-সর্বস্ব গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ভালো লাগে নি। অনর্থ আচারের মোহমুক্ত সত্যদ্রষ্টা রামকৃষ্ণদেবের জীবনযাপনকে তারা নিন্দা ও ঘৃণা কোরেই চলেছিল। মন্দিরে ঘণ্টা নেড়ে আর চালকলা বেঁধে তারা মনে কোরতো, 'ধর্ম আমাদের একচেটে সম্পত্তি'। তাদের ভেতরে একরত্তি ভক্তি নিষ্ঠা নেই—বাইরে আছে শুধু ঝোঁটা তেলক পৈতে ও রুদ্রাক্ষ-মালার সাইনবোর্ড।

প্রভু যীশু ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুজনেই এসেছিলেন একেবারে সহজ সরল শুদ্ধ জীবন নিয়ে। বিষয়সম্পত্তি সম্মান প্রতিপত্তি কিম্বা পাণ্ডিত্যের গরুর ওঁদের দুজনের মধ্যে মোটেই ছিল না। ওঁদের ঐশ্বর্য আত্মার মহত্বে ও আত্মজ্ঞানে। দীন দরিদ্র অবজ্ঞাত ঘৃণিত শত শত নরনারীকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্যেই ওঁরা এসেছিলেন। গরীব দীন দুঃখীদের মধ্যে থেকেই ওঁরা সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। সংসারে যাঁরা ধনী মানী পণ্ডিত, সমাজের মাথায় যাঁরা প্রভুত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে ব'সে আছেন—এমন সব লোক কখনই যীশুকে কিম্বা রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতে চান নি। উপেক্ষা ও অহঙ্কারের বশে নাক সিঁটকে ওঁদেরই দিকে ঐসব ধনীমানী ও পণ্ডিতেরা তাকিয়ে দেখেছেন! কেনই বা ওঁরা ঐ রকম মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা কোরবেন? যীশু ও রামকৃষ্ণের বাইরে তো কোনই ঐশ্বর্য নেই আড়ম্বর নেই, এমনকি মাথা গুঁজে থাকবার একটু জায়গাও ওঁদের ছিল না। সেজন্যে ঐসব ধনী-মানীদের কাছে যীশু ও রামকৃষ্ণ চিরদিনই 'নগণ্য সামান্য মানুষই' ছিলেন। ওঁদের কারুর টাকার গরম, কারুর বিষয়সম্পত্তির দেমাক, কারুর পাণ্ডিত্যের জাঁক, আবার কারুর বা বংশগত খ্যাতি ও আভিজাত্যের গর্ব।

ধনী মানী পণ্ডিতেরা যীশু ও রামকৃষ্ণকে কোনও দিন চায় নি—তাই ওঁদের পাওনি—আর কখন পাবেও না। যারা ওঁদের চেয়েছিলো—তারা দীন নিঃস্ব সরল সর্বহারাদের দল। তাদের সঙ্গে তাই তাদেরই মতন সহজ হয়ে যীশু ও রামকৃষ্ণ ব'সে থাকতেন—মাটির ওপরে ধূলোর আসনে। কারণ ওঁরা দেখেছিলেন—"নেমেছে ধূলার তলে দীন পতিতের ভগবান।"

শাস্ত্র পড়লে ভগবানের সম্বন্ধে বড়জোর বিচারগত একটা ধারণা জন্মাতে পারে। আর ধর্মের ব্যাপারে শুধু শাস্ত্রপড়া ও শাস্ত্রবিচারই শেষ অবস্থা নয়। হৃদয় মন পবিত্র কোরে সমস্ত প্রাণঢেলে অবিশ্রান্তভাবে সাধনের দ্বারাই ধর্মের চরম অবস্থায় মানুষ যেতে পারে। ষোল-আনা মন দিয়ে নিষ্কাম ভক্তির জোরে আত্মহারা হয়ে ডাকলে তবে মানুষ ভগবানের দর্শন পায়। প্রভু যীশু ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুজনেই নিজেদের জীবনে তা চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। আমাদের ঋষিরাও বলেছেন, "বিনা তপস্যায় ধর্ম হয় না। বিনা তপস্যায় বিনা সংযমে ভগবানকে পাওয়া যায় না।"

কিন্তু শাস্ত্রপড়া পণ্ডিতদের দল কখনই যীশুর ও রামকৃষ্ণের মহত্ত্ব বুঝতে পারেন নি। "শুধু শাস্ত্র পড়লেই ধর্মকে জানা যায়—ভগবানকে দেখা যায়" —বাস্তিকতার এই সংস্কার ওঁদের মনে অশথ গাছের মতন আষ্টেপিষ্টে শেকড় গেঁথে রয়েছে। পুঁথিপড়া বিদ্যার অহঙ্কারে ওঁদের ভেতরকার চোখ অন্ধ। অন্তরে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ যে মহাপুরুষদের মধ্যে হয়েছে—ওঁদের চেনবার মতন বুদ্ধি ও দৃষ্টি ঐসব পণ্ডিতদের মধ্যে যে নেই। বিবেক-বৈরাগ্যহীন ওঁদের ঐ অধীত বিদ্যা তাই হয়ে উঠেছে অবিদ্যা।

তারই প্রমাণ প্রভু যীশু ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের কোন কোন ঘটনায় পাওয়া যায়।

সেন্ট জনের গস্পেলে সপ্তম অধ্যায়ে একটি ঘটনা আছে। গ্যালিলিতে যীশু লোকেদের কাছে ধর্মপ্রচার ক'রেছিলেন। প্যালেস্টাইন ও তার চারদিকে তখন হাজার হাজার লোক জানতে পারলে যীশু সত্যই

ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মগুরু। তাঁর মুখ থেকে ধর্মের আশ্চর্য্য সব কথা শুনে দলে দলে লোকেরা ছুটে আসছিলো—মুক্তি ও শান্তির সন্ধান পাবার জন্যে। ইহুদী ফারিসী পণ্ডিতেরা তো অবাক্। যীশুর মুখে ধর্মের অদ্ভুত সব কথা শুনে তাদের মাথা ঘুরে গেলো। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি কোরতে লাগলো—"আরে! এই লোকটা তো মোটেই লেখাপড়া শেখে নি। কিন্তু এমন সব জ্ঞানের কথা এই লোকটা কী কোরে বলছে?" যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যেসব কথা আমি বলছি, সেসব আমার নিজের কথা নয়। যিনি আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—এ সমস্ত কথা তাঁরই। আমার পিতা আমার ভেতর দিয়েই ঐ সব কথা বলেন।" অনেক রকম আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ পেয়েও ফারিসী পণ্ডিতদের মনে তবুও যীশুর প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হলো না। তাদের কাছে যীশু 'একটা মূর্খ ও সাধারণ মানুষই' রয়ে গেলেন!

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখ থেকে ধর্মের নানারকম অনুভূতির আশ্চর্য্য সব কথা শুনে অনেক বেদান্তপন্থী তর্কচূড়ামনি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও তাঁরা রামকৃষ্ণদেবকে মহাপুরুষ ব'লে স্বীকার কোরতে পারেন নি। অনেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাও কোরেছিলেন, "মশাই! আপনি তো লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু ধর্মের এমন সব কথা কি কোরে জানলেন? সেই কথা শুনে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "আমার ভেতর থেকে মা (জগজ্জননী) জ্ঞানের বাণ ছুঁড়িয়ে দেন। এর ভেতর থেকে আমার মা লোকশিক্ষা দিচ্ছেন।" আবার তিনি অনেক সময়ে বলেছেন, "ঐ সব কথা আমি বলি না। ওসব কথা আমার মায়ের কথা।"

"সাংসারিক ভোগবাসনা একেবারে ত্যাগ না কোরলে ভগবানকে পাওয়া অসম্ভব। বিষয়-বাসনা এককণা থাকলেও ভগবানকে পাওয়া যায় না। টাকার মোহ থাকলে ধর্মরাজ্যে যাওয়া যায় না।" প্রভু যীশু ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ এইকথা বারবার তাঁদের শিষ্যদের ও শিক্ষার্থীদের বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—"ধর্মের নামে ঐসব বাজে আচার-নিয়ম মানবার কোনই দরকার নেই। মন থেকে ভোগের বাসনা দূর করো। সরল হও, সত্যপরায়ণ হও। ভক্তিমান হও। কিসে সমস্ত মন ভগবানের চিন্তায় ডুবে যায়, কিসে ভগবানের ওপরে ষোল আনা অনুরাগ আসে—শুধু তারই চেষ্টা করো।" কিন্তু তাঁদের ঐসব উপদেশ পালন করবার শক্তি ও চেষ্টা মাত্র মুষ্টিমেয়দেরই পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সাধারণ লোক তাঁদের ঐ আদেশ ও উপদেশকে ভয় করে। কারণ তারা হিসাবী। তাদের মধ্যে আগলি-পেছলি অনেক টান আছে। তাদের মনেতে অনেক মলিন কামনার জঞ্জাল গাদা হয়ে জমে রয়েছে। এইজন্যে প্রভু যীশু বলেছিলেন, "অনেক লোককেই ডাকা হয়েছিল—কিন্তু মাত্র কয়েকজনই যোগ্য ব'লে প্রমাণ দিলে।" রামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, "সবাই দেখছি কড়ায়ের ডালের খদ্দের। ভগবানকে পাওয়ার মতন মন দুচার জনেরই আছে।"

ধর্মের উচ্চ বিষয়ের ধারণা ও সাধনা করবার মতন শক্তিশালী লোকের সংখ্যা চিরদিন খুবই অল্প। বেশীর ভাগ লোক ধর্ম ধর্ম কোরলেও ওসব বোঝে না। তাদের কাছে ধর্মের সাধারণ উপদেশ মাত্রই দেওয়া চলে। এই কারণে যীশু জনসাধারণের কাছ থেকে নির্জ্জনে স'রে যেতেন, পিটার জন ও যাকুবস প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগী শিষ্যদের নিয়ে। সার্মন অন দি মাউন্ট বা শৈলোপদেশ-এ যীশু যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন—সেসব উপদেশ পালনের অধিকারী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা। সাধারণ লোকেদের কাছে ঐসব উপদেশ দেওয়া যেন বন্ধ মুক্তো ছড়ানোর মতন পণ্ডশ্রম মাত্র। ঠাকুর রামকৃষ্ণও ধর্মের গভীর ও সূক্ষ্ম সমস্ত সাধনার কথা সাধারণ লোকেদের কাছে বলতেন না। গভীর রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে প্রায়ই নরেন্দ্র রাখাল সারদা শশী যোগেন কালী প্রভৃতি তাঁর সর্ব্বত্যাগী বালক শিষ্যরা থাকতেন। সেই সময়ে নির্জ্জনে

ঐসব সর্ব্বত্যাগী বালক শিষ্যদের তিনি ত্যাগ বৈরাগ্য সংযম ও যোগ সমাধির উচ্চতত্ত্বের উপদেশ দিতেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও প্রভু যীশুর সঙ্গে স্বরূপগত ঐক্যই শুধু ছিল না। দু'জনের মুখের ছাঁদও প্রায় এক রকম ছিল। ঠাকুরের সমস্ত শিষ্যরা যীশুর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। যীশু ও রামকৃষ্ণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির দৃষ্টিতে একই ভাবের দুটি বিভিন্ন মূর্ত্তি। যীশুর কথা বলতে বলতে তাঁরা সকলেই আত্মহারা হয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়। ঠাকুর দেখেছিলেন—যীশুর কোন কোন শিষ্য এজন্মে আবার তাঁরই শিষ্যরূপে জন্মগ্রহণ কোরেছেন—যেমন শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ও শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)। ঠাকুর বারবার নিজেই বলেছেন, "শরৎ ও শশীকে যীশুখৃষ্টের দলে দেখেছিলুম।"

দেহত্যাগের কিছুকাল আগে প্রভু যীশু তাঁর প্রধান শিষ্য সেণ্ট পিটারের মধ্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার কোরে বলেছিলেন, "পিটার! এখন আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবী দিয়ে যেবো। (ঐশ্বরিক শক্তিতে পূর্ণ)। এই চাবী দিয়ে তুমি যার (হৃদয়ের) সে-ই দরজা খুলে দেবে, সেই স্বর্গরাজ্যে যেতে পারবে।" কাশীপুরের বাগানে দেহত্যাগের দিন-কতক আগে ঠাকুর রামকৃষ্ণও তাঁর প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রের (স্বামিজীর) মধ্যে বিশেষ এক শক্তি সঞ্চার ক'রে বলেছিলেন, "আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। এই শক্তির বলে তুই অনেক কাজ কোরে যাবি।"

যীশু সমস্ত পাপীতাপীর পরিত্রাণের জন্যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণও শত শত পাপীর পাপতাপ নিয়ে কঠিন রোগে নিজের দেহকে জর্জ্জরিত কোরেছিলেন। দেহত্যাগের পরে যীশুর মতন ঠাকুর রামকৃষ্ণও অনেকবার তাঁর শিষ্যদের জ্যোতির্ম্ময় দেহে দেখা দিয়েছিলেন। আর ঠাকুরের শিষ্যদের সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের গোড়া-পত্তন হয়েছিল যীশুর জন্মদিনের আগের দিনে (Christmas Eve)—২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬ সালে আঁটপুর গ্রামে।

হুগলী জেলায় আঁটপুর গ্রামে ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) জন্মভূমি। যীশুর প্রিয় শিষ্য সেণ্ট জনের মতন প্রেমানন্দও ছিলেন—ভগবৎপ্রেমের ও মানব-প্রেমের জমাট মূর্ত্তি। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর লেখা রামকৃষ্ণ-চরিতে বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে তাই লিখেছেন, "He was Saint John of Ramakrishna."

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরের শেষসপ্তাহে শরৎ শশী কালী বাবুরাম নিরঞ্জন সারদা গঙ্গাধর প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভাইদের সঙ্গে স্বামিজী এই আঁটপুরের বাড়ীতে গিছলেন। সেখানে তাঁরা দশ বারো দিন ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁরা বেশীর ভাগ সময় জপধ্যান ভজনগান ও ধর্ম্মের প্রসঙ্গ নিয়ে কাটাতেন। একদিন স্বামিজী ধুনী জেলে সমস্ত গুরুভাইদের সঙ্গে ধর্ম্মের আলোচনা করছিলেন। প্রভু যীশুর সর্ব্বত্যাগময় পবিত্র জীবন ও তাঁর উপদেশের কথায় সেদিন তাঁরা সবাই একেবারে মেতে গিছলেন। যীশুর কথা বলতে বলতে সকাল থেকে প্রায় রাত বারোটা বেজে গেলো। হঠাৎ তখন তাঁদের খেয়াল হলো—সেদিন যে চব্বিশে ডিসেম্বর—Christmas Eve—যীশুর জন্মদিনের আগের দিন! তখন সেই জলন্ত ধুনীর সামনে স্বামিজী তাঁর সমস্ত গুরুভাইদের পাশাপাশি বসালেন। স্বামিজী গুরুভাইদের সবাইকে বল্লেন, "আজ যীশুর জন্মের পুণ্যদিন। তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগের বৈরাগ্যের পবিত্রতার মূর্ত্তি। আমাদের ঠাকুর আর খ্রীশু এক। আজ এসো। সবাই মিলে এই আগুনের সামনে প্রতিজ্ঞা করো—আমরা কেউই আর বাড়ীতে ফিরে যাবো না। আজ থেকে আমরা সবাই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন কাটাবো।"

গুরুভাইরা সবাই সেই প্রতিজ্ঞা কোরলেন। তারপরে বরাহনগর মঠে কিছুদিন বাসে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পরে

চললো তাঁদের কঠোর তপস্যা—'যে তপস্যার কঠোরতা দেখলে ভূত পর্য্যন্ত পালিয়ে যেতো।' সে সময়ে বরাহনগর মঠে জনকতক খৃষ্টান মিশনারী এসেছিলেন—ঠাকুরের ঐসব যুবক শিষ্যদের খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত কোরতে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দিনকতক কথাবার্ত্তা ব'লে আর তাঁদের বৈরাগ্য সংযম তপস্যা ও ভক্তিভাব দেখে মিশনারীরা হার মানলেন। কেউ কেউ ব'লেও গেলেন—"এইসব যুবকদের কাছে আমরা আর খৃষ্টের সম্বন্ধে কি প্রচার কোরবো? এরাই ঠিক ঠিক যীশুর ভক্ত। যীশুর শিক্ষাকে এরাই সার্থক কোরে দিয়েছে। শুধু তাই নয়। এদের জীবন আর চাল-চলন দেখে মনে হয়—যীশুর শিষ্যরা (Apostles) যেন আবার জন্ম নিয়ে এসেছেন।"

১৮৮৭ সালের সেই ঘটনার পরে অনেক বছর কেটে গেছে। ১৯২৬ সালে বাঙলা দেশ থেকে অনেক দূরে ফ্রান্সের রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ভক্ত মানবপ্রেমিক মনীষী রোমাঁ্যা রোলাঁর মনকে রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী মুগ্ধ ও বিস্মিত কোরে দিলে। রামকৃষ্ণদেবের জীবনকাহিনী পড়তে পড়তে ও শুনতে শুনতে রোমাঁ্যা রোলাঁ অবাক হয়ে গেলেন। রোমাঁ্যা রোলাঁ দেখলেন, যীশু ও রামকৃষ্ণ দুই মহাপুরুষের মধ্যে সবদিক দিয়ে কী আশ্চর্য্য মিল!! শেষকালে ভক্তি ও অনুরাগের বশে মনীষী রোলাঁ রামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত রচনায় তন্ময়ভাবে মেতে গেলেন।

রোমাঁ্যা রোলাঁ তাঁর লেখা রামকৃষ্ণ-চরিতে একজায়গায় লিখেছেন, "অন্ধবাদপূর্ণ ও ভোগ-বিলাসমুখী আজকের এই সভ্যতার কোলাহলে ও চাকচিক্যে সমস্ত পৃথিবী আজ যীশুর মহান আদর্শকে ভুলে গেছে। রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে ও সাধনায় আজ যীশুর আদর্শ আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রায় দু হাজার বছরের ব্যবধান থাকার জন্যে বলা যায়—আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ যীশুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।" রোমাঁ্যা রোলাঁ তার পরে আবার বলেছেন, "এই মানুষটির (রামকৃষ্ণদেবের) মুক্তিকে আজ আমি পাশ্চাত্য জগতে মুক্তিকামী ইউরোপের কাছে আবাহন করছি—তার শান্তির জন্য—যে ইউরোপ সমস্ত মানবজাতির নিদ্রার সুযোগে হত্যা কোরেছে।"

আমরা শুধু এই কথা বলি। প্রভু যীশুর ধর্ম্ম ও বাণীকে ঠিকভাবে জানতে হ'লে রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি কোরতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত গোঁড়ামী ও একগুঁয়েমী কোরে কোনই লাভ নেই। বরং তাতে লোকসানই আছে। আর শুধু যীশুর জীবন ও বাণীই নয়, পৃথিবীর আরও সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আর সমস্ত মহাপুরুষের আদর্শ ও মহত্ত্বকে ঠিকভাবে চিনিয়ে ও দেখিয়ে দিতে পারে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মধ্যে চরম পরিণতি ও সমন্বয় লাভ কোরেছে যুগে যুগে দেশে দেশে উদ্গারিত সমস্ত ধর্ম্মের ও সমস্ত মহামানবদের সাধনা ও অনুভূতির ধারা।

সত্যের অন্বেষণ, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের জন্য প্রাণপণে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং যাবতীয় মহৎ কর্ম্মের সাধনার ফলেই ব্যক্তি ও জাতি উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। যে জাতির লোকেরা সত্যান্বেষী নয়, যেখানে মানুষ মানসিক জড়তা আলস্য ও পুরাতন জীর্ণ আচারপ্রথায় নিমজ্জিত, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভারতবাসীদের এখন সমস্ত জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী-বিতান

ভগবান সকলকার ভেতর কিরকম ভাবে থাকেন জানো? যেমন চিকের ভেতরে বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না। ভগবানও ঠিক সেই রকম ভাবে সকলের মধ্যে বিরাজ করেন।

প্রদীপের স্বভাব আলো দেওয়া। কেউ বা তাতে ভাত রাঁধছে, কেউ বা (নোট বা দলিল) জাল করছে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ করছে। সে কি আলোর দোষ? অর্থাৎ কেউ ভগবানের নামে মুক্তির চেষ্টা করছে, কেউ চুরি করতে চেষ্টা করছে। সে কি ভগবানের দোষ?

যার যেমন ভাব—তার তেমনি লাভ। ভগবান কল্পতরু। তাঁর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়।

সাপের মুখে বিষ আছে। সে যখন আপনি খায়, তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায়, তখন বিষ লাগে। তেমনি ভগবানে মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মায়া মুগ্ধ করতে পারে না। অন্যকে সেই মায়ায় মুগ্ধ করে।

মায়া কাকে বলে জানো? বাপ মা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র ভাগনে ভাইপো জামাই এইসব আত্মীয়দের প্রতি যে টান ও ভালবাসা। আর দয়া মানে—'সর্বভূতে আমার হরি আছেন' এই জেনে সবাইকে ভালবাসা।

যেমন সূর্য পৃথিবীকে আলো করে রেখেছেন, কিন্তু সামান্য একখণ্ড মেঘ সামনে এসে যদি আবরণ করে ফেলে, তাহ'লে আর সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায় না। সেইরকম সর্বব্যাপী সর্বশক্তীস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে আমরা সামান্য মায়া-আবরণের জন্যে দেখতে পাচ্ছি না।

মানুষের সাধ্য কি অপরের ভব-বন্ধন মোচন করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া—তাঁর কৃপা না হ'লে কিছুতেই মানুষের মুক্তি হয় না। সচ্চিদানন্দ গুরু ভিন্ন মানুষের গতি নেই।

ভগবান ভক্তির অধীন। যার ভক্তি আছে, সে-ই ভগবানকে পাবে। ভক্তির টানে ভগবান ভক্তের কাছে ধরা দেন! ভক্তিমান চণ্ডাল ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাকুলতাই ভগবানকে পাবার প্রধান উপায়। ব্যাকুলতা এলেই অরুণোদয় হলো। ভগবানের জন্যে যে প্রাণখুলে কাঁদে তার মনের সমস্ত ময়লা সাফ হয়ে যায়। অন্তর শুদ্ধ হয়ে যায়।

ভগবানের জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে না—তার মানে এখনও বিষয়ভোগে আসক্তি আছে। ভোগের বাসনা দূর না হ'লে ভগবানের জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয় না।

ধ্যান করবে—মনে বনে ও কোণে। যার হেথায় (অন্তরে ধর্মভাব) আছে, তার সেথায়ও (মন্দির তীর্থাদি পবিত্র স্থানে) আছে। অন্তর শুদ্ধ না হ'লে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় না।

একঘেয়ে হোস্‌নি। এখানকার (পরমহংসদেবের) ভাব একঘেয়ে নয়। জ্ঞান ভক্তি প্রেম এখানে সব ভাবই আছে। কেন একঘেয়ে হবি? আমি তাঁকে (ভগবানকে) নানাভাবে দেখি ও ডাকি। জপ কোরে, পুজো কোরে, স্মরণ কোরে, ধ্যান কোরে নানারকমে তাঁকে দেখি। আবার দেখি এই জীবজগৎ সবই তিনি হয়েছেন।

রাজস্থানে প্রস্তর-যুগের কারখানা-কেন্দ্র আবিষ্কার

নয়াদিল্লী রবিবার ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩—পুরাতত্ত্ব বিভাগের উত্তর-পশ্চিম সার্কেলের নয়াদিল্লীস্থিত এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট উত্তর-পূর্ব রাজস্থানের মধ্যযুগের কর্মক্ষেত্রগুলি খনন করিয়া আদি প্রস্তর-যুগের দুইটি কারখানা কেন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের ফলে উত্তর-পূর্ব রাজস্থানের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির তুলনামূলক পরীক্ষায় সাহায্য হইবে।

আলোয়ার জেলায় সাবওয়ান নদীর তীরে তাদরের অনতিদূরে এক গভীর জঙ্গলে একটি কারখানার স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুঠার, কাটারি প্রভৃতি নানাপ্রকার যন্ত্র এখানে পাওয়া গিয়াছে। এখানে যেসব যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে সেইগুলির কোন কোনটি মধ্যমাকৃতি, কোনটি বা বৃহদাকৃতি। ইহাতে বুঝা যায় যে, কারখানাটি বেশ বড় ছিল এবং ইহাতে নানা আকারের যন্ত্রপাতিই তৈয়ার করা হইত।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে দুইটি বিভিন্ন প্রস্তর যন্ত্র-সংস্কৃতি আছে। প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে এইগুলির বিকাশ হইয়াছিল। ইহাদের একটি দক্ষিণী বা মাদ্রাজী সংস্কৃতি। ইহা প্রধানতঃ ছিমুখী পরশু সংস্কৃতি। অন্যটি হইল—পাঞ্জাব সোহন সংস্কৃতি। উত্তর ভারতের রাওয়ালপিণ্ডির নিকট "সোয়ান" বা "সোহন" নদী উপত্যকায় ইহার উৎপত্তি এবং শিওয়ালিক অঞ্চল পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। ইহার সরঞ্জাম ছিল ছড়ির যন্ত্রপাতি।

তাদর অঞ্চল পরিদর্শন করিলে মনে হয়, এখানে প্রধানতঃ কোয়া যন্ত্রশিল্পই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। অবশ্য অন্যান্য ধরণের যন্ত্রপাতিও এখানে ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এইগুলির আকৃতি ছিল বিরাট। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল লোক এইগুলি বর্জন করিত, তাহাদের অনুধাবন করিতে ইহাতে বিশেষ সাহায্য হইবে। এইখানে পাঞ্জাব সোহন সংস্কৃতির ছড়ি যন্ত্রপাতিও আছে কিনা তাহা জানা যায় নাই।

তাদর উপত্যকায় আজকাল বাঘরুলের বাস। এই বাঘরুলের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যুঝিয়াই বোধহয় প্রাচীন প্রস্তর যুগের লোকদিগকে জীবন-ধারণ করিতে হইত। যে নদীটি পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়িয়া কারখানা স্থানের ধার দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পাড় ভরাট হইয়া আসিয়াছে এবং ইহা এখন একটি স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছে। জলধারা সরিয়া যাইবার ফলে নদী-বক্ষের নুড়িগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং সেই সঙ্গে পাহাড় বয়া বড় বড় পাথরের খণ্ডগুলিও দেখা যাইতেছে। নদীর দক্ষিণ পাশে ১০ ফুটের বেশী উঁচু খাড়াই আছে। ঐ খাড়াই দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, কালের প্রবাহে পর্যায়ক্রমে দুইবার ইহাতে ভরকেদ এবং ক্ষয়করণের চিহ্ন পড়িয়াছে। দ্বিতীয় স্থানটি বৈরাট হইতে নয় মাইল দূরে বিপারা গ্রামের নিকট অবস্থিত। সেখানে একটি নালা বড় রাস্তার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার তলদেশে হাতকুড়ুল, কাটারি প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ নদী উপত্যকা এলাকায় প্রস্তর যুগের কতকগুলি লোকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে, অধিকাংশ স্থলেই এগুলি হইতে কৃত্রিমিক তথ্য উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু তাদর অঞ্চলে যে সকল যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলির পারিপার্শ্বিক অবস্থান হইতে এই যন্ত্রগুলির বিবর্তনের পরিচয় অনুধাবনের সূত্র পাওয়া যায়। কারণ এইগুলি প্রাচীন যুগ হইতে অব্যাহতভাবে এখানে পড়িয়া আছে এবং জমাট-বাঁধা প্রস্তরের মত হইয়া গিয়াছে।

—পি. টি. আই

পরলোকে ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ সেন

কলিকাতা 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর বিখ্যাত জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক মাননীয় গুণেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় গত ২৬ জানুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে অতিশয় প্রত্যূষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু একান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। কারণ ২৫ জানুয়ারী তারিখেও গুণেন্দ্রবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যার পরে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের সভায় দৈনন্দিন শ্রোতারূপে সমস্তক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরেও প্রায় রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা এবং অনেকক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে পরিবারগত বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে যাইবার প্রয়োজনে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যান। তাহার পরের দিন সকালে পাঁচটার সময়ে আমরা সংবাদ পাইলাম, আমাদের একান্ত প্রিয় ডাক্তার গুণেন্দ্রবাবু আর ইহলোকে নাই। তাঁহার চিকিৎসক বন্ধুরা অনুমান করিয়াছেন, হাই ব্লাডপ্রেসারের জন্যই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে গুণেন্দ্রবাবুর বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁহার অশীতিপর-বয়স্ক প্রবীণ পিতাকে এই নিদারুণ শোকের আঘাত পাইতে হইল। গুণেন্দ্রবাবুর মাতৃদেবী অনেক বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

জীবন-কাহিনী—স্বর্গীয় ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ সেন পূর্ব্ববঙ্গের একটি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশের সন্তান। গুণেন্দ্রবাবুর আদিনিবাস ও জন্মভূমি ঢাকা জেলায়—সোনারং নামক স্থানে। গুণেন্দ্রবাবুর পিতামহ একজন প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবি ছিলেন। গুণেন্দ্রবাবুর প্রবীণ বয়স্ক পিতা মাননীয় শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন মহাশয় প্রথমে Civil Court Commissioner-এর কার্য্য করিতেন, পরে তিনি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস-এর ইনস্পেক্টার-এর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গুণেন্দ্রবাবুর মাতা স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী ঢাকা জেলার বানারি গ্রামে জমিদার বংশের কন্যা। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েই এইরূপে বংশগৌরবে উন্নত থাকায় গুণেন্দ্রবাবুদের বংশ ঢাকা ফরিদপুর ময়মনসিংহ এবং কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সুপরিচিত।

ডাক্তার গুণেন্দ্রবাবু ১৯০০ সালে জুলাই মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩০০ শ্রাবণ মাসে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে নিজ গ্রামের স্কুলের ছাত্ররূপে গুণেন্দ্রবাবু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে ঢাকা কলেজ হইতে আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সন্তোষজনকভাবে পাশ করিবার পরে তিনি কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগের আন্দোলনে গুণেন্দ্রবাবু যোগদান করেন এবং দেশহিতকর নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এক বছর বাদে তিনি পুনরায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি এম-বি উপাধি লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানেই ডাক্তারী প্র্যাকটিশ করিতে আরম্ভ করেন।

১৯২৭ সালে গুণেন্দ্রবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সে সময়ে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে ঐ কাজে ইস্তফা দিয়া গুণেন্দ্রবাবু কলিকাতা স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ কোনও বিভাগে প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতে থাকেন। এইখানেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতা ও সুনামের সহিত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ মেডিকেল অফিসারের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩০ সালে কালাজ্বর সংক্রান্ত

অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তেন্দ্রবাবুকে আসামে পাঠানো হইয়াছিল। তাহার পরে চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষ কোনও গবেষণা কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বম্বে হকমান ইনিষ্টিটিউট-এ কিছুকাল নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল।

১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্যারাকপুরে আমেরিকানদের মিলিটারী ক্যাম্প স্থাপিত ছিল। সেই সময়ে গুপ্তেন্দ্রবাবুকে Part-time physican ও Medical Adviser-রূপে প্রতিদিন কলিকাতা হইতে যাইয়া সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। সেখানে তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা মধুর ব্যবহার ও সহৃদয়তার জন্য আমেরিকান মিলিটারী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

জনপ্রিয় চিকিৎসক— ডাক্তারী বিদ্যায় গুপ্তেন্দ্রবাবু যেমন জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ছিলেন—চিকিৎসাকার্য্যেও তিনি অসাধারণদক্ষতা ও কার্য্যকরী জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং অন্যান্য স্থানে দায়িত্বপূর্ণ মেডিকেল অফিসারের কাজে তিনি দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত নিজের দক্ষতা ও কর্ম্মক্ষমতার প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ডাক্তারীর কাজে অর্থ ও যশ লাভের অপেক্ষা মানবসেবাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মধ্যে অধিকতর রূপে প্রকাশিত হইত। কলিকাতার বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি নিপুণভাবে অনেক ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এজন্য আপনা হইতেই আর্থিক সচ্ছলতা ও যশ তাঁহাকে ছায়ার মতন অনুগামী হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্তেন্দ্রবাবুর মধ্যে কখনই অর্থলালসের মোহ ও আসক্তি ছিল না। চিকিৎসার অবলম্বনে শ্রেণীবিশেষে জনসেবা করাই তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বহু ভদ্রপরিবারের অসংখ্য ব্যক্তিকে তিনি দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠিতভাবে চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়। অসমর্থ ও সহায়-সম্বলহীন ভদ্রঘরের অনেক রোগীকে তিনি ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন, তাহাদের পথ্য ও খাদ্যের জন্যও গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এমনকি অনেক কুলি মজুর মুটিয়া পর্য্যন্ত এবিষয়ে তাঁহার সাহায্য ও বদান্যতা লাভ করিয়াছে।

ধর্ম্মজীবন—গুপ্তেন্দ্রবাবু বর্ত্তমান যুগের একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হইলেও সাংসারিক সুখভোগ ও আরামস্বাচ্ছন্দ্যের লালসা তাঁহার জীবনকে মলিন করিতে পারে নাই। বিবাহিত গৃহস্থ হইলেও তিনি সাধারণ সংসারী ব্যক্তিদের মতন বিষয়াসক্ত অর্থলোলুপ অথবা পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তি আদৌ ছিলেন না। প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেও গুপ্তেন্দ্রবাবু মোটেই সঞ্চয়ী ছিলেন না। স্ত্রী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নীদের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেও তাঁহার স্নেহমমতা ও কর্ত্তব্যবোধ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। পরিচিত বহু ভদ্রব্যক্তিকে তাঁহাদের দায়-অদায়ে বিনাসর্ত্তে গোপনে শত শত টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কোনও বিপন্ন নরনারী আসিলে তিনি টাকা কাপড়-চোপড় প্রায়ই দিতেন। কয়েকটি আশ্রমে ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে তিনি মাসে মাসে নিয়মিত অর্থসাহায্য করিতেন। ইহা ছাড়াও রাস্তায় যাইবার সময়ে অন্ধ পঙ্গু আতুর ও অসহায় ব্যক্তিদের তিনি দু-আনা-চার আনা করিয়া পয়সা দান করিতেন। প্রত্যেকদিন সেই দানে তাঁহার পকেট হইতে দশবারো টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইত। এই রকমে ছোটবড় অনেক রকম দান ও সেবাসাহায্যে তাঁহার প্রতিদিনই তিনিশ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হইয়া যাইত। এইভাবে অযথা দানশীলতার জন্য গুপ্তেন্দ্রবাবু নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের জন্য বিশেষ-কিছু অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

গুপ্তেন্দ্রবাবু বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সারদাদেবীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের দুইঘণ্টা পূর্ব্বে নিজের নির্দ্দিষ্ট পূজার ঘরে বসিয়া ঠাকুর ও শ্রীমায়ের উপাসনা করিতেন। ঠাকুর ও শ্রীমায়ের জীবন-

চরিত ও উপদেশের পুস্তকগুলি তিনি বোজ অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করা তাঁহার অতি অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। 'দেবস্থানে শূন্য হাতে যাইতে নাই' বলিয়া বেদান্ত মঠের মন্দিরে পূজার জন্য তিনি প্রতিদিনই প্রণামী দিয়া যাইতেন। বেদান্ত মঠে ঠাকুর শ্রীমা স্বামিজীর এবং অন্যান্য উৎসবে গুণেন্দ্রবাবু নানাভাবে সাহায্য করিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অভেদানন্দ স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের লিখিত গ্রন্থ তিনিয়া নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেওয়া তাঁহার চরিত্রের একটি অন্যতম রীতি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের তিনি নানাদিক দিয়া একজন অযাচিত ও অকৃত্রিম হিতৈষী ও সাহায্যকারী সেবক ছিলেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহার বিশেষ আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুর সম্বন্ধ ছিল। দিনের যে কোন সময়ে অবসর পাইলেই গুণেন্দ্রবাবু বেদান্ত মঠে আসিয়া সন্ন্যাসীদের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদের কুশল সংবাদ লইতেন। কোন কোনদিন ঠাকুর শ্রীমায়ের ও স্বামিজীর প্রসঙ্গে তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত। সর্ব্বদা সহাস্য মুখ, উদার হৃদয়, শ্রদ্ধাপূর্ণ মন এবং ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠার নিবিড়তায় তিনি বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের অন্তরকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সত্যই গুণেন্দ্রবাবুর স্মৃতি আমাদের কাছে এত উজ্জ্বল ও মনোরম হইয়া আছে যে, এখনও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এমন একজন ভক্তিমান সদাচারী জনসেবী উদারচিত্ত ও মধুর চরিত্র ব্যক্তিকে বিশ্বৃত হওয়া সত্যই তাঁহার সহিত প্রীতি শ্রদ্ধা স্নেহ ও সম্মানের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ প্রিয় ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব।

গুণেন্দ্রবাবু তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, দুই সুযোগ্য পুত্র, একমাত্র কন্যা, পূজনীয় পিতৃদেব, সহোদর ভ্রাতৃগণ এবং বহু আত্মীয়স্বজনকে রাখিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই মর্ম্মন্তুদ শোকে সান্ত্বনা দিবার মতন শক্তি ও ভাষা আমাদের নাই। যিনি সকল শান্তির নিদান, সমস্ত ব্যথা-বেদনার পরমসান্ত্বনাদাতা, সেই অশেষ মঙ্গলময় বিধাতা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর হইতে সমস্ত দুঃখ বেদনা দূর করুন—তাঁহাদের প্রত্যেকের বেদনাভর্জ্জরিত প্রাণে শান্তির সুধাধারা বর্ষণ করুন। আর অবশেষে আমরা প্রার্থনা করি—আমাদের একান্ত প্রিয় এই উদারচিত্ত ভক্তিমান পুরুষের আত্মা ভগবৎসান্নিধ্যে চিরশান্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউন।

ওঁ শান্তিঃ।

সৌরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক খনন-কার্য্য

রাজকোট হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ মঙ্গলবারের তারিখের স্থানীয় প্রতিনিধির বিবরণ প্রকাশ :—

সৌরাষ্ট্রের আর্কিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের এবং বরোদা ইউনিভার্সিটির যুক্ত প্রচেষ্টায় হারাপ্পা অঞ্চলে মিষ্টার পি. পি. পাণ্ডীয় মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় মাসাধিক কাল হইতে ঐতিহাসিক খনন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বরোদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডক্টর এস সুব্রহ্মণ্যম্ মহাশয়ও এই ঐতিহাসিক খননকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

এই ঐতিহাসিক খনন-কার্য্যের প্রথম স্থান জামনগরের নিকটবর্ত্তী লাখাবাওয়াল অঞ্চলে।

পুরাতত্ত্ববিদগণ এই সমস্ত স্থান বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানিতে পারিয়াছেন—এই সমস্ত স্থলে ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক অনেক জ্ঞাতব্য ও নূতন তথ্যের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন আছে। তাঁহাদের মতে হারাপ্পার সেই প্রাচীন যুগের (খৃষ্টপূর্ব্ব ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার) অধুনা-বিলুপ্ত কোন কোনও জাতির এখানে অবস্থান অনেক নগর ও জনপদ ছিল।

—স্টেটসম্যান

সঙ্ঘবার্ত্তা

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত শুক্রবার ২০ মাঘ ১৩৮২ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬) তারিখে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ চতুর্পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীমৎ স্বামিজীর এই জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রভাতে বেদান্ত মঠের মন্দিরে মঙ্গলারতি স্তবপাঠ ভজনগান হইয়াছিল। তাহার পরে বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বেলা একটার সময় হইতে তিনটা পর্য্যন্ত প্রায় সাতশত ভক্তনরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলা তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবনচরিত অবলম্বনে কথকতা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের লাইব্রেরী হলে ও প্রাঙ্গণে একটি জনসভা হইয়াছিল। মাননীয় ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার পরে শ্রীমৎ স্বামী তুর্গানন্দজী শান্তিবাচন করিয়াছিলেন।

তাহার পরে স্বামিজীর জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে স্বামী বেদানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল, অধ্যাপক শ্রীনিখিলেশ্বু রায়চৌধুরী এবং অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়েরা স্বামিজীর জীবন-সাধনা কর্ম্মান্দোলন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীমৎ স্বামিজীর স্বরচিত কয়েকটি গান শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক গাওয়া হইয়াছিল।

মাননীয় ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ মহাশয় সভাপতিরূপে একটি মনোরম অভিভাষণ দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন বিষয় তিনি তাঁহার অভিভাষণে বর্ণনা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোঁমাঁ রোঁলা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় রোঁম্যাঁ রোলাঁর সহিত ব্যক্তিগত কথোপকথন হইতে অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী সমাপ্তি-সঙ্গীত গাহিবার পরে রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে সভার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। জনসভার অধিবেশনের পরে ক্ষুদিরাম বসু রোডের (হাতীবাগান কলিকাতা) 'নীলসঙ্ঘ'-এর সদস্যগণ ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কালীকীর্ত্তন গানের দ্বারা সমবেত ভক্ত শ্রোতাদের আনন্দিত করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময়ে উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছিল।

ধর্ম্মালোচনা—পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্য সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় সোমবার হইতে শুক্রবার প্রতি সপ্তাহে ছয়দিন করিয়া কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কথকতা—প্রতি রবিবার সন্ধ্যার আরতির পরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত" কথকতা করিতেছেন।

শ্রীরামনাম-কীর্ত্তন—প্রতি শনিবার বেলা তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীরামনাম-কীর্ত্তন এবং বিবিধ ভজনগান হইয়া থাকে।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৬২

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

সম্পাদক—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং
১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬, ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসহইতে শ্রীবিনয়ভূষণ সিংহ, কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—চৈত্র, ১৩৬২

সূচীপত্র

১।	বরণীয় (কবিতা)		৪৯
২।	শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা রহস্য	রাসমোহন চক্রবর্ত্তী	৫০
৩।	বাসন্তী পূর্ণিমা	অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর	৫৪
৪।	ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ...	ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৫

জামসেদপুর—ব্র্যাঞ্চ

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

(স্থাপিত—১৯১৮)

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিখুঁতভাবে ইঞ্জিন মেরামতি কার্য্য আমাদের বৈশিষ্ট্য

হেড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১

ফোন—২৩-১৮০৪ (পাঁচ লাইন)

শাখা—বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক ও গৌহাটি

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সূচীপত্র

৫।	জীবনের ধারা ...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠ	৬২
৬।	যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব (কবিতা) ...	নন্দলাল বাগচি	৬৮
৭।	পূজ্যপাদ শ্রীঅভেদানন্দ মহারাজের প্রশ্নোত্তর ...		৬৯
৮।	মেঘনাথ সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ...	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
৯।	যতীন্দ্রনাথের কবিতা	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৭৬
১০।	পরলোকে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসী ...	বীরেন্দ্রনাথ দে	৭৯
১১।	বরাহনগর ...	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী	৮৪
১২।	পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণে বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা।		৮৫
১৩।	দক্ষিণ মেরু অভিযানের নবতম পরিকল্পনা।		৮৬
১৪।	টমাটোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার		৮৭
১৫।	দেহস্থ রক্তবাহী শিরার সফল ভাস্কর্য		৮৭
১৬।	ভারতীয় সভ্যতার দ্বিজত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব	বালকরাম ভট্টাচার্য্য	৮৮
১৭।	প্রাচীন কালের প্রাসাদ		৯৪
১৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ গীতিকা (কবিতা) ...	মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৯৪
১৯।	অতীতে আমেরিকায় ভারতীয়দের প্রসার ...		৯৫
২০।	গ্রন্থসমালোচনা		৯৫
২১।	সঙ্ঘবার্ত্তা ...		৯৬

"বিশ্ববাণী"-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষান্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন: বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে নতুবা পূর্ব্বের ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না।

প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকদের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY & CO.

Dealers in:-

WEST END · FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ, বসু এণ্ড কোং (ডেকরেটরস্)

৫২নং ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

ফোন :—বড়বাজার ১৬২৫

বিশ্ববাণী

অষ্টাদশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৬২ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বরণীয়

শ্রীঅমরেশ মিত্র

জীবনে আসিল চিরবসন্ত
অশেষ মাধুরী আজি,
বিকশিল হৃদি-কুঞ্জ-কাননে
রঙে রঙে ফুলরাজি।
ওগো অপরূপ, ওগো অনুপম,
ওগো প্রাণারাম চির প্রিয়তম,
তুমি এলে তাই আকাশে উঠিছে,
সুরে সুরে বীণা বাজি'।
উঠিছে পুলকে ভামলা এ-ধরা
উৎসব-সাজে সাজি'।

• • • •

বসেছিনু আমি ধ্যানের আবেশে
কতকাল তব তরে,
কত ব্যাকুলতা-মিলন-পিয়াসা
অনুরাগে প্রেমভরে।
কখন আসিবে ওগো সাথী সখা
কবে তুমি মোরে এসে দেবে দেখা?
সেই ভাবনায় কেটে গেছে মোর
ক্ষণে ক্ষণে আশা ভোরে,
এসেছি ছুটিয়া কতবার পথে
নিশীথে আঁধার-ঘোরে।

• • • •

কতদিন কত মাস ও বরষ
একে একে গেছে চ'লে,
তবু বসেছিনু আনমনে একা
এ বিজন বনতলে।
তোমারে না হেরে বিষাদে হতাশে
যদিও কেটেছে এই বনবাসে
তবু মোর প্রাণে জাগিত নীরবে
এই আশা পলে পলে
আসিবে আসিবে একদা যে তুমি
সমারোহে কোলাহলে।

• • • •

সফল হয়েছে সাধনা আমার
আজিকে তোমার বরণে,
জীবন উঠেছে সহসা ভরিয়া
সুনিবিড় সুধা-হরষে।
আমার জীবন, আমার ভুবন,
হয়েছে আজি কী শোভায় শোভন,
হে চির-অজানা, হে চির-গোপন
তোমারি পরম পরশে
আলোকে সমীরে অবিরত ধারে—
একি এ মহিমা বরষে!

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা রহস্য

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ

চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বিশ্বভরাচরের অন্নদাত্রিনী ভগবতী অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণা উপনিষৎ, অন্নদাকল্পতন্ত্র কারণাগম, মহীধর-বিরচিত মন্ত্রমহোদধি (নবম-তরঙ্গ), কাশীখণ্ড ইত্যাদি গ্রন্থে অন্নপূর্ণার স্বরূপ, ধ্যান, মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য বিরচিত "তন্ত্রসার" নিবন্ধে অন্নপূর্ণার বিভিন্ন মন্ত্র, পূজা প্রয়োগ, স্তোত্র ও কবচ দৃষ্ট হয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত 'অন্নপূর্ণা স্তোত্র' সুপ্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বঙ্গভাষায় "অন্নদামঙ্গল" কাব্য রচনা করিয়া অন্নপূর্ণার মহিমা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।

অন্নপূর্ণা উপনিষদে কথিত হইয়াছে, ভগবতী অন্নপূর্ণা সাধককে ব্রহ্মজ্ঞানামৃত দান করতঃ কৃতার্থ করিয়া থাকেন। নিদাঘ নামক জনৈক যোগী ব্রহ্মজ্ঞ ঋভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

কয়োপাসনয়া ব্রহ্মন্নীদৃশং প্রাপ্তবানসি।
তাং মে ব্রূহি মহাবিদ্যাং মোক্ষসাম্রাজ্যদায়িনীম্॥

হে ব্রহ্মন্! আপনি কোন্ উপাসনা দ্বারা এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন? আমাকে সেই মোক্ষরূপ সাম্রাজ্যদায়িনী মহাবিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন।

ঋভু কহিলেন,—যাহার জ্ঞানমাত্রেই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে সেই নিত্যা বিদ্যা শ্রবণ কর। আমার পিতা আমাকে সপ্তবিংশতি বর্ণাত্মক অন্নপূর্ণা-মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া তাহা সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত মহামন্ত্র যথা,—

"ঐঁ হ্রীঁ সৌঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ নমো ভগবত্যন্নপূর্ণে সমাভিলষিতমন্নং দেহি স্বাহা।"

আমি নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমোক্ত আচার-পরায়ণ হইয়া দীর্ঘকাল ঐ মহামন্ত্রের সাধনা করিতে থাকি।

এবংগতে বহুদিনে প্রাদুরাসীন্মমাগ্রতঃ।
অন্নপূর্ণা বিশালাক্ষী স্মেরানন্দসুধাপ্লুতা॥

অর্থাৎ—এই মন্ত্রানুষ্ঠান করিতে করিতে বহুদিন অতীত হইলে বিশালনয়না, ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুখপদ্ম-বিশিষ্টা ভগবতী অন্নপূর্ণা আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

দেবী আমাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে আমি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিলাম, "আত্মতত্ত্বং মনসি মে প্রাদুর্ভবতি পার্ব্বতি!" মাতঃ পার্ব্বতি! যাহাতে আমার চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, সেই বর প্রদান করুন।

'তথাস্তু' বলিয়া ভগবতী অন্নপূর্ণা অন্তর্হিতা হইলেন। তখন জগতের বিচিত্রতা দর্শন করিয়া আমার চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইল—"তদা মে মতিরুৎপন্না জগদ্বৈচিত্র্য দর্শনাৎ।"

পুরাণে ও তন্ত্রে কোথাও অন্নপূর্ণাকে দ্বিভুজা, কোথাও বা চতুর্ভুজারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবীর সুপ্রচলিত ধ্যান এইরূপ,—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াম্
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যপরাং ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

—(তন্ত্রসার-ধৃত)

অর্থাৎ—দেবী অন্নপূর্ণা রক্তবর্ণা, বিচিত্র বসনা পরিহিতা, তাঁহার ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। তিনি সর্ব্বদা অন্নবিতরণ করিতেছেন, তাঁহার শরীর স্তনভারে আনত। নৃত্যপরায়ণ ও চন্দ্রখণ্ড ভূষিত মহাদেবকে দর্শন করিয়া দেবী

আনন্দিতা ; সেই ভবদুঃখহারিণী ভগবতী অন্নপূর্ণাকে ভজনা করি।

কারণাগমে দ্বিভুজা অন্নপূর্ণার ধ্যান এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বামে মাণিক্যপাত্রং মধু-রস-ভরিতং
বিভ্রতীং পাণিপদ্মে,
দিব্যৈরত্নৈঃ প্রপূর্ণাং দৃতমণিকাচে দক্ষিণে রত্নদর্বীম্।
রক্তাঙ্গীং পীনতুঙ্গস্তনভরবিলসদ্ধারহারাং ত্রিনেত্রাম্,
বন্দে পূর্ণেন্দুবিম্ব প্রতিনিধিবদনামম্বিকামন্নপূর্ণাম্ ॥"

অর্থাৎ—যিনি বামকর-কমলে মধুরসপূর্ণ মাণিক্য-পাত্র ধারণ করেন এবং মণিকায় শোভিত দক্ষিণ হস্তে দিব্যরত্ন দ্বারা পূর্ণ রত্নময় দর্বী (হাতা) ধারণ করেন, যিনি রক্তবর্ণা, স্থূল ও উন্নত স্তনভারে শোভমানা, মুক্তাহার বিভূষিতা এবং ত্রিনয়না, সেই পূর্ণচন্দ্র-সদৃশাননা জগজ্জননী অন্নপূর্ণা দেবীকে বন্দনা করি।

কারণাগমে চতুর্ভুজা অন্নপূর্ণার ধ্যান যথা :—

"সিন্দূরাভাং ত্রিনেত্রামমৃতকলিকলাং
খেচরীং রক্তবস্ত্রাম্,
পীনোত্তুঙ্গস্তনাঢ্যামভিনব-বিলসদ্-যৌবনারম্ভ-রম্যাম্
নানালঙ্কারযুক্তাং সরসিজনয়নাম্ ইন্দুসংক্রান্তমূর্তিম্
দেবীং পাশাঙ্কুশাঢ্যামভয়বরকরাম্ অন্নপূর্ণাম্ নমামি।"

অর্থাৎ—যিনি সিন্দূরবর্ণা, ত্রিনয়না, অমৃতকরণ-শীল চন্দ্রকলা দ্বারা শোভিতা, যিনি শূন্যাকাশে বিহারকারিণী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, যিনি স্থূল ও উন্নত স্তনযুগল দ্বারা সমৃদ্ধা, যিনি নবযৌবনরমণীয়া, নানালঙ্কারভূষিতা, কমলনয়না, যাঁহার দেহজ্যোতি চন্দ্রপ্রভাতুল্য, যিনি চতুর্ভুজে পাশ অঙ্কুশ অভয় ও বর মুদ্রা ধারণ করেন, সেই দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করি।

শঙ্করাচার্য বিরচিত "অন্নপূর্ণা-স্তোত্রে" দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা-অন্নপূর্ণার উভয়বিধ রূপেরই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা :—

"দর্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্নখচিতা
দক্ষে করে সংস্থিতা,
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী
সৌভাগ্য মাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী
কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী
মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৮

অর্থাৎ—হে দেবী! তোমার দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণ ও বিচিত্র রত্নখচিত দর্বী (হাতা) এবং বাম হস্তে সুমিষ্ট চরুপূর্ণ পাত্র অবস্থিত। তুমি সৌভাগ্য-বিধাত্রী, ভক্তগণের অভীষ্ট প্রদানকারিণী এবং কটাক্ষে মঙ্গলবিধায়িনী। তুমি কাশীপুরের অধীশ্বরী, করুণাময়ী মাতা জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, তুমি আমায় ভিক্ষা দাও।

চন্দ্রার্কানল কোটি কোটি সদৃশা
চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী,
চন্দ্রার্কাগ্নি সমান কুণ্ডলধরী
চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালা-পুস্তক-পাশাঙ্কুশধরী
কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী
মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৯

অর্থাৎ—হে দেবি! তুমি কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভাশালিনী, চন্দ্রকিরণ তোমার অধরের ছায়ামাত্র, তুমি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি-তুল্য ভাস্বর কুণ্ডল যুগল কর্ণে ধারণ করিতেছ, তুমিই চন্দ্র-সূর্য্যকে দীপ্তি প্রদান করিতেছ।

তুমি চতুর্ভুজে মালা, পুস্তক, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিতেছ, তুমি কাশীপুরের অধীশ্বরী করুণাময়ী মাতা জগদীশ্বরী, তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও।

আচার্য্য শঙ্কর কি করিয়া ভগবতী অন্নপূর্ণার কৃপা ও দর্শন লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে :—

আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মণিকর্ণিকাসমীপে অবস্থান

করিতেছিলেন। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন; নির্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তিরও স্থান নাই, ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য। এইভাবে তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়া শক্তিকে অস্বীকার করিতে লাগিলেন।

একদা আচার্য্য শঙ্কর প্রত্যূষে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নানার্থ যাইতেছেন, পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, এক সুন্দরী যুবতী মৃতপতির মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং তাহার সৎকারের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। মৃত দেহটি ঘাটের পথ রুদ্ধ করিয়া স্থাপিত দেখিয়া শঙ্কর স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, 'মা! শবটিকে যদি আপনি একপার্শ্বে সরাইয়া রাখেন তাহা হইলে আমরা গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইতে পারি।' শোকাভিভূতা ঐ নারী যেন এই কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাহাতে শঙ্কর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে পরিশেষে সেই শোকার্ত্ত নারী তাঁহাকে বলিলেন, 'কেন মহাত্মন্! আপনি বারবার আমাকে একথা বলিতেছেন? শবকেই এইজন্য বলুন না।' আচার্য্য বলিলেন, 'মা! আপনি শোকে বুদ্ধিহারা হইয়াছেন। শব কি কখনও নিজে নড়িতে পারে? উহার কি শক্তি আছে যে, সে স্বয়ং নড়িবে?' ঐ নারীটি তখন উত্তর করিলেন, 'কেন মহাত্মন্! আপনার মতে ত শক্তিশূন্য ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্তৃত্ব। শব তবে স্বয়ং নড়িবেনা কেন?' এই উত্তর শুনিয়া আচার্য্য একান্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'ইহা কি দৈব লীলা।' অকস্মাৎ সেই যুবতী ও শবদেহ কোথায় মিলাইয়া গেল, দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই স্থানে কাশীপুরাধীশ্বরী ভগবতী অন্নপূর্ণা সেখানে প্রকাশিতা হইলেন। আচার্য্য শঙ্কর তখন কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি-গদ্গদ চিত্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—

"ওঁ নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী
সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,
নির্ধূতাখিল ঘোরপাবনকরী
প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচল বংশপাবনকরী
কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বন করী
মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।

অর্থাৎ—হে মাতঃ। তুমি নিরন্তর সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ, স্বীয় হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছ, তুমি সৌন্দর্য্যের সাগরস্বরূপা, তুমি সন্তানগণের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাক, তুমি প্রত্যক্ষ মাহেশ্বর শক্তি, স্বীয় অঙ্গ দ্বারা হিমালয় বংশকে পবিত্র করিয়াছ, তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, জগজ্জননী অন্নপূর্ণা। তুমি করুণাপরবশ হইয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর।

আচার্য্য শঙ্কর ভগবতী অন্নপূর্ণার নিকট কিরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন?

"অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞান বৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি।"

অর্থাৎ—হে মাতঃ অন্নপূর্ণে! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণপ্রিয়া। হে পার্ব্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর।

পরম করুণাময়ী ভক্তবৎসলা ভগবতী অন্নপূর্ণা শঙ্করাচার্য্যের স্তবে প্রসন্না হইয়া তাঁহার বামকরস্থিত অমৃত ভাণ্ড হইতে দক্ষিণকরস্থিত রত্নদ্বারা শঙ্করকে পূর্ণজ্ঞান ও বৈরাগ্যামৃত পরিবেশন করিলেন। শঙ্কর দিব্যানুভূতি লাভ করিয়া পরমানন্দে গাহিতে লাগিলেন,—

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী
পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ
স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।"

—(অন্নপূর্ণাস্তোত্র, ১২)

অর্থাৎ—জগজ্জননী পার্ব্বতী দেবী আমার

মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব আমার পিতা, শিব কৃষ্ণবৃন্দ সকলেই আমার বান্ধব এবং সমগ্র ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর "অন্নদামঙ্গল" কাব্য রচনা করিয়া জন-সমাজে অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। ঐ কাব্য-গ্রন্থটির রচনার সমাপ্তিকাল ১৬৭৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫২ হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ। যে ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হয় তাহা এইরূপ—নবাব আলিবর্দী খাঁ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একবার সাত লক্ষ টাকা নজরানা চাহেন। ঐ টাকা দিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করা হয়। সেখানে মহারাজা দেবীর স্তব করায় দেবী অন্নপূর্ণা মূর্তিতে স্বপ্নে তাঁহার নিকটে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন,—

"শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
করে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়॥"
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্নে কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে॥"

—(অন্নদামঙ্গল)

এদিকে দেবী ভারতচন্দ্রকেও স্বপ্নে দর্শন দিয়া "অন্নদামঙ্গল" রচনার আদেশ দিলেন।

"ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিলা যাহা না করিহ ভয়।
আমার কৃপায় বলে বোধা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিবাবে॥
এত বলি অন্নদার মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥"

অন্নপূর্ণার আবির্ভাব বৃত্তান্ত "অন্নদামঙ্গলে" এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশ গ্রন্থ "অন্নদাকল্প" গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত বলিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কৈলাস-পুরীতে হর-গৌরীর মধ্যে প্রায়ই দাম্পত্যকলহ ঘটিত। শিব সহজে ভাঙ্গড় ভোলা, অধিকাংশ দিনই তাঁহার ঘরে অন্ন থাকিত না। ভিক্ষার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াও শিব সব দিন অন্ন সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না, সুতরাং শিব ও দুর্গা উভয়কে উপবাসী থাকিতে হইত। এই ব্যাপার লইয়া হরের সহিত গৌরীর অষ্টপ্রহর কোন্দল লাগিয়া থাকিত। একদিন শিব ভিক্ষাতে বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও ত্রিভুবনে কুত্রাপি এক মুষ্টি অন্ন পাইলেন না। এদিকে মহামায়া মায়া প্রকাশ করিয়া কাশীতে অন্নপূর্ণারূপে প্রকটিতা হইয়া সমস্ত নরনারী ও সর্বজীবকে অকাতরে অন্ন বিলাইতে লাগিলেন। জগতে কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত শিব পরিশেষে কাশীপুরীতে অন্নপূর্ণার নিকটই ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবতী অন্নপূর্ণা কর্ত্তৃক মহাদেবকে অন্নদানের বিবরণ "অন্নদামঙ্গলে" এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,

"অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥
ভারত অমৃত পূরিত করি।
রত্ন পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাধের মত॥
অন্ন অন্ন অন্নপূর্ণা বলিয়া
নাচেন শঙ্কর তালে ঢলিয়া।

হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর ভক্তসঙ্গে ॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তানে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা বহু মধুর ॥"

কবি ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার পরিবেশিত অন্ন মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন,

"তোমার অন্নের বলে অভাবধি আছে গলে,
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে পান পাত্র আর হাতে হাতা মাত্র,
দিতে পার চতুর্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া।
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে,
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া
পাইলিয়া অন্নসুধা ভারতের হর ক্ষুধা,
মা বিনা বাপকে অন্ন কে দেয় ভাবিয়া ॥"

—(অন্নদামঙ্গল)

ভারতে পূজিতা অন্নপূর্ণা দেবীর নামের সঙ্গে প্রাচীন রোমে পূজিতা "অন্ন-পেরেন্না" (Anna Perenna) দেবীর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। রোমকদের এই অন্ন-পেরেন্না দেবীও অন্ন বিতরণ করিতেন। রোমবাসীরা আভেন্টাইন পর্ব্বতে গেলে এই দেবী তাহাদিগকে অন্ন দান করিয়া ছিলেন। আমাদের অন্নপূর্ণার পূজা চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে হয়, রোমকদের অন্ন-পেরেন্না দেবীর পূজাও এই সময়ে হইত। খুব সম্ভবতঃ রোমকেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া অন্নপূর্ণাদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা-পদ্ধতি লিখিয়া গিয়া স্বদেশে তাহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। মৌর্য্যযুগে ভারতবর্ষের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের বাণিজ্যগত সম্পর্ক ছিল এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের একজন গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"বৎসর বৎসর রোম সাম্রাজ্য হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া যায়। এই সময় বঙ্গদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ার হইত। উহা এত চিক্কণ ও চমৎকার ছিল যে, সেকালের রোম সাম্রাজ্যের ধনী বিলাসিগণ বঙ্গের মসলিন বস্ত্র ক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐসব স্থানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

বাসন্তী পূর্ণিমা

অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর, এম-এ

পশ্চিম দিগন্ত-তীরে আকাশের নিম্ন সানুতটে
তখনও মোছেনি অস্তরাগ,
বিহগ-কাকলী—
তখনও যায়নি ডুবে স্তব্ধির গভীর আঁধারে।
ধীরে-ধীরে দেখা দিল স্নিগ্ধকান্ত চন্দ্রের স্বপন।
সাথে এল সুরভিত সমীরণ,
মনে হল, পূর্ণিমা-কৌমুদী—
ছড়াল চন্দনগন্ধ,
সুদূর সুবাস হতে বিলাসিত হয় যেন
ঐ
মৃদুল জ্যোৎস্নিমা।
আর মর্ম্মর
প্রাণে আনে পবনের পেলব পরশ।
আজ বুঝি বাসন্তী-পূর্ণিমা,
আনন্দের কল্পলোক স্বর্গের সৌন্দর্য্য-মহিমা
দেখিবার লভিবার সাধ—
তাই আজ পূর্ণ হ'ল,
চিত্ত পেল তৃপ্তির প্রসাদ।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়তম শিষ্যরূপে ধর্ম্মসাধনার চরম অনুভূতির শিখরে উঠিয়া একজন প্রকৃত ব্রহ্মবিদ ও আদর্শ ধর্ম্মগুরু হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য শিষ্যরূপে স্বামিজীর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান শুদ্ধভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সুন্দর সমাবেশ লাভ করিয়াছিল। একাধারে তিনি ছিলেন জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের সাধনায় সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধপুরুষ।

প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিদের নিষেবিত সুমহান বেদান্ত ধর্ম্মকে স্বামিজী নিজের বিচিত্র জীবনে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, দার্শনিক মননশীলতা ও বাস্তব জীবনে কর্ম্মসাধনার মধ্যে বিবিধ প্রকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকালেই কাশীপুর বাগানে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে স্বামিজী নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া বেদান্তের সর্ব্বোচ্চ ভাব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য অদ্বৈততত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। অসাধারণ মননশীলতা ও চিন্তাশক্তির স্বাতন্ত্র্যে এবং বিবিধ দুরূহ বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা স্বামিজী বেদান্তের বর্ত্তমান যুগোপযোগী ব্যাখ্যান বক্তৃতা রচনা ও উপদেশের মধ্যে দিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনরূপী বিরাট জনসেবার প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার মধ্য দিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা "জীবই শিব" বেদান্তের এই তত্ত্বের বাস্তব রূপ তিনি দান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবসানের পরে ১৮৮৬ হইতে নিজের মহাপ্রয়াণের কাল পর্য্যন্ত (১৯০২) স্বামিজী ধর্ম্মের বিভিন্ন দিককে নিজের বহুমুখী ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকে নানাভাবে দেশবিদেশে প্রচার ও ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে স্বামিজীর সমস্ত মতামত তাঁহার রচনাবলীতে আটখানি বিরাট পুস্তকে (Complete Works) প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামিজীর সেই সমস্ত বক্তৃতা রচনা কথোপকথন ও উপদেশের আলোচনা করিলে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত মতামত আমরা জানিতে পারিব। তবে স্বামিজীর সমস্ত রচনাবলী হইতে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নয় বলিয়া আমরা তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধ কয়েকটি বক্তৃতা রচনা ও উপদেশ হইতে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে, ধর্ম্মের সংজ্ঞা (definition) নির্দ্দেশ করিতে গিয়া স্বামিজী কি বলিয়াছেন? স্বামিজীর ধারণায় ও মতে, "Religion is the manifestation of Divinity already in man (মানুষমাত্রেরই মধ্যে যে ব্রহ্মস্বরূপতা নিহিত আছে—তাহার বহির্ব্বিকাশ সাধন করাই ধর্ম্ম)। নিউ ইয়র্কে My Master (আমার গুরুদেব) নামে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে বক্তৃতায় ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকৃতির নির্দ্দেশ করিতে গিয়া স্বামিজী বলিয়াছেন :—

"Man must realise God, feel God, see God, talk to God, and become one with God. That is religion. Religion is realisation."

স্বামিজী তাহার পর এ সম্বন্ধে অন্য একটি বক্তৃতায় বলিতেছেন :—

"Religion is realisation of God, and I will call you a worshipper of God, when you have become able to realise the Idea. Before that it is the spelling of words and no more. It is this powor of realisation that makes religion" "No amount of doctrines or philosophies, or ethical books, that you may have

stuffed into your brain, will matter much—only what you are, and what you have realised."

—(Complete Works, Vol- v p-43)

স্বামিজী স্পষ্টই বলিয়াছেন—গীর্জা মন্দির মসজিদ প্রভৃতি ধর্মস্থানে গমন ও সমবেত উপাসনায় যোগ দেওয়া ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়। ফোঁটা মালা তপ্ত তিলক নামাবলী গেরুয়া জটা দাড়ী প্রভৃতির দ্বারা ধার্মিক হওয়া যায় না। ধর্মের ব্যাপারে এই সমস্ত নিতান্ত গৌণ ও বাহ্য এবং অসার বস্তু। এইজন্য স্বামিজী তাঁহার একটি বক্তৃতায় মাদ্রাজবাসী শ্রোতাদের উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলিয়াছেন :—

"Religion is not going to church, or putting the marks on the forchead, or dressing in a peculiar fashion ; you may paint yourselves in all colours of the rainbow, but if the heart has not been opened, if you have not realised God, it is all in vain."

—(C. W. Vol III., page 283)

'সন্ন্যাসীর গান' বা 'Song of Sannyasin' কবিতাতেও স্বামিজী লিখিয়াছেন :—

"Where seekest freedom thou friend ?

In books and temples.

Vain is thy search."

"অন্বেষিছ মুক্তি কেথা বন্ধুবর ?

শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ !"

স্বামি-শিষ্য-সংবাদের উত্তর কাণ্ডে ভাবার বল্লীতে ৯৫ পৃষ্ঠায় স্বামিজী বলিতেছেন : "আচার বিচার কেবল মানুষের ভিতরের মহাশক্তি স্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভিতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাই সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধিনিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে ? যে দেশেই যাই, দেখি, উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। ঠাকুর (রামকৃষ্ণদেব) এটেই দেখাতে এসেছিলেন। অনুভূতিই হচ্ছে সারকথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, হাজার বৎসর নিরামিষ খা—তাতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয় তবে জানবি, সবৈব বৃথা হলো।"

'রাজযোগ পুস্তকের অন্তর-বাণীতে স্বামিজী বলিয়াছেন :—

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদিগের মধ্যে একটি অথবা একাধিক বা সকল উপায়গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্মের সর্বাঙ্গীন রূপ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।"

প্রাচীন আর্যঋষিবৃন্দ ধর্মের তত্ত্ব নির্ণয় ও সেই তত্ত্বকে উপলব্ধির জন্য যে সাধন পদ্ধতির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন—স্বামিজী তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকে তাহাকেই বর্তমান যুগের উপযোগীরূপে নূতন আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামিজী My Master নামে বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"ধর্ম একান্ত সত্যময়। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও উপলব্ধিরই বস্তু। মতবাদ আচার নিয়ম ব্রতব্রত শাস্ত্রবিচার ধর্ম নয়। বক্তৃতা তর্কবিতর্ক শাস্ত্র-ব্যাখ্যান কখনই ধর্ম নয়। ধর্ম কোনও কল্পনার বিষয় নয়। ইহা একেবারে চাক্ষুষ সত্য ব্যাপার। অনুভূতিই একমাত্র ধর্ম। আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করাই ধর্ম।"

ধর্মানুরাগী সমস্ত মানুষের প্রকৃতি রুচি এবং সাধন-সামর্থ্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ও বৈচিত্র্য বর্তমান। সাত্ত্বিক ধ্যানশীল একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি যে-ভাবে ধর্মসাধনা করেন, তাহার সহিত মননশীল রূপ

প্রার্থনাকারী ব্যক্তির এবং বহির্মুখী ও বাহ্য আচার অনুষ্ঠান সহায়ে মূর্তি বা প্রতীকাদির উপাসনাকারীর ধর্মগত উপাসনার মধ্যে প্রকারগত প্রভেদ সর্বদা থাকিবেই। সব শ্রেণীর সাধকদেরই উপাসনার লক্ষ্য সত্যস্বরূপ অনাদি অনন্ত পরমাত্মা। কিন্তু মাত্র একটি উপায়কেই অবলম্বন করিয়া সকলেই ধর্মসাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ধর্ম সাধনায় বিভিন্ন সাধক ও উপাসকদের সাধনাগত অবস্থার তারতম্যে অনেক রকম পথ ও পদ্ধতি দেখা যায়। ধর্মের সাধনায় কেহ জ্ঞানপথ, কেহ ভক্তিপথ কেহ যোগপথ এবং কেহবা নিষ্কাম কর্ম সাধনের পথ নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া সাকার নিরাকার প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উপাসকেরা উপাসনা করেন। আবার সাকারবাদীদের মধ্যে মধ্যে এক এক প্রকৃতির উপাসক এক একপ্রকার মূর্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

ধর্মের সাধনায় প্রথম প্রবর্তিত উপাসকদের জন্য বাহ্য মূর্তিপূজার বিধান রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা উন্নততর প্রকৃতির লোকেরা মনন ও অপের দ্বারা উপাসনা করেন। ইহাদের অপেক্ষাও যাঁহারা উন্নত তাঁহারা বুদ্ধিবিচারের স্তরকে অতিক্রম করিয়া শুধু একাগ্র ও অচঞ্চল ধ্যানের দ্বারা আপনার মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। আর সর্বোচ্চ স্তরের সাধকেরা সদাসর্বদা অন্তরে বাহিরে সর্বত্র পরমাত্মাকে পরিব্যাপ্ত দেখিয়া থাকেন। হিন্দুধর্মে ধর্মসাধনার ব্যাপারে এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ও স্তরের সাধককে ও উপাসককে তাহার ধর্মপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া হয় বলিয়া বহু শত বৎসর হইতে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মমতের অসংখ্য সিদ্ধযোগী ও ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাত্মার অভ্যুদয় হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ভাবে অনুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মসাধনার এই বৈচিত্র্যকে চিরদিনই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং ধর্মসাধনার সকল স্তরের সাধনা ও উপাসনাকে সকল সময়েই তিনি উৎসাহ দিয়াছেন।

তবে একথা একান্ত যুক্তিসঙ্গত এবং অনস্বীকার্য যে, সাধনার পদ্ধতি যাহার যেমনই হউক না কেন, ধর্মের মূলনীতিকে সম্যক অন্তরে পালন না করিলে ধর্মের চরম গন্তব্য স্থলে কেহই কখনও উপনীত হইতে পারে না। সংযম পবিত্রতা সৎচিন্তা, ঈশ্বর-ভাবনা সত্যবাদিতা, দ্বেষহিংসাশূন্যতা, ভক্তি বিবেকিতা প্রভৃতি গুণগুলির সমষ্টিই ধর্মের মূলনীতি। এই মূলনীতিকে বাদ দিয়া ধর্মসাধনার অথবা পারিকতার কোনই অর্থ হয় না। স্বামিজী এইজন্য ধর্মের এই মূলনীতি পালনকে ধর্মসাধনের ব্যাপারে বরাবরই প্রাধান্য দিয়াছেন। অথচ ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, ধার্মিক নামে পরিচয়দানকারী শতকরা নিরানব্বই জন লোকই কাজেকর্তব্যে ধর্মের এই মূলনীতি পালনের ধার দিয়াও কখন যাইতে চান না! তাঁহাদের অধিকাংশই প্রধানতঃ নিজের নিজের সম্প্রদায়গত আচার নিয়ম মতবাদ প্রথা পালপার্বণ ব্রতব্রত পালনেই উৎসাহী। বিশেষ বিশেষ দিনে গঙ্গাদি নদীতে স্নান, অমুক তিথিতে অমুক শাকশব্জী না খাওয়া, উৎসবাদিতে যোগ দিয়া সেখানে গুলতানি করা এবং কতকগুলি অর্থহীন প্রথাকে মানিয়া চলাই সাধারণ নরনারী-ধর্মসাধনার চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন। ইহার ফলে ঋষি-মুনিদের দেশ এই ভারতবর্ষে ধর্মসাধনা এখন প্রাণ-হীন অর্থহীন কতকগুলি অচ্যুত আচার অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য সমগ্র ভারতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধক সিদ্ধপুরুষ ছাড়া ধর্মবিশ্বাসী বলিয়া অভিহিত নরনারীদের মধ্যে ধর্মের নামে যাহা প্রচলিত রহিয়াছে—তাহা আদৌ ধর্ম নয়—তাহা ধর্মের মলিন অবনত ও বিকৃত রূপ মাত্র।

স্বামিজী তাঁহার যোগদৃষ্টির সহায়ে দেখিয়া-ছিলেন—বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে সাত্ত্বিকতার আবরণে ঘোর তামসিকতা এবং ধর্মনিষ্ঠার নামে ধর্মজড়তা ও ধর্মবিকৃতি বিরাজ করিতেছে। সমগ্র ভারতে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের এই বিকৃত অবস্থা দেখিয়া স্বামিজী ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "এইরূপ ধার্মিকতার

ফলে সমস্ত হিন্দুজাতি দেহে মনে প্রাণে ও বুদ্ধিতে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞান-বিমুখ কর্মবিমুখ ধর্মসাধনার ফলে সমস্ত হিন্দুজাতি এখন নির্জীব ভীরু ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভক্তিবাদের নামে এখন হিন্দুজাতি শুধু অন্ধ-আবেগ ভাবপ্রবণতা যুক্তিহীনতা ও আলস্যের শ্রীতিসঘো ক্ষীণবুদ্ধি ভীরু স্নায়ুদুর্বল অলস ও প্রলাপভাষী হইয়া ধ্বংসোন্মুখ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনার কুফলে হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে পৌরুষ আত্মবিশ্বাস সৎসাহস যুক্তিশীলতা ধৈর্য ও চিত্তস্থিরতার গুণগুলি লুপ্তপ্রায় অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। আর তাহা ছাড়াও জ্ঞান ও বিদ্যার ব্যাপক চর্চা না থাকায় হিন্দুসমাজে ধর্মবিশ্বাসী ও ভক্ত বলিয়া পরিচয়-দানকারী অধিকাংশ ব্যক্তিদের ধর্ম ঈশ্বর আত্মা এবং ধর্ম-সাধনার সম্বন্ধে যুক্তিসবল ও পরিষ্কার ধারণা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য স্বামিজী নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়া-ছিলেন, "হিন্দুর ধর্ম এখন ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে। জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ কর্মমার্গ এখন সবই পলায়ন। এখন আছেন ছুৎমার্গ (আতিশয্য ও অস্পৃশ্যতা)।" "এখন হিন্দুর ধর্ম ধ্যান জ্ঞান পবিত্রতা সংযম ভক্তি এসব কিছুই নয়। ধর্ম এখন দাঁড়িয়েছে— লোকাচার দেশাচারে। কতকগুলি গ্রাম্য কুসংস্কারকেই হিন্দুসমাজে শাস্ত্রের সারমর্ম বলিয়া মানা হইতেছে।"

স্বামিজী সেজন্য তাঁহার বক্তৃতা প্রবন্ধ চিঠিপত্র কথোপকথন প্রভৃতির মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজকে জানাইয়া দিয়াছেন—এই সমস্ত কখনই প্রকৃত ধর্ম নয়—এসমস্ত উপধর্ম অপধর্ম এবং এমনকি অধর্ম। দেশে জ্ঞানের সাধনা কর্মের সাধনা মহত্ত্বের সাধনা বীরত্বের সাধনা ও পৌরুষের সাধনা অনেক শত বৎসর না থাকাতে ধর্মের নামে এখন এইসব অযথা অজ্ঞান কুশ্রীতা ও কদর্যতায় দেশ ভরিয়া গিয়াছে। স্বামিজীর মতে যদি গীতা উপনিষদ ও বেদান্তের উপদিষ্ট ধর্ম এদেশে জনসাধারণের দ্বারা প্রতি-পালিত হইত, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ ধর্মের ব্যাপারে আজ এমন অবনত হইত না—তাহা হইলে সমস্ত হিন্দুজাতি আজ এমন দুর্বল ভীরু নির্জীব আত্মবিশ্বাসহীন ও জড়চিত্ত জনসমাজে পরিণত হইত না।

এইজন্যই স্বামিজী বলিয়াছেন, "দুর্বল ভীরু অলস কাপুরুষ ও স্বার্থপরের কখনই ধর্ম হয় না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' The *Self* cannot be realised by the weak. শক্তিমান হও, বীর্যবান হও, সাহসী হও, হৃদয়বান হও, আত্ম-বিশ্বাসী হও—ধর্ম তারপরে আপনিই আসবে। বীর্য মনুষ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রহ্মতেজ—আর এমন একটি মন চাই, যার উপাদানে বজ্র গঠিত হয়।"

স্বামিজীর মতে—এই শক্তিপ্রদ বীর্যপ্রদ ও পৌরুষদায়ক ধর্মলাভের আদর্শের জন্য আমাদিগকে গীতার ধর্মকে পালন করিতে হইবে। স্বামিজী বারবার বলিয়াছেন, "আমাদের মনুষ্যত্ব ও ধর্ম-সাধনার আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথীরূপী মহাশক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে— যাঁহার মুখ হইতে বজ্রনির্ঘোষে উদ্ভূত হইয়াছিল ভগবদ্গীতা। যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতার জীবন্ত মূর্তি ছিলেন—সেই সর্বগুণাধার অমিতশক্তিধর আদর্শ-পুরুষ ও সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অবলম্বনে আমাদের জীবনকে গড়িতে হইবে। সেই শ্রীকৃষ্ণ গীতার কৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। স্বামিজীর মতে ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই আদর্শ হওয়া উচিত—বীরত্ব মহত্ত্ব দিব্যশক্তি ও মানবপ্রেমের মূর্তি,দুর্জননাশী দুষ্কৃতিহারী সেই মহামানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই সম্বন্ধে স্বামিজী নানাস্থানে তাঁহার বক্তৃতায় ও কথাবার্তায় অনেকবার বলিয়াছেন।

Ideal of a Universal Religion বক্তৃতায় স্বামিজী ধর্মের বিশ্বাস ও সাধনার বিভিন্ন দিকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মমতের তিনটি বিভিন্ন অংশ আছে—(১) ইহার দার্শনিক মতবাদ (২) ইহার পৌরাণিক কাহিনী এবং (৩)

ইহার আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি।" নিম্নস্তরের মূর্ত্তি-পূজা, দেবদেবীর উপাসনা, সগুণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা, অবতারবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্তরের অদ্বৈতভাব—ধর্ম্মের সমস্ত ভাবকেই স্বামিজী অনুভূতিগত সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফলেই সত্য বলিয়া স্বীকার ও সমর্থন করিয়াছেন। স্বামিজীর অনুভূতিতে দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত প্রত্যেকটি অবস্থাই সত্য। ইহারা পরস্পরের বিরোধী নয়—বরং —সত্যতত্ত্ব লাভের সাধন-পথে ইহারা উত্তরোত্তর ক্রমিক সোপানমাত্র। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই উপযোগিতা আছে—আর ইহারা স্বরূপতঃ কখনই বিরোধী ও বিভিন্ন বিষয় নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ-দেবের জীবনদৃষ্টান্তে এবং নিজস্ব তপস্যাশক্তির ও অনুভূতির দ্বারা স্বামিজী আসিয়াছিলেন—শুষ্কজ্ঞান ও শুষ্কভক্তি স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন।

স্বামিজীর মতে "আধ্যাত্মিক অনুভূতি কখনই যুক্তিবিরোধী হইতে পারে না। যুক্তিশক্তি (reason) অথবা মননশীলতার (intellect) স্তরকে অতিক্রম করিয়াই মানুষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং ধর্ম্মগত অনুভূতিলাভের সময়েই মানুষের যুক্তিশক্তি ও মননশীলতা পরিপূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করে। কোনও ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছে কি না—তাহার প্রমাণ তাহার উপলব্ধ বিষয়ে যুক্তির সারবত্তা আছে কিনা। যদি না থাকে—তবে তাহা কখনই আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, তাহা উন্মাদের মানসিক বিকার ও জড়তার অসদ্ভূতিপূর্ণতা ও ভ্রান্তিমাত্র।" সেজন্য *Ideal of a Universal Religion* বক্তৃতায় স্বামিজী বলিয়াছেন; "It is reason that develops into inspiration, and therefore inspiration does not contradict reason, but fulfils it. * * * * A fool or a semi-lunatic thinks that the confusion going on in his brain is inspiration, and he wants men to follow him. The most contradictory, irrational nonsense that has been preached in the world, is simply the instinctive jargon of confused lunatic brains, trying to pass for the language of inspiration."

—(A Study of Religion, page 80)

দুঃখের বিষয়, এইসব mental abnormality nervous debility ও শরীরগত অন্যান্য প্রকার বিকৃতিই এখন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙলাদেশে তথাকথিত অনেক আশ্রমের সংশ্লিষ্ট শত শত নর-নারীর মধ্যে ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। দেহ ও মনের ঐ সমস্ত বিকৃতি ও জড়তাই এখন বাঙলাদেশে যুক্তিবিচারহীন ও ভাবপ্রবণ জনসাধারণের মধ্যে 'আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ' ও 'সাত্ত্বিকতার লক্ষণ' বলিয়া সমাদর, উৎসাহ ও প্রশংসা লাভ করিতেছে। আর যে সমস্ত নরনারীদের মধ্যে ঐসব দৈহিক ও মানসিক বিকৃতি ও অস্বাভাবিকতা (abnormality) অত্যন্ত অধিক প্রকাশিত এখন তাহাদিগকে সিদ্ধ মুক্ত ও ভাবসমাধিবান ধর্ম্মাত্মা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির অপব্যয় করা হইতেছে। বর্ত্তমানে বাঙলা-দেশে প্রকৃত ধ্যানযোগী সাধক ও সিদ্ধপুরুষের বদলে এই সমস্ত বিকৃতচিত্ত ব্যক্তিদেরই সমাদর বেশী।

এই সমস্ত তথাকথিত ধর্ম্মবিশ্বাসী ভক্ত ও সাধক ও সিদ্ধ এবং তাহাদের অনুরক্ত নরনারীদের সংখ্যার ক্রমিক আধিক্য স্বামিজীর যোগসিদ্ধ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এইসব তথাকথিত ধার্ম্মিক ও ভক্তদের সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। যেমন :—"আমি বেশ কোরে বুঝে দেখেছি, এদেশে এখন যারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—craked brains অথবা fanatic (মজ্জাগতভাবে দুর্ব্বল বিকৃত মস্তিষ্ক ও বিচারশূন্য, উৎসাহপূর্ণ)। দেশ ঘোর তমোতে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহলোকে দাসত্ব ও পরলোকে নরক।"

—(স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড, দ্বিতীয়াবলী পৃষ্ঠা ১৮)

যাহা হউক, ধর্ম্মের সাধন-পদ্ধতি ও অনুভূতি সম্বন্ধে স্বামিজী তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব :—

"আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ধর্ম্ম। আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন কখনই মুক্তি হয় না। ব্রহ্মচর্য্য পবিত্রতা ও বাসনাকামনা-ত্যাগ ভিন্ন ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তিকে বুঝায়। দুর্ব্বলতা দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবেই তুমি কেবলমাত্র আত্মা। যদি মুক্ত-স্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত। ঈশ্বর তিনিই, যিনি মুক্তস্বভাব হন।

মুক্তি সমাধি এসব কেবল ব্রহ্মপ্রকাশের পথের প্রতিবন্ধকগুলি দূর কোরে দেয় মাত্র। নতুবা আত্মা সূর্য্যের মত সর্ব্বদা জ্বলছেন। অজ্ঞান-মেঘ তাঁকে ঢেকে রেখেছে মাত্র। সেই মেঘ সরিয়ে দেওয়া—আর সূর্য্যেরও প্রকাশ হওয়া—তখনি 'তিষ্ঠতে হৃদয় গ্রন্থি' অবস্থা হয়।

আত্মার স্বরূপের কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত ভাব হচ্ছে। এক আত্মাই (ব্রহ্ম) বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। ইহাই বেদের সার রহস্য।

সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে-ঢাকা সূর্য্যের মত। একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ কেবল—কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ, কোথাও আবরণ একটু তরল।

সর্ব্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ (Personal God) হতে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যষ্টি, আর সকল জীবের সমষ্টি ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল, ঈশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত কোরে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভেতর থেকে project (বাহির) কোরেছেন।

ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্ত্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ ভাগ হয় না। বুঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি স্থিতি লয়াধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র "ঈশ্বর" ব'লে নির্দ্দেশ কোরেছে। কূটস্থ অপর ত্রিপাদ—যাতে কোনরূপ দ্বৈতকল্পনার স্থান নেই—তাই ব্রহ্ম।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন—তা নয়, ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয়নি। অদ্বৈতবাদী বলেন, নাম রূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা বলে যখন মনের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন বোধ হয়—আমিই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ প্রত্যক্‌চৈতন্য বা ব্রহ্ম।

জীবের স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম। ধ্যানধারণায় নামরূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর সারমর্ম্ম। বেদবেদান্ত শাস্ত্রমাত্র এই কথাই নানারকমে বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ভক্তিমার্গ—Slow process, দেরীতে ফল হয় কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন। হয়ত বিভূতি পথে (miracle) মন চ'লে গেল। আর স্বরূপে পৌঁছুতে পারলে না। একমাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ এবং সর্ব্বমত-সংস্থাপক ব'লে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সমাদৃত। এবে বিচারপথে চলতে চলতে মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। বিচার ও ধ্যানবলে উদ্বেদ্য বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে Goal-এ (গন্তব্য স্থানে) ঠিক পৌঁছানো যায়। ইহাই আমার মতে সহজপন্থা ও আশুফলপ্রদ।

ঈশ্বরে অকপট ও অবিচ্ছিন্ন অনুরাগই ভক্তি। প্রীতি ইহার আদি মধ্য ও অন্ত। ঈশ্বরে নিঃস্বার্থ অকপট ও অবিরত প্রীতিই ভক্তিসাধনের প্রধান উপায়। কোনরূপ স্বার্থবাসনা অথবা প্রতিদান না চাহিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বদা ভগবানকে ভাল-বাসাই যথার্থ ভক্তির লক্ষণ।

গৌণজ্ঞান ও গৌণভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে—ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্ব্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্ব্বত্র দর্শন, তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি থাকতে হবার যো নেই।

প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যাঁর হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিদ্যমান—আর যিনি সর্ব্বাবস্থাতে অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভক্ত যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভেদভাবে উপলব্ধি কোরে অন্তরে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন এবং সবাইকেই ভালবাসেন, সকলের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যিনি একটির পক্ষপাতী —তিনি জ্ঞানীও নন, ভক্তও নন—তিনি জুয়াচোর।

পূর্ণপ্রজ্ঞ না হ'লে কারও প্রেমানুভূতি হয় না। কোনও বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। তৈলধারাবৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনে যখন ঈশ্বরীয় চিন্তার ধারা অবিশ্রান্ত বয়ে যায় তখন তাকে ধ্যান বলে। 'সমাধি' অর্থে জীব ও ব্রহ্মের সমত্ব উপলব্ধি বুঝায়।

যাঁহার ভিতর হইতে ধর্ম্মের শক্তি সঞ্চারিত হয় তিনিই গুরু আর যাঁহার মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চারিত হয় তিনিই শিষ্য। যিনি বেদার্থদ্রষ্টা নিষ্পাপ কামগন্ধহীন ও ব্রহ্মবিদ্ তিনিই গুরু।

মূর্ত্তিপূজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মুক্তি হইতে পারে না—তবে মূর্ত্তিপূজা মুক্তিলাভের গৌণকারণস্বরূপ, ঐ পথের সহায়ক। মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ অনেকের পক্ষে উহা অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া দেয়। ঐ অদ্বৈতজ্ঞান লাভেই মানব মুক্ত হইতে পারে।

—(স্বামি-শিষ্য-সংবাদ)

আমাদের এখন দেখতে হবে—এই সকল জপ পূজাদির যেই (আরম্ভ) কোথায়? সেই যেই হচ্ছে শ্রদ্ধা। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে কোন তত্ত্ব হোক না, ভাবতে থাকলে দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে ও সচ্চিদানন্দস্বরূপের ইতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞানশাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছে।

যে কোনো ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানে তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বরপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ; ক্রমশঃ পশুপদবীতে উপনীত হইতেছ।

সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধ্যান মধ্যম। স্তুতি ও জপ অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম। বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও, উহাতে কোন পাপ নাই। যে যাহা পারে, তাহার তাহাই করা উচিত। এই হেতু যে প্রতিমা-পূজা করিতেছে, তাহার নিন্দা করা উচিত নয়।

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে (Personal God) উপাসনা না করিলে চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রীপুত্র পিতামাতা বন্ধু গুরু বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করিতেই হইবে। অতএব আমাদের ভগবানের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতঃই মানুষী (anthropomorphic conception of God)। সত্য সত্যই, 'এই মানবশরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির।' সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে (অবতারপুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ বা সাধনসিদ্ধ সদ্‌গুরুরূপী) কোনও মানুষের উপাসনা করিতেছে।

শাস্ত্রেই বা এত অধিকার নির্দ্দেশের হাঙ্গামা কেন? সবই truth (সত্য), তবে relative truth different in degrees (আপেক্ষিক সত্য এবং ইহাদের প্রভেদ পরিমাণগত)। মানুষ যা কিছু সত্য ব'লে জানে,

সে সকলই ঐরূপ। কোন্‌টি অল্প সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য। নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান। এই আত্মা জড়ের ভিতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন। 'জীব' নামধারী মানুষের ভিতরে তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (জাগরিত)' রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই superconscious stage-এ —অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে রয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে—যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না—অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌।"

—(স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, উত্তরকাণ্ড)

জীবনের ধারা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠ

পৃথিবীতে তৃণ, বৃক্ষ ও মানব এই তিন প্রকার জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহার চৈতন্য ব্যাপকভাবে প্রকাশমান। এই চৈতন্য ব্যাপকভাবে প্রকাশিত থাকিবার জন্যই মানুষ ভোগের প্রতি আসক্ত, এই ভোগস্পৃহা অনন্ত। টাকা, পয়সা, মান, মর্য্যাদা ইত্যাদি জাগতিক ভোগের একটা সীমা আছে অর্থাৎ এইসব ভোগ সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র ভগবানই অনন্ত, সুতরাং অনন্ত জিনিষেই মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে। এই ভোগাকাঙ্ক্ষা কেবল মনুষ্য-জীবনেই প্রবল। তবে মানবাকারে যাহারা পশু অপেক্ষা নীচ, তাহাদের এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় না, কারণ তাহাদের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই।

আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন এই চারিটি মনুষ্য ও পশু উভয়েরই তুল্য। কিন্তু মানবের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, এইজন্যই মানব শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে ভগবানে ভক্তি বা বিশ্বাস আসা সম্ভব হয় না। ভগবানকে লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে একমাত্র মানুষই তাঁহাকে পাইতে পারে।

প্রকৃতির অনুকূলে চলাকে ধর্ম্ম, এবং প্রকৃতির প্রতিকূলে চলাকে অধর্ম্ম বলা হয়। এই উভয়বিধ গতির সংমিশ্রণেই মানুষ। মানুষ ব্যতীত অপরাপর জীবের ভোগের একটা সীমা আছে, কারণ তাহাদের চৈতন্য ব্যাপকভাবে বিকশিত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য ভিন্ন অপরাপর প্রাণীর ভোগস্পৃহা বহির্জগতে সীমাবদ্ধ। মানুষের ভোগের সীমা নাই। এই অনন্ত ভোগের অভিলাষী হইতেছে একমাত্র মানুষ এবং ঐ প্রকার কামনার বশবর্ত্তী বলিয়াই মানুষ ভোগের দ্বারা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। এই তৃপ্তি লাভের জন্য মানুষ ভগবানকে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তবে প্রকৃত মানুষ হইলে তবেই ভগবানকে খুঁজিবার স্পৃহা জাগিবে, অন্যথায় নহে। মানুষ ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টার দ্বারা ধর্ম্ম-সাধনার মাধ্যমে সত্যিকারের অনুরক্ত আনন্দলাভ করিতে পারে। তবে মন হইতেছে ইহার অন্তরায়। মানুষের দশ ইন্দ্রিয় স্বাধীনভাবে পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করিতে অসমর্থ। মন উহাদিগকে পরিচালিত করিয়া থাকে। অতএব এই মনকে যদি আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারা যায় তাহা হইলে সর্ব্ববিধ অন্তরায়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

আত্মা মনের বাহিরে এবং সে নির্লিপ্ত। মন ও আত্মা পরস্পরের অভেদ সম্বন্ধ। একের অবর্ত্তমানে অপরে থাকিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আত্মা হইতেই মনের উৎপত্তি। এই মন মস্তিষ্করূপে স্থূল আধারের আশ্রয়ে থাকিতে না পারিলে, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আত্মা ভগবানের অংশ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় আত্মার সমষ্টিকে ভগবান বলা যাইতে পারে।

চৈতন্যের আর এক নাম পুরুষ এবং আত্মাকে যে গুণান্বিত করে তাহারই নাম প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত নাম ব্রহ্ম। পুরুষ ও প্রকৃতিকে কেহ পৃথক করিতে পারে না, কারণ প্রকৃতি মানুষের শক্তিবিশেষ এবং পুরুষও প্রকৃতির শক্তিবিশেষ। সুতরাং যাঁহার জন্য যিনি শক্তিমান, তাঁহার শক্তি তাঁহার নিকট হইতে কি পৃথক করা সম্ভব? অতএব পুরুষ যে স্থানে থাকিবে প্রকৃতিও সেই স্থানে থাকিবে। প্রকৃতি পুরুষের সৃষ্টি নয়; পুরুষও প্রকৃতির সৃষ্টি নহে।

মন বা অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম, ইহা ভিন্ন সমস্তই স্থূল। মনের ধর্ম্মই হইতেছে ভাবনা বা চিন্তা করা। এই চিন্তা দ্বারাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মানুষের মনের অহং তত্ত্বটাই কাজ করে এবং এই তত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাজ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মের স্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই স্বাধীন, অর্থাৎ কেহ কাহারও অধীন নয়। "প্রকৃতি করায় কর্ম্ম, কি দোষ আমার", এখানে প্রকৃতি মানে স্বভাব। প্রকৃতি একটা শক্তিবিশেষ, ইহার কাজ হইল পুরুষকে গুণান্বিত করা। দর্শন-শাস্ত্রে গুণ শব্দের অর্থ হইল বাঁধিবার দড়ি। প্রকৃতি পুরুষকে দড়ির দ্বারা বন্ধন করিয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী চালনা করে, অপরপক্ষে পুরুষ প্রকৃতিকে ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে অক্ষম।

ব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। এই বিবিধ গুণের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারা পরিচালিত। পুরুষ যেখানে প্রকৃতির গুণে গুণান্বিত, সেখানে সগুণ ব্রহ্ম কাজ করিতেছে এবং পুরুষ যেখানে প্রকৃতির গুণে গুণান্বিত নয়, সেখানে নির্গুণ ব্রহ্ম কাজ করিতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। পুরুষ যখনই প্রকৃতির গুণে গুণান্বিত ও প্রকৃতি পুরুষের গুণে গুণান্বিত হয় তখনই সৃষ্টির উৎপত্তি অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম কাজ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে পুরুষ প্রকৃতির গুণে গুণান্বিত না হইলে এবং প্রকৃতি পুরুষের গুণে গুণান্বিত না হইলে সৃষ্টির উৎপত্তি হয় না; অর্থাৎ তখন নির্গুণ ব্রহ্ম কাজ করিতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মেই ভগবান বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, মঙ্গলময় ও জ্যোতির্ম্ময়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পুরুষ ও প্রকৃতি সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের অধিকারী। পুরুষ ও প্রকৃতি জীবনের প্রারম্ভে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মেই অবস্থান করে। কালের প্রভাবে প্রকৃতির গুণে পুরুষ গুণান্বিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পুরুষ ও প্রকৃতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে চলিয়া যায় ও পরস্পর পরস্পরের গুণে মুগ্ধ হওয়ায় সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার কালের প্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি স্থূল হইতে যখন সূক্ষ্মে চলিয়া যায় তখন পরস্পর পরস্পরকে গুণান্বিত করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কালের প্রভাবেই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে ও পুনরায় স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যায়। কালের এই পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র মানুষের উপরই সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং কালই এই পরিবর্ত্তনের মূল। এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গমনাগমন না করিলে কোন মানুষকে বলিতে পারা যায় না যে, তিনি ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করিলেন। স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই উভয়বিধ অবস্থা যাহারা ভোগ করেন নাই তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পুরাণে দেখা যায় যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার ভোগই প্রচলিত ছিল এবং যে সমস্ত মানুষ এই উভয়বিধ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেন সমাজে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হইতেন ও সেই সমস্ত মানুষকে ঋষি বলা হইত।

ভগবান স্বয়ং গুণযুক্ত পুরুষ। গুণযুক্ত হইলেই সৃষ্টির উৎপত্তি এবং এই উৎপত্তি হয় সগুণ ব্রহ্ম হইতে। ব্রহ্ম নিজ দেহ হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টির যাহা কিছু তৎসমস্তই ভগবানের অংশ হইতে সমুদ্ভূত একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

প্রকৃতির ইচ্ছায় পুরুষই সৃষ্টিতে রূপদান করিয়াছে এবং প্রকৃতি তাহাকে যেভাবে চালনা করে সে সেইভাবে চলিয়া থাকে। সৃষ্টির সমস্তই চৈতন্যযুক্ত সুতরাং বর্ত্তমান মতানুসারে জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই। যে পুরুষে প্রকৃতির প্রভাব যত বেশী সে পুরুষ তত স্থূল ভাবাপন্ন এবং প্রকৃতির প্রভাব যাহার উপর যত কম সে তত সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন। এই নিয়মে পুরুষের প্রভাবও প্রকৃতির উপর বর্ত্তমান। সৃষ্টি পুরুষের দেহ হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে গুণান্বিত হইয়া পুরুষ নিজ দেহ হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন করে। সৃষ্টি সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা ও সেই কল্পনার রূপ হইল সৃষ্টি। চিত্তের কল্পনানুযায়ী সৃষ্টিরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। মানুষ যাহা একবার দেখিয়াছে কল্পনাদ্বারা তাহা পুনরায় দেখিতে পায়। চিন্তার সময় কল্পনাকে বাস্তব বলিয়া মনে হয়, আর যখন কল্পনা বা চিন্তার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষরূপ পরিগ্রহ না করে তখন উহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বলিয়া মনে হয়। কল্পনার সাহায্যেই অতীত দেবতার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। মনুষ্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং মানুষই হইল কল্পনাধারার চরম উৎকর্ষ।

সৃষ্টির গতি হইতেছে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্ম। প্রথমে সগুণ ব্রহ্ম ছিল বদ্ধ, পরে সাধনা দ্বারা হইল মুক্ত পুরুষ। ব্রহ্ম যদি সাধনা দ্বারা মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি সাধনা দ্বারা যে পরস্পর মুক্ত হইতে পারে তাহার কোন ভুল নাই। সাধনা-পথের অন্তরায় হইল মন। আর আমি আমার মনের একটা রূপ মাত্র অর্থাৎ আমাকে নিয়া তৈয়ারী হইয়াছে আমার মন। দেহটি আমার (আত্মার) আশ্রয় মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা ভগবানের অংশ, অতএব আত্মাই যে ভগবান সে বিষয়ে কোন ভুল নাই—আর তাঁহার স্বরূপ হইলেন নির্গুণ ব্রহ্ম। আমি আমার আত্মার রূপান্তর মাত্র। আমার আমিত্ববোধই মানুষকে ভগবান হইতে দূরে রাখিয়াছে।

আত্মা কোন কাজ করে না, এবং সে কর্ম্মের কোন ফলও ভোগ করে না। আত্মা মানব-শরীরে শুধু সাক্ষী বা দর্শক হিসাবে আছে। মানুষ কর্ম্মানুসারে ভাল, মন্দ ফল ভোগ করিয়া থাকে। মন কাজ করে, সুতরাং ফল ভোগও করে মন।

কর্ম্মফল ভোগ প্রকৃতির বিধান ইহা অখণ্ডনীয়।

আত্মা দুই প্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বদ্ধ আত্মা সাধনার দ্বারা মুক্ত হইতে পারে। এই প্রকার মুক্ত আত্মার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কারণ মুক্ত আত্মার সহিত মনও মুক্ত হইয়া থাকে। তবে এরূপ আত্মা খুব বিরল। বদ্ধ আত্মাই জগৎ রক্ষা করিতেছে, সমস্ত আত্মা মুক্ত হইয়া গেলে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হইত। এই প্রকার বদ্ধ আত্মার উপর প্রকৃতির প্রভাব নিয়ত বর্ত্তমান, আর যতদিন ঐ প্রকার থাকে ততদিন মনেরও মৃত্যু হয় না; মনের যখন মৃত্যু হয় না তখন সে কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে।

মন মস্তিষ্করূপে স্থূল আধারকে আশ্রয় না করিলে কোন কাজই করিতে পারে না। মন মস্তিষ্করূপ স্থূল আধার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করে। সুতরাং মৃত্যুর পর কর্ম্মফল ভোগ বাকী থাকিলে আত্মা ও মনকে নূতন আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয় এবং তাহারই ফলে লইতে হয় পুনর্জ্জন্ম। মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে বা নরকে গমন করে এ ধারণা ভুল। মৃত্যুর পর যতদিন পুনর্জ্জন্ম না হয় ততদিন তাহাকে কোন স্থানে আশ্রয় নিতে হয় ও সেই আশ্রয়স্থানকে স্বর্গ বা নরক বলিয়া কল্পনা করা হয়। তবে সপ্তলোক বলিয়া যে স্থানগুলি অর্থাৎ নক্ষত্র আছে ঐ সব স্থানে লোক থাকিলে তাহারাও নিশ্চয়ই মরণশীল। তবে মৃত্যুর পর তাহারা ঐ সব স্থানেই পুনরায়

জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, তবে মুক্ত-আত্মা এখান হইতে মুক্ত হইয়া অন্তস্তরে গমন করে ও ও ক্রমশঃ নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উন্নত হয় কিন্তু ঐসব আত্মা এখানে আর ফিরিয়া আসে না। মনে রাখিতে হইবে মন কখনও বৃদ্ধ হয় না। মানুষের জন্য স্বর্গ বা নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। এই পৃথিবীতে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বর্ত্তমান। নিজ কর্ম্মানুযায়ী এইখানেই জীবের সুখ বা দুঃখভোগ হইয়া থাকে। যখন সুফল ভোগ হয় তখন স্বর্গ ও যখন মানুষ সুফল বা দুঃখ ভোগ করে তখন নরক ভোগ হইতেছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। স্বর্গসুখ বা নরক-যন্ত্রণা ভোগ, উভয় ক্ষেত্রেই জন্মগ্রহণ অপরিহার্য্য। যেখানে কর্ম্মফলভোগের উপযুক্ত ক্ষেত্র মিলিবে সেইখানেই মানুষের পুনর্জ্জন্ম হইবে। প্রকৃতিই জীবের কর্ম্মফলভোগের ক্ষেত্র খুঁজিয়া দেয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যায় না ততক্ষণ পুনর্জ্জন্ম হয় না। কর্ম্মফল ভোগ করাকেই ভাগ্য বা অদৃষ্ট বলা হইয়া থাকে। ঐ অদৃষ্ট লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ভাগ্য বা অদৃষ্টের জন্য ভগবান দায়ী নন, আমরা নিজেরাই সে জন্য দায়ী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সৎকার্য্যের জন্য সুফল আর কুকর্ম্মের জন্য কুফল ভোগ করিতে হয়। প্রকৃতির এই বিধান কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

কর্ম্ম মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত—বিদ্যামায়া এবং অবিদ্যামায়া। সৎকর্ম্মকে বিদ্যামায়া, আর অসৎকর্ম্মকে অবিদ্যামায়া বলা হয়।

এই কর্ম্মানুযায়ী মানুষ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) উত্তম পুরুষ :—

মানুষের মধ্যে যিনি প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলেন ও আত্মার উন্নতি হইতে পারে এরূপ কাজ করেন তিনি উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষই প্রকৃত মানুষ, যেহেতু তিনি সকল জীবের ইচ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ একমাত্র তিনিই মানবের ধর্ম্ম পালন করেন।

(২) মধ্যম পুরুষ :—

পশুগণ মাত্র প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলে, তাহাদের চৈতন্য ব্যাপকভাবে বিকশিত নয় বলিয়া তাহারা তাহাদের আত্মার উন্নতির জন্য কোন কাজ করে না। এখন মানুষ হইলেও মধ্যম পুরুষ পর্য্যায়ের ব্যক্তিরা তাঁহাদের চৈতন্য ব্যাপকভাবে বিকশিত থাকা সত্ত্বেও আত্মার উন্নতির জন্য কোন কাজ করেন না, কেবলমাত্র প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া থাকেন সুতরাং মধ্যম পুরুষ পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে পশুবৎ বলিলে ভুল হইবে না।

(৩) অধম ও অধমাধম পুরুষ :—

অধম ও অধমাধম ব্যক্তিগণ পশুদের অপেক্ষা নীচ। পশুগণ আত্মার উন্নতির জন্য কোন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলে বলিয়া সময়ে তাহাদের আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। অধম ও অধমাধম ব্যক্তিগণ প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলে না পরন্তু আত্মার যাহাতে অবনতি ঘটে ঐরূপ দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং অধম ও অধমাধম মানুষ পশু অপেক্ষা যে নীচ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রহশান্তি বা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করান যায় না। কথিত আছে—

"যদভাবি ন তদ্ভাবি,
ভাবি চেন্ন তদন্যথা"

অর্থাৎ, যাহা হইবার নয় তাহা কখনও হইবে না এবং যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। প্রহশান্তির দ্বারা কর্ম্মফল-ভোগের সময়টাকে শুধু বদলান যায়। কুকাজ করিয়া তাহার বদলে সুকাজ করিলে, কুকাজের ফল কুফলটাকে এড়ানো যায় না। কুকাজের জন্য অবশ্য পৃথক ফল ভোগ করিতে হইবে। একই জীবনে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার ফল ভোগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমাদের কর্ম্মফল ভোগের জন্য ভগবান দায়ী নন; এ বিষয়ে আমরা নিজেরাই দায়ী।

প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। অনেকের ধারণা যে, প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কর্ম্মফল পরিবর্ত্তন হইতে পারে ; হয়ত প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ দুষ্কর্ম্ম-সম্ভূত দুফলকে সুফল করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ধারণা ভুল বলিয়া মনে হয়, কারণ বিধাতা তাঁহার সৃষ্ট বিধানকে ভঙ্গ করিতে পারেন না। কর্ম্মফল-ভোগ জীবের মঙ্গলের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা না হইলে মানুষের পরিবর্ত্তন ঘটিত না। কর্ম্মফল-ভোগই মানুষের পরিবর্ত্তন আনয়ন করে।

মুক্তির জন্য যত্ন বা চেষ্টার নামেই সাধনা। প্রাণি-গণের মধ্যে মাত্র মানুষই মুক্তিলাভের জন্য সাধনা করিয়া থাকে। অনন্ত প্রকৃতির সহিত অণুচৈতন্যের যুদ্ধকেই সাধনা বলে। প্রকৃতির প্রভাব যেখানে প্রবল সেখানে চঞ্চলতাও বেশী, আবার প্রকৃতির প্রভাবও যেখানে কম সেখানে চঞ্চলতাও কম। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের বুদ্ধি হইতে চিত্তের চঞ্চলতা বেশী। চিত্তের চঞ্চলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় হইল সাধনা। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সাধনার দ্বারা চিত্তকে সংযত করিয়া একাগ্র বা একমুখী করিতে পারিলে তবেই সাধক প্রকৃত শক্তির অধিকারী হইতে পারেন। প্রকৃতিকে বশীভূত করা অতীব দুরূহ। যেখানে প্রকৃতি পুরুষের গুণে গুণান্বিত সেই স্থলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। অর্জ্জিত শক্তি ব্যবহার করার অর্থ হইল, শক্তির অপব্যয় করা। ক্রমশঃ অপব্যয় করিবার ফলে শক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে যেহেতু ভগবান ঐ প্রকার অপব্যবহারে তুষ্ট নন। শক্তি দুষ্কার্য্যে ব্যবহার করিলে মানুষের নৈতিক ও ধর্ম্মগত পতন হইয়া থাকে। মনই সকল কার্য্যের প্রযোজক। অতএব মনকে সংযত করিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। মন বা চিত্তকে সংযত করিতে না পারিলে সাধনা ও ভজন ব্যর্থ হয়। যিনি সাধনার পথ-প্রদর্শক তাঁহাকেই আমরা গুরু বলিয়া থাকি। নররূপে গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান। অকৃতকোন ব্যক্তি কখনও মানুষের ধর্ম্মসাধনার গুরু হইতে পারে না। তপস্যাসিদ্ধ সিদ্ধমুক্ত পুরুষ ভিন্ন ধর্ম্মসাধনায় সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীকে গুরু করিলে—ধর্ম্মসাধনার সঠিক উপায় ও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। অতএব কেবলমাত্র মুক্ত পুরুষই গুরু হইবার উপযুক্ত। সাধনা না করিয়া কেবল গুরুর উপর ভরসা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কোনই ফল হইবে না। সাধনা নিজেকেই করিতে হইবে এবং সাধনার ব্যাপারে অপরের সাহায্যে কোন কাজ হয় না। সাধনার পথে বাধা বিঘ্ন আসাটা স্বাভাবিক, যেহেতু সাধনা একপ্রকার যুদ্ধ বিশেষ (অণুচৈতন্যের সহিত)। সাধনার পথে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সাধকের মঙ্গলই হইয়া থাকে। উহাতে তাঁহার সংযম ও ধৈর্য্যশীলতার পরীক্ষা হইয়া যায় এবং উক্ত প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিলেই তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

সাধারণ মানুষ প্রধানতঃ মনে করে যে, সন্ন্যাসী হইলে এবং স্ত্রীলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সাধনা হয় না। এরূপও কথিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য-পালন ব্যতীত সাধনা করা যায় না। অতএব সাধককে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন তিনিই ব্রহ্মচারী পদবাচ্য, ব্রহ্মচারী হইল সাধনার ফল। সাধনা ব্যতিরেকে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না। মন হইল ব্রহ্মচারী হইবার পথে অন্তরায়। অতএব সাধনা দ্বারা ভোগবাসনা ও মনকে জয় করিতে পারিলে সংসারত্যাগী না হইয়াও ব্রহ্মচারী হওয়া যায়। কিন্তু সংসারের পরিবেশে থাকিয়া এইভাবে মোহজয়ী হইয়া ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাধারণ শক্তিমান সাধকদের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অসাধারণ শক্তিমান ও একান্ত শুদ্ধচিত্ত সাধকের পক্ষেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে সাধনা সহজসাধ্য এবং তাহাতে বাধাবিঘ্ন কম, কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া

সংযত চিত্তে সাধনা করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাধক বা মুক্তপুরুষ। সাধনার জন্য আসক্তিক ভোগের জিনিষ জোর পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না। সাধনা দ্বারা আপনা হইতেই ভোগের বাসনা হ্রাস পাইয়া থাকে।

পুরুষ যেদিন নিজেকে প্রকৃতি জ্ঞানে দেখিবে এবং প্রকৃতি যেদিন নিজেকে পুরুষ জ্ঞানে দেখিতে পারিবে সেইদিনই মোক্ষলাভ হইবে। পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রই এই সংসার। এখানে সামঞ্জস্যভাবে লীলা করাটাই আনন্দদায়ক। সংসারে নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত চিত্তে সং সাজিয়া থাকিতে পারিলেই শান্তি পাওয়া যায়। এই শান্তি লাভ করিতে পারিলে প্রকৃষ্টতর শান্তির পথ সুগম হইয়া থাকে।

বেদ ও বিজ্ঞান

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

সত্য দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বেদ" বলা যায়।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রকৃত শিক্ষক কে?

কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য, যিনি অনায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজ আত্মা শিষ্যের আত্মায় সংক্রান্তিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব

মন্মথলাল বাগচি

কামারপুকুর গ্রাম পশ্চিম বাঙলায়
অবস্থিত অতিদূরে।
নগরের কোলাহল জনতার রোল
নাহি সেথা একেবারে।
আছে সেথা অবারিত সুবিস্তৃত মাঠ
সবুজ গাছের সারি
ঘেরে আছে আকাশের উদার নীলিমা।
মাঝে মাঝে কুটিরের শ্রেণী
শিবের মন্দির আর অল্প দেবালয়।
জলভরা সরোবর দীঘি।
উন্মুক্ত মাঠের পাশে—
বয়ে যায় ধীরে ধীরে আমোদর নদ
আঁকা-বাঁকা গতি তার, স্রোত অতিক্ষীণ।

• • • •

এই গ্রামে বহু বর্ষ আগে
ক্ষুদিরাম চট্টমনি ব্রাহ্মণ-সন্ততী
সদাচারী সত্যনিষ্ঠ ভক্তিনিষ্ঠাময়
সামান্য কুটিরবাসী
অতীব সরল শুদ্ধ সহজ জীবন।
একদিন তাঁহাদের ঘরে
ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ায়
জন্মলভিল শিশু এক সুন্দর সুঠাম
সুকুমার সৌম্য কান্তি
আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব তার অঙ্গের লক্ষণ।
বাল্য হতে প্রকাশিল বিবিধপ্রকারে
অপরূপ বর্ম্মভাব।
ঐশ্বরিক ভাবাবেশে সেই শিশু
হয়ে যেতো বারেবারে বিভোর তন্ময়।
কেবা এ অদ্ভুত শিশু?
কী বিচিত্র চরিত্র তাহার!
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে বালকের বেশে
যে বিরাজে—কী এক অপূর্ব্ব ভাবে,
কে জানাবে কিবা তার সত্য পরিচয়?
তারপরে একে একে গেছে চ'লে
কত মাস কত বর্ষ সময়ের স্রোতে
আজি তাঁরে জানে সবে
যুগ-অবতার তিনি
বিশ্বধর্ম্মমূর্ত্তিধারী—রামকৃষ্ণ নামে।

• • •

জাহ্নবীর পূর্ব্বকূলে
একদা নির্জ্জন গ্রাম যে দক্ষিণেশ্বর
সেইখানে শ্যাম-শ্যামা-শিবের মন্দির
অশথ বটের তলে
সমুন্নত চক্রাকার বেদী
বিবিধ বিটপীময় ছায়া সুনিবিড়
সুপবিত্র পঞ্চবটী সাধন-কানন।
সেইখানে সমাসীন মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়
ভগবদ্ভক্ত রামকৃষ্ণ যুগ-অবতার
নরেন্দ্র রাখাল কালী হরি বাবুরাম
যোগেন শরৎ শশী লাটু নিরঞ্জন
তারক সারদা আদি সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁর।
যুগধর্ম্মস্থাপনায় রামকৃষ্ণ প্রভু
বিরাজিত সেথা নিজ অন্তরঙ্গ সনে।

• • • •

ধর্ম্মের সমগ্র ভাব প্রকৃত আকার
আপনার শক্তিবলে করি উজ্জীবিত
আনালেন আরবার রামকৃষ্ণদেব
যুগধর্ম্ম সাধন-বিধান।
আনিলে নবযুগ ধর্ম্ম-ইতিহাসে।
আজ তাঁর পুণ্য নাম জীবন-কাহিনী
সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-অনুকৃতি-বাণী
প্রচারিত পরিচিত
পৃথিবীর নানাস্থানে নগরে নগরে।
নানাদেশ অধিবাসী কত নরনারী
অনুরক্ত তাঁর প্রতি আজ
সবে তাঁরে ভক্তিভরে করিছে বন্দন।
জাতিধর্ম্ম সম্প্রদায় কোন ভেদ নাই
যে এসেছে আকুল অন্তরে
রামকৃষ্ণ প্রেমময় করুণা-আধার
দিয়েছেন তাঁহারে আশ্রয়।
আজ তাঁর জন্মদিনে সকলের সনে
আমিও সমগ্রচিত্তে সে মহামানবে
প্রণিপাত করি ভক্তিভরে
যাচি তাঁর প্রসন্নতা আশীষ অভয়।

ফাল্গুন ত্রয়োদশীয়া ১৩৬২

পূজ্যপাদ শ্রীঅভেদানন্দ মহারাজের প্রশ্নোত্তর

[১৯২৩ জুলাই হইতে ১৯২৪ জুন পর্যন্ত কলিকাতায় ১১নম্বর ইডেন হসপিটাল রোডে (সেন্ট্রাল য়্যাভিনিউ-এর উপরে) ভাড়াটিয়া বাড়ীতে "শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি" অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সমিতির হলঘরে শ্রোতাদের নিকটে বুধবারে রাজযোগ, শুক্রবারে গীতা এবং রবিবারে বেদান্ত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিতেন। স্বামিজীর ক্লাস-লেকচারের পরে শ্রোতারা অথবা তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যরা তাঁহাকে ধর্মসম্বন্ধে প্রায়ই প্রশ্ন করিতেন। স্বামিজী ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সেইসব প্রশ্নোত্তরের কতকগুলি এখানে সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইল।

—ইতি সম্পাদক, বিশ্ববাণী]

রবিবারে (২৬শে আগষ্ট, ১৯২৩) স্বামিজীর বেদান্ত সম্বন্ধে ক্লাস-লেকচার শেষ হবার পরে একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন কোরলেন :—মহারাজ! 'বেদান্ত' শব্দের মানে কি?

স্বামিজী :— 'বেদান্ত' বলতে সাধারণতঃ ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয়। ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্ত শাস্ত্র বেদব্যাসের রচনা। উপনিষদের সমস্ত মন্ত্রের সার compile (সঙ্কলন) কোরে বেদব্যাস যে-সমস্ত সূত্র রচনা কোরে-ছিলেন—তাদের সমষ্টিকেই 'বেদান্ত' বলে। বেদান্ত শাস্ত্র একাধারে দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম-সাধনা দুই বিষয়েরই নির্দ্দেশ দেয়।

তবে আসলে 'বেদান্ত' বলতে বিশেষ কোনো 'শাস্ত্র' বা মতবাদকে বোঝায় না। 'বেদ' মানে জ্ঞান, আর 'অন্ত' মানে 'শেষ'। অর্থাৎ, জ্ঞানের যা চরম পরিণতি তাই হলো 'বেদান্ত'। Vedanta in its truest sense of the term signifies that knowledge which is absolute infinite and eternal.

অন্য একজন ব্যক্তির প্রশ্ন :—মহারাজ! 'জ্ঞানের চরম পরিণতি' বলতে কি বলে?

স্বামিজী :—'জ্ঞানের চরম পরিণতি' মানে—যে জ্ঞানের প্রকাশে আর কোনও জ্ঞানের দরকার হয় না, সমস্ত জ্ঞান যে জ্ঞানে সম্পূর্ণতা লাভ করে, যা সমস্ত জ্ঞানের eternal source and found-ation (চিরন্তন উৎস ও ভিত্তি) সেই perfect and complete knowledgeই (সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান) হলো বেদান্ত।

এই চরম ও পূর্ণ জ্ঞানই হলো সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞানের চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নেই। এই জ্ঞানই হচ্ছে অনন্ত জ্ঞান। অন্য সমস্ত জ্ঞান partial and incomplete (আংশিক ও অসম্পূর্ণ)। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হচ্ছে চরম ও পরিপূর্ণ জ্ঞান।

Art, Science, Philosophy (শিল্প, বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র) বা যে কোনও বিষয়ের জ্ঞানই বলো—সব জ্ঞানই imperfect (অসম্পূর্ণ)। তা-ছাড়া ঐ সমস্ত জ্ঞান এক একটা খণ্ড বিষয়কে নিয়ে আছে। তাদের field (ক্ষেত্র) limited (সীমাবদ্ধ)। আর Science-এরও (বিজ্ঞানেরও) নানারকম ভাগ আছে। Physics, Chemistry, Astronomy, Geology, Physiology, Anatomy (পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান) এই রকম আরো কত রকম।

Science-এর (বিজ্ঞানের) কোন ভাগই independent (স্বাধীন) নয়। এদের মধ্যে এমন কতকগুলো ভাগ আছে, যার decision যা

discovery (সিদ্ধান্ত বা আবিষ্কার) অন্য কতক-গুলো বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বা fact-এর (তথ্যের) ওপরে depend (নির্ভর) করে। এইজন্যে Science-এর (বিজ্ঞানে) মাধ্যমে যে-সব সত্য আবিষ্কার করা হয় সে সত্য absolute (নিরপেক্ষ) নয়, সে সত্য relative (আপেক্ষিক) ও inter-dependent truth (পরস্পরে নির্ভরশীল সত্য)।

প্রশ্ন :—Science তো অন্য বস্তু নিয়ে থাকে। ধর্মের ব্যাপারে Science-এর কি দরকার ?

স্বামিজী :—সাধারণতঃ science বলতে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সম্বন্ধে নানারকম পদার্থ ও নিয়মকে discovery, interpret ও analyse (আবিষ্কার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা) বোঝায়। কিন্তু আসলে Science বা বিজ্ঞান মানে—to seek, find out and interpret the truth through a systematic process of reason and analysis. Science always seeks to systematize any nature of knowledge, be it either secular intellectual or spiritual (যথাযথ যুক্তির পদ্ধতির সঙ্গে বিশ্লেষণ কোরে সত্যকে অন্বেষণ ও আবিষ্কার করাই বিজ্ঞান। জড়জগৎ, বুদ্ধিজগৎ কিম্বা অধ্যাত্মজগতের অন্তর্গত যে কোনও জ্ঞানকে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশ্লেষ করে দেখাই বিজ্ঞানের কাজ)।

Science-এর field very vast (ক্ষেত্র খুবই বৃহৎ), এমনকি unending (অশেষ) বল্লেও অত্যুক্তি করা হয় না। Observation, experiment and analysis (পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ) এই তিনটি method (উপায়) নিয়ে Science (বিজ্ঞান) truth-কে (সত্যকে) discover (আবিষ্কার) ও interprete করে।

প্রশ্ন :—মহারাজ ! ধর্মের ব্যাপারে এসবের দরকার কি ?

স্বামিজী :—বাপু 'ধর্ম' বলতে কি বোঝায় তা জানোনা ব'লেই তোমরা ঐ রকম ছেলেমানুষী কথা বলো। ধর্মের সম্বন্ধে তোমাদের conception (ধারণা) মোটেই clear (পরিষ্কার) নয়, তাই তোমরা মনে করো—ধর্ম হচ্ছে একটা গাঁজাখুরী কিছুতকিমাকার ব্যাপার। বলো দিকিনি, ধর্ম বলতে কি বোঝো ?

প্রশ্ন—আজ্ঞে মহারাজ ! ধর্মের মানে আর কি ? এই পুজো পাঠ জপ তপ ব্রতব্রত পালন করা। ধর্ম মানে ভগবানকে ডাকা।

স্বামিজী :—ভগবান বা ঈশ্বর বলতে তোমরা কি বোঝো ? সে সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি ?

প্রশ্নকারী শ্রোতা :—আজ্ঞে যিনি জগতের সৃষ্টি কোরেছেন, যাঁকে আমরা ভক্তি করি।

স্বামিজী :—তা তিনি কি রকম ?—তাঁর স্বভাব ও স্বরূপ কি রকম ?

প্রশ্নকারী শ্রোতা—আজ্ঞে, তা আর কি কোরে বোলবো ? সবাই বলে ভগবান আছেন. সবাই ভগবানকে ডাকে, তাই আমরাও তাঁকে ডাকি।

স্বামিজী (মৃদুহাস্যে) :—যে বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের কোনই ধারণা নেই, বিশ্বাস নেই, যা কখনও feel (অনুভব) করতে পারো না—তাকে কেমন কোরে ভক্তি করো ? কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানাশোনা থাকলে তবে তার ওপর অনুরাগ কিম্বা ভালবাসা হয় ? বলি, আগে ভগবান আছেন কিনা জানো, আগে জানবার চেষ্টা করো তাঁর স্বভাব গুণ ও শক্তি কেমন ? তবে তো তাঁর দিকে মন যাবে—তবে তো তাঁকে ভালবাসতে ইচ্ছা হবে।

শ্রোতা :—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ !

স্বামিজী :—'আজ্ঞে হাঁ' নয় গো বাপু ? Reason (যুক্তিবিচার) বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। Religion is intensely rational. Relgion is intensely practical. First of all you should know the subject in its true perspective. You must determine the very nature of the object which you are willing to know (ধর্ম হচ্ছে আগাগোড়া যুক্তি-

মূলক। ধর্ম হচ্ছে একেবারে হাতে কলমে কোরে দেখবার ব্যাপার। যে বিষয়কে তুমি জানতে চাও, তাকে ঠিক ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে আগে জানতে হবে)।

যে বিষয়কে তুমি জানতে চাইছো, তার স্বভাব-প্রকৃতি তোমার সবচেয়ে আগে জানা দরকার।

এইজন্যেই ধর্মের ব্যাপারে Science-এর (বিজ্ঞানের) দরকার। Observation, experiment and analysis (পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ) এই তিনটি প্রধান উপায়কে নিয়ে ধর্মের তত্ত্ববস্তুকে জানতে হবে। যেখানে ধর্মের ব্যাপারে এই রকম scientific outlook (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি) নেই—সেখানে ধর্ম শুধু কতকগুলো foolish beliefs and superstitions (নির্বোধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার) মাত্র।

অন্য আর একজন ব্যক্তি :—কিন্তু মহারাজ! কই ধর্মের ব্যাপারে এই রকম উপায় তো আমাদের দেশে বড়ো একটা কেউ মেনে চলে না। সব জায়গাতেই তো দেখেছি কতকগুলো tradition belief ও creed (বনেদি বিশ্বাস ও বিধিবদ্ধ নিয়ম) লোকে পালন করে।

স্বামিজী :—সেইজন্যেই তো এদেশে ধর্মের নামে হাজার হাজার লোকের মন inert and passive (জড় ও নিষ্ক্রিয়) হয়ে গেছে। এদেশে ধর্ম হয়েছে এখন শুধু sentimentalism আর credulity (ভাবপ্রবণতা ও যুক্তিহীনতা)। কতকগুলো বাঁধা আচার-নিয়ম মেনে চলাই তো আর ধর্ম নয়। ধর্ম হচ্ছে to realize the ultimate Reality of this universe in direct and immediate vision (সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ দৃষ্টিতে এই বিশ্ব-জগতের চরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করাই ধর্ম)। ধর্ম হচ্ছে এই বিশ্বজগতের যা ultimate cause (চরম কারণ) ও eternal basis (শাশ্বত ভিত্তি) তার সঙ্গে তোমার স্বরূপগত সম্বন্ধকে জানা।

"কে আমি? কোথা থেকে আমি এই জগতে এসেছি? এই দেহটা নষ্ট হয়ে গেলে কি আমিও ধ্বংস হয়ে যাবো? না, তারপরেও আমি থাকবো? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা মূলসত্য তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আর সেই পরম সত্যের স্বরূপ কি রকম?"—এই সমস্ত তত্ত্বকে সাক্ষাৎভাবে জানাই ধর্মের লক্ষণ। এই হচ্ছে আসল ধর্ম। এ বাদ দিয়ে আর যা কিছু—সে আসল ধর্ম নয়। সেসব একেবারে secondary and unimportant (গৌণ ও অপ্রয়োজনীয়)। আত্মজ্ঞান লাভই ধর্ম। আর সবই একেবারে অসার বাজে জিনিস।

একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কোরলেন :—মহারাজ! তা হ'লে এইসব পুজো ব্রতব্রত জপ প্রার্থনার কি কোনই দাম নেই?

স্বামিজী :—আছে। আমি তো এসব আগে কতবার আমার ক্লাস-লেকচারে এখানে explain (ব্যাখ্যা) কোরেছি। তাছাড়া Spiritual Unfoldment-এ (আত্মবিকাশ নামে আমার বইএ) আমি তো এসব কথা খুব পরিষ্কার কোরে বুঝিয়ে বলেছি। ঐ বইখানা প'ড়ে দেখলেই এসব ব্যাপার বুঝতে পারবে।

কী জানো, পুজো প্রার্থনা জপ নাম-গান এসব ধর্মের ব্যাপারে অনেক নীচুস্তরের ব্যাপার। ওসব হচ্ছে একেবারে beginners-দের (ধর্মের অনুষ্ঠানে প্রথম-প্রবর্তিত ব্যক্তিদের) জন্যে। যাদের মন চঞ্চল অস্থির, যারা তত্ত্বের বিচার করতে পারে না, একঘণ্টাও ইষ্টচিন্তায় মনকে স্থির রাখতে পারে না—তাদের জন্যেই এইসবের ব্যবস্থা হয়েছে। মন স্থির ও একাগ্র হ'লে তবে তো ঈশ্বরের ধ্যান কোরতে পারা যায়?

আর একজন প্রশ্ন কোরলেন :—মহারাজ ইষ্ট-চিন্তায় মনকে স্থির কোরতে পারা যায় না কেন? যতই ইষ্টচিন্তা কোরতে যাই, ততই অন্য রকম আজেবাজে ও খারাপ চিন্তা এসে মনকে তোলপাড় কোরতে থাকে। আজ প্রায় তিন চার বছর তো চেষ্টা কোরছি তবুও মনকে ইষ্টচিন্তায় বসাতে পারছি, না। এরকম কেন হয়?

স্বামিজী :—এরকম কেন হয়? তার মানে গতজন্মের যতো হীন সংস্কার মনের তলায় গাদা হয়ে জ'মে আছে। যেমন পুকুরের যতো মাছের বতন। পুকুরে জাল ফেললে—সেই মাছগুলো পুকুরের তলা থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে—সারা পুকুরকে তোলপাড় কোরতে থাকে। ইষ্টচিন্তা কোরতে গেলেও তেমনি মনের সমস্তটাই খুব নাড়া পায়। তার ফলে ঐসব পুরনো হীনসংস্কারগুলো প্রবল হয়ে মনের ওপরকার স্তরে উঠে ছুটোছুটি ও তোলপাড় আরম্ভ কোরে দেয়।

সেই ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা কোরলেন:—তাহলে মহারাজ! এই রকম কি সারাজন্ম ধ'রে চলতে থাকবে? এইজন্মে আমরা কি কিছুতেই ইষ্টচিন্তায় মনকে বসাতে পারবো না?

স্বামিজী :—হবে না কেন? তবে লেগে প'ড়ে থাকতে হয়। একদিনেই তো আর ঐসব সংস্কার দূর হয় না। যা অনেক জন্ম ধ'রে জ'মে আছে, সে কি আর দু-এক বছরের চেষ্টাতে দূর হয়? এর জন্যে অনেক বছর ধৈর্য্য ধরে সাহস কোরে প্রাণপণে খাটতে হবে। ঐসব হীনচিন্তা দূর করবার উপায় সৎচিন্তা অভ্যাস করা। সৎচিন্তা কোরতে কোরতে মনের মোড় ফিরে যায়। একটা পুরানো habit (সংস্কার) ঝাঁকিয়ে গেছে। তাকে জয় কোরতে হলে সব সময়ে মনকে পবিত্র বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে। সৎপ্রসঙ্গ সৎচিন্তা ও সৎগ্রন্থপাঠ করতে করতে মন ক্রমে স্থির ও একাগ্র হয়ে যায়।

আর তাছাড়াও আর একটা উপায় আছে—তাকে বলে প্রত্যাহার—withdrawal of the mind from the object of the senses, ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে, বিশেষতঃ কুবিষয় থেকে, মনকে ফিরিয়ে এনে নিজের ইষ্টচিন্তায় বারবার তাকে লাগাবার চেষ্টা করতে হয়। এই রকম pratice (অভ্যাস) শুধু সকাল সন্ধ্যায় জপে বসবার সময়ে কোরলেই হবে না। খেয়া বসা কাজকর্ম পড়াশোনা সব সময়েই মনে মনে এই processটি (উপায়টি) চালিয়ে যেতে হবে। সারাদিন যদি মনটা সৎচিন্তায় ও পবিত্রভাবে কেটে যায়—তাহলে ইষ্টচিন্তার সময়ে মনে কোনও রকম গোলমাল হবে না। বেশ শান্ত ও স্থির মনে ইষ্টদেবতার চিন্তা ও জপ কোরতে পারা যাবে।

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন। সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ। সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এই অনন্ত সত্য জগতের মূলভিত্তি। • • • তমসাচ্ছন্ন পাশব প্রকৃতির মানুষ আমরা। সহস্রবার ঠেকিয়াও এই মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না। সহস্রবার ঠেকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই। উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী আমরা মনে করি যে, যে কোন প্রকারে ঠিক নিজের স্বার্থসাধনেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা নিতান্ত কম দেখা যায়নি, কিন্তু বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভার অধিকারীর সংখ্যা আজও কম। বিশ্বের দরবারে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আসন গ্রহণ করতে পারেন এমন বিজ্ঞানী আমাদের দেশে অতি মুষ্টিমেয়। এই স্বল্প সংখ্যক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডাক্তার মেঘনাদ সাহা ছিলেন অন্যতম।

ডাঃ সাহার যে অনন্যসাধারণ মৌলিক গবেষণা বিশ্বের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেটি হচ্ছে তাঁর প্রথম জীবনে আবিষ্কৃত "তাপ আয়নন তত্ত্ব" (থিওরি অব থারমাল আয়োনাইজেশন)। আস্ট্রোফিজিক্স বা নভো-পদার্থ-বিদ্যার গবেষণায় এই তত্ত্ব এক নতুন ধারার প্রবর্তন করে। নভো-পদার্থবিদ্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই তত্ত্ব কতখানি যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা অল্প কথায় ব'লে শেষ করা যায় না। এই নিবন্ধে আমরা ডাঃ সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব ও নভো-পদার্থবিদ্যায় তার বিবিধ প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে আলোচনা করবো।

আমরা জানি তাপ দিলে বরফ গ'লে জল হয় এবং জল উত্তপ্ত করলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। কঠিন থেকে তরল ও তরল থেকে বাষ্পীয় অবস্থার পদার্থের এই রূপান্তরের মূলে আছে তাপের প্রভাবে পদার্থের অণুপুঞ্জে আলোড়ন। তাপ যত বাড়তে থাকে অণুপুঞ্জে আলোড়ন তত বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে অণুদের সংযুক্তি ক্রমশঃ ভেঙে যায়। পক্ষান্তরে তাপ যদি ক্রমশ কমতে থাকে, তাহলে অণুপুঞ্জে আলোড়ন কম হয় এবং তার ফলে অণু-দের সন্নিবেশ ক্রমে ঘন হয়ে আসে। এইভাবে বাষ্প জলে এবং জল বরফে পরিণত হয়। তাপ কমতে কমতে যখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে, অণুদের সন্নিবেশ একেবারে গায়ে গায়ে সুদৃঢ় বাঁধনের মধ্যে বাঁধা পড়ে তখন তরল জল ঘনীভূত হয়ে কঠিন বরফের রূপ পরিগ্রহ করে।

তাপের প্রভাবে নানা অবস্থান্তর রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে নানা গবেষণা হয়েছিল এবং নানা জন নিজ নিজ উদ্ভাবিত গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে এ-সবের ব্যাখ্যাদানেরও চেষ্টা করেছিলেন। তাপের প্রভাব সম্বন্ধে যা কিছু মীমাংসা তাঁরা করেছিলেন তার মূলে ছিল এই ধারণা যে, পরমাণু হচ্ছে স্থিতিস্থাপক (elastic) গোলক। এই ধারণার অনুযায়ী গণনায় সব ক্ষেত্রে কিন্তু সমান পাওয়া যায় না।

১৯২০ সনে 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত নিজের একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক সাহা এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন— তাপের প্রভাব সংক্রান্ত সমস্ত গণনা পরমাণুকে স্থিতিস্থাপক গোলক ব'লে কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু পরমাণুর নিজস্ব গঠন বিবেচনা করা হয়নি।

পরমাণুর গঠন কীরূপ, সে-সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট চিত্র সর্বপ্রথম প্রদান করেন অধ্যাপক র‍্যাদারফোর্ড। এরপর ১৯১৩ সনে তাঁর শিষ্য নাইলস্ বোর কণাবাদে (কোয়ান্টাম থিয়োরি) সাহায্যে পরমাণু বর্ণালী (স্পেকট্রাম) ব্যাখ্যা করেন। এদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন ক'রে অধ্যাপক সাহা অণুপরমাণুর উপরে তাপের প্রভাব সম্বন্ধে এক নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যে তত্ত্ব আজ বিজ্ঞানজগতে "সাহার তাপ আয়নন তত্ত্ব" নামে সুবিখ্যাত।

পদার্থের উপর তাপের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এখন, "আয়নন" বলতে কী বোঝায় তা একটু ব্যাখ্যা করা

প্রয়োজন। আমরা জানি —ইলেকট্রন ও প্রোটন সমন্বয়ে প্রত্যেক পরমাণু গঠিত এবং পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন তার বহিঃস্তরে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন-মুক্ত করে, তখন তাকে বলা হয় "আয়ন" এবং ইলেকট্রন-মুক্ত পরমাণুর যে অবস্থা তাকে বলা হয় 'আয়নন" (আয়োনাইজেশন)। তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আয়ননের ফলে আয়নিত পরমাণু ও মুক্ত ইলেকট্রনের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই ইলেকট্রন-বিমুক্তীকরণ ঘটে কী ভাবে? পরমাণু যখন বৈদ্যুতিক চাপের অধীনে হয়, তখন তার বহিঃস্তর থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়। অধ্যাপক সাহা তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে দেখালেন, এই আয়নন অর্থাৎ ইলেকট্রন বিমুক্তীকরণ তাপ ও চাপের অধীনে সম্ভব।

সাহার এই তাপ-আয়নন তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নব আলোকসম্পাত করলো। ১৮৫৯ সন থেকে যখন নক্ষত্রমণ্ডলী পর্যালোচনার জন্যে বর্ণালী-বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তখন ইংলণ্ডে স্যার নরম্যান লকইয়র এবং ইটালিতে কাপার সেচি নক্ষত্র-বর্ণালী সম্বন্ধে প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সকল তথ্যে কিছু পরিমাণ সংগতি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এবং লকইয়র, সেচি ও হারভার্ড কলেজ মানমন্দিরের শ্রীমতী ক্যানন এক প্রকার শ্রেণী-বিন্যাসের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই সকল সুসংগৃহীত তথ্য ব্যাখ্যা করার মত কোন যুক্তি-সঙ্গত তত্ত্ব তখনও পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি। ১৮৮৮ সনের গড়ার দিকে লকইয়র ও জানসেন সূর্যের ক্রমোমণ্ডলের (ক্রমোক্ষিপ্তার) বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করেন এবং ফাউলার, মিচেল ও অন্যান্য গ্রহণ-পর্যবেক্ষকেরা সুসংবদ্ধভাবে ক্রমোমণ্ডলের বর্ণালীর আলোক চিত্রগ্রহণ করেন। একটা বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, সূর্যমণ্ডলের বর্ণালীতে লঘু মৌল হাইড্রোজেন হিলিয়াম ও সোডিয়াম অপেক্ষা ক্যালসিয়ামের বর্ণালী-রেখা অধিকতর দেখা যায়। কী কারণে এমন ঘটে, এই সমস্যা বিজ্ঞানীদের চিন্তিত ক'রে রেখেছিল অনেক দিন। অধ্যাপক সাহা তাঁর তাপ-আয়নন তত্ত্বের সাহায্যে এই সমস্যা সুন্দর ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

১৯২০ সনে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন ও ১৯২১ সনে রয়েল সোসাইটির কার্যবিবরণীতে অধ্যাপক সাহা "সৌর ক্রমোমণ্ডলে আয়নন" ও "সূর্যে মৌলিক পদার্থ" সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমরা জানি আর্ক ও স্পার্ক এ দুটি বিভিন্ন উপায়ে বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। এই দুটি বর্ণালী এক রকমের নয়, আর্ক-বর্ণালী থেকে স্পার্ক-বর্ণালী স্বতন্ত্র। লকইয়রের মতে স্পার্কে উষ্ণতা আর্কের চেয়ে অনেক বেশী। অর্থাৎ স্পার্ক-বর্ণালী উষ্ণতর অবস্থার পরিচয় দেয়। সূর্যপৃষ্ঠ থেকে হাজার মাইল দূরে অর্থাৎ সৌরমণ্ডলের উচ্চ স্তরে কতক পরমাণু থেকে বিক্ষিপ্ত আলোক স্পার্ক-বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সূর্যপৃষ্ঠে অনুরূপ পরমাণুর বর্ণালীতে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক সাহা তাঁর তাপ-আয়নন তত্ত্বে তাঁর "আয়নন সূত্র" প্রকাশ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, ক্রমোমণ্ডলে চাপ হ্রাস হওয়ার জন্যে সেখানে স্পার্ক-বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অধ্যাপক সাহা বলেন, যেমন গ্যাসের ক্ষেত্রে তেমনি প্রতি পরমাণুতেও তাপের প্রভাব সরল গাণিতিক সূত্র প্রকাশ করা সম্ভব। সাহার সূত্র অনুযায়ী এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করে গ্যাসের চাপ। গ্যাসে চাপ ও তাপ যদি খুবই কম হয়, তা হলে এর প্রতিটি পরমাণু একই রকম আলো বিকীরণ করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণু যেন একই অবস্থায় আছে। চাপ যদি সাধারণ হয় ও তাপ হয় বেশী, সে-ক্ষেত্রেও অনুরূপ আলো বিকীর্ণ হবে। ক্রমোমণ্ডলে পরমাণুর অবস্থা পরিবর্তনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে নিম্নচাপ। কিন্তু সূর্যপৃষ্ঠে সাধারণ চাপের অধীনে প্রচণ্ড তাপ এই অবস্থার পরিবর্তন-সাধনে অত কার্যকরী হয় না।

বর্ণালীগত পরীক্ষায় দেখা গেছে, সূর্যপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে বর্ণালীর যে পরিবর্তন হয় সেটা নির্ভর

করে সেই স্তরে আয়নিত পরমাণুর উপর। বিভিন্ন মৌলের পরমাণু ও একই মৌলের পরমাণু আয়ননের বিভিন্ন অবস্থায় যে আলোর সৃষ্টি করে সেই আলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায়, তাতে বিশেষ বিশেষ বর্ণালী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এই বর্ণালী রেখাসমূহের পরিচয় থেকে মৌলের অস্তিত্ব জানা যায়।

এইভাবে বর্ণালীগত গবেষণা থেকে জ্যোতিষ্কের সংযুতি ও বিশ্বের দূরতম মণ্ডলে হাইড্রোজেন, কার্বন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি মৌলের অস্তিত্ব জানা গেছে।

কোন জ্যোতিষ্কে তাপ ও চাপ কত তা নির্ভর করে সেই জ্যোতিষ্কের পরিমণ্ডলে পরমাণুর অবস্থার উপর। বিভিন্ন জ্যোতিষ্কে কীভাবে তাপ ও চাপের তারতম্যের জন্য কোনো মৌলের পরমাণুর শমিত অবস্থা এক আয়নিত অবস্থা ও দুই আয়নিত অবস্থার ক্রমপর্যায় হয় সে সম্বন্ধে নানা পর্যবেক্ষণ হয়েছে। কোনো বিশেষ তাপে ও চাপে এই আয়নন-মান কত হবে তার হিসাব অধ্যাপক সাহা করেছেন। মনে করুন, নক্ষত্রমণ্ডলের কোনো অংশের বর্ণালী থেকে জানা গেল সেখানে বহুলাংশ ক্যালসিয়াম পরমাণু এক ইলেকট্রনচ্যুত হয়ে আছে। সাহার সূত্র থেকে সেই অংশের তাপ ও চাপ নিরূপণ করা যাবে। তবে একসঙ্গে তাপ ও চাপ নিরূপণ করা যাবে না। একটা জানা থাকলে অন্যটার পরিমাপ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যদি বর্ণালী-রেখার পরিচয় থেকে আয়নিত পরমাণুর অনুপাত ও আয়নন বিভব (আয়োনাইজেশন পোটেনসিয়াল) জানা যায়, তাহলে সাহার সূত্র থেকে নক্ষত্রমণ্ডলের তাপ কিংবা চাপের পরিমাপ পাওয়া যাবে। প্রতি পরমাণুর আয়নন বিভব জানা আছে। ক্যালসিয়াম ও হাইড্রোজন পরমাণুর আয়ননের অনুপাত সাহার সূত্রে নিরূপিত হয়েছে। সাহার পারিতিক সূত্র অনুযায়ী আয়ননের অনুপাত বাড়ে, তাপ বাড়লে, চাপ কমলে ও আয়নন বিভব কম হ'লে।

সৌরবর্ণালীতে বিশেষ কয়েকটি মৌলের বর্ণালীরেখা কেন প্রকাশিত হয়, তার ব্যাখ্যা অধ্যাপক সাহা দিয়েছেন তাঁর "সূর্যে মৌলিক পদার্থ" প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন কয়েকটি মৌল যেমন রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়, কিন্তু অন্যান্য মৌল তাদের অধিক আয়নন বিভব অনুনাদ বিভবের (রেজনেন্স পোটেনসিয়াল) ফলে তত উত্তেজিত হয় না।

অধ্যাপক সাহা তাঁর তাপ-আয়নন তত্ত্ব ও তৎসংক্রান্ত অনুসিদ্ধান্তগুলিকে শুধু পারিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ ক'রে ক্ষান্ত হননি, সেগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করার জন্যে তিনি বিশেষ বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু যথোপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণের জন্য তাঁকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় এবং বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে ১৯৩৮ সনে তাঁর ছাত্র ডাঃ বি এন শ্রীবাস্তব বহু অর্থোসপত্তা যন্ত্রের সাহায্যে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেন।

পরবর্তীকালে সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্বের পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ সাধন করেন ডাঃ এইচ এন-রাসেল, অধ্যাপক সি জি ডারউইন, আর এইচ-ফাউলার এবং ই এ মিলনে। বর্তমানে পদার্থ-বিজ্ঞানে সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব একটি মৌলিক অবদান ব'লে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই তত্ত্ব সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সংযুতি, বিভিন্ন স্তরে কোনো মৌলের বর্ণালীরেখাসমূহের সমাবেশ ও তদনুযায়ী তাপ ও চাপের অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে এবং আয়ননমণ্ডলের গঠন সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দান করেছে।

১৯১৯ সনে অধ্যাপক সাহা "বৃত্ত বিকীরণ চাপ" (সিলেকটিভ রেডিয়েশান প্রেসার) নামে একটি মূল্যবান তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের একাংশ ইংলণ্ডের ফ্যাক্টোফিজিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বাকী অংশ যা তিনি পরে পাঠিয়েছিলেন তা আর কোনো দিন প্রকাশিত হয়নি। আরকেন বীক্ষণাগারের

একটি ড্রয়ারে তা দীর্ঘকাল ফেলে রাখা হয়েছিল। ১৮ বছর পরে ১৯৩৮ সনে তিনি যখন ইংলণ্ডে যান তখন এর পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছিলেন, ক্রোমোস্ফিয়ারের গঠন ও ক্যালসিয়াম পরমাণুর ক্রোমোস্ফিয়ারের উচ্চ স্তরে অবস্থিতি কয়েকটি পরমাণুর উপর বিকীরণ চাপের বৃত্ত প্রয়োগের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। উক্ত নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপ নিরূপণ ক'রে দেখা গেছে, ১২০০০ ডিগ্রী থেকে ১৫০০০ ডিগ্রী উষ্ণতায় সাহার নিয়মের মত অন্য কোনো নিয়ম অত কার্যকরী হয় না।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক মিলনে 'বৃত্ত বিকীরণ চাপ তত্ত্ব' বিশেষভাবে গ'ড়ে তোলেন। এই তত্ত্ব গ'ড়ে তোলার জন্য অধ্যাপক সাহার কাছে যে তিনি মূলত ঋণী, এ-কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সাহার তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে আরও বহু বিজ্ঞানী নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধীয় নানা জটিল সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন। নভোপদার্থবিদ্যায় সাহার তত্ত্বের গুরুত্ব যে কতখানি তা প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডিংটনের একটি উক্তি থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

"Saha's theory is to be regarded as one of the ten great discoveries in Astronomy after Galileo's discovery of the telescope in 1610."

(১৬১০ সালে গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় যে দশটি প্রধান আবিষ্কার হয়েছে, সাহার তত্ত্ব তার মধ্যে অন্যতম ব'লে বিবেচিত হবে)। তাপ-আয়নন তত্ত্বের এই অপরিমেয় গুরুত্বের জন্যেই ভারত-সন্তান মেঘনাদ সাহার নাম বিশ্বের বিজ্ঞান-ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৬২ (২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬)

যতীন্দ্রনাথের কবিতা

শ্রীঅনিল কুমার হালদার।

'অগ্রপূর্বিকার' ভূমিকায় যতীন্দ্রনাথ আপন কাব্য-কথা সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমার ঘরে জন্মে সেই কল্পলোকবাসিনীর যা দুর্গতি তা'ত আমি সব জানি। কেবল একান্ত কৌলিন্য অভিমান নিয়ে বার বার তাকে শাসন করেছি, অর্থগৌরবহীন অন্নবিত্তের ঘর, না জুটে রত্নালঙ্কার, না মানায় ফুলের সাজ, নিত্য দুঃখের সংসারে জলভরা চোখে কাজলেরই বা ঠাঁই কোথা? সুতরাং আর যাই হও পাড়াপড়শী সুভাগিনীদের মত তুমি ব্যাপিকা হবার প্রয়াস করো না। রূপগুণ যদি নাই থাকে বড়দের সম্ভ্রমবোধ হারিও না।" এই উদ্ধৃতির মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের কবিতা তথা কাব্যধর্মের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যতীন্দ্রনাথ একান্তভাবে আত্মসমাহিত, তাঁর চারিত্রিক কৌলিন্যগর্ব আজীবন বজায় ছিল তাঁর কবিতায়, লোককান্ত হ'বার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি, ঐ ভূমিকায় তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

যতীন্দ্রনাথের সুর বেদনায় ভরা ও ব্যথার ম্লানঃ তাঁর রক্তে রক্তে উপলাহত ফেনপুঞ্জের শীকরসিক্ত আবেশ বা প্রখর সূর্যের আতপ্ত কিরণে মরুময়। দিগন্ত-বিস্তৃত বালুকা সন্ধ্যায় কবির তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ হয়েছিল, যার নৈকট্য পীড়নে তীব্র জ্বালা সঞ্চারিত

হয়েছে, তাই তাঁর অধিকাংশ কবিতা ব্যঙ্গ ও সুনিপুণ শ্লেষের সুরধারে শাণিত। সেই তীক্ষ্ণতার প্রান্তদেশে কবি সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিরুদ্ধে এবং সর্ববিধ প্রচলিত শাসন অনুশাসন ও প্রথা-বিশ্বাসের বিপক্ষে রুদ্রের মত ভ্রান্ত আক্রোশে প্রতিকূলাচরণ করেছেন। তাঁর অন্তশ্চেতনে কিন্তু একটা কোমলতন্ত্রী অনাহত ছিল, তার প্রকাশ পাই ত্রিধারার কবির কাব্য-সাধনার একেবারে উপান্তকালে।

বাংলাদেশের শ্যামলতায় আবৈশব পালিত ও বাংলা কাব্যের পালিত লাবণ্যরসে পুষ্ট ও প্রতি-পালিত হয়ে কবির এই প্রচণ্ড বক্রস্বর, এই তৃষ্ণার্ত জ্বলনজ্বালার লেলিহান বুভুক্ষা এবং ততোধিক বিক্রমশালিত্ব, বস্তুতঃ আশ্চর্যের বিষয়। শেষী-সঙ্কলনই কবির লেখনী চালনার নিদানভূত। নজরুলের নির্ঘোষ ও চাকল্য অথবা মধুসূদনের রণধ্বনিমাখার উদ্ধত বলাধিক্যের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও তাঁদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সাযুজ্য নেই। কারণ যতীন্দ্রনাথ একান্তভাবে চিন্তানিষ্ঠ ও ভাব-তুষ্টিষ্ঠ কবি; তাঁর আধিমানসিকতার যুক্তির ক্রম-বিন্যাস উপমা উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের অন্তরালে সহস্র মুকুরে ভেঙে পড়েছে।

"কেন ভাই রবি বিরক্ত করো? তুমি যেথি সব ওঁচা
কিরণ ঝাঁটার হিরণ কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা!
আমি তুমি ভালো ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিশ ঢেলে।
তবু জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
তবাই তোমার কী আলো পেয়েছে অন্ধের চোখ?
চেয়াপুঞ্জি থেকে
একখানা মেঘ ধার দিতে পার,
গোবি সাহারার বুকে?"

যতীন্দ্রনাথ তাঁর গভীরচারী অনুধ্যানপ্রেরণায় যে কবিবাক্ উচ্চারণ করেছেন, তার মধ্যেই তাঁর সমস্ত স্বকীয়তা মুক্তার মতো নিটোল হয়ে উঠেছে।

(ক) মরণে হবে সাথী
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না
বারোটার বেশী রাতি।

(খ) তুমি শালগ্রাম শিলা
পোওয়া যদি যায় সকলি সমান
তারে নিয়ে রাসলীলা?

(গ) প্রেম ব'লে কিছু নাই
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই

(ঘ) আমি জানি সুখ ও দুঃখ জীবনে দুইটি শ্রেয়।"

এরই জন্যে কবির বিদ্রূপ অট্টহাস্য ক'রে উঠেছে—

"লোক পোষানির প্রায়
জননীর কোলে ছেলে বড় ক'রেকে পুনঃ কাড়িছে হায়।
এবং চাহিতে মুক্তি হাসি আসে হায়।
পাকাইতে কাঁচা হাত।
কোন অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ?"

উপরের সমস্ত উদ্ধৃতিই কবির 'ঘুমের ঘোরে' থেকে নেওয়া। আমার বিশ্বাস কবির সমস্ত কাব্যভাব ও কাব্য-দর্শন ওরই মধ্যেই স্পষ্টীকৃত। তাঁর অনুভূতিও নাস্তিক্য চেতনার উদ্ধত আক্রোশ। তাঁর চাপা কষাঘাত ও সুস্পষ্ট পরিহাস এবং তাঁর প্রবলতম বিদ্রূপের পরাকাষ্ঠা থেকে নিষ্ঠুরতম কটুভাষ অর্থাৎ তাঁর বিশিষ্ট সৃষ্টিকোণের মূলকথা ওখানে বাস্তব আলেখ্যে বিধৃত। যতীন্দ্রনাথের বাস্তব জীবনের যতখানি ইঙ্গিতই পূর্ণায়ত হয়ে উঠুক না কেন, তাঁর কবিতা কল্পনা-বিলাসের সামগ্রী নয়, একথা সত্য। তাঁর লেখনশৈলীতে স্খলিত গতিবেগ লক্ষ্যণীয় এবং সাধারণ কথাই এমন ভঙ্গীযোজনায় তিনি ভ'রে দিতে পারেন, যাতে নিশ্ছিদ্র আধিমানসিকতার ঐকান্তিক কাব্যমাধুর্য অতি সহজেই মনোহরণ করে। ঈশ্বরপ্রীতি তাঁর নেই, বরঞ্চ জনক্ষোভ ঐ স্রষ্টার কল্পোলকল্পিত ভিত্তিমূলকে তিনি তীব্র-ভাবে নাড়া দিয়েছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা করেছেন কাব্যে। গতানুগতিক ভাববিলাস বর্জনেই কবির প্রাণোল্লাসের আমন্ত্রণ এষণা; তার পটভূমিকায় চৈতন্যই সক্রিয় হোক তা যদি কবির একান্তভাবে স্বকীয় হয়, তবে সে হলো

গভীরাত্মক বাস্তবানুবাদিতা। তাই সাধারণ অর্থে 'কবি' বলতে যা বোঝা যায় সেই ভাবাবেগের অতিরেক যতীন্দ্রনাথে একেবারে বিরল। তাঁর মানসব্রতে অনুভূতির তাড়না এবং তারই উপোদ্‌ঘাতে তাঁর সজ্ঞান কাব্য সাধনা। কাব্যলক্ষ্মীর কনকুকিঙ্কিণীর দাক্ষিণ্য অথবা নূপুর কাকলীকুজনের প্রসন্নতা। অথবা লাস্যলীলা ও কটাক্ষমহিমায় যতীন্দ্রনাথ বঞ্চিত—এতটুকু নারীর নিরাভরণ হৃদয়দান, তথাপি যেটুকু কাব্যরসমুখ সমাহৃতি দেখা যায়, সে শুধু বাগ্‌বন্ধনের নৈপুণ্য ও চমৎকারিত্ব, এরই নাম কবিভাষা।

যতীন্দ্রনাথের তথাকথিত অনলঙ্কৃত কবিভাষায় কবির অজ্ঞাতসারে রসসিদ্ধির বারিনিষেকে তাঁর ভাবের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে, তারও মূলে সেই অহংমগ্নতা ক্রিয়াশীল। তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকোষ্ঠে একটা নৈয়ায়িক বা কঠিন তার্কিকপ্রবণতা তাঁর কবিমনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং সেই সূত্রেই ঐ নৈরাত্মবোধের জন্ম। নৈসর্গিকবিধানকে তিনি কোনমতে মানতে রাজী ন'ন সেই অর্থে যে, তা হলো প্রথাগত পাপক্ষয় ও আত্মতুষ্টি; তাই আপন অন্তরবীণার আলোকে জগৎরহস্যের মর্মমূলের অন্ধকারও অপসারিত করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর ঐ দৃষ্টিতে তাই এ' বিশ্ব 'চামড়ার কারখানা' অথবা 'খেজুর বাগান' ব'লে প্রতীয়মান। এবং তার মালিক যে, যাকে জানার কোন উপায় নেই তারই উপর তিনি বজ্রাহস্ত: তাঁর কল্পিত বন্ধুকে খাড়া ক'রে আপনার অজানিতে সমস্ত ক্ষোভই তিনি উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, কবির এই কথোক্তি নিন্দা বর্ষিত হয়েছে ঐ ভগবান অপেক্ষা তাঁর ভাবকদের ওপর অনেক বেশী।

'সায়ম্' থেকে যখন প্রাণশক্তির প্রখর আলোক তিমিত হয়ে এলো, তখন যে সুরটা চিরকালই ছিল —সেই দুঃখবাদ—তা' একেবারে অনাবৃত হয়ে পড়েছে; বিশেষতঃ ত্রিযামার আসন্ন অন্ধকারে বিনাশ স্মৃতির ব্যথা বড়ই করুণ। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে; ধীর মন্থরের ক্রমিক পদসঞ্চারে কবির মৃগতৃষ্ণার অকারণ ক্লান্তি যেমনে পরিব্যাপ্ত; ঐ মর্মর-গুঞ্জনে শুরুতার বিষাদ পাঠকেরও মর্মস্পর্শ করে। ত্রিযামায় একটা অতিলক্ষিত ধূয়াই হলো বিগত বৈভবের অনুশোচনা, যদিও তথাকার নৈরপেক্ষ্য ভাবণে তা' একান্তভাবেই রমণীয়। 'মরুমায়া', 'মরুশিখা'-এর শব্দধ্বনিত নয়, 'ত্রিযামা'র বাঁশীর বাসন্তী রাগিণীর মর্মান্ত মূর্ছনা শ্রুত হয়। কবির প্রতিভাসূর্য আজ স্তিমিত, তাই মধ্যাহ্নের খরদ্যুতিতে যে জ্বালা ও দাহ ছিল আজ তা' স্নিগ্ধ ও নির্দাহ। শুধু তাই নয়, ধরণীর আলিঙ্গন-লালসায় কবি আতুর। কাব্যলক্ষ্মীর ক্রোড় ক্লেদক্ষ আশ্লেষ কামনায় কবি একান্তভাবেই অধীর, তাতেই তাঁর সর্বেন্দ্রিয় শিথিল ও অবসীদ্‌গত। তাই কবি এতদিনে চমকিত হয়ে দেখ্‌লেন তাঁর যৌবন এবারের মতো বিগত হলেও কাব্যসুন্দরীর লাবণ্য অতিশয় লোভন—ঐ রূপজ আকর্ষণে ইতিহাসের অপূরণ।

"যারে বলেছিনু—নাই
চেতনার ভুলে বসি চিতামূলে,
গায়ে মাখি তারি ছাই।'

বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথের কবিতা মুমুক্ষুর অতি-চেতনায় যেমন একদিকে অনাবৃত, তেমনি অন্যদিকে দুঃখের গভীর ক্লান্তিতে অতিশয় মন্থর। যৌবনের দুর্বলিত আনিক্য ও বার্দ্ধক্যের দুর্বলতা দুই-ই তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছে; সুতরাং একহিসাবে কবি যেন দুলনায় বিশ্রান্ত পথিক এবং সে হিসাবে তাঁর বিপর্যাসের একমাত্র কারণ তাঁর প্রেষণার পরিবর্তন। দুঃখবাদীর বৈরাগ্য তাঁর কবিতার অক্ষরে অক্ষরে শোনা গেলেও, শিবশঙ্করের তীব্র ঘৃণা, জগৎ ও জগৎস্রষ্টার প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শন নিতান্তই দুর্লক্ষ্য নয় —মহেশ্বরই তো কবির উপাস্যদেবতা। তাঁর জীবনবীণার সব ক'টা তারই জড়িয়ে গেছে —গেছে ব'লেই সুরও আজ বেসুরা ঠেকে; সমস্ত জগৎ ও মানুষ তাঁকে ছলনা করেছে, তাই তাঁর

রোষবহ্নি প্রজ্বলিত। জীবনের ঐ তিক্ততা তাঁর কাব্যধর্ম্মকেও স্পর্শ করেছিল—

"সব ছিপি খোলবের সোডাজল সম
বিস্বাদ জীবন মম—ঢেলে ফেলে দাও।'
আশ্বাস দিও না আর, ফিরিবে না স্বাদ তার
মিশাও যদি বা বন্ধু মামুলি সুধা-ও।

এবং—

"কি যে আমি চাই—?
অভিরুচি নাই বন্ধু তোমারে জানাই।"

তাই তাঁর কবিতার রসোপলব্ধি এবং ঐ অনুভাব বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ অবধারণের জন্য তাঁর মানস-বিবর্ত্তনের অনুধাবন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।'

পরলোকে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে

সম্প্রতি ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী মহাকর্ম্মী ও শক্তিশালী কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষী ও নেতার অকস্মাৎ দেহত্যাগে আমাদের দেশ ও জাতি মনীষা ও মানবতার দিক দিয়া অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। দার্শনিক মনীষী ও ধর্ম্মপ্রাণ অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য, বৈজ্ঞানিকপ্রবর ও স্বদেশপ্রাণ ডক্টর মেঘনাথ সাহা, ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক মনীষী ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও মনীষী আচার্য্য নরেন্দ্রদেব, ভারতীয় লোকসভার সর্ব্বজনপ্রিয় অধ্যক্ষ গণেশ বাসুদেব মবলঙ্কর (দাদাসাহেব) প্রভৃতি জননেতা ও মনীষীরা মাত্র দেড়মাসের মধ্যে সকলেই একে একে পরলোকে চলিয়া গেলেন। বিশেষতঃ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও স্বদেশপ্রাণ ডাঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যু সমস্ত বাঙালী জাতির নিকট বিনামেঘে বজ্রপাতের মতন আকস্মিক ও অতিশয় শোকাবহ ব্যাপার। তাঁহাদের প্রত্যেকের মৃত্যু সমস্ত জাতির পক্ষে যেমন বেদনাদায়ক তেমনি দারুণ ক্ষতিকর। কারণ ইহাদের প্রত্যেকের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার মতন আর কোন সুযোগ্য ব্যক্তিদের পাওয়া এখন সমগ্র ভারতে একান্ত দুর্লভ। শিক্ষাগুরু ও মানবসেবাব্রতী মাননীয় ডক্টর মেঘনাদ সাহার অকস্মাৎ দেহত্যাগে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতিই আজ একটি অতি উজ্জ্বল রত্নকে হারাইয়া দরিদ্র ও অসহায় হইয়াছে। এই সমস্ত মনীষীদের ও জননেতাদের জীবন ও কর্ম্মসাধনা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে সকলের কাছেই বিশেষ পরিচিত। তথাপি আমরা তাঁহাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া ঐসব পরলোকগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আন্তরিক সম্মান-প্রদর্শন করিতেছি।

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী—মাননীয় ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব ও সম্পদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনার দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ফরাসী ও বাঙলা এই তিন ভাষায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার (চীন, ব্রহ্মা, জাভা, ইন্দোচীন,) প্রভৃতি দেশগুলির প্রাচীন ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্যে পূর্ণ, তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পুস্তক আছে। ঐ সমস্ত মনীষাদীপ্ত প্রবন্ধ ও মৌলিক তথ্যপূর্ণ পুস্তকের দ্বারা ভারতবাসীরা

ঐতিহাসিক মননশীলতার ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান সম্পদ লাভ করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বাঙালী মিলিয়া কলিকাতা মহানগরীতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে Greater India Society (বৃহত্তর ভারত পরিষৎ) নামে ঐতিহাসিক গবেষণাগার ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ-প্রকাশনার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী। এই প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত বিশিষ্ট সদস্য এখন পরলোকে, তাঁহাদের মধ্যে বিনয়কুমার সরকার বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতির নাম এখানে বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ডক্টর বাগচী ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস সম্বন্ধে লেকচারারের পদে তিনি নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য ছাড়াও ডাঃ বাগচী এশিয়াটিক সোসাইটি, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এবং অন্যান্য স্থানে যাইয়া ঐতিহাসিক গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষী মঁসিও সিলভ্যাঁ লেভীর নির্দ্দেশে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার প্রধান কার্য্য ছিল। এজন্য তিনি কয়েক বৎসর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। ডাঃ বাগচী রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আরও কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও ফেলো ছিলেন। গবেষণা কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কিছুকাল ইন্দোচীনে থাকিতে হইয়াছিল। প্রবাসী, Modern Review, Visva Bharati Quarterly Review বিচিত্রা প্রভৃতি এদেশীয় এবং জাপান চীন ও ফ্রান্সের কোন কোন বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁহার অনেক গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। বৃহত্তর ভারত পরিষৎ হইতে 'India and China' নামে তাঁহার পুস্তকটি প্রথমে বাহির হয়। এলাহাবাদের Hind Kitab Mahal প্রতিষ্ঠান হইতে ১৯৪৯ সালে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে পুনরায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইন্দোচীন নামেও তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশ্বভারতী হইতে ডক্টর বাগচীর 'ভারত ও ইন্দোচীন'। (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের অন্তর্গত) পুস্তকটি আজ প্রায় আট বৎসর হইল বাহির হইয়াছে।

ডক্টর বাগচী ১৯৩৮ সাল হইতে কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতনে চীনাভবনে গবেষণা ব্যাপারে Research Director রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার বা উপাচার্য্যের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। গত ১৯ জানুয়ারী ৪-৫৪ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ডক্টর বাগচীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ বাগচীর মৃত্যুতে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে অনুরাগী ব্যক্তিদের বিশেষতঃ ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ প্রভৃতি তাঁহার বহুবৎসরের প্রিয়বন্ধু ও সহকর্ম্মিগণের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাপ্রদ দুঃসংবাদ ও অপূরণীয় ক্ষতি।

ধার্ম্মিক মনীষী হরিদাস ভট্টাচার্য্য :— ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, হিন্দুশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ও ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রদ সন্দর্ভ-লেখক ও বক্তা অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২০ জানুয়ারী ১৯৫৬ (৬ই মাঘ ১৩৬২) দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একাধারে শিক্ষাব্রতী জ্ঞানসাধক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গে চব্বিশ পরগণা জেলায় নৈহাটির নিকটে ভাট-পাড়ায় একটি ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারে হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্ম হইয়াছিল। হরিদাস ভট্টাচার্য্য

মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন প্রোফেসররূপে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি দর্শনশাস্ত্রে সাময়িকভাবে মধ্যে মধ্যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার অধ্যাপনা গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ফললাভে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় প্রিন্সেপ নিশ্বপেন্দু ঘোষ লেকচারাররূপে 'Foundations of Living Faiths' নামে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি তুলনামূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অন্যতম নিদর্শন। ঐ বক্তৃতাগুলির প্রথম খণ্ড মাত্র আজ কয়েক বৎসর হইল বাহির হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে তাঁহার অন্যসমস্ত বক্তৃতাগুলি এখনও বাহির হয় নাই। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য একবার ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের উপদেষ্টা কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অফ কালচারের প্রচেষ্টায় 'Cultural Heritage of India' নামে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে বৃহদাকার গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য ইদানিং তিনি প্রধান সম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুতে এই বিরাট গ্রন্থাবলীর সম্পাদনার কার্য্যে যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হওয়া দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বৈজ্ঞানিকপ্রবর ডক্টর মেঘনাদ সাহা—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মী, ঐতিহাসিক জনসেবক এবং ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত মনীষী ডক্টর মেঘনাদ সাহার মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালী জাতি যাহা হারাইল, সেই দুর্লভ রত্নের সমাধান সম্পদ আর কখনও ফিরিয়া পাইবে না। ভবিষ্যতে হয়তো অধ্যাপক সাহার ছাত্রবৃন্দ অথবা পুত্রদের মধ্যে কেহ তাঁহার অপেক্ষা আরও একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে নিজের প্রতিভা ও জ্ঞানের পরিচয়ে তাঁহারা ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিতে পারেন। কিন্তু তাহার যাঁরা একাধারে মনীষা দূরদর্শিতা মানবপ্রেম জনসেবা স্বদেশপ্রাণতা ও বহুমুখী কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন এমন একজন পুরুষের অভ্যুদয় হওয়া সহজে সম্ভব হইবে না। বঙ্গমাতা আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি সুসন্তানকে হারাইয়া দীনহীনা ভিখারিণীর মতন সকলের উপেক্ষিতা ও অবজ্ঞাতা হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্গমাতার এইসব যোগ্য সন্তানদের মধ্যে যেমনটি যাইতেছেন—আর তেমনটি আসিতেছেন না। বাঙলার এই দুর্দিনে মহাপ্রাণ ও মনীষী অধ্যাপক ডাঃ সাহার মৃত্যুতে বাঙালী জাতি আরও দরিদ্র হইল।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ঢাকা জেলার বাণিয়াটি থানার অন্তর্গত শেওড়াতলী গ্রামে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব জগন্নাথ সাহার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। দারিদ্র্যের ও নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়া অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা নিজের আত্মবিশ্বাস অধ্যবসায় ও বিভিন্নমুখে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন জ্ঞানবিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা ও বিবিধ মহৎকর্ম্মের ব্রতে নিয়োজিত আশ্চর্য্য জীবন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের তিনি একজন প্রিয় ও সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পদার্থবিজ্ঞায় (Physics) মৌলিক নিবন্ধ (Relativity Pressure of Light and Astrophysics) রচনার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি (D. Sc.) লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে বৈজ্ঞানিক মনীষার জন্য তাঁহাকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২০ সালে অধ্যাপক সাহা তাঁহার "Thermal Ionisation Theory"

অথবা "Theory of Production electrically charged Atoms by Heat" নামে বিজ্ঞানের মৌলিক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মতবাদ পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন একটি সম্ভাবে আবিষ্কার করিয়াছে।

বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার জন্য অধ্যাপক সাহা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। লণ্ডনে ইম্পিরীয়াল কলেজ অফ সায়েন্সের অধ্যাপক এক্রাউলারের এবং বার্লিনে অধ্যাপক নার্নষ্ট (Prof. Nernst) সাহেবের ল্যাবরেটরীতে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করিয়া এই মতবাদের সম্ভাবে আরও পরিণত অবস্থায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপক সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে খয়রা অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে কয়েক মাস বাদে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য চলিয়া যান। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাদিক্রমে প্রায় দশবৎসর কাল থাকিয়া একনিষ্ঠ অনুরাগে ডক্টর সাহা পদার্থ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে তাঁহার অনেক গবেষণায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে তাবসম্পদে ও জ্ঞানের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ডক্টর সাহার অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁহাকে ইহার ফেলো (F. R. S.) নির্বাচনের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিল। ইতিপূর্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামানুজম্ প্রভৃতি মাত্র দুইজন ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহার পর ডাঃ সাহা প্যারিস বোর্ডন প্রভৃতি স্থানের বৈজ্ঞানিক সংসদের অনারারী ফেলো ও মেম্বারের পদপ্রাপ্তির সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৭ সালে কোমেতে (ইটালী) ইলেকট্রিক ব্যাটারীর বিখ্যাত উদ্ভাবক আলেসান্দ্রো ভোল্টার (জন্ম ১৭৪৫—মৃত্যু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ) মৃত্যুর শতবার্ষিকী উৎসব হইয়াছিল। ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে ডক্টর সাহা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে এই উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ঐ সময়ে Modern Review পত্রিকায় সেই বৈজ্ঞানিক সম্মিলনের তাঁহার তথ্যপূর্ণ একটি বিস্তৃত বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৭ সালে রয়েল সোসাইটির উদ্যোগে লণ্ডনে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা স্যার আইজ্যাক নিউটনের (জন্ম ১৬৪২—মৃত্যু ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ) ত্রিশততম জন্ম বার্ষিকী উৎসব হইয়াছিল। এখানেও ডক্টর সাহা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মস্কোয় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় মস্কো ও লেনিনগ্রাডে সোভিয়েট য়্যাকাডেমী অফ সায়েন্স-এর ২২০-তম বার্ষিক উৎসব হইয়াছিল। এখানেও ডক্টর সাহা নিমন্ত্রিত হইয়া ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সাহার একান্ত প্রচেষ্টায় এলাহাবাদে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্ব ও অধ্যাপনার উৎকর্ষে এখানে তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপনা-যশ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার ফলে পাঞ্জাব বাঙলা মধ্যপ্রদেশ মাদ্রাজ বোম্বাই মহীশূর প্রভৃতি ভারতের সব সমস্ত রাজ্য ও প্রদেশ হইতে বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রগণ এখানে যোগ দিতে লাগিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রজীবনের সময় হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত ডক্টর সাহার পরিচয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুতা হইয়াছিল। ১৯২২ সালে উত্তর-বঙ্গে দারুণ বন্যার ফলে ধনী দরিদ্র হাজার হাজার নরনারী গৃহহারা ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বন্যাপীড়িত নরনারীদের জন্য ছাত্র অধ্যাপক ও দেশকর্মী যুবকদের লইয়া একটি বিরাট সেবাদল গঠিত হইয়াছিল। আচার্য্য রায় মহাশয়ের নির্দ্দেশে নেতাজী সুভাষ বসু, ডক্টর সাহা এবং মহা বঙ্গী দুঃস্থ ও স্বেচ্ছাসেবক

জানাজন নিরোগীর দ্বারা মাসের পর মাস উত্তরবঙ্গে বন্যাপীড়িত অসংখ্য নরনারীদের রিলিফের জন্য বিরাট কার্য্য নিপুণভাবে সেখানে পরিচালিত ও সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র-বসু হরিপুরায় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ডক্টর মেঘনাদ সাহার নির্দ্দেশে ও পরামর্শ অনুযায়ী নেতাজী বসু ভারতের জাতীয় উন্নতির ক্রমিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ভারত ইউনিয়নের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনাকেই স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতেছেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডক্টর মেঘনাদ সাহা কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে 'পালিত প্রোফেসার'রূপে পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে থাকেন। ভারতবর্ষে পরমাণবিক শক্তির (Atomic energy) গবেষণা ব্যাপারে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। ডক্টর সাহার একান্ত চেষ্টাতেই কলিকাতায় Institute of Nuclear Physics নামক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট অফ সায়েন্স বিভাগের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার পথকে নানাভাবে প্রশস্তিত করিয়া দিয়াছেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ডক্টর সাহা ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারত ইউনিয়নের তাইস প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এই কমিশনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা কলিকাতার বহুবাজারে Indian Association for the Cultivation of Science-এর আজীবন সদস্য ছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে বহু বৎসর অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অধ্যাপক ডক্টর সাহা নানাবিধ কর্ম্মদক্ষতার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি আবার সম্পূর্ণ নূতনরূপে সংগঠিত করেন। তাঁহার অবিশ্রান্ত ও একান্ত চেষ্টায় ভারত ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইহার কার্য্যের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ দান (Grant) ক্রমে বার্ষিক কুড়ি লাখটাকায় পরিণত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রসারণের জন্য অল্প একটি বাড়ী তৈয়ার করিতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রচেষ্টায় প্রায় ত্রিশ বিঘা একটি জমি দান করিয়াছেন। নানারূপে এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনের পরে ডক্টর সাহা তাঁহার দীর্ঘকালের প্রিয় বন্ধু ও সহকর্ম্মী ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের হাতে ইহার অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে নানাপ্রকারে মহান কর্ম্মসাধনায় ও জ্ঞানব্রতে উজ্জ্বল ভারতগৌরব ও বাঙালীর প্রিয় নেতা ডক্টর মেঘনাদ সাহা কর্ম্মরত অবস্থাতেই নিউ দিল্লীতে প্ল্যানিং কমিটির অফিসের সম্মুখে গত সরস্বতী পূজার দিন (বৃহস্পতিবার ৩রা ফাল্গুন ১৩৬২—১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬) অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিলেন! স্বদেশপ্রাণ ও কর্ম্মযোগী মনীষীর জীবন কর্ম্মরত অবস্থাতেই শেষ হইল। এইরূপ মৃত্যু আপাতদৃষ্টে বেদনাদায়ক হইলেও—ইহার গৌরব মহত্প্রয়াসী মানবমাত্রেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য-বীর্য্য-তরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; তত্ত্ব হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়। ০ ০ ০ আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্ব্বল, ঘোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে?

—স্বামী বিবেকানন্দ

বরাহনগর

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ইতিহাসে তুমি নহ স্বগৌরব,
নহ ধন ধীর, কীর্ত্তিময়,
শৌর্য্যে বীর্য্যে নহ মহীয়ান্—
নাহি বৈভব ঋদ্ধিচয়।
খ্যাতিতে তোমার ভরে নাই দেশ
প্রতিশ্রুতে রটেনি নাম,
তবুও বিশ্ব ধন্য করিয়
হ'য়েছ সবার হৃদয়ারাম।

মহানগরীর একটি প্রান্তে
আছ একাকে আপনা-লীন,
সেজে আছ চির-সুস্থিরায়া
হ'য়ে আছ চির দীনাতিদীন।
যুগে যুগে তুমি নিকৃতি মাঝে
ধ্যানের আসন দিয়েছ পাতি',
ভক্ত-প্রাণের অম্লান ফুল
বক্ষে তোমার রেখেছ গাঁথি'।

গেরুয়ায় রঙ্গ অঙ্গে মুখাগে
চীর-বৈরিক-বসন প'রি,
ধর্ম্ম নিশান উড়'য়ে দিয়েছ
ত্যাগের মন্ত্র কণ্ঠে ভ'রি।
তোমার শান্তি আশ্রয় মাঝে
কত না আর্ত্তে দিয়েছ ঠাঁই,
দিয়েছ ভক্তি, দিয়েছ মুক্তি
বিশ্বে তোমার তুলনা নাই।

পশ্চিমে তব পাবনী গঙ্গা
কুলু কুলু রবে যেতেছে বহি ;
দিব্য-সুরের মূর্চ্ছনা বাজে—
যায় কোন্ বাণী মর্ম্মে বাহি'।
কোন্ স্বপনের রূপ যেন ফুটে,
জাগে যেন কোন্ স্বর্গ-ছবি,
তীরভূমি তব শুচি ও স্নিগ্ধ
সে কোন্ অমৃত স্পর্শ লভি।

প্রেমে মাতোয়ারা প্রেমের ঠাকুর
শ্রীগৌরাঙ্গ পাগল-প্রাণ,
এসেছিল তব আঙিনার তলে—
সে স্মৃতি আজিও দীপ্তিমান্।

ভক্তের কাছে ভাগবত শুনি
ধন্য করিল তোমার রজ,
শান্তির নীড় আজো হেরি তাই
তব পবিত্র হৃদয়-মঞ্জ।

গোরার চরণ-চিহ্ন ধরিয়া
আজো "পাঠ-বাড়ী" পুণ্য-ধাম,
ভক্ত-প্রাণের কণ্ঠে সেথায়
উঠে "হরি হরি" মধুর নাম।
আকাশে বাতাসে কি যেন আভাস,
কি যেন প্রেরণা আজিও জাগে,
আজো ভ'রে যেন সকল প্রাণ মন
অনুরাগ আর প্রেমের রাগে।

রামকৃষ্ণের তপস্যা-রূপ
জাগিয়া উঠিল তোমার মাঝে,
সারা জগতের নবীন তীর্থ
উজ্জ্বল হ'য়ে তাই ত' রাজে।
পাষাণী-প্রতিমা হ'ল চিন্ময়ী,
জড়ে হ'ল প্রাণ অক্লান্তময়,
ভবহারিণীর দিব্য প্রীতিতে
হ'ল চারিদিক জ্যোতির্ম্ময়।

পঞ্চবটীর পবিত্র পীঠে
জ্ঞানী আর গুণী আসিল কত,
বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
এখানে লভিল মহান্ ব্রত।
মহামুক্তির জ্ঞান ভক্তির
এখানে মিলিল প্লাবন-ধারা,
আশু-মানব এখানে ভাঙিল
লৌহ-কঠিন ভবের কারা।

বরাহনগর, সার্থক তুমি,
সার্থক মোরা তোমারে ল'ভি,
যুগে যুগে তুমি তোমার মাঝারে
এঁকেছ পুণ্য-স্বর্গ-ছবি।
স্পর্শ তোমার অমৃতময়,
বক্ষ তোমার মুক্তি-ঠাঁই
তোমার ধূলিতে লুটাইয়ে শির
চির আনন্দ হৃদয়ে পাই।

পৃথিবীর বয়স-নির্দ্ধারণে বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা

পৃথিবীর সঠিক বয়স নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নয়, তবে এই বিষয়টি লইয়া দেশ বিদেশের ভূতত্ত্ববিদ ও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানীগণ বহুদিন ধরিয়া গবেষণারত রহিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক হাক্সলী তাঁহার গবেষণালব্ধ তথ্য হইতে বলিয়াছেন যে, প্রাণের উন্মেষ হওয়ার পূর্ব্বেও পৃথিবীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল এবং তখন পৃথিবীতে উত্তপ্ত তরল লৌহ-স্রোত প্রবহমান ছিল। সেই সময় হইতে বয়স গণনা করিলে দেখা যায় পৃথিবীর দশকোটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে।

এই মত সম্পর্কে বহু মতভেদ রহিয়াছে। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, পৃথিবীর বয়স ১২০ হইতে ১৪০ কোটি বৎসরের মধ্যে। তাঁহারা বলেন—পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। কারণ তরল ধাতব পদার্থ ক্রমে প্রস্তর ও তাহা হইতে মৃত্তিকায় পরিণত হইতে কিছু কম সময় অতিবাহিত হয় নাই। পৃথিবীর বয়সকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ উল্লিখিত মন্তব্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'এজয়েক' যুগের সময়কাল ছয় হইতে আটকোটি বৎসর। সে যুগটি বাস্তবতঃ প্রাক-জৈবিক যুগ।

পরবর্ত্তী যুগ 'প্রোটোজোয়েক'। এ সময় পৃথিবীতে দৃশ্যমান জীবের অস্তিত্ব না থাকিলেও অণুবীক্ষণগ্রাহ্য জীবের আবির্ভাব ঘটে। ইহার পরবর্ত্তী তিন কোটি হইতে দুই কোটি ছাব্বিশ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বে "পেলিয়ো-জয়েক" যুগে কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন জলজ প্রাণী ও টিলোবাইট প্রভৃতি জীব সমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করিত। পরের এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব অবধি 'উত্তর পেলিও জয়েক' যুগ ধরা হয়। এই কালেই উভয়চর জীব, মাছ, কার্প, অষপুচ্ছ, ব্যাংচাতা, তাওলা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। পরবর্ত্তী চার লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "মেসোজয়েক" যুগ। এই যুগে বিরাটাকার সরীসৃপেরা পৃথিবীতে বাস করিত। তৎপরবর্ত্তী যুগের নাম কেইনোজয়েক যুগ এই সময় স্তন্যপায়ী জন্তুর উৎপত্তি হয়। আনুমানিক একলক্ষ বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইয়োসিন' যুগে পৃথিবীর আদিম এবং নূতন ভূভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর মর্কট জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। পরবর্ত্তী যুগের নাম "ওলিগোসিন"। এই যুগেই মনুষ্যাকৃতি ক্ষুদ্র বানর জাতীয় জীবের বিবর্ত্তন সুরু হয়। এই ক্রমোন্নতি বিভিন্ন ধারায় পরবর্ত্তী "মিওসিন" যুগে মনুষ্যরূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। তবে, নয় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেই মানুষের কিন্তু প্রথম আবির্ভাব কাল নয়। "হাইডেলবার্গ" ও "পিল্টাডাউন" মানব পৃথিবীতে বিচরণ করিত একলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এবং পাঁচ লক্ষ বৎসরের মধ্যে। সেই হিসাব অনুসারে "প্লাইওসিন" যুগকেই মানব-জাতির প্রথম আবির্ভাব কাল বলিয়া গণ্য হয়।

সুতরাং আলোচ্য তথ্য হইতে মনে হয়—ভূতত্ত্ববিদগণের এই গণনা অনেকাংশেই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও এই বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নিকট আজিও সমান রহস্য লইয়াই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

—(আমেরিকান নিউজ)

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাচীন মুদ্রা

দক্ষিণ ভারতে পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের দ্বারা আবিষ্কৃত

মাদ্রাজের প্রধান সহর হইতে বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ তারিখের একটি খবরের কাগজের সংবাদদাতার নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া গিয়াছে :—

দক্ষিণভারতে মাদ্রাজের অন্তর্গত অন্ধ্রদেশে গুন্টুর (Guntur) জেলার অমরাবতীর 'ধরণী-কোট' নামে একটি জনপদ আছে। এখানে আট হাজার প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রূপার টাকাগুলির প্রত্যেকটিতেই পাঞ্চ করা (punched) এক একটি ছিদ্র আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক পণ্ডিত এই আবিষ্কৃত সমস্ত প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেরই অভিমত, এই প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি দক্ষিণভারতেই অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে কোনও রাজ্যের শাসকদের দ্বারা তৈয়ারী করানো হইয়াছিল। তাঁহারা মনে করেন—ইহাদের নির্ম্মাণ-কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এবং ঐ সময়ে অন্ধ্রদেশে ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোনও রাজারা রাজত্ব করিতেন। ঐ মুদ্রাগুলি সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মাদুরাই জেলায় পেরিয়াকুলাম অঞ্চলের অন্তর্গত বোদিনাইকানুর নামক স্থানে কিছুকাল আগে ১১৩৮টি পাঞ্চকরা রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই মুদ্রাগুলির বিশেষত্ব এই যে—ইহাদের এক পিঠে একটি মৎস্য-প্রতীক আছে। মাদ্রাজের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে যাঁহারা অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা সকলেই জানেন—পাণ্ডীয় বংশের রাজাদের শাসন-তন্ত্রের প্রতীক ছিল—একটি মৎস্যের মূর্ত্তি।

—স্ট্যাফেন্স

দক্ষিণ মেরু অভিযানের নবতম পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক (১৯৫৭-৫৮) সম্মেলন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ মেরু অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মার্কিণ অভিযানের একটি অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের লিটল আমেরিকায় স্থাপিত হইয়াছে। অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় দশ সহস্র টন খাদ্য ও সাজ সরঞ্জাম নামাইয়া দিয়া ইতিমধ্যেই তিনটি মার্কিণ জাহাজ লিটল আমেরিকা হইতে যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করে।

লিটল আমেরিকার অভিযান-কেন্দ্রে প্রায় ৭৮ জন আমেরিকান রহিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার কালে কর্ম্মীদের বাস্তবতঃ বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করিতে হইবে। সংযোগকারী জাহাজ তিনখানি প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে কিছুদিন ধরিয়া স্থল অথবা জলপথে বহির্জগতের সহিত তাহাদের কোনও যোগাযোগ থাকিবে না। তিন সপ্তাহ পরে একখানি মালবাহী ও একখানি বরফ-ভাঙা জাহাজ আসিয়া সেখানে ডাক পৌঁছাইয়া দিবে। তাহার পরে প্রায় এক বৎসরকালের মধ্যে তথায় আর কোনও জাহাজ যাতায়াত করিবে না।

প্রায় ৭০০ ফিট গভীর বরফের উপর উক্ত কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা, একটি বেতার-কেন্দ্র ও একটি পোষ্ট অফিস আছে। ইহা ব্যতীত অভিযান কার্য্যের সুবিধার জন্য একটি বিমান রাখা হইয়াছে। সেই জনহীন প্রান্তে শিবিরের কক্ষগুলি গরম রাখা ও কর্ম্মীদের অন্যান্য সুখ সুবিধার সুব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

—(স্ট্যাফেন)

টমেটোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ আবিষ্কার

পৃথিবীর তরিতরকারির ইতিহাসে টমেটোর ইতিহাস নানা দিক দিয়া অনন্যসাধারণ।

অনসমাজে প্রচলনের পর হইতে খুব কম সময়ের মধ্যে ইহা অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। শুধু ইহার মনোরম বর্ণ ও আস্বাদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তিই নয়, যোগাযোগের ক্ষমতাও ইহার জনপ্রিয়তাকে সুদৃঢ় করিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার এণ্ডেস পর্ব্বতাঞ্চলের এই রক্তিম বন্য ফলের গাছকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী করা হয় শুধু একটিমাত্র শোভাবর্দ্ধনেরই জন্য। গোড়ার দিকে ইহাকে বলা হইত—'লাভ আপেল'। এমনকি ১৮২০ সাল অবধিও এই ফলটিকে লোকে বিষাক্ত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল ইহা ভোজনের দুঃসাহস দৈনিকার দিনে অনেকেরই ছিল না। আজ দেশে ইহার গুণকীর্ত্তন, চাষবাস ও নানাবিধ উন্নয়নমূলক পরীক্ষাদির অন্ত নাই। সমসাময়িক যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল দেশ আমেরিকার চাষের দিক হইতে টমাটো তৃতীয় স্থান অধিকার করিতেছে।

মার্কিণী জীব-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে আজ এই তরকারী বা ফলটির জীবনে এক নূতনতর অধ্যায় উন্মোচিত হইতে যাইতেছে—টমাটো চিকিৎসার উপযোগী ঔষধাদি সৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছে।

টমেটোর রসের মধ্যে এক 'অ্যান্টিবায়োটিক' রসায়ন বিজ্ঞানীগণ সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নূতন পদার্থটির তাঁহারা ইহার নামকরণ করিয়াছেন টমাটিন্। মানুষ বা যে কোন প্রাণীর ত্বকের রোগে ইহা অত্যন্ত কল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর্জ্জেন্টিনার এক ঔষধ প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবসা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের গবেষকগণ টমাটিন হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সহযোগে টমেটিডাইন নামক একটি বিশেষ রসায়ন প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উইওমুর লেবরেটরীতে বর্ত্তমানে ইহার জোর পরিক্ষাদি চলিতেছে। এই টমেটিডাইন মানুষের মূত্রাশয় উপস্থ এবং হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত নানা পীড়ার উপশম ঘটাইতে সক্ষম, উহাই গবেষকদের অভিমত। অপরাপর রোগ নিরাময়ের জন্যও মূল টমেটো রসকে বহুপ্রকারে রূপান্তরিত করা হইতেছে।

দেহস্থ রক্তবাহী শিরার সঞ্চয়-ভাণ্ডার

রোগ চিকিৎসার সুবিধার জন্য রক্ত-সঞ্চয়ের কেন্দ্র বা ব্লাড-ব্যাঙ্কের প্রচলন আজকাল খুবই সর্ব্বদেশে বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সভ্য ও উন্নত দেশেই ইহার প্রবর্ত্তন ও সংগঠন দেখা যাইতেছে, কিন্তু সম্প্রতি মানব-দেহের শিরা-উপশিরা সংরক্ষণের জন্যও নানা স্থানে সংগ্রহ ভাণ্ডার ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে। হসপাতের চিকিৎসকগণ এদিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রগতির দাবী রাখেন।

দুর্ঘটনায় হত অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের দেহের শিরাসমূহ সঞ্চয় করিয়া ওলন্দাজ ডাক্তারগণ এক চিকিৎসা-ভাণ্ডার গঠন করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ দেহশিরা ব্যাঙ্ক নামেই পরিচিত। যে সব রোগীদের শরীরের প্রধান শিরা আকস্মিক আঘাতের ফলে ছিঁড়িয়া যায় বা কোন রোগের ফলে বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, তাহাদের জন্য এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করা হয়।

চিকিৎসকগণ ঐ প্রকারে সংরক্ষিত শিরাসমূহ রোগীদেহে গ্রথিত করিয়া দিয়া তাহাদের জীবন দান করেন। এই নূতন ধরণের ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতার ফলে বিশেষ করিয়া অস্ত্রোপচারের বহুতর সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ছিমাদ্রি—শুক্রবার ১১ই ফাল্গুন ১৩৬২ (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬) সাপ্তাহিক সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ভারতীয় সভ্যতায় দ্বিজত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য

এই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি, ব্যবহারিক জীবন থেকে সৌষমিক জীবনে মানুষকে উন্নীত করেছিল। এই সৌষমিক জীবন, মানুষের জীবনে, ব্যবহারে নীতিতে নানা বিচিত্র অনুশয়ে সমৃদ্ধ। মানুষের ব্যবহারে ও চিন্তাধারায় যে ক্রিয়ার পর অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া বৃত্তিকে দেখতে পাওয়া যায়, সৌষমিক চিন্তায় ও জীবনে এই প্রতিক্রিয়া বৃত্তিকে যথাসম্ভব নানা নন্দিত কর্মে, ব্যবহারে ও চিন্তায় লোপ ক'রে সুকুমার ঔদার্য্যের দ্বারা ক্ষমা করবার, ভুল সংশোধন করবার একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়া বৃত্তিকে লুপ্ত করিবার জন্য নানা নন্দিত কর্মে চিন্তাধারায় যে সুকুমার ঔদার্য্যকে চিত্ত মধ্যে উদ্বোধনের চেষ্টা করা হয়, তাহাই হ'চ্ছে অনুশয় বা বৃদ্ধি বৈরাগ্য। পৃথিবীতে ক্রিয়া থেকে প্রতিক্রিয়া-বৃত্তিকে লুপ্ত করবার জন্য গভীর সমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট বুদ্ধি বৈরাগ্যকে উদ্বোধনের চেষ্টা বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। ক্রোধকে, অক্রোধের দ্বারা জয় করবার যে নির্দ্দেশ আমরা দেখতে পাই তা হ'চ্ছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাঝে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অনুশয়-বোধের উদাহরণ।

এই অনুশয়-বোধের মধ্যে যে চিন্তার ধৈর্য্য ও বুদ্ধির বৈরাগ্যকে আমরা লক্ষ্য করি তাহা ঘ'টে ওঠে নন্দিত বৃত্তির মাঝামাঝে। এই নন্দিত বৃত্তি আমাদের চিত্তবৃত্তিকে যে আনন্দ ও রসের সঞ্চার করে তা ক্রমে আমাদের চিরাচরিত বৃত্তিগুলির উপর একটা নন্দিত সংস্কার সঞ্চারিত করে। এই নন্দিত সংস্কার ক্রমে ক্রমে আমাদের চিত্ত-বৃত্তিতে উহার ফলশ্রুতিস্বরূপ গভীর সামঞ্জস্য ও নিগূঢ় শৃঙ্খলাবোধকে জাগরিত করে। নন্দিত সংস্কার যে সুষমা বা সৌন্দর্য্যকে বোঝে, তা সুগভীর সামঞ্জস্যে ও শৃঙ্খলায় মানুষের চিত্তকে দোলা দেয়।

এই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা মানুষের চিত্তে জীবনের হ'য়ে বিশ্বের হয়ে একটা সূক্ষ্ম মমত্ব বা দায়িত্ব বোধকে উপলব্ধি করিতে শিখে। এই মমত্ব অনুভব ও দায়িত্ববোধই ক্রিয়ার পর অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া-বৃত্তিকে মনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে আর স্থান দিতে চায় না, যেখানে সে নিজের ঐ সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যভূষিত চিত্তেই একটা অনর্থের ও অশিবের আশঙ্কা করে এবং এমনি ক'রে সে নিজেকে পদে পদে খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলতে বাধা দেয় এইভাবে মানুষের মানস-জীবন উচ্চতর সভ্যতায় জগৎ ও জীবনকে আরও সুগভীর উপলব্ধির পথে, আদিম খেয়াল মনের স্তর থেকে আরও উচ্চ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়।*

সৌষমিক বৃত্তির ব্যবহারিক সংস্কারের অতি সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন এইভাবে করা হ'লো।

সৌষমিক তাত্ত্বিক সংস্কারের আর একটা দিক আছে। তার প্রভাবই ঐ শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য-প্রিয়তারও গোড়ায়। সৌষমিক বৃত্তির যে সংস্কার আমাদের মনের নিগূঢ় চিত্তবৃত্তিকে নন্দিত ক'রে জগৎ ও জীবনে সামঞ্জস্যের মূল শক্তিটিকে অর্জ্জন করে, তা হ'চ্ছে আনন্দ-সংস্কার। বলা বাহুল্য এই আনন্দ-সংস্কার কোন প্রয়োজনের আনন্দ নয়। এই আনন্দ-সংস্কারই ক্রমে ক্রমে মানস গভীরে একটা ধৈর্য্য ও ধীর প্রসন্নতার জন্ম দেয়। এই প্রসন্নতার ভিত্তিভূমিতেই সুকুমার বৃত্তিগুলি যেমন প্রকাশ পাবার একটা দৃঢ় আধার পায়, তেমনি আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর শক্তির ও সত্যের পথে অগ্রসর হবার মানসিক ধৈর্য্যকেও এই প্রসন্নতা ধরিয়া থাকে। সৌষমিক বৃত্তির আশ্রয়ে যে তাত্ত্বিক উজান সংস্কারকে আমরা সুকুমার কলাশিল্প রূপে দেখিতে পাই, সেই সুকুমার কলাশিল্পের মধ্যে তার নিগূঢ় জীবনীশক্তিরূপে

যে শাশ্বত আনন্দ বিদ্যমান সেই আনন্দের সমানধর্মী প্রভাব থেকেই ঐ প্রসন্নতার উদ্ভব হয়। সভ্যতাকে শুধু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক বাস্তিক ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে এই প্রসন্নতাই ক্রমে ধৈর্য্য ও ধরিত্রী সম্পন্ন একটা সুগোল পরিপুষ্টী প্রদান করে। মানুষ এই রকম ভাবে ব্যবহার ও চিন্তার ক্ষেত্রে সভ্যতার আরও নিগূঢ় অন্তর্দেশে প্রবেশ করে। সভ্যতার এই সৌনমিক ক্ষেত্রে মানুষের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয়।

এই সৌনমিক বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিলে সভ্যতার ক্ষেত্র শুধু স্বার্থবোধের পার্থিবিক সামঞ্জস্যরূপে পরিণমিত হয়। সৌনমিক বৃত্তি মানুষের পূর্ণতার পথে দ্বিজত্বকে আনয়ন করে, ব্রাহ্মণত্বকে নয়। সৌনমিক ক্ষেত্র, চিত্তবৃত্তির নন্দিত সামঞ্জস্যে নিঃস্বার্থপরতার আভাষ দিলেও পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা সৌনমিক বৃত্তি দিতে পারে না। নীরন্ধ্র বৈষয়িক প্রয়োজনে ব্যস্ত চিত্তবৃত্তিকে এই সৌনমিকতা নন্দিত অবকাশের দ্বারা সমস্ত কিছু মানসগুণাবলীর একীভূত অহেতুক প্রকাশকে ক্ষণিকের জন্যও আমাদের চিত্তে আসন্ন ক'রে তুলে এবং তা-ই অপূর্ব্ব সুষমাভাবে সমস্ত জীবনকে ভরিয়ে তোলে। সৌনমিকতার যে আনন্দ-সংস্কার মানুষের চিত্তে সৌনমিক অনুভূতির ধরণটাকে স্পষ্ট করে তা শুধু নিরালম্ব নয়। তার আলম্বন অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে ঐ মানস-গুণাবলীর পুঞ্জীভূত প্রকাশের মধ্যে। এই প্রকাশশীলতাই আনন্দ-সংস্কারের উপাদানগুলিকে পুষ্ট করে। এই কারণেই সৌনমিক চিত্তবৃত্তিতে যে শোভনতা, শালীনতা, সৌকুমার্য্য প্রভৃতি আসন্ন হ'য়ে ওঠে, তা শুধু আনন্দ-সংস্কারকে পাথেয় ক'রে নিয়ে চলে। তা ঐ মানস-গুণাবলীর পুঞ্জীভূত প্রকাশের শক্তিতে শক্তিমান। ঐ মানসগুণ 'প্রকাশশীলতাই' শোভনতা, শালীনতা, সৌকুমার্য্য প্রভৃতি মানসগুণাবলীর শক্তি-উৎস।

এই যে অনুসন্ধমূলক নানা বিচিত্র গুণাবলী এর অভিব্যক্তি সৌনমিক চিত্তবৃত্তিতে অখণ্ডিত সামঞ্জস্যে ফুটে ওঠে। এই ফুটে ওঠার ব্যাপারটা সৌনমিক বৃত্তির সৌন্দর্য্য বা চমৎকারিত্ব ধাতুকে অতি প্রচ্ছন্নভাবে গ'ড়ে তোলে। এই কারণেই সৌনমিক বৃত্তি শুধু আনন্দ সংস্কারে শেষ নয়, তার মধ্যে আছে সভ্যতার ছন্দ ও শৃঙ্খলা। এই অহেতুক আনন্দ-সংস্কার ও সভ্যতার সুষমা এই দুইয়ে মিলেই সৌনমিক বৃত্তির চরিতার্থতা।

সৌনমিক স্তর সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন করবার জন্য সভ্যতায় সুষমা-বোধের আধারস্বরূপ নানা উদারতর মানস গুণাবলী লক্ষ্য ক'রেছি। ঐ মানস গুণাবলী যে লক্ষ্যে নিজেদের চরম চরিতার্থতা পেতে চায়, গুণের সমস্ত গুণত্বকে বজায় রেখে সেখানে তারা ব্যবহারিক নিয়ম কানুন থেকে অবাধ মুক্তি পেতে চায়, তা-ই হ'চ্ছে পারমার্থিক দিক। সৌনমিক স্তরে যে আনন্দ-সংস্কার বর্ত্তমান, তাহা উভয় জগতের মাঝে একটা সুবাগত সূত্র স্থাপনের যেন কাজ করছে।

সৌনমিক মুক্তির আনন্দ-সংস্কারে যে সমাজিক, ব্যবহারিক সীমাবোধ ধরা পড়ে তা শুধু প্রয়োজন মুক্তির আনন্দ সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল রাখে। তারপরে সে আর কিছু করে না। সৌনমিক বোধে মানবের চিত্তের দিকে যে উদারতর ও সুশোভন পূর্ণতা অনুভব করা যায়, তা সর্ব্বদাই সামাজিক ও ব্যবহারিক বিধিনিষেধকে একটা নিগূঢ় ও গভীর মূল্য বোধে ধারণ ক'রে সৌনমিক বোধের আনন্দ-সংস্কারকে একটা গুণগত মর্য্যাদা দান করে।

পারমার্থিক স্তরে এই বিধি নিষেধ নেই। আনন্দ-সংস্কার এখানে গুণগত মর্য্যাদায় বিকৃষিত নয়। কারণ, মর্য্যাদা-বোধ একটা সামাজিক প্রতিক্রিয়া বৃত্তি, তাহা আনুপাদনিক ও নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানানো। সৌনমিক স্তর এই শৃঙ্খলার অনুগত পারমার্থিক স্তরে এই বিধি নিষেধ নাই। সমাজে যাহা শোভনতা ও উদারতা দ্বারা সংযত থাকে, শোভনতা ও উদারতা সেখানে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের উপায়রূপে কাজ করে, এই স্তরে সেই শোভনতা ও উদারতা

উপের হ'য়ে যায় সেখানে উপায়রূপে যাদের ধ'রে রেখেছিল তারা এই স্তরে সেসব জীর্ণ হ'য়ে যায়।

পারমার্থিক স্তর মূলতঃ জগৎ ও জীবনের দ্বৈত বোধ থেকে মুক্তির স্তর। দ্বৈতবোধে সে আপেক্ষিকতা, নৈমিত্তিকতা বর্তমান থাকে তাতে জগৎ ও জীবন পরস্পরের প্রতি পার্থক্যে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। তখন চারিদিকেই সতর্ক দৃষ্টি। সংশয় দ্বিধা আনন্দ ও আশঙ্কার বৈচিত্র্যই উদারতা ও সুশোভনতারূপে সৌলমিক গুণসমূহের দ্বারা সংযত থাকে।

পারমার্থিক স্তরে এই দ্বৈতবোধ থাকে না। ফলে ঐ সমস্ত নৈমিত্তিকতা এবং আপেক্ষিকতাও থাকে না এবং এর ফলে জগৎ ও জীবন বোধের মধ্যে পার্থক্যসূচক কার্য-কারণের নানা বিচিত্র বুনানিও থাকে না। তখন কি হয় এটা একটু অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায়। সৌলমিক স্তরে জগৎ ও জীবনের যোগসূত্ররূপে সে মানসের ভাববৃত্তি-গুলি বাস্তব হ'য়ে উঠ্‌তে চেয়েছিল এখানে (পার-মার্থিক স্তরে) সে-গুলোই যেন এক একটা ব্যক্তি হ'য়ে ওঠে। মাঝে থাকেনা কোনও রকম আপেক্ষিকতা ও নৈমিত্তিকতা। সেজন্য মুক্তিও হয় অবাধ। সৌলমিক স্তরে উন্নীত মানুষ বিজ্ঞান লাভ ক'রেছিল। এই পারমার্থিক স্তরে উত্থিত হয়ে মানুষ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।

মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে নানাবিধ জৈব তাগিদ, সে প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করে তার নির্দিষ্ট ধরণটি হ'চ্ছে,—নিজ স্বার্থবোধের অনুকূলে মনের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া-বৃত্তিকে সাফল্যের সঙ্গে নিপুণভাবে পরিচালিত করা। এই পরিচালনার জন্যে অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগকে যথাযথ গ্রহণ করাই হ'চ্ছে মানুষের সমগ্র জৈব ইতিহাসের মূল কথা। এই সুযোগ এবং পরিবেশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে শুধু জড় প্রতিক্রিয়াশীলতার ভাবে গ'ড়ে তোলে। বুদ্ধিবৃত্তির এই জড় ও প্রতিক্রিয়াশীলতা জগৎকে তার কাছে শুধু জৈব ভোগের সামগ্রী হিসাবে তুলে ধরে। এই জড় প্রতিক্রিয়াশীলতা যে সমস্ত বৃত্তির মানুষের মধ্যে উত্থিত করে, তা শুধু জৈব তাগিদের বশে আসন্ন কর্মশীলতার মধ্যে নিজেদের বিকৃত করে। এই আসন্ন কর্মশীলতা জগৎকে শুধু চাওয়া ও পাওয়ার দিকে অনুভব করে এবং সেইভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে ও অনুসন্ধানকে গঠিত করে।

বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুসন্ধান জগৎতত্ত্বে শুধু করার ইতিহাস। এই করার মধ্যে সে অধ্যবসায় লক্ষ্য করা যায় তা সর্বদাই আসন্ন উদ্দেশ্যবোধে এবং ব্যবহারিক ফলদর্শিতায় নিজের সমস্ত চেষ্টাকে বিকীর্ণ করে। এই বিকীর্ণ করার ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে একটা বিশিষ্ট সংস্কারে মানসে গঠিত হ'তে থাকে। মানসে গঠিত এই বিশিষ্ট সংস্কারটাই হচ্ছে প্রেরণামূলক সংস্কার। এই প্রেরণা সর্বদাই বিশিষ্ট উদ্দেশ্য-বোধে নিয়োজিত হয় ব'লে তার মধ্যে ব্যবহারিক কৃত কারিতার পরিচয় একেবারে নীরন্ধ্র।

ব্যবহারিক কৃতকারিতার এই নীরন্ধ্রতায় মানুষ যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, যখন তার কাছে প্রয়োজন-বোধের ধরণটি আসন্ন উদ্দেশ্য বোধ ও ফলদর্শিতায় শুধু একটা বাঁধা-ধরা পথে অন্তহীন পুনরাবর্তিত হ'তে থাকে, তখন সে মানসে একটা ক্লান্ত ও অবসন্নতা বোধ করে। এই ক্লান্তি ও অবসন্নতা ব্যবহারিক ফলদর্শিতার প্রয়োজন-বোধের মধ্যে উদ্ভব হয় ব'লে এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অপ্রয়োজনের তাগিদ সে তার মানসে অনুভব করে। প্রয়োজনের মধ্যে সে বাঁধা-ধরা পথ আছে তার মধ্যে কোথাও এতটুকু অবসর বা ফেলে-ছড়িয়ে-যাবার পথ নেই। সবটাই একটা বিশিষ্ট কার্য কারণ ও পূর্বাপর বোধে নির্দিষ্ট থাকে। মানুষ তার জীবন-যাত্রার এই অবস্থা অধিগত করলে তারপরে চিরন্তন নির্দিষ্ট পথের অতি পরিচয়ের ফলে তার সব বৈচিত্র্য ও রহস্য তার কাছে নিঃশেষিত হয়। অতি পরিচয়ের ফলে সে অন্ধ ও জড় অভ্যাসের বশীভূত হ'য়ে পড়ে। এই অন্ধ ও জড় অভ্যাস তার চিত্তকেও অসাড় ক'রে ফেলে। এই অসাড়

চিত্তের পাষাণতার তার কাছে বড় তুচ্ছ ঠেকে। প্রয়োজন-বোধের নীরস তাই তার অসাড় চিত্তের কারণ। মানসে আরও গভীরতর বৃত্তির উদ্বোধনে এই অসাড় চিত্তের পাষাণতার তার কাছে অনুভূত হওয়ায়, সেই ক্ষণেই তার মধ্যে জেগে ওঠে অপ্রয়োজনের তাগিদ বা প্রেরণা। এই তাগিদেই হয় ব্যবহারিক থেকে লৌকিকতার উদ্বোধন। এই লৌকিকতায় সভ্যতার পথে মানুষের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

এই লৌকিকতায়, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনের জীবনে একটি নন্দিত অবকাশ ঘটে। এই নন্দিত অবকাশ নীরস ব্যবহারিক জীবনের চিরাবৃত্ত অভ্যাসের জড়তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। এইখানে মানুষের চিন্তাধারা জগৎ ও জীবনের আরও সুদূর দিকচক্রবালে প্রসারিত হয়। এই নন্দিত অবকাশকে মানুষ তাত্ত্বিক সুষমার শিল্পকলায় প্রসারিত করে এবং ব্যবহারিক বোধে নানাবিধ উদার ও সুশোভন জীবনচর্যায় প্রসারিত করে। বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের মধ্যে মানুষের এই দ্বিজত্ব প্রাপ্তির একটা সুগভীর ইতিহাস লুক্কায়িত আছে।

ক্রৌঞ্চ মিথুনের আনন্দ-ক্রীড়া যখন আদিকবি মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে তখনই এলো ব্যাধের শর। এতেই তাঁহার মনে করুণার কান্না উপচেয়া গেল। এই অতি গভীর কারুণ্য-বোধ প্রকাশ হ'ল কবিতায়। আদি কবির গতময় জীবনের যে চিরন্তন পুনরাবৃত্তি তার পক্ষকে বাঁধা-ধরা ভাবে বদ্ধ ক'রে রেখেছিল, তাতে ঐ সুগভীর করুণার ভাষা নেই। কারণ, গতময় নীরস জীবন সবটাই প্রয়োজনে নিঃশেষিত। এই প্রয়োজনে নিঃশেষিত জীবনে সুগভীর কারুণ্য-বোধ কোন বাস্তব ও জৈব অর্থ খুঁজে পায় না। সেইজন্যেই তার প্রকাশের ভাষা গদ্যে ফুলায় না সেই হয় পদ্যের। ভাষার মধ্যে গভীরতম জীবন-রসের উদ্দীপন এমন একটা ব্যক্তির সমাবেশ ক'রে যাহার প্রকাশ গদ্যে ফুলায় না। গদ্য সেখানে শেষ হ'য়ে যায়। সেখানে প্রকাশের ধরণ এমন একটা-মাত্রার অন্বেষণ করে, যার মধ্যে নিজের ঐ গভীর জীবন-রসকে সে খানিকটা পরিমাণ প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই প্রত্যক্ষ করবার আকাঙ্ক্ষায় সে ভাষায় একটা দোলা আনে যাহা তার ঐ জীবন রসের অনুগত। বাল্মীকির মনুষ্যেতর জীব জীবনের প্রতি অতি গভীর কারুণ্য-বোধ চকিতে ভাষার মধ্যে যে দোলা হ'য়ে ফুটে উঠেছিল, তা-ই কবিতা। সে মুহূর্তে এই দোলন ফুটে উঠল সেই মুহূর্তেই সর্ব্বব্যাপী করুণা উদারতা ও সুশোভনতার বীজ বাল্মীকি মারফত মানুষের মনে উপ্ত হ'ল। যে করুণায় মনুষ্যেতর জীবের প্রতি বাল্মীকির অনিবার্য্য হৃদয়বেগ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল, মনুষ্য জগতের পানে স্বভাবতই সকলের অগোচরে তা আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছিল। এই করুণাবোধ জৈব প্রয়োজনের বিরুদ্ধে শুধু অপ্রয়োজনীয় নানা গভীর মানস বা চিত্তবৃত্তিকে, মানুষের হ'য়ে স্বভাবতই উদ্ভাসিত ক'রেছিল। স্বার্থবোধের বা জৈব প্রয়োজনজাত অব্যবহিত মানস প্রতিক্রিয়াটা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বা নীরস বিষয়-বোধে যথাযথভাবে বোধগম্য হয়। এর বাহিরে তাহা অপ্রয়োজনের কোটায় পড়ে।

মানুষের সম্বন্ধে যা কিছু ব্যাপার যখন ঐ প্রয়োজন বোধের কোটায় পড়ে তখন বাল্মীকির ঐ করুণার অর্থ কিন্তু জগতে বোধগম্য হয় না। কারণ প্রয়োজন-বোধের সে সমস্ত প্রত্যয়-ধারা বর্ত্তমান, সেসব জৈব স্বার্থবোধে সীমায়িত হ'য়ে থাকে। এই জৈব স্বার্থবোধ শুধু বিষয়ের দিক দিকে জগৎকে বোঝে ব'লে তার সমস্ত মানস-সঙ্গতি-ধারা বিষয়-বোধে বা জৈব স্বার্থবোধে যথাযথ মূল্যে দৃঢ় হ'য়ে যায়। সঙ্গতিধারার এই যথাযথ মূল্যবোধ জগৎ এবং মানুষের মধ্যেকার সম্বন্ধটাকে শুধু অব্যবহিতক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্তরে অবধারণ করে। মানুষের সভ্যতায় এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণাত্ম মানুষের জৈব জীবনকে

একটা অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে চালিত ক'রে তার সমস্ত রহস্যকে নিঃশেষিত ক'রে ফেলে।

কি সম্বন্ধ-বোধে, কি নানা কার্যধারায় এই ন্যায়শাস্ত্রীয় অন্তহীন পুনরাবৃত্তি জগৎ ও জীবনকে শুধু প্রয়োজন ও নৈব বোধে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ব'লে মানুষ মানুষে সম্বন্ধের অহেতুকতাকে তার ঐ প্রয়োজনমূলক মূল্যবোধে বা সঙ্গতিধারায় গ্রহণ করতে পারে না। যতক্ষণ ঐ অহেতুকতাকে মানুষ বোঝার ততক্ষণ তার সমস্ত প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে ঠেলে বুনে নীরন্ধ্র ভাবে ব'সেছিল, কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখে নি। আদিকবি বাল্মীকি যখন ঐ শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রেছিলেন তখন তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতা সেই মুহূর্তেই তাঁকে ঐ নীরন্ধ্র প্রয়োজন-বোধ থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিল। এই অহেতুকতার মধ্যে যে সত্যময় জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি তার প্রকাশের ধরণটিও অপূর্ব অবকাশময়, তার পরিচয় কাব্যসৃষ্টিতে। সত্যের মধ্যে শুধু প্রয়োজনবোধের বিকাশই দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের একান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে পরস্পরের কাছে প্রকাশের যে মাধ্যম প্রয়োজন হয় তাহাই হ'চ্ছে গদ্য। বাল্মীকির বিশাল হৃদয়ের উদ্বেলতা এই ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল সেইজন্যে তার প্রকাশও ঘটলো এমন্ এমন্ একটা মাধ্যম্ অবলম্বন ক'রে, যা অপ্রয়োজনের স্বাভাবিক উল্লাসে, নীরন্ধ্র প্রয়োজন থেকে নন্দিত অবকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠার পিছনে নিগূঢ় জীবন-বোধ বর্তমান।

এই নিগূঢ় জীবনবোধ মরণের আলোকে সমস্ত সম্বন্ধবোধকে বুঝতে গিয়ে জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে গভীর মননে ধারণাবদ্ধ হয়। এই নশ্বরতা সম্বন্ধে অবহিত হ'লে, জীবনের মধ্যে চাওয়া পাওয়ার ঐকান্তিকতা বিশ্ববোধে কোন আপাতঃ সঙ্গতি খুঁজে পাবে। তার ফলে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ বোধে শুধু পরতন্ত্র বিষয় বোধ প্রধান হ'য়ে মানুষটাও তার মধ্যে একটু একটু ক'রে স্থান গ্রহণ করে। এইভাবে মানুষের সম্বন্ধে বিষয় দিক দিয়ে যাহা অহেতুক, সেই অহেতুক মানস-বৃত্তির স্ফুরণ হ'তে থাকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে যে সমস্ত উদারতর বৃত্তির প্রতিষ্ঠা দেখি, তার মূলেও ঐ নিগূঢ় জীবন-বোধ বর্তমান। এই জীবন-বোধের মূল-ধাতু করুণার উৎসরূপে গভীর করুণ-রসে প্রতিষ্ঠিত।

ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ঐ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে বাল্মীকির হৃদয়ে সমস্ত উদারতর বৃত্তি ও মানস-সুষমার বীজীভূত অভিব্যক্তি ঐ করুণরস নিমেষে উদ্বেলিত হ'য়ে বিচিত্র প্রকাশের মাধ্যমকে অবলম্বন ক'রে সুদূর দেশ কালে সুকুমার কলা শিল্পের তাত্ত্বিক দিকের যেমন সৃষ্টি করলে, তেমনি সৃষ্টি করলে ঐ সুকুমার কলা-শিল্পের অনুগত নানা সুশোভন মানসিকতার। এই সুশোভন মানসিকতার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনের সঙ্গে অপ্রয়োজনের হেতুর সঙ্গে অহেতুকের একটা বিচিত্র সামঞ্জস্য প্রয়াসে মানুষের একমুখী, একঘোঁকা জড় ও অভ্যাসের ছাপ চরিত্রে আরও গভীরতর বিশ্ব ও জীবন-বোধ প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। এইভাবে বাল্মীকি মারফত মানুষের বিশ্বত্ব-প্রাপ্তি ঘটেছিল।

এমন সজলা সুফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন-ধান্য প্রসব কোরেছেন, সেখানে দেহধারণ কোরে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নেই? যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশের Civilization (সভ্যতা) বিস্তার কোরেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দশা? ● ● তোরা আবার বেদ বেদান্তের বড়াই করিস? যে জাতি সামান্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কোরতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার ধর্মের বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে—জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হও।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাচীন কালের প্রাসাদ

শীত নিবারণের ব্যবস্থা

ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তুরস্কের আনাতোলিয়া প্রদেশে ভূগর্ভে খৃষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের একটি প্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রাসাদের তলায় কতকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রাসাদে শীত-নিবারণের জন্য এই প্রকোষ্ঠগুলিতে চুল্লী প্রজ্বলিত থাকিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন।

খৃষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে 'আরজাবন' নামক একটি বিলুপ্ত জাতি এই প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়াছিল। এই জাতির বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় নাই। তবে এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে যে, কৃষ্ণসাগরের ক্রীট দ্বীপে মিনোয়ান নামে যে জাতি ছিল, আরজাবন জাতি আচার-ব্যবহারে সেই জাতিরই স্বরূপ ছিল।

যে প্রাচীন প্রাসাদটি আনাতোলিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ৩০০ফুট লম্বা।

—মাকেন্স

শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতিকা

স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

পরিচিতি—এই গানের রচয়িতা ভক্তপ্রবর ও কবি স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। কিশোর বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই মণীন্দ্রবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন এবং প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" "শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" প্রভৃতি গ্রন্থে মণীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে স্থানে স্থানে উল্লেখ করা আছে।

ইতি,—সম্পাদক, বিশ্ববাণী

শতেক বরষ পরে, কে পুন: আইল ওরে
কার বাঁশী বাজে আজ ভুবন ভ'রে।
গগনে পবনে শুনি, কার ঐ জয়ধ্বনি,
চমকি জাগে ধরণী, হরষ ভরে।
দিকে দিকে মহোৎসব—'জয় রামকৃষ্ণ' রব
আনন্দে বিহ্বল সব ধায় কার তরে?
নামামৃত সুধাপানে মৃতেরে জাগায় প্রাণে
আঁধারে আলোক দানে দুখনিশা হ'রে।
তবু মনে জাগে সেই দিন, এ চিতে সেই দীনহীন
কাঁদি সেই নিশিদিন সবার তরে।
সর্ব্বত্যাগী দিগম্বর, ফিরে নিত্য ঘর-ঘর
না গণিয়ে আত্মপর শত অনাদরে
জীবের পাপের ভার, করি নিজ কণ্ঠহার
অনায়াসে করি পার ভবসিন্ধু তারে।
(সেই) হীন হতে হীনতম—দীনের ঠাকুর মম
আজ কিবা অনুপম রূপ সে ধরে।
রাজরাজেশ্বর বেশে—দাঁড়ায়ে সম্মুখে এসে
তবু এই রূপাবেশে মন না সরে।
মনে পড়ি' সেই মুখ,—কেনরে বিদরে বুক
ভুলি সব দুখ-সুখ শুধু নয়ন ঝরে।

অতীতে আমেরিকায় ভারতীয়দের প্রসার

নিউইর্কে—আমেরিকার লুইজিয়ানী প্রদেশে খৃষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের একটি স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার প্রাকৃতিক ইতিহাসের মিউজিয়ামে উত্তর আমেরিকার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর জেম্‌স এ ফোর্ড বলেন যে, এই স্তূপটির ধরণ ভারতীয়। খৃষ্ট জন্মের ২৭০০ বৎসর আগে এশিয়া মহাদেশ হইতে ভারতীয়রা কি ভাবে বেরিং প্রণালী পার হইয়া আমেরিকায় আসিয়া আদি বসতি স্থাপন করিয়াছিল মিঃ ফোর্ড তাহার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

যে স্তূপটি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই স্তূপটি একটি প্রাচীন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। মিসিসিপি নদীর অন্তর্গত ভিক্‌সবুর্গ হইতে ৪০ মাইল দূরে স্তূপটি বিদ্যমান। এই স্তূপটির অস্তিত্ব অনেক দিন হইতেই জানা ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। ১৯৪৭ সালে বিমান হইতে ফটো তুলিয়া লইয়া এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। গত ১৯৫৫ সালে ডক্টর ফোর্ড এবং ডক্টর জুনিয়াস বি বার্ড ঐ স্থানে যাইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁহারা ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে কাজ আরম্ভ করিয়া মে মাসে সেই কাজ শেষ করেন।

—নাকেন্স

গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক-সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতএব গ্রন্থকার অথবা পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে সমালোচ্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। —ইতি সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

জপসূত্রম্—তৃতীয় খণ্ডম্।—(কারিকা সম্বলিতম্—বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেন সহ)। শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়। ডিমাই সাইজ—পৃষ্ঠা ৩৭৬। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের প্রণীত কারিকা ও বঙ্গভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত জপসূত্রম্ গ্রন্থের অনুবাদ সাধন-পিপাসু ও শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিদের নিকটে একটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক। ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ স্বামিজী কর্ত্তৃক ইহার বৃহদাকারে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডগুলির ন্যায় সেইরূপ বৃহদাকারে উহার তৃতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের পরিচয় ধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিদের নিকটে ও বিদ্বৎসমাজে বিশেষ পরিচিত। দার্শনিক তত্ত্বের বিচারে তিনি গভীর চিন্তাশীল। বৈদিক ও তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও সাধন-পদ্ধতির রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা গভীর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও নবীন যাবতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান যেমন প্রগাঢ় ও তেমনি ব্যাপক। ঐ সমস্ত দুরূহ বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় লিখিত তাঁহার গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি সুধীসমাজের

নিকট বিস্ময়কর। ইহা ছাড়াও তিনি একজন একনিষ্ঠ ধ্যানশীল সাধক-পুরুষ। ইতিপূর্বে তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির মতন 'জপসূত্রম্'-এর এই তিনখণ্ড পুস্তকেও—বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য চিন্তাশক্তি লিপিকুশলতা শাস্ত্রজ্ঞতা ও তত্ত্বনির্ণয়ে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির সমাবেশ হইয়াছে। সেইজন্য এই গ্রন্থের অপূর্ব বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসু অধীতশাস্ত্র ও বিচারশীল পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে।

জপসূত্রম্ মূলতঃ একটি শাস্ত্রগ্রন্থ। ধর্মসাধনার বিশেষ একটি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বিষয় সূত্রাকারে ইহাতে উক্ত হইয়াছে। সূত্রাকারে এই শ্রেণীর শাস্ত্রগ্রন্থ হিন্দুধর্মানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট বিশেষ আদরণীয়। বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র, পাতঞ্জল দর্শন বা যোগসূত্র, ছাড়াও শিবসূত্র-শক্তিসূত্র, কৌলসূত্র, বজ্রসূত্র, স্বরসূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর আরও কয়েকটি সূত্রাকারে সংগ্রথিত প্রধান প্রধান শাস্ত্র হিন্দুধর্মে আছে। জপসূত্র শাস্ত্রটিও হিন্দুদের বিশেষ একটি প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ। এই শাস্ত্রগ্রন্থটির চারিটি অধ্যায় আবার চারিটি পাদ-এ বিভক্ত। ইহার মোট সূত্রসংখ্যা পাঁচশত এবং কারিকা-সংখ্যা প্রায় তাহাদের চারিগুণ। পূর্বেই ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মননশক্তিমান শ্রদ্ধাস্পদ স্বামিজী সুনিপুণ অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা আমরা বলিয়াছি। এক্ষণে ইহার এই তৃতীয় খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদ-এ ১২০টি সূত্রের ব্যাখ্যা শেষ হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত প্রথম পাদ-এর প্রথমে বাইশটি সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যানের দ্বারা এই তিনটি খণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়—সমস্ত গ্রন্থটি দশখণ্ডে আসিয়া শেষ হইবে। যদি ভগবৎকৃপায় তাহা সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির ইহা একটি অভিনব সম্পদ হইয়া সগৌরবে বিরাজ করিবে।

জপের সাধনা পৃথিবীর সকল ধর্মমতের সাধনার অনুষ্ঠানের মধ্যে অপরিহার্যভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের মধ্যে জপের সাধনা আবার বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যেই ইষ্টমন্ত্রের জপ সাধনার সর্বপ্রধান অঙ্গ। সেইজন্য উপনিষদ গীতা পাতঞ্জল দর্শন ভাগবত তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই জপ সাধনের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। এমনকি হিন্দুসম্প্রদায়ের সমস্ত সিদ্ধ-যোগী ও ধর্মগুরুরা ইষ্টমন্ত্র জপকেই সাধনার প্রধান অবলম্বন বলিয়াই শিষ্যবৃন্দকে যুগে যুগে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। "শুদ্ধ ও একাগ্রমনে ইষ্টদেবতার রূপচিন্তা ও তত্ত্বভাবনার সহিত ইষ্টমন্ত্র জপের দ্বারা ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়"—একথা ধর্মানুরাগী প্রত্যেক হিন্দু নরনারীরই মজ্জাগত সংস্কার। "জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি নিয়ন্তরম্"—এই প্রবাদ বাক্য হিন্দুধর্মের সাধক দিগের মধ্যে শত শত বৎসর অতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অতএব এই জপসাধনের শাস্ত্রানুমোদিত যথাযথ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কিরূপ—সাধনশিক্ষার্থী হিন্দু নরনারীমাত্রেরই পক্ষে তাহা অবগত হওয়া একান্ত পক্ষে প্রয়োজন ও কর্তব্য।

এই গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার জপসাধনের সেই পদ্ধতিকে বিবিধ প্রামাণ্য শাস্ত্রের উক্তিরাশি এবং নিজের অসাধারণ মননশীলতার সাহায্যে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুকে পাঠকদের বোধগম্য করাইবার জন্য তাঁহাকে আনুষঙ্গিক বহুবিধ তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছে। 'মন্ত্র' শব্দের আভ্যন্তরিক অর্থ কি? 'মন্ত্র' বলিতে কি বুঝায়?—মন্ত্রজপের ক্রিয়া নিষ্পন্ন কিভাবে হওয়া উচিত? তাহার চরম উদ্দেশ্য কি?' এ সমস্তই তিনি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জপসাধনার ব্যাপারে শব্দ (ধ্বনি বা নাদ) মন্ত্রের তত্ত্বগত অর্থ, জপের সংখ্যা এবং ইহাদের সমুদয় ব্যাপার তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া বাক্ প্রাণ ও মনের (অগ্নি চন্দ্র ও সূর্যের) স্বরূপগত ও প্রকারগত

ভেদ কি? উপলব্ধির পথে যাবতীয় বিঘ্ন ও অন্তরায় এবং তাহাদের দূর করিবার উপায় কি?—এই সমস্ত সমস্যার সমাধানও প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ন্যায় এই তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার নিখুঁতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সাধনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্ত ব্যাপারই ইহাতে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য এই গ্রন্থের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্রানুরাগী ও সাধননিষ্ঠ ব্যক্তি-মাত্রের নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকৃত না হইয়া পারে না। এই গ্রন্থের সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা সংক্ষেপে সম্ভব নয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দীর্ঘ ভূমিকাটি এই গ্রন্থের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা এই বইখানি শাস্ত্রনিষ্ঠ ও সাধনানুরাগী প্রত্যেক হিন্দুকে সযত্নে পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সঙ্ঘবার্ত্তা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব :—গত ৩০শে ফাল্গুন ১৩৬২ বুধবার কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২১তম শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রত্যূষে বেদান্ত মঠের মন্দিরে মঙ্গলারতি ও স্তবপাঠ হয়। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বিশেষ পূজা, হোম ও স্বামী দুর্গানন্দজী কর্ত্তৃক চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১০টায় সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সম্প্রদায় ভজনগান করেন। বেলা ১১টায় সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী কথকতা করিয়াছিলেন।

বেলা ৪টা হইতে ৫।০টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনবিদ্ শ্রীভাগীরথ বসু রামায়ণের 'রাবণ মন্দোদরী সংবাদ' বিষয়ে সুললিত কণ্ঠে কথকতা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা ছয়টায় জনহিতৈষী ও প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রাঙ্গণে এক জনসভার হইয়াছিল। সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন। স্বামী দুর্গানন্দজীর শান্তিবাচনের পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ও তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুভূতি সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দ বক্তৃতা করেন। তাহার পরে অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পণ্ডিত হরিনন্দন ঝা মহাশয় অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি মনোরম বক্তৃতা দেন। মাঝে সুকণ্ঠগায়ক শ্রীচিত্ত রায় মহাশয় দুইটি ভাবা-সঙ্গীত গাহিয়া সভাস্থ সকল ব্যক্তিকে মুগ্ধ করেন। এবারের সভার বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল, পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজীর রেকর্ডে তোলা (শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে—১৯৩৬) বক্তৃতাটি বাজানো হইয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে ছিল গ্রামোফন রেকর্ডে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কণ্ঠে গীত দুইটি ভাবসঙ্গীত। শেষে সভাপতি শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ মহারাজের অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের মহিমা বর্ণনার পর শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী সমাপ্তি-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। সভার শেষে বিশ্বনাথি কালীকীর্ত্তন সমিতির সদস্যগণ প্রায় আড়াই ঘণ্টা যাবত কালী-কীর্ত্তনে সকলকে মাতাইয়া দিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় এগারটায় উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

পরবর্ত্তী শনিবার সন্ধ্যা ছটা হইতে রাত্রি ১০টা অবধি সিকদার বাগান সঙ্গীত সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ গীতাভিনয় করিয়া সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। এই উৎসবে সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মালোচনা :—প্রতি সপ্তাহে সোমবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত ছয়দিন ধরিয়া পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

কথকতা :—প্রতি রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যার আরতির পরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত কথকতা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্ত্তন :—প্রতি শনিবার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বেলা তিনটার সময়ে সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরামনাম-কীর্ত্তন ও অন্যান্য ভজনগান হইয়া থাকে।

সপ্তদশ বর্ষ

(ফাল্গুন, ১৩৬১ মাঘ, ১৩৬২)

সম্পাদক

স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা] [প্রতি সংখ্যা আট আনা

বিশ্ববাণী

সপ্তদশ বর্ষ

(ফাল্গুন, ১৩৬১—মাঘ, ১৩৬২)

বর্ষসূচী

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
অ		
অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিনে ...		৬০৩
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি গবেষণা-পত্র	শুভ্রেন্দু কর	৬০৮
অন্ধ্রদেশে বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কার		৬০২
অমর কবি মাইকেল মধুসূদন (কবিতা)	শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৫৮
অশোক-লিপি ও ইতিকথা	শ্রীকালিপদ হোড়	৫১৭
আ		
আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায়	৩১৪
আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি (কবিতা)	শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়	৫০৭
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি (কবিতা) ...	শ্রীবীণাপাণী দত্ত	২৬৪
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রতি (কবিতা)	অনাদিনাথ দত্ত	৪৫৯
আধুনিক বাংলা সাহিত্য	আচার্য্য যদুনাথ সরকার	২৭১
আবাহন (প্রবন্ধ)		৩৩৯
আবাহন (কবিতা)	শ্রীপরেশনাথ দত্ত	১৩০
আবির্ভাব ঐ	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়	১২৫
আবির্ভাব (প্রবন্ধ)	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়	৪১৯
আশা (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়	৬৮
আশ্রয় ঐ ...	শ্রীগুরুদাস দত্ত	৮৩
আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম 'প্রসঙ্গ' ...	শ্রীবিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	২৫৬
আহ্বান সুখের যাত্রী (কবিতা) ...	শ্রীকণিভূষণ চক্রবর্ত্তী	৩৩
ই		
ইতিহাসের এক অধ্যায়. ...	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর	
ইতিহাসের দুইটী তথ্য		
ইবন বতুতার বঙ্গদেশ ভ্রমণ (প্রবন্ধ) ...	শ্রীমনোজেন্দু মজুমদার	
ইন্দ্রমি ঐতিহাসিক ঘোষেকাস		
ইংরাজ ও মুসলমান	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য	

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
ঈ		
ঈশ্বরের অবতার	স্বামী অভেদানন্দ	২৮৯
উ		
উত্তর বাংলার আদিবাসী ?	শ্রীমাধবীলতা সিংহ	৩৪
এ		
এক নজরে বর্ত্তমান বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য	৩৬৪
একলব্য (কবিতা)	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	১৬০
এক্স-রশ্মি সম্পর্কে ডাঃ রামনের আবিষ্কার		৩০৭
ও		
ওপর পানে রইবি চেয়ে (কবিতা)	শ্রীবীণাদেবী সেন	৪১১
ক		
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (কবিতা)	শ্রীনিরঞ্জন রায় চৌধুরী ...	১৩৪
কবি নবীনচন্দ্রের 'অমৃতাভ' কাব্য (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় ...	৩৯০
কম্বোডিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি ...	...	৩২৩
কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীমীরা মিত্র ১৭, ৮৪, ১১৩, ২৩৩, ২৬২, ৩১৫	
কীর্ত্তন	শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ...	৪২৮
কেদার-বদরী হোতে (কবিতা) ...	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৪৬৭
ক্রোচের দার্শনিক মতবাদ ...	শ্রীমৎ পুণ্যাগ্র পরমপন্থী	১১০
গ		
গীতাতে জীবন-সমস্যার নির্দ্দেশ (প্রবন্ধ)	শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী	৪৪৯
গীতার আত্মতত্ত্ব ...	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	২৩৪
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের পটভূমি (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক বীরানন্দ ঠাকুর ...	৪১০
গ্রন্থ-সমালোচনা	১৪, ৩৩৪, ৪৭৪, ৫২৪, ৬১১	
গ্রেটব্রিটেনে যুক্তরাজ্যের জনকল্যাণ রাষ্ট্রে তিন দিন	শ্রীদেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ...	৮৬
চ		
চন্দ্রের জন্মকাহিনী		৬০৮
চণ্ডীদাস (কবিতা) ...	শ্রীবিমেন্দ্রলাল নাথ	৪৪৩
চন্দ্রিশ পরগণার হালিসহর	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	৪৯২
'চর্য্যাপদ'-এর শিল্প সুষমা	শ্রীঅমিল কুমার হালদার	৫২৩
চিরন্তন (কবিতা).. ...	শ্রীমণি মুখোপাধ্যায়	২০৯
চিরন্তন ঐ ...	শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী	১৪৫
জ		
জগজ্জননীর উপাসনা ...	শ্রীভবানীপ্রসাদ মজুমদার	২০৩
জাতিগঠনে গ্রন্থাগারের স্থান ...	শ্রীসরোজনাথ বসু	১৩৬

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৪৪
জিজ্ঞাসা (কবিতা)	শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী ...	৬২
জীবনের গান (ঐ)	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ	৫১০
জীবাত্মা ও পরমাত্মা	স্বামী অক্ষয়ানন্দ	১৯৪
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সারদাদেবী	যতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬৮৩
ডেকার্টের দার্শনিক মতবাদ ...	পুরাগ্র পরমপন্থী	৫৪৯
তপোবনে (কবিতা)	শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী	২৪১
ভিন্নত-ভারত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর ১১৫, ১৬১, ২২৭, ২৭২, ৩০৫ ৪৪৫, ৫০২	
দয়াল গুরু (কবিতা) ...	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	৩২৭
দার্শনিক রেনে ডেকার্তের জীবন-কথা		৫৪৭
দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রবন্ধ)	স্বামী দুর্গানন্দ	৩৭৯
দেবদর্শন	স্বামী সুব্রানন্দ পুরী	১৮৪
দেবী আবাহন (কবিতা)	শ্রীকালিপদ কোঙার	৩৫৮
দেশবন্ধুর প্রতি (ঐ) ...	শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৩২
দৈত (ঐ) ...	শ্রীতারক ঘোষ	৩৬৩
ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	১৭২, ২২১
ধর্ম্ম ও রাজনীতি	ঐ	৮, ৭৩
ধর্ম্ম ও সমাজ	ঐ	১২৬
ধর্ম্মে অলৌকিকতা কি অপরিহার্য্য ?	শ্রীঅমিয়শঙ্কর নন্দী	৪৯৯
নববর্ষে বিশ্বভারতী (প্রবন্ধ)		১
নববর্ষে (কবিতা)	অশোক মিত্র	৯৭
নাই কোন অভিমান (কবিতা) ...	শ্রীশান্তশীল দাস	১৬
পদার্থবীর-পাঠক	শ্রীঅনিলকুমার হালদার ...	৫৬৩
পদার্থের প্রকৃত পরিচয়	শ্রীভূবনমোহন বিশ্বাস, এম্-এস্-সি	২৫৯
পরলোকে টমাসম্যান ...	সরোজনাথ বসু ...	৩১৯
পুরুষোত্তম পরমহংসদেব (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	৩৭১

বিষয়	লেখক ও লেখিকা		পৃষ্ঠা
প্রতিবিম্ব (কবিতা)	শ্রীবীরানন্দ ঠাকুর	...	১৯৩
প্রতীক্ষা (কবিতা)	শ্রীনির্মল চন্দ্র রায়	...	৪৬৯
প্রত্নতাত্ত্বিক সংবাদ		১৪১, ২৩৯, ২৮২, ৩৩৪	
প্রপন্ন (কবিতা)	শ্রীনির্মলচন্দ্র রায়	...	৪৪
প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি		...	৫৫৪
প্রাচীন পর্যটকদের হিমালয় অতিক্রমকারী অভিযাত্রা			২৬৯

ব

বরফীনারায়ণের পথে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য		৪৭৯
বর্ষশেষ (কবিতা)	শ্রীঅশোক মিত্র		৪৯
বর্ষা-আবাহন (ঐ)	শ্রীপ্রশান্ত সেন		১৫২
বাঙলার সীমানা ও বঙ্গ সংস্কৃতি	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য		১৩১
বাঙালীর প্রথম ইংরাজী কবিতা-লেখক	শ্রীললিল ঘোষ		৩১
বাগ্মীকণ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ	শ্রীঅনিলকুমার হালদার		২১৬
বাংলা-সাহিত্যের ভাবীকাল (প্রবন্ধ)	শ্রীঅনিল হালদার		৪০৪
বাংলার লোক-সংস্কৃতির পটভূমিকা	অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়		৪৫
বিজ্ঞানী হেমিং	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়		১১৯
বিবিধ সঙ্কলন			৬০৬
বিশ্বজননী শ্রীদুর্গা	স্বামী অভেদানন্দ		৫৪১
বিবেকানন্দের প্রতি (কবিতা)	... শ্রীশৈলেশ ভট্টাচার্য্য		৬১০
বিস্তৃত জনপদ সপ্তগ্রাম	... ৺নটবর দত্ত		৬৩
বিস্মৃতি (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাস		৩৫৯
বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী (কবিতা)	শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		১৬৬
বেদান্ত-দর্শনের শিক্ষা ও আদর্শ	স্বামী অভেদানন্দ		২৪২
বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টিন	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে		২১০
বৈজ্ঞানিক ফার্মি	শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		৫৫৩
বোধিসত্ত্ব (কবিতা)	শ্রীবিমলেন্দ্রলাল নাথ		২০২
ব্যক্তি সমাজ ও জাতি	... শ্রীহিরণ্ময় দত্ত		৪৮৬
ব্যর্থ শরৎ (কবিতা)	... শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী		৩৮৯
ব্রহ্মবিৎ শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ	...		৪৮৮

ভ

ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুর (কবিতা)	শ্রীশান্তিময় ঘোষ		৪৭৬
ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব	... শ্রীহরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ...		১৪৬
ভক্তি-সাধনা ও ভক্ত-জীবন	... শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়		২৯৮
ভগবতীর সৌন্দর্য্য-ধ্যান (প্রবন্ধ)	... শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী ...		৩৪৯

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
ওয় মেউল (কবিতা)	নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৪০৭০
ভাগবতী গীতি (প্রবন্ধ)	শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম	৩৫৪
ভাব ও নৃত্য ঐ	শ্রীমীরা মিত্র ...	৪১৬
ভারত তিব্বত বাণিজ্যিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক গুরুত্ব	শ্রীসাহিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ...	৫৭৯
ভারতীয় চিত্র-শিল্পের আদর্শ	সুধাকান্ত বসু	১০৮
ভারতে পরমাণু-শক্তির গবেষণা	সত্যজিৎ	২৫
ভারতের সাহিত্য-সম্পদ	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬৯
ভালবাসা	শ্রীবাসকরাম ভট্টাচার্য্য ...	৫১৭
ম		
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত		৬১৪
মহাত্মা সেণ্ট পিটারের দেহাবশেষ		৬০৩
মধুসূদনের শিল্পী-সত্তা	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৩১২
মন ও মানুষ	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৪৬০, ৫০৬
মহা-জাগতিক রশ্মি	আল-কামাল আবদুল ওহাব	৪৬৮
মহাপুরুষ শ্রীমৎ শিবানন্দ মহারাজ	...	৫৫৬
মহামানব যীশুখৃষ্ট	শ্রীহীরালাল বিশ্বাস ...	২৮৬
মালসী গান	ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সঙ্গীতশাস্ত্রী	৪২৬
মাসাদ	শ্রীরামনাথ বিশ্বাস ...	১৯
মায়াবাদ ও আচার্য্য গৌড়পাদ (প্রবন্ধ) ...	ব্রহ্মচারী সদানন্দ	৪৪২
মোহ-মুক্তি (কবিতা)	শ্রীনিরঞ্জন রায়চৌধুরী	৭৮
মৌর্য্য যুগের চাষী (প্রবন্ধ)	শ্রীকালীপদ হোড়	৩৭৩
মৃত্যুঞ্জয়ী রবীন্দ্রনাথ	অনিলকুমার হালদার	১০৪
য		
যীশুখৃষ্টের উপদেশমালা		৫৪২
যোগের সাধনা	স্বামী অভেদানন্দ	৪৩১
র		
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে	শ্রীকাত্যায়নী ঘোষ	১৭৭
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	২৬৭
রামকৃষ্ণ দর্শন ...	শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৭৯
রামায়ণের বেদনা	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৫১১
রাষ্ট্র ও শিল্প (প্রবন্ধ)	শ্রীসুশীলভূষণ গুপ্ত	৩৭৫
শ		
শঙ্করদেব ও তদীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী, প্রাচ্যতত্ত্বসাগর	১৫৩
শরৎ-লক্ষ্মী (কবিতা) ...	শ্রীমনোরঞ্জন রায় ...	৩৩২
শান্তি (কবিতা)	শ্রীপাঁচকড়িদে কর্ম্মকার ...	৪২৫
শান্তির পথে (কবিতা) ...	শ্রীশান্তিময় গোস্বামী	৪১৩

বিষয়	লেখক ও লেখিকা	পৃষ্ঠা
শ্রীদুর্গা-বন্দনা (কবিতা)	শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী	৩৩৮
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে…মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্ন	শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়	৫৯৯
শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপদেশ		৩২৯
শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা	পি, শেষাদ্রি আয়ার, বি-এ, এম্-এল্.	২৪৬
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতিপূজা	শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী …	৪৭০
শ্রীমা-সারদাদেবীর কথা	বেলা দে	৫৯
শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)	শ্রীঅধীর সরকার	২৭
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ	শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৯৮
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ	শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫১
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ	শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৫
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত-বেদান্ত সাধনা	শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় …	৫৮১
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি (কবিতা)	শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী …	৩০
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ	শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় …	২
শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে ভক্তবৃন্দ	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় …	৩৯
শ্রীললিতা-রহস্য …	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী …	৬০৪
শ্রীলক্ষ্মী-রহস্য (প্রবন্ধ) …	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী …	৪৫১
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রশস্তি (কবিতা) …	শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী …	৩০৪
শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে …	শ্রীশোভা দুই …	৫৬১
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা (প্রবন্ধ) …	শ্রীমুকুলমালা দেবী …	৩৮৫
শ্রীশ্রীরাধা …	শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সাংখ্যবেদান্ততীর্থ বৈষ্ণবদার্শনাচার্য্য	১৬৭
শ্রীশ্রীশ্যামা-রহস্য	স্বামী দুর্গানন্দ	৪৬৩

স

সঙ্গীত-রত্নাকর অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী …	…	…	১৮৮
সঙ্ঘবার্ত্তা	৪৮, ৯৫, ১৪২, ১৯২, ২৪০, ২৮৮, ৩৩৬, ৪৭৬, ৫২৬ ৫৬৬, ৬১২		
সমুদ্র সকাশে (কবিতা) …	শ্রীঅশোক মিত্র …		৩৮
সাহিত্য-উপভোগের অধিকার …	শ্রীঅনিলকুমার হালদার …		৯১
সুদূরের আলো …	দীপ্তেন্দু বসু		৫০৮
সূর্য্যমূর্ত্তির পার্শ্ববর্ত্তী মূর্ত্তিগুলির পরিচয় …			৫২১
সোপেনহাওয়ারের দার্শনিক মতবাদ …	শ্রীমৎ পুরাগ্র পরমপন্থী		২৭৯
সংশয় (কবিতা) …	অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন গুহ		৪৬২
স্বদেশী-আন্দোলনের স্মৃতি …	বীরেন্দ্র নাথ দে		৩৩৩
স্বাধীনতা-উৎসব (কবিতা) …	শ্রীনিরঞ্জন রায়চৌধুরী		৩১১
স্বামী অভেদানন্দের অন্তর্ধান (প্রবন্ধ) …	শ্রীকমলা দেবী		২৮
স্বামী বিবেকানন্দ …	শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু		৮৯
১৮৫৩-৫৭ সালের বিপ্লবী বাঙালী …	শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার		৫৪৪

হ

হিন্দুদের দৃষ্টিতে যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টান চার্চ্চের ধর্ম …	স্বামী অভেদানন্দ	৫২৭, ৫৬৭
হে রুদ্র বৈশাখ (কবিতা) …	প্রণাম্ত সেন	১০৩

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত

স্বামী শংকরানন্দ

আজ-পর্যন্ত যতগুলি প্রামাণিক জীবন-চরিত এই মহামানবকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে সকলগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া অথচ আরও নূতন উপকরণ দিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইয়াছে। সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সহজ সরল কাহিনী ও বাণীই এই পুস্তকের বিশেষত্ব।

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

২৪০ পৃষ্ঠা : : মূল্য : মাত্র দুই টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী ঃ

পদ্যছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা : সুন্দর বাঁধাই : মূল্য ৫৲ মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৬৲

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি ঃ

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবংশের পরিচয়" সম্বলিত—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পদ্যছন্দে লিখিত। মূল্য ৪৲ ভিঃ পিঃতে ৪।০

প্রাপ্তিস্থান—**স্বামী ওঙ্কারানন্দ** (গ্রন্থকার) ১নং উমেশ দত্ত লেন, (বিডন ষ্ট্রীট), কলিকাতা।
এবং—**শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,** ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন মনকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী
তসর, গরদ, মটকা
সিল্ক, টিস্ শাড়ী
জহরলাল
পান্নালাল
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ বেনারস, অমৃতসহর

অণুজীবকরধ্বজ

যকৃৎরোগে সুপ্রতিষ্ঠিত কবার পরিবর্ত্ত নির্দিষ্ট মাত্রার
ট্যাবলেট আকারে সংহত

সক্রিয় ষড়্গুণ মকরধ্বজ

চরম-বিজ্ঞানের ফলে ইহার ভেষজশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি
পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সর্ব্বাধিক নির্ভরযোগ্য

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট. (৭ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

নূতন পুস্তক—

SRI RAMAKRISHNA
AND HIS APOSTLE
SWAMI ABHEDANANDA

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনকথা, ধর্ম্মমত এবং পাশ্চাত্য দেশে কার্য্যাবলীর বিবরণ ও ব্যাখ্যান।

স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীআশুতোষ ঘোষ এবং স্বামী বেদানন্দ কর্ত্তৃক ইংরাজীতে লিখিত চারিটি সুপাঠ্য প্রবন্ধের সমাবেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী অভেদানন্দজীর দুইখানি ছবি আছে। মূল্য এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফটো

শ্রীরামকৃষ্ণদেব—দাঁড়ানো, বসা ও বাই।

শ্রীমা—বসা।

স্বামী বিবেকানন্দ—ধ্যানমূর্তি, চিকাগো বক্তৃতাকালীন বেশ, পরিব্রাজক, লণ্ডনে চেয়ারে বসা, দাঁড়ানো ও আরও নানা রকমের।

স্বামী অভেদানন্দ—ধ্যানমূর্তি, আসনে বসা, আচার্য্য বেশে লণ্ডনে, আমেরিকায় বক্তৃতাকালীন, এবং আরও নানা রকমের।

ফুল সাইজ ১৷৷০

ক্যাবিনেট সাইজ ৸০

হাফ ক্যাবিনেট ।৵০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, সুবোধানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, যোগানন্দ প্রভৃতি প্রত্যেকের ক্যাবিনেট সাইজ ফটো—৸০

শ্রীরামকৃষ্ণদেব :

অষ্ট্রিয়া দেশের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক ভোরাকের অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে ১৯" × ২৪" সাইজ। (সুন্দর মাউন্ট করা) মূল্য : দুই টাকা। ক্যাবিনেট সাইজ ৸০

শ্রীসারদাদেবী :

ফুল সাইজ ১৷৷০, ক্যাবিনেট সাইজ ৸০

রঙিন লকেট প্রত্যেকটি আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

কাশ্মীর ও তিব্বতে

আমেরিকা যুক্তরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে ১৯২৩ সালে পূজনীয় স্বামিজীর কাশ্মীর ও তিব্বতে পরিভ্রমণ কাহিনী।

মূল্য পাঁচটাকা

মরণের পারে

মৃত্যুর পরে নিজনিজ কর্মানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির নানা প্রকার গতি সম্বন্ধে এবং জীবাত্মার পূর্বজন্ম ও পরজন্ম সম্বন্ধে সিদ্ধযোগীর অনুভূতির আলোকে ব্যাখ্যান।

—মূল্য পাঁচটাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম

কলিকাতা অফিস ও আউটডোর
২৯এ, বিবেকানন্দ রোড
পোঃ বড়বাজার, কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৫২২০

টেলিগ্রাম : "উন্মাদ আশ্রম" কলিকাতা
হাসপাতাল—দমদম, পোঃ মুঘুড়াঙ্গা
জিলা ২৪ পরগণা
ফোন : দমদম ১০৫

প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
কবিরাজ, অতুলবিহারী দত্ত, বি-এস্‌সি, কবিরত্ন

ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

INDIA AND HER PEOPLE নামক

সুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে সেখানকার খৃষ্টান-মিশনারী-সঙ্ঘ এবং ভারতবিদ্বেষী অন্যান্য সমস্ত দলের ভারতবর্ষ হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা কাহিনী ও কুৎসা প্রচারের সুযোগ্য প্রত্যুত্তরপূর্ণ বক্তৃতামালা

'ক্রুকলীন ইনিষ্টিটিউট অফ আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রদত্ত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানপ্রদ বক্তৃতাবলী

বাঙলা অনুবাদে—ফুটনোটে এবং পরিশিষ্টে আরও অনেক নূতন তথ্য এবং বক্তব্য বিষয়ের সমর্থক প্রামাণ্য উক্তি ও উদ্ধৃতি সংযোজিত হইয়াছে

ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৩৯৭ পৃষ্ঠা,

মূল্য চারিটাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—কলিকাতা-৬

Ring Up. B. B. 5243.

BHARATI PRINTING WORKS

141. VIVEKANANDA ROAD. CALCUTTA-6

বিশেষ ঘোষণা

অতি সুলভ মূল্যে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কপা ছবি। প্রতিখানি তিন আনা মাত্র।

পোষ্টে ছবি পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের অফিসে সকালে ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আসিলেই পাইবেন।

নূতন কয়েকখানি উপন্যাস

লিলিদেবীর

পূর্ণচ্ছেদ · দাম ২৲

অনিল সেনের

বউরাণী—দাম ১৷৷০

প্রতিবেশী—দাম ১৷৷০

যুগে যুগে—দাম ১৷৵০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

BY SWAMI ABHEDANANDA :

ystery of Death	Rs. 8/8
fe beyond Death	6/8
dia and Her People	6/8
ie Psychology	6/-
cience of Psychic Phenomena	4/-
Doctrine of Karma	3/-
Lectures in India	3/8
Songs Divine	2/-
Ideal of Education	1/-
Reincarnation	2/-
How to be a Yogi	4/-
Philosophy and Religion	6/8
Divine Heritage of Man	4/-
Sayings of Ramakrishna	3/-
Attitude of Vedanta towards Relig on	6/8
Vivekananda & His Work	1/-
man Affection & Divine Love	1/8
Spiritual Unfoldment	2/-
th of Realization	4/-
ll-knowledge	3/-
ilosophy of Panchadasi	1/-
eligion of the 20th Century	As. 12
hristian Science and Vedanta	12
Woman'sPlace in Hindu Religion	12

Six Annas each

Why a Hindu accepts Christ and Rejects Churchianity : Why a Hindu is a Vegetarian : Unity and Harmony : Cord and Cross In Ancient India.

Swami Vivekananda and Modern India: by Swami Jagadishwarananda. As. 12.

Progress and Perfection : by Swami Prajnanananda. Rs. 1.

An Apostle of Monism : by Sister Shivani (*Mrs Mary Lepage*) (Life and Activities of Swami Abhedananda). Rs. 7/8

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

মরণের পারে	৫৲
কাশ্মীর ও তিব্বতে	৫৲
ভারতীয় সংস্কৃতি	৪৲
মনের বিচিত্র রূপ	২৷৹
হিন্দুনারী	২৷৹
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২৷৹
যোগশিক্ষা	২৲
আত্মজ্ঞান	২৲
পুনর্জন্মবাদ	২৲
কর্মবিজ্ঞান	২৲
স্তোত্ররত্নাকর	২৲
পত্র সংকলন	১৲
স্বামী বিবেকানন্দ	৷৹
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	১৲
আত্মবিকাশ	১৲
অভিভাষণ	৷৹
প্রতীক ও তাহার অর্থ	৵৹
অর্চনা	৵৹

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

তীর্থরেণু	৩৷৹
শ্রীদুর্গা	৩৷৹
রাগ ও রূপ	৮৲
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি	১০৲
অভেদানন্দ-দর্শন	৮৲
রামকৃষ্ণ-চন্দ্রিকা	২৲
বাঙ্গালা রূপদমালা	১৸৹

স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কথা	৪৲
রামকৃষ্ণ চরিত	২৲

স্বামী বেদানন্দ প্রণীত

বাঙ্গলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২৲

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মুক্তি আন্দোলনে স্বামী অভেদানন্দ	১৲

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ	১ম ভাগ ৩৷৹, ২য়, ১৷৹

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ —ফোন—বি. বি. ১৮০৫

সুস্থ ও অসুস্থ সকল অবস্থাতেই
বার্লি সমান উপকারী

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ ও নির্ভরযোগ্য

লিলি বার্লি মিলস লিঃ কলিকাতা - ৪

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

কাশ্মীর ও তিব্বতে

১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাশ্মীর ও তিব্বতের ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ বহুস্থানের ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন। কাশ্মীর ও তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিখ্যাত মন্দির মঠ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক বর্ণনা। কাশ্মীরের রাজনৈতিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক তথ্য। তিব্বতের হিমিস মঠে যীশুখৃষ্টের অপ্রকাশিত জীবনকাহিনীর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ।

মূল্য পাঁচ টাকা

ভারতীয় সংস্কৃতি

(**India and Her People** পুস্তকের অনুবাদ।)

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ১৯০৬ সালে "ক্রকলীন ইনিস্টিটিউট অফ আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সেস" নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ বক্তৃতা মালা

মূল্য চার টাকা

মরণের পারে

(**Life beyond Death**-নামে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ।)

এই গ্রন্থে মানুষের পূর্ব্বজন্ম জন্মান্তরবাদ, পরলোকতত্ত্ব, মৃত্যুর পরে বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর বিভিন্ন প্রকার গতি ও অবস্থা সম্বন্ধে দার্শনিক মনীষা ও সিদ্ধযোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

দেহবিমুক্ত নানাপ্রকার জীবাত্মার অনেকগুলি আলোকচিত্রের সমাবেশে সমৃদ্ধ

P30405

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬, ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসহইতে শ্রীবিনয়রতন সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—বৈশাখ, ১৩৬৩

সূচীপত্র

১।	নূতন বৎসর (কবিতা)	... শ্রীঅমরেশ মিত্র	১৭
২।	ঐক্য ও সমন্বয়	স্বামী অভেদানন্দ	১৮
৩।	সংশয় (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়	১১০
৪।	মহাযোগী পওহারী বাবা	...	১১১

জামসেদপুর—ব্র্যাঞ্চ

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

(স্থাপিত—১৯১৮)

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিখুঁত ভাবে ইঞ্জিন মেরামতি কার্য্য আমাদের বৈশিষ্ট্য

হেড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১

ফোন—২৩-১৮০৪ (পাঁচ লাইন)

শাখা—বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক ও গৌহাটি

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডি, রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোনঃ ৩৪- ৩৭১১

সূচীপত্র

৫।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ...	শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ	১১৫
৬।	বুদ্ধপূর্ণিমা (কবিতা)	মণিমোহন পাল	১১৭
৭।	বৈজ্ঞানিক সত্য	অধ্যাপক শ্রীরঞ্জনরঞ্জন রায়	১১৮
৮।	চণ্ডীদাস (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীবিভেন্দ্রলাল নাথ	১২১
৯।	তুলসীনাথ	সুজ্ঞানন্দ পুরী	১২২
১০।	ভারতের ঐশ্বর্য্য	সুশীলকুমার ঘোষ	১২৫
১১।	নাটক	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	১২৯
১২।	নিরপেক্ষতা ও আন্তর্জাতিকতা	আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৩২
১৩।	চব্বিশ পরগনার ইতিহাসে আমডাঙ্গা	বিজয়গোপাল বসু	১৩৩
১৪।	কবি-প্রণাম (কবিতা)	কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী	১৩৮
১৫।	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা	সুশীলকুমার গুপ্তগুপ্ত	১৩৯
১৬।	আচার্য্য শঙ্করের প্রতি ...	সুকুমার চক্রবর্ত্তী	১৪৪
১৭।	সঙ্ঘবার্ত্তা ...	...	১৪৪

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে নতুবা পূর্ব্বের ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না।

প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END - FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS.

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ, বসু এণ্ড কোং (ডেকরেটর্স)

৫২নং ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

ফোন :—বড়বাজার ১৬২৫

বিশ্ববাণী

অষ্টাদশ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৬৩ | তৃতীয় সংখ্যা

নূতন বৎসর

শ্রীঅমরেশ মিত্র

নূতন বৎসর এলো বৈশাখের প্রথম প্রভাতে
দুঃসহ প্রখর অতি রৌদ্রের দহনে,
অতি উগ্র রক্তবর্ণ রক্তবস্ত্র রোষদৃষ্টিপাতে
বিলম্বিত ঘটাকাশে আরক্ত নয়নে।
সে তো আজ আনে নাই উৎসবের পুলক-উল্লাস
আনে নাই কোন সুখ আরামের আশা,
সে আজি এনেছে কোন্ ভীষণের ইঙ্গিত আভাস
আনার আসিছে কোন্ সর্বসুখনাশা।
অগ্নিমূর্তি সে সন্ন্যাসী ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করে
চাহিছে কিসের ভিক্ষা বজ্রনাদ-স্বরে?
সে যে চায় নিয়ে যেতে আপনার পায় পূর্ণ কোরে
সবার আসক্তি মোহ সকলের ভারে।
আসিয়াছে সে তপস্বী দীক্ষাদিতে অগ্নিমন্ত্রে সবে
তাই আজি করিতেছে সবারে আহ্বান।
আকাশে বাতাসে আজ উঠিতেছে সুগম্ভীর রবে
উদাত্ত দীপক রাগে আগিনা কী গান।
সর্বত্যাগ-সাধনায় যোগা যারা নির্মম নির্ভীক
সমস্ত ক্ষুদ্রতা বৃত্তি করিয়াছে জয়,
যাহারা প্রত্যেকে মৌর্য মহত্তর জীবন্ত প্রতীক
দিতেছে যে বীরত্বের বহ্নি পরিচয়।
সেইসব মহাপ্রাণ মোহজয়ী শক্তিশালী বীর
আসিবে বলিয়া তাই মৌন প্রতীক্ষায়
বসে আছে উগ্রতপা সে সন্ন্যাসী সমুন্নত শির
অজিন-আসনে একা স্থির স্থাণুপ্রায়।
এ আহ্বান ফিরিতেছে দিকে দিকে পর্বতে প্রান্তরে
এ আহ্বান ঘরে চ'লে দূরে অতি দূরে
সে আহ্বান শুনি কানে জনগণ শিহরিছে ডরে
আপনা লুকায়ে রাখে রুদ্ধ অন্তঃপুরে।
ওরে ভীরু স্বার্থপর হীনচিত্ত প্রাণদৈন্যে দীন,
সঙ্কীর্ণ দুবল মন মলিনতাময় —
কোথায় পালাবি? কেন এ প্রয়াস বৃথা ব্যর্থ হীন?
আজি যে এসেছে মহা পরীক্ষা-সময়।

এই অগ্নিপরীক্ষায় নাহি কারো কোন অব্যাহতি
নাহি তো নিষ্কৃতি কোন পথ পালাবার।
যদি নাহি আসো আজ বাহিরিয়া হয়ে ত্যাগব্রতী
তাহ'লে বিলুপ্তি ধ্বংস নিশ্চয় তোমার।
ক্ষুদ্র ক্ষীণ প্রাণ লয়ে যেবা চায় বাঁচিতে গোপনে
সে তো কভু কোন ক্রমে নাহি রক্ষা পায়।
যে জন উৎসর্গ করে হাস্যমুখে আপন জীবনে
চিরজীব হয়ে থাকে মুক্তি-মহিমায়।
নিষ্ঠুর নির্মম অতি প্রকৃতির এ চির বিধান
এ নিয়ম রুধিবার সাধ্য নাই কার,
দুঃখের দুর্গম পথে, যেবা করে জয়-অভিযান
সে যে চ'লে যায় সর্ব্ববাধাবন্ধপার।

এতদিন গৃহমাঝে করিয়াছ যেসব সঞ্চয়
সে সকলি ফেলে দিয়ে এসো রিক্ত হয়ে।
বাহিরের এ ঐশ্বর্য্য শুধু ঘৃণ্য আবর্জ্জনাময়,
অমিত ঐশ্বর্য্য আছে অন্তরে হৃদয়ে।
ক্ষয়হীন সে ঐশ্বর্য্য লভিবারে যেবা আগুয়ান
সে নাহি ফিরিয়া চায় পশ্চাতে কখন,
বল্গাবেগে চ'লে যায় গাহি মহা জীবনের গান
অবশেষে পায় শান্তি মুক্তি চিরন্তন।
আজি নব বৎসরের পুণ্যদিনে হও সমুত্থিত
লও দীক্ষা ত্যাগমন্ত্রে প্রশান্ত হৃদয়ে।
মানব-কল্যাণব্রতে মনেপ্রাণে থাকো নিয়োজিত
জীবন সার্থক হবে বিচিত্র বিজয়।

ভগবান বুদ্ধের বাণী

সর্ব্ববিধ পাপকার্য্য না করা, কল্যাণকর সমস্ত প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকা এবং চিত্তের বিশুদ্ধতা-সাধনই—বুদ্ধের অনুশাসন।

তোমার মুক্তি তোমাকে নিজের দ্বারাই অর্জ্জন করিতে হইবে। তথাগত শুধু তোমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই পথে ঠিকভাবে অগ্রসর হইলে, তুমি মার-এর বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে।

জটা গোত্র অথবা জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যাঁহাতে সত্য ও ধর্ম্ম বিদ্যমান—তিনিই সুখী এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

যিনি সকল প্রকার মোহাসক্তির সম্বন্ধকে উচ্ছেদ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সেই নিরাসক্ত মুক্ত পুরুষকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

নিজেই নিজেকে (আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও মুক্তির উচ্চ অবস্থায়) উত্থিত ও উন্নীত কর। হে ভিক্ষু অরক্ষিত ও স্মৃতিমান হইয়া তুমি সুখে কালযাপন কর।

সর্ব্বপ্রকার নাম ও রূপে যিনি অনাসক্ত, নশ্বর ও অনিত্যের অবসানে যিনি অনুশোচনাহীন ও প্রীত—তিনিই ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) বলিয়া উক্ত হন।

সত্যই মানুষের একমাত্র মুক্তিদাতা। আচার অনুষ্ঠানের কোনও অর্থ নাই। প্রার্থনার অভ্যাস নিষ্ফল। কর্ম্মফলই একমাত্র বলবান। সৎকর্ম্ম, শুচিতা, পবিত্রতা ও হৃদয়ের বিশুদ্ধিতার দ্বারাই কুকর্ম্মফলকে জয় করা যায়। সত্যের সাক্ষাৎ অনুভূতি ভিন্ন কখনই শান্তি ও মুক্তি লাভ হয় না।

বাসনামুক্ত নিরাসক্ত ধ্যানশীল প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিই চিরশান্তি লাভ করেন।

ঐক্য ও সমন্বয়

স্বামী অভেদানন্দ

বেদান্তের সমস্ত শিক্ষা ও উপদেশ একটি বিশেষ আদর্শের উপরে ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই আদর্শটি হইতেছে—প্রেম। যীশুখৃষ্টের জন্ম-গ্রহণের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে (৫৬০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) ভারতবর্ষে মহামানব গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিক্ষা :—

"ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন হি সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনঃ॥"

—ধম্মপদ, (যমক বগ্গো) ৫

অর্থাৎ,—"হিংসা অথবা বৈরিতার দ্বারা কখনও হিংসাকে জয় করা যায় না। অহিংসা বা বৈরশূন্যতার দ্বারাই হিংসাকে জয় করা যায়। ইহাই ধর্ম্মের চিরন্তন (সনাতন) নীতি।" এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন—"প্রেম কাহাকে বলে?" প্রেম বলিতে সর্ব্বজীবের প্রতি একাত্মতার প্রাণময় প্রকাশকে বুঝায়। যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদের উপদেশ দিয়াছিলেন, "তোমার প্রতিবেশীদের তুমি আত্মবৎ ভালবাসিবে (Love thy neighbour as thyself)। কিন্তু কেন আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের আত্মবৎ অভেদ জ্ঞানে ভালবাসিব, যীশু সেই উক্তির সপক্ষে যুক্তি-প্রদর্শনের দ্বারা উহার ভিতরকার তত্ত্বকে কোথাও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যীশুখৃষ্টের ঐ উপদেশের আভ্যন্তরিক তাৎপর্য্য তাঁহার আবির্ভাবের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিরা বেদান্ত অথবা উপনিষদে বলিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ বিশ্বজনীন দার্শনিক সত্যতত্ত্বের প্রতিপাদন-কারী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র। মানবপ্রেম ও সর্ব্বজীবে একাত্মতার সম্বন্ধে উপনিষদ যুক্তিপ্রদর্শনের দ্বারা বলিতেছে—"আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের প্রেমশীল হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাদিগকে আমরা যে ভালবাসিব, তাহার কারণ এইজন্য নয় যে—তাহারা মধ্যে মধ্যে আমাদিগের কোন না কোনও প্রকার উপকার করিয়াছে—অথবা তাহারা আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে। তাহারা আমাদিগকে স্নেহহীন কর্কশ বাক্য বলুক, অথবা প্রতিপদে আমাদের ক্ষতি ও অনিষ্ট করুক, কিম্বা আমাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করুক—তথাপি আমরা তাহাদিগকে ভালবাসিব। তাহাদের এই প্রকার কুব্যবহার অনিষ্টকারিতা ও ঘৃণাবিদ্বেষ সত্ত্বেও আমরা তাহাদের প্রতি প্রেমশীল হইব—ইহার একমাত্র কারণ—স্বরূপতঃ তাহারা ও আমরা এক ও অভিন্ন।" সমগ্র নিখিল বিশ্বচরাচরে ব্রহ্মই একমাত্র মূল অস্তিত্বস্বরূপ। সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্ত এবং অব্যয় অপরিণামী সত্তা। অপাতঃদৃষ্টিতে সমস্ত নর-নারী ও সমস্ত জীবকে ব্রহ্মসত্তা হইতে পৃথক ও ভিন্ন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে আমাদের সত্তা—আমাদের সকলের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি তিনি। উপনিষদে বলা হইয়াছে—'সেই পরমাত্মা আমাদের প্রাণের প্রাণ মনের মন ও আত্মার আত্মা। তিনি অন্তর্য্যামীরূপে সমস্ত মানব ও জীবের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। প্রত্যেক জীব বা নরনারী যেন একএকটি আরশির মতন। আর আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব-দর্পণে সেই একমাত্র অস্তিত্বস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বহুরূপে ও বহু প্রকারে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন।

এসম্বন্ধে আমি এখানে একটি উদাহরণ দিতেছি :—মনে করুন, আপনি প্রখর সূর্য্যালোক-পূর্ণ কোনও উন্মুক্ত স্থানে শত শত বাটি জলে ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছেন—আর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য হইতে সেই সমস্ত প্রত্যেকটি বাটির মধ্যে জলে সূর্য্যের ছায়া

পড়িয়াছে। আপনারা দেখিবেন প্রত্যেক বাটির জলেতে সেই সূর্য্যের এক একটি আলাদা আলাদা প্রতিবিম্ব রহিয়াছে—অবশ্য সূর্য্যের ঐ প্রতিবিম্ব-গুলির প্রত্যেকটি আকার অনেক ক্ষুদ্র। এখন আপনারা তুলনা করিয়া দেখুন, পৃথিবীর তুলনায় আকারগত ব্যাপারে সূর্য্য কতগুণ বৃহত্তর? এই পৃথিবীর বৃত্তের যে ব্যাস (diameter) তাহা আটহাজার মাইল দীর্ঘ—আর সূর্য্য মণ্ডলের ব্যাস আটশত আশী হাজার মাইল দীর্ঘ। অথচ কী আশ্চর্য্য! এই অতিশয় বিপুলাকার সূর্য্য এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটি বা জগ-এর মধ্যে ছায়া-রূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! সূর্য্যের সহিত আকারগতভাবে তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই পৃথিবী জ্যামিতির বর্ণিত একটি বিন্দুর মতন অনুপরিমাণ অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি পদার্থ মাত্র। জ্যামিতির মধ্যে বিন্দু বা point-এর অস্তিত্ব (position) আছে—কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ অথবা স্থূলতার কোনরূপ আয়তন তাহার নাই। অথবা পৃথিবীর আকার কোনও বৃত্তের মধ্যগত কেন্দ্রবিন্দুর মতন—আর এই কেন্দ্রবিন্দুর ব্যাস বা ব্যাসার্দ্ধ (radius) কিছুই নাই। এখন এখানে এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে—এই পৃথিবী দেখিতে এমন বিশালাকৃতি—নানাবিধ পদার্থপুঞ্জের সমাবেশে ইহা সুবিশাল আকার। এই পৃথিবীই যদি সূর্য্যের তুলনায় আকারে জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় অতিশয় ক্ষুদ্র হয়—তাহা হইলে ইহার তুলনায় আমাদের আকার বা আয়তন কতটুকু? এখন এই বিরাট বিশাল বিশ্বজগতের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি আমরা বালুকণার অপেক্ষাও আরও ক্ষুদ্রতর আকারবিশিষ্ট। তথাপি এই ক্ষুদ্রাদপি অতিশয় ক্ষুদ্র মানবদেহের মধ্যে বিশ্বজগৎকে উদ্ভাসকারী স্বয়ংজ্যোতিস্বরূপ সেই মহতোমহীয়ান পরমাত্মার প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হইয়াছে আমরা দেখিতে পাই। ইহাই মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি।

যেমন প্রকৃত সূর্য্যকে ছাড়িয়া প্রতিবিম্ব সূর্য্য থাকিতে পারে না—সেইরূপ স্বয়ংজ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া তাহার ছায়ারূপী জীবাত্মাদের অস্তিত্বও কখন সম্ভব হইতে পারে না। সেই পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্ম অথবা জগজ্জননীর সর্ব্বব্যাপী অসীম অস্তিত্বের মধ্যেই আমরা প্রত্যেকে সর্ব্বদা অবস্থিত হইয়া আছি। এই সর্ব্বাস্তিত্ব-স্বরূপকে লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিতে পারে—কিন্তু মূলতত্ত্বের দিক দিয়া ইহা অনাদি অনন্তকাল একমেবাদ্বিতীয়ং ও অনন্ত সত্তা। বেদে সেইজন্য আর্ষকবিরা বলিয়াছেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—অর্থাৎ—সত্য স্বরূপতঃ এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু তাহাকে জ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। স্বরূপগত এই একাত্মতা ও অভিন্নতার উপলব্ধির ভূমিতে দাঁড়াইলে মানুষে মানুষে আপাতঃদৃষ্টিতে যতসব ভেদ বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা আছে তাহা দূর হইয়া যাইবে। পৃথক পৃথক সত্তা বলিয়া প্রতীয়মান এই সমস্ত জীবাত্মাকে চিরন্তন ঐক্য ও সমন্বয়ের সূত্রে মিলিত করিয়া দিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। সেই পরমাত্মা অনাদি অনন্ত পরম-পরিপূর্ণ সত্তা—আর আমরা সেই অনন্ত অস্তিত্বের মহাসমুদ্রে এক একটি জলকণামাত্র। এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করাই চরম ও সর্ব্বোচ্চ সত্য।

প্রাচীন বৈদিক যুগে কোনও এক সত্যান্বেষী সাধকের সম্বন্ধে আমরা পড়িয়া থাকি যে, ঐ সাধক-ব্যক্তি তাঁহার সত্যদ্রষ্টা গুরুদেবের নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূজনীয় গুরুদেব! এক কথায় যাহাতে আমি বেদাদের সমস্ত সত্যকে অবগত হইতে পারি, আপনি আমায় এমন একটি উপদেশ দান করুন।" শিষ্যের প্রশ্ন শুনিয়া সেই ব্রহ্মবিদ্ গুরু তাঁহাকে বলিলেন: "কোটি কোটি শাস্ত্রগ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই সারমর্ম্ম আমি তোমাকে মাত্র একটি শ্লোকের অর্দ্ধভাগের দ্বারাই জানাইয়া দিব। সেই শ্লোকার্দ্ধ এই—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং সমুদয় জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

জীব ও ব্রহ্মের এই একত্বানুভূতিই বেদান্তের উপনিষদ্ শিক্ষার সারবর্ম। আমাদের দৃষ্টিতে নাম রূপের বহুত্ব ও জীবে জীবে বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে। একত্বানুভূতির দ্বারা জীবে জীবে এবং সকল প্রাণী ও পদার্থে এই সমস্ত ভেদভাব ও পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা করাই আমাদের একান্ত উচিত। সমস্ত বিশ্বজগতের অন্তস্তলে এই একত্বের স্রোতধারা সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। যদি আমরা সমস্ত নামরূপের বহুত্বের পিছনে এই একত্বের স্রোতকে আবিষ্কার করিতে না পারি, তাহা হইলে বেদান্ত অথবা অন্য সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমাদের কি লাভ হইল? এই একত্ব-উপলব্ধি বা অদ্বৈতানুভূতিই বেদান্ত দর্শনের মূলনীতি। বেদান্তের শাস্ত্রকে পুঁথিগতভাবে শুধু অধ্যয়ন করিয়াছে, অথচ সমস্ত জীব ও সকল পদার্থের স্বরূপগত একত্ব ও অভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এমন ব্যক্তিকে আমরা বেদান্তবাদী বলিতে পারি না।

যদি একত্বানুভূতির এই অবস্থা হইতে সমস্ত জীবকে নিরীক্ষণ করা যায়, তখন আর কোথায় থাকে এইসব ভেদ ও বিভিন্নতা? এই অবস্থায় আসিলে কি আর মানুষে মানুষে হিংসা বিবাদ ও যুদ্ধ হইতে পারে? কিম্বা মানুষে মানুষে কি আর কখনও ঘৃণা ও ঈর্ষার উদ্রেক সম্ভব হয়? এই অবস্থায় আসিলে তখন শুধু আমাদের নিজের মধ্যেই নয়, পুরুষ নারী ও সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে। ইহাই হইতেছে বেদান্তের আদর্শ। সর্ব্বব্যাপী ও শাশ্বত অস্তিত্বরূপী পরমাত্মার মধ্যে আমরা সকলেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি। সেই পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে দেখিলে কি আর অপরের প্রতি আমাদের দ্বেষ হিংসা ঘৃণা কিম্বা ভেদভাব আসিতে পারে? তখন আর কোনই বৈষম্য থাকিবে না—তখন বিরাজ করিবে শুধু শান্তি ও আনন্দ। এই একত্বানুভূতিই সকল ধর্মের চরম গন্তব্য ও মূলনীতি।

এই সত্যকে প্রমাণিত করিবার জন্য আপনাদের দেশে (আমেরিকায়) বেদান্তের উদার মতবাদকে জনসমাজে প্রচারিত করা হইয়াছে। আমরা যদি এই বিশ্বজগতের অভিব্যক্তির ধারাকে পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাইব? 'ক্রমাভিব্যক্তি' কথাটির অর্থ কি? সমজাতীয় জীবসকলের অথবা পদার্থ-পুঞ্জের নানাজাতীয় প্রাণী ও পদার্থে পরিণতি ও প্রকাশই ক্রমাভিব্যক্তি। এখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছি। নরনারী পশুপাখী তরুলতা—আবার বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর সমষ্টিরূপী কত জাতি ধর্ম শ্রেণী প্রকৃতি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। এই সমস্ত বৈচিত্র্য সেই এক অদ্বিতীয় অপরিণামী সত্তা হইতেই প্রসূত হইয়াছে। সেই একত্বের চরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করিয়া আমরা কেন সকলের মধ্যে একত্ব ও সমত্ব দেখিব না? কিন্তু আমরা যদি শুধু বাহিরের এই সমস্ত নামরূপের বহুত্বের মধ্যেই অভিভূত হইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের দ্বারা সেই সমত্বভাবকে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। যদি আমাদের সকলের মুখকে একই আকারে পরিণত করার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সমস্ত মুখই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা হইলে আর কোনও মুখের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির কার্য্যধারা সেরূপ নয়। বরং প্রকৃতির কার্য্যধারা হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের প্রকাশ। আর এই নিয়মের মধ্যে বিরুদ্ধে আমরা কোন কাজই করিতে পারি না। প্রকৃতির এই কার্য্য-শক্তির স্রোতকে প্রতিরোধ করা আমাদের উচিত নয়।

প্রকৃতির যাহা ধারা সেইমতই আমাদের চলা উচিত। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সমন্বয় আছে তাহার সহিত মিলিয়া চলাই আমাদের উচিত। বিশ্বপ্রকৃতি সর্ব্বদাই বিভিন্ন শ্রেণী প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে সংঘর্ষ-স্থাপনের কাজ করিতেছে। তাহার দ্বারা বিশ্বজগতে একত্বের সৌন্দর্য্য-মহিমাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। জাগতিক অভিব্যক্তির

চরমে একত্বের সেই প্রকাশ বিশ্বপ্রকৃতি সর্ব্বদা দেখাইতেছে—আর এই অভিব্যক্তির চরম অবস্থাই আধ্যাত্মিকতা। সেই চরম অবস্থায় আমরা সেই সত্যতত্ত্বকে দেখিতে পাইব যে অবস্থায় উন্নীত হইয়া যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার পিতা এক,' বেদান্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা যেমন বলিয়াছেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'সোঽহমস্মি'—'আমিই সেই ব্রহ্ম' 'সেই পরমাত্মাই আমি'। অতএব মানুষ ও পরমাত্মার স্বরূপগত একত্ব ও অভেদ ভাব উপলব্ধি করাই বেদান্তের সাধনার চরম গন্তব্য।

কিন্তু শুধু এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই কি আমরা নিরস্ত হইব? আমরা কি শুধু পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সহিত আমাদের স্বরূপগত একত্ব উপলব্ধি করিয়াই শান্ত থাকিব?

আমাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে যে বৈষম্য আছে এই মহান আদর্শের উপলব্ধির জন্য তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। যদি ত্যাগ-সাধনায় আপনারা নিরত হইয়া থাকেন তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনারা আপনাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভেদ-নীতিকে দূর করুন। আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত আত্মম্ভরিতা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে দারুণ অন্তরায়। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম সাধনার ব্যাপারে আমাদিগকে অবনত করিয়া রাখিয়াছে। এই আত্মম্ভরিতা বা অহমিকাকে দূর করিয়া সাধনার পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। অহমিকাকে দূর করিবার জন্য আমাদের বিনয় ও নম্রতা অভ্যাস করা প্রয়োজন। ধর্ম্ম সাধনার ব্যাপারে বিনয়ই প্রধান গুণ। অপরের মধ্যে আপনারা মহৎ ভাবকে দেখিতে শিক্ষা করুন; আপনারা অহমিকাগ্রস্ত হইবেন না। অপরের অপেক্ষা আপনারা শ্রেষ্ঠ এইরূপ মনোভাবের প্রশ্রয় আপনারা দিবেন না, তাহা হইলে আপনারা নিজেরাই নিজেদের অধঃপতনের বীজকে রোপণ করিবেন। "যীশুখৃষ্টের সেই বাণীকে স্মরণ করুন, "অপরের বিচার করিও না, কারণ তাহা হইলে তোমাকে বিচারের অধীন হইতে হইবে।" অপরের দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার করিবার কোন অধিকারই আমাদের নাই। অপরের পক্ষে যে পথ কল্যাণকর সেই পথে তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করা এবং যাহা আপনার নিজের পথে মঙ্গলজনক সেই পথে অন্যকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা বেদান্তের মতে অতি নিন্দিত কর্ম্ম। অতএব আপনারা উদার ও ন্যায়পরায়ণ হউন। আর এই প্রকার মনোভাবই শ্রেষ্ঠ মনোভাব। "সকল ধর্ম্মমত সত্যতত্ত্বকে লাভ করিবার জন্য এক একটি পৃথক পৃথক সাধনার পথ। সমস্ত ধর্ম্মমতের সাধন-পথ চরমে একই সত্যের পথ ভিন্ন আর কিছু নয়" এই মহতী শিক্ষাই বর্ত্তমান যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানবজাতিকে শিখাইয়া গিয়াছেন। কোন মহৎ ভাবকে ধ্বংস করিবার জন্য আমরা এই পৃথিবীতে আসি নাই—বরং সমস্ত মহৎ ভাবের বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই সমন্বয়-সাধনার সাফল্যের ফলে সমস্ত ভেদ বৈষম্য দূর হয় এবং সকলের মধ্যে ঐক্য ও সমতাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের মধ্যে যদি কোনও ভেদ বৈষম্য থাকে, তবে সে সব কেন হইতেছে—তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত। তাহা হইলে ঐ সমস্ত ভেদ বৈষম্যের কারণকে আমরা উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইব এবং ইহাদের কুপ্রভাব হইতে আমরা রক্ষা পাইব। তাহা হইলেই আমরা সকলের মধ্যে ও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঐক্যের ভাব দেখিতে পারিব। আমাদের মধ্যে এই সমস্ত অনর্থের কারণ আমরা নিজেরাই, অথচ ইহার জন্য আমরা অন্য ব্যক্তিদের দায়ী করিতেছি। এই সমস্ত দোষ ত্রুটির সব দায়িত্বই আমাদের নিজেদের উপরে লওয়ার জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে সৎসাহস দেখাইতে হইবে। আর বেদান্ত ইহাই করিতে শিক্ষা দেয়। যদি আপনার জীবনে কোনও বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে জানিবেন আপনি নিজেই তাহার হেতু। ইহার জন্য আপনার দ্বারা যে সব ভুল করা

হইয়াছে তাহা হইতে চেষ্টা করিলে আপনি নিবৃত্ত থাকিতে পারেন। আপনি অন্যের ঘাড়ে কোনও দোষ চাপাইবেন না। আমাদের ভাবী জীবন আমরা আমাদের এখনকার যাবতীয় কার্য্য চিন্তা ও অভ্যাসের দ্বারাই গড়িয়া তুলিতেছি। আমরাই আমাদের ভাবীজীবন বা ভাগ্যকে তৈয়ারী করিতেছি, যাবতীয় বাক্য ও চিন্তার দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আমরা সৃষ্টি করিতেছি। আমরা প্রত্যেকে এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্ত্তা—কেন না আমরা বিশ্বজগতের বিরাট সৃষ্টিকর্ত্তারই এক একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমরা কোন না কোন প্রকারে কিছু সৃষ্টি করিতেছি। আপনারা কি দেখিতে পান না যে, আহার্য্য দ্রব্যসকল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে তাহাদের দ্বারা আমরা আমাদের দেহে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পুরাতন পরমাণুকণাগুলি কেমন করিয়া সরাইয়া দিয়া আমরা সেই স্থানে আমাদের দেহে নূতন পরমাণুকণা নূতন মাংস-তন্তু, শিরা উপশিরা প্রভৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে উৎপন্ন করিতেছি?

আপনারা কি দেখিতে পান না যে, আপনারা যখনই যেখানে থাকেন তখনই সেখানে আপনাদের উপযোগী নূতন নূতন পরিবেশকে গড়িয়া তোলেন? যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট হইতে আপনারা জর্জ্জরিত হইতেছেন, তাহাদের কারণ কি? সারা জীবন ধরিয়া আপনারা যেসব সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন অথবা যে সমস্ত বিপর্য্যয় ও দুঃসময় আপনাদের জীবনকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে—সে সকলের কারণ কে? আমাদের মনের বাহিরে 'শয়তান' অথবা 'যাবতীয় অশুভ ব্যাপারের সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া কখনই কেহ নাই। আমাদের এই সমস্ত সুখদুঃখ দুর্গতি ভোগের প্রকৃত কারণ আমরা নিজেরাই। পৃথিবীতে দ্বৈতবাদী অথবা দুইটি স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী কতকগুলি ধর্ম্মমত আছে। তাহাদের মধ্যে এই দুইটি বিরোধী ঈশ্বরের মধ্যে একজন যাবতীয় শুভ ও কল্যাণকর ব্যাপারের স্রষ্টা—এবং অন্য ঈশ্বরটি সমস্ত দুঃখ অমঙ্গল ও দুর্ভোগকে সৃষ্টি করেন। ইহাদের ইচ্ছা ও খেয়ালমত নাকি সমস্ত নরনারীর ভাল ও মন্দ যাবতীয় কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে!! কর্ম্মবাদের যুক্তিপূর্ণ মতের দ্বারা বেদান্ত এই সমস্ত যুক্তিহীন ধর্ম্মমতের উপরে প্রচণ্ডভাবে মৃত্যুশেল নিক্ষেপ করিয়াছে। এই রকম দুই ভিন্ন প্রকৃতির ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কখনও সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের ধর্ম্মাধর্ম্ম চলা উচিত নয়। জগতের সমস্ত ব্যাপারই বিশ্বপ্রকৃতির অধীন শৃঙ্খলাময় ও সঙ্গতিপূর্ণ নিয়মনীতির দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। এই সমস্ত সক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মনীতি অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের মতনই অনাদি কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নিয়মনীতি সর্ব্বত্র বিশ্বজগতের যাবতীয় ব্যাপারে প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের উচিত এই সমস্ত নিয়মনীতিকে অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করা। প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে চিরন্তন সৌন্দর্য্য ও মহিমা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—তাহাকে আবিষ্কার করার জন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত।

যদি আমরা এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে এতাবৎকাল আমাদের এই সমস্ত জ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা ও চর্চ্চা করার কি ফল হইল? যে কোনও ব্যক্তি স্বার্থান্ধ হইয়া বিবাদ ও বিসম্বাদ করিতে পারে। কিন্তু যীশুখৃষ্টের এই উপদেশের অনুসারে আমাদের উচিত—"কেহ যদি আমাদের ডান গালে চড় মারে তাহা হইলে তাহাকে অন্যগালটিও চড় খাইবার জন্য তাহার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া।" এইভাবে প্রেম বিনয় ও অহমিকাশূন্যতা প্রদর্শন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আপনারা পৃথিবীতে মানবজাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন। তাহা হইলে যীশুর যেমন নদী ও সমুদ্র হইতে মৎস্যদের ধরিয়া আনে আপনারাও তেমনি মহাত্মা সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট ফ্রান্সিসের মতন শত শত ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারিবেন। যদি নিজের অহমিকা দূর করিয়া দিয়া দীনহীন মানবদের সহিত প্রাণ-

খুলিয়া আপনি মেলামেশা করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনি কিরূপে দীন দরিদ্র আর্ত উপেক্ষিত মানবদের সেবাব্রতে নিরত হইবেন? এই আত্মকেন্দ্রিকতা বা অহংকারই সমস্ত মানুষের সহিত আমাদের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায়।

সন্ন্যাসীর জীবন অর্থে সর্বত্যাগের জীবনই বুঝায় —তিনি দ্বেষ ঘৃণা কুটিলতা অহঙ্কার ভোগাসক্তি প্রভৃতি সমস্তই একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী কি ত্যাগ করেন? ভোগাসক্তি মোহাসক্তি। সুরম্য প্রাসাদ ও সর্ববিধ ভোগ্য দ্রব্যের অধিকারী হইয়া সেখানে বাস করা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে যদি ভোগবাসনা ও বিষয়াসক্তি না থাকে তাহা হইলে বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনি সন্ন্যাসী আবার এদিকে যদি আপনি পথচারী দুঃস্থহারা ভিখারী হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন এবং অপরের দেওয়া খাদ্য খাওয়ার সামান্য জীবনযাপন করেন—আর বাহিরে এই দরিদ্র অথচ আপনার মনে ভোগবাসনার মুখলালসা উগ্র হইয়া থাকে—তাহা হইলে জানিবেন প্রকৃতপক্ষে আপনি একজন ভিখারী মাত্র—কিন্তু কখনই আপনি সন্ন্যাসী নহেন। মন ও মনের হীন প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে আপনি যদি সমর্থ না হইয়া থাকেন—তাহা হইলে বেদান্ত-সাধনার ব্যাপারে আপনি ক-খ পর্যন্ত শিখিবার জ্ঞানও লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন ভারতে ত্রেতাযুগে রাজর্ষি জনকের পবিত্র জীবনকাহিনী আপনারা স্মরণ করুন। রাজর্ষি জনক (ইহার প্রকৃত নাম সীরধ্বজ) ত্রেতাযুগে মিথিলার অধিপতি ছিলেন। তিনি একাধারে যেমন সুনিপুণ রাজ্যশাসক আবার অন্যদিকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারী ঋষি ছিলেন। বেদান্তে বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞান অনাসক্তি ও সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ততার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন রাজর্ষি জনক। রাজা জনক মিথিলার রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন। রাজ্যশাসন পরিবার-পালন, সন্তানস্নেহ, পত্নীপ্রেম প্রভৃতি সমস্ত কর্তব্যই তিনি করিতেন। কিন্তু এইসব কার্যে তাঁহার কোনও আসক্তি ছিল না। একবার মিথিলার রাজপ্রাসাদ ও তাহার চারিপাশে খুব প্রবল অগ্নিকাণ্ড হইয়া বাড়ী ঘর ও আসবাব পত্র পুড়িয়া যাইতে লাগিল। মিথিলার রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর অন্য সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আগুন নিভাইতে লাগিল। কিন্তু এই অবস্থায় জনকের মনে কোনও উদ্বেগ চাঞ্চল্য ও ভীতিবিহ্বলতা দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহার এই নির্লিপ্ততা ও স্থিরচিত্ততা সম্বন্ধে মন্ত্রীরা ও রাজপ্রাসাদবাসীগণ প্রশ্ন করিলে জনক স্থিরভাবে উত্তর দিলেন, "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন" অর্থাৎ, "সমস্ত মিথিলা রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না।" অতএব আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, বিষয় সম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয় কখনও মানুষের আত্মাকে সম্পদশালী করিতে পারে না—বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া দিলেও আত্মা কখনও দরিদ্র হইয়া যায় না। কিন্তু পার্থিব বিষয় সম্পদে আসক্তির জন্য মানুষের জীবনকে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে অবনত করিয়া দেয়।

বেদান্ত আমাদের উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দেয় যে, জগৎকে যেন আমরা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোনও সত্তা বলিয়া না দেখি। বরং আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব—এই জগতের প্রকৃত সত্তাই ব্রহ্ম। দ্বৈতবাদী ধর্মমতের লোকেদের মতন আমরা যেন কখনই এই ভ্রম পোষণ করি যে, ঈশ্বর জগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক সত্তা। আমাদের জীবনে যে কোনও কার্য আমরা করি না কেন, সেই সমস্ত কার্যকে ঈশ্বরের উপাসনা ও পূজার অবস্থায় পরিণত করিয়া ফেলিতে পারি। আমরা যেন অবিচ্ছিন্ন সত্তারূপে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে ও জানিতে পারি। যখন আপনি আপনার বাড়ীতে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিবেন তখন মনে করিবেন—আপনি যেন ভগবানের মন্দিরের মার্জনা করিতেছেন এবং তাহার দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন। আপনার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য যেন ঈশ্বরের দিকেই সর্বদা ধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইতেছে

মানবজীবনের আদর্শ। এই উদার ও উন্নত মনোভাব দৃঢ় হইয়া গেলে আর কোনও ভয় বা সন্দেহ থাকিবে না। শয়তান বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আমাদের মনে ভয়ভীতির ভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়? সেই ভয়—মৃত্যুর ভয়, পাপকার্য্য জনিত শাস্তির ভয় এবং আরও অন্য প্রকারের ভয়। আমাদের মনে যে এই ভয়ভীতি বর্ত্তমান, তাহার কারণ শৈশব হইতেই আমাদিগকে এই ভয়ে অভ্যস্ত হইবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এমনকি শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার মাতার মনে ভয়-ভীতি সর্ব্বস্ব শিশুর মনে ভয়ের ভাব বীজাকারে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এইজন্যই আমরা মৃত্যুভয়ে ভীত, শাস্তির ভয়ে ভীত, এবং 'অনন্ত নরকের' ভয়ে ভীত। আর এই সমস্ত মিথ্যা ও কল্পিত ভয়ের সংস্কার আমাদের মধ্যে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, আমরা সর্ব্বদাই মনে করি ও বিশ্বাস করি, আমরা পাপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। 'পাপ' বলিতে প্রকৃত পক্ষে কী বুঝায়? পাপের প্রকৃত অর্থ—ভ্রম প্রমাদ বা ভ্রান্তি। এই ভয় ভীতি ও ভ্রান্তি প্রমাদ কোথা হইতে আসে? ইহারা আসে—আমাদের অজ্ঞানতা হইতে। এই অজ্ঞানতা আমাদের অন্তরকে একটি জালের ন্যায় আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই কারণে অনন্তজ্ঞানস্বরূপ যে ব্রহ্ম আমাদের অন্তরবাসী অন্তর্য্যামী ও আমাদের স্বরূপসত্তা—তাহাকে আমরা সর্ব্বদা আমাদিগের নিকট পৃথক ও ভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি। এই অজ্ঞতা বা অবিদ্যার কুপ্রভাবে সমগ্র জগৎ ও ব্রহ্মের সমস্বরূপতা ও অভেদত্ব উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। এই অবিদ্যার অন্ধকারে ভ্রান্ত ও অভিভূত হইয়াই লোকে পাপ ও কুকর্ম করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে পাপী হইয়া পড়ে। সমস্ত পাপ দুর্নীতি ও কুকার্য্যের একমাত্র মূল এই অজ্ঞানতার অন্ধকার মানবাত্মার আত্মজ্ঞানের সূর্য্যোদয়ের ফলে চিরতরে দূর হইয়া যায়। বেদান্তে উপনিষৎ সাধনপদ্ধতিকে যাঁহারা অন্তরে মনে অবিশ্রান্ত অভ্যাস করেন, তাঁহারাই অবিদ্যাকে জয় করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

যীশুখৃষ্টের উপনিষৎ ধর্ম্মমতকে ঠিকভাবে ও শ্রেষ্ঠ-রূপে ব্যাখ্যানের দ্বারা বেদান্তই একমাত্র সকলের নিকট বোধগম্য করিয়া দিতে পারে। গীর্জ্জার প্রচলিত মিশনারীদের দ্বারা প্রচারিত বক্তৃতা ও ভাষণ যীশুখৃষ্টের প্রকৃত ধর্ম্মকে মানুষের কাছে প্রকাশ ও বোধগম্য করিতে পারে না। যীশুখৃষ্টের নিজের উপনিষৎ ধর্ম্মের মধ্যে মানবাত্মা ও ঈশ্বরের চিরন্তন ও চরম মিলনের তত্ত্বকে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর এই জীব ও ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক মিলন ও স্বরূপগত একত্বকেই বর্ত্তমানযুগে সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সুমহান ও শান্তিপ্রদ আদর্শই আজিকার পৃথিবী চাহিতেছে। আর কয়েক বৎসর বাদে আপনারা দেখিতে পাইবেন—বেদান্তই সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মমত হইয়া পড়িয়াছে। থিওসফি, খৃষ্টান সায়েন্স, নিউ থট (New Thought) প্রভৃতি বর্ত্তমান কালে এদেশে প্রচারিত ধর্ম্মমতগুলি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের অতিক্ষীণ আভাস মাত্র। বেদান্তই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে প্রচার ও প্রতিপন্ন ও উপলব্ধি করিয়াছে। অন্য সমস্ত ধর্ম্মমত বেদান্তের এই সুমহান ও সার্ব্বভৌমিক আদর্শের দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এখন অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত মতাবলম্বীদের সংখ্যা অতি অল্প—সেইজন্য আপনারা বেদান্তের সুমহান ধর্ম্মাদর্শকে সমাদর করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—"যীশুখৃষ্টের জীবনকালে কয়জন ব্যক্তি তাঁহার মতকে স্বীকার করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার নিজস্ব উপনিষৎ ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন?" (পিটার, জন, ম্যাথুজ প্রভৃতি) মাত্র বারোজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যই যীশুখৃষ্টের জীবনকালে তাঁহাকে স্বীকার ও কাজে-কর্ত্তব্যে তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন। আবার এই মাত্র বারোজনের মধ্যে কেহ কেহ যেমন কোন ঘটনায় নিজেকে যীশুর শিষ্য বলিয়া পরিচিত

করিতে চান নাই—এমনকি ইহাদেরই মধ্যে একজন (যীহুদা ইস্কারীয়োৎ) বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল।

সুদীর্ঘ দুইহাজার বৎসর ধরিয়া ধর্মগত ব্যাপারে যে মহান কার্য্য খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে—বেদান্তের দ্বারা তাহা মাত্র দুই শত বৎসরেই করা সম্ভব হইবে। আপনারা আর কয়েক বৎসর মাত্র অপেক্ষা করুন—বেদান্ত-ধর্ম্মের যে বীজ এখন এদেশে রোপণ করা হইয়াছে—তাহাই দেশে দেশে ক্রমেই বিশাল বৃক্ষরাজিতে বৃহদাকারে পরিণত ও বিস্তৃত হইতে থাকিবে। বেদান্তের উদার ও মহান্ সত্যপ্রচারক এই ধর্ম্মমতকে গ্রহণ করিবার জন্য বহু ব্যক্তি উন্মুখ হইয়া আছে। সম্প্রতি (১৯১৪ ডিসেম্বর মাসে) আমি কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলস অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেখানে প্রচারকার্য্যের পরে আমাকে প্রায় চার পাঁচশত ভদ্রলোক ও মহিলা মাঝে মাঝে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছেন, আমি যেন বেদান্ত প্রচারের জন্য কালিফোর্ণিয়ায় স্থায়ীভাবে বাস করি। কালিফোর্ণিয়ায় সেখানেই আমি এখন যাই, সেখানেই আমি বেদান্ত সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের দেখিতে পাই। এই সমস্ত ব্যক্তিরা খৃষ্টান সায়েন্স, নিউ থট কিম্বা এই জাতীয় ধর্ম্মমতের উপদেশে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

আমাদের দ্বারা প্রচারিত বেদান্তের এই ধর্ম্মমত জাতিগত সম্প্রদায়গত সমস্ত সঙ্কীর্ণতা হইতে উর্দ্ধে। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, পূর্ব্বোক্ত ঐসব ধর্ম্ম-মতগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে সত্য আছে। আমি প্রমাণ দিয়া দেখাতে পারি, খৃষ্টান সায়েন্স মতের প্রবর্ত্তিকা মিসেস এডি (Mr. Mary B. Eddy) বেদান্ত বিশেষতঃ ভগবদ্গীতা হইতেই তাঁহার নিজস্ব ধর্ম্মমত গঠনের সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আপনারা *Christian Science and Vedanta* নামে আমার বক্তৃতাটি পড়িয়া দেখুন—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, ঐ বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। থিওসফির *(Theosophy)* গৃহীত ধর্ম্মমতের মূলনীতি বেদান্ত হইতেই গৃহীত হইয়াছে। নস এঞ্জেলেসে নিউ থট চার্চ্চ (*New Thought Church)* সম্বন্ধে আমি একটি বক্তৃতায় দেখাইয়াছিলাম যে, ঐ মতের মূলনীতি বেদান্তের ধর্ম্মমতেই আছে। ডেট্রয়েটে নিউথট মতাবলম্বীদের উদ্যোগে যে ধর্ম্মসম্মেলন হইয়াছিল—সেই সম্মেলনে অন্যতম বক্তারূপে আমি উপস্থিত ছিলাম। হার্টফোর্টে স্পিরিচুয়ালিষ্টদের এক সম্মেলন-সভাতেও আমি বক্তৃতা দিয়াছিলাম। চেষ্টারফিল্ডের অন্তর্গত ইউনিয়ার এক জনসভায় আটশত শ্রোতার সম্মুখে আমাকে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া লিলি-ডেল নামক স্থানেও আমি একবার ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। সেজন্য আমি তাহাদের ধর্ম্মমতকে বিশেষভাবে জানি এবং তাই স্বীকার করি যে, ঐ সমস্ত ধর্ম্মমতগুলির মধ্যেও অল্পবিস্তর সত্য আছে। নিঃসন্দেহে তাহারা সমস্ত মানব-জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক আদর্শে উপনীত হইবার পথ পরিষ্কার করিতেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বেদান্ত অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছে! বেদান্ত-ধর্ম্মে বহুবিধ ধর্ম্মভাবের বৈচিত্র্য আছে—আর সেইজন্যই ইহা প্রত্যেক মতের উপাসকদের আকৃষ্ট করিতে পারে। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত এবং আরও অনেক প্রকার, ধর্ম্মাবতারের বিভাগ ও স্তর বেদান্তে আছে—তাহারা সকল ভাব ও রুচির ধর্ম্মানুরাগীদের ইহা গ্রহণ করিতে পারে।

বেদান্ত শুধু দার্শনিক মতবাদ মাত্রই নয়—ইহা একটি বিশিষ্ট ও প্রকৃত ধর্ম্মসাধনার পথ। কারণ বেদান্ত উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসাধনার আদর্শ ও সাধন-পদ্ধতির আধার। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত ইহার বিরাট বৈচিত্র্যের বিশাল বক্ষে আসিয়া মিলিত ও সমন্বয় লাভ করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্ম, ইহুদী ধর্ম্ম জোরোস্তারীয় ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মমতগুলি

সকলেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম। কিন্তু বেদান্তের মধ্যে সমস্ত ধর্মমতের মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়। আবার ধর্মমত হইলেও দার্শনিক সিদ্ধান্তে বেদান্ত যুক্তি-শীলতার দ্বারা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সমস্ত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া ফেলিতে পারে। বেদান্তের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদ ও বিচারশীলতার নিয়মকেই মানিয়া চলে। অতএব 'বেদান্ত' বলিতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, উহা সেই মতবাদ—যাহার মধ্যে বিজ্ঞান যুক্তিবাদ দর্শনশাস্ত্র অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মমতের সমান প্রকৃতির ও তাহাদের পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে।

বেদান্তের বিশিষ্ট একটি দার্শনিক মতবাদ—আবার অন্যদিকে ইহা একটি সুমহান ধর্মমত। ধর্ম ও দর্শন—ইহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও বিশেষত্ব কি? দর্শনশাস্ত্রে ধর্মের যুক্তি বিচারপূর্ণ মতের যথাযথ যুক্তির পদ্ধতিগত ব্যাখ্যান—আর ধর্মশাস্ত্রের সেই মতবাদকে যথাযথ সাধনার দ্বারা বাস্তবে পরিণত করাই ধর্ম। ধর্মের সম্বন্ধে জানিতে হইলে প্রথমে ধর্মের তত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে হইবে। ধর্মের তত্ত্বকে যুক্তিবিচারের দ্বারা বুঝিতে পারিলে ইহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। তাহা হইলে ধর্মের সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ অবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা আর থাকিবে না।

দার্শনিকতার দৃষ্টিতে ধর্মকর্ম বুঝিতে পারিলে ধর্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন আমাদের মনকে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহাদের মীমাংসা হইয়া যাইবে। তাহার পরে ধর্মের আদর্শকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম চিন্তা ও আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া রূপায়িত করিবার সাধনপথ আমরা ঠিক করিয়া লইতে পারিব। এই কারণে বেদান্ত শুধু বুদ্ধিবিচারজগত মতবাদ মাত্রই নয়—ইহা সম্পূর্ণ সাধনাগত কর্ম-অনুষ্ঠানের ব্যাপার। আহার বিহার ভ্রমণ ভোজন কাজকর্ম কথাবার্তা প্রভৃতি জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই বেদান্তের ধর্মাদর্শকে আপনারা বাস্তব-ভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন। গৃহস্থালী ও পরিবারের সমস্ত কর্মে, পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্নী স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলের প্রতি কর্তব্য সাধনে ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ প্রীতি দানের ব্যাপারে এই বেদান্তের, ধর্মাদর্শকে রূপায়িত করা, আপনাদের পক্ষে আন্তরিক চেষ্টা করিলে সম্ভব হইতে পারে। বেদান্তের নিয়মনীতিকে যদি আপনারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে পরিবারগত ও সমাজগত সমস্ত ব্যক্তিদের সহিত আপনাদের সম্বন্ধকে আপনারা আধ্যাত্মিক ভাবে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারেন। আর যদি জীবনের সমস্ত কর্ম সমস্ত চিন্তা ও সকল ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধকে আধ্যাত্মিক ভাবে আপনাদের দ্বারা রূপান্তরিত হয়—তাহা হইলে প্রমাণিত হইবে আপনার যথার্থই বেদান্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অনুরক্ত। এইভাবে জীবনকে উন্নীত ও পবিত্র করিতে পারিলে আপনি যীশুখৃষ্টের আদর্শের যথাযথ একজন অনুগামী ভক্ত বলিয়া নিজেকে প্রমাণিত করিতে সক্ষম হইবেন। এইভাবে জীবনকে উন্নত করিতে পারিলে আপনি পৃথিবীর অন্যসমস্ত অবতার ও ধর্মগুরুদের যথার্থ ভক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবেন।

বেদান্তের এই আদর্শ সমস্ত ধর্মভাবের সমন্বয়কারী একটি সর্বাঙ্গীন ধর্মরূপ। আর এই সর্বাঙ্গীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মাদর্শের মধ্যে দ্বেষ হিংসা সঙ্কীর্ণতা অথবা বৈষম্য কোনও স্থান হইতে পারে না। দ্বেষ হিংসা ঘৃণা ও ভেদভাব অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়—আর অজ্ঞানতাই যাবতীয় অনর্থের মূল। যদি আপনি ক্রমাগত দ্বেষ-হিংসার প্রশ্রয় দেন—তাহা হইলে আপনার দেহে স্বাস্থ্যহানিকর মারাত্মক ব্যাধিবিষের উৎপত্তি হইবে। সেদিন নিউইয়র্ক সহরের একজন প্রবীণ ও বিখ্যাত ডাক্তার বলিয়াছিলেন, 'কোন পুরুষ বা নারী হিংসা বিদ্বেষের দ্বারায় জর্জরিত হইলে তাহার দেহে এমন সাংঘাতিক বিষের উৎপত্তি হয় যে, তাহাতে কুড়িজন লোককে

হত্যা করা যায়।' আর ইহা সত্যসত্যই প্রকৃত ঘটনা। অতএব ঈর্ষা বিদ্বেষকে আপনাদের কোনক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

জগতের যত কিছু অশুভ অমঙ্গল তাহা অভাবাত্মক দিক হইতে আসিয়া থাকে। আপনি যদি ভাবাত্মক পথের অনুসরণ করেন তাহা হইলে কোনও অশুভ আপনার জীবনে আসিবে না। জগতের সকল দিকে সকলের প্রতি মৈত্রী প্রেম সহানুভূতি ঐক্য ও মিলনের মনোভাব প্রসারিত করুন। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা দেখিবেন সমস্ত অশুভ ও অমঙ্গল ধীরে ধীরে দূর হইয়া যাইতেছে। তখন আপনার মধ্যে শান্তি আবির্ভূতা হইবে, আপনি যেখানেই থাকিবেন তখন সেখানেই আপনার ভিতর হইতে সকলের মধ্যে শান্তি সঞ্চারিত হইতে থাকিবে। যে কোন লোকই আপনাকে দেখিবে সেই ব্যক্তিই অন্তরে শান্তি ও সান্ত্বনা পাইবে। এই শান্তিকে প্রথমে আপনার নিজের ভিতর হইতে জাগ্রত করিতে হইবে—তাহার পরে আপনি সেই শান্তি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিবেন। আপনার শান্তিপ্রভা উপস্থিতির ফলে আপনার বাসগৃহ আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, আপনার কর্মস্থলে এবং আপনি যে কোনও স্থানে থাকিবেন সর্বত্রই আধ্যাত্মিক ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে। আপনার পবিত্রতাময় উপস্থিতির প্রভাবে কুটিল চিত্ত ব্যক্তির মনও সরল হইতে থাকিবে। আপনার কাছে থাকিলে তাহার মধ্যে আর খলতা ও কুটিলতা থাকিবে না।

যথার্থ সিদ্ধমহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিলে ও বাস করিলে মানুষের মধ্যে আর কুটিলতা থাকে না। অতএব আপনারা প্রত্যেকেই কেন এক একজন সিদ্ধপুরুষ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন না? তাহা হইলে তো আপনারা কুটিল ব্যক্তিদের মনকে শুদ্ধ ও সরল করিয়া ফেলিতে পারেন। তাহা হইলে চোর ডাকাত দুর্বৃত্ত বদমাইসদের সংশোধন করিবার জন্য সহরে পুলিশ-বাহিনী কিম্বা সমাজ-সংস্কারের কোনও প্রতিষ্ঠান রাখিবার আর দরকার হইবে না।

আদর্শের অনুগামী জীবন যাপন করুন, জনসমাজে বর্তমান কালে এই আদর্শের আপনারা জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে আপনাদের উপস্থিতির প্রভাবেই সমস্ত দুর্বৃত্ত ও হীনপ্রকৃতির লোকেরা একেবারে সৎপ্রকৃতির ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া যাইবে।

গত উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে (গাজীপুর নামক উত্তর প্রদেশের কোনও নগরের উপকণ্ঠে) পওহারী বাবা নামে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর যোগীপুরুষ ও সিদ্ধমহাত্মা ছিলেন। এই মহাপুরুষ আপনার কুটির প্রাঙ্গনে মাটির তলায় একটি গভীর গুহার মধ্যে অনেক সময়ে ধ্যানাবেশে অবস্থান করিতেন। তাঁহার আশ্রমে ছিল দু'তিন খানি কুটির ঘর এবং একটি ফুলের বাগান। সমস্ত আশ্রমটির চারিদিক উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই জনহীন স্থানে 'নিজের নিভৃত আশ্রমের' মধ্যে ঐ মহাপুরুষ মাসের পর মাস নিঃসঙ্গ তপস্যায় যাপন করিতেন। কারণ, যথার্থ মহাপুরুষ ও প্রকৃত সিদ্ধযোগীরা যাহে লোকেদের সঙ্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকেন।

ভারতবর্ষে আসল ও নকল দুইশ্রেণীর যোগী আছে—আর ইহাদের স্বভাবপ্রকৃতি জীবনযাত্রা আচারব্যবহারের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা যথার্থ রাজযোগী ও সিদ্ধ-মহাপুরুষ তাঁহারা জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে সর্বদা আপনাকে লুকাইয়া রাখেন। তাঁহারা ঐসব কপট ও ভণ্ড যোগীদের মতন কখনও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া নিজেদের জাহির করিতে চাহেন না। তাঁহাদের এইভাবে আত্ম-গোপন করিয়া থাকিবার কারণ, যেহেতু ভোগ-বাসনাসক্ত সাধারণ লোকেদের সংস্পর্শে তাঁহারা বিব্রত ও বিরক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। মহাত্মা পওহারী বাবা ধ্যানমগ্ন হইয়া নিজের আশ্রম-প্রাঙ্গণের তলার গুহার মধ্যে একাদিক্রমে কয়েক দিন করিয়া যাপন করিতেন। সেই সময়ে তিনি

কখনও কোন খাদ্য পাইতেন না, এমনকি জল পর্য্যন্ত পান করিতেন না। কিন্তু তপস্যাসিদ্ধির ফলে তাঁহার উপস্থিতি এমন পবিত্র প্রভাবে পূর্ণ ছিল যে তাঁহার জীবনকালে তাঁহার আশ্রমের সন্নিহিত স্থানগুলিতে চুরি বাটপাড়ি ডাকাতি কিম্বা অন্য কোনও পাপকার্য্য হয় নাই। দীর্ঘকাল ঐ স্থান হইতে চুরি ডাকাতির কোনও ডায়েরী না হওয়ায় পুলিশ কমিশনার স্বয়ং এবিষয়ে তদন্ত করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের নিরুপদ্রবপূর্ণ ও শান্তিময় পরিবেশ দেখিয়া সেখানে আর পুলিশের দরকার নাই জানিয়া সেখানকার থানা উঠাইয়া দিলেন। পওহারীবাবার সুপবিত্র জীবনকাহিনী হইতে বুঝিতে পারা যায়, কোনও পুরুষ বা নারীর মধ্যে পবিত্রতার পূর্ণপ্রকাশ হইলে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ফলে ঐ পরিবেশে যে সমস্ত নরনারী আসিয়া পড়ে, তাহাদের জীবনের গতি ফিরিয়া যায় এবং পরিণামে তাহারা সৎ ও পুণ্যশীল হইয়া পড়ে।

এই বিশ্বসংসারে চেতনার বিভিন্ন প্রকার আয়তন বা এলাকা আছে। আপনাকে কেন্দ্র করিয়া চেতনার একটি পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। আপনার ব্যক্তিগত চেতনা পবিত্রতাময় হইলে আপনার সান্নিধ্যে আগত ব্যক্তিরা পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত ও উন্নীত হইতে থাকিবে। যেমন প্রত্যেক চুম্বক পাথরের আকর্ষণ-শক্তির বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ঘুরত্ব পর্য্যন্ত এক একটি পরিবেশ আছে। সেই পরিবেশের মধ্যে কোনও সূচ আসিয়া পড়িলে চুম্বক পাথর তখনি তাহাকে টানিয়া লইবে। চুম্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তির বাহিরে সূচটিকে লইয়া যান—দেখিবেন চুম্বক পাথরটি সূচটিকে আর টানিতে পারিতেছে না। সেইরূপ যখনই কোনও ব্যক্তি আপনার প্রভাবশক্তির পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িবে তখনই সে আপনার দ্বারা আকৃষ্ট হইবে এবং আপনার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে থাকিবে। কিন্তু যদি আপনার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত আধ্যাত্মিক-কেন্দ্রের জন্য আপনার প্রভাবের পরিবেশ ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ শক্তিকে আপনি বর্দ্ধিত প্রসারিত ও সঞ্চারিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, ব্যক্তিরূপে প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে অসীম শক্তি সম্ভাবনা ও প্রভাবশীলতা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কারণ, এসম্বন্ধে আমি যেমন ইতিপূর্ব্বে আপনাদিগকে বলিয়াছি—আমরা প্রত্যেকেই এক একজন ক্ষুদ্রাকৃতি সৃষ্টিকর্ত্তা। আপাতঃদৃষ্টিতে আমরা অণুপরিমাণ ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি—কিন্তু সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাত্মার সহিত আমাদের স্বরূপগত একত্ব ও অভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিলে, আমাদের মধ্যে অসীম শক্তি প্রকাশিত হইবে।

স্বরূপতঃ আমরা জন্মহীন মৃত্যুহীন আত্মা। আর কিছুই আমাদের স্বরূপ এই আত্মা অপেক্ষা মহত্তর নয়। যখন আমরা দেহাত্মবোধে অভিভূত হই তখন আমরা অণু পরমাণু অপেক্ষাও অতিশয় ক্ষুদ্রতর। কিন্তু যখন আমরা নিজেদের আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন আমরা অনাদি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন। এই ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধির ফলে আমরা সমস্ত ভয় ভেদ বৈষম্যকে অতিক্রম করি, তখন প্রতিবেশী দেশবাসী এবং এমনকি অন্য সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সহিত আমাদের একাত্মতা বোধ করিতে পারি। তখনই যথার্থ আধ্যাত্মিকতার জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়—আর এখানেই দিব্যভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের মধ্যে এই দিব্যস্বরূপতার বিকাশ সাধন করিতে হইবে। আপনারা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করুন। তখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন—আপনাদের জীবন-দৃষ্টান্তের সহায়ে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক রাজ্যের আবির্ভাব হইবে। তাতসারেই আমাদিগকে এই সুমহান আদর্শের দৃষ্টান্ত-দেখাইতে হইবে, সেই আদর্শের উপলব্ধির জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্যের প্রতি

আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, যাহাতে আমাদের মধ্যে সমস্ত দোষ ত্রুটিকে সংশোধন করিতে পারি। সেই আদর্শে উপনীত হইবার জন্য ঐকান্তিকভাবে সাধনার সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি আমরা শান্তি মৈত্রী ও শুভেচ্ছার মনোভাব প্রসারিত করিতে থাকিব। যাহারা আমাদের গালাগালি দেয় তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতে, যাহারা আমাদের ঘৃণা করে তাহাদের ভালবাসিতে, যাহারা আমাদের উপেক্ষা করে তাহাদের সমাদর ও প্রীতি দিতে আমাদের অভ্যাস করিতে হইবে। যদি আমরা ইহা সফল করিতে পারি তাহা হইলে আমরা বেদান্তের আদর্শকে যথার্থ প্রতিপালনকারী বলিয়া প্রমাণিত হইব। তারপরে ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিব—যে পরিপূর্ণতার সম্বন্ধে যীশুখৃষ্ট তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর যেমন সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ তোমরা সকলে সেইরূপ পরিপূর্ণতা লাভ কর।" অথবা প্রাচীন ভারতের ঋষিরা এ সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি," অর্থাৎ "যাঁহারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন তাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপতায় চির প্রতিষ্ঠিত হন।" এই অবস্থায় আসিলে মানুষের জীবন কিরূপ উন্নত ও মহান হইয়া যায় সে সম্বন্ধে বেদান্তে বলা হইয়াছে :—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং
ততো ন বিজুগুপ্সতে।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ
একত্বমনুপশ্যতঃ॥"
—ঈশোপনিষৎ, ৬, ৭ মন্ত্র

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সমস্ত জীবকে আপনার মধ্যেই এবং সমস্ত জীবের মধ্যে নিজেকে সর্ব্বদা অবস্থিত দেখিতে পান, তখন তিনি কাহারও প্রতি আর ঘৃণা পোষণ করিতে পারেন না।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমস্ত জীবের মধ্যে নিজেকে দর্শন করেন—তখন সেই চরম একত্ব উপলব্ধিকারী ব্যক্তির মধ্যে শোক অথবা মোহ আর থাকিতে পারে না।" *

* ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে সানফ্রান্সিস্কো সহরে প্রদত্ত পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বক্তৃতা *Unity and Harmony*র স্বামী বেদানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদ।

সংশয়

অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়, এম-এ

হারাই হারাই আপনারে এই ভয়
নিতি মনে আনে শত ভীরু সংশয়।
মনেরে আমার কে যেন আড়ালে রাখে,
কোন্ মায়াজালে তোমার মূরতি ঢাকে,
সব আলো মোর নিতে যায় বারে বারে,
হৃদয় আমার নিমেষেই তমোময়।
আপনারে আমি বাহির ভুবন থেকে
রেখেছিনু দূরে শুধু আপনার করি,
কঠিন আঘাতে সবহারা হয়ে শেষে
আজ হৃদয় ওঠে হাহাকারে ভরি।
সবাকার মাঝে যবে আমি নতি দাঁড়াই,
নয়ন সমুখে দেখি কোন বাধা নাই,
আপনারে আমি চিনি নবনব রূপে,
মোরে নিয়ে একি খেলা তব লীলাময়?

মহাযোগী পওহারী বাবা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গাজীপুর সহরের কিছুদূরে একটি নির্জন আশ্রমের অধিবাসী সিদ্ধ-মহাত্মা পওহারী বাবার পবিত্র জীবনের কথা বাঙলা-দেশের লোকেদের নিকট আজও তেমন পরিচিত নয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অনেক স্থানে এই মহাপুরুষের নাম হাজার হাজার লোকের নিকটে সুপরিচিত। মহাযোগী পওহারী বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমসাময়িক কালে জীবিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু নিজের অসাধারণ যোগশক্তির বলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহত্ত্ব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিবিড়ভাবে ভক্তি করিতেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পওহারী বাবা তাঁহার আশ্রমের একটি ঘরে রামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি রাখিয়া দিয়াছিলেন। পওহারী বাবা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন, রামকৃষ্ণদেব সত্যই একজন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মভাবকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হইয়াছে।

পওহারী বাবার পূর্ব্বাশ্রমের নাম—হরভজন তেওয়ারী। তাঁহার পিতার নাম অযোধ্যাপ্রসাদ তেওয়ারী। ১৮২০খৃষ্টাব্দে জৌনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর (গুর্জি) নামক স্থানে একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বাল্যকালে হরভজন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া-ছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার একটি চক্ষু কাণা হইয়া গিয়াছিল। বালকের মনে পাছে কোনও ক্ষোভ হয় সেজন্য তাঁহার পিতামাতা পিতৃব্য ও আত্মীয়গণ হরভজনকে স্নেহভরে "গুরুাচার্য্য" বলিয়া ডাকিতেন।

ব্রাহ্মণবংশের প্রথামত মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে হরভজনের উপনয়ন (পৈতা) সংস্কার হইয়াছিল। ঐ অল্পবয়স হইতেই তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন। পাণিনির ব্যাকরণ, উপনিষদ, গীতা বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে হরভজন প্রায় পনেরো বৎসর পরে গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শঙ্কর রামানুজ ও নিম্বার্কের ভাষ্যসমেত বেদান্ত শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। যৌবনকালে প্রায় বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যার প্রভাবে প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্য তপস্যা পবিত্রতা ও ঈশ্বরভক্তি ছিল সত্যই অসাধারণ। আহার বাক্য ও নিদ্রায় হরভজন অত্যন্ত সংযমী ছিলেন। ঈশ্বরপ্রেম ধ্যানতন্ময়তা সত্যনিষ্ঠা বিনয় নম্রতা প্রভৃতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণগুলি যৌবনকাল হইতেই ইঁহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানব-প্রেম জীবে দয়া সকলের প্রতি মৈত্রী করুণা ও সেবার ভাব ইঁহার পবিত্র চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। হরভজন আজন্ম অতিশয় সরল সদানন্দ প্রিয়ভাষী ও মধুর প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃত সিদ্ধযোগী ও ভক্ত মহাত্মার বলিয়া ইনি অহঙ্কার আত্মম্ভরিতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। নির্জ্জনে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকা বাল্যকাল হইতেই হরভজনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রকৃত একজন সিদ্ধমহাত্মা ছিলেন বলিয়া ইনি কখনও নাম যশ প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত ছিলেন না। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধির অবর্ণনীয় আনন্দে ইনি সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন। ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে সন্ন্যাসী হরভজন ভাত রুটি প্রভৃতি খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া দিনান্তে মাত্র আধসের দুধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। আবার ধ্যানের আবেশে কখন কখন এক সপ্তাহ কিম্বা পনেরো দিন আহার-নিদ্রা-

বঞ্চিত হইয়া অবস্থান করিতেন। এইজন্য গাজীপুরে হয়জনের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিরা ইঁহাকে পওহারী বাবা 'অর্থাৎ পয়স (দুধ) অথবা পবন (বায়ু) আহারকারী মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে থাকেন। এই নামেই তিনি এখন সাধুসন্ন্যাসীদের সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত।

পওহারী বাবা যৌবনকালে হিমালয় এবং ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইনি উত্তরে কেদারবদরী হরিদ্বার কাশী বৃন্দাবন অযোধ্যা এবং দক্ষিণে কাঞ্চী শ্রীরঙ্গপত্তন মাদুরা রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান পদব্রজে পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়স হইতে পওহারী বাবা গাজীপুরের কাছে একটি স্থানে নির্জন আশ্রম তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি তপস্যায় যাপন করিতে থাকেন। সেখানে কয়েকজন অনুরক্ত তাঁহাকে দেখাশোনা করিতেন। কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া পওহারী বাবা পারতপক্ষে কাহারও সেবা গ্রহণ করা পছন্দ করিতেন না।

যাঁহারা যথার্থ উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষ তাঁহারা অপরকে দীক্ষা দেবার জন্য মোটেই লালায়িত হননা। অথবা দীক্ষা দিলেও মাত্র দুচারজনকে দীক্ষা দিয়া থাকেন। পওহারী বাবা কখনও গুরুগিরির ব্যবসা করেন নাই। তাঁহার কোনও দীক্ষিত শিষ্য ছিল না। ধর্মের নামে একটা সম্প্রদায় বা দল প্রতিষ্ঠা করা ইহার নিকট একেবারে অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার ছিল। কারণ এসম্বন্ধে স্বামিজীকে তিনি বলিয়াছিলেন উহার দ্বারা ধর্মভাবের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি ও বিকৃতি হয়। তবে যথার্থ বৈরাগ্যবান ও সাধননিষ্ঠ কোনও ব্যক্তির ধর্মগত কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাদের সংশয় তিনি দূর করিয়া দিতেন। পরিণত বয়সে প্রকৃত মহাপুরুষের বিশেষ বিশেষ গুণ ও মহত্ত্ব পওহারী বাবার মধ্যে আশ্চর্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি কখনও জনতার সম্মুখে আসিয়া ধর্মপ্রচার বা ধর্মের উপদেশ দান করেন নাই। কোনও জনসভায় তিনি কখনও বক্তৃতা দেন নাই। কখনও শ্রোতাদের কুহকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই—যদিও শাস্ত্রের সম্বন্ধে বিচার ও অনুভূতি গভীর জ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। এই ধর্মবণিকতার যুগে তথাকথিত ধর্মগুরুদের মতন ধর্মের নামে ব্যবসাদারী করা অথবা অনেক চেলা জুটাইয়া আরামে ও ভোগবিলাসে থাকার হীনপ্রবৃত্তি এই সিদ্ধমহাত্মার চরিত্রে কীণতম ছায়াপাতও করিতে পারে নাই।

পওহারী বাবার উপস্থিতিতে এমন অধ্যাত্মিক প্রভাব ও শক্তি ছিল যে, তাঁহার আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানে বাসকারী অনেক লোকের জীবনকে ধর্মভাবে উন্নত করিয়া দিয়াছিল। অনেক মলিনচিত্ত ব্যক্তি তাঁহার আশ্রমের আশে পাশে থাকার ফলে সৎপ্রকৃতি সম্পন্ন হইয়াছিল। ভিক্টর হিউগোর 'লা মিজরাবল' উপন্যাসে সাধু ও ভক্ত বিশপ মিরিয়েলের প্রভাবে দুর্ধর্ষ ডাকাত জিণ ভলজ্যার জীবনকে সৎভাবে পরিবর্তন করিয়া দিবার কাহিনী বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহা লেখকের রচিত কল্পিত কাহিনী মাত্র। কিন্তু পওহারী বাবা এ বিষয়ে বাস্তবে ও জীবন্ত ঘটনায় তাহার সত্যতা দেখাইয়া গিয়াছেন। পওহারী বাবার আশ্রমে থালা বাটি কাপড় চুরি করিতে তাঁহাকে দেখিবামাত্র চোরের অন্তর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল। সে ব্যক্তি পরবর্তীকালে একজন সাধু ও ভক্তরূপে পরিণত হইয়াছিল। অহিংসা ও প্রেমের শক্তি পওহারী বাবার মধ্যে প্রবলভাবে ছিল বলিয়া ওঁরা বদমাইসদের তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে দুষ্প্রবৃত্তি ক্রমে দূর হইয়া গিয়াছে। একবার একটি বিষাক্ত গোখুরা সাপ পওহারী বাবার ডান হাতে দংশন করিয়াছিল। কিন্তু অহিংসার ও প্রেমের মূর্তি এই মহাত্মার তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় নাই। জানি না সাপের বিষ কেমন করিয়া শক্তিহীন হইয়া গিয়াছিল। এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে মনীষী রাজনারায়ণ বসু (শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ) ও ভক্তিভাজন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলে পওহারী বাবা উত্তর দিয়াছিলেন, "পাহন দেওতা আয়া"—অর্থাৎ, "সাপের রূপ ধরিয়া আমার কাছে সেই পরম প্রিয়তম ও আরাধ্য ভগবানের একজন দূত আসিয়াছিল।"

নীলমাধব ঘোষ নামে একজন উচ্চশিক্ষিত ও ভক্তিমান ভদ্রলোক গাজীপুরে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অধীনে কোনও অফিসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। নীলমাধব বাবু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিতও নীলমাধব বাবুর পরিচয় ছিল (রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম ভাগ দেখুন)। নীলমাধব বাবু একবার ১৮৮০ সালে ছুটি লইয়া কলিকাতায় এক মাসের জন্য আসেন। সে সময়ে তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে গাজীপুরে পওহারী বাবার সম্বন্ধে অনেক খবর দিয়াছিলেন। তাহাতে কেশবচন্দ্র পওহারী বাবাকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। ঐজন্য কয়েকজন প্রিয় শিষ্যকে লইয়া নীলমাধব বাবুর গাজীপুরের বাড়ীতে কেশবচন্দ্র কয়েকদিন ছিলেন। ঐ সময়ে পওহারী বাবার সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। উদারচিত্ত ও গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্র পওহারী বাবার আধ্যাত্মিক মহত্বে মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র পওহারী বাবাকে জনসমাজে আসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য শ্রদ্ধার সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মপ্রচারে সম্পূর্ণ বিমুখ মহাত্মা পওহারী বাবা কেশবচন্দ্রের সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হন নাই। গাজীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র পওহারী বাবার কথা রামকৃষ্ণদেব, রাজনারায়ণ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী এবং তাঁহার পরিচিত আরও অনেক কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী অভেদানন্দ স্বামী সারদানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্যেরাও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে পওহারী বাবার কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পরে স্বামীজী ও তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা কয়েক বৎসর কাল উত্তর প্রদেশ পাঞ্জাব রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে তপস্যা ও তীর্থভ্রমণে কাটাইয়া ছিলেন। ঐ সময়ে স্বামিজী এবং ব্রহ্মানন্দ অভেদানন্দ সারদানন্দ তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি স্বামিজীর গুরুভ্রাতারা গাজীপুরে পওহারী বাবাকে দর্শন করিবার ও তাঁহার উপদেশ শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের দেহত্যাগের (১৮৮৬) পরে স্বামিজী উত্তর-প্রদেশে পরিব্রজ্যার সময়ে কয়েক মাস গাজীপুরে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পওহারী বাবার সহিত স্বামিজীর কয়েকবার দেখা ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। স্বামিজী রামকৃষ্ণদেবের প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য বলিয়া পওহারী বাবা তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতি ও স্নেহের ভাব পোষণ করিতেন। স্বামিজী একবার পওহারী বাবার কাছে হটযোগের সাধনা শিক্ষার জন্য দীক্ষা লইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। (এসম্বন্ধে স্বামি-শিষ্য সংবাদ উত্তরকাণ্ড ও স্বামিজীর ইংরাজী ও বাংলা জীবন-চরিতগুলি দেখুন।) কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাভক্তির জন্য পওহারী বাবা স্বামিজীকে দীক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। পওহারী বাবার অদ্ভুত জীবন আধ্যাত্মিক শক্তি ও মহত্বের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিয়া স্বামিজী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এমনকি স্বামিজী কয়েকবার বলিয়াছেন, রামকৃষ্ণদেবের পরে পওহারী বাবার মতন এমন উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষ তিনি আর কোথাও দেখিতে পান নাই। পওহারী বাবার সহিত স্বামিজী ও তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতার যেসব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাঁহারা কেহই কোনও কথা খুলিয়া বলেন নাই, অথবা লেখেন নাই। সম্ভবতঃ ধর্ম্ম-সাধনার ব্যাপারে অতি উচ্চ বিষয়ক আলাপ প্রকাশ করা নিষেধ বলিয়া তাঁহারা ঐসব কথাবার্ত্তা প্রকাশ্যভাবে অন্য লোকেদের কাছে কখনও বলেন নাই।* তবে স্বামিজী কয়েকটি চিঠিতে কাশীধামের অধিবাসী অমিদার সুপণ্ডিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ প্রমোদাদাস

মিত্রকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গাজীপুর হইতে পওহারী বাবার সম্বন্ধে আচার্য্যে ইঙ্গিতে কিছু কিছু বর্ণনা দিয়াছেন। আর পওহারী বাবার দেহত্যাগের পরে স্বামীজি তাঁহার সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। স্বামিজীর ঐ প্রবন্ধটি ইংরাজী ও বাঙলার পুস্তিকার আকারে পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাপুরুষ পওহারী বাবা ধর্মসাধনা ও আধ্যাত্মিক মহত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ প্রকৃত একজন মহাত্মা সত্য সত্যই এযুগে দুর্লভ। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে গাজীপুরের আশ্রমে বিশেষ একটি হোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিজের দেহ পূর্ণাহুতিরূপে দিয়া পওহারী বাবা মহা-সমাধি লাভ করিয়াছেন। পওহারী বাবার দেহত্যাগ-কালে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের দুঃসংবাদ শুনিয়া স্বামিজী অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। স্বামিজী সেদিন একান্ত শ্রদ্ধার সহিত ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস বুল প্রভৃতি তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যাদের কাছে পওহারী বাবার মহত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আপনার ভক্তি ও প্রণাম নিবেদন করিয়াছিলেন।

সাধন-পথের অনুসন্ধানে তোমাদিগকে নিজ নিজ আধার ও বয়ের সহিত নিয়োজিত হইয়া থাকিতে হইবে। শুধু আমাকে দর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। আমার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া দুঃখজড়িত এই মর্ত্তজীবনের জাল হইতে মুক্ত হও। লক্ষ্য স্থির ও অটল রাখিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হও।

পীড়িত ব্যক্তি ঔষধের আরোগ্যকারিণী শক্তির দ্বারা রোগমুক্ত হইতে পারে। চিকিৎসককে স্বচক্ষে না দেখিয়াও সে রোগমুক্ত হইতে পারে।

যে আমার উপদেশ পালন না করিবে তাহার পক্ষে আমার দর্শনলাভ বৃথা। ইহা নিশ্চিত। প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর ব্যক্তি আমা হইতে দূরে থাকিয়াও সর্ব্বদা আমার নিকটে অবস্থান করেন।

কেহ আমার সহিত একত্রে বাস করিলেও যদি আমার দেওয়া উপদেশ পালনে অমনোযোগী ও বিমুখ হয়—তাহা হইলে আমার নিকট হইতে সে ব্যক্তি বহু দূরে আছে। ধর্ম্মানুরাগী ও সাধন-পরায়ণ ব্যক্তি সকল সময়েই তথাগতের সান্নিধ্যলাভের পবিত্রতা ও আনন্দ উপভোগ করে।

জন্মই সর্ব্বপ্রকার মিশ্র পদার্থের প্রকৃতি ও পরিণতি। কিন্তু সত্য অনন্তকাল ধরিয়া অবিকৃত চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আমার এই বাক্যে তোমরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হও। আন্তরিক ও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায় সাধনার পথকে বাধাবিঘ্ন হইতে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখ।

—ভগবান বুদ্ধদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ, বি. এল

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে (১২৪২) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। 'দ্বিতীয়' কথাটী দ্বি+তীয় পূরণার্থে। 'দ্বি' অর্থে আচ্ছাদন করা। যাহা দুইয়ের পূরণ করে। যাহা একটে আচ্ছাদন করে। যাহা দু'টিকে একত্রে সমাবেশ করে, তাহাই দ্বিতীয়। চিৎ-রূপী রবি ও অচিৎরূপী চন্দ্রের দূরত্ব ও নিকটত্ব সমস্ত হেতু তিথির উদয়। আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবানের রথযাত্রা। শ্রাবণ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকে 'মনোরথ দ্বিতীয়া' বলে। কার্ত্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকে 'যম দ্বিতীয়া' বলে, যাহা সংযমন শিক্ষা দেয় এবং ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সর্ব্বমঙ্গলার প্রতীক ষষ্ঠী মাতার পূজা। ষষ্ঠীই জগন্মাতার প্রতীক। সংযম শিক্ষা হইলে মনের দ্বারা জগন্মাতা হয়। এই তিথির দেবতা ব্রহ্মা, যিনি একটে ভেদ করিয়া দুইয়ের উৎপত্তি করেন।

বেদান্ত বলে—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক পদার্থ নহে। একই পদার্থ, কখন পুরুষ ভাবে এবং কখনও বা প্রকৃতি ভাবে। ঠাকুর বলিতেন—"সেটা কি রকম জানিস? যেমন সাপটা কখন চলছে, আবার কখন বা স্থির হয়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে তখন হলো পুরুষ ভাব—প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। আর সাপটা চলছে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে কাজ করছে।" আরও উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বুঝাইতেন—"তোরা তো বিয়ে বাড়ীর বাজি দেখেছিস্। কর্ত্তা চুপ ক'রে বসে হুকুম চালিয়ে গুড়ুক খাচ্ছেন এবং গিন্নি চতুর্দ্দিকে ঘোরাঘুরি করে সব সামলাচ্ছে।" শান্ত অবস্থা পুরুষ এবং কার্য্যকরী অবস্থাই প্রকৃতি। জানাগি ভিন্ন এ শান্ত অবস্থা আনিতে পারে না। কারণ অহঙ্কার তত্ত্ব হেতু আমরা সকলেই নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন। তাহাই হইল মহামায়ার সৃষ্টি লীলা। এই কারণেই শক্তিপুজকের পূজার বলি—"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে নিবেদয়ামি চ আত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর।" যাহাতে শ্রীভগবানের শ্রীপদ্মে আত্মনিবেদন হেতু তাঁহারই কৃপায় আমার সেই শান্ত অবস্থা আসে। আমাদের ঠাকুরের মধ্যে এই দুই ভাবের সংমিশ্রণ অতি মধুরভাবে বিকশিত। যিনি জগন্মাতাকে ক্রতলস্থ অনুভবন করেন তিনি লোকশিক্ষার্থ মা-কালীর মূর্ত্তিপূজক।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নিজের ঘরের সম্মুখে বারান্দায় একাকী নিজের ভাবে এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন, মথুর কাছারী ঘর হইতে দেখিলেন, ঠাকুরের সম্মুখ দিকে কালী এবং পশ্চাৎ দিকে শিব। মথুর মনে করিলেন উহা তাঁহার দৃষ্টিভ্রম। তিনি চক্ষু মুছিয়া পুনরায় তাকাইয়া একই তিনি দেখিলেন। তখন তিনি উঠিলেন এবং ঠাকুরের কাছে আসিতে দেখিলেন যে, তাহা ঠাকুরের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ঠাকুর একাধারে শিব ও শক্তি।

ঠাকুর বলতেন—"মা-ই আমায় সব। সমস্ত বাহ্যতঃ প্রকৃতি জীবন্ত প্রত্যক্ষ জগদম্বার লীলা বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্তই মহামায়ার খেলা। এই মায়া ব্রহ্মের শক্তি।" তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে—ব্রহ্ম কি মায়া-বিজড়িত? ঠাকুর বলিতেন—"না তাহা নহে। ব্রহ্মের মায়া হ'লেও এবং মায়া ব্রহ্মে সর্ব্বকালীন থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্ম সেই মায়ায় আবদ্ধ নহে। যেমন সাপ থাকে কামড়ায় সে ঘরে। সাপের মুখে বিষ সর্ব্বদা আছে। সাপ

সেই মুখ দিয়ে খাচ্ছে, চোক গিলছে, কিন্তু নিজে সে মরে না। সেই রকম ব্রহ্মের মায়া হ'লেও ব্রহ্ম মায়া দ্বারা বিজড়িত নহে।" এই কারণে শাস্ত্রে সর্প মায়ার প্রতীক। ঠাকুর এই মহামায়া আদ্যাশক্তির উপাসক। ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যুক্তিসঙ্গত।

এই মহামায়া (আদ্যাশক্তি কালী) মহাদেবের স্পন্দনশক্তি। এই মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। অর্থাৎ—শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। যেমন পবন ও পবন-স্পন্দন একই পদার্থ। দাহিকাশক্তি ও অনল যেমন একই পদার্থ। সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তাঁহার স্পন্দশক্তি অর্থাৎ মায়া সর্ব্বথাই এক কথাচ পৃথক নহে। স্পন্দনের দ্বারা যেমন বায়ু অনুভূত হয়; উষ্ণতার দ্বারা যেমন অগ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ শিব নামক নির্গুণ শান্ত চিদাত্মাও স্পন্দশক্তি কালিকা শক্তির দ্বারা অনুমিত হয়। অন্য কোন উপায়ে নহে। তত্ত্বজ্ঞানীরা এই শান্তশিব চিন্মাত্রকেই অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। স্পন্দশক্তি তাঁহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্য জগৎ প্রকাশ করে। সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা-নগর নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ নিরাকার শিবের ইচ্ছা এই দৃশ্য প্রপঞ্চ সৃজন করিতেছে। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দ-শক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় 'জীবচৈতন্য' নামে সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া 'প্রকৃতি' নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূত উৎপত্তি প্রকৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া 'ক্রিয়া' নামে অভিহিতা হন। মহাভারতে 'জন্মেজয়' এই তত্ত্ব বুঝায়। 'এজ' ধাতুর অর্থই হইল কম্পন, স্পন্দন। এই স্পন্দশক্তি মানবদেহের হৃদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত 'হৃদয়' নামক শিবের মস্তকের ভূষণ বিষ্ণুরূপা ইন্দুকলা বলিয়া ইহার নাম 'উমা'। ইনিই কাল। এই কাল ও কালী আকাশ-স্বরূপা বলিয়া উহার বর্ণ কাল। আকাশের অবস্থিতি যেমন আকাশেই, তাহার ভিন্ন আধার নাই। সেইরূপ ইহাদেরও ভিন্ন আধার নাই। ইহারাই ইহাদের আধার অর্থাৎ আধার আধেয় রূপা। এই পরিস্পন্দন শক্তিরূপিণী ভগবতী কালী অনাদি অনন্ত চিৎশক্তিরূপিণী, নিজ ইচ্ছাতেই তিনি সমস্ত বেদোক্ত ক্রিয়াস্বরূপা হন। এই কারণে ইহার বিবিধ অভিনয় সহিত নৃত্য ব্রহ্মার কটিফল স্বরূপ এবং নিখিল প্রাণীর সৃষ্টি, স্থিতি, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি রূপে পর্য্যবসিত হয়। ইনি ক্রিয়ারূপিণী। ক্রিয়া নিরয়ব হয় না বলিয়া কৃতগণের উৎপত্তি ও শরীর মধ্যে হস্ত, পদ ইন্দ্রাদি ইত্যাদি এবং তাহাদের স্পন্দনই ক্রিয়া। কৃতস্পন্দন ভিন্ন জাগতিক ক্রিয়া নাই।

এই ক্রিয়াই হইল কর্ম্ম। কাজেই কর্ম্মত্যাগ হয় না। তাহা হইলে প্রশ্ন হয়—'ত্যাগ' অর্থে কি বুঝায়? ত্যাগ কথাটি ত্যজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ত্যজ্ অর্থে ছাড়া। প্রশ্ন উঠে কি ছাড়া? দ্বারা পুত্র না বিষয়? বিষয় ত্যাগ হয় না। কারণ গ্রহণের গ্রাহ্যো যথা ব্যবস্থিয়তে স বিষয়:"। গ্রহণ শক্তির দ্বারা গ্রাহ্য যেরূপে ব্যবহৃত তাহাই বিষয়। বিষয় গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্ক-ফল। সুতরাং বিষয় ত্যাগ হয় না। তাহা হইলে ত্যাগ বলিতে কি বুঝায়? ত্যাগ বলিতে বৈরাগ্য বুঝায়? অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ। ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্যবস্তুতে অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য। ভোগ্য বস্তুনিচয়ের স্বরূপ অনিত্য দেহ হইতে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত সকলের নশ্বরত্ব বোধে বিষয় স্থানে বিরক্তির নামেই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য কি করিয়া লাভ হয়? গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" অভ্যাস দ্বারাই এই বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে হয়। 'কারণ' নামক নদী উভয় দিক বাহিনী। ইহা যেমন কল্যাণের দিকে প্রবাহিতা, তেমনি পাপের দিকেও প্রবাহিতা হইতে পারে। যাহা কৈবল্যস্বরূপ উচ্চ ভূমি পর্য্যন্ত প্রবাহিনী ও বিবেক বিষয়রূপ নিম্নমার্গ-গামিনী তাহা কল্যাণবহা। আর যাহা সংসার প্রাগ্‌ভার পর্য্যন্ত বাহিনী ও অবিবেক বিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী তাহা পাপবহা। বৈরাগ্যের দ্বারা

বিষয়স্রোত মন্দ বা ক্ষীণীভূত হয় এবং বিবেক দর্শনাভ্যাসের দ্বারা বিবেক স্রোতে উদ্ঘাটিত হয়। এই প্রকারে যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় তখন তত্ত্ব-দর্শন ঘটে।

ঠাকুরের জীবনে এই বৈরাগ্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তিনি প্রকৃতি বিজড়িত হইয়াও প্রকৃতি-পাশে বদ্ধ হন নাই। সাধারণ লোক যেমন পাশযুক্ত জীব, তিনি পাশবিমুক্ত হেতু—শিব। তিনি নিজ জীবনে এই বৈরাগ্য দেখাইয়া জগৎকে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে, মানব সংসারে থাকিয়াও জীবন্মুক্ত হইতে পারে। তাই তাঁহার মূল শিক্ষা —কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ। কামিনী ও কাঞ্চন কি ভাবে জীবকে মোহগ্রস্ত করিতে পারে সমগ্র জগৎ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ওঁ রামকৃষ্ণায় নমঃ

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

P 30405

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

অশিমোহন পাল, এম-এ, বি-এল

সেই এক পূর্ণিমায় সার্থকতা ঘটেছিল জানি,
নিবৃত্তির মহামন্ত্র ভিক্ষাপাত্রে দিয়াছিলে আনি'
জ্ঞানদর্শী প্রিয়দর্শী প্রবুদ্ধ মহান্—
একদা জগৎ-সভা নতশিরে লয়েছে সে দান।
'অহিংসা পরম ধর্ম'—এই কথা শুনায়েছ বিশ্বে,
সম্মানের শীর্ষে তুমি তুলিয়াছ যত লব নিঃস্বে।
হে অমিতাভ, অমিত প্রাণের স্নিগ্ধ আলোকে
আশা সিঞ্চিত অমৃত বাণী সান্ত্বনা দেয় লোকে
কৌলিন্যের গর্বস্ফীত স্বার্থলুব্ধ পৃথিবীর দ্বারে
শান্তির পরম বাণী, তথাগত, প্রচারিলে কারে?
ভুলিয়াছে তারা আজি সন্ধ্যির শান্তিময় শিক্ষা
অবহেলি' সেই মন্ত্র লইয়াছে পিশাচের দীক্ষা,
হিংসা-বিষে জর্জরিত মৃত্যু-নীল ধরণীর অঙ্গ
দুর্বলের কণ্ঠরোধে মত্ত পাপ লইয়াছে সঙ্গ;
পৈশাচিক মৃত্যুযজ্ঞে আহুতির মহা আয়োজন
প্রলয় আঁধারে, দেব, হইয়াছে তোমা প্রয়োজন
শঙ্কিতা ধরিত্রী কাঁদে, প্রার্থনায় মিনতির সুর
শান্তির সঙ্গীত-স্রষ্টা কোথা প্রভু আছো কত দূর?
ভারতের তমোময় লুপ্ত নভে হে জ্যোতির্ধর!
পরাও আলোকটীকা পুত হস্তে অমর অক্ষর,
অলঙ্কার ব্যঞ্জনায় বহু উর্ধ্বে সত্যসন্ধী তুমি—
দীন-মাথা-অঞ্জলিতে শ্রদ্ধাভরে তোমারে প্রণমি।

বৈজ্ঞানিক সত্য

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন রায়

সত্য এবং জ্ঞান অন্বেষণের দুটি পন্থা আবহমানকাল থেকে মানুষের সমাজে চ'লে আসছে। একটি হ'ল বিশ্লেষণা, অভিজ্ঞতা ও বিচার বুদ্ধিযোগে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এবং অপরটি হ'ল ধ্যানধারণালব্ধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা। প্রথমটিকে বলা হয় বিজ্ঞানের এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় অধ্যাত্মবিদ্যার পথ। শোনা যায়, মহাজন বা মহাপুরুষেরা ধ্যানধারণার ফলে অখণ্ড সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপলব্ধি করতে পারেন তাঁদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে। অন্ধকারে আলোর মত অখণ্ড সত্যের রূপ বা পরম জ্ঞানের জ্যোতি ফুটে ওঠে তাঁদের মানসপটে। এর ধারণা কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধির অধীন নয়। কেননা, এর সন্ধান পেলে মানুষের পক্ষে আর কিছু পাবার বাকী থাকে না—'যৎ লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' এবং এ জানলে মানুষের আর কিছু জানবার বাকী থাকে না—'যজ্ জ্ঞাত্বা নেহভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।' কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ অখণ্ড সত্যের বা পরম জ্ঞানের অনুভূতি সম্ভব নয়। তাই মানুষ চলেছে বিজ্ঞানের পথে সত্য এবং জ্ঞানের সন্ধানে। এ বৈজ্ঞানিক সত্য বা জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হচ্ছে বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

লোকে কথায় বলে 'বৈজ্ঞানিক সত্য'—অর্থাৎ যেন একেবারে খাঁটি সত্য, যার মধ্যে কোন ভেজাল নেই। কিন্তু বিচারে দেখা যায়—বৈজ্ঞানিক সত্য মাত্রই হচ্ছে আংশিক বা খণ্ড সত্য। এদের স্বরূপ বদলায় অহরহ, নিত্যনতুন আবিষ্কারে। সুতরাং বিজ্ঞানে যে সত্যের বিবরণ আমরা পাই, তা হচ্ছে অনেকটা অন্ধের হস্তী দর্শন বর্ণনার অনুরূপ। বিজ্ঞানে সত্যের কারবার চলছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা যন্ত্রযোগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সাহায্যে। চোখের অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তুকে বিজ্ঞান-চর্চার ফলে মানুষ দেখতে পায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে; কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী নীহারিকার অভ্যন্তর প্রদেশ অবিশ্ব করছে সে দূরবীনের কৃপায়। পৃথিবীর অপর প্রান্তের শব্দ এবং দৃশ্য মানুষ শুনতে ও দেখতে পাচ্ছে রেডিও, টেলিফোন এবং টেলিভিশন যন্ত্রের আবিষ্কারে। এসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ থেকে বিজ্ঞান গ'ড়ে তুলছে এক একটি খণ্ড সত্য। এসব খণ্ড সত্যকে কার্য-কারণের সূত্রে গেঁথে বিজ্ঞানের প্রয়াস চলেছে পরম সত্যের সন্ধানে। কিন্তু যতই এসব নিত্য নূতন খণ্ড সত্যের আবিষ্কার হচ্ছে, বিজ্ঞানের অজানা রাজ্যের পরিধিও যাচ্ছে ততই বেড়ে। ফলে, কোন কালে যে বিজ্ঞান পরম সত্যের নাগাল পাবে, এ দুরাশা করা চলে না। কবির কথায় বলা যায়—বিজ্ঞানের পক্ষে 'জ্ঞানের সীমানা নাই কোথা, চারিদিকে যতই সে পথ খুঁজে ফিরে, পথ তত সুদূর হয়ে যায়।'

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন—এর কারণ কি? এক কথায় বলতে গেলে, কারণ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সীমাবদ্ধ শক্তিতে। যখন অপূর্ব শক্তিশালী উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যেও কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়াকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞানের মধ্যে ধরতে পারি না—সেখানেই নেয় বিজ্ঞান কল্পনার আশ্রয় এবং সেখানেই মানে সে হার। কাজেই কার্য-কারণের সকল গ্রন্থির সন্ধান বিজ্ঞান পায় না। তা ছাড়া, কার্য-কারণের সূত্রাবলম্বনে যে বিচার, তার কোন আদি-অন্তের নির্দেশ পাওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞান তার এ অজ্ঞানতাকে প্রকৃতি বা Nature-এর দোহাই

দিয়ে চালাতে চায়। আসলে, দেশ এবং কালের মধ্যে বাঁধা রয়েছে বিজ্ঞানের জানু। কিন্তু 'কালের কোন আদি অন্ত মধ্য নেই' এ কথা বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সবাইকে স্বীকার করতে হবে। সুতরাং কালের গতির সঙ্গে কার্য-কারণসূত্রে গাঁথা বিজ্ঞানের সত্যেরও কোন পরিণাম বা অন্ত নেই। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এই কারণে সিদ্ধান্ত করেছেন—কাল ব'লে কোন সত্তা নেই—এ হচ্ছে ঘটনাবলীর পারম্পর্য নির্ণয়ের জন্যে মানুষের উদ্ভাবিত কৌশল মাত্র। কেননা কৃত ভবিষ্যৎ ও অতীত ব'লে যে আমরা কালের বিভাগ ক'রে থাকি তা সকলের নিকট সমান নয়, একথা প্রমাণ করেছেন আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদে। আইনষ্টাইনের গবেষণার ফলে দেশের সত্তাও গেছে এভাবে বিলোপ হয়ে। ফলে দাঁড়ায়, দেশকালের ভিত্তিতে গড়া বিজ্ঞান কোন চরম বা সনাতন অখণ্ড সত্যের সন্ধান আমাদের দিতে পারে না।

তথাপি বিজ্ঞান তার খণ্ড সত্যগুলিকে জুড়ে এক অখণ্ড সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছে, তাকে চলতি কথায় প্রকাশ করতে হ'লে "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর মেহের আলির ভাষায় বলতে হয়—'সব ঝুটা হ্যায়', অর্থাৎ যা আমরা চারিদিকে দেখতে বা শুনতে পাই, সে সবই ভেল্কিবাজী। এ শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ অনুভূতি শক্তির কারসাজী। নানাবর্ণে সমাকুল আমাদের এ বিচিত্র বিশ্ব হচ্ছে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে শুধু কতগুলি তেজ-তরঙ্গের লীলাখেলা। লাল, নীল, পীত, হরিৎ, বেগুনি প্রভৃতি নানা রঙের অনুভূতি আমরা পাই বিভিন্ন কম্পনসংখ্যার তেজ-তরঙ্গের সঙ্গে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে। যাকে আমরা কঠিন নিরেট লৌহ ব'লে গণ্য করি, তা হচ্ছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একেবারেই ফাঁপা এবং অসংখ্য রন্ধ্রে পরিপূর্ণ। একটি লৌহপিণ্ডের অভ্যন্তরে সংখ্যাতীত অণুপরমাণু অবস্থান করে। কখনো স্থির থাকে না, নিজ নিজ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তারা অবিরাম অল্প-বিস্তর স্পন্দনশীল। কিন্তু এ সব অণুপরমাণুগুলি আবার ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। লৌহপিণ্ডে প্রত্যেকটি অণুপরমাণু যে পরিমাণ স্থান জুড়ে থাকে, তার তুলনায় তাদের উপাদান ইলেকট্রন প্রোটনের স্থান হচ্ছে এবপ্রকার নগণ্য। অর্থাৎ— লৌহপিণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশে ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদির পরস্পর দূরত্ব তাদের আপন আয়তনের হাজার গুণের অধিক বলা যায়। মোটের উপর লৌহপিণ্ডটি হচ্ছে অসংখ্য বৃহদায়তন রন্ধ্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইলেকট্রনগুলি প্রোটন-নিউট্রনে গঠিত পরমাণুর কেন্দ্র-বস্তুর চতুর্দিকে এমন প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে যে, তাতে মনে হয় সমস্ত ফাঁকা জায়গা যেন তারাই রয়েছে অধিকার ক'রে। অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে এ সব ইলেকট্রনের গতিবেগের মাত্রা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০।৭০ মাইলেরও অধিক। তারা এত বেগে ছুটোছুটি করে যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে কোন্ মুহূর্তে কোথায় তাদের অবস্থান তা নির্দেশ করা অসম্ভব। এই কারণে বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ (Hysenburgh) প্রচার করেছেন তাঁর অনিশ্চিতবাদের এবং বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিঙার (Schroedinger) ইলেকট্রনকে তরঙ্গকল্পনে পরিণত ক'রে তার জড়ত্বকে দিয়েছেন একেবারে উড়িয়ে। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী ইলেক্ট্রনকে বাষ্পীভূত ক'রে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত পরমাণুদেহে মেঘের আকারে। কিন্তু পাঠক যদি প্রশ্ন করেন, কার তরঙ্গ বা কোন্ পদার্থের মেঘ, তা হ'লে বিজ্ঞানী এর কোন উত্তর দিতে পারবেন না। অন্যদিকে যদি আমরা আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, কিংবা সৌরজগতের বা বিশাল নক্ষত্রলোকের গতিবিধি নিয়ে বিচার করতে বসি, তাতেও দেখা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌরজগৎ বা নক্ষত্রলোকের সঙ্গে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য নেই। যে বসুধাপৃষ্ঠে আমরা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করি, যাতে আমরা স্থির এবং অচঞ্চল মনে

নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই, বিজ্ঞানের প্রমাণে সে ভূমণ্ডল এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না। সূর্যকে প্রদক্ষিণ ক'রে যে অসাধারণ বেগে আমাদের পৃথিবী ছুটে চলে, তার কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের গণনায় পৃথিবীর এ চক্রাকার গতিবেগের পরিমাণ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ মাইল—মানুষের গড়া আণবিক শক্তিতে পরিচালিত সবচেয়ে দ্রুতগামী যানবাহন বা রকেটের বেগও যার কাছে হার মানে। অথচ, ধরাপৃষ্ঠে বাস ক'রেও এরূপ অসাধারণ গতিবেগের কোন অনুভূতিই (Perception) আমরা পাই না; এর উপর আধুনিক বিজ্ঞানের দেওয়া প্রমাণে পৃথিবী আবার নিজের অক্ষদণ্ডের উপর লাটিমের মত ঘাচ্ছে অনবরত ঘূর্ণায়মান। এ ঘূর্ণিপাকের গতিবেগও মিনিটে প্রায় ১৬.১৭ মাইলের উপর। এ-ও আমরা কোন কালে অনুভব করতে পারি না। পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে বিজ্ঞানের এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ কি? উত্তরে বলতে হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে দিনরাত, শীতগ্রীষ্ম ইত্যাদি নৈসর্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যাখ্যা করা চলে না। পাঠক হয়তো আবার প্রশ্ন করবেন, এর কোন অনুভূতি আমাদের হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে। তিনি প্রমাণ দিয়েছেন যে, আমাদের স্থিতি গতির অনুভূতি হচ্ছে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। পরম স্থিতি বা পরম গতির কোন ধারণা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। উড়োজাহাজে যাঁরা যাতায়াত করেন, এ কথার তাৎপর্য তাঁরা কতকটা বুঝতে পারবেন। সাধারণতঃ এরোপ্লেন চলে ঘণ্টায় মাত্র ২০০-২৫০ মাইল বেগে, তথাপি এরোপ্লেনে চাপলে মনে হয় যেন স্থির হয়ে ঘরে বসে আছি। এরোপ্লেন চলার কোন লক্ষণ দেখা যায় না; যতক্ষণ না আমরা নীচে তাকিয়ে দেখি যে, নদী পাহাড় শহর গ্রাম প্রভৃতি সব পিছনে স'রে। মনে হয় আরও এরোপ্লেনটা আছে যেন শূন্যাকাশে স্থির হয়ে এবং তলায় পৃথিবীটা চলেছে উল্টো দিকে। যেখানে বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩০ মাইল, সেক্ষেত্রে এরোপ্লেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ২০০-২৫০ মাইল বললে তার শুধু আপেক্ষিক গতিই বোঝায়। নিরপেক্ষভাবে এরোপ্লেনের গতিবেগ হিসাব কোরে দেখতে হলে পৃথিবীর গতিবেগের সঙ্গে তার আপন গতিবেগ যোগ বা বিয়োগ দিতে হয়। কিন্তু এখানেও রেহাই নেই। কেন না, পৃথিবীর গতিও বিজ্ঞানের মতে আপেক্ষিক। কারণ সমস্ত সৌরজগতের আবার একটি গতি আছে। এরূপে বিজ্ঞানের কোন খণ্ড সত্যকে খাঁটি বা নিরপেক্ষ সত্য ব'লে গণ্য করা চলে না।

ফলে দাঁড়ায়, মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে, বিজ্ঞান যে বিশ্বরূপের সন্ধান দেয় তার কোন মিল নেই। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎকে বিশ্লেষণ ক'রে যে অখণ্ড সত্যের বা জ্ঞানের আবিষ্কারে বিজ্ঞান অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে, তাতে রূপেরসে গন্ধে ভরা স্থির ও অচঞ্চল মানুষের প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব যাচ্ছে বাতিল হয়ে হয়ে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গড়া একটি অপরূপ মায়া, সুতরাং একপ্রকার অ-সৎ এবং অনিত্য। বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হয় এর সৃষ্টি। এই কারণে আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও সীমার সঙ্গে এর রূপ যায় বদলে। রং-কাণা লোকের কাছে বিশ্বজগৎ যেমন বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন হয়ে। মানুষেতর জীবের নিকট, অর্থাৎ পশুপক্ষীর দৃষ্টিতে এ জগৎ হবে ভিন্ন রকম। পিপীলিকা ও সরীসৃপ প্রভৃতি জীবের কাছে এ হয়ত দেখা যায় আরও স্বতন্ত্ররূপে। এখানে বিজ্ঞানের মায়াবাদের সঙ্গে বেদান্তের মায়াবাদের তুলনা করা চলে।

বিজ্ঞানের প্রমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ মায়াময় হলেও বিজ্ঞানের কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎকেও চরম সত্য ব'লে গণ্য করা চলে না। কারণ বিজ্ঞানের জগৎ হচ্ছে শুধু খণ্ড সত্যের

জ্যোতি তাত্ত্বি এবং পরিশেষে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ইলেকট্রন ও তেজ-তত্ত্বের আলোর মূলে গেছে তলিয়ে। অনিশ্চিততাবাদের প্রতিষ্ঠা ক'রে এ ক্ষেত্রে আপনার হার সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। "বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা যন্ত্রযোগে লব্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশ্লেষণ। যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতি মাত্রই হচ্ছে ভঙ্গুর এবং ভ্রমাত্মক, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকেও পরম বা সনাতন সত্য ব'লে গণ্য করা চলে না। এ শুধু এক প্রকার মায়া থেকে আর প্রকার রূপান্তর বিশেষ।"

উপসংহারে বলা যায়, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিত্তিতে গড়া বিজ্ঞানের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বজগৎ শুধু খণ্ড সত্যেরই পরিচয় দিতে পারে। এ সব খণ্ড সত্যকে জুড়ে অখণ্ড সত্যের আবিষ্কারের চেষ্টায় বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হয়েছে ততই তার অজ্ঞানের পরিধি গেছে বেড়ে। তাই ব্যবহারিক জগতে অক্ষুণ্ণ ও অভাবনীয় প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে পরম সত্যের ধারণায় বিজ্ঞান মেনেছে হার। ইন্দ্রিয়ানুভূতিসাপেক্ষ একমাত্র জড় বস্তুর বিশ্লেষণে পরম সত্যের সন্ধান কখনও মিলবে না। তাই বলতে হয় ধর্মের মত সত্যের তত্ত্বও রয়েছে তারই মধ্যে নিহিত; অতএব 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' এ পথ হচ্ছে, যা গোড়ায় বলা হয়েছে, সাধারণের অনধিগম্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পথ। এ অনুভূতিতে মানুষ বুদ্ধি ও বিজ্ঞান পায় লয়। তাই একে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—'অবাঙ্ মনসোগোচরম্'।

—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন-বিভাগের সতীর্থ-সম্মেলন বাহিকী (১৯৫৬) অভিভাষণ থেকে গৃহীত)।

লোকসেবক—বৃহস্পতিবার ১৯ মাঘ ১৩৬২ (২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬) তারিখের দৈনিক সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

চণ্ডীদাস

অধ্যাপক শ্রীবিজেন্দ্রলাল নাথ, এম-এ

পাষাণ দেবতা পায়ে নিবেদিত হতো যবে
মানুষের ব্যথার ক্রন্দন,
দেবতা রহিতো মূক, চাহিতো না চক্ষু মেলি
জাগিতো না হৃদয়-স্পন্দন,
বেদনার ধূপাধারে মানুষের মর্মবাণী
যেই দিন পুড়ে হতো ছাই—
জীবনে জীবন লভি সেইদিন মহাকবি
বজ্রকণ্ঠে বলেছিলে—
'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এ মহা সত্যের বাণী বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে যবে
চকিত করিল তব প্রাণ,
সেদিন হইতে কবি ব্যথায় বিদীর্ণ চিতে
রচিয়াছ মানুষের গান।
তব কাব্য নহে সে তো ছন্দে ছন্দ গাঁথিবার
রূপকার কবির প্রয়াস,—
জীবন-সঙ্গীতে তব শৃঙ্খলিত মানুষের মন
ফেলে তাই মুক্তির নিঃশ্বাস।

তুঙ্গনাথ

শ্রীসুব্রহ্মানন্দ পুরী

৩০শে মে, ভোরবেলা আমরা রওনা হলাম পৌথীবাসী চটী থেকে। চটীটি বেশ বড়, দশ বারখানা দোকান আছে। এখানে অতি সুন্দর কাঠের বাসন তৈরী ও বিক্রী হয়। পৌথীবাসী কেদারনাথ ধাম থেকে বদরী-নারায়ণ যাবার পথে পাওয়া যায়—দূরত্ব অর্ধেকের কম। পাহাড় এখানে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ, বড় বড় বৃক্ষ লতায় চারদিক পরিপূর্ণ, নিকটবর্তী কোথাও জনপদের চিহ্ন নেই। আগের দিন এগার মাইল দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই ভেঙে বেলা একটায় ঘর্মাক্ত কলেবরে এখানে এসে পৌঁছেছি। সবাই ক্লান্ত, তাই আর বিকেল বেলা বের হওয়া সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত যান বাহন ছাড়া দুরধিগম্য পাহাড়ীয়া পথে শ্রীচরণেই আমারা দীর্ঘ ৩২১ মাইল ভ্রমণ ক'রে এসেছি। উত্তরাখণ্ডের চা'রধামের তিনধাম—যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ ধাম—আমাদের স্বপ্নলোচর হয়েছে। বাকী শুধু চতুর্থ ধাম, বদরীনারায়ণ। এই তিনধামে আমরা যে কত হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল, রোমাঞ্চকর গহন পাহাড় পর্বত, নদীনালা, চড়াই উতরাই অতিক্রম করেছি তার ইয়ত্তা নেই। পাহাড়ীরা বলে চা'রধামে ৮৪ লাখ পাহাড় ডিঙানো হয়। সে যাই হোক, 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ' যে আমরা অন্তত কতটা হতে পেরেছি তা নিঃসন্দেহ।

দু'মাইলের মাথায় এসে পেলাম বানিয়াকুণ্ড চটী। নিকটেই পি, ডব্লু, ডির বাংলো। ছয় সাত খানা চটি আছে এখানে। স্থানটি ৭৭০০ ফিট উঁচু। আরো এগিয়ে চললুম—তিন মাইল গহন বনভূমি পার হ'য়ে এলুম চোপতায়, জায়গাটি ভাল। একটি ধরমশালা ও কয়েকটি চটী আছে। সামনে খোলা ময়দান! হাঁ, ময়দান! বৈ কি! দীর্ঘ বেড় মাস ঘুরছি—এতটুকু ফাঁকা জায়গা চোখে পড়েছে অতি অল্প দিনই। যেদিকে তাকাই, কঠিন নির্মম পাহাড় এসে দৃষ্টিপথে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। প্রতিহত দৃষ্টি নিয়ে আর পারছিনে—মন কেবল চাচ্ছে পাহাড় রৈরোধ আগল ভেঙে উন্মুক্ত হতে। এ চোপতাতে এসে দেখছি আমাদের পূর্বপরিচিত, ক'লকাতা থেকে আগত এক বাঙ্গালী মাড়োয়ারী বাবুর দল রওনা হচ্ছেন। ৩০ জনের পোষ্টাই বিরাট দল। সবাই একসঙ্গে পথে নেবে পড়লুম। চীর, পাইন ও দেওদার গাছের ফাঁকে ফাঁকে অগ্রসর হচ্ছি। এক মাইল চড়াই ক'রে এসে দু'টো রাস্তা। বাঁ দিকেরটি সোজা উত্তরে পাহাড়ের গায়ে দেখে অবস্থিত তুঙ্গনাথ—মন্দিরে উঠে গিয়েছে। আর অন্য রাস্তাটি অতি সন্তর্পণে ঘুরে থেকে সে পাহাড়ের পরশ্চর্শ ক'রে পূর্বদিকে নেবে এসেছে তুলোকণা চটীতে। তুঙ্গনাথ একবারে হিমালয়ের তুঙ্গেই চ'ড়ে বসে আছেন। কোন্ ভক্তপ্রবর দেবাদিদেবের এহেন নামকরণ করেছিলেন জানিনে, তবে সেই রসজ্ঞ কবির—বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল যথার্থতঃ। এখান থেকে জীবন খাড়াই পাহাড়, একে —ওতরানো প্রাণান্ত কর! দু'মাইলের মধ্যে ৮ হাজার ফিটকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ঠেকিয়েছে—প্রায় ১৩ হাজার ফিট এই উঁচুতে। উত্তরাখণ্ডে এই মন্দিরটিই সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির। এজন্যে অনেক যাত্রী এখান থেকে তুঙ্গনাথে না উঠে কেটে পড়েন বদরী-নারায়ণের পথে তুলোকণা চটিতে। ১০ জনের ঐ দলটির ২।৩ জন ছাড়া অন্য সকলই উত্তরণ করবেন তুলোকনাতে। আর যাঁরা শূন্যে উঠে শিব-সন্দর্শনের সাহস রাখেন, তাঁরা আগে থেকেই হিসেব ক'রে চলে রাত্রি যাপন করেন চোপতাতে। এ-ব্যবস্থায় প্রত্যূষে চোপতা থেকে রওনা হলে তুঙ্গনাথের চড়াই ভাঙতে অনেকটা সহজ হয়। দিনমণির প্রখরতা যতই বাড়ে ততই ক্লান্তি হয় অত্যধিক। হোক না সে তুষার রাজ্য!

১৯৫ ১২ হাজার ফিট উঁচুতে এ প্রচণ্ড মার্তণ্ডদেবের প্রখর প্রতাপে শ্রান্ত পথচারীর দশা যায় অন্তিম অবস্থায় আমাদের হ'লো কিন্তু অন্যরূপ। দু'টি বল ও গাইড এই অযাচিত সংযোগে পথ চলার চেষ্টাতে বাধা না হয়ে হয়েছিল আরো ৪।৫ মাইল দূরে পৌঁথীবাসাতে তাতে শীতাধিক্যের হাত থেকে বেঁচে সজীব ছিল।

আমরা বাঁদিকের পথে চললুম তুষার-কিরীটী তুঙ্গনাথে। স্তরে স্তরে সাজানো পাহাড়ের পর পাহাড়, আবার পাহাড়। শুষ্কলতা-হীন নগ্ন পাহাড়! বেয়ে বেয়ে কেবলই উঠছি—শেষ নেই। হাল ধ'রে যাচ্ছে সাথী সকলেই এগিয়ে গেলেন—আমি কমজোর মানুষ, আর পারছিনে। শরীরটাকে টেনে তুলা নয়তো, যেন মৃতদেহ বয়ে বেড়ানো। উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ—প্রচুর অবারিত রৌদ্র। অধিকন্তু এ পথে আবার নেই পানীয় জল! তুঙ্গনাথের পাহাড়ে উঠা দুঃসাধ্য সত্যি, কিন্তু অসাধ্য নয়। পাহাড়ে দ্রুতগামী না হয়ে, যিনি বিশ্রাম ক'রে ধীরে পথ চলেন, তাঁর ঐ সত্যটি নখদর্পণে পরিস্ফুট। সে জল হাওয়ার এমনি গুণ যে, আধঘণ্টা বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না—তাতেই মহৌষধীর ন্যায় কাজ করে। রাস্তার এপাশ-ওপাশ জমাট-বাঁধা বরফ—যেখানে গলে গিয়েছে সেখানেই রকমারী ফুল ফুটে উঠেছে। সে ফুল জাতীয় ফুল গাছের পাতা কিন্তু তখনও বের হয়নি—হবে আরো পরে। যতই উপরে উঠছি ততই হিমালয়ের ঘুমন্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছি। সুমুখে তুহিনাবৃত শৃঙ্গগুলো পর পর এক একটি দৃশ্য পথে প্রকাশিত হয়ে আমাদের নয়ন মন হরণ ক'রে নিচ্ছে। এ সব সৌন্দর্যাবলীতে দৈহিক কষ্টটা যেন কর্পূরের মত উবে গেল। পাহাড়ের উপরে উঠে প্রথমেই নজরে পড়লো সীমাহীন শ্যামল সুন্দর গিরিরাজের উন্নত শির যেন শুভ্র ঘোমটাতে মণ্ডিত হয়ে অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। তার আকাশের বুকে কত বৈচিত্র্য, নিষ্কলঙ্ক তুষার-শয্যার কত সৌন্দর্য, বাতাসের স্পর্শে কত সান্ত্বনা! এর প্রভাবে কার না চিত্ত রঞ্জিত হয়?

তুঙ্গনাথে উঠে যেখানে রাস্তা শেষ হ'লো, সেখানেই 'আকাশ গঙ্গা'। আকাশ-গঙ্গার জলস্রোত ৮।১০ হাত উপর থেকে গোমুখের মধ্যে দিয়ে একটি কুণ্ডে পতিত হয়। ঐ কুণ্ডের নাম—'অমৃত কুণ্ড' এই কুণ্ডটি যেন তালরূপে বাঁধানো। তাতে স্নান-তর্পণাদি করা হয়ে থাকে। পাহাড়ের শিখরে এরূপ জলরাশীর উৎপত্তি কি ক'রে হলো তা বুঝা ভার। অতিবৃষ্টিতেও বরফ গলে নদী, নালা, ঝরণা হিসাবে অনেক জল-স্রোত পর্বতগাত্রে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া অন্তঃপ্রবাহিত স্রোত মুখ ও কখনো কখনো চিরপ্রবাহাকারে বহির্গত হয়ে থাকে। সে সবই পাহাড়ের কটিদেশে কিংবা মধ্য প্রদেশে, বড় জোর গলদেশে। কিন্তু এ আকাশগঙ্গাটি তুঙ্গনাথের শীর্ষে। আকাশ থেকে নেমে এসেছে বললেও তা মিথ্যে বলা হবে না। প্রশস্ত রাস্তা মন্দির পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে। মাঝে মাঝে হিমানিরাশি এখন গলে না। দু'পাশে অনেক দোকান পাট। অধিকাংশেই খাবার ও মেওয়ার দোকান। হিমালয়ে ও তিব্বতে দেবপূজার উপচার হিসেবে মেওয়ার খুব রেওয়াজ। দুর্গম ও শীতপ্রধান দেশে শুকনো খাদ্যে, পেস্তা কিস্‌মিস্ প্রভৃতি দীর্ঘস্থায়ী ফলের আদান প্রদান করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। মন্দিরের চারপাশে ছোট ছোট অনেক দেউল। সেখানে কাল-ভৈরব, পার্বতী, জয়নাথ, কেদারনাথ, মহেশ্বর, রুদ্রেশ্বর ও বেদব্যাস আদি দেবগণের পূজো অর্চনা সমাপনান্তে তুঙ্গনাথের তুষ্টি বিধান করতে হয়। পাশে আর একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে—তার নাম 'ঊষকুণ্ড'। যেখানে বসে পাণ্ডারা সকল প্রধান করেন, তাকে বলে 'ধর্মশিলা'।

হিমালয়ে লোকজনের বসতি অতি বিরল। রাস্তা ঘাট বা চলাচলের ব্যবস্থা ততোধিক শিথিল—প্রায় নেই। আর যাও বা আছে তাতেও যাতায়াত করা নিরাপদ তো নয়ই, বরং অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবু দেবমন্দিরের সংখ্যা যেখানে তুলনায় সমভূমির চেয়ে বেশী। সদর রাস্তা থেকে ১৫।২০ মাইল দূর, ভয়ানক অরণ্যাকীর্ণ, বন্য জীব-

অন্ত অনুধাবিত, তুঙ্গর চূড়াই উত্তরাই পার হয়ে গিয়ে দেখবেন—সেখানে দেব মন্দির। আবার বিভিন্ন দেবতা ছাড়া, একই নামীয় দেবতা যে একটি রাজ্য দখল করে তা নয়,—এক একজন আবার চা'র পাঁচটি উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চ-কেদার, পঞ্চ-বদরী, পঞ্চতীর্থ, পঞ্চশিলা প্রধান, আরো আছেন যেমন চার ভৈরব, চা'রধাম, চারপ্রয়াগ এই ভাবে আরো কত।

পঞ্চকেদারের প্রথম কেদার হচ্ছেন—কেদারনাথ, মহাদেবের পশ্চাৎভাগ দ্বিতীয়কেদার—মদমহেশ্বর, নাভিদেশ, বা মধ্যভাগ, তৃতীয় কেদার—শ্রীতুঙ্গনাথ, বাহুপ্রদেশ, চতুর্থ কেদার—রুদ্রনাথ, মুখভাগ এবং পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বর মহাদেব, মস্তকের জটাভাগ। তুঙ্গনাথের বিরাট মন্দির প্রস্তরনির্মিত—উপরে স্বর্ণ কলস স্থাপিত। দরজাটি খুব ছোট। কাল পঞ্চানন মহাদেবই এখানে তৃতীয় কেদার। পশ্চাতে দেয়ালে নারায়ণ, ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের নিকট থেকে হিমালয়ের দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর। এ যে শিবের আবাস। সত্যং—শিবং—সুন্দরম্। অবল ধবল উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি শিখর যোজনের পর যোজন পরিব্যাপ্ত। আকাশ নির্ম্মল থাকলে খুব কেদার ও বদরীনাথের নয়নাভিরাম তুষার শৈলও নাকি ওখান থেকে দেখা যায়। তুঙ্গনাথের ২৫।৩০ মাইল উত্তরে মান্ধাতা-ক্ষেত্র অবস্থিত। সেখানে কয়েকটি ধর্মশালা আছে, সেখানে অতিরিক্ত হিমের জন্যে রাত্রিবাস করা কঠিন। তুহিন মৃত্যুর কাছে অকালে কে প্রাণ হারাতে চায়? চিরসুন্দরের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চনাদিতে সেখানে আমরা ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে অবতরণ করলুম। আরোহণের পথেই অবরোহণ করিনি। আর একটি প্রাকৃতিক রাস্তা আকাশচুম্বী তুঙ্গনাথের মস্তক থেকে সোজা পড়ে গিয়েছে পদপ্রান্তে চন্দ্রশিলা-চূড়ার 'দেয়াল সদৃশ খাড়া ৫ মাইল উঁচু পাহাড়টিকে কেটে সিঁড়ি তৈরী ক'রে দিয়াছেন এক পুণ্যার্থী শেঠজী—এই হাল্কে। সঙ্কীর্ণ পথরেখাটি বড় চমৎকার দেখায়। পাহাড়ের উপর থেকে হোক, আর নীচ থেকে হোক প্রায় সমস্তটাই একদৃষ্টে দৃষ্ট হয়। এ যেন ঐশ্বর্য্যশালী হিমাদ্রি নগরীর সর্ব্বোচ্চ সৌধে আরোহণ করবার দৃঢ় নির্মিত ঘূর্ণায়মান সোপানাবলী। তবে এ পথে কেউ আরোহণ করতে পারেন না, যাঁরা করেন অবতরণই ক'রে থাকেন।

তুলোকনা চটীতে উত্তরণ ক'রেও সেদিন আমরা পানাহারের নামটি কেউ করিনি—সোজা চলেছি তো চলেছিই। চিরশ্যামল নিবিড় পার্ব্বত্য অরণ্যানী কিন্তু গাছের গুড়াভাগ ও তলদেশ সুপরিষ্কৃত—ক্ষুদ্র পতঙ্গটীও চোখ এড়াতে পারে না। এ রাজ্যে চন্দ্র সূর্যের প্রবেশ নিষেধ। বসন্তের নিহি করা পাতা বিছানো ছায়া-শীতল সহজ বনপথ। কোন এক দৈব আকর্ষণ যেন অগ্রপশ্চাৎ যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে প্রাণ উদাসকারী বাঁকা-বাঁকা পথে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বেলা প্রায় তিনটেতে পেলাম একটি উন্মুক্ত মাঠ—এক কোণে পঞ্চবাসা চটি।

ভেতরে অসীম শক্তি রয়েছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে তোরা বীর্য্যহীন হয়ে পড়েছিস। সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে। একবার ওইসব দেশে বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশের লোকের জীবন-প্রবাহ কেমন তর তর বেগে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

ভারতবর্ষ চিরকাল ঐশ্বর্য্যের জন্য সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ধনরত্ন, অলঙ্কার, টাকা-মোহর-গিনি প্রভৃতি স্বর্ণ প্রাচুর্য্যে ভারতের খ্যাতি বহুদিন ধরিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত। ঐশ্বর্য্যে, বিলাসিতায়, ভোগে, আনন্দে, আরামে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ভারতীয় রাজা, মহারাজ, সম্রাট, নবাব, বাদশাহ, আমির, জমিদার, তালুকদার, সুবাদার, প্রভৃতি বিবিধ ধনকুবেরগণ। জগৎশেঠের অর্থৈশ্বর্য্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, মুর্শিদাবাদের নবাব, অযোধ্যার নবাব, গৌড়াধিপতি, দিল্লীর সম্রাটের বদান্যতা, ধন-প্রাচুর্য্য ভুবনবিদিত।

অযোধ্যার নবাব ছিলেন এক ধন-কুবের। এক একজন নবাবের এক একটি পৃথক ধন-ভাণ্ডার থাকিত। সামাজিক ও রাজকীয় প্রথা অনুসারে তাঁহাদের গুপ্তধন প্রাসাদের মধ্যে গুপ্তস্থানে প্রোথিত থাকিত। প্রথা অনুসারে, কথিত আছে, নবাবদের প্রতি প্রাসাদে পঞ্চাশ লক্ষ স্বর্ণ মোহর ভূতলস্থ নিভৃত কক্ষে বা নির্জ্জন স্থানে নীরবে সংরক্ষিত হইত। আত্মীয়-পরিজন, রাজ-কর্ম্মচারী, অন্তঃপুরচারিণী, ভৃত্য, অনুচর, পারিষদ বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির অগোচরে ইহা সংগোপনে বিশিষ্ট জিনে সুরক্ষিত রাখিবার বিধি ছিল। গুপ্তধন পবিত্র ধন, পুণ্য, ঐশ্বর্য্য, ইহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেনা, ব্যবহার করিবে না, ইহার সন্ধানও কেহ রাখিবে না। নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহা পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত থাকিবে, যুগ-যুগান্তর কাটিয়া যাইবে, তথাপি ইহার বার্ত্তা অবাঙ্‌মানসগোচর হইয়া থাকিবে।

যবাদ্যুগে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য এইভাবে সুরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। যুগ যুগ ধরিয়া এইভাবে প্রচুর অর্থ, বিরাট ঐশ্বর্য্য, বিশাল ধন সম্পত্তি সঞ্চিত, সংগৃহীত, পরিপুষ্ট হইয়া ভারতের প্রাচুর্য্য, শান্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জগতের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অযোধ্যার নবাবগণ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ভূতল কক্ষে নিভৃতে প্রাসাদাভ্যন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ স্বর্ণ মোহর লুক্কায়িত রাখিতেন। শুনা যায়— এইরূপ ৫২টি প্রাসাদ ও ৫৬টি উদ্যান ছিল। প্রোথিত হইবার পর এই সকল অর্থে কেহ হস্ত নিক্ষেপ করিত না, ইহা সূর্য্যালোক দেখিতে পাইত না। প্রায় ৫৪ কোটি টাকা এইরূপে সঞ্চিত ছিল। তৎকালে ধন সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকিত। ব্যক্তিগত ধন, রাজকীয় ধন, গুপ্ত ধন, স্ত্রীধন প্রভৃতি। রাজকোষ ব্যতীত ব্যক্তিগত ধন পৃথকভাবে গণ্য হইত। গুপ্তধন মাত্র নবাবদের প্রায় ৫৪ কোটি টাকা একবার সঞ্চিত হইয়াছিল।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি সাহ বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় দুই কোটি টাকা। ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তি ছিল প্রচুর। তাঁহার ছিল ধনরত্ন, হীরা জহরৎ মণিমুক্তার অতুল ও অমূল্য সংগ্রহ। কেবল ৩২৭টি হস্তী বোঝাই পান্না, যাহার মূল্য হইবে প্রায় দুই শত কোটি টাকা। অযোধ্যার এক নবাব মাহমুদ আলিখাঁর ধন-রক্ষককে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করে, যাহার ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তথাপি তিনি কোন গুপ্তরহস্য প্রকাশ করেন নাই। অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য্য যাহা তিনি অবগত ছিলেন তাহার কোন সংবাদ ব্যক্ত করেন নাই।

রাজার ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার ব্যতীত রাজার বা নবাবের আত্মীয় স্বজন পারিষদগণ প্রত্যেকে স্বকীয় ধনভাণ্ডার এবং মণিমাণিক্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতেন এবং প্রত্যেকে ভূগর্ভে গুপ্তধন সঞ্চিত রাখিতেন। তখনকার রাজ-কোষাধ্যক্ষদের মধ্যে একজনের রোজনামচা হইতে প্রকাশ পায় এইরূপে

ভূগর্ভে সংরক্ষিত রাখিবার প্রথা সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এই কোষাধ্যক্ষের বংশধরগণ ইহার বিবরণ প্রকাশ করেন। লক্ষ্ণৌ সহরে নবাব আসফ উদ্দৌলা সম্প্রতি ১৪০ বৎসরের পুরাতন একটি ডায়েরী ও কয়েকটি চার্ট দেখিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তধনের অনুসন্ধান করিতেছেন। রোজনামচায় (diary) লিপিবদ্ধ সংবাদগুলি অনুসরণ করিয়া কয়েকটি স্থলে খনন কার্য্য চলে, তবে কিছু প্রাপ্ত হওয়ার আশা আছে। [গত বৎসর ইহা জানা যায়, তিনি উক্তর প্রদেশের সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ঐরূপ খনন-কার্য্য বিভিন্ন স্থানে চালাইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন।]

ধনের সার্থকতা সদ্ব্যয়ে, পরের অভাব-মোচনে। ভারতবর্ষ ধনের সদ্ব্যবহার জানিত। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, আবুপর্ব্বত, দাক্ষিণাত্যের সাধন-পীঠ ও দেব দেউলে অগাধ ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া তাঁহারা পার্থিব বৈভবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মনকে আকৃষ্ট করিতে দেবতার মন্দির, ধর্ম্মস্থান, পূজা-পীঠ প্রভৃতি নানাভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছেন লক্ষ্মীর বরপুত্র ধন-কুবেরগণ।

জগৎ শেঠ—

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী জগৎ-শেঠ-বংশ ভারতের ঐশ্বর্য্য আকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল। দেশবাসীর অর্থকষ্ট মোচনের জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্য সুকর ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ধনভাণ্ডার সকল সময়েই উন্মুক্ত ছিল। অর্থ সাহায্য হেতু তাঁহারা ছিলেন দেশবাসীদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। চিরসমৃদ্ধ ধনশালিনী বহু ইষ্টসাধন করিয়া ধনের অভাব দূর করিয়া আনিয়াছে ভক্তি সংযম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃতি। ধর্ম্মসাধনা, অতিথিসেবা তাঁহাদের চিরসৌরবের নিদর্শন বলিয়া সমগ্র ভারত তাঁহাদের নিকট ঋণী, ভারতবাসীর প্রাণ পুণ্যঅর্জ্জনের সমাজ-সেবার আদর্শে অনুপ্রেরিত। লোকসেবা যেন ছিল তাঁহাদের ব্রত, রাজ সরকারকে সাহায্য দান ছিল তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁহাদের দানমাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল।

শেঠবংশ শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 'শ্রেষ্ঠী' শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে 'শেঠ'। তাঁহাদের অর্থ-সাহায্য বৃত্তি কাহারও অবিদিত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিপন্নকে ধন সাহায্য তাঁহাদের বংশগত ধারা বলিয়া অনেকে বিপদের সময়ে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেন, ঋণ করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতেন। কত শত গৃহস্থসন্তান পরিবার বণিক, ধনাঢ্য ব্যক্তি, পণ্যজীবি তাঁহাদের উদারতা ও অর্থানুকূল্যে সঞ্জীবিত ও বিপন্মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অর্থ সম্পত্তি থাকিলেও তাহা সময়মত পাওয়া যায় না। বহু ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিবার জন্যই যেন এই শ্রেষ্ঠী পরিবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অর্থানুকূল্য বহু পরিবারকে আসন্ন বিপদ সাধন হইতে রক্ষা করিয়াছে।

উত্তর ভারতের এই শ্রেষ্ঠী বংশ উদারতায়, দানশীলতায়, কর্জ্জপ্রদানে অগণ্য পরিবারের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। অগাধ বিত্তশালী জগৎশেঠ-বংশ রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যশাসন ব্যাপারেও মুরুব্বী ছিলেন। শ্রাবস্তীর এক ধনী-শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর নাম সুপ্রসিদ্ধ, তিনি অনাথ পিণ্ডদ—ভগবান বুদ্ধের নাম সংস্পর্শে তিনি চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জিতবনে বুদ্ধদেব তাঁহারই উদ্যান-ভবনে সপ্তাহ কয়েক বা মাসাধিক কাল অতিবাহিত করিয়া ধর্ম্ম-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

হীরানন্দ শেঠ হইতে এই বংশের গৌরব সূচনা হয়। রাজস্থানের সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি চলিয়া আসেন সৌভাগ্য-সন্ধানে। পাটলিপুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান পাটনায় তিনি ব্যবসাজীবীর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। তাঁহার বংশগত ব্যবসা অসাধারণ সাফল্যের উচ্চ শিখরে উঠিল। তাহার পর অকাতরে ঋণদান ব্যবসা দ্বারা সুদ সমেত তাঁহারা অজস্রধনীয় অর্থের

অধিকারী হইয়া উঠেন। বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিন্তু দেখা যায় হীরানন্দ শেঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ শেঠ ঢাকায় চলিয়া আসেন। মোগল আমলে ইহা তখন বাঙলাদেশের রাজধানী ছিল। বঙ্গদেশের বহুলোক তাঁহাদের উদারতা ও পরোপকার বৃত্তির পরিচয় পাইয়া তৃপ্তি-লাভ করিলেন।

১৭০২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশের স্বাধীন নবাব হইয়া বসেন এবং মুর্শিদাবাদে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার জনসেবা, প্রজাপালন জন্য উক্ত রাজধানীর নামকরণ হইল মুর্শিদাবাদ। উক্ত শ্রেষ্ঠীপ্রবর মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদে আসিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার অর্থ-সাহায্যে রাজৈশ্বর্য্য পরিপুষ্টি লাভ করিবে, বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়িত হইবে। কিছুকাল এইভাবে হইবার পর মাণিকচাঁদ স্বর্গারোহণ করিলে তদীয় দৌহিত্রপুত্র ফতেচাঁদ তাঁহার গদিতে আরোহণ করিলেন (১৭২২ খৃঃ)। মাণিকচাঁদের দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ বংশের ব্যবসায় কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ পরলোক গমন করিলে জানা যায় শেঠ বংশের নিকট তাঁহার ঋণের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকা। তাঁহার যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন শেঠ পরিবার। রাজ্যশাসন, প্রজাদের সুখ-বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা প্রভৃতি সকল ব্যয় সাধনের প্রধান উৎস ছিল শেঠবংশের ধনভাণ্ডার। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ধনাঢ্যতম ফতেচাঁদ ভারত-রাজধানী দিল্লীতে গমন করিলেন। তথায় প্রচুর অর্থ আদান-প্রদান সম্পর্কে সুবিধার জন্য পিতার আমলে একটি হিসাব কার্য্যালয় দিল্লীতে খোলা হয়। এই শাখা বিভাগের কর্ম্ম পরিদর্শনের জন্য ফতেচাঁদ যখন দিল্লীতে আসিলেন তখন দিল্লীর সম্রাট উঁহাকে "জগৎ শেঠ" উপাধিতে বিভূষিত করেন—ইহার অর্থ জগতের অর্থপতি। বাস্তবিক ইঁহারা বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ত্রাণকর্ত্তা, বহু ব্যবসায়ীর মানরক্ষক এবং বহু পণ্যজীবির উদ্ধারসাধনে সহায়ক।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুবর্ত্তী সুজা-উদ্দৌলার আমলে ফতেচাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যেন উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁকে বাঙলার নবাবের মসনদে বসাইবার তিনিই মূলীভূত কারণ। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বঙ্গ সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। তৎপরিবর্ত্তে বসান হইল আলিবর্দ্দী খাঁকে। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মঋতুতে মহারাষ্ট্র দেশীয় ভাস্কর পণ্ডিত বর্গী কাটোয়া আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নানা স্থান হইতে লুণ্ঠনের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিতেন। তাঁহার অভিসন্ধির ফলে ফতেচাঁদের মুর্শিদাবাদ আবাস মুক্তিত হয়। জগৎশেঠের ধনসম্পত্তি সেবার নিতান্ত স্বল্প পরিমাণে ছিল না, তিনি হারাইলেন স্বর্ণ-মুদ্রা ও স্বর্ণ-ইটে সর্ব্বসমেত দুই কোটি টাকা। নবাবের টাঁকশালে যে সকল ব্যক্তিগত private স্বর্ণের মুদ্রা প্রস্তুত হইত তাহা কেবল মাত্র জগৎ-শেঠের। তিনি ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

পলাশীর যুদ্ধ—

জগৎ-শেঠ ফতেচাঁদের পর তাঁহার দুই পৌত্র বিষয়ের অধিকারী হন প্রথমটির নাম মহাতাব রায় ইনিই জগৎশেঠ উপাধি পান এবং কনিষ্ঠ স্বরূপ রায় রাজা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেঠ বংশের গৌরব-সূর্য-মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের অপূর্ব্ব তীব্র জ্যোতিঃ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ দেহত্যাগ করিলে তদীয় দৌহিত্র ষোড়শ বর্ষীয় সিরাজ-উ-দ্দৌলা বাঙলার নবাব হইয়া বসিলেন। এই ঘটনা উক্ত বৎসরের মার্চ্চ মাসে ঘটে এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশে পরে বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ভাগ্যচক্র দেশবাসীর পক্ষে নিদারুণ ভাবে ঘুরিতে থাকে।

অল্পমতি বালক সিরাজ বয়স্যের আদরে অতিরিক্ত স্নেহে ও বিলাসিতায় লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও বালকসুলভ

বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইত, এ প্রয়োজন মিটাইতেন শেঠবংশের প্রসিদ্ধ ধনীগণ। বিলাস-মত্ত অপরিণামদর্শী নবাব একবার অর্থাতিরিক্ত প্রয়োজনবশতঃ মহাতাপ রায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। তাঁহার অপর্য্যাপ্ত অর্থ সরবরাহে শৈথিল্য দেখিয়া ক্রুদ্ধ ও অসৎ চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠেন। আজন্ম সুখী অপ্রতিহত প্রভাবে অর্থ ও বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এমন অপরিণত বয়সে কাল-বিলম্ব সহ্য হয় না। যখন যাহা প্রয়োজন সে ক্ষুধা না মিটাইতে পারিলে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। যেমন করিয়া হউক অর্থ তুলিয়া দিন—বলিলে মহাতাব রায় জগৎ শেঠের আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত লাগে। ক্রোধবশতঃ কটূক্তি করিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। অর্থ সাহায্যে বিলম্ব হেতু সিরাজ রাজদ্রোহিতার নামে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়েন। মীরজাফরের মাধ্যমে ও প্রচেষ্টায় এ আদেশ পরিবর্ত্তিত হইল না। অবশেষে ক্রোধ প্রশমিত হইলে নবাব সাহেব জগৎশেঠ মহতাব রায়কে কারামুক্ত করেন। তদবধি জগৎ বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করিয়া নিবিড়ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। রজিত রায় ও ইয়ার লতিফ খাঁর নিকট হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। ইয়ার লতিফের দ্বারা লর্ড ক্লাইভ তাঁহার কাছে সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন-বিচ্যুতির প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। জগৎশেঠ ও অন্যান্য কতিপয় রাজপুরুষের সাহায্যে ক্লাইভ বাঙ্গলার সিংহাসন লাভ করেন। তাহাতে অতি শীঘ্র ভারতের ভাগ্যাকাশে পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদের তোষাখানায় দেখা গেল অর্থের পরিমাণ মাত্র এক কোটি টাকা। লর্ড ক্লাইভ ম্রিয়মান হইলেন, জগৎশেঠ ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, ষড়যন্ত্রের ফলফলিল। সিরাজ পনেরো মাস মাত্র সিংহাসন অধিকার করিয়া আর সিংহাসন রক্ষা করিতে পারিলেন না। চল্লিশ কোটি টাকা লর্ড ক্লাইভ রাজকোষ হইতে আশা করিয়াছিলেন, তিনিও মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেন। মীরজাফরকে রাজতক্তায় বসাইবার পর শান্তি দ্বারা রাজ্য শাসিত হয় নাই। অর্থানুকূল্য বরাবরই শেঠগণের দ্বারা হইয়া আসিতেছিল। অনন্তর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মীর কাশিম মীরজাফরের পর সিংহাসনে বসিলে, নূতন নবাবের নিকট জগৎশেঠ বার লক্ষ টাকার একটি বিল ধরিলেন। ঐ অর্থ মীরকাশিম ফিরাইয়া দিলেন না এবং দুই বৎসর পরে মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদের মতানৈক্য হইবার ফলে জগৎশেঠকে পুনরায় কারারুদ্ধ হইতে হইল, তৎসঙ্গে স্বরূপচাঁদও কারাগারে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। মীরকাশিমের আদেশে কারারুদ্ধ হইয়া তাঁহারা মুঙ্গেরে প্রেরিত হন। অতঃপর মীরকাশিম গঙ্গাতীরে, মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া আনেন। কথিত আছে উদয়নালা যুদ্ধের প্রাক্কালে জগৎশেঠকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া ভাগিরথী-বক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা সুপবিত্র গঙ্গার জলেই দেহত্যাগ করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ যখন দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করিলেন, তখন মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় টাকশাল স্থানান্তরিত করা হইল। পরবৎসর মহাতাব চাঁদের আঠার বৎসর বয়স্ক পুত্র কুশলচাঁদকে জগৎশেঠ করা হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তরুণ জগৎশেঠকে লর্ড ক্লাইভ বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি (pension) দিতে প্রস্তাব করিলেন যাহা কুশলচাঁদ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তাঁহাদের পরিবারের মাসিক ব্যয় এক লক্ষ টাকার কম নহে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত কুশলচাঁদের অন্তঃপুরে ১২০০ নারী থাকিতেন এবং দাস দাসী সর্ব্বসমেত চারি হাজারের অল্প হইবে না।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কুশলচাঁদের দেহান্ত হইলে, জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন হীরাচাঁদ এবং তাঁহার মাসিক বৃত্তির সংখ্যা ছিল বার হাজার টাকা। পরবর্ত্তী যুগে উহা আট হাজার টাকা করা হইয়াছিল। হীরাচাঁদের পর ইন্দ্রচাঁদ জগৎশেঠ হন। তিনিই বোধহয় এই বংশের শেষ জগৎশেঠ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জীবিত থাকিয়া তিনি প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়।

নাটক

শ্রীঅনিলকুমার হালদার

নাটকরূপে শিল্পপ্রকরণের অন্তরালে কবিকল্পনা ও কাব্যকৌশলের যে চরমোৎকর্ষ, সাহিত্যের অন্য কোনও শাখায় তাহা নাই। ইহার আঙ্গিক (technique) কৌশলের অতিচেতনার উপরই নাটকত্ব এবং নাট্যরসসৃষ্টি নির্ভরশীল বলিয়া যে নাট্যকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা অনুধাবন না করেন তাঁহার সর্ববিধ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। বাংলা দেশের খুব কম নাট্যকারই তাহা শিক্ষা করিয়াছেন; তাই সুলভ যাত্রাগানের উত্তেজনা ও এক প্রকার নাটুকেপনা অথবা নাটকীয় ঢঙ্ অধিকাংশ বাঙলা নাটকেও প্রকট। তদ্ব্যতীত, অতিসহজ ভাবের অতিরেক এই জাতির মজ্জাগত, এই অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণতাই বাংলা নাটককে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া বৃহত্তর সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারে নাই। তাহার বাস্তব জীবনবৃত্তের সীমারেখায় সার্দ্ধশতবর্ষাধীনও অধিক পুরানো সেই নদীয়ার প্লাবন-উচ্ছ্বাস আজিও অবশিষ্ট আছে; এবং সেই প্লাবন তাহার বাস্তবজীবন ছাড়াইয়া ভাবজীবন অর্থাৎ সাহিত্যকেও স্পর্শ করিয়াছে; যে-জন্য রবীন্দ্র-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতি নাটকেই তাহা প্রায়শঃ উপস্থিত। সামাজিক নাটকের গার্হস্থালীর মধ্যে, পৌরাণিক নাটকের ভক্তিভাবের মধ্যে এবং ঐতিহাসিক নাটকের দেশপ্রীতির মধ্যে সেই সুর সর্ব্বত্রই সমান—দীনবন্ধু ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম, এমন কি মাইকেলের মধ্যেও একটি যুক্তিনিষ্ঠ কঠিন মন ছিল।

নাট্যকারের যে জীবনদৃষ্টি, তাহাতো শিল্প-জগতের চূড়ান্ত সীমারেখা স্পর্শ করিয়া আছে। তাহার মধ্যে নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মূল্য সমধিক। এক একটা ধ্যানসৃষ্টির জন্য যেমন, যাহাতে এই মাটির মানুষের সামগ্রিক চেতনাও অপরোক্ষ করিয়া থাকে। রোমান্টিক কল্পনার অহৈতুক উল্লাস অথবা ক্ল্যাসিক বন্ধনের কাঠিন্যও নহে—নাট্যকার জীবনকে মৃত্যুকে ও জগৎকে একেবারে মুখোমুখি রাখিয়া তাহারই আলোকে তাহাকে চিনিয়া লন। সেই জীবন-জিজ্ঞাসার দৃঢ় বলিষ্ঠতা, সেই আত্মসাক্ষাৎকারের সুতীব্র সাহস ও সেই রূপ-প্রতীতির উৎকণ্ঠা নাট্যকারের সৃষ্টির মধ্যে কখনো বা কবিত্বের মাধুর্য্য, কখনো বা উপন্যাসের কাহিনীরস, কখনো বা কঠোর তৃপ্তি, অথবা গভীরতর নির্ব্বেদ আনিয়া দেয়। মর্ত্ত্যজীবনের উর্দ্ধে এই ক্ষয়ক্ষতি ব্যক্তিগত নিস্পৃহ বৈরাগ্যসাধনা, আত্মগোপনের একান্ত কামনা অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিকতা—ইহাই নাট্যকারের প্রাথমিক শিল্পসাধনা।

নাটকের মধ্যে কোনও স্থানে এবং কখনও লেখকের ব্যক্তিস্বরূপ কোনও রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে না, তাহার আত্মগত ভাব ও ভাবনার বাহন চরিত্রগুলি নয়, অন্ততঃ ঠিক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, অর্থাৎ পাত্র পাত্রী আপনার রসেই সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। নাটক পাঠ করিবার কালে ঐ কঠিন প্রণালিই চিত্তে উদিত হয়—লেখক সত্য নিরপেক্ষ বস্তু (Plot) চেতনাই তাহার সমস্ত বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সেই লৌকিক তন্ময়তায় তাহার আত্মবিক চাঞ্চল্য এবং পরিতৃপ্তি—শিল্পরসের উপকূলে তাহাই গূঢ়তর আনন্দে উদ্বেলিয়া উঠে; সজ্ঞান পাঠকমানসে শিল্পকলা কুতূহলের চরিতার্থতাও তাহাতে। সেইজন্য যে পাঠক যুগপৎ সাহিত্যের শিল্পরস ও আনন্দ আস্বাদ করিতে চায়, নাটকের মধ্যেও তাহার আপন আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা এবং যে-

লেখক সৃষ্টির আনন্দে আপনশক্তির ও আপন শক্তির ও আপন অভিজ্ঞতার সন্ধান পায় সে অনিবার্য্যভাবেই নাট্যকার হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র আপন শক্তির ও আপন অভিজ্ঞতার—অন্তর্নিহিত স্ব-শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন; কিন্তু অবিমিশ্র সৃষ্টির উল্লাস-মুখর অধীরতা অথবা প্রাণোচ্ছল অসহিষ্ণুতা তাঁহাতে নাই; তাঁহার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল—আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার ঔপন্যাসিক সত্যের পিছনে পিছনে সর্ব্বদাই একটা স্বাদেশিকতার বেদনা অথবা অসহায় মানবজীবনের বৃহত্তর আধ্যাত্মিকতা তাঁহাকে বারে বারে প্রলুব্ধ করিত। তাই সেই উপন্যাস নাটকীয় গুণবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বোপরি উপন্যাসধর্ম্মী।

উপলাকীর্ণ জীবনের পথে পথে মানুষের দুঃখ ও বেদনা আঘাতে আঘাতে যে সংহত মূর্ত্তিধারণ করে নাটকে তাহাই ট্র্যাজেডি নামে অভিহিত হয়। ট্র্যাজেডির স্বরূপ নাটকের মধ্যে যে রসদূরার উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছে তাহাতেই বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠকল্পনা বহিঃপ্রকাশের জন্য একমুখী। মর্ত্ত্য-জীবনের শিলাতটে দৈবনিগৃহীত মানুষের অব্যক্ত হাহাকার এবং তাহার অন্তরের অবরুদ্ধ বেদনাকে নাট্যকার একেবারে আমাদের চাক্ষুষ করিয়া তোলেন—তাহাতে উদ্যত অশ্রুও স্তম্ভিত হইয়া যায়, যে মুখর সেও এক নিমেষে মৌন মূক হইয়া যায়। সেই আহত চিত্তের ক্রান্তিবেলায় দাঁড়াইয়া আমরাও উপলব্ধি করি মানুষের জীবন কত অসহায়, তাহার পাপের তুলনায় শাস্তির কতখানি আধিক্য; সব হারানোর পাণ্ডুরতায় সেই জীবন-দিগন্তে রসচক্রের কত আর্ত্ত-চিহ্ন।

পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমাজে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে: ইহাই কত ছন্দে, কত ভঙ্গীতে যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সম্বন্ধে তাই নাটকের যেমন আদর, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও তেমনি সেইখানেই আবির্ভূত হইয়াছে। সেক্সপীয়রের নাটকগুলিও জীবনের এই ট্র্যাজিক-সম্বিৎ কবি-কল্পনার চারুত্বে ও সুষমায় অভিমণ্ডিত, তাই এত যুগ পার হইয়াও তাহার অম্লান দ্যুতি এতটুকুও ম্লান হয় নাই।

নাটক যেমন শিল্পকলনের নিগূঢ় কৌশলে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তেমনি নাট্য-পাঠকেরও উন্নত কল্পনার কিছু প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের প্রতিস্পর্দ্ধী নাটক এখনও রচিত হয় নাই এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকও সাধারণ জনগণের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। তাহার প্রধান কারণ যাঁহারা নাটক লিখিয়াছেন তাঁহারা রঙ্গমঞ্চের জনচিত্তের ভাবানুভূতিকেই সম্মান করিয়াছেন, আপন প্রাণকে অনুসরণ করা তাঁহাদের কমই অভ্যাস ছিল। এবং দ্বিতীয়তঃ যে শিক্ষা ও যে প্রতিভা নাট্যশিল্পের অনুকূল তাহা কয়জনের ছিল? সেই দুর্ব্বলতা—যে জন্যই হউক—বাঙলা নাটকের সার্ব্বভৌমত্বের অন্তরায় হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে একজন 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার' আপন দুর্ব্বলতার সাফাই গাহিয়া বলিয়াছেন, 'বাঙলা নাটক তাহার নিজস্ব পন্থায় গঠিত হইবে!' জানিনা সেই নিজস্ব পন্থাটি কি বস্তু। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর নাট্যশিল্পে সমাজকে অন্তর্মুখে ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার কবিকল্পনার অভিনব উল্লাস ও তাহাতেই মুখরিত হইয়াছে, তাঁহার সাঙ্কেতিক (symbolical) নাটকগুলি তাহারই অভ্রান্ত নিদর্শন।

নাটকের গভীরতম প্রেরণা জীবন ও জগৎ-হইতে আসে—লোকচরিত্রের অনুধ্যান এবং সর্ব্বজনের হৃদয়ভাবে এখানে অবিকৃতভাবে ধরা দেয়; তাই সেই প্রাণের স্পর্শই আমাদিগকে অভিমাত্রায় চকল করিয়া তোলে। কিন্তু ইহার সমস্তই নাট্যআঙ্গিকের পর্ব্বে পর্ব্বে স্থির হইয়া আছে সেই গঠনে শৈথিল্য দেখা দিলে নাটকে রসাভাস সৃষ্টি হয়—তাই শ্রেষ্ঠ নাটক যুগপৎ ইহার প্রকরণ-পারিপাট্য ও রসোৎকর্ষকে সমান্তরাল রেখায় অনুবর্ত্তন করিয়া চলে।

নাট্যসুন্দরীর রূপচর্য্যার বিশিষ্ট ভঙ্গী কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে—তথাপি

ইহার মূলগ্রন্থি সেই সংঘাত সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে; ঐ সংঘাত উৎকেন্দ্রিকতাই রসরাজ্যের উৎপাদক। সংঘাতই হইল নানা ঘূর্ণীর মধ্যস্থিত একটি স্থির বিন্দু। নৃত্য-পটিয়সীর স্থৈর্যবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহারই আকাশতলে জীবজীবনের ঐকান্তিকতার সমস্ত জগতের রূপ সন্ধর্ষণে। তাহাতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবতার আধিক্য, এবং রসের চিত্তচমৎকারিত্ব অপেক্ষা গূঢ় সংবেগই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই যে জীবন ও মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করা নাট্যকারের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ (Philosophy of life) তাহাকে কবি, ঔপন্যাসিক জীবনচরিতকার ও ঐতিহাসিক হইতে পৃথক করিতেছে।

নাটকের একটা সাঙ্গীতিক ছন্দ আছে—নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিতায় তাহাই সত্যরূপে উদ্ভাসিয়া উঠে; ঐ ছন্দ প্রথমে ধীরে তারপর যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়—শেষ আসিয়া তাহাই গভীরতর সুরে পৌঁছিয়া রস সংহতি লাভ করে। অর্থাৎ নাট্যকার জীবনসমুদ্রের উপকূলে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, ফুৎকারের কৌশলে বিভিন্ন রন্ধ্রে বিভিন্ন ধ্বনি উঠে, নাট্যকার শুধু সুর দিয়া সে মাধুর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে না—সুতরাং বাঁশীরও একটা রাগী বা ছন্দ আছে স্বীকার করিতে হয়, অবশ্য এ' কথাও সত্য যে, নাট্যকারের আধিমানসিকতায় একটা সুরসঙ্গতি স্থাপিত না হইলে সেই বাঁশীও বড় বেসুরা বাজে।

[প্রথম অংশ সমাপ্ত]

নিরপেক্ষতা ও আন্তর্জাতিকতা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

যুদ্ধ-বিগ্রহ • কথাটি মোটেই নতুন নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন রাজ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চ'লে আসছে, যদিও ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপ—বদলে গেছে। আজকের দিনে আমরা যে ধরণের সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত কিম্বা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে ধরণের সংগ্রামে লিপ্ত হবে, সে ধরণের সংগ্রামের সঙ্গে অতীতের সংগ্রামের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ফলে নিরপেক্ষতা (neutrality) কথাটির অর্থ এবং তাৎপর্য্য সংগ্রামের পরিবর্ত্তনশীল রূপের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে। অতীতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো এবং যে সব কর্ত্তব্য পালন করবার দায়িত্ব নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা হতো, সে সব সুযোগ সুবিধা এবং কর্ত্তব্যের সঙ্গে আজকের দিনের আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা এবং কর্ত্তব্যের অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্ত্তব্য হলো প্রতিবেশী কিম্বা দূরবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আরব্ধ যুদ্ধে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ না করা। যদি কোন রাষ্ট্র এই কর্ত্তব্য ঠিকভাবে সম্পাদন কোরে চলেন, তাহলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সেই রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে, এবং ও যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলো সে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে বাধ্য থাকবেন।

আজকের দিনে একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অনুসারে দু'ধরনের অধিকার পেতে

থাকেন। প্রথমতঃ, তাঁকে আত্মরক্ষা করবার অধিকার দেওয়া হয়। যুদ্ধে লিপ্ত কিম্বা বিবদমান রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক যাতে তাঁর রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘিত হতে না পারে, সেজন্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার অধিকার একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এই অধিকার কোন সময়ে সঙ্কুচিত করা করা যাবে না। প্রশ্ন হতে পারে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার অধিকারী কিনা। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাঁর নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রাখতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। শুধু তাই নয়। যুদ্ধের আগে মহাসাগরে যে রকম তাঁর জাহাজ বিনাবাধায় যাতায়াত কোরতো, যুদ্ধের সময়ও ঠিক সেরকম তার জাহাজ যাতায়াত কোরবে। সেই রাষ্ট্রের জাহাজের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করার কোন অধিকার বিবদমান কিম্বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলোর নেই।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যে রকম কতকগুলো সুবিধা ভোগ করে, সে রকম তাকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্তব্যও পালন করতে হয়। বিশেষ কোরে আজকের দিনে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুব বেশী। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ কথাটির তাৎপর্য্য অনেক সময়ে বদলে যায়। অর্থাৎ আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি সে কথাটি হলো এই যে, মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে যখন কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে একটা নির্দ্দোষ মনোভাব অবলম্বন করাকে অবাঞ্ছনীয় ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ নিরপেক্ষতার সঙ্গে এই নির্দ্দিষ্ট মনোভাবের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, যা'তে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলো সৈন্য স্থল এবং বিমানবাহিনী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সীমানা লঙ্ঘন করতে কিম্বা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে ঘাঁটি তৈরী করতে না পারেন সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার যেরকম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আছে, সেরকম অন্যদিকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ বিবাদ কিম্বা সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে দূরে স'রে থাকতে হবে। এর কারণ হলো এই যে, বিবদমান এবং যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে যদি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিজের ভাগ্যকে জড়িত করেন, তাহলে তাঁর নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম—ভারত ও ইউরোপ—মানব-সভ্যতার দুই বিভিন্ন দিক। এই দুই সভ্যতাই অসম্পূর্ণ ও প্রত্যেকেই মাত্র সভ্যতার একদিকে বিকাশ লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ তার সভ্যতার গতিতে বিকাশ করেছে—মানব সভ্যতার ভেতরের শক্তি ও সম্পদ। ইউরোপ তার সভ্যতার গতিতে প্রকাশ কোরেছে বাইরের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ। ইউরোপের লক্ষ্য ঐহিক উন্নতি ভাগতিক সমৃদ্ধি ও রাজ্য-বিস্তার। ভারতবর্ষের লক্ষ্য অন্তরের সংযম, আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানবপ্রীতি আর অন্তর্জাতিকে উন্নত করার চেষ্টা। ভারতের সভ্যতা অন্তর্মুখী, ইউরোপের সভ্যতা বহির্মুখী।

এখন এই দুই সভ্যতা সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে। আর সম্পূর্ণ মানব-সভ্যতা-সৌধ গড়ে তোলবার জন্যে চাই ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি ও সম্পদের সঙ্গে ইউরোপের বিজ্ঞান কর্ম্মদক্ষতা সঙ্ঘবদ্ধতা ও ঐহিক সমৃদ্ধির সমন্বয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

চব্বিশপরগণার ইতিহাসে আমডাঙ্গা

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

শাস্ত্রমতে সৎসঙ্গ, ঈশ্বরে ভক্তি এবং গঙ্গাস্নান এই তিনটি অসার সংসারের সার বস্তু :—

"সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাস্তসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রিনি সারানি ভাবয়েৎ॥"

ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে বসতি বিস্তার করেন। এই সকল স্থানে তাঁহারা ৺কালী মন্দির, ৺দুর্গামন্দির, ৺শিবমন্দির, ৺বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি দেবস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজার্চ্চনা করিতেন। সে সময়ে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে বহু ধর্মনিষ্ঠ সদাচারী শাস্ত্রজ্ঞ ও উদার চিত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। চরিত্রে সদাচারে জ্ঞানে বিদ্যায় ও ধর্মনিষ্ঠার উৎকর্ষতার জন্য তাঁহারা সমাজের সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। যে কয়েকটি কায়স্থ সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় সে সবগুলিই গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, যেমন:—আখনা (বর্দ্ধমান) টেরা, মাহীনগর, বালি, কোন্নগর, খড়া, বাগআঁচড় রসনগর মজিলপুর প্রভৃতি।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর যখন ইংরেজ কোম্পানি এ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন, তখনও চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার ভিতর দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিতা ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে স্থানে বারশত ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি করাইয়া ছিলেন তাহাই অধুনা 'বারাসত' (বারোশত) নাম ধারণ করিয়াছে। গঙ্গা-বিহীন স্থানে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বাস করা অসম্ভব। বারাসত মহকুমার স্থানে স্থানে 'ভাটি' দৃষ্ট হয়। এই সব ভাটিই (জলাশয়) গঙ্গার অবশেষ। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, হুগলী নদী হইতে কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লী) দিয়া দিল্লী গমনাগমন করিতে এই জলপথ তখনকার দিনে ব্যবহৃত হইত।

বারাসতের সেই সৌভাগ্যের কালে আধুনিক মহকুমা সহরের প্রায় চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে জাহ্নবী তীরে দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত মোহান্ত রামানন্দ গিরি গোস্বামী দৈবক্রমতঃ আগমন করেন। তখন সেখানে মনুষ্যবাসও ছিল না, বন-জঙ্গলও ছিল না। দিগন্তপ্রসারী বিশালপ্রান্তরে প্রকৃতি দেবী যেন সদা ক্রীড়া করিতেন। স্থানটি তাঁহার সাধনভজনের অনুকূল বোধহয়। স্থানমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি এখানে কুটীর রচনা করেন এবং ৺শ্যামামায়ের বিগ্রহ সেখানে স্থাপিত করেন। শক্তিপূজার ৺শিবপূজা এবং ৺শালগ্রাম শিলার পূজা অপরিহার্য্য। সুতরাং রামানন্দ গিরির প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে শ্যামাপূজার সঙ্গে সঙ্গে শিবলিঙ্গের ও ৺নারায়ণ-শিলারও নিত্য পূজা এবং ভোগ হইতে লাগিল।

রামানন্দ গিরির প্রচলিত নাম ছিল—'রামাগেৎ গিরি'। এই দলের সন্ন্যাসীরা দশনামী অদ্বৈতবাদী বৈরাগিক হইলেও তন্ত্রসাধনায় বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। রামানন্দ গিরি যখন চণ্ডীপাঠ করিতেন তখন তাঁহার পাঠের সুললিত সুরের আকর্ষণে গঙ্গায় নৌকারোহী যাত্রীরা তাঁহার কুটীর সান্নিধ্যে আগত হইতেন এবং দেবীর পূজার জন্য ভোগ প্রদান করিতেন। সে যুগে জলপথ নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদ ছিল না। মগ এবং পর্ত্তুগীজ দিনেমার প্রভৃতি বোম্বেটে ফিরীঙ্গী দস্যুরা যাত্রীদের উপর নানাপ্রকারে উপদ্রব ও অত্যাচার করিত। সেইজন্য তখনকার দিনে গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহী যাত্রীরা যাত্রাপথের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য রামানন্দ গিরির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজা দিত। বাদশাহের দরবারে তখন যাঁহারা গমন করিতেন তাঁহারা মায়ের নিকট অভীষ্ট-সিদ্ধির আশায় মৌন প্রার্থনা নিবেদন করিতেন। ইহাতে পথ নির্ব্বিঘ্ন হইত, আশানুরূপ ফলও লাভ হইত। এই সকল কারণে ভক্তদের কাছে এইস্থানের দেবীর নাম হইল 'ফলদাময়ী'। এই মন্দিরের মাহাত্ম্য

ও প্রসিদ্ধি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সেজন্য হিন্দু জনসাধারণ এখানে সেবা-ভোগের জন্য সাধ্যমত পূজা ও প্রণামী দিয়া যাইত। ক্রমে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য পর্ণকুটিরের স্থানে দেবীর নিম্মিত হইল। ভোগ ঘর ইষ্টক-মন্দিরও পৃথক হইল। দুতলার মঠবাড়ীতে উপরের ঘরগুলিতে দেবীর পূজার ব্যবস্থার জন্য সংরক্ষিত করা হইয়াছিল। নীচের কক্ষগুলি মোহান্ত এবং অতিথি অভ্যাগতদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

রামাদেৎ গিরি মহারাজের প্রকট কালেই অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি ৺কক্ষপাময়ী মাকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দেবোত্তর রূপে দান করিয়াছিলেন। তখন হইতেই মায়ের মন্দিরের পার্শ্বে জনবসতি আরম্ভ হয়। রামাদেৎ গিরির নামানুসারে এখানকার পল্লীর নাম হইল 'রামডাঙ্গা'। 'ডাঙ্গা' সংস্কৃত শব্দ—উহার অর্থ পল্লী বা পাড়া। 'রামডাঙ্গা' শব্দ পরে বিকৃত হইয়া 'আমডাঙ্গা' হইয়াছে। সরকারী দলিল ও কাগজপত্রে উহার এই নামই এখন ব্যবহৃত হইতেছে।

রামাদেৎ গিরি বাঙ্গলা ১১৫৭ সালে (১৭৫০ খৃষ্টাব্দে) দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণ গিরি গোস্বামী ঐ দেবস্থানের মোহান্ত-পদ লাভ করেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কয়েক লক্ষ টাকার নজরানা দাবী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন এরূপ বিপুল পরিমাণ টাকা নবাবকে দিতে পারেন নাই। সেইজন্য নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নারায়ণ গোস্বামী তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনেন। কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্র কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন বলিয়া নারায়ণ গিরি একমাস যাবৎ বিশেষ তান্ত্রিক ক্রিয়ার পূজা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহারই কিছুদিন পরে কৃষ্ণচন্দ্রকে আলীবর্দ্দী খাঁ মুক্তিদান করিয়াছিলেন। এইভাবে মুক্তিলাভের জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ গিরির মন্দিরে অনেক টাকা ভোগের জন্য দান করেন। তাহা ছাড়াও নারায়ণ গিরি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে 'ব্রহ্মত্তরাণ' ও 'পরমহংস' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ১১৭১ সালে (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি ৯১৬ দেবোত্তর নলবিল সম্পত্তির লাখেরাজদার-রূপে মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ইহার পরিমাণ ছিল তিনশত ষাট্ বিঘা।

নারায়ণ গিরির মৃত্যুর পরে মোহন্ত হইয়াছিলেন আনন্দ গিরি। সাধুচরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে ইনিও এই দেবালয়ের আর্থিক সম্পদ ও বিষয়সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ২২৭৪ বাঙ্গেয়াপ্তির দলিলে মোহান্ত বলিয়া তিনি অভিহিত হন। অম্বিকা গিরি, আনন্দ গিরির দেহরক্ষার পর এখানকার মোহান্তের গদি দখল করেন। ইহার কোন রেকর্ড পাওয়া যায় নাই।

ইহার পরবর্ত্তী মোহান্ত রাজেন্দ্র গিরি। নলবিল সম্পর্কিত দলিলে ইনি লাখেরাজদার বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন।

রাজেন্দ্র গিরির পরে যিনি মোহান্ত হন তিনি জ্ঞানানন্দ গিরি নামে পরিচিত। সচ্চিদানন্দ গিরি তাঁহার পরে মোহান্ত হন।

ইহাদের পরে ভৈরবানন্দ গিরি—অতি কীর্ত্তিমান্ মোহান্ত। ইনি একাধারে যেমন সাধকপ্রকৃতির পুরুষ, তেমনি বেদান্ত তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে ইনি হুগলী জেলায় তেলিনী-পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারভুক্ত লোক ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি সুধীদের দ্বারা 'প্রাণতোষিণী তন্ত্র' নামে সঙ্কলন গ্রন্থের রচনা ও সম্পাদনায় ইনি সাহায্য করিয়াছেন। শিবনাথ গিরি মোহান্তের সেবাইৎ রূপে ২২৭৪ বাঙ্গেয়াপ্তি দলিলে লিখিত হইয়াছে।

আনন্দ গিরিও একজন খ্যাতিমান্ মোহান্ত। বাঙ্গলা ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) ইনি দেহরক্ষা করেন। তাঁহার সময়ে তারকেশ্বরের মোহান্ত আমডাঙ্গায় আসিয়া স্বয়ং ইহাকে রাজটীকা পরাইয়াছিলেন। ২২৭৪ বাঙ্গেয়াপ্তির দলিলে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ইংরেজ সরকার নলবিল

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি আদালতে আপীল করিয়া পুনরায় উহা লাখেরাজ সাব্যস্ত করেন।

শুভানন্দ গিরি গদি লাভ করিবার কিছুকাল পরে আত্মহত্যা করেন। কি কারণে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না।

শুভানন্দের মৃত্যুর পরে দেবানন্দ গিরি মোহান্ত হইয়াছিলেন। হাওড়া ট্রাষ্ট স্যুট নং ২০।১৯০৫ মামলায় ইনি মোহান্ত বলিয়া প্রমাণিত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আনন্দানন্দ গিরি মোহান্ত হইবার অল্পকাল পরেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দানন্দ গিরি ১৮৮০ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমডাঙ্গার মোহান্ত ছিলেন। উত্তমানন্দ তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জজকোর্টে একটি মোকর্দ্দমা (নং ৩৭০১) রুজু করেন কিন্তু অসুবিধা বুঝিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মামলা তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। এই বৎসর ৯১।৬ সি লাখেরাজ সম্পত্তি নলবিল সেল-এর দ্বারে কালেক্টারীতে নীলামে বিক্রয় হয়। ইহাতে মুকুন্দানন্দের অন্তরে বড়ই ব্যথা লাগে। ফলে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী রেজেষ্ট্রীকৃত অর্পণনামায় তিনি উত্তমানন্দকে গদি দান করেন। ইহার দেহরক্ষার পর গোকুলানন্দ গিরি মাধবের সহিত ওমরাও গিরির মোহান্ত পদ লইয়া বিবাদ হয়। গোকুলানন্দ গিরি মাধব অকৃতকার্য্য হইয়া ওমরাও গিরিকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এক রেজেষ্ট্রীকৃত অর্পণনামায় আমডাঙ্গার গদি ছাড়িয়া দেন।

ওমরাও গিরি হাওড়া মুন্সিফিতে ভোটবাগান মঠের মোহান্ত ছিলেন। ইহার কোন শিষ্য ছিল না। এত চেষ্টা করিয়া কাগজে-কলমে গদি লাভ করিলেও আসলে তিনি আমডাঙ্গা দখল করিতে পারেন নাই। কারণ ইহা তখন ইজারাদারের দখলে ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার দেহরক্ষা হয়। এই সময় আমডাঙ্গা মঠের বড়ই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। ইজারাদার জমিদারী উপস্বত্ব ভোগ করিতেন কিন্তু মঠের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। কোনরকমে বিগ্রহের নিত্য সেবা হইত। অনেক কাল ধরিয়া মন্দিরগুলিকে মেরামত করা হয় নাই। তাহার ফলে মন্দিরগুলি জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইতে থাকে।

ত্রিলোক গিরি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তারকেশ্বর মণ্ডলীর দ্বারা হাওড়া জেলার মুন্সিফির কাছে ভোটবাগান মঠের মোহান্ত হন। ভোটবাগান মঠের প্রতিষ্ঠাতা পূরণগিরি তখনকার দিনে বাঙ্গলার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি শুধু সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না। রাজনৈতিক কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল। হেষ্টিংসই পূরণ গিরিকে কয়েকবার তিব্বতে বাণিজ্যিক ও রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

আমডাঙ্গা মঠের ইজারাদারের ২৯ বৎসর মিয়াদ ১৯০৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে শেষ হইলে ইনি তদ্রূপ মঠ দখল করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালে হাওড়া জজকোর্টে ৯২ ধারায় ২০নং ট্রাষ্ট স্যুট দায়ের করেন। ত্রিলোক গিরি ১৯১৬ সালের পয়লা মার্চ্চ দেহরক্ষা করেন।

আমডাঙ্গার অবস্থিত মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত অচ্যুত আশ্রম দণ্ডী স্বামী। 'মঠ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ—বিদ্যা ও তপস্যা অভ্যাসের জন্য সন্ন্যাসীদের আবাস স্থান। সমাধিক্ষেত্রে নির্ম্মিত মন্দিরকেও সাধারণতঃ 'মঠ' বলা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে নিম্নলিখিত মোহান্তদিগের মঠ (সমাধি বা কবর) আছে। (১) রামানন্দ গিরি গোস্বামী গুরুকে রামানন্দ গিরি (২) শিবানন্দ গিরি (৩) আনন্দ গিরি (৪) দেবানন্দ গিরি এবং (৫) ভৈরবানন্দ গিরি। আমডাঙ্গার আরও অনেক মোহান্তের মধ্যে এইভাবে গোরস্থানের মতন অনেকগুলি সমাধিমন্দির বা মঠের অবিস্থিতি দেবস্থলীটী আমডাঙ্গা মন্দিরের পরিবর্ত্তে আমডাঙ্গা মঠ নাম ধারণ করিয়াছে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে জনসাধারণের দৃষ্টি মঠের

উপর বিশেষভাবে নিপতিত হয়। 'আমডাঙা মঠ সংরক্ষণ সমিতি' সেই সময় আত্মপ্রকাশ করে। এই সমিতির প্রচেষ্টায় এখানকার মন্দির ও অন্যান্য গৃহের সংস্কার সাধিত হয়। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর অনুকরণে মন্দির চত্বরে একটি ৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির সমিতির সভ্যেরা নির্মাণ করেন। এখানে বিগ্রহের নিত্যপূজা হইয়া থাকে। এই মন্দির সম্মুখস্থ তুলসী মঞ্চটিও ভক্তিমান যাত্রীদের মনকে আকৃষ্ট করে। দেবতার পূজা ভোগের জন্য সমিতি ফুলবাগান, ফল-বাগান তৈয়ারী করিয়াছেন, দুধের জন্য গরু রাখিয়াছেন দুইটি গোলাভরা ধান রাখিয়াছেন। এই ধানের চাউলে শ্রীশ্রীজগদম্বার অন্নভোগ হইয়া থাকে। আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য একটি হাট সভ্যেরা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে মঙ্গলবারে ও শনিবারে দুইদিন করিয়া এখানে হাট বসে।

চব্বিশ পরগণার জেলা বোর্ড মঠপ্রাঙ্গণে সোপানাবলী যুক্ত একটি দীঘি খনন করাইয়া এখানকার দেবপূজা ও লোকেদের ব্যবহারের জন্য জলের অভাব দূর করিয়াছেন। জলাশয়টি অতীত দিনের গঙ্গাগর্ভে খনিত বলিয়া ভক্ত নরনারীগণ বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে এখানে স্নানে গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জ্জন হয় বলিয়া মনে করেন। হাটের পশ্চাতেও মঠের একটি মাঝারী আয়তনের জলাশয় আছে। ইহা বেলগ্রাম নিবাসী আব্দুল জোকারাত নামে কোন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ভদ্রলোকের পুণ্যকীর্ত্তি। তিনি ইহার ঘাটও বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। জলাশয়টির নাম 'অচল দীঘি'। একসময় জনসাধারণ ইহার জলপান করিতেন। এখন সর্ব্বত্র টিউবওয়েল স্থাপিত হওয়ায় পুষ্করিণীর জল আর পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় না। মঠেও একটি নলকূপ আছে। অচল দীঘির জীর্ণ সোপান-শ্রেণী খুলনা দক্ষিণ শ্রীপুরনিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অর্থে সংস্কৃত হইয়াছে। এই পুষ্করিণীতে মাছের চাষ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে এই মঠে শ্রীকঙ্কণাময়ী মাতার পাষাণ-মূর্ত্তির এখন পূজা হইতেছে। দেবীমূর্ত্তি বস্ত্রাবৃতা, দিগম্বরী নহেন। প্রতি বৎসর ঐ পৌষ তারিখে মঠে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। সেই উপলক্ষে মঠবাড়িতে মহোৎসব হইয়া থাকে। মেলায় আগত ব্যক্তিদের খিচুড়ী, দুই তিনটি তরকারি, চাটনি এবং পায়স প্রভৃতি পেট ভরিয়া খাওয়ানো হয়।

রামায়েৎ গিরি স্থাপিত এখানে পঞ্চমুণ্ডীআসনে প্রতি অমাবস্যায় নিশীথে অনেকানেক তান্ত্রিক সাধক ভজনপূজাদি সাধন করিয়া থাকেন। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও ধনাঢ্য বীরেশ্বর পাঁড়ে মহোদয়ের সুযোগ্য বংশধরের এখানকার মঠে বীরেশ্বর চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিয়া ইহাতে মাসিক একশত টাকা সাহায্য করিতেছেন। কয়েকটি ছাত্র প্রবীন অধ্যাপকের সহিত এখানে আহার ও বাসস্থান পাইয়া থাকেন। এই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন, প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহের নিয়মিত অধ্যাপনা চলে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসিক পঞ্চাশ টাকা, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা এবং মহানুভব ব্যক্তিগণ সামর্থানুসারে এক হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক চাঁদা দিয়া থাকেন।

মঠের জমিদারি বাবাসত মহকুমা ছাড়া, ডায়মণ্ডহারবার এবং পাকিস্তানের খুলনা জিলায়ও ছিল। ইহার খাসজমি একশত বিঘা বাকী সমস্তই প্রজার নিকট বন্দোবস্ত করা। জমিদারির বার্ষিক আয় বাৎসরিক দুই শত টাকা। রাজস্ব ও অন্যান্য খরচা বাদ দিয়া ১৫৫৩ মুনাফা থাকে। আমডাঙা মঠের কাজকর্ম নির্ব্বাহের জন্য একজন নায়েব, দুইজন পুরোহিত, একজন পাইক ও একজন ঝি আছে। নায়েব চল্লিশ টাকা, পুরোহিত দুইজন কুড়ি টাকা করিয়া চল্লিশ টাকা ও পাইক ৫৲ পায়। অবশ্য এই বেতনের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। বর্ত্তমানে উহাদের সকলের মাহিনা বাড়িয়াছে। জমিদারির আয় ভিন্ন হাটের আয় আছে। প্রত্যেক হাটবারে দোকান প্রতি খাজনা বা 'তোলা' তোলা হইয়া থাকে। অচল দীঘির

মাইশ্বরের দিনে বিক্রয় হয়। প্রয়োজনমত আম প্রভৃতি ফলও বিক্রয় হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন নূতন রাষ্ট্রীয় আইনের নিয়মানুসারে মঠের জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমড়াঙ্গা মঠ আজ বাইশ বৎসর যাবৎ রিসিভারের অধীন রহিয়াছে। এ্যাডভোকেট কৃতনাথ মুখার্জি, (১৮৯পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া) বর্ত্তমান রিসিভার।

আমড়াঙ্গা মঠের দেওয়াল গাত্রের একখানি বৈষয়িক কাগজে এই কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। "৺তারকেশ্বর মঠ সংক্রান্ত ৯২ খারার ট্রাষ্ট স্যুট নং ২২।১৯২২ মোকর্দ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক দ্বিরীকৃত দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত তারকেশ্বর মণ্ডলীর অন্তর্গত মঠ সমূহের নাম।

(১) তারকেশ্বর মঠ (২) আমড়াঙ্গা মঠ (৩) ভোট-বাগান মঠ (হাওড়া) (৪) গুপ্তি পাড়া মঠ (হুগলী) (৫) পুরীমঠ, সন্তোষপুর, (৬) নৈনপর মঠ (৭) দেওয়ামঠ, সন্তোষপুর (৮) ভদ্রকালী মঠ, বৈষ্ণবাটী (৯) চাইপাঠ মঠ (মেদিনীপুর)—এবং (১০) বেরপাড়া মঠ (মেদিনীপুর)।

গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের ভিতর থাকিয়াও যে সমস্ত রাজপুরুষ স্নেহে মনে প্রাণে আমড়াঙ্গা মঠের সর্ব্ববিধ কল্যাণের দিকে যত্নবান্ ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বারাসতের ভূতপূর্ব্ব মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমড়াঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত (অধুনা অবসর-প্রাপ্ত) মহাশয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। রামপুর নিবাসী জীবনকৃষ্ণ ঘোষ মঠের উন্নতিকল্পে এককালীন সাতহাজার টাকা ব্যয় করিয়া দেশের ও দশের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন এবং নিজের ধর্ম্ম-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

আমড়াঙ্গা মঠ লইয়াই আমড়াঙ্গা গ্রাম আরম্ভ। আমড়াঙ্গা মঠই এই গ্রামখানির একমাত্র গৌরব। আমড়াঙ্গা মঠই এই গ্রামের বৈভব। মঠের বিষয় বর্ণনা করিলে পল্লীর প্রায় চৌদ্দ আনা কথা বলা হয়। সেইজন্য ঐ গ্রামের ইতিহাস বলিতে গিয়া মঠ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল।

আমড়াঙ্গা মঠের গুরুত্ব বর্দ্ধনে গবর্ণমেণ্ট আমড়াঙ্গা গ্রামে—থানা, ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, ফ্রি-প্রাইমারি স্কুল, স্যানিটারি অফিস, কৃষি-অফিস প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন।

আমড়াঙ্গা গ্রামবাসীদের সাধারণ অবস্থা ভাল। অধিকাংশ বাড়িতেই ইটের তৈয়ারী ঘর, খোলা চত্বর যুক্ত খামার, গোয়ালঘর পরু আছে। মাঠে ধানের সময় ধান, অন্য সময় মটর, মুসুরি, ছোলা পিঁয়াজ বেগুন, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সবজী রূপে পালং, কপি, লাউ, কুমড়া পর্য্যাপ্ত ফলিয়া থাকে। এখান হইতে বারাসতে অনেক শাক-সব্জি চালান যায়। পাট এখানকার উৎপন্ন অন্যতম প্রধান পণ্যদ্রব্য। তাহা ছাড়া এখানে অনেক আখের ক্ষেতও আছে। আম, কাঁটাল, জাম, জামরুল, পেঁপে, কলা, বেল, বাঁশ প্রভৃতি আমড়াঙ্গায় অনেক হয়, খেজুর গাছের প্রাচুর্য্যও এখানে আছে। শীতকালে অনেক বাড়িতেই খেজুরের গুড় তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আমড়াঙ্গায় ম্যালেরিয়া নাই। অন্য কোন অসুখ বিসুখও কম। অধিবাসীরা প্রাচীনপন্থী হিন্দু ও সাধারণভাবে ধর্ম্মপরায়ণ। চুরি ডাকাতি এখানে খুবই অল্প দেখা যায়।

বারাসত হইতে শিবের রাস্তা আমড়াঙ্গার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ পথে বাস (Bus) যাতায়াত করে। বারাসত হইতে আমড়াঙ্গা পর্য্যন্ত বাসের ভাড়া চারি আনা। শিয়ালদহ হইতে বারাসত পর্য্যন্ত ট্রেনের ভাড়া মাত্র পাঁচ আনা। শ্যামবাজার হইতেও বাসে বারাসত পর্য্যন্ত যাইতে ঐ একই ভাড়া লাগে।

কবি-প্রণাম

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ

পঁচিশে বৈশাখ এলো, জীবনের
মহাক্রমশাখে
ফুটিল একটি কলি, সঁপিলাম
তাহাও তোমাকে
আমার গানের সাথে—
লহ ফুল, লহ এ জীবন,
তোমার আশীষ লভি ধন্য তারা
হোক্ অনুখন।
তোমার দখিন বায়ু, বিকচপ্রসূনশ্যামশোভা
শুভ্রবি ফিরিছে বহি গানে প্রাণে
বাণী মনোলোভা—
সে নহে ক্ষণিক লাগি'—
হোক্ তারা চিরজীবনের
হোক্ সর্ব্বব্যাপী তারা
স্পর্শ বহি' চিরসুন্দরের।

• • •

তোমায় আমি পেয়েছিলেম
প্রাণের গভীরে,
স্বর্ণাধারার কলস্বনে,
উপল-মন্দ্রীরে;
পেয়েছিলেম রবির আলোয়,
আমার যতেক সাদায় কালোয়,
গঙ্গাধারা তুমি—আমার
যমুনা-নীরে!
তোমার সাথে মিলন মম
প্রাণের গভীরে!
তুমি আমার বক্ষতন্ত্রীতে
গেয়েছ হে গান
সকল কাজে সকল মাঝে
তোমার অবদান।
সর্ব্বরূপে কর্ম্মলীলায়
তোমার আকাশ যায় ছুঁয়ে যায়
আমার জীবন-তটিনীরে—
তাহে নাচে প্রাণ—
জীবন-গুরু নমো নমঃ
গাহি তব গান।

কৃষ্ণচূড়ার বর্ণচ্ছটা
রাঙায় আকাশে,
বন্দনাগান তেমনি তব
ছড়ায় বাতাসে,
ধরণী আজিকে পঞ্চদীপ জ্বালি'
গন্ধে পুষ্পে ভরি' আনে ডালি,
দীপ্ত প্রাণের লহ অঞ্জলি
স্মিতশুভ্রহাসে—
মৃণ্ময়ী ধরা হবে চিন্ময়ী
তোমার প্রকাশে।

ঈশান কোণে ঈষারা ওই
প্রলয় মেঘেরি—
অগ্নি-পরশ আঁখি-হরষ
হেথায় যে হেরি!
তুমি এসো শুভ্র নবনীপবাসে
সজল মেঘের কাজল বিলাসে—
ধ্বনুক চিত্ত, অম্বরতলে
বাজিল ভেরী—
"ওরে জাগ্, ওঠ্ তোরা সবে
বাহিরে দেরী!"

কবি তোমার অভয়রবে
ঘোচে অন্ধকার,
বিশ্ববাণী তোমার বীণে
তোলে কী ঝঙ্কার!
ঘুরে যাক্ জ্বালা তৃষা ক্ষুধারাশি
বিকশিত হোক্ প্রেম প্রীতি হাসি
নব আনন্দ জীবনছন্দে
বহুক্ সবার—
তোমায় ভালোবেসেছি তাই
লহ নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভারতবর্ষের বাণী-মূর্তি। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিরাট প্রাণময় প্রতীক। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমস্ত মহান ও উদার ভাবরাশি ও চিন্তাসম্পদ তাঁর মধ্যে সার্থক সমাবেশ ও সমন্বয় লাভ কোরেছে। সাধারণতঃ তিনি 'যুগপ্রষ্টা সাহিত্যিক ও অপূর্ব প্রতিভাশালী কবি' বলে'ই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র পৃথিবীতে আধুনিক যুগের চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ। মানব-প্রতিভার এমন অতি অল্প বিষয়ই আছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও সৃজনধর্মী প্রতিভা নব নব ও বিচিত্র সম্পদ দান করেনি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে দেশগত জাতিগত সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার সীমাকে ছাড়িয়ে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

বাঙলা দেশে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ কোরলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাবের জ্ঞানের ও কর্মের সাধনায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বরেণ্য মনীষীদের সঙ্গে একাত্মতার সম্বন্ধে চির সংযুক্ত। ভারতবর্ষের সভ্যতা সাধনা ও সংস্কৃতি তাঁর অন্তরের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জড়িয়ে আছে। কিন্তু তাই ব'লে ভারতবাসী বা বাঙালীদের জাতীয় চরিত্রে যেখানে যা কিছু দোষ ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে—রবীন্দ্রনাথ তাদের কখনও প্রশ্রয় দেন নি। ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালী জাতের সমস্ত গুণ ও দোষের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আবার অন্যদিকে ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ও জ্ঞানের সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন হৃদয়ের প্রীতি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইউরোপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবনা ও আবিষ্কারকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র চিত্তে গ্রহণ ও সমর্থন কোরেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার যে দিকটা আসুরিক বীভৎসতা ও নারকীয় কুশ্রীতায় পূর্ণ তিনি তার বিরুদ্ধে চিরদিন বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ কোরেছেন।

ইউরোপে বহু শতাব্দী ধ'রে শত শত মনীষী জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আশ্চর্য সৃষ্টি-প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে আসছেন—তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে চিরদিন বিমুগ্ধ বিস্মিত ও আকৃষ্ট কোরেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার যে সমস্ত মহাপ্রাণ মানবপ্রেমিক মনীষী অসহায় নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত মানবশ্রেণীর উদ্ধারে ও সেবায় আত্মোৎসর্গ কোরেছেন ও কোরছেন, তাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অন্তরের সুনিবিড় শ্রদ্ধা নিবেদন কোরেছেন। ইউরোপীয় সভ্যতার যে দিকটা মানবতা জ্ঞান-সাধনা ও কল্যাণব্রতে সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের অন্তরে তা চিরদিন অনুরাগ ও বিস্ময় জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের সাম্রাজ্যবাদ রাজ্যলিপ্সা পরস্বলোলুপতা শোষণবাদ বর্ণবিদ্বেষ দুর্বল জাতিদের স্বাধীনতা-হরণ প্রভৃতি আসুরিক বৃত্তি ও প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন চির বিরোধী। ভারতবর্ষ চীন ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এশিয়ার ও আফ্রিকার নানাদেশের পরাধীন অধিবাসীদের ওপর শ্বেতাঙ্গ শাসক জাতিদের দু-শাসন উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনকে রবীন্দ্রনাথ বরাবর দানবিক রীতি ও আসুরিক কার্য্য ব'লে ঘৃণা ও প্রতিবাদ কোরে এসেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাশ্চাত্ত্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতজাতিদের আসুরিক প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা আরও প্রবল ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগলো। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সেই আসুরিক দিকটার প্রবল বিভীষিকা ক্রমেই সমস্ত পৃথিবীতে অশান্তি দুঃখ দারিদ্র্য অভাব ও হাহাকার এনে মানবজাতিকে জর্জরিত কোরবে, রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদৃষ্টি তা আবিষ্কার কোরেছিল। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী

শাসকেরা আফ্রিকার বুকে যুদ্ধে জয়ী হয়ে সেখানকার লোকেদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন আরম্ভ কোরে দিলে। মানবপ্রেমিক মহাপ্রাণ কবি রবীন্দ্রনাথ তাই সে সময়ে একটি কবিতায় ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার মর্মবাণী এইভাবে প্রকাশ কোরেছিলেন :—

"পশ্চাতের সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল। হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। ধরাহীনা সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে।
তপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
পার্শ্বে পার্শ্বে বেঁধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয়-মন্থন ক্ষোভে
জন্তুবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।
কবিদল চিৎকারিছে আপনা ভুলিয়া
শ্মশান-কুক্কুরসম কাড়াকাড়ি নীতি।"

—'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ (বৈশাখ, ১৩০৮)

সাম্রাজ্যবাদের রাজালিপ্সার ও শোষণবাদের ফলপ্রভাবে ইউরোপীয় সভ্যতা বা আধুনিক সভ্যতা ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগলো শান্তিবাদী মানুষের কাছে দারুণ এক সন্ত্রাস ও আতঙ্ক। রবীন্দ্রনাথ তাই 'নৈবেদ্য' কাব্যে আবার লিখেছেন :—

"আজি সভ্যতার—
অন্নহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে
দরিদ্র-কবির-পুষ্ট বিলাস-লালনে
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর মর্মর
লৌহবাহু মানবের ভীষণ বর্বর
রক্তরক্ত—অগ্নিস্ফীত পরম স্পর্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে হায়,
নীরব গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তা চেষ্টালেশ।"

ব্যক্তি বা জাতি কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের শক্তিকে যখন কোন মহান্ উদ্দেশে নিয়োজিত করে, তখন দেশে ও সমাজে কোন না কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন হয়। কিন্তু সেই শক্তি যখন লোভ লালসা ও অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হয় তখন দেশে ও সমাজে নানারকম অশান্তি ও অবনতি এনে দেয়। আবার কোন কোনও স্বাধীন শক্তিশালী জাতির সমস্ত শক্তি যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অপরের অধিকার হরণ করে ও লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দুর্গতি ও ধ্বংসের গহ্বরে ফেলে দেয়—তখন পৃথিবী দারুণ দুঃখ ভয় ও অশান্তির আগার হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালে আগষ্ট মাসে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। সেই যুদ্ধে ইউরোপে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারী অকারণে নিহত হলো। কত পরিবারের শান্তিময় সুখের নীড় গেলো ভেঙে। কত নারী হলো পতিহীনা। কত শিশু কত বালক-বালিকা হলো অনাথ গৃহহারা ও নিরাশ্রয়। এই ভীষণ মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের অনেক নগর ও জনপদ হয়ে গেছে একেবারে জনহীন ও শ্মশান। ইউরোপের অনেক রাজ্যের সম্রাট রাষ্ট্রপতিদের ও রাজনৈতিক নেতাদেরও তার ফলে ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছে। তবুও ইউরোপ সেই শোষণবৃত্তি থেকে নিরস্ত হয় নি। মহাযুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে ইউরোপের দেশগুলি কিছুকাল যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে নিরস্ত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে চলতে লাগলো অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি, নূতনভাবে সমর-সজ্জা, নিজ নিজ রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য দারুণ কূটনীতি ও নানারকম অপকৌশল।

১৯২০ সাল থেকে ১৯২১-এর প্রায় মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে নিয়ে ফ্রান্স জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের দেশগুলি ভ্রমণ করেছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখলেন, ইউরোপের এই শান্ত অবস্থা মোটেই শান্তিবাদ ও যুদ্ধবিমুখতার লক্ষণ নয়। এই আপাতঃ নিস্তব্ধতা আর একটা মহাযুদ্ধের ঝড় ওঠবার পূর্ব লক্ষণ মাত্র। তাই রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স জার্মানী ও

ইউরোপের ভ্রমণ শেষে তাঁর কোন-কোন সমধর্মা-সভায় অভিনন্দনের উত্তর দেবার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এই যুদ্ধপ্রিয়তা ও স্বার্থবুদ্ধিই একদিন ইউরোপের ধ্বংস নিয়ে আসবে। নানা রাজ্যের প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রী ও রাজনীতিকদের মারফত ইউরোপ যে সভ্যতার রূপ প্রকাশ করছে সে সভ্যতা মানব-সভ্যতা নয়, সে সভ্যতা দানব-সভ্যতা।"

মহাত্মা গান্ধীও এক সময়ে ইউরোপের এই তথাকথিত সভ্যতার সম্বন্ধে বলেছিলেন : "This civilization is irreligious, and it has taken such a hold on the people in Europe that those who are in it appear to be half-mad."

—*Hind Swaraj* বা *Indian Home Rule page 24*

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর অনেক আগে ভারতবর্ষের আর একজন বরেণ্য পুরুষ ইউরোপীয় সভ্যতার এই অন্তঃসারশূন্য দিকটা নিজের অনেক বক্তৃতা চিঠিপত্র ও প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে ও নির্ভীক ভাষায় ব'লে গেছেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামিজীর 'পত্রাবলী' 'ভাববার বিবেকানন্দ' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' প্রভৃতি বইগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইউরোপের সভ্যতাগর্বী শ্বেতাঙ্গ জাতিদের এই তথাকথিত সভ্যতার নামে অতি উগ্র লোভ নির্দারুণ স্বার্থপরতা পরস্বলোলুপতা ও মানববিদ্বেষের পরিণাম কি? এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ "নৈবেদ্য" কাব্য-গ্রন্থে লিখেছেন :

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করি তারে
কাল-রাত্রি ঝঞ্ঝারিত দুর্যোগ আঁধারে
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বাসখান।"

কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা শোনেনা কখনই কোনও মহামানবের হিত-বাণী। মানব-কল্যাণব্রতী মনীষীদের সতর্ক বাণী তাদের কাছে উপেক্ষা ও পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠলো। শক্তির মদে আত্মহারা হয়ে তারা বক্তৃতা ও প্রচার-লিপিতে ঘোষণা করতে লাগলো, "যুদ্ধই জীবন। War is a biological neccessity. War is to relieve the earth from the burden of over-population. শান্তিবাদ কাপুরুষতার লক্ষণ। আমরা শ্বেতজাতি, পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের ওপর আধিপত্য করাই আমাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার। এশিয়া ও আফ্রিকার অন্য সমস্ত অ-শ্বেত জাতিকে পরাধীন কোরে তাদের অভিভাবকত্ব করবার প্রকাণ্ড কর্তব্যের ভার ঈশ্বর আমাদের ওপরে দিয়েছেন।" রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের শান্তিবাণী শাসনতন্ত্র ইংরাজ ফরাসী ও আমেরিকানদের কাছে হয়ে উঠলো চক্ষুশূল। কারণ রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি—সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে ও পৃথিবীর সকল দেশের গণতন্ত্রের অভ্যুদয়ের সমর্থনে কাজ কোরে চলেছে।

এই রকম রক্তলিপ্সু মনোভাব যেখানে প্রত্যেক রাজ্যের প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রনেতা ও রাষ্ট্র-চালকদের মধ্যে তীব্র ও প্রচণ্ড—সেখানে কখনও শান্তি ও মৈত্রীর পরিবেশ থাকতে পারে না। ইউরোপের কুপ্রভাবে এশিয়ার অন্যতম উন্নতিশীল জাতি জাপানীরাও হয়ে উঠলো ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। সমস্ত এশিয়াকে নিজের সাম্রাজ্যের করতলে আনবার জন্যে জাপান 'Asia for the Asiatics' এই বুলি প্রচার করতে লাগলো। কিন্তু কাজে কর্তব্যে তারা হয়ে উঠলো রাজ্যলোভী ও মানব-বিধ্বংসী। তাই সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের শিষ্য জাপান ১৯৩৪ সালের শেষ দিকে চীনদেশ আক্রমণ কোরলে। শান্তিবাদী চীনবাসীরা একতাবদ্ধ হয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু সভ্যতাগর্বী জাপানী বর্বরতায় চীনের নানা স্থানে বইতে লাগলো নিরীহ সরল নরনারীদের রক্তবন্যা। অসংখ্য শিশু ও বৃদ্ধবৃদ্ধা হলো নির্মমভাবে নিহত। শত শত নারীর সম্ভ্রম হয়ে গেলো ধূলিসাৎ। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর

আগে রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়েছিলেন। সেখানে এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তার (the Cult of Nationalism) বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শান্তিবাদী মৈত্রীধর্মী ভারতের বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তৃতা জাপানের প্রাণে বড়ো আঘাত লেগেছিল। সেই আঘাত তারা কিছুতেই বরদাস্ত কোরতে পারে নি। নিজেদের সংশোধন করবার চেষ্টার বদলে তারা নতুনদেশভক্তির প্রতি করলে বিরক্তি ও আক্রোশ প্রকাশ।

এদিকে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের প্রকাণ্ড কালো মেঘ দলে দলে এসে জমা হতে লাগলো। হিটলারের অধীন জার্মানী আর মুসোলিনীর অধীন ফ্যাসিষ্ট ইটালী থেকে আরম্ভ হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা। হিটলার ও মুসোলিনী দুজনে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর মতন একজোট হয়ে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে ও ফ্রান্সে আরম্ভ কোরলে আক্রমণ। তারপরে লাগলো সেই যুদ্ধে একদিকে ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকা ও রাশিয়া আর অন্যদিকে জার্মানী ইটালী ও জাপান। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে শুধু ইউরোপ নয়, এশিয়ার অনেক দেশও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙলায় আমেরিকান সৈন্যবাহিনী নানা জায়গায় এসে নিজেদের ঘাঁটি কোরলে। ঐ সব আমেরিকান সৈন্যরা বাংলার সমাজদেহে নানারকম পাপ দুর্নীতি ও কদাচারের ব্যাধিবীজ সঞ্চার কোরে চ'লে গেলো। প্রায় প্রত্যেক রাত্রে জাপানী বোমারুর দলে দলে আকাশ-পথে এসে কলকাতা ও নানা জায়গায় বোমা ফেলা আরম্ভ হলো। শত শত নিরীহ নরনারী সেই দুর্যোগে প্রাণ দিলে। শান্তিপ্রিয় বাঙালী জাত ভয়ে উৎকণ্ঠায় চারিদিকে দেখতে লাগলো নরকের বীভৎস কুশ্রীতা। আর অনেকেই ভাবতে লাগলো—"এই কি সভ্যতা?"

উপনিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের প্রবর্ত্তিত বিশ্বপ্রাণতা বিশ্বপ্রেমের সাধনায় সাধনারত রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই বিভীষিকা দেখে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হলেন। ঊর্ধ্বাকথিত সভ্যতার কৃপ্তভাবে নরনারীরা সভ্যই যে পিশাচ পিশাচী রাক্ষস-রাক্ষসী হয়ে পড়ে তিনি তা স্পষ্টই দেখলেন। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে অনেক জঘন্য কুৎসিত রুচি ও প্রথা আমাদের মধ্যে শিক্ষিত ও ভদ্র অনেক নরনারীর মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে। তার ফলে আমাদের সমাজ-দেহে অনেক মারাত্মক ব্যাধি এসে দেখা দিচ্ছে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিক ও শান্তিবাদী জনসাধারণ পাশ্চাত্য জাতিদের সভ্যতার এই উৎকট ভীষণ রূপ দেখে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় শিউরে উঠলেন। তাঁদের প্রত্যেকের অন্তরে ঘৃণা অসন্তোষ বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে প্রকাশের ভাষা খুঁজতে লাগলো। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর সেই মর্ম্মব্যথা ক্ষোভ ও প্রতিবাদকে এই ভাবে প্রকাশ কোরলেন :—

"দেখিলাম একালের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা
দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার বিকৃতির কদর্য্য বিদ্রূপ।
একদিকে স্পর্দ্ধিত ক্রূরতা মত্ততার নির্লজ্জ হুঙ্কার।
অন্যদিকে ভীরুতার দ্বিধাগ্রস্ত চরণ বিক্ষেপ।
বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি কৃপণের সতর্ক সম্বল
বন্যন্থ প্রাণীর মতো ক্ষণিক গর্জ্জন অন্তে
ক্ষীণস্বরে তখনি জানায় নিরাপদ নীরব নম্রতা।
রাষ্ট্রপতি যত আছে প্রৌঢ় প্রতাপের মন্ত্রীসভাতলে
আদেশ নির্দ্দেশ রেখেছে নিশ্চিহ্ন করি
রুদ্ধ ওষ্ঠ অধরের চাপে সংশয়ে সঙ্কোচে।
এদিকে দানব-পক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
বৈতরণী নদীপার হতে। যজ্ঞপক্ষ ঝটকারিয়া
নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি, আকাশেরে করিল অশুচি।
মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক
শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী
শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে
ধিক্কার হানিতে পারি যেন।
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর
ঐতিহ্যের হৃৎস্পন্দনে,

কই কণ্ঠ ভয়ার্ত্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ রবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

—'প্রান্তিক' কাব্য

জীবনসন্ধ্যায় নিজের কোনও এক জন্মদিনে (১৩৪৫ বৈশাখ) কবিগুরু তাই এ সম্বন্ধে আরও নির্ভীক ও তেজস্বী ভাষায় বলেছিলেন :—

"ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসলোভে মত্ত যারা, একান্ত আত্মায় দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জ্জনাস্তূপ তব ঘেরি
বীভৎস চিৎকারে তারা রাত্রিদিন করে হেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারেবারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সন্দিগ্ধের ছলের বিস্তারে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্ব্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাবো, ব'লে যাবো—এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের।
নাট্যের কদর্যরূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
ঘৃণ্যশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাবো, দ্যূতচ্ছলে মানবের মূঢ় অপব্যয়
রচিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

—'সৈঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ, 'জন্মদিনে' কবিতা

আজ ইউরোপ ও আমেরিকা তার রাজনৈতিক আধিপত্য, অগাধ ঐশ্বর্য্য, বিপুল অস্ত্রশস্ত্রার, সুবিপুল সৈন্যবল প্রভৃতির অহঙ্কারে উন্মত্ত ও দিশেহারা। রোমাঁ্যা রোলাঁ, আইনষ্টাইন, বার্ণার্ড শ, বের্গসোঁ প্রভৃতি মানবপ্রেমিক মনীষীদের হিতবাণী রাষ্ট্র-পতিদের কানে যায় নি। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী জ্ঞানী গুণী মনীষী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা যুদ্ধ রাজ্যলিপ্সার ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করেছেন, কিম্বা এশিয়া আফ্রিকার নির্য্যাতিত জাতিদের স্বাধীনতা লাভ ও উন্নতির জন্যে কোন সমর্থন ও সহানুভূতি জানাতে লাহিত হন। এমন কি তাঁদের ঐ রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। যাঁরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মহান গৌরবময় ও কল্যাণকর দিকটির সাধক, আজ ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও রাজনৈতিক নেতাদের ঘোর-জুলুমে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করবার অধিকারটুকুও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নেই। মানুষের এতবড়ো অপমান বোধ হয় আর কোনযুগে হয় নি, যা এখনকার দিনে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী বর্ণবিদ্বেষী ও শোষণবাদী রাষ্ট্রনায়করা ও তাঁদের অনুচরেরা করছেন। তবে একথা সত্য—অধর্ম্ম ও অন্যায় কিছুকালের জন্যে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করলেও একদিন তাদের সমূলে ধ্বংস নিশ্চয়ই হয়। অমাবস্যার রাত্রি যতই দুর্যোগময়ী ও অন্ধকারময়ী হোক না কেন—তা কখনই চিরস্থায়ী হয় না। ক্রমেই তার শেষ হয়। পূর্ব্বদিগঞ্চল স্বর্ণবর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত করে উদয়-সূর্য্য এনে দেয় নবীন প্রভাত। তাই আজ পৃথিবীতে এই অন্যায় অবিচার অনাচার প্রবল চলেও, একদিন আসবে সমস্ত বঞ্চিত শোষিত মানবের মুক্তি শান্তি সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের শুভদিন।

পৃথিবীর দেশে দেশে আজ যারা শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ পুঁজিবাদ শোষণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড শিলাতলে নিষ্পেষিত—একদিন সেই দীন নিঃস্ব সর্ব্বহারার দলই প্রচণ্ড শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উচ্ছেদ করবে এই অন্যায় বৈষম্য ভেদনীতি ও শোষণবাদের শয়তানি। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বনিকাপাত সেদিন হবে চির বিলুপ্তি। ইউরোপে সেদিন দেখা দেবে একতা মৈত্রী শান্তি ও সহযোগিতা। পৃথিবীর দেশে দেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ভ্রাতৃত্ব একতার আসনপ্রদান। সেদিন এশিয়া ও আফ্রিকার প্রত্যেক দেশেও জনসাধারণ পাবে স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অধিকার। অত্যাচার অবিচার বৈষম্যের নীতি কখনই চিরস্থায়ী হয় না। তার শেষ, তার ধ্বংস আছেই—একথা রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর দেশে দেশে বারবার বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন। কবির দৃষ্টি নিয়ে ভারতের বরেণ্য কবি

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবীর ভাবীযুগের শান্তি প্রেম একতা ও সমৃদ্ধির ছবি দেখে তাই ব'লে গেছেন:—

"সভ্য শিকারীর দল
পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল
ভুলে গেলো আত্মপর,
আদিম বন্যতা তার
উদ্‌ঘাটিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।

এ পাপ যুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বীবেশে
চিরাভ্যস্ত সন্ধ্যাতারে আসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে।"

—'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থ, ২১ সংখ্যক কবিতা

আচার্য্য শঙ্করের প্রতি

শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী

ধর্ম্মনামে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘৃণ্য অনুষ্ঠান
একদা এ দেশে বহু শতবর্ষ ধ'রে,
নরকের বিভীষিকা বিস্তারিয়া ছিল বিদ্যমান
অসংখ্য মানবে মুগ্ধ অভিভূত কোরে।
বেদের মহান ধর্ম্ম বিস্মরিয়া এই দেশবাসী
ছিল রত শত শত কুৎসিত আচারে।
চারিদিকে অনাচার দুর্নীতি ও পাপ রাশিরাশি।
ঢেকেছিল আর্য্যভূমে তমিস্র আঁধারে।
অধর্ম্মের সে আঁধার উদ্ভাসিয়া দেখা দিলে তুমি
প্রভাতের সূর্য্যসম অমিত গৌরবে।
তব শুভ আবির্ভাবে ধন্য হলো এ ভারতভূমি
মন্ত্রিল আশ্রমে পুনঃ বেদমন্ত্র রবে।
দিব্যজ্ঞান দীপ্তমূর্ত্তি হে শঙ্কর শিব-অবতার,
ব্রহ্মবিদ্যা বিমণ্ডিত অদ্বৈত-ভাস্কর,
তোমার বিচিত্র শক্তি আর্য্যধর্ম্মে করিল উদ্ধার,
এলো ফিরে স্বর্গলোভা অনিন্দ্য সুন্দর।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পাদপদ্মতলে
স্মরি তব জীবনের পুণ্য লীলাকথা।
তোমার আদর্শে যেন ভারতের সন্তান সকলে
করে যেন উদ্দীপিত হে ধর্ম্মপ্রদাতা।

সঙ্ঘবার্ত্তা

ধর্ম্মালোচনা—প্রত্যেক সপ্তাহে প্রতি সোমবার হইতে শুক্রবার ছয়দিন ধরিয়া পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যা সাতটার সময় শ্রীমদ্ ভাগবতম্ শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্তন—প্রতি শনিবার বিকালে তিনটার সময় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীরামনাম-কীর্ত্তন ও অন্যান্য ভজনগান গাহিয়া থাকেন।

কথকতা—প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আরতির পরে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত কথকতা করিয়া থাকেন।

STUDENTS
COMMON-ROOM

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ : ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

সম্পাদক—স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

—১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী হসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বানার্জী কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

সূচীপত্র

১।	বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪২
২।	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেবতা ও মানুষ	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত	১৪৭
৩।	তন্ত্র ও বেদান্তের সমন্বয়	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	১৫১
৪।	বাংলা-কাব্য ও যুগ মানস	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	১৫৪
৫।	শেষ আশা (কবিতা)	শ্রীকালিপদ কোঙার	১৫৯
৬।	সতীদাহ-কুপ্রথার উচ্ছেদ আন্দোলন	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর	১৬০
৭।	নিবেদিতা (কবিতা) ...	শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার ...	১৬৩

মোটর গাড়ার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্ মিক্কুকার প্রাইভেট, লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

৮।	মন ও মানব	শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ	১৬৪
৯।	সত্য	শ্রীজনা সমাদ্দার	১৬৯
১০।	স্বর্গ কথা কয় (কবিতা)	শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১
১১।	৺শ্রীকেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ পরিক্রমা	ব্রহ্মচারী অমীম চৈতন্য	১৭৩
১২।	গান (কবিতা)	শ্রীভাস্করচন্দ্র রায়	১৭৭
১৩।	ঈজিপ্ট সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত	শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী	১৭৮
১৪।	মরীচিকা	শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮১
১৫।	সেলিউকস কি পরাজিত	শ্রীকালীপদ হোড়	১৮২
১৬।	শ্রীবুদ্ধ স্মরণে	স্বামী দুর্গানন্দ	১৮৪
১৭।	ব্রহ্ম বিহার	শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়	১৮৬
১৮।	প্রাণাগম বিজ্ঞান	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	১৮৭
১৯।	সঙ্ঘ বার্ত্তা	—	১৯২

"বিশ্ববাণী"-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY & CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ, বসু, এণ্ড কোং (ডেকরেটর্স্)

৫২নং ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

ফোন :—বড়বাজার ১৬২৫

বিশ্ববাণী

অষ্টাদশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৬৩ | চতুর্থ সংখ্যা

বিবেকানন্দ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ.

যাদের জীবনাদর্শে
পৃথিবীর উত্থানের
ইতিহাস গড়া—
যারা দিলো বক্ষে তার
প্রাণ মধু ভরা,
দিলো রূপ দিলো সুর
বিচিত্র মধুর!
জ্বালালো জীবন প্রদীপ
ছড়ালো সুগন্ধ।
সেই যুগ সারথী মহামানবের
অনুগামী তুমি
হে বিবেকানন্দ।
মাতৃ অঙ্কে জন্ম লভি'
যদি পুনর্ব্বার,
মহামানবের মহামন্ত্রে
দীক্ষা নাহি হয়—
অজানায় লক্ষ সম্ভাবনা
বুকে বুকে কুঁড়ি হয়ে রয়,
সেই কুঁড়ি ফুল হয়ে
নাহি মেলে আঁখি:
বৃন্তি রাখে জীবনেরে ঢাকি'।
কামনার কারাগারে
শৃঙ্খলিত থাকি'
মুক্তি লাগি' করে যারা রণ
তাই হয় জীবনের
মিথ্যা প্রহসন।
দীক্ষাহীন জীবনের
প্রতিপদক্ষেপ,
জীবন ঘিরিয়া আনে
সহস্র বিক্ষেপ—
আনে ভুল বিভ্রান্তির
সহস্র জঞ্জাল:
মানুষের রূপে হাসে
প্রেতের কঙ্কাল।
এই সত্য প্রকাশিলে
আপনার মাঝে

ইষ্টনিষ্ঠ চলনার
নিত্য প্রতিকাজে,
রেখে গেলে জীবনের
আদর্শ মহান ;
"রামকৃষ্ণ" ভগবানে
করি আত্মদান।
রেখে গেলে শাশ্বত
অনন্তের বাণী
প্রতি ঘরে হলো
জানাজানি,
গুরুহীন, দীক্ষাহীন
জীবন চলন :
আত্মহত্যারূপে তাই
জাতীয় মরণ।
আচার চরিত্র হীন
ব্যক্তি দিয়ে কভু,
নাহি গড়ে পরিবার
রাষ্ট্র ও সমাজ
ব্যর্থ হয় জীবনের কাজ।

ব্যক্তি সাধ্য তুচ্ছ করি'
সমষ্টির সাধ্য লাগি'
সাজাইলে অর্থহীন
কথার বেসাতী
ধুকে মরে অন্ধকারে
জন সাধে জাতি।
জীবন গড়িতে হলে
চাই গুরু জীবনীয়
সর্ব্ব সমন্বয়ী,
এই পথ চিরন্তন
জীবনের পথ—
এই পথে হতে হবে জয়ী।
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত
হে বিজয়ী
শুদ্ধ মহাপ্রাণ—
তোমার স্মরণে গাহি
জীবনের
জীবনীয় গান।

জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে প'ড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

"প্রাচীন বাংলা সাহিত্য দেবতা ও মানুষ"

শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত

গত ফাল্গুন সংখ্যার "বিশ্ববাণীতে" "দেবতার অন্তরালে বাংলা সাহিত্য" নামে যে নিবন্ধটী বাহির হইয়াছে,—সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যই এই প্রবন্ধের ভূমিকা।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ইহার উপর কতখানি প্রভাব রাখিয়াছে: বাঙালীর জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, উত্থান পতনের আলো ছায়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক যোগ কতখানি, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই বিচার্য্য বিষয়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজত্বের পর বাংলাদেশে ব্যাপক অরাজকতা চলিতে থাকে, যাহা ইতিহাসে 'মৎস্য-ন্যায়' নামে প্রসিদ্ধ। এক শতাব্দী ধরিয়া এই অরাজকতা চলিবার পর বাংলার জনসাধারণ গোপাল নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহা ৭৬৫ খৃষ্টাব্দের কথা। গোপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল দিনাজপুর জেলার পাহাড়পুরের সোমপুরে এক মহাবিহার স্থাপন করেন। তারপর প্রথম মহীপালের নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধ তিব্বতে গমন করেন। পালরাজগনের যুগে নরপালের সময় বিখ্যাত বৌদ্ধ বাঙালী অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিব্বত গমন করেন এবং বাংলার চিত্রকলা নেপাল তিব্বতী চিত্রকলার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাহাহইলে আমরা দেখিতে পাই ১০৮২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পালরাজগণ বাংলা শাসন করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম তিনশতাব্দীর অধিককাল বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে।

এইবার ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের কতখানি যোগ আছে দেখা যাক। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ শশাঙ্কের রাজত্বকালের পর বাংলার প্রথম পদ রচয়িতা সরহের নাম পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বনাম রাহুলভদ্র। ইনি বাঙালী ছিলেন। শুধু তাহাই নয়, সরহ বৌদ্ধ সহজযান তত্ত্বের প্রধান সাধক এবং একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। সুতরাং "সহজযান ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বাংলাদেশ বোধহয় কিছু বিরূপ ছিল।"—এই উক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কথায়—"তাঁহার (সরহ) সময় হইতেই বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা সমগ্র ভারতে বিস্তৃতিলাভ করে।" ৮০০-৮৫০ খৃষ্টাব্দে সরহের রচিত চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। অতএব বাংলাসাহিত্যে "দশম শতাব্দী" নয়, সপ্তম শতাব্দী হইতেই চর্য্যাপদের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই চর্য্যাপদ—"বাংলাভাষার ভ্রূণ অবস্থাতেই একটা ধর্ম্মচেতনাকে অবলম্বন করিয়া"—ছিল না, তাহার প্রমাণ সরহের রচিত একটি পদে আছে।—

"বাটত ভঅ খাণ্ট বি বল আ"

অর্থাৎ পথে খড়্গধারী বলবান দস্যুর ভয় আছে। ইহার সহিত ধর্ম্মচেতনার কোন সম্বন্ধ নাই, বরং সেকালে জলপথে দস্যু তস্করের উপদ্রবের কথাই বলা হইয়াছে।

চর্য্যাপদে লৌকিকতার আরও দুএকটী উদাহরণ দিতেছি। কুক্কুরী পাদের একটি চর্য্যায় বলা হইয়াছে —"শ্বশুর ঘুমাইয়া আছেন, কিন্তু বধূর চোখে নিদ্রা নাই। তাহার কানের সোনা চোরে চুরি করিয়াছে। কাহার কাছে গিয়া বৌটি সোনা চাহিবে। দিনে বধূটী কাকের ডাকে ভয় পায়, রাত্রে সে যায় কামরূপ।"

শবর-পাদের একটি চর্য্যায় দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। নেশায় উন্মত্ত স্বামীকে- স্ত্রী বলিতেছে—"উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, পাগলামী করিও না,—সোহাই তোমার। (আমি) তোমার নিজ ঘরণী, নাম সহজ সুন্দরী।"

ধর্মচেতনার পরিবর্তে একটি বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় চর্যাপদে পাওয়া যায়।

ইহার পর রামায়ণ-মহাভারত। মহাভারতের বহুপূর্বে রামায়ণের অনুবাদ হইয়াছিল। তাহারও পূর্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়েই বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হয়। কবি কৃত্তিবাস চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেষভাগে রামায়ণের অনুবাদ করেন। কেননা পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে সিকন্দর শাহ ও তৎপুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম বাংলার ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। শিল্পে ও সাহিত্যে এই সময় বাংলাদেশ অগ্রসর ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির এই উন্নতির সময়ে কবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব। ব্যক্তিগত জীবনে কৃত্তিবাস যে সামাজিক বিরুদ্ধতার মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে, এবং চীনের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ স্থাপনের রাষ্ট্রীয়-গরজাগরণের ক্ষেত্রে—কবির হাতে রামচন্দ্রের মধ্যে খাঁটি মানুষের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল বলিয়াই বিশ্বাস। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন এবং রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণের মতে রামায়ণের এই বিকৃতি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা ঘটিয়াছিল। সুতরাং—"রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের হাতে অনেকাংশে তুরীয়লোকে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্বের ক্রান্তিরেখায় সঞ্চরমান।"—এই উক্তির বাস্তবতা কতদূর?

মহাভারত সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলা চলে। কাশীরামদাসের পূর্বে সঞ্জয়, বিজয়পণ্ডিত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশীরামদাস ইহাদের অনুবাদিত গ্রন্থ সম্মুখে রাখিয়া মহাভারত রচনা করেন। ঐতিহাসিক প্রমাণানুসারে কাশীরামদাস ষোড়শশতাব্দীর লোক এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মহাভারত রচিত হয়। ভারতের ইতিহাসে এই সময় মুঘল রাজত্বের সূচনা এবং বাংলার 'বার ভূঞা'রা এই যুগেই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তাহাড়া এই ষোড়শ শতকেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে মহাপ্লাবন আনিয়াছিল, তাঁহার সুন্দর, পবিত্র জীবনযাত্রা বাঙালীর হৃদয়ে জীবনাদর্শের যে বীজ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল, তাহারই পরোক্ষ ফল কাশীদাসী রচনায় পাওয়া যায়। এই জন্যই দেবত্ব ও মানবত্বের সমন্বয়ে একটি মহত্তর চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। অদ্ভুত কূট-কৌশলী, মানব চরিত্রে বিশেষজ্ঞ (মনস্তত্ত্ববিদ্) ও ভবিষ্যত দ্রষ্টা, (যাহাকে অনেকেই দেবত্বশক্তি বলিয়া অভিহিত করেন) ইচ্ছাশক্তি চালনাকারী, (will force) এবং শাস্ত্রজ্ঞানী করিয়া কাশীরামদাস দেখাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকে। ইহাতে তাঁহার অপরাধ কোথায়? যুগ ও কালকে কেহই এড়াইতে পারেন না। কাশীরামদাস যতই মহৎ কাব্য-রচনা করুন, যুগোচিত প্রভাব তাঁহার রচনায় থাকিবেই। এই মহাভারতের পরিকল্পনা সেই সময়েই আকবরের কর্মে ও ধর্মে পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলি রামায়ণ-মহাভারতের সমসাময়িক কালে রচিত হইয়াছিল। এখন ইহার সহিত ঐতিহাসিক বাংলার কোন যোগ আছে কিনা দেখা যাক।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রাজা গনেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুত্র যদু জালালদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসেন। তিনি নির্দয়ভাবে হিন্দুদের নির্যাতন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ষড়যন্ত্র ও হত্যা বাংলার ইতিহাসের অন্তর্গত। অবশেষে হুমায়নশাহ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময়েই অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়গুপ্তের মনসার ভাসান রচিত হয়।

'চণ্ডীর গান' রচনায় যে দুইজন প্রাচীন কবির নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা মাধবাচার্য্য এবং কবি জনার্দন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আকবর যখন হিন্দুমুসলমান-ধর্ম-সমন্বয়ের কারণে দেশের মধ্য কতকগুলি বাধ্যতামূলক আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন বাংলায় এবং আরও কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়। সেই সময় অর্থাৎ সেই ১৫৭২ খৃষ্টাব্দেই মাধবাচার্য্যের 'চণ্ডীর গান' লিপিবদ্ধ হয়। কবি জনার্দনও তেমনি ১৭শ খৃষ্টাব্দে

ঔরঙ্গজীবের হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, জিজিয়া কর ধার্য্য এবং দেবমন্দির ধ্বংস করিবার সময় 'চণ্ডীর ব্রতকথা' লিখিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যায়, বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রভাব হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি গান রচিত হইয়াছিল। দেবদেবীর নামে জনসাধারণের মন-হরণ করা সেকালে সহজ ছিল বলিয়াই এই সমস্ত কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই মঙ্গলকাব্যের ভূমিকা।

এবার মঙ্গলকাব্যের কাব্যগুণ বিচার করা যাক্। এতগুলি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য বিচারে বাংলা-সাহিত্যে চিরকালের স্থান পাইবার যোগ্য। সুতরাং "ইহারা বাংলাসাহিত্যের কলেবর পুষ্টির সহায়তা করিয়াছে" শুধু নয়; কতকগুলি আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির জন্য বিশ্বসাহিত্যে না হোক, বাংলাসাহিত্যে ইহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট। 'মনসামঙ্গলের' চাঁদ সদাগরের অনমনীয় পৌরুষ, 'চণ্ডীমঙ্গলের' শ্রীমন্তের কৈশোরোত্তীর্ণ বয়সে সাগর পাড়ি দিবার দুঃসাহস, কালকেতুর শক্তিচর্চ্চা উত্তরকালে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে কি কোন রেখাপাত করে নাই? 'ধর্ম্মমঙ্গলের' রঞ্জাবতীর আত্মোৎসর্গ, 'মনসামঙ্গলের' বেহুলার মরিতের প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার অটুট সংকল্প কিংশ শতাব্দীর মানবতা বোধের মধ্যভাগ অপেক্ষা কি কিছু সামান্য? সুতরাং মঙ্গলকাব্য কেবলমাত্র "বাংলাসাহিত্যের কলেবর পুষ্টি" করে নাই,—বাংলার রাজনৈতিক দুর্দ্দিনে ধর্ম্মচেতনার সংবদ্ধ এবং শক্তিশালী একটি জাতি গড়িয়া তুলিবার পথের সহায়ক।

বৈষ্ণব কাব্যের রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যোত্তরকালে শুধুমাত্র দেবতারূপে দেখা দেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের কথায়—"প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেমকবিতায় ধর্ম্মের প্রেরণা একান্তই গৌণ ছিল। কাব্য প্রেরণাই সেখানে আসল কথা।...রাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে প্রেম-কবিতার আলম্বন-বিভাবমাত্র। তাহার অধিক আর কিছুই নহে।"

চৈতন্যপূর্ব্ব যুগে অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের কবিরা শুধুমাত্র বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেন নাই। কবি জয়দেবও পার্থিব প্রেম বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্তের মতে—"সদুক্তি-কর্ণামৃতেই তাহা উদ্ধৃত রহিয়াছে।" এই জন্যই "গীত গোবিন্দের" কবি হরি স্মরণে মনকে সরস করা অপেক্ষা বিলাস-কলা-কুতূহলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন বেশী। ইহা ছাড়া তৎকালীন কবিদের পার্থিব প্রেম-মূলক কবিতা পরবর্ত্তীকালে রাধাকৃষ্ণের কবিতায় রূপগ্রহণ করিয়াছে। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' একটি পার্থিব প্রেমের শ্লোক :—

"যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছে, সেই আজ আমার বর। সেই অন্ধকার নিশি, সেই বিকশিত কুসুমের সুরভি, কদম্ববনের বায়ু, আমিও সেই আছি,—তথাপি সেই বেতসীবনের সে সব গুপ্ত সুরত ব্যাপারের লীলা, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

ইহা পরবর্ত্তীকালে রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলীতে' রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতারূপে স্থান পাইয়াছে—ইহার অঙ্গসৌষ্ঠবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনসহ, তাহা বলা বাহুল্য।

'অমরু শতকের' অমরু, 'নলচম্পূর' ত্রিবিক্রম, ধীপক প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের পার্থিব কবিতায় পরবর্ত্তীকালে দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন যুগের সাহিত্য কেবলমাত্র দেবতার দেবত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিল না,—পার্থিব বিষয়েও যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে।

এবার—"উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বাবধি দেবতার অতিপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল;...চর্য্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ অবধি সেই একই স্রোত।"—ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। ১৭১২ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের জীবিতকাল। বাংলার ইতিহাসে এই সময় নবাব আলিবর্দ্দীর ও সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল। বর্গীদের উপদ্রবও লুণ্ঠন এবং পলাশীর যুদ্ধ এই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। বর্গীদের লুণ্ঠনে এবং ইংরাজদের অর্থ-

শোষণে বিত্তবান ছাড়া দেশের জনসাধারণের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভারতচন্দ্র দেব-দেবীর মাধ্যমে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের আলেখ্য অধিকাংশ স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলের' "হরগৌরীর কোন্দলে, বাঙ্গালীর সংসারে দাম্পত্য-কলহের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র বিনা
বেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥"

ইহার সহিত বর্তমান গ্রাম্যবাংলার অতি প্রচলিত প্রবাদ—"ভাতকাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।"—ইহার কি মিল নাই?

আর একটি কবিতা "অন্নদা-পাটনী-সংবাদ।" ইহাতে মাঝি এবং ছদ্মবেশিনী দেবীর প্রথম পরিচয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তববোধ রহিয়াছে। গৃহস্থের কোন কুলবধূকে ঘাটে একা দেখিয়া বিস্ময়বোধ করা পাটনীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয় এবং এই উক্তিও তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক—;

"পরিচয় না দিলে করিতে নাহি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফোর ফার॥"

অতঃপর অন্নদার আত্মপরিচয়ের পর দেবীর নিকট পাটনীর প্রার্থনা তৎকালীন দরিদ্র, ধর্মভীরু ও নির্লোভ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।" সাক্ষাৎ-আবির্ভূত দেবতার নিকটে এমন ক্ষুদ্র প্রার্থনা কে করিয়াছে? ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতে গেলে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলালের কথায় বলিতে হয়—"বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সেই প্রথম একজন বড়দরের কবিশিল্পীর অভ্যুদয় হইয়াছিল।"

এখন "এই ঐশ্বরিক প্রবণতার চাপে পড়িয়া বাংলাসাহিত্যের অগ্রগতি প্রত্যাহত, বরিঞ্চ কলেবর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। এতগুলি দেবতার শোভাযাত্রা বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতাই সূচিত করিতেছে।"—এই উক্তির বাস্তবতা কতখানি?

এ সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর এক জনপ্রিয় প্রতিভা (বিবেকানন্দ) বলিয়াছেন—"ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস,—মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন। আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সিবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়ে এখনও বেড়াচ্ছেন। ঐ যে মা কালী; উনি চীন, জাপান পর্যন্ত পুজো খাচ্ছেন।"

সুতরাং ভারতচন্দ্রের শিব এবং রামপ্রসাদের মা কালী বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে আসিয়া বোধকরি এমন কোন অন্যায় করেন নাই?

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ঋষি শ্রীঅরবিন্দের কথায় —"ভারতবর্ষ যদি তাহার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বর্জন করে, তবে তাহা শোচনীয় ব্যাপারই হইবে।" তাহা হইলে এখন আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে দেবতার প্রসার বাঙালী চরিত্রকে দুর্বল করে নাই,—বরং এই আধ্যাত্মিকতার সোপান বহিয়া বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্য শুধু প্রতিহারী হইয়া নাই। তাহার জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলীর' অতীন্দ্রিয়বাদ তাহার প্রমাণ।

আধ্যাত্মিকতার পুষ্ট যে জাতি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম দিয়াছে, জন্ম দিয়াছে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের,—সে জাতির সাহিত্য গৌরবের সামগ্রী সন্দেহ নাই। বাংলার স্বভাব-ধর্মকে বাঙালী অস্বীকার করে নাই। আবেগের সহিত যুক্তি, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতা, দেবত্বের পাশে মানবতাবোধ আছে বলিয়াই তাহার সাহিত্য আজ প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ, সত্য ও সুন্দরের সমাবেশে উজ্জ্বল।

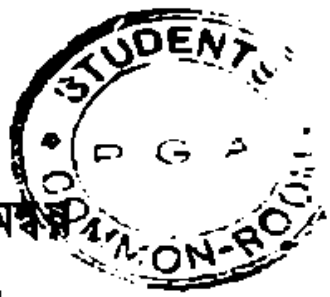

তন্ত্র ও বেদান্তের সমন্বয়

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

যখন কোন ভেল্‌কী ওয়ালা বাজী দেখায়, তখন বাজীটা যে মিথ্যা তা আমরা বেশ বুঝি, কিন্তু তবু আমরা বাজী দেখে মুগ্ধ হই, সাময়িক ভাবে বাজীটাকে সত্য ব'লে মনে করি, কিন্তু ভেল্‌কী-ওয়ালা যে আসল সত্য ও বাজীটা যে মিথ্যা এতে কোন সন্দেহ করি না। বাজীওয়ালা তার ভেতরের কৌশল দিয়ে বাজী বিস্তার করে। সকল দর্শককে মুগ্ধ করে, শেষে সব বাজী নিজের ভেতর গুটিয়ে নিয়ে সে নিজেই অবস্থান করে। সেই রকম যিনি সর্ব্বোচ্চ মহেশ্বর বা পরমাত্মা যিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তিনিই একমাত্র সত্য। তিনি যখন এই জগৎরূপ ভেল্‌কী দেখাতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর শক্তিকে আশ্রয় ক'রে এই জগতের প্রকাশ করেন। শক্তি ভিন্ন কোন ক্রিয়া হয় না। এই শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকে বলে সগুণ ব্রহ্ম। তদ্‌ব্রহ্ম যিদ্‌গুণং যত্র সগুণং নির্গুণং শিবম্। অতএব পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম যিনি বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষ, তিনিই তাঁর শক্তি সহযোগে সগুণ হন। তাই বলা হয়েছে মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতস্ত নির্গুণঃ। নির্গুণ ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা ভাষায় কেহই এপর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন নি। কোন উপমা দিয়েও গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝানের উপায় নাই। ব্রহ্ম অখণ্ড বস্তু অতএব বাক্যমনাতীত। ইনিই তুরীয়ং চতুর্থম্। এই ব্রহ্মের দ্বিতীয় কেহ নাই।

এখন যদি বলা যায় যে এরূপ থাকুন আর না থাকুন তাতে আমাদের প্রয়োজন কি? এর উত্তর এই—ঐ যে উত্তালতরঙ্গ রাজি সমুদ্র বক্ষোপরি সদা চঞ্চল, নৃত্য পরায়ণ, উহাদের ঐ নৃত্য কি সম্ভব হ'ত যদি উহাদের তলদেশে চঞ্চলতা হীন স্থির সমুদ্র বিরাজিত না থাকত? তা যেমন হয় না, সেইরূপ এই জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ পূর্ণ জগৎ ভেল্‌কীর ও সম্ভাবনা হ'ত না, যদি উহার পশ্চাতে—উহার আধার স্বরূপ ব্রহ্ম না থাকতেন। ঐ নির্গুণ সত্তাই হলেন এই জগৎরূপী আবেশের আধার। তিনি একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ। তাঁর চিৎসত্তা তাঁর সহিত অভেদ তাঁর মায়াশক্তির উপর প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ঐ শক্তিও চৈতন্যময়ী—। তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ, এবং তিনি সত্তা ও আনন্দ স্বরূপ। এই জন্য তাঁকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ। তবে তাঁতে আমাদের প্রয়োজন নাই একরূপে বলা যায়—, কারণ এরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনার উর্দ্ধে। আমাদের প্রয়োজন সগুণ বা শক্তি-যুক্ত ব্রহ্মকে লয়ে, কারণ তিনিই উপাসনার যোগ্য। আমরা যে উপাসনা করি তা—শক্তিযুক্ত চৈতন্যের উপাসনা বা চৈতন্যযুক্ত শক্তির উপাসনা। শক্তি তত্ত্ব ও এক বিরাট তত্ত্ব, উহাকে বুঝাও বড় একটা সহজ ব্যাপার নয়।

যখন এক ব্যক্তি ক্রিয়াহীনরূপে অবস্থান করেন, তখন আমরা তাঁর কোন প্রকার শক্তির বিকাশ বুঝতে পারি না। লোকটী হয়ত একজন বক্তা বা লেখক বা কোন শারীরিক কষ্টসাধ্য কর্ম্মসম্পাদনে পটু। যখন তিনি ঐ সকল কাজ করেন অর্থাৎ বক্তৃতা দেন বা লেখেন তখন তাঁর ঐ ঐ শক্তির পরিচয় আমরা পাই—। কাজ করার পূর্ব্বে শক্তি তাঁর অভ্যন্তরে সুপ্তভাবে ছিল। ঠিক এই রকম যখন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন, তখন সব শক্তি তাঁর ভিতর সুপ্তভাবে থাকে, যখন তিনি সগুণ হন, অবশ্য স্বরূপতঃ নির্গুণ থাকলেও তখন তাঁর শক্তির বিকাশ আমরা দেখতে পাই। অতএব সগুণ ব্রহ্মের দিক অপেক্ষা শক্তির দিকটাই বেশী প্রকট। শক্তিতে ব্রহ্মভাবের কাজ চৈতন্যসঞ্চার—। এই চৈতন্য জগতের নিমিত্ত কারণ আর স্বয়ং শক্তি

জগতের উপাদান কারণ। এসম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে মাকড়সার উপমা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সৃষ্টিব্যাপারেই অনন্তশক্তির সব কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সৃষ্টিতত্ত্বটা বিরাট শক্তির একটা বহিরঙ্গমাত্র। শক্তি অনন্তরূপিণী হেতেতু এই শক্তি ও অনাদ্যনন্ত ব্রহ্ম জল ও জলের হিমশক্তির ন্যায় অভেদ। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিকে তিনভাগে এইরূপে ভাগ করা হয়েছে :—

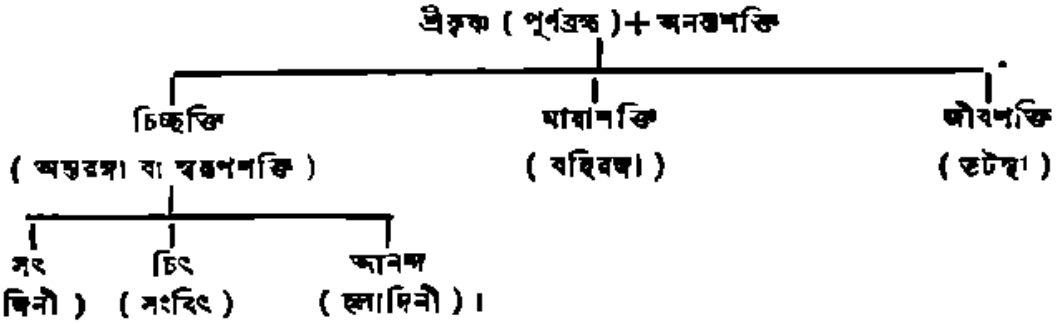

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত অভেদ তাই উহা তাঁর স্বরূপ এবং উহাই চিৎ এবং যাহা চিৎ বা জ্ঞান, তাই সৎ ও আনন্দ স্বরূপ। বৈষ্ণব দর্শনের এই অভেদ ব্রহ্ম শক্তিই বেদান্তের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। যিনি অনন্তশক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সনাতন পূর্ণব্রহ্ম। যে শক্তির দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি—হয় উহা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। এই শক্তিকেই বেদান্তদর্শন মায়া—বা অবিদ্যা বলেছেন পূর্ণশক্তির ইহা একতৃতীয়াংশ মাত্র এবং বেদান্তে এইজন্য বলা হয় যে শক্তি ব্রহ্মের একদেশে অবস্থিতা। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানী ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। অর্থাৎ ব্রহ্মের একপাদে এই জগৎ ও ত্রিপাদ কূটস্থ। ঁ অথবা ¼অংশে মায়াশক্তি এ ল'য়ে তর্ক বিতর্কের কোন প্রয়োজন নাই, ব্যাপারটা এই যে বহিরঙ্গাশক্তি ব্রহ্মের সামান্য অংশেই অবস্থিতা।

গীতাতেও উক্ত হয়েছে বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। তিনি এক অংশ মাত্র দ্বারাই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধারণ ক'রে আছেন, তাঁর অনন্ত শক্তি তাঁর সহিত অভেদে অবস্থিতা। তাঁর এই স্বরূপ শক্তির মধ্যে সন্ধিনী বা সৎ, সংবিৎ বা চিৎ এবং হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ বর্ত্তমান। এই হ্লাদিনী শক্তিই ঘনীভূত প্রেম যাহা হতে মহাভাবের আবির্ভাব হয়—এবং শ্রীমতী রাধারাণী মহাভাব স্বরূপা ঘনীভূতা কৃষ্ণপ্রেম। মাধুর্য্যময় কৃষ্ণপ্রেমের ঘনবিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীমতী। 'সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ নিজের প্রেম নিজে আস্বাদন করার জন্য নিজের ভেতর হ'তে এই শ্রীরাধাকে বাহির করেছেন।' (শ্রীরামকৃষ্ণদেব)। অতএব সমুদয় আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তির যা নির্যাস তাই শ্রীমতী রাধারাণী। আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ ও আনন্দময়ী শ্রীরাধা স্বরূপে একই। জীব ও উপাসনার চরম অবস্থায় যখন সমাধিমগ্ন হয়, তখন সে তার স্বাতন্ত্র্যকে ঐ যুগলের মধ্যে হারিয়ে ফেলে, তখন তার আর ব্যষ্টিত্ব থাকে না। থাকবেই বা কেন? সে তো আর ব্রহ্ম ব্যতীত একটা পৃথক বস্তু নয়। মায়াশক্তি প্রভাবে সে তার ব্রহ্মভাব বা স্বরূপ ভুলে গিয়ে নিজের ওপর অভিমানাত্মক একটা 'আমি'র আরোপ করে নিজেকে একটু ক্ষুদ্র কিছু মনে করছে বইতো নয়। ব্যাঘ্রশিশু নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে নিজের ওপর মেষত্ব আরোপ করেছে বইতো নয়। জীব ত তাঁরই তটস্থা শক্তি। শ্রীগীতা বলেন।

'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫

অর্থাৎ আমার জীবস্বরূপা অন্য একটী চেতনরূপা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে যাকে বলা হয় পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতিই সমুদয় অপরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ। সাধনার চরমে যখন জীবরূপী ব্যাঘ্রশিশু নিজের ওপর আরোপিত মেষত্ব ভ্রান্তি দূর করতে সক্ষম হয়, তখনই স্বরূপ জ্ঞান লাভ ক'রে সে—পরমানন্দ ঘন শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক হ'য়ে যায়।

ভক্তি যোগে সাধনায় ইহাই পরাকাষ্ঠা। এইরূপ সাধক সগুণকে অবলম্বন ক'রে চরমে নির্গুণের সহিত এক হ'য়ে যায়। জ্ঞানযোগীগণও বিচার পথে সাধনা করতে করতে চরমে স্বরূপ জ্ঞানে উপনীত হন। পথের পার্থক্য থাকলেও সিদ্ধিলাভের চরম অবস্থায় একই অদ্বৈতানুভূতিতে কোন পার্থক্যই থাকে না। পথের পার্থক্য থাকতেই পারে। কারণ সকলের মনোবৃত্তি বা সাধন সামর্থ্য ত এক রকম নয়। সকল সাধকের পক্ষে একই রকমের উপাসনার ব্যবস্থাদান সকল রোগের জন্য একই প্রকার ঔষধ দেওয়ার মত হাস্যকর ব্যাপার। সগুণ ও নির্গুণের বিচারে আমরা দেখলাম বৈষ্ণব সাধকগণ বা জ্ঞানপথের পথিকগণ চরমে একই স্থানে পৌঁছাইয়া থাকেন। এইবার শৈব ও শাক্ত সাধকগণের সাধন ও বিচার প্রণালী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করা যাক।

ইহারাও সগুণ ব্রহ্ম বা শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন ও অন্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। শৈবগণের উপাস্য হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ শিব ও শাক্তগণ সচ্চিদানন্দময়ী মহাবিদ্যাকে উপাসনা করেন। একের পিতৃভাবে ও অপরের মাতৃভাবে উপাসনা। যে মায়া জীবের বন্ধনের কারণ, তিনিই আবার মহামায়ারূপে বন্ধন-নাশিনী। এই মহাশক্তি মহামায়া কারণরূপে অব্যক্ত শিব, কার্য্যরূপে ব্যক্ত। মায়ার অব্যাকৃত অবস্থাই তুরীয়ং চতুর্থম্ মায়ার আত্যন্তিক নাশ নাই, তবে মহামায়ার কৃপায় যিনি মুক্তিলাভ করেন, তাঁর নিকট আর মায়া থাকেন না। এই অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রেই বেদান্তী মায়াকে মিথ্যা বলেন। কিন্তু জীবের যতক্ষণ অহংবোধ থাকে, ততক্ষণ মায়াশক্তিকে মিথ্যা বলার উপায় নাই, ততক্ষণ শক্তির এলাকা। শাক্তগণ শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই বলেন নির্গুণ ব্রহ্ম বা নিষ্কল শিব। যে শক্তি ত্রিগুণাতীতা, তিনিই—ত্রিগুণময়ী। প্রথমোক্ত অবস্থাটি তাঁর স্বরূপ, ২য়টী লীলামূর্ত্তি। লীলায় তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কারিণী। তিনি নিরাকারাপি সাকারা। এ জগতের তিনিই উপাদান কারণ, অতএব তিনিই সব, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছু নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তিনি বলছেন—একৈবাহং জগত্যত্র—দ্বিতীয়া কা মমাপরা। শক্তি ও শক্তিমান অগ্নি ও তার দাহিকা-শক্তির ন্যায় অভেদ। শিববিহীন হ'য়ে শক্তি বা শক্তি বিহীন হ'য়ে শিব কখন থাকেন না, তাই পুরাণে বলা হয়েছে উমা মহেশ্বরূপিনী ও মহেশ্বর উমারূপী।

ন শিবেন বিনা শক্তির্নশক্তি রহিতঃ শিবঃ।
উমা মহেশ্বরয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

এই সকল তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'তে বুঝা যায়—যে ব্রহ্ম স্বরূপে নির্গুণ, তিনিই লীলায় সগুণ। একই ব্রহ্মের তুরীয়াতীত ভাবকে নিষ্কল শিব বলা হয় ও সক্রিয় অবস্থাকে ত্রিগুণময়ী শক্তি বলা হয়। শিব ভিন্ন শক্তি জড়া প্রকৃতি এবং শক্তি ভিন্ন শিব নিষ্ক্রিয়। তন্ত্রশাস্ত্রের যিনি নিষ্কল শিব তিনিই বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম এবং তন্ত্রের যিনি শক্তিযুক্ত শিব বা সকল শিব তিনিই বেদান্তের সগুণ ব্রহ্ম। তবে নির্গুণ ব্রহ্মে শক্তি আছেন কিনা এ বিষয়ে বেদান্তে কিছু না বললেও তন্ত্র বলেন যে নির্গুণ শিবে শক্তি নিষ্ক্রিয় বা অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিতা। শক্তি সাধনার বিভিন্ন ভাব থাকলেও মাতৃভাবে শক্তি সাধনাই অতি মধুর ও অতি পবিত্র। অনন্তরূপিনী মহাশক্তিকে কেই বা জানতে পারে? স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'মা' তোরে কেউ জানতে পারে নি, পারবে ও না, তুই আমাকে তোর চরণে শুদ্ধা ভক্তি দে। এই জন্যই বেদান্ত তাঁকে অনির্ব্বচনীয়া বলেছেন। শাক্তসাধক নিজেকে মনে করে সে বিশ্বজননীর কোলের শিশু। মা, মা ক'রে তাঁকে ডাকা ও মাধুর্য্যময়ী মাতৃমূর্ত্তির ধ্যান এই তার সাধনা। ধ্যান হ'তে নেমে সে দেখে সবই সেই মা। নিত্যোব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠালাভ হ'লে অভয়া মা তাঁর সন্তানকে চিরতরে তাঁর অভয়াঙ্কে তুলে নেন ও তাকে ব্রহ্মরূপ আনন্দ সিন্ধুনীরে লবণ সমুদ্রে লবণখণ্ডের ন্যায় গলাইয়া দেন। সাধক সন্তানের তখন আর ব্যষ্টি আমিবোধ থাকে না, সে তখন ভূমা, পূর্ণানন্দ স্বরূপ। সব ভেদের তখন অবসান। এইরূপে মাতৃরূপী সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় সে তার নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আপন সত্তায় ফিরে যায়। ইহাই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব,—তন্ত্র ও বেদান্তের সমন্বয়।

বাংলা-কাব্য ও যুগমানস

শ্রীঅনিল কুমার হালদার

উত্তরাপথের সিরিবর্ত্ম দিয়া যে আর্য্যাংসিন্ধুকূলে, সেই আর্য্যাই বরেন্দ্রভূমি বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এবং ভাগীরথী-তীরে উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং রাঢ়বঙ্গের আর্য্যেতর জাতিকে বহিষ্কৃত করিয়া যে সাংস্কৃতিক পটমণ্ডপ তাহাদিগের দ্বারা গঠিত হয় তাহারই ললিত পরিচয় 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এর সংস্কৃত ভাষায়;—আবার দশম, দ্বাদশ শতকে ধর্ম-প্রাঙ্গনের মধ্যে দিয়া তাহাই সিদ্ধাচার্য্যদিগের 'চর্য্যাপদে' প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। চর্য্যাপদের ভাষায়,—বাংলা ভাষার ভ্রূণ অবস্থায়—বাঙ্গালীমনের শিল্পকলা কুতূহলের পরম নির্ব্বৃতি। ইহার আদিপক্ষে তত্ত্বকথা, উত্তরপক্ষে গৌড়বাংলার দৈনন্দিন প্রতি-চিত্র অর্থাৎ একমেরুতে তরুণ যোগীর আচরণীয় যোগকৌশল, আর এক মেরুতে পার্থিব দুঃখ-দুর্দ্দৈব-দারিদ্র্যের আভাস অঙ্কনে সুরশ্রী ও শৈলী-সৌষম্যের অভিব্যঞ্জনার অক্ষরে অক্ষরে সিদ্ধকবির উপচিত রসসিক্ষা গোপন থাকিতে পারে নাই। এ' যেন অমসৃণ-পাথর কুঁদিয়া কুঁদিয়া মনঃকল্পিত মূর্ত্তিনির্ম্মাণ; চর্য্যাপদকার তাই বলিয়াছেন,—(যদিও অজ্ঞাত-সারে),—

'উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী।'
—'উঁচু উঁচু পর্ব্বতে সবরী বালিকা বাস করে, তার পরিধানে ময়ূরপুচ্ছ এবং গ্রীবায় গুঞ্জার মালা।'

চর্য্যাপদের স্থানে স্থানে কান্নার সুর বড় প্রবল। মাটির মানুষের দুঃখ-স্পন্দন এবং আর্ত্তস্বর অভিলক্ষিত পরিবেশ উপস্থাপনায় ধ্বনিবর্ণের সাযুজ্য-বন্ধনে গাঢ় ও গূঢ়সঞ্চারী রসরুচিতে রূপায়িত হইয়াছে। তাই যেথি অর্দ্ধরাত্রিতে বহুড়ির কানের-দুল চোরে চুরি করে, ডোম্বি চাঙ্গাড়ী ভিক্ষা করে, রূপা বাধিবার ঠাঁই মেলে না, তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিতে হয়, হাঁড়িতে ভাত থাকেনা অথচ নিত্য অতিথি আসিতে থাকে, ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই যায়—অর্থাতিক্রমী এই যে ভাবমণ্ডলের জাগর স্বপ্ন এখানে ফুটিয়া ওঠে তাহার নিটোল পরিকল্পনার পশ্চাতে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, সামাজিক পরিস্থিতির কিছু কিছু প্রভাব কায়া কল্পালের মত উপাদান যোগাইয়াছে; তার কারণ কবি নিতান্ত অসামাজিক জীব নহে বলিয়া। তথাপি ইহা বড় আশ্বাস হইতে পারে না; পটভূমিকার একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয় বটে কিন্তু যে প্রতিভা কালানুবর্ত্তী হইয়াও কালাতিশায়ী—শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই তাহা—সেখানে আধিমানসিক ঊর্দ্ধায়ণ পরিকল্পনা এতদূর ক্রিয়াশীল যে আলঙ্কারিককে বাধ্য হইয়াই যেন বলিতে হয় কাব্য 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী'। কথাটি আংশিক সত্য। কাব্যের দু'টা দিক: কারুকর্ম্ম ও ব্যঞ্জার্থ; যে কাব্য উৎকৃষ্ট তাহা ধ্বন্যার্থেই, শব্দবিন্যাস চাতুর্য্যেই পাঠককে মুগ্ধ করে, তদ্দণ্ড সে ব্যক্তিকে যে রসিক হইতেই হইবে এমন দিব্যি হাস্যকর; ঐ কাব্য যে রসিককেও রসিক করে। পক্ষান্তরে কাব্যের নৈর্ব্যক্তিকতা শিক্ষা ও সংস্কার সাপেক্ষ বটে; মনশ্চৈতন্যের উপকূলে এই অরূপ আনন্দের পরিবেশনে পরিতুষ্ট হইতে হইলে চাই সহজাত সহৃদয়তা। তবু বড় কবি সেই রুচিও, উন্নত রসবোধও সৃষ্টি করিয়া থাকে—প্রত্যক্ষে নহে পরোক্ষে; ইহা তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের দায়ে পড়িয়া। এই পথে পূর্ব্ববর্ত্তী-প্রতিভা উত্তরকালাগত শিল্পীকে প্রভূত পরিমাণে যেরূপ সাহায্য করে, এমন আর কেহ নহে, অবশ্য প্রায়শঃ তাহারও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়—ঐ ব্যতিক্রম যুগমানসের ফল।

যুগ মানসের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর প্রাকৃচৈতন্য, বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদাবলীর মধুচক্রে সযত্নে সঞ্চিত।

বৈষ্ণব-পদাবলী—বাংলাকাব্যের ভূলসীমঞ্চ, যেমন পবিত্র, তেমনই কাব্যরসিকের অপরিহার্য। ভণিতা-সংবলিত এই পদগুলি মানবমনের আকৃতিকে রূপকরূপে অমর্ত্যলোকের দিকে যে অব্যর্থ ইশারা করে, তাহা একহিসাবে প্রেমমহুয়ার অমূল্য-মণিময় —অর্থাৎ লিরিকপ্রেম-কাহিনীর বাঙ্‌ময় চিত্রাতুর প্রচ্ছদপট ইতিপূর্বে অদৃষ্ট। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে দেশে ব্যাপক ঘর্মৈষণা এবং আত্মজাগৃতি ঘটে, তৎপূর্বে প্রাক্-জয়দেবের আমল হইতেই এদেশে কৃষ্ণরাধার লোকায়ত উপাখ্যান প্রচলিত ছিল বলিয়া এখানে তাহাই একমাত্র উপজীব্য; পরে শ্রীচৈতন্যও একটি অবলম্বন হইয়াছে। এই কাব্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা —গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রাগানুগা ভক্তি—পূর্বোক্ত চর্যাপদের ঈষৎ অনুসৃতি। বৈষ্ণবপদাবলীর নায়িকা রাধা, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রাকৃতরমণীর লক্ষণাক্রান্ত, এ' যেন এক অপূর্ব ছিল—মান অভিমান, বিরহমিলনের পর্ববন্ধে তাহারই ছায়া-কোমল স্পর্শ ত্বরিতবেগে পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হয়। এই প্রাকৃত চেতনার সঙ্গে দেহকেন্দ্রিক রসবিলাস-মূর্চ্ছনা, ভাবসংবদ্ধ শিল্প উল্লাস—যে পরিচয় অর্ধপ্রাকৃত ও ব্রজবুলি ভাষাশ্রয়ে সুবলয়িত—অপূর্ব মাদকতা সঞ্চার করায় 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' হয় কিনা জানি না, তবে তৎকালীন পাঠকগোষ্ঠীর কাব্যাস্বাদের চূড়ান্ত তৃপ্তি নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে; নহিলে ঐ কাব্য এত সমাদর ও সম্মানলাভ কখনই করিত না। সেই যুগ —পরিপ্রেক্ষণে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীরা, যাহারা একটুতেই কাঁদিয়া উঠে, অল্পতেই মূর্চ্ছা যায়, সমাজ অধ্যবস্থার প্রতিফলন এই কাব্যে করিয়াছেন; পরকীয়া উপভোগে তাহারই মর্মানুসারী প্রতিভাস।

বাংলার কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই ধর্মকোলাহল এবং অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর অন্ধ-বিভীষিকা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিড়ম্বনা-নিষ্কৃতির অতি-লৌকিক সান্ত্বনা-সম্ভাবনায় বাঙ্গালী যেমন ব্রত ও পূজা-উপচার সংগ্রহে কাল কাটাইয়াছে, তেমনই তাহার কাব্য-চর্চায় তলদেশে তাহাই রসরূপের শুচি ও শুচিস্মিত মাঙ্গল্যের আয়োজন প্রাচুর্যে ভরিয়া দিয়াছে;—ইহারই সাধারণ নাম মঙ্গল কাব্য। কাব্য মূল্যের বিচারে এখানে ঊর্ধ্বগামী মননশীলতার সাক্ষাৎ বিরল; আদৌ একই-বস্তু-কেন্দ্রিক, যেন তাহা ব্যতীত আর কোনও আচরণ নাই; অর্থাৎ ইহাও একপ্রকার —"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্"। কিন্তু কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মর্ত্যপ্রীতি—সেই কান্নাহাসির নিখুঁত বাস্তব প্রতিবিম্ব—সারা মঙ্গলকাব্যে দুর্লভ, আর মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদসদাগর দুর্লভতর। প্রাচীন বাংলাকাব্যে চাঁদসদাগরের মতো অনমনীয়, রক্তমাংসের মানুষ আর একটিও সৃষ্টি হয় নাই। মুকুন্দরাম যদি ফুল্লরা, খুল্লনা, কালকেতুকে ছাড়িয়া চাঁদসদাগর গড়িতেন তবে বাংলাকাব্যের সীমারেখা আর এক যুগ আগাইয়া যাইতে পারিত। যাহা হৌক, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সমস্ত মঙ্গল-কাব্যেই দেবতা এতখানি প্রাধান্য এবং অপরিহার্য, যেজন্য দেব মহিমায় ইহার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত। ঐ যুগ দৈব অতিচেতনায় বিশ্বাসী ও নির্ভর এবং দেবতার অতিপ্রাচুর্যে মানবমহিমা কিয়ৎরূপে ক্ষুণ্ণ, অন্ততঃ আহত—নূতন কবিকল্পনা তো একেবারেই নাই, গীতি-সুরও ম্লান—শুধু একবৃত্তির পুনঃ পুনঃ রোমন্থন।

উনবিংশ শতাব্দীর দেশনৈতিক জোয়ার ভাঁটার সম্বন্ধসঞ্চরণের ফলে উর্বর পলিমৃত্তিকাবাহিত বাংলা কাব্যক্ষেত্রে শ্যামলতার নূতনবার্তা নিয়া আসিলেন কবি শ্রীমধুসূদন। তাঁহার মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা-সমুখ ব্যক্তিবিদ্রোহের অশ্রুত-পূর্ব সুর, অপূর্ব বাণী সৌষ্ঠবলাভ। মাইকেল গোটা শতাব্দীরই বিরাট প্রতিভূ অর্থাৎ যুগস্রষ্টা;—তাঁহাতে প্রকীর্ণ মহা-কাব্যের খণ্ড খণ্ড অনুভাব দানা বাঁধিতেছিল, তথাপি বহির্দ্বারে নূতনের করাঘাত প্রবল হইয়া উঠিলে মধ্য-পথে ক্ষান্তি দিতে হইয়াছে; তাই মাইকেলের ঐ মহাকাব্য অসম্পূর্ণ। উহাতে যুগসঙ্কেতের অস্পষ্ট লক্ষণ—মহাকাব্য অপগত। মাইকেল বাঙালী সাধারণ পাঠকের কূপমণ্ডূকতার নির্মোক ঘুচাইয়া দিলেন প্রসারী সমুদ্রের বার্তা আনিলেন—ইহার বক্ষে ক্রুদ্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাস ফেনায়িত, সীমাহীন বিস্তার, অটল গাম্ভীর্য এবং অনন্ত বিস্ময়! তাঁহার কবিকল্পনা

তাঁহাতে উদ্ভূত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাতেই তার ছেদচিহ্ন ; ঈষৎ রেশ পরবর্তী যুগে আছে বটে কিন্তু সেই যুগের বিপ্লবী পটভূমিকা ছায়াময় হইয়া উঠিলে কবিপ্রাণও তিমিত ; দৃষ্টান্তস্বরূপ হেমচন্দ্র অথবা নবীনচন্দ্র সে-সুর যত কম, সহকালের প্রেরণা সেখানে তবুও ছিল।

এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমস্বর তথা সামঞ্জস্য মানুষে নিটোল ও সংহত, যে রূপায়ণ পরিবর্তনাম্ভ শ্যামশস্যের শীর্ষে-শীর্ষে শিশির বিন্দুর মুক্তাকলস্‌দল্। আকাশের তারায় তারায় রূপবল্লার নিত্য বিস্ফুরণ মর্ত্যমমতার উপলখণ্ডে রুদ্ধিত ভঙ্গিতে মূর্ত্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা জাতীয় ভাবাদর্শের সমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বতোমুখী ধ্যানমার্গের ঐকান্তিক রূপবিলাস, তাহাও কল্পলোকের চূড়ায় দাঁড়াইয়া, সাক্ষাৎ পাই। এইখানে প্রথম বিশ্ব-চেতনা, আত্মবিস্তার। তাহাতে আর একটি কাজ হইয়াছে : বাংলাভাষার অনুরণন স্বর্গধ্বনির আবিষ্কার। পরবর্তী বাংলাকাব্যে সে গুণ স্বতঃপ্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ যুগসৃষ্টির কবি ; পাঠকের রুচিপরিবর্তন ও আত্মপ্রসাদের রশ্মিবিভ্রমের পরিপূর্তি। যেহেতু, মূলতঃ, তিনি শান্তরসের উপাসক, তাঁহার কাব্যে শৈলমালার নীলাভচ্ছটি অধিকপরিমাণে অভিব্যক্ত, এবং ঠিক সেইজন্যই যুগোচিত প্রেরণাকেও তিনি পরদলিত করিয়া অন্তর্লোকের রসগঙ্গার নির্মুক্ত স্রোতসন্ধান পাঠকের চিত্তে সর্ব্বপ্রথমে দান করেন ; অতএব ঐ সর্ব্বমানবীয় আবেদন-আধিক্যে রবীন্দ্র-কাব্য যুগান্ত কালেও আরাম রমণীয় হইবারই কথা —এবং তাহা হইয়াছেও।

রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে বিংশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধও অবসিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ কালেভদ্রে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা নির্জ্জলা সত্যকথা। তিনি সেই কবি, যাঁহারা যুগ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথ আর জন্মাইবেন না,—তাঁহারা সুবিবেচনাপ্রসূতরূপে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান নহেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্য যুগসঙ্কটের সম্মুখে ; আগ্রত প্রশ্নের বহির্দ্বারে, চরম কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ঘূর্ণীর মত আলোড়ন তুলিয়াছে—সে আলোড়নের সার্থকতা অথবা অসার্থকতা যুগপ্রতিভার শক্তি সীমাসাপেক্ষ। ঐ যুগের একটা সর্ব্বানুভূত লক্ষণ আত্মজিজ্ঞাসা বা স্বকীয় সত্তার প্রশ্ন, প্রশ্নহিসাবে ইহা সাংঘাতিক। 'আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জান'—ঐ বোধ আগ্রত হইলে, উপনিষদ যাহাই বলুক, জীবজীবনে ইতি দিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তবে আর একটা দিক আছে : প্রশ্নকর্ত্তার সাধনাসম্বল না থাকিলে তাহাই দেখা দেয়, ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—বিপ্লব এবং নাস্তিকতা, যদিও নাস্তিক্যবোধ হইতে অনেকসময় পুরুষকারের বলিষ্ঠ উন্মেষ হইয়া থাকে।

আধুনিক কাব্যের এক প্রান্ত উহাকে স্পর্শ করিয়া আছে, সেখানে বলিষ্ঠতা, নির্ভীকতা এবং জীবনপ্রতীতির বলে ক্ষয়ক্ষতির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ ও বিদ্রোহ ঘোষণা ; হয়ত আত্মবাতন্ত্র্যপ্রীতি তত স্পষ্ট নয় ; এবং আর এক প্রান্তে দেহকেন্দ্রিকতার অসহায় নির্বেদ। এ জীবনের tragedy-র কারণ হিসাবে নিয়তি তত প্রবল নয়, যত আধুনিক সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, প্রথা ইত্যাদি—এবং কাব্যপাঠকের চিত্ত অপ্রবুদ্ধ আবেগে উদ্বেল অথবা আত্মহারা হইবার সুযোগ সৌভাগ্যক্রমে হারাইয়াছে, জীবজীবনজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা কখনই সম্ভব নয়। আবেগপুঞ্জ দিয়া এ' মনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না—বোধিবৃত্তির অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। বাস্তব-উৎকেন্দ্রিক যে জীবন আলেখ্য সে যেন—"it is a tale told by an idiot." কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবন তো ঘটীন স্বপ্ন নয়, পরন্তু অধিকতর বিষম বৈসাদৃশ্যে ভারাক্রান্ত —আধুনিক কাব্যের আপাত রূঢ়তার অন্তরালস্থিত ইহাই সেই গুহ্য তথ্য।

কিন্তু সংশয়-নিরসন ওখানে হইল না। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তাহা উহা লইয়া নয়, ইহার আঙ্গিকগঠনে যে অকারণ দুর্বোধ্যতা স্থানে

স্থানে সুপ্রকট তাহা লইয়া। বিষয়-নিরপেক্ষ কবিতার আকার বলিয়া কিছু নাই, যাহাতে থাকে তাহা কবিতাই নয়। 'Oxford Lectures on Poetry'—তে Bradley বলিলেন, 'There is no such thing as mere form in poetry. All form is expression.'

বক্তব্যের ভঙ্গী একান্তভাবে ব্যক্তি-নির্ভর; আর বক্তব্যের বিষয়বস্তু অধিকপরিমাণে যুগসাপেক্ষ,—আধুনিক কবিতার এই দৃষ্টিকোণ, বঙ্গসচেতনতা, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতকে লেখা হইতে পারিত না; অসম্ভব; কারণ যুগচেতনা উহা থাকিলে প্রতিভাকে স্বয়ম্ভু হইতে হয়, যাহা আধুনিক-কালে, এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় কল্পনা করা দুষ্কর। সুতরাং যে কবিতায় বিংশ শতাব্দীর ভাবনা কাব্যিক ফলশ্রুতিতে ভরিয়া উঠে নাই, নূতন অভিব্যঞ্জনায় কবি কাব্যপ্রেরণার উৎস খুঁজিয়া পায় নাই, গড্ডলিকা স্রোতে যাহার অভিসার অথবা রসচর্বণায় যাহার উপসংহার তাহা আধুনিক কবিতাই নয়। এককথায়, রসনিষ্পত্তির বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রাগ্রসর চেতনার নিবিড় সংবেশন কাব্যকলামণ্ডিত হইয়া উঠিলেই আধুনিক কাব্যপাঠকের অভীপ্সা চরিতার্থ। ঐ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং ইহার পিছনে অতলান্ত সক্রিয় চিন্তা কাজ করিতেছে; অর্থাৎ ঐ কবিও একধরনের সমালোচক; সেই পুরাণো পৃথিবীকে সে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু কখনই নির্বিচারে নয়। ঐ গ্রহণে ক্ষতি আসিলে নূতনকাব্য সৃষ্টি হইবে না, যাহা জাতির পক্ষে অপমৃত্যুস্বরূপ; আমরা অতীতকে যেমন শ্রদ্ধা করিব সম্মান করিব তেমনি ক্রমাগতে সম্মুখের দিগন্ত রেখা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিব, নতুবা বাংলা সাহিত্য এখানেই পঙ্গু, স্থাবর হইলে তাহার মত অভিশাপ আর কি হইতে পারে? পুরানো পুঁজি লইয়া কতদিন কাজ চলিবে? নূতন সৃষ্টিশীলতা দেখা দিবে না? তদুত্তরে Eliot বলেন,—

'The people which ceases to care for its literary inheritance becomes barbaric; the people which ceases to produce literature ceases to move in thought and sensibility.' [Use of Poetry and use of criticism]

আধুনিক বা রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে তিনজন পূর্ণায়ত শুরু—কবিকণ্ঠে মৌলিক সুর-সুষমার নির্ভরতৃপ্তি অথবা তৃপ্তির ইঙ্গিত: মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ। মোহিতলাল বলিষ্ঠ বুদ্ধিগ্রাহ্য কবি, চিরাচরিত কবি-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; সেই প্রাতিস্বিকতায় তাঁহার কাব্যোৎকর্ষ, অর্থাৎ কাব্যের আত্মস্থ ব্যক্তি মোহিত-লাল স্ফুটস্বরূপ। চার্ব্বাকদর্শনের তত্ত্বকথার একটা ইঙ্গিত তাঁহার কাব্যে থাকিলেও ভোগাবস্তির পরিবেশ পার হইয়া তিনি পাঠকের পোষিত ধারণাকে আঘাত করেন, হয়ত চূর্ণও করেন এবং সীমায়িত দেহের মধ্যে পরম আশ্বস্তভাবে থাকিবার কালে দেহরহস্য বা দেহজিজ্ঞাসার অদম্য কৌতূহলে দেহকেই একান্ত করিয়া বুঝে পাইতে চাহেন। 'হায় দেহ নাই তুমি ছাড়া কেহ জানি তাহা প্রাণে প্রাণে'—। আত্মাকে তিনি নস্যাৎ করিয়াছেন, রূপ—পিপাসার অসীমতা কণ্ঠে লইয়া তাঁহার কবিগানের সূত্রপাত, বিশেষতঃ 'স্বরগরল'ও 'বিস্মরণীতে'। ইহা নিছক বুদ্ধহীন কল্পনা নহে, সজ্ঞান—মতবাদের প্রতিষ্ঠা প্রয়াস। তাই প্রচলিত অর্থে যাহাকে কবিত্ব বলে, তাহার ছিটে ফোঁটা মোহিতলালে নাই, মোহিত-লালের কাব্য বুঝিবার কাব্য; ইংরেজ কবি Shelly কে যেমন কবি সমাজের কবি বলা হইয়া থাকে মোহিতলাল তাহারই এক ক্ষুদ্রসংস্করণ। সুতরাং মোহিতলাল যে লোককাব্য কবি হইবেন না, ইহাই স্বাভাবিক, যদিও আগামী পাঠক হয়ত একদা এই কাব্যে আবিষ্কারের বিস্ময়পুলকে দেখিবে—'আলো নাই আছে শুধু প্রাণের আরাম।'

যতীন্দ্রনাথও পরিচিত-কাব্যলোক-উৎকেন্দ্রিক নূতন কবিমানুষ, সন্দেহবাদ তাঁহাতে প্রবল। তিনি প্রাক্—আধুনিক সমবয়িত বাংলা কাব্যকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়াছেন; সেই বিদ্রূপের শানিতমুখে স্বকীয় মৌলিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে

গিয়া অকস্মাৎ পৃথিবীর আসলরূপটি দেখিতে পাইলেন, তিনি পেশীশক্তিতে শক্তিমান, সেই স্পর্দ্ধায় ভগবানকে বিদ্রূপ তো দূরের কথা স্থানে স্থানে, স্পষ্টতঃ উড়াইয়া দিয়াছেন এবং সেখানে একটা অদ্ভুত জীব "বস্তু"—কে বসাইয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ বস্তুলোকের কবি এবং কমবেশী বুদ্ধিমান, তথাপি তাঁহার কাব্যে একটা অপূর্ব্ব কল্পনার আবেশ আছে, তাহাও দুঃখমিশ্রিত—এই দিক্ দিয়া তিনি মোহিতলাল হইতে পৃথক। মোহিত লালের চেতনায় হুইটম্যানের মানবিকতাবোধ আর সোপেনহাওয়ারের জীবনদর্শন—ইহার কোনটাই যতীন্দ্রনাথে নাই। তিনি সমস্ত মানুষকে খেজুর গাছের মত দেখিতে পান, তাঁহার কেতকী কুল আধরাত্রিতে নীলাম্বরীতে কণ্ঠে ফাঁসী লাগাইয়া প্রাণ-ত্যাগ করে। হাটে হাটে তিনি শুধু হাট করিতেই ঘুরিয়া বেড়ান না—'হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি কত যে কাঁদিছে মাঠ।' তাঁহার কাছে প্রেম বলিয়া কিছু নাই, ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই ও সব বুজ্‌রুকি এমনকি ঐ পৃথিবীটাই 'গোরস্থান'—এর মতো ইত্যাদি।

সমস্ত মরুকাব্যের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের যে পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিপ্লবীর নহে, প্রতিবাদীর; (বিপ্লবী হইলে তাঁহার অনুকরণ এ দেশে এতদিনে নিশ্চিত হইত) বাংলাকাব্যে যতীন্দ্রনাথ প্রবলতম প্রতিবাদ যদিও তাঁহার শেষ দুইখানি কাব্য 'সায়ম' ও 'ত্রিযামা'র সেই সুর কিঞ্চিত ম্লান হইয়া আসিয়াছে।

কবি জীবনানন্দের রেখাবন্ধনেও মায়াস্বপ্নের ইন্দ্রজাল কবিত্ব মহিমায় পরিপূর্ণ। জীবনানন্দের সুর আত্মপ্রীতির অনাহত আবিষ্ট সুরা, সুরের উল্লাস অপেক্ষা কিছু কিছু বেদনার মন্ত্রিত রাগিনী মূলতানে বাজিয়া উঠে এবং আদিকসজ্জায় শেষতম প্রসাধন লাবণ্যবিলাসের দীর্ঘশ্বাসে অনুরণিত হইতে থাকে। প্রাণের হা-হা-সুরটাও অলক্ষ্য নয়। তাঁহার মধ্যে আধুনিক জীবনের রুক্ষতা সময়ে সময়ে উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি করিতে পারিলেও তাহাই আবার কবির সৌর-জগতের আপনকক্ষপথে পরিভ্রমণের প্রেরণা যোগায়, তথাপি উহারই প্রত্যন্তপ্রদেশে রোমান্টিক নির্ব্বেদেরও অস্তিত্ব আছে, সেখানে কবি একেবারে নিঃসঙ্গ, সঙ্গী শুধু পেচা আর ইঁদুর এক—'ডাইনে আর বাঁয়ে

পোড়ো জমি—খড় নাড়া—মাঠের কাটল,
শিশিরের জল।'

—এই ধানকাটা মাঠে চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ লইয়া রাতের ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি 'হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।'

কবির চিত্তাকাশে কখন শকুন, কখন ধানসিড়ি নদীটির পাশ দিয়া সোনালি ডানার চিল, হয়ত বা একটা সিন্ধু সারস, অথবা সাঁই সাঁই করিয়া অজস্র বুনো হাঁস, আবার একটা বিড়াল বা ঘোড়া ঘুরিয়া বেড়ায় উদাসীনের মতো। সময়ে সময়ে একটা নারী মূর্ত্তি—তাহাই অনন্ত আশ্রয়স্থল—কায়া-কান্তি লাভ করিয়া কবিকে বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়; এ কে অরুনিমা সান্যাল? এ কে শঙ্খমালা—না তাহা নহে, কারণ—

'চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল, অন্ধকার,
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার
শঙ্খিনী মাদার,
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো
আর।'

সেইজন্য ঐ ক্লান্ত পথিককে যে দুঃখের শান্তি দিয়াছিল, জীবনের লেনদেন ফুরাইলেও অন্ধকারের মাঝে সেই একজনই সত্য হইয়া থাকে, যাহার নাম বনলতা সেন,—

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখতার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য; অতিদূর সমুদ্রের পর
হালভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে
দারুচিনি দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে
'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের
বনলতা সেন।'

ঐ 'সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা'—কবি জীবনের নিদারুণ প্রতীক? অথবা 'নাটোরের বনলতা সেন'—কবিকল্পনার ক্ষণিক আশ্রয়?

এই যে নূতন চিন্তাভঙ্গীর ওজঃবিতা কাব্য-মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহারই তলদেশে গভীর-ব্যাপী মননপ্রগতির সাক্ষ্য কি নিতান্তই দুর্লক্ষ্য? যুগ চেতনার উল্লাস ও অনুভূতির অবয় মিলনে যে বোধি-বৃত্তির, যে বুদ্ধিগ্রাহী পরিবেশ কাব্য-রসের আনুকূল্য করিয়াছে—এই সমস্ত সৃষ্টি তাহারই বাহ্য প্রতীক; ইহা যেমন সেই দশম-দ্বাদশ শতকে রচনা—কল্পনার অতীত ছিল তেমনই সাম্প্রতিক কালে অষ্টাদশপর্ব্বের মহাকাব্য অথবা দৈবপ্রভাবের শ্লোক কাব্য সৃষ্টির পরিকল্পনাও অসম্ভব। যুগ-অগ্রগতির সমান্তরাল রেখায় পাঠকমানসের দ্রুত—উন্নয়ন,—তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির উর্দ্ধলোকের চিন্তাশীলতা। এখন যেমন অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা অথবা রসচর্ব্বনা আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি পীড়া দেয় তেমনি পুরানো-মূলধনের ভাঙানো-বৃত্তি, অথবা ঢেলেসাজা ও সেজে ঢালা-রূপ মনোভঙ্গি অত্যন্ত হাস্যকর এবং অস্বাভাবিক। আমাদের চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি নূতন বিষয়বস্তু, নূতন বাচনভঙ্গী, অবশ্য কাব্যমান উন্নীত, এককথায় সুন্দরতর সৃষ্টির সাক্ষাৎ যদি না পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে এ জাতির চিৎ-প্রকর্ষে ভাটা পড়িতে সুরু করিয়াছে; মনের ক্ষেত্রে তাহা দীন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুর্বল, স্বকীয় মেধার অনুশীলনে সে পরাঙ্মুখ, তাহার চিত্তের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত। মহেঞ্জোদড়োর শিল্পমূর্ত্তি, কোণারকের মন্দিরের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য এবং অজন্তা গুহাগাত্রে যে শৈলবন্ধী শিল্পায়ণ কোন দূর মনোলোকের আভাস বহন করিয়া আনে—তাহা সুন্দর; ঐ স্বল্প সঞ্চরণ বাংলা কাব্যের ক্রান্তিরেখায়, ঐ সৌন্দর্য্য-সৌকর্য্য চর্য্যাপদ হইতে বিংশশতকের অতি আধুনিক কবি কল্পনায় পরিদৃষ্ট, যুগচৈতন্য তাহারই সাক্ষ্য করিয়াছে—তথাপি তৃপ্তির সীমারেখা এখানে অস্ত যাইতে পারে না; কারণ—

"Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter;—" (Keats)

—যে সঙ্গীত শ্রুত তাহা মধুর, কিন্তু অশ্রুত সঙ্গীত আরও মধুরতর; অতএব—'চইবেবেতি, চইবেবেতি': বাংলা কাব্যের ক্রমবিবর্ত্তন ও যুগ প্রগতির তালে তালে।

—:)o(:—

শেষ আশা

শ্রীকালীপদ কোঙার

শুধু তোমারেই চাহি
তব গুণ গাহি,
জীবনে কিছুই নাহিক সাধ।
বড় বেদনায়
কেঁদেছে হৃদয়,
এসেছে জীবনে এ অবসাদ।
ঘুচিল সকলি
সুখের পিয়াস,
কাটিল সকল আশা মায়াডোর,
(এবার) যা করিবে করো
একান্ত নির্ভর
করিনু তোমার চরণ-উপর।
শুধু স্তবগাথা
গেয়ে যাব হেথা,
চাহিবনা কিছু বিনিময়ে তার।
সব আশা হীন
ভরসা বিহীন,
পায় তো দিওগো চরণ তোমার॥

সতীদাহ-কুপ্রথার উচ্ছেদ আন্দোলন

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর, বি, এস-সি

কতকগুলি নিরস তারিখ ও রাজাদের নামের সংগ্রহ পুস্তককে কোন দেশের প্রকৃত ইতিহাস বলা যায়না। আমাদের দেশের চলিত ইতিহাস কিন্তু এইধরণের। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। বিগত অধিবেশনে ভারতীয় ইতিহাস মহাসভায় অনুরূপ কথাই উঠিয়াছিল। দেশের কোন এক সময়ের ইতিহাস পড়িলে জাতির তৎকালীন সর্বাঙ্গীন অবস্থার একটা ধারণা পাঠকের মনে অঙ্কিত হওয়া চাই; নতুবা তাহা ইতিহাস আখ্যার যোগ্য নহে।

সতীদাহ প্রথা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময়ে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রহিত করা হইয়াছিল সে কথা ইতিহাসে আমরা পড়িয়া থাকি। কিন্তু তাহার পটভূমিকার বিস্তৃত পরিচয় আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিহিত হইয়া আছে। লোকে সে সময়ে এই আইন প্রণয়নের কথায় কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল এবং সরকারই বা শেষ পর্যন্ত কোন পথে চলিয়াছিলেন সে কথা অনেকের অবিদিত।

'ধর্ম সভা' নামে রাজধানী কলিকাতায় এক সমিতি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রণী হ'ন। মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তখন কলিকাতা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। আবার সমগ্র ভারতে সেকালে কলিকাতাই শীর্ষস্থানে। এই রাধাকান্ত দেব স্বয়ং বিরোধিতায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন; প্রায় ১১১৬ জন নাগরিকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র এই ধর্ম সভা বড় লাটের নিকট পেশ করেন, তাহাতে শাস্ত্র প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া সতীদাহ যে অশাস্ত্রীয় না তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। প্রধানতঃ স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র, মহারাজ কালীকৃষ্ণ দেব, কাশীনাথ ঘোষ, গোপীকান্ত ঠাকুর, রাজা নৃসিংহ চন্দ্র রায়, রাজা রাজ নারায়ণ রায়বাহাদুর, রাজা শিবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি। সর্বপ্রথম স্বাক্ষর করেন অখিলচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও সর্বশেষ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১২৩৭ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা' যন্ত্রে তাহা মুদ্রিত হয়। আবেদন-পত্রটির এইভাবে আরম্ভ:—

"মহামহিম শ্রীল লার্ড কেবিণ্ডিষ বেন্টিঙ্ক গবরণর জেনারেল বাহাদুর সমীপেষু। আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা নিবাসী কএকজন লোক হিন্দু দিগের ব্যবস্থা ও বোধ নিবেদন করিবার ভার লইয়া ঐ সকল ব্যবস্থা বোধ বিপরীত নিবেদন করিয়াছেন এবং আপনি কৌন্সলের বিঠকে এমত মিথ্যা কথায় সতী হওনের ব্যবস্থা নিবারণ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে উদ্যত আছেন এ নিমিত্তে আমরা স্বাক্ষর করিয়া সম্ভ্রম পূর্বক এই নিবেদন পত্র প্রদান করিতেছি হিন্দু ধর্ম কর্মের উপর হস্ত নিঃক্ষেপ করণে আমরা ভীতিবারণে ব্যগ্রতা করিতেছি এবং অতিশয় ভীত হইয়াছি।" উপসংহারে আছে:—

"এই সকল আইন সত্যজ্ঞানির মনে অনুভব হইয়াছে আর যে সকল লোক আমার দিগের শাস্ত্র ও ভাষা ও ব্যবহার সুন্দর জ্ঞাত আছেন তাঁহারা ইহা সহ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত জনের দিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানবান ও রাজ্যকার্য্যের ভার নির্বাহ করিয়াছেন তাঁহার দিগের দ্বারা আমার দিগের ধর্ম কখন অতিক্রম হয় নাহি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎ কালে ভূতকালের ন্যায় তাহা অলঙ্ঘ্য-রূপে রক্ষা পাইবেক যে হেতু যে সকল ভারি জামিন ও শনন্দের ন্যায় আমরা আপন হাকিম হইতে পাইয়াছি যাহার উপর আমারদিগের ধনপ্রাণাপেক্ষা আমারদিগের অতি পবিত্র ধর্মের নির্ভর। আর আমরা সত্য কহিতেছি যে আপনি কৌন্সলের বৈঠকে এই আবশ্যক বিষয় মনোযোগ পূর্বক বিবেচনা

করিলে ভাবনা ও ভয়ের সহিত এই চিন্তা আমাদিগের ও কোম্পানি বাহাদুরের সমস্ত শিষ্ট বশিষ্ট হিন্দু প্রজা বর্গের মনে হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ হইবেক আর আপনকার সদ্বিবেচনাদ্বারা এইমত আর কোন বিষয়ে আক্রমণ হইতে আমরা চিরকাল রক্ষা পাইব ইতি ৩। আরজী সমাপ্ত। ৩।"

ইহা হইতে তৎকালীন বঙ্গভাষার রচনা-পদ্ধতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আজকালের সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ভাষার ক্রমবিকাশ বিচারে ইহার মূল্য আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভ্যুদয় হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। বাংলার গদ্য সাহিত্য তাঁর হাতে গড়া। রাজা রামমোহন এ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করে যান। গদ্য সাহিত্য পড়ে অর্থ বোধ করা লোকের পক্ষে সহজ ছিল না। সেইজন্য রাজা রামমোহন যখন বেদান্ত সূত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গদ্য বুঝিবার কি প্রণালী, তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি :

"এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসেনা। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না; ইহা প্রত্যক্ষ কাহুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়।" অতঃপর কি করিলে গদ্যবোধ জন্মে তৎসম্বন্ধে লেখক উপদেশ দিতেছেন। —"কাব্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।" "বাংলার জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধে ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন।

গদ্য রচনার (৩) নিদর্শন বহুদিন হইতে পাওয়া যায়। হাওড়ার ৪৪ মাইল দূরস্থ জৌগ্রাম ষ্টেশনের নিকটে কুলীন গ্রাম। এখানে দশরথ বসুর বংশে মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য ১৩৭৩-১৪৮০ খ্রীঃ অব্দে রচনা করিয়া বঙ্গের একজন আদি কবি বলিয়া গণিত হন। আত্মপরিচয় তাঁহারই রচনায় :

"বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥
বন্ধু বন্ধু সর্বজনে করিয়া বিনয়।
মালাধর বসু কহে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়॥
গুণ নাহি অধম মুক্তি নাহিকো জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ তবে দিলা প্রভু ব্যাস॥"
"একভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥"

পূর্বোক্ত পদ শ্রীচৈতন্যের বড় প্রিয় ছিল; তিনি বলিতেন :

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁই তাঁর বাক্য এক আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশে হাত॥"

সমাজ সহসা নূতন বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহে না। এইজন্যে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন কালে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ীতে সোড়ায় সোড়ায় একটি শাস্ত্র বচন লেখা থাকিত—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টার পূর্বে জননীর নিকট অনুমতি লইয়াছিলেন।— মা তুমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝবেনা। আমি বিদ্যা বিবাহ সম্বন্ধে এই বই খানি

১। "..... I am convinced that the Raja did not exercise a progressive influence when he agitated for the repeal of Lord William Bentinck's law for the abolition of the Sati or when he patronised the Dharma Sava....." P. 112, Part II, Glossings from the Modern History of the Indian Chiefs, Rajas and Maharajas etc. by Loke Nath Ghose, Printed and Published by J. N. Ghose & Co., Presidency Press, Calcutta, 1881.

লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পাইলে এই বই ছাপাইতে পারিনা। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি আছে।" ভগবতী দেবী উত্তর দিয়াছিলেন, "কিছু মাত্র আপত্তি নাই। লোকের চক্ষুশূল, মঙ্গলকর্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহাদের দিন কাটিতেছে তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবার উপায় করিবে এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।" এত সাবধানতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত বিরোধিতার সম্মুখীন না হইতে হইয়াছিল! সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রচেষ্টাও প্রথমে তীব্রভাবে সমালোচনার বিষয় হইয়া ক্রমশঃ সমাজে হিতকর বিধান রূপে গৃহীত হইয়াছে।

বেন্টিঙ্কের পূর্বে কোন্ কোন্ রাজপুরুষ সতীদাহের কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন আলোচ্য আবেদনটিতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়—যথা:—

"আমরা আরো নিবেদন করি যে পূর্ব্বে ইহার অনুসন্ধান কোন কোন অতি পণ্ডিত ও ধর্ম্মিষ্ঠ কোম্পানির কর্ম্মচারি সাহেবেরা করিয়াছেন। * * * ক্লেব সাহেবের সময়ে তাঁহার দেওয়ান ৺মহারাজ নবকৃষ্ণ এক বিধবাকে সহগমন করিতে বারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এই কহিয়া যে তোমার স্বামির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্তা হইয়াছে। পরে যখন সে কেবল মিথ্যা বিড়ম্বনা জানিতে পারিল তাহাকে নির্ব্বাহযোগ্য ধন দিতে চাহিলেন কিন্তু কিছুতে সম্মত হইলনা। সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে লার্ড ক্লেব সাহেব আজ্ঞা করিলেন যে হিন্দুরদিগের ধর্ম্মে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। * * * * পূর্ব্ব গবরনর জনরল শ্রীল শ্রীওয়ারেন হেষ্টিস্ বাহাদুর মেং নথোনিয়ল স্মিথ সাহেবের প্রার্থনাক্রমে যিনি তখন কোর্ট অফ ডাইরেকটরের চায়মেন ছিলেন এবং অনেক শাস্ত্রে বিলক্ষণ বিজ্ঞ ছিলেন তিনি এই নির্ধারিত করিয়াছিলেন যে সতীর বিষয়ে শাস্ত্র যথার্থ বটে এবং এই প্রকার আরো অনুসন্ধান মেং উইলকিন্স সাহেব করিয়াছিলেন যিনি কর্ম্মে প্রেরিত হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত হিন্দুরদিগের শাস্ত্র ও ব্যবহার জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বারাণসে ছিলেন আর তাঁহার ব্যবস্থা ঐ ওয়ারন হেষ্টিংস সাহেবের ব্যবস্থার তুল্য ছিল এবং এই ব্যবস্থা মেং জনাথন ডঙ্কিন সাহেব মান্য করিয়াছিলেন যাঁহার উৎসুক্য ও উত্তম বিচার বারাণসে এবং হিন্দুস্থানের অন্য অন্য খণ্ডে হিন্দুরা কৃতজ্ঞতার সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্মরণ করিবেক। লার্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান মিসিনরি যাহারা প্রথমে এদেশে উপস্থিত হইয়া গুপ্তভাবে কিছু মিথ্যা ও অত্যুক্তি বৃত্তান্ত সতীর বিষয়ে লিখিয়া কৌন্সলে অর্পণ করিয়াছিল এবং প্রথম এই কথা কহিয়াছিল যে এবিষয় অশাস্ত্র পূর্ব্ব উক্ত শ্রীশ্রীযুক্ত গবরণর জেনরল কৌন্সলের বৈঠকে মেং ডঙ্কিন সাহেবের সহায়তাতে অনুসন্ধান করিয়া এবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং আমারদিগকে পূর্ব্বমত ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়াতে তুষ্ট ছিলেন শ্রীশ্রীলার্ড মায়রা ও আমহের্ষ্ট সাহেবের সময়ে অনেক ইউরোপীয় (খৃষ্টান) মিসনারি যাঁহারা হিন্দুদিগকে ও অন্য লোককে ধর্ম্মান্তরিত (convert) করাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই সতীর ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই মিথ্যাকথা বড় প্রাগল্‌ভ্য করিয়া কহিয়াছিলেন যে হিন্দুরদিগের স্ত্রীদিগকে বলক্রমে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করে। ইহাতে সরকারের মনোযোগ হইয়াছিল এবং মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এই আজ্ঞা হইয়াছিল যে সতী যাহাতে ইচ্ছা পূর্ব্বক চিতারোহণ করে এমত যায়া নির্দ্ধারিত করিবেন.....শ্রীশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর সম্মত হইয়াছিলেন এবং আর কেহ এবিষয়ে হাত দেন নাই"।

লার্ডের নিকট হইতে ধর্মসভা যে উত্তর পাইয়াছিলেন তাহা এক ঐতিহাসিক নথিপত্র। ১৪ জানুয়ারি ১৮৩০ সালে স্বয়ং অবলিউ. সি. বেন্টিঙ্কের স্বাক্ষরিত এই উত্তরে আছে:

"শ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকট যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। হিন্দুরদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক শাস্ত্রে

বিধবারদিগের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামির মরণান্তর তাঁহারদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ বটে এবং যে সকল শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মান্য তত্তদ্গ্রন্থে ব্রহ্মচর্য্যব্রত মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে এবং আরো লিখিত আছে যে ঐ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ যে কালকে হিন্দুলোকেরা বর্ত্তমান কালাপেক্ষা উত্তমরূপে গণনা করেন, পূর্ব্বকালে যে ঐ ব্যবহার ছিল আমার দিগের তদ্বিষয়ক বোধ আছে কিন্তু যে পণ্ডিতের দিগের স্থানে প্রার্থনা করিয়া সহমরণ বিষয়ে এক্ষণে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন সে পণ্ডিতের দিগের ঐ পূর্ব্বকালীন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতরূপ ব্যবহার বিষয়ক বোধ থাকাতেও আমার দিগের সন্তোষ জন্মিয়াছে।"

"অতএব হিন্দুর দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির এমত দুরবস্থা হয় নাই যে গবরণমেণ্টের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয় কি আপনারদিগের শাস্ত্রের ব্যবস্থোল্লঙ্ঘন করিতে হয় যেহেতু বিধবারদিগের ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করাতে এককালে গবরণমেণ্টের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং স্বধর্ম্মের মুখ্য কল্প ও প্রতিপালন করা হয় এবং ইহাতেও হিন্দুরদিগের উৎকৃষ্ট পূর্ব্বকালীন সদ্ব্যবহারের আদর্শ ও বর্ত্তমান লোকেরদিগের দর্শায়ন হয়।"

"ধর্ম্মের বিষয়ে হিন্দুরদিগের যাদৃচ্ছিকানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে কিছু ব্যাঘাত জন্মাইবেন না। এবং যুক্তি ও যথার্থের সহিত যে সকল অনুষ্ঠান অবিরুদ্ধ হয় এমত পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যবহারানুষ্ঠানে তাঁহারদিগের কিছু প্রতিবন্ধকতা হইবেনা ইহা প্রার্থনা কারিরদিগের স্থানে পুনরুক্তিকরণের কোন আবশ্যক নাই কিন্তু এই সকল ব্যবহারের মধ্যে কতিপয় ব্যবহার শ্রীশ্রীযুতের পূর্ব্বপরম্পরা মনুষ্যেরদিগের জীবন সংরক্ষণার্থে এবং সম্বন্ধের পারিপাট্য করণার্থে সময় ক্রমে তাহা রহিত করণের আবশ্যক বুঝিয়াছেন সে সকল ব্যবহারের এক্ষণে স্মরণ আবশ্যক নাই প্রাণরক্ষার উপায়মাত্র রহিত এমত শৈশব কালে মাতার স্তন্য দ্বারা যে পুত্র আপনার প্রাণরক্ষা করেন সেই পুত্র যে সেই মাতার আত্মঘাত বিষয়ে সচেষ্ট হন এরূপ ব্যবহারকে পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতীয় লোকেরা অনুমতির বহির্ভূত করিতে একবাক্য হয়।"

"শ্রীশ্রীযুত অতি সম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনা কারিরদিগের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে যে বিবেচনা পূর্ব্বক রহিত করণের আবশ্যক দেখিয়াছেন তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রার্থনা কারিরা তথাচ এ মত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত আইন পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ড রাজার কৌন্সলে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথা প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন।"

নিবেদিতা

শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার

এ দেশের দুঃখে চিত্ত উঠিল উথলি,'
রবীন্দ্র বরিল তোমা "লোকমাতা" বলি'।
শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে তব গাঢ় অনুরাগ,
ইতিবৃত্তে সেল রাখি' চিরন্তন দাগ।
বিপ্লবের মহামন্ত্রে তোমার হুংকার,
মুক্তি ভাতি' দিল এই লাঞ্ছিত বাংলার।
পাশ্চাত্য-সম্ভবা অয়ি ভারত-পুত্তলি,
যেখানে আসিলে আজ স্মৃতিরে উজলি।
স্বাধীনতা করায়ত্ত—ফলিল স্বপন,
ছন্দোবন্ধে করি তাই তোমায় স্মরণ॥

STUDENT
COMMON-ROOM

মন ও মানব

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

আমরা মানব, মানুষ ইত্যাদি নামে কথিত হই। মানব মনে চিন্তা করিতে থাকে। ভাবময় এই পৃথিবী। চতুর্দিকে ভাবের রাজ্য। ঐ কুয়াসার অন্তরালে কে দাঁড়িয়ে আছে? কাহার ইঙ্গিতে ভাবের স্রোতের গতি পরিবর্তিত হচ্ছে, এ কুহেলিকা অজ্ঞাত।

কয়েকজন মহাপ্রাণ মানব, মানুষের দুঃখে দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে খুঁজেছেন সৃষ্টিকর্ত্তাকে। তাঁরা দূর করতে চান, শোক, দুঃখ, জরা, অভাব, মনের অশান্তি ইত্যাদি। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে; জীব ও ঈশ্বরের ভিতর কোন ভাবের বন্ধন আছে? ইহা লইয়া বহু চিন্তা হয়েছে।

শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, শ্রীমাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ, রামানুজ স্বামীর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ইত্যাদি প্রত্যেকেই এক একটা ভাব বা বাদের প্রবর্ত্তক। যিনি যে বাদের অনুগামী, তার মনে এই বাদ বৃহৎরূপে বাসা বাঁধে।

মনই এবিষয়ে প্রবর্ত্তক ও চালক; মন ভিন্ন মানবের গতি নেই। আমাদের স্থূল দেহের ভিতর সূক্ষ্ম দেহে এই মনের অবস্থিতি বলা হয়েছে।

স্থূল দেহ মৃত্যুতে ধ্বংস হয় কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্ব থাকে। সূক্ষ্ম দেহে মন, বুদ্ধি, বিবেক, অভিজ্ঞতা ও অনুতাপ প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকে। মন চোখে দেখে, কানে শোনে। সেই মনই আত্মদর্শন করায়; তজ্জন্য চাই শুদ্ধ স্থির মন।

মনকে উন্নত করাই মানবের আদর্শ-রাষ্ট্রের লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়। কেননা মানব মন দ্বারা চালিত হয়। মন চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্য ও ভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। মুহূর্মুহু, অহর্নিশি ভাব বদলায়। প্রাতঃকালের মন সন্ধ্যায় খুঁজে পাওয়া যায়না। শ্মশানে মৃতের পার্শ্বের মনের ভাব আনন্দোৎসবে থাকে না। মন পবিত্র হয় যদি মানব ভগবৎচিন্তায় রত থাকে। শাস্ত্রে সাধুসঙ্গ ও সৎগ্রন্থপাঠ সর্বদা করা উচিত একারণে বলা হয়েছে মনে হয়। অনেক সময়ে মন পরের দুঃখে দুঃখী হতে দেখা যায় কিন্তু পরের সুখে সুখী হতে খুব কম দেখা যায়। এতেই, কলহ পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ সৃষ্ট হচ্ছে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "চঞ্চল মন শুদ্ধ শান্ত হও। আত্মারূপে পরিণত হও। ইষ্টদর্শন হোক।" "আত্মার চিন্ময় মূর্ত্তিই ইষ্ট" এ কথা বহুবার শুনেছি। তখনই দেখা যাবে নিজ বাসস্থান যেখানে সূক্ষ্ম দেহে আশ্রয় খুঁজবে ইষ্টপূজায় রত থাকবে।

মানবশিশু স্বভাবে জাত, স্বভাবে বর্দ্ধিত হয়। প্রথমেই মাতৃস্তন্য পান করে, শেখাতে হয় না। তখনও ইন্দ্রিয়জাত মনের পরিপুষ্টি হয়নি। মনের সঙ্গে স্বভাবজাত গুণগুলি প্রকাশিত হয়। শৈশবে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতে চায়। যৌবনে বিপরীত ভাবাপন্ন স্ত্রী, পুরুষের সঙ্গে মিশতে চায়; বার্দ্ধক্যে খোঁজে তাহার নিজের খোঁজ; তখনই স্বভাবতঃ ভগবানের খোঁজ পড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন, স্বভাব থেকে দূরে সরে যায়, বিদ্রোহ করে, অহঙ্কার আসে, কষ্ট পায়। সুখ, দুঃখের অনুভূতি হয়। যে মন সরল পরিষ্কার ছিল তাহাতে বহু দাগ পড়ে যায়। সরল উদার মন তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাহারা ভাগ্যক্রমে উদার সরল বিশুদ্ধ মন গঠন করতে পারেন তাঁদের সঙ্গে গুরুশক্তি এসে যোগ দেন। গুরুদত্ত নামে ডাকতে ডাকতে তবেই ত ইষ্টমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ইহাতে ভগবান আছেন ও ইহাতে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়। ইহা সত্য, এবিষয়ে বিশেষভাবে

বলিবার স্থান এখানে নহে। একান্ত চিত্তে সরল মনে তাঁকে ডাকতে থাকলে "স্বপ্রকাশ" দেখা দেন। ক্রমে দেখবে তাঁর লোক, যেখানে সূক্ষ্মদেহে মন স্থূল দেহের অংশে অন্ততঃ কিছুকাল আশ্রয় পাবে।

এ লোকে থাকার সৌভাগ্য তোমাকেই মনের সাহায্যে বা আত্মার সাহায্যে গড়ে তুলতে হবে।

আরও একটা কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে ঃ অক্লান্ত মার্জনা চাই পথও তোমাকে গ'ড়ে তুলতে হবে।

চতুর্দিক অন্ধকার দেখলে চলবে না। দেখতে হবে আলোকে উদ্ভাসিত পথ; সঙ্গে ইষ্টমূর্তি —ভগবান পথ দেখিয়ে স্বস্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। ইহা কল্পনা নয় সত্য। ভগবান রামকৃষ্ণদেব নিজে ইহা দেখেছেন ও বলেছেন। এখন মন যেরূপ অবস্থায় আছে, মৃত্যুর পরেও ঠিক তদ্রূপ অবস্থায় থাকবে, ইহাই অভিজ্ঞতার বাণী। তুমি যেরূপভাবে এখানে থাকছো, অনেকটা সেরূপভাবে সূক্ষ্মদেহে থাকতে চেষ্টা করবে। স্ব-ভাবে মানব-মন চালিত হচ্ছে ও হবে। তোমার ইষ্ট যখন তোমার হৃদয়ে এসে দাঁড়ান তখনিই ত তুমি ইষ্ট দর্শন, আত্মদর্শন, পরিপূর্ণভাবে করতে পারবে।

ক্রমে মন লাভ করবে বিশ্বরূপদর্শন, ব্রহ্মের অনুভূতি। সৌভাগ্যবান হলে পরমাত্মার খেলার অনুভূতি হবে। 'মনকে খোঁজ, আত্মাকে খোঁজ', এ বাণী মহাত্মাদের কাছে শুনেছি। তুমি মন,— আত্মা, জ্ঞানী, ভক্ত, শরণাগত, স্থিতপ্রজ্ঞ। যে প্রেমানুরাগে স্বপ্রকাশকে পাওয়া যায়—যে ভাবে শ্রীমতী রাধিকার মনে জেগেছিল; যে ভাবে নারদ হরিগুণ গান ক'রে বেড়াচ্ছেন; ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব, যেভাবে অনুপ্রাণিত; সেই প্রেমানুরাগের কিঞ্চিৎ আস্বাদন করতে পারলে তাঁকে পাওয়া যায়, শুনেছি। গর্ব, অহঙ্কার, শঠতা, পরচর্চা, হিংসা, অভিমান মনে কখনও স্থান দিও না।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মাকে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করো।

জীবাত্মার চতুর্দিকের কামনা, বাসনা, অজ্ঞান, অহংকার দূর করো। ষড়রিপু ও হিংসাদ্বেষ যেন তাদের অস্তিত্বের দ্বারা মনকে কলুষিত করতে না পারে।

অশিব, অমঙ্গল, মৃত্যু, শোক ও জরা দূরে রাখ। মনে তখন পরমাত্মার খেলা, ব্রহ্মের অনুভূতি হবে। এ যে তাঁরই দয়া—দয়া, অপার করুণা,—সর্বজীবে, সর্বস্থানে, সর্বকালে।

নিজে নিজেই দয়ার খেলা, মনের খেলা সাংসারিক খেলা খেলছেন, এ অনুভূতিতে অজ্ঞান দূরে যাবে, দেহবুদ্ধি থাকবেনা, আত্মবুদ্ধি প্রকাশ হবে। ধরণীতে ব্রহ্মের প্রকাশ হবে, সমস্ত নদীতে ব্রহ্মবারি বহিবে; মৃত্যু ভয় দূরে পালাবে। মরণের সময়ে শান্তমনে স্থিরচিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, মনে হয়।

হে পরমাত্মীয়, পরমবন্ধু, হে সখা, হে মিত্র, হে পিতা, হে মাতা, ভ্রাতা ভগ্নি, কোথায় তুমি?

পিতা বলে তোমাকে ডাকবার সৌভাগ্য পেয়েছি; শৈশবে মাতৃস্তন্য পান করেছি; পুত্র ব'লে কত আদর করেছি; সমস্তই অজ্ঞানে করেছি; কতই না অহঙ্কারে ডুবেছি; অনুতাপও সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি।

সেই অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে সারাজীবন ফুরিয়ে যাবে। শরণাগত হতে সমর্থ হবো না। দুর্ভাগ্য বলতে হবে—চরম দুর্ভাগ্য।

কর্মের বন্ধন, কর্মফলভোগ অহঙ্কারে করতে হয়। ভগবানে কর্মফল অর্পণ করো—কর্মফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। বিশুদ্ধতার মূর্তি সর্বমঙ্গলময়ের নিকটবর্তী কর্মফল হবে, তার সাধ্য কি! কর্মফল জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম হয়ে যাবে। ইহা বহু ঋষি মনিষী বলেছেন।

ভগবানের নামে জীবাত্মা উদ্ধার হয়—তাঁহার নাম একবার করতে পারলেই হল—অজামিলের ন্যায় উদ্ধার করতলগত। তাঁহাকে পাপ স্পর্শিবে, কি স্পর্দ্ধা!

লেখক শুনেছেন যখন পাপের সৃষ্টি হয়, তখন স্থান না পেয়ে পাপ, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার থাকবার স্থান কোথায়? উত্তর পেল, যাহার

হৃদয়ে হরি-কথা নাই সেখানে থাকবে। আর কিছু না পারত মন, একবার হরি বলো—অবসর সময়ে অন্ততঃ হেলায়। মন উন্নত হতে থাকবেই থাকবে। নাম ও নামী যে অভেদ। এ কথা শাস্ত্রে আছে। কেহ কেহ বলেন, চিত্ত-হ্রদে, ইন্দ্রিয়ের বাতাসে, ষড়রিপুর সহায়তায় মন সৃষ্ট হয়। তখন যদি বিবেক হাল ধরতে সম্পূর্ণ সক্ষম না হয় উত্তাল তরঙ্গে মন-তরী ডুবে যাবে অতল তলে; খুঁজেও তাকে পাওয়া যাবেনা। মানব-মন যে সব সদ্‌গুণের অধিকারী তাদের সন্ধান আর মিলবে না।

তখন আসতে হবে তাঁহাকে যিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য আসেন। তবে উহা সবার ভাগ্যে মেলেনা কচিৎ কাহারও ভাগ্যে হয়—রাবণ, কংস উদ্ধার হয়েছিলেন, তবে যদি বিবেক-বুদ্ধি অভিজ্ঞতায় ঠিক ভাবে হাল ধরা থাকে, তখন জীবনতরী ঠিকভাবে চলতে থাকবে। তরঙ্গ কাটিয়ে স্থির জলে পৌঁছে যাবে। সেখানে গুরুশক্তি তোমাকে আহ্বান করছেন, ইষ্টমূর্ত্তি সম্মুখে তোমার আসবেন। বিশ্বরূপ দর্শন হবে। সমস্ত জগৎ তোমাতে, তুমি সমস্ত জগতে।

আত্মার খেলা কি মনোমুগ্ধকর! জীবাত্মা পরমাত্মার অভিন্ন বোধ হবে। জগৎ আত্মবৎ দেখবে; তখন মৃত্যুভয় থাকবেনা। তোমার দেহ ধ্বংস হতে পারে কিন্তু অন্তদেহে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। ভগবৎ-খেলা পূর্বের মতই চলছে। তখন জীবন অনন্ত, কাল অনন্ত, স্থান অনন্ত; অনন্তের সঙ্গে একাকার তুমিও অনন্ত।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

গীতা—১১।১৬

হে বিশ্বরূপ, আমি আপনার আদি মধ্য ও অন্ত দেখিতেছিনা।

অন্তঃকরণের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বৃত্তিই মন। অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। মনের দ্বন্দ্বে সত্যের প্রকাশ হয়—তার সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ এই মনেই অবিশ্বাস প্রশ্রয় পায়। কারণ মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহচর চতুর্দিকে কামনা, বাসনা, কামিনী, কাঞ্চন। উহা ষড়রিপুর আশ্রয়স্থল। ইহা হতে উদ্ধার পেতে হলে ডাকতে হয় তাঁকে এবং নিতে হয় তাঁর নাম। গীতায় শ্রীভগবান বলেন—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

গীতা—১৬।২১

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন প্রকার আত্ম-বিনাশক নরকের দ্বার। অতএব এই তিনটি ত্যাগ করিবে। তিনি আরও বলেন—

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।

গীতা—১৬।২২

হে কৌন্তেয় ছঃখ মোহাত্মক ও শ্রেয়ঃ প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক এই তিনটি নরকদ্বার হইতে মুক্ত হইলে মানব ঈশ্বর ধর্মাদিষ্ট স্বীয় কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় এবং সেই শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান বশতঃ ইহলোকের সুখ-ভোগ ও মনুষ্য জন্মের সার্থকতারূপ শ্রেষ্ঠ গতি (মোক্ষ) লাভ করে।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় গুরুভক্তি ও ইষ্টনিষ্ঠা না থাকিলে দুর্দান্ত মনকে বশীভূত করা দুরূহ। গুরুমন্ত্র সদা জপ ও ইষ্টের ধ্যান ভিন্ন মনকে ঠিক পথে চালিত করা কঠিন। মন্ত্র জপে বহির্বিষয়ী মন আত্মাভিমুখী হয়।

মনকে নিয়ে অনেক সময়ে মুস্কিলে পড়তে হয়। বিষয়াসক্ত মন, কামনা বাসনা যুক্ত মন সময়ে সময়ে অভাব বোধ করে শান্তি পায়না। তখনই ছুটতে হয় সদ্‌গুরুর কাছে। কোথায় তিনি—যিনি ভববন্ধনবিনাশকারী সদ্‌গুরু?

ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধগুরুর আশ্রয় লাভে উদ্ধার পাওয়া যায়।

সুখ, ছঃখ ভাব মাত্র। ইহা সংস্কারগত ও ব্যক্তি-গত। সাধারণ মানবই ইহাদ্বারা বিচলিত হয়।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২।৫৭

যিনি সর্বত্র মমতাশূন্য সেই সেই শুভাশুভতে

(শুভ ও অশুভ বিষয় পাইলে) যিনি আনন্দিতও হন না বা অসন্তুষ্টও হন না, তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনকে স্থির করতে হবে। সুখ দুঃখের তরঙ্গ তথায় থাকবেনা। আত্মবুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করতে হয়। মনের উপর প্রভুত্ব করতে পারলে উহার প্রকৃত সত্ত্বা উপলব্ধি হয়।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
—গীতা ১৩।২২

মন আমাদের দেহাত্মবোধ বজায় রাখে। বহির্বিন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার যোগ রাখে। মানুষের বন্ধন এই মন—সুখ দুঃখের অনুভূতি হয় এই মনে; জন্ম মৃত্যু দেখে এই মন। সত্যিকার জন্ম মৃত্যু ত আর নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
—গীতা ২।২০

মনের গতি অপূর্ব। ইহার গতির বেগ অবর্ণনীয়। সূর্য্যলোক চন্দ্রলোক কিম্বা যে কোন লোকে যেতে পারে। ইহাকে বাঁধতে হবে এবং সে-রজ্জু হবে আত্মবুদ্ধি আত্মজ্ঞান। মনকে জানা দরকার। নতুবা উহা সম্ভব হবে না।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥
—মৈত্রায়ণী উপ ৪।১১

অর্থাৎ, মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয়। ভাবা উচিত—যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্যঃ পঞ্চদশী ১১।১১৩। মানুষের যেমন অন্তঃকরণ, ফলটী হয় ঠিক তদনুরূপ।

কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি॥
মহাভারত শান্তিপর্ব, ১৭৭।২৫

অর্থাৎ, হে কাম তোমার মূল আমি জানি। সঙ্কল্প হইতে তোমার জন্ম। তোমার আর সঙ্কল্প করিব না। তাহা হইলে তুমি সমূলে বিনষ্ট হইবে। দৃঢ় সঙ্কল্প চাই। ভগবান বুদ্ধ আসনে বসিবার পূর্বে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

অর্থাৎ, এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক; ত্বক, অস্থি ও মাংস ধ্বংস হউক। বহু কল্পের দুর্লভ বোধি লাভ না করিয়া এই আসন ত্যাগ করিব না।

আত্ম চিন্তার পূর্বে এইরূপ সঙ্কল্প করতে হয়।

বিশ্বাস করতে হবে, 'আমি দেহ নই, আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা।'

অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট আত্মা অজ্ঞানাবৃত, তজ্জন্য অনাত্মা দেহকে আত্মরূপে গ্রহণপূর্বক দেহের মৃত্যুতে নিজের মৃত্যু কল্পনা করে। অজ্ঞ ব্যক্তি পুনঃপুনঃ মৃত হন, কিন্তু

"আত্মা ইব ইদং সর্বম্" —ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২

অর্থাৎ, আত্মাই এই সমস্ত।

দৃগ্‌দৃশ্যৌ যৌ পদার্থৌ স্তঃ পরস্পরবিলক্ষণৌ।
দৃগ্ ব্রহ্ম দৃশ্যং মায়েতি সর্ববেদান্ত ডিণ্ডিমঃ॥

দুই পদার্থ, দৃক ও দৃশ্য আছে। দৃক্ (দ্রষ্টা) ব্রহ্ম; চৈতন্যস্বরূপ বিজ্ঞাতা প্রকাশক ব্রহ্ম—আত্মা দৃশ্য—জড়, বিষয়, অনাত্মা। এই আত্মার উপলব্ধি, ইহাতে বিশ্বাস আনিতে পারলে আত্মচিন্তা সার্থক হয়।

উপনিষদে বলা হয়েছে,

'সর্বমিদং খলু ব্রহ্ম'

গীতায় বলা হয়েছে

'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন
স্থিতো জগৎ'। ১০।৪২

পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং
দিবি। ছান্দোগ্য উপ ৩।১২।৬

অর্থাৎ ইহার (ব্রহ্মের) একপাদ সর্বভূত এবং তিন পাদ স্বর্গে অক্ষয়।

তিনপাদ—স্থির শান্ত-সমুদ্রের শান্তজল—নিত্য ব্রহ্ম—ঠাকুরের মত।

লীলায় ঝড় ওঠে—বাতাস বয়- সে বাতাস ত্রিগুণাত্মিকা মায়া—ইন্দ্রিয়ের খেলা।

চিত্ত স্থির শান্ত রাখতে হবে, যেন ইন্দ্রিয়ের খেলা — ত্রিগুণাত্মিকা খেলা না থাকে।

মনকে আয়ত্তে আনতে পারলেই চিত্তের স্থৈর্য্য আসবে, ব্রাহ্মীস্থিতি হবে।

মনের সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়ের বাতাসে—কামনা, বাসনা দেহ তৈয়ারী করে। কিছুই চাহিনা—ইন্দ্রিয়ের খেলায় বিচলিত হবো না। আনন্দ, শান্তি সুখ কিছুই নাই।

চিত্ত স্থির, শান্ত, তরঙ্গহীন ; তুরীয় অবস্থা ; কারণ-দেহে কিংবা মহাকারণে অবস্থান।

আয়ত্তে আত্মনা তুষ্টঃ ; দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয় ক্রোধঃ হও।

ব্রহ্মজ্ঞানে ত্রিবিধ দুঃখের নাশ হয় -আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

কিছু দেখেও দেখেনা—শুনেও শুনেনা—তুমি ত আত্মা।

ধুলো ময়লা দূর কর, চিত্তমার্জন কর—পরমাত্মার ধ্যানে সমাহিত হও—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে শুনেছি। তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, কামনা বাসনা কিছুই নও। তুমি যে আত্মা, পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন।

শয়ন, ভোজন, দেহের কোন কর্ম্মের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ নাই—দেহ তো ধ্বংস হবে—তুমি কিন্তু —'অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্য মানে শরীরে।' মনকে জয় করো। সহজ পথ গুরুমন্ত্র জপ—আনন্দ পাওয়া যায়। মুনি ঋষিরা ত্যাগের পথে 'নেতি, নেতি' বিচার ক'রে আত্মার কথা বলে আমাদের শান্তির পথ খুঁজে দিয়েছেন।

তাঁরা মনকে আত্মায় লীন করতে চান। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সমূহ হতে দূরে থাকতে বলেন। তাঁরা বলেন, ইন্দ্রিয়জাত সুখ, সুখই নয়। অজ্ঞানপ্রসূত কল্পনা, ক্ষণস্থায়ী।

সমাধিতে আত্মা দেহে থাকেনা। আত্মার নিকটে ধুলো ময়লা কামনা-বাসনা না থাকলে সে বাহিরে যায়, অন্যান্য পবিত্র আত্মার সহিত মিলতে খেলতে —আনন্দময় আত্মার খেলায় যোগ দিতে। আত্মা পুনরায় সাধারণতঃ দেহে ফিরে আসতে চায় না, তবে কয়েক জনের বেলায় ইহা সম্ভব হয়েছে : যেমন—শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণদেব ইত্যাদি।

কোন কোন মূর্ত্তি-উপাসকের (সগুণ ব্রহ্মের) আত্মা বিদেহে ইষ্টমূর্ত্তি বা ভগবানের উপাসনায় সেই লোকে যায়।

ইষ্ট-পূজায়—ভগবানের পূজায় সময় কাটে। কেহ কেহ ইহাকে সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য মুক্তি বলে। পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন আত্মার ভাবকে নির্বাণ অবস্থাও বলা হয়।

এইসব সাধকদের জগতের আকর্ষণ না থাকাতে দেহ তৈয়ারী হয় না।

ভগবানকে ডাকতে ডাকতে—নাম জপ করতে করতে—স্বপ্রকাশকে দেখতে দেখতে—মানস-পূজায় রত থাকতে থাকতে—চতুর্দ্দিকে আত্মার খেলার উপলব্ধি হয়।

বিষয়-বাসনারহিত হয়ে যায় ; মন স্থির হয়। আত্মভাব প্রকাশ পায়।

ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।
মহানির্বাণতন্ত্র, ৩।৫৯

—:)•(:—

STUDENTS' COMMON-ROOM

সত্য

শ্রীজনা সমাদ্দার

যে জিনিষ যেরূপভাবে দেখা যায়, শুনা যায়, ভাবা যায় ও তাহা অনুরূপভাবেই ব্যক্ত করা হয় তাহাকেই সত্যবাদীতা বলে। 'সত্য' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেই মনে একটি উচ্চ, উদার, শুদ্ধ ও পবিত্রভাবের উন্মেষ হয়।

পুরাকালে গুরু-গৃহে অবস্থান করিয়া ছাত্রদের অধ্যয়নের নিয়ম ছিল। তখন সেখানে কেবলমাত্র নানাপ্রকার বিদ্যাই যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনেরও শিক্ষা দেওয়া হইত। চরিত্রগঠনের ঋষিপ্রদত্ত নিয়মাবলীর সর্বপ্রথম নিয়ম—'সত্য'। চরিত্রগঠনের ভিত্তিস্বরূপ সত্যকে গ্রহণ না করিলে ছাত্রেরা অধ্যয়নরূপ তপস্যায় যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না তাহা তাঁহারা নিজেদের জীবনে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য পালন ছাত্র-জীবনের একান্ত কর্তব্য। 'সত্য' ইহার প্রথম সোপান। গৃহে প্রত্যাগমনের সময় গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন—"সত্যং বদ, সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্—বাক্যে সত্যপরায়ণ হইবে, সত্য হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না।"

বিদ্যাশিক্ষা করা ও চরিত্রগঠনের উপযুক্ত সময়—বাল্যকাল। কারণ, প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে বাল্যকালের শিক্ষা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর। মনীষী John Milton বলিয়াছেন—"Childhood shows the man, as morning shows the day."

এই সময় মানুষ জগৎ সম্বন্ধে এবং সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ প্রভৃতির জ্ঞান ক্রমে ক্রমে আহরণ করিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ একই চিন্তা এবং একই কাজ করিলে উহা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়। সেই কারণে পূর্বে গুরুগৃহে অবস্থানকালে তাঁহার তত্ত্বাবধানে এবং উপদেশে ক্রমে সত্যানুরাগ জন্মে এবং সত্যের উপকারিতা ও নিষ্ঠা কোমল মনের উপর এরূপভাবে রেখাপাত করিত যে, উত্তরকালে উহাই তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশিত হইত। বোধ হয় এই নীতির উপর মানুষের চরিত্র-গঠিত হইত বলিয়াই তাঁহারা সত্যবাদী ছিলেন এবং সেই যুগের নাম ছিল 'সত্যযুগ'। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সত্যের মহিমা প্রকাশার্থে মহাকাব্য মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" এই সত্য সংবাদটি তাঁহাকে বলেন। কিন্তু সংবাদটি সত্য হইলেও যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য ছিল—দ্রোণাচার্যের মনে অশ্বত্থামা নামে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া এবং এইজন্য ইচ্ছাপূর্বক যুধিষ্ঠির 'গজঃ' কথাটি এত নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, দ্রোণাচার্য তাহা শুনিতে পান না এবং যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যও সফল হয়। যুধিষ্ঠিরের উক্তি সত্য হইলেও নিহিত উদ্দেশ্য অসত্য ছিল এবং এইজন্যই উহা মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে নরকদর্শন করিতে হইয়াছিল।

'সত্য' চরিত্রগঠনের প্রধান অঙ্গ হইলেও উহা কেবলমাত্র উপদেশদ্বারা যে শিক্ষনীয় নয় তাহা স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়:

"আমরা জগতের সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, 'সাধু হও' 'সাধু হও', 'সাধু হও'। বোধ হয় জগতের কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই যে 'মিথ্যা কহিও না', 'চুরি করিও না' ইত্যাদিরূপ শিক্ষা পায় নাই। কিন্তু কেহ তাহাকে এসকল অসৎকর্ম হইতে নিবৃত্তির উপায়

শিক্ষা দেয় না। শুধু কথায় হয় না। কেনই বা সে চোর না হইবে? আমরাও তাহাকে চৌর্য কর্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দিই না। কেবল বলি 'চুরি করিও না', 'মিথ্যা কহিও না'। মনসংযম করিবার শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য করা হয়, তাহাতেই তাহার শিক্ষা ও উপকার হইয়া থাকে।"

বর্তমানকালে দেশের দারিদ্র্য এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব বর্তমান শিক্ষার উপর এরূপভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, সত্য, সততা প্রভৃতি নীতির মূল্য সাধারণ জীবনে একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। বিকৃত শিক্ষা এবং অল্প জ্ঞান জীবনের কর্মক্ষেত্রে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য না করায় ফলে প্রায় সমুদয় জীবনখানা দুঃখ, শোক এবং অনুশোচনা ও অশান্তিতে কাটাইতে হয়। কারণ, চরিত্রের ভিত্তি দৃঢ় নয়, সত্যে নিষ্ঠা নাই, তাই মিথ্যার সাহায্য লইতে হয় এবং মিথ্যার মধ্যে লুকাইয়া থাকে জগতের যত পাপ, অন্যায় প্রভৃতি। মিথ্যা কখনও সত্যের নিকট মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। মিথ্যাবাদীকে সকলে অবিশ্বাস করে এবং সত্যের নিকট পরাজয়ের গ্লানি সারাজীবন তাহাকে ভোগ করিতে হয়। সত্য গোপন করিবার জন্য যে পথ অবলম্বন করা হয়, তাহাই মিথ্যা। গোপনতাই পাপ, অতএব মিথ্যাও পাপ।

"সত্যং শিবং সুন্দরম্"—একদিকে শিব যেমন সুন্দরের প্রতীক, অপরদিকে তেমনি সত্যের। ঈশ্বর মৃত্যুহীন তেমনি শাশ্বত। 'সত্য ঈশ্বরস্বরূপ।' সেই-জন্য সত্য অসীমশক্তিশালী। পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাহাকে সত্য বিদ্ধ করিতে পারে না। সত্য মানুষকে অসমসাহসিক করিয়া তোলে এবং মিথ্যা মানুষকে দুর্বল ও সঙ্কীর্ণ করে।

"সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্। সত্যেনৈষ পন্থা বিততো দেবযানঃ"—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয়লাভ হয় না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্ম-লাভের একমাত্র পথ রয়েছে, কেবল সেইখানেই প্রেয় ও সত্য বর্তমান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—নির্ভয়ে সত্য কথা বল। সত্য সনাতন, সত্যই আত্মাস্বরূপ। সত্যলাভ করার জন্য যদি নরকের ভিতর দিয়েও যেতে হয়, তাতেও পেছ্‌পা হয়ো না। এইরূপে সত্যের পরীক্ষা করিতে হয়—যাহা তোমাকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে দুর্বল করে, তাহাই অসত্য। তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর। ইহাতে জীবনীশক্তি নাই। একমাত্র সত্যই শক্তির আধার, শক্তি সঞ্চার করে, চিত্তকে আলোকিত করে এবং কর্মে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করে। সত্যই পবিত্রতা এবং সত্যই জ্ঞান।

"যে জ্ঞান হৃদয় এবং মনকে বিশুদ্ধ করে তাহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান। আর সবকিছুই জ্ঞানের পরিপন্থী, সত্যকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানের উন্মেষ।"

মানুষের জীবনকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—জাগতিক ও আধ্যাত্মিক। জাগতিক জীবনে সত্য নিজেই সত্যের পুরস্কারস্বরূপ। জীবনের কর্মক্ষেত্রে সাহস, শক্তি, প্রেরণা যোগায় সত্য। তাই জাগতিক-জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার মূলে সত্যের দান অমূল্য। সত্যপালনকারীর চারিত্রিক প্রভাবও কেবলমাত্র নিজপরিবারমধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—সমাজ-জীবনের উপরেও বিস্তারলাভ করে। ইহাতে গোষ্ঠীরও মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে এরূপ শোনা যায় যে, যদি কেহ যাদশবৎসর একভাবে সত্যপালন করিতে পারে তাহা হইলে সে বাক্‌সিদ্ধ এবং জাতিস্মর হয়। আর আধ্যাত্মিক জীবনে সত্যই হইতেছে সিংহদ্বার। ইহা ব্যতীত এক পা'ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সত্যই ক্রমে সহিষ্ণুতা, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি আনয়ন করে। সত্যের গুণাবলী অবর্ণনীয়। ইহার জন্য উপযুক্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, অনুরাগ এবং প্রয়োজন হইলে যথেষ্ট পার্থিব কষ্ট স্বীকার করিবার মত মনোবল থাকিলেই কেবল-মাত্র হয়ত শেষপর্যন্ত সত্যলাভ হওয়া সম্ভব। ইহার মোটামুটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী হইতে আমরা হৃদয়-ঙ্গম করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন—"কলিযুগে লোকের আয়ু কম এবং তাহাদের জীবিকানির্বাহের জন্য উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়, কাজেই তাহারা বেশী ধ্যান

অপ করিবার অবসর পাবেনা। এ যুগে সত্যই এক-মাত্র সাধনা।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"সত্যের উপর তুমি প্রতিষ্ঠিত হও, তাহা হইলেই তুমি ভগবানকে লাভ করিবে।"

সত্যই মানুষের মুক্তিসাধন করে। দার্শনিক Santayana বলিয়াছেন—"The truth is cruel but it can be loved and it makes free those who have loved it."

মহাপণ্ডিত চাণক্যের উপদেশানুযায়ী আমাদের সাধারণ জীবনযাপনে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে,—"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্—" সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু সত্য অপ্রিয় হইলে বলিবে না। অপ্রিয় সত্য কাহারও মনে দুঃখ দান করিলে বলিবে না।"

কেবলমাত্র সত্যকথা বলিলেই হইবেনা, সঙ্গে সঙ্গে সত্যচিন্তা ও সত্যকর্ম করিতে হইবে। তাহা হইলেই সত্য পূর্ণাঙ্গ হইবে। অবশ্য নিষ্ঠার সহিত সত্যপালন করিলেই সত্যচিন্তা, সত্যকর্ম, অহিংসা দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি ঐশ্বরিক গুণাবলী আপনা হইতেই চরিত্রের মধ্যে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। যে সত্য-বাদী, সে নির্ভীক। কাহারও নিকটে সে মাথা নত করেনা, সকলের উর্দ্ধে তাঁহার স্থান। সত্যবাদী সর্বদাই চিত্তে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। যে সত্যাশ্রয়ী সে ঈশ্বরাশ্রয়ী এবং সে সতত ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে।

আমরাও ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করিবার নিমিত্ত কবির সহিত সম্মিলিত কণ্ঠে বলি—

মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পুজিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন,
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখ সহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়।

স্বর্গ কথা কয়

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্জাব পৌরুষ পুর, ভূনিষন্ন তৃণাঙ্কুর
নাই সেথা—নাই।
মিহিরের অগ্নিরাশি ব্রহ্মাস্ত্রির মতো আসি'
নামে সেই ঠাঁই।
মহামন্ত্রে নানকের কয়ে সেই আগুনের
ঘৃতাহুতি দান:
আকুলি' আকাশ-তল জ্বলি' উঠে হোমানল
দিব্য দ্যুতিমান।
সে বহ্নির গর্ভ হতে বাহিরায় শতে শতে
—বাহিরায় শিখ,
সদ্য-দীপ্ত, বলীয়ান, ধর্মমদে মহীয়ান,
উদ্দাম, নির্ভীক।
বীর গুরু বাহাদুর জনিয়া উদাত্ত সুর
করেন প্রচার—
"ধর্ম তোমাদের প্রাণ, ধর্ম তোমাদের মান,
ধর্ম সর্বসার।
সেই দেবধর্ম হতে টেনে নিতে পক্ষপাতে
যে তোমারে চায়,
ধর্ম তব খরশান উত্তর কৃপাণ দান
সেই দুরাত্মায়।

অভ্রভেদী বাধা যত করি' দীর্ণ, পদাহত,
করি' ধূলিসার
তোমার ধর্মের ধ্বজ ঊর্ধ্বে তুলি' অসম্বরণ
ফরুক বিহার।"

গুরুর বিষাণ-মন্ত্রে পঞ্জাবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বাজে প্রতিধ্বনি :
খালসার ঘন রোলে বিদ্যুৎহিল্লোলে দোলে
আকাশ—অবনী।
সহস্র প্রাণের ধারা, ছিন্নবিধা, দিশাহারা,
মিলে একসাথ ;
অমৃত ললাটে জাগে দ্যুলোকের রশ্মিরাগে
পাপয় প্রভাত।
দশ দিক প্রকম্পিয়া উঠে অগ্র ঝলসিয়া,
উঠে শৃঙ্গনাদ।
দিল্লীর কিলার চূড়ে সম্রাটের মুণ্ড ঘুরে
গণিয়া প্রমাদ।

শিখের গুরুর পালে চর আসে—ঝড় আসে !
—ঘোষে সমাচার
"এই দণ্ডে অবিলম্বে হাজির হইতে হবে
দিল্লীতে তোমার।"
শুনিয়া উদ্ধত বাণী, ভৈরব-ভ্রূকুটি হানি'
গর্জে শিখদল।
গুরু কহে, "হ'ক তাই। ইথে যদি ভয় পাই,
কিবা মোর বল !
ধর্ম হবে বর্ম মোর, সঙ্কট-সংঘাতে ঘোর
করিবেক ত্রাণ।
তোমরা জাগিয়া থেকো, অনল জ্বালায়ে রেখো,
আমি চলিলাম।"

দিল্লীশের দুর্গ-তলে অগ্রধর দলে দলে
কৃতান্ত-প্রতীক।
সেথা, ভীম সঙ্কুপ্রায়, আত্মাহুতি-মহিমায়
দাঁড়াইল শিখ।

ভূপ কহে, "গুরুজীর পাদস্পর্শে এ দিল্লীর
ধন্য হ'ল ধূলি।
কিন্তু, তুমি এইখানে এলে রাজসন্নিধানে
শিষ্টাচার ভুলি'।
অশোভন বেশ-বাসে, কে আসে রাজার পাশে,
কহ মোরে ভাই।
সুশোভন অলংকার পর তুমি এই বার,
—এইটুকু চাই।"

অন্তরালে রূপকের পরধর্ম গ্রহণের
হেরিয়া ইঙ্গিত,
সাধু কহে স্মিত ভাষে, "হের ঐ মহাকাশে
—হের, মহীভৃৎ !
একক তপন জ্বলে সহস্র সরসীজলে
রাজে চিত্র তার ;
এক সে অনেক—জানি', আমি মোর ধর্মমানি
বিশ্বাসে অপার।"
দর্পী কহে, রক্ত চোখে, "ভুগিতে হইবে তোকে
এর পরিণাম—
কারাগারে অনাহারে, আনুষঙ্গিক অত্যাচারে,
দগ্ধ হ'বে প্রাণ।"

শিখ কহে, "মহাশয়, কী তুমি দেখাও ভয় !
যেবে যায় তরী,—
এক পারে র'বে সুখ আর পারে র'বে দুখ
ধূলিতলে পড়ি'।"
প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে চাবুক মারিয়া গাত্রে
যাতক তখন,
সিংহেরে শিকল দিয়া, অন্ধকূপে নিক্ষেপিয়া,
করে নিষ্পীড়ন।
অসি হানে যত বার, শিখ গর্জে তত বার,
"অকালের জয়।"
তমোময় কারাঘরে নরকের সে বিবরে
স্বর্গ কথা কয়।

৺শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ পরিক্রমা

ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য

পূর্ব্ব হইতেই অন্তরে অন্তরে বাসনা চলিয়াছে হৃষীকেশ দর্শনের এবং সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার। ক্রমে অন্তর্নিহিত বাসনা যখন প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন ইহা বাহিরে সচলরূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল আশ্রমাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামিজী মহারাজের নিকট। আমার অন্তর যে হৃষীকেশ দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি অনুভব করিলেন। আমাকে বুঝাইলেন, আশ্রমের কাজ ছাড়িয়া একটানা অনেকদিন ঐভাবে থাকা সম্ভব নয় এবং ঠিকও হইবে না। এইভাবে উভয়ের মাঝে সপ্রশ্ন ও সস্নেহ কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে দিন পনের কিংবা একমাসের জন্য হৃষিকেশে গিয়া থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "সামনে ৺শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২০তম জন্মবার্ষিক উৎসব, তাছাড়া আশ্রমের দুটি অনাথ বালকের উপনয়ন সংস্কারের দিন ঠিক হয়ে আছে, এ দুই কাজ হয়ে যাওয়ার পর আপনি না হয় কেটে পড়বেন আর কি!" আমার মন প্রফুল্লিত হইল, কিন্তু খুবই গম্ভীর হইয়া পড়িলাম। তারপর উৎসবের কাজে ধুমধাম পড়িয়া গেল। এইভাবে মহাসমারোহে ৺শ্রীশ্রীপ্রভুর কাজ এবং ক্রমে উপনয়ন দুইই সুসম্পন্ন হইবার পর স্বামিজী মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে যাওয়া হচ্ছে?" উত্তরে বলিলাম, "মনে করেছি ওই যে রওনা হব।" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "৬ তারিখ কি দিন ভাল?" কিছুটা আশ্চর্য্য হইয়া আমি বলিলাম, "দিনের আবার ভাল মন্দ কি?" আপনি যেদিন বলবেন, না হয় সেইদিন রওনা হব। স্বামিজী মহারাজ মধুর ভঙ্গিতে মিষ্টি হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না, না, ওসব ৺ঠাকুরও মানতেন; মেনে চলাই ভাল,"...ইত্যাদি। সেদিন সহর হইতে দ্বিপ্রহরে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামিজী মহারাজ আমাকে উপরে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "আপনি ৩রা মে রওনা হতে পারেন, দিন মন্দ নয়।" তারপর কোন্ গাড়ীতে রওনা হইলে আমার পক্ষে সুবিধা হইবে, ইত্যাদি বিষয় স্থানীয় রেলষ্টেশনের সহিত টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলিয়া সব ঠিক করিয়া দিলেন।

অবশেষে আমি সন ১৯৫৩র মে মাসের ৩ তারিখে রাত্রি দশ ঘটিকায় লক্ষ্ণৌ মেলে হৃষীকেশের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমি আশ্রম হইতে স্থানীয় রেলষ্টেশনে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী মহারাজ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি এসে গেছেন, গাড়ীর কত দেরী আছে?" তাঁহার এ কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার পর তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন গাড়ীর খবর লইতে এবং কোন্ লাইনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা জানিবার জন্য। ইতিমধ্যে রেলেরই কয়েকজন কর্ম্মচারী আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাহারা আমাকে বলিলেন, "আপনি একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন, গাড়ী পৌঁছে গেলেই আমরা আপনার গাড়ীতে বস্‌বার ব্যবস্থা করে দেব। কারণ এ গাড়ীতে বড় বেশী ভিড় হয় কিনা তাই।" অল্প কতক্ষণের মধ্যে গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়াই রহিয়াছি। স্বামিজী মহারাজ উপযুক্ত কামরার জন্য অতি দ্রুত গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আত্ম-ভোলার মত। আমার জানা ছিল তাঁহার বুকের অবস্থা ভাল নয়। তাড়াতাড়ি কিছুক্ষণ পায়ে চলিলেই অত্যধিক জোরে শ্বাস হইতে থাকে এবং সেইজন্য তাঁহাকে খুবই কষ্ট পাইতে হয়, ঠিক এমত অবস্থায় প্লাটফরমে আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "যাঃ! গাড়ী

ছেড়ে দিচ্ছে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে, আপনার মত ---।" আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম, তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া চট্ করিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, আর মনে মনে ভাবিতেছি, যাঁহাকে প্রতিনিয়ত শান্ত, গম্ভীর অবস্থায় আশ্রমে দেখিয়া থাকি, যাঁহাকে অল্প অথচ মিষ্টভাষী বলিয়া জানি এবং যাঁহার সহিত আশ্রমে কাজ করিবার কালে কোন ভুল ত্রুটির জন্য বজ্রসম কঠোর বলিয়া স্মরণ করি, আজ তিনি এইখানে আমার জন্য··· । যাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র তুলনা হয় না সেই তিনি আজ এই মুহূর্ত্তে যেন সমবয়স্ক, সমবুদ্ধি ও সমকর্ম্ম প্রবণতার ভিত্তিতে বন্ধুর সুব্যবস্থায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে শরীর আমার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, কিন্তু গাড়ীতে উঠা এক প্রকার অসম্ভব অবস্থা ছিল ; কারণ সমস্ত গাড়ীতে মাত্র একটাই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা ছিল। ইহাও খুব বড় নয়। উহাতে যেন তিল ধারণের স্থান ছিল না। একে ত গাড়ীতে সশরীরে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য, তদুপরি ট্রাঙ্ক, ও প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র রহিয়াছে। আমাদের সকলের সমবেত ধস্তাধস্তির ফলে অতিকষ্টে কয়েকজনের পার্শ্বদেশে ট্রাঙ্ক ও বিছানা রাখা সম্ভব হইয়াছিল এবং অনন্যোপায় হইয়া তখন ওই ট্রাঙ্কের উপরেই আমি বসিয়া পড়িয়াছিলাম। এইভাবে গাড়ী শোনপুর জংশনে পৌঁছিলে গাড়ীতে একজন টিকেট চেকার প্রবেশ করিলেন। তখন দেখা গেল এতক্ষণ যাহারা বেশ শান্তশিষ্ট ছিল তাহারা প্রায় সকলেই অনেকখানি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রধান হইল ইহারা অনেকেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল বিশ্ববিশ্রুত বেদান্ত কেশরী স্বামী বিবেকানন্দ যে দেশ ও জাতির উন্নতি কল্পে "শিক্ষা" "শিক্ষা" বলিয়া এত চিৎকার করিয়া গিয়াছেন সেই দেশ শিক্ষার দিক হইতে এখনও কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যাহোক, টিকিটের যাত্রীদের নিকট অতিরিক্ত ভাড়া দাবী করিলে কোন কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত পয়সা দিয়া দেয় এবং অপর কোন কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত পয়সা দিতে না পারায় টিকিটসি রেলওয়ে পুলিসের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে রেলওয়ে ষ্টেশনের ভিতরের দিকে লইয়া গেল।

তারপর আমরা মাত্র পাঁচ ছয়জনই গাড়ীতে রহিলাম। এখন হইতে গাড়ীতে প্রচুর জায়গার ব্যবস্থা হইয়া যাওয়ায় আর কোন অসুবিধা রহিল না। বেশ আরামে 'শয়নং কুরু কেশব' করিবার জন্য অতঃপর বিছানা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ভোরে সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় মেল গোরখপুরে পৌঁছাইল। গাড়ী ছাড়িবে এমন সময় একভদ্রলোক ধূমপান করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং জানলার পাশে দাঁড়াইলেন। একটু পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্ জগহমে আপ বৈঠ্ সকতা হুঁ ?" উত্তরে আমি বলিলাম, "জরুর, বৈঠিয়ে।" বেশ প্রফুল্লিত মনে ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে আমার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার নাম ও ঠিকানা শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিয়া ফেলিলেন, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা ত তাহলে এক গুষ্টির লোক। বেলুড় মঠের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট আমার গুরু মহারাজ। আমরা উভয়েই এক পতাকার নীচে রয়েছি. বেশ বেশ,···আপনার নাম যতীন্দ্র দাস, রেলের কন্ট্রাক্টরি করি ?" পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন ?" উত্তরে বলিলাম, "হৃষীকেশ," শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, "খুব ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। আমিও হরিদ্বার যাচ্ছি, একসঙ্গে অনেকখানি রাস্তা যাওয়া যাবে।" ভদ্রলোকের এতসব কথার সঙ্গে ধূমপান কিন্তু বেশ পুরাদমেই চলিতেছিল। তাঁহার বর্ণিত একগুষ্টি ও এক পতাকার নীচে ইত্যাদি কথাগুলি যতই আনন্দের ও শ্রুতিমধুর হউক না কেন, তিনি কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে কোন একজনের এত নিকটে বসিয়া তাঁহার এত ধূমপান রুচিসঙ্গত বলিয়া সকলের পক্ষে স্বীকার করিয়া নেওয়া সম্ভব হইবেনা। একটু পরে আমি সামান্য হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "বড় ভাল লাগ কিন্তু ধূমায়িত হইতেছে," তিনি একটুতেই বুঝিলেন ও সলজ্জভাবে সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দূরে বসিলেন

এবং তাড়াতাড়ি আরও কিছুটা পান করিয়া তবেই ইহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন, "Really খুব বেশী ভুল করে ফেলেছি, স্বভাবে এটা যে অভ্যাগত হয়ে গেছে। ডাক্তার আমায় কতবার বলছেন, কিন্তু একদম ছেড়ে দিতে পারছি না..." ইত্যাদি। সে যাহা হউক, বুঝিলাম মণীন্দ্রবাবু সরল প্রকৃতির লোক। রাস্তায় অনেকখানি তাঁহার জন্য আমার সুবিধা হইয়াছিল ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এইভাবে ক্রমে বেলা সাড়ে বারো ঘটিকায় আমাদের গাড়ী শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে লক্ষ্ণৌ জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবার পর আমরা উভয়েই কুলির সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে তখনকার মত আশ্রয় গ্রহণ করি। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন অতি সুন্দর। শুধু তাই নয়, হঠাৎ সুরম্য প্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার সকল দিক সুব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। এই লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের বড় বড় বাড়ী ও সুব্যবস্থাপূর্ণ বিশ্রামাগার ইত্যাদি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, ভারতের প্রতিটি ষ্টেশন কতদিনে এবম্বিধ রূপ পরিগ্রহ করিবে। তবেই বোধ হয় স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সত্তার কিঞ্চিন্মাত্র বাহিরে প্রকাশ ঘটিবে। যাহা হোক, আমরা যে বিশ্রামাগারটির মধ্যে ছিলাম সেটি অন্ততঃ ৪০'×৩০' ফুট হইবে। শ্বেত পাথরে বাঁধান মেঝে হইতে দেওয়ালে ৪½' ফুট পর্য্যন্ত খুব ভাল মোজাইক করা রহিয়াছে। তন্মধ্যে যথাসম্ভব চেয়ার টেবিলের সুব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় বিজলী পাখার কোন ত্রুটি নাই। জামা কাপড় ও যাঁহারা টুপি ব্যবহার করেন, তাঁহাদের জন্য ঐ সমস্ত রাখিবার অনেকগুলি ক্লিপ্ লাগান রহিয়াছে। তদুপরি প্রসাধনের সুবিধার জন্য বেশ বড় টেবিল—আয়না রহিয়াছে। বিশ্রামাগারের সংলগ্ন স্নানাগার; স্নানাগার অনেকগুলি, ভিতরে বেশ প্রশস্ত জায়গা এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রাখিবার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। এক কথায় বিশ্রামাগার হইতে আরম্ভ করিয়া স্নানাগার, পায়খানা ইত্যাদি ইহার সকল দিকই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিবার পর কিছুটা ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। এমন সময় পিছন হইতে একটি লোক আমাদের সম্মুখে আসিয়া নিঃশব্দে অঙ্গুলী সঞ্চালনে আমাদের বুঝাইয়া দিল, ট্রাঙ্ক, ও বিছানাপত্র এদিকে এইখানে রাখুন। আমরাও আর কোন আপত্তি না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার চিহ্নিত জায়গায় রাখিলাম, তারপর লোকটির দিকে তাকাইয়া দেখি, এই লোক একজন রেলেরই কর্ম্মচারী, বিশ্রামাগারের রক্ষক। লোকটির মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী, সাদা এক আলখাল্লা পরিহিত ও তাহার উভয় কর্ণদেশে অঙ্গুরীয়ম পিতলের বলয় ঝুলিতেছে এবং তাহার কোমরে কোম্পানির নিশানা স্বরূপ পিতলের ব্যাজ্ রহিয়াছে। লোকটি দীর্ঘকায় বটে, কিন্তু তাহার গণ্ডদেশ বাহিরের সমস্ত বস্তুনিচয় হইতে বিদায় নিয়া প্রায় অন্তর্মুখী হইয়া গিয়াছে। অপরপক্ষে বড় বড় তাহার রক্তচক্ষু বাহিরের দিকে যেন উঁকির মত ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; লোকটি আমাদের কুর্নিশ করিল এবং অতি বিনয়ের অবতার হইয়া আমাদের দিকে কিছুটা সমীহ ও সলজ্জভাবে দৃষ্টিপাত করিলে পর সঙ্গী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ঠিক হ্যায়, মত্ ঘাবড়ানা, চল্‌নেকে বক্ত্ কুছ্ মিল যায়েগী," আমি নীরব, নিঃশব্দ, তারপর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকটির এই কুর্নিশ, কিছুটা সমীহ ও সলজ্জতার মাধ্যমে আমাদের কাছে তার অন্তরের যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল, তা কিসের জন্যে?" সঙ্গী উত্তরে আমাকে বলিলেন, "এই উৎকণ্ঠা হচ্ছে গোল চাকতির জন্যে।" আমি ত শুনিয়া অবাক। তারপর সঙ্গী তাঁহার বিছানা পাতিয়া আরাম করিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও আমার স্নান ও আহার সমাপন করিয়া একটি আরাম কেদারায় বসিয়া পাখার হাওয়া সেবন করিতে লাগিলাম। এইরূপভাবে আরও কয়েকজন ভদ্রলোকই আরাম কেদারায় বসিয়া রহিয়াছেন এবং অন্যান্য দিকে মা-মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ সকল আপন আপন ভাবে ও রঙ্গেচঙ্গে বিভোরা হইয়া রহিয়াছেন। তাহাদের চোখে মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে সামর্থ্য ও বিদ্যা আভিজাত্য

বোধের বিষময় বহ্নি। এমনসময় এক নাপিত তাহার যন্ত্রপাতি সহ একটি আরাম কেদারার সামনে অগ্রসর হইল। সে আরাম কেদারার নিকট গিয়াই ঐ ভদ্রলোকের কাছে নীরব ও শান্ত সুরে বুঝাইতে চাহিল—এই দীন সেবকের কোন প্রয়োজন বোধ করেন কি-না। নাপিতের এবম্বিধ ভাব প্রকাশের পর ভদ্রলোক স্বীয় গণ্ডদেশ স্বহস্তে মার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহাকে তাহার স্বধর্ম্ম পালন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পাইয়া নাপিতের ঘাদু মণ্ডলীতে তরতর্ করিয়া রক্তের নতুন চাপ বহিতে লাগিল। তাহার মুখে কথা নাই, কিন্তু চোখের কোনে ফুটিয়া রহিয়াছে প্রভুর প্রতি তাহার নীরব দাসিত্বের কথা; সে অতি দ্রুত অথচ শান্তভাবে প্রভুর গণ্ডদেশে সাবান মাখাইয়া ক্ষুরের দ্বারা পালিশ করিতে আরম্ভ করিল; নাপিতের শ্রীহস্তে খুবই সন্তর্পণের ভাব এবং চোখে সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। এই সেবার কাজ সম্পূর্ণ হইবার পর ক্ষণিকের প্রভু তাহার পকেটে হাত দিলেন। দুঃখের বিষয়, পকেটে খুচরা পয়সা ছিলনা; বাধ্য হইয়া বড় মনিব্যাগ হইতে একটি আধুলি নাপিতের হাতের উপর নিক্ষেপ করিল। নাপিত শশব্যস্তে করজোড়ে জানাইল, তাহার সঙ্গে আধুলির পয়সা নাই। ক্ষণিকের প্রভু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এবং নিজের সম্প্রসারিত হস্তের ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন, "যাঃ ব্যাটা, আধুলি ও তোকেই দেওয়া হয়েছে, তোর থেকে আবার পয়সার ইচ্ছে আমি রাখি নাকি! যাঃ, যাঃ।"

ইহার একটু পরেই এক মুচি আসিয়া অপর একজন ভদ্রলোকের নিকট সাহনয়ে বলিল, "বাবু, পালিশ?" বাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রীচরণদ্বয় মুচির হাতে সঁপিয়া দিলেন। আর মুচি শ্রীচরণ পাইয়া আনন্দে বিভোর, একেবারে "দেহি পদপল্লব মুদারম্।" তারপর বাবুর পকেট হইতে বাহির হইল মাত্র একখানা। বেচারা মুচির চোখে মুখে ত সঙ্গে সঙ্গেই বিষাদের কালো-ছায়া নামিয়া পড়িল। কি করিবে, বাবুর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মুচি আর সাহস করিয়া দাঁড়াইল না। সে মনের ব্যথা মনেই রাখিয়া বিশ্রামাগারের বাহিরে মমতা কাটাইল।

এরই মধ্যে আর একজন ৩৭।৩৮ বয়স্ক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং পট্ট করিয়া পরণের দামী প্যাণ্ট্ খুলিয়া এক পায়জামা পরিলেন। দেহকে আচ্ছাদিত করিলেন, একখানা ধব্‌ধবে সেমিজ দ্বারা। চক্ষেতে দিলেন সাদা কাঁচের বেড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে লাগাইলেন এক শ্বেতকায় লাঠি। লাঠির কিন্তু মোটেই উপায় রহিল না। ভদ্রলোক চক্ষের পলকে লাঠিতে অগ্নিসংযোগ করিলেন আর লাঠি কিন্তু কাঁদিয়াই আকুল। অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইতে লাঠি কেবলই ভাবিতে লাগিল হায় হায় ভাবিয়াছিলাম ভদ্রলোকের পকেটে বাস করিয়া আমি একটি মানুষের মত মানুষ হইব কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সর্ব্বৈব ভুল, পরিণাম ভস্মের স্তূপ—। হায়, হায় ভদ্রলোকের সঙ্গ গ্রহণ করিলে যদি এই হয় আমার নেশনের পরিণতি……] ভদ্রলোক ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি সটান লাঠির অস্তিত্ব লোপ করিবার মানসে এবং ইহার সর্ব্বপ্রকার ভাবরাশির সমাধি রচনার জন্য সসম্মানে চলিলেন বিশ্রামাগারের বাহিরে অর্থাৎ স্নানঘরে। ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর অথচ জগতের সচলভাবে চলনমান হইয়া গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ঘন ঘন চক্ষু হইতে কাঁচের বেড়া খুলিয়া ইহাকে মুছিয়া পুঁছিয়া একবার লাগান আর একবার খোলেন। এতক্ষণে শ্বেতকায় লাঠির চরম অবসান ঘটিল। তাহার সকল আশার নাশ হইল এবং তিলে তিলে জ্বলিয়া পুড়িয়া রূপহীন অরূপের ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য ওই লাঠি তাহার অন্তিম মুহূর্ত্তে এই এক চরম অভি-সম্পাতের মর্ম্মন্তুদবাণী—ভদ্রলোকের কানে কানে শুনাইয়া গেল—"যা করেছ আমায়, ঠিক তেমনটিই পেতে হবে তোমায়, প্রস্তুত থেকো।" ভদ্রলোক শুনিলেন, একটু হাসিলেন, ভুলিয়া গেলেন সব কথা। এখনই এই মুহূর্ত্তেই ওই ভদ্রলোক ঝট্ করিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া পট্ করিয়া পায়জামা ছাড়িয়া এক মুক্তি পরিলেন, আর তাহার উর্দ্ধমুখী কেশের

গোড়ায় কিছুটা 'কম্প্রোমাইডিন' ঢালাইয়া একবাসে চলিলেন স্নানাগারের দিকে। ওমা! স্নান শেষ করিয়াই ঝড়ের ন্যায় সোঁ সোঁ করিয়া আসিয়াই টস্ করিয়া বাহির করিলেন লম্বা প্যান্ট ও ডবল কাফের সার্ট। সস্ করিয়া প্যান্ট্, জামা ইত্যাদি পরিয়াই ঊর্দ্ধমুখী কেশের গর্ব্বিত শির নত করিবার জন্য মাথায় লাগাইলেন চিরুণী। মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে তোফা ভদ্রলোক সাজিয়া গেলেন। কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, আর যাই হোকনা কেন টিকিট ত আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর; অতএব সমস্ত সুবিধাটাই বা কেন আমি পাইব না। সুবিধা যখন রহিয়াছে তখন তাহা ছাড়িব কেন? যদিও তাঁহার কেশকে সুবিন্যস্ত করিবার জন্য আর কোন প্রয়োজন ছিলনা, তথাপি ঐ ভাবের আমেজে পড়িয়া ভদ্রলোক তাঁরের গহিতে চলিলেন প্রসাধনের আয়নার দিকে। যদিও ভদ্রলোকটি ভালভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন শক্তিদায়িনী ও শক্তিহারিণী ঐ ঐ দেবীমূর্ত্তি সকলকে; কিন্তু কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। একটু সমীহের ভাব পর্য্যন্ত না রাখিয়া আরম্ভ করিলেন কেশ-বিন্যাস করিতে। তখনই আমার স্মরণ হইল সেই কবি বঙ্কিমের কথা, "যৌবন জল-তরঙ্গ রুধিবে কে। হরে মুরারে হরে মুরারে মধুকৈটভারে .....।" অপরপক্ষে ভবের ভাবে উন্মাদিনী মায়েরাও কিছুমাত্র সমীহ ও সলজ্জবোধ না করিয়া বরং অনেকখানি দম্ভভরেই তাহাদের আয়ত চক্ষুর বড় বড় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ঐ ভদ্রলোকের উপর। প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিল ঐ আয়নারই এক পাশে কেশবিন্যাস আরম্ভ করিয়া। শুধু তাহাই মাত্র নয়, সামান্য ভ্রূকুটি ও নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিয়া, ভাবে ভঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল আমাদেরও তোমারই মত দ্বিতীয়শ্রেণীর টিকিট রহিয়াছে। আর কেবল টিকিটই নয়, কোম্পানির সম্মানিত যাত্রি হিসাবে ও আপনজন হিসাবে আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে একাধিক জনের পাশ। যা হোক শেষপর্য্যন্ত মায়ের দলেরই জয় হইল এবং অনুমিত হইয়াছিল এতক্ষণে যেন একটু স্থির বুদ্ধি ঐ ভদ্রলোকের মনের গহন কোণে দোলা দিতেছিল। তিনি বাধ্য হইয়া পিছু হটিলেন, তাঁহার অতিরিক্ত চট্‌পটে ভাব স্তিমিত রূপ ধারণ করিল এবং তিনি বাহিরে ভিতরে নীরবতার আশ্রয়কে সাশ্রয় করিয়া আত্মগোপন করিলেন। (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীতাক্ষরচন্দ্র রায়, এম-এ

প্রভু, চূর্ণ কর, চূর্ণ কর আমার অহংকার।
তুমি আপন মনে আমার বীণার
তোল হে ঝংকার।
তুমি চূর্ণ কর আমার অহংকার॥

বাজুক মম প্রাণে ব্যথা,
সইতে নারি নীরবতা,
রুদ্র করুণ সুরে খুলুক
রুদ্ধ হৃদি-দ্বার।
তুমি চূর্ণ কর আমার অহংকার॥

মায়ার ডোরে পাকে পাকে,
জড়ায়েছি আপনাকে;
সে-ডোর তুমি কাটো প্রভু
আনাই বারংবার।
তুমি চূর্ণ কর আমার অহংকার॥

ঈজিপ্ট সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত

(মধ্যযুগ)

শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী, এম, এ, বি, এল

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

হিক্‌সস্‌দের রাজত্বকালে ঈজিপ্টের দক্ষিণাংশে সাকহুন্‌রি নামে এক সম্রাট নিজেকে সূর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন ও বিদেশী "সেপার্ড" বা "হিক্‌সস্‌"দের জয় করিয়া সপ্তদশ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যদিও হিক্‌সস্‌গণ মেমফিস্‌ হইতে বিতাড়িত হইয়া নীলনদের সেবেনেটিক্‌ শাখা ও ওয়াডি-তিউ-মিলাতের মধ্যাকলে বাস করিতেছিল তথাপি তখনও তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। সপ্তদশ রাজবংশের তিনজন—ক্যারাও টিয়াকুনি, কামোহু ও আহ্‌মসিস্‌ প্রত্যেকেই সেপার্ডদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও ক্যারাও টিয়াকুনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ মিসরীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহ্‌মসিস্‌। ইহার বাহুবলেই হিক্‌সস্‌গণ ঈজিপ্ট হইতে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হইয়াছিল। ইহারা বিতাড়িত হইয়া ঈজিপ্টের সীমান্তে সিরিয়া প্রদেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল। পুঃ পুঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আহ্‌মসিস্‌ নিউরিয়া ও সুদানের ঈজিপ্ট-আক্রমণ প্রতিহত করেন। আহ্‌মসিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম আমেনথিস্‌ সম্রাটের মুকুট ও রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেও তাঁহার ইতিহাস-বিখ্যাত মাতা সম্রাজ্ঞী নোফ্রিটারি রাজকার্য্যাদি পরিচালনা করিতেন। থিব্‌স্‌ নগরীর ত্রিমূর্ত্তি আমন্‌, খন্‌হু ও মাউট দেবতার পার্শ্বে নোফ্রিটারির মূর্ত্তিও পূজিত হইত। ক্যারাও আমেনথিস্‌ প্রথমে কুশ প্রদেশে ও পরে সিরিয়ায় যুদ্ধ অভিযান পাঠাইয়া উক্ত দেশগুলিকে জয় করিয়াছিলেন। ইহার রাজত্বকালে ঈজিপ্টের অধিবাসীগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত ও দেশে ব্যবসাবাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। ইহার প্রস্তরমূর্ত্তি [টিউরিন মিউজিয়ামে রক্ষিত] এত সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে তাঁহার মুখমণ্ডলের কমনীয় ভাব এখনও দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেনথিস্‌ নিজের ভগ্নী [দ্বিতীয় আহ্‌-টু-পু] কে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের কন্যা আহ্‌মাশির সহিত আমেনথিসের দাসীগর্ভজাত সন্তান থুট্‌মসিসের বিবাহ হইয়াছিল। আমেনথিসের মৃত্যুর পর থুট্‌-মসিস্‌ মিসরের ক্যারাও হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ঈজিপ্ট হইতে সিরিয়ায় যুদ্ধ অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল ও এইযুদ্ধে ক্যারাও স্বয়ং সিরিয়া-দেশে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। থুট্‌মসিসের মৃত্যুর পর আহ্‌মসিসের কন্যা হাট্‌সপ্‌সিটু ঈজিপ্টের সম্রাজ্ঞী ছিলেন ও তিনি নিজের ভ্রাতা দ্বিতীয় থুট্‌-মসিস্‌কে বিবাহ করেন। এই সম্রাজ্ঞী ডেয়ার-এল্‌ বাহারি, থিব্‌স্‌ ও কার্ণাক্‌ নগরীতে বহু সুরম্য প্রাসাদ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কার্ণাক্‌ নগরীর দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ [Obelisk] অদ্যাপিও কালজয়ী হইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই স্তম্ভের গাত্রে বহু খোদিত লিপি (Hieroglyphics) ও মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যায়। এই লিপিতে পুয়ানিট্‌ প্রদেশে যুদ্ধ অভিযানের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রদেশ হইতে বহু স্বর্ণ, হস্তীদন্ত, চিতাবাঘ, জিরাফ্‌ ও নূতন ফলের গাছ আনীত হইয়াছিল। সাইনাই পর্ব্বতের অন্তর্গত বহুবিধ প্রস্তরের খনিগুলি দ্বাদশবংশীয় ক্যারাওগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সচল ছিল, পরে কালক্রমে তাহা পরিত্যক্ত হয়। সম্রাজ্ঞী হাটসপ-সিটুর রাজত্বকালে সেই খনিগুলিতে পুনরায় কার্য্য

আরম্ভ করা হয় ও কার্যের কেন্দ্রস্থল ওয়াজি-ম্যাথারাতে সম্রাজ্ঞীর রাজপ্রাসাদের এক অংশ (কর্মচারীবৃন্দ ও দাসদাসীসহ) স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ইহার মৃত্যুর পর তৃতীয় থুট্‌মসিস্ ফ্যারাও হ'ন ও তাঁহার ভগ্নী দ্বিতীয় হাট্‌সপশিটুকে বিবাহ করেন। তৃতীয় থুট্‌মসিস্ সিরিয়াদেশে যুদ্ধ অভিযান লইয়া গিয়াছিলেন। মেগিড্ডো নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে সিরিয়াবাসীগণ পরাজিত হইলে সমগ্র দক্ষিণ সিরিয়া ও দামাস্কাস্ (জর্ডন নদী হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত) ঈজিপ্টের করতলগত হয়। এই যুদ্ধজয়ের কাহিনী কার্ণাক্ নগরীর বহু প্রস্তর-স্তম্ভে, ফলকে ও মন্দিরে চিত্রিত ও বর্ণিত হইয়াছে। এই ফ্যারাও বহুবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন ও সমগ্র খাক্ প্রদেশ (ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত), ফিনিশিয়া, মিটানি, লোটাটু ও নেগেব (মরুসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ) জয় করিয়াছিলেন। এই সব বিজীত প্রদেশগুলি হইতে ঈজিপ্টের মেমফিস্ ও থিব্‌স্ নগরীতে বহুপ্রকারের উপঢৌকন: স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্যরত্ন, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, বলদ, ভেড়া ছাগল ও নানাবিধ ফলমূলের চারাগাছ প্রেরিত হইত। তৃতীয় থুট্‌মসিস্ মেসোপোটেমিয়ায় যুদ্ধ অভিযান পাঠাইয়া উক্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন এসিরিয়ার সম্রাট ও খাটি প্রদেশের অধিবাসীগণ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। ইউ-ফ্রেটিস্ নদীতীরস্থ রাজন্যবর্গ এই সময় ঈজিপ্টের বশ্যতা স্বীকার করেন। বিভিন্ন পার্ব্বত্যজাতি—যাহারা আহি, আর্কা, টুনিপা, নাহারেম্ কুশ ও উষালু প্রদেশে বাস করিত, ঈজিপ্টের সহিত যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়াছিল। কোড্‌স্থ নগরের সম্রাট বহুদিন বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সিরিয়া, চ্যালডিয়া, পুয়ানিট্, এশিয়ামাইনর, টায়ার, সিডন, খাক্, ফিনিশিয়া, কোডস্থ, এসিরিয়া ও ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ মিশরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। আলাশিয়া, নাহারেম ও মিটানির রাজন্যবর্গকে ফ্যারাওগণ মিত্ররাজ্যের সম্মান দিয়াছিলেন। ব্যাবিলন ও মিটানি প্রদেশ হইতে রাজবংশীয় কন্যাদের ঈজিপ্টে প্রেরণ করা হইত ও ফ্যারাওগণ তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া সম্রাজ্ঞীর সম্মান প্রদান করিতেন। কিন্তু ফিনিশিয়া অথবা খাক্ প্রদেশের রাজকন্যাগণ সেইরূপ সম্মান পাইতেন না। তথাপি যে সমস্ত রাজকন্যাগণ ও তাঁহাদের দাসীগণ ঈজিপ্টে যাইতেন তাঁহারা সেই দেশেরই আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি অনুসরণ করিতেন। এইরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক বিবাহের কথা ঐতিহাসিকেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা :—(ক) খাটি প্রদেশের রাজকন্যার সহিত ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের বিবাহ, (খ) মিটানি প্রদেশের সম্রাট দুস্‌রাটার ভগ্নী ও কন্যার সহিত ফ্যারাও চতুর্থ আমেনহিসের বিবাহ, (গ) মিটানির সম্রাট সুতর্ণের কন্যার সহিত তৃতীয় আমেনহিসের বিবাহ। কথিত আছে যে সম্রাট সুতর্ণ তাঁহার কন্যার সহিত ৩১০ জন সুসজ্জিতা সখীবৃন্দ ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে বহুবিধ ধনরত্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন (ঘ) ব্যাবিলন সম্রাট কালিমাখিনের কন্যার সহিত ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহিসের বিবাহ। আরও অনেক দৃষ্টান্ত বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল। মধ্যযুগে এইরূপে ঈজিপ্ট ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার ফলে মিশর ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল। সিরিয়া প্রদেশ হইতে ক্রীতদাস, যুদ্ধের রথ, সূতা ও পশমের বস্ত্র, সুগন্ধি তৈল, উৎকৃষ্ট মদ্য, বহুমূল্য কাষ্ঠ, বহুজাতীয় পক্ষী ও সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র আনীত হইত। দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে কয়েকপ্রকারের বাঁশী ও বীণ সিরিয়া হইতে থিব্‌স্ এর 'এমন্' দেবতার মন্দিরে প্রেরিত হইয়াছিল। ঈজিপ্ট হইতে বিবিধ ধাতু ও তুলা এশিরিয়া, ব্যাবিলন ও মিটানিতে প্রেরিত হইত ও সেইগুলি হইতে অলঙ্কার, বস্ত্র ও যুদ্ধের অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া মিশরে পাঠান হইত। ঈজিপ্টে আনীত প্রত্যেক বিদেশীয় বস্তুর উপরে শুল্কশুল্ক ধার্য্য করা হইত এবং ঈজিপ্টের দ্রব্যাদি যখন অন্য প্রদেশে পাঠান হইত সেই স্থানের রাজন্যবর্গেরাও শুল্কশুল্ক গ্রহণ করিতেন।

যে সব বিদেশীয়েরা ঈজিপ্টে যাইয়া বাস করিত

তাহাদিগকে সাধারণ নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইত। তাহারা সেখানে ভূসম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহ করিয়া নিজের ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারিত। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বিদেশীদের ফ্যারাওগণের অধীনে সম্মানজনক কার্য্যাদি দেওয়া হইত ও তাঁহারা সেখানে নিজেদের জাত-ব্যবসায় দ্বারাও অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

ফ্যারাও তৃতীয় থুট্‌মসিসের পরে দ্বিতীয় আমেনহিসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার রাজত্বকালে নিউবিয়া ও সিরিয়া প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ফ্যারাও তাহা দমন করেন। এই যুদ্ধের বিবরণ ও চিত্রাদি কার্ণাক নগরীর প্রস্তর ফলকে খোদিত হইয়া উচ্চ স্তম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং ইহার এশিয়া-মাইনর জয়ের সংবাদও 'আমাদা'র প্রস্তর ফলকে বর্ণিত হইয়াছে। ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহিস্ শৌর্য্য-বীর্য্যে তাঁহার পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। আলাশিয়া, খাটি, মিটানি, এশিরিয়া ও ব্যাবিলনের সম্রাটগণ তৃতীয় আমেনহিসের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্যাবিলন সম্রাটের ভগ্নী, কন্যা ও মিটানির সম্রাটের কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। সিরিয়া দেশে যুদ্ধ অভিযান পাঠাইয়া তিনি সেই দেশও জয় করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ঈজিপ্টের ইতিহাসে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির কাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার, পথঘাট, সৌধমালা ও মন্দিরাদির নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। নীল নদের প্রথম গিরিসঙ্কটের নিকট ও এলিফ্যাণ্টাইন দ্বীপে তিনি যে গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও তাহা বর্ত্তমান ছিল। কেবল ১৮২২ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেইগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই ফ্যারাও এর স্মৃতিস্তম্ভ থিউবাসটিস্ ও এথ্রিবিস্ নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। 'মাউট্' দেবতার পুরাতন মন্দির তিনি নূতন করিয়া গঠন করাইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে বহুশত কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করাইয়াছিলেন। লাক্সর নামক স্থানে তিনি যে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও সেই প্রাচীন যুগের ফ্যারাওদের রাজত্বকালের স্থাপত্য বিদ্যার অতুলনীয় কীর্ত্তিরূপে বিদ্যমান আছে। 'এমন্' ও 'মাউট্' দেবতাদের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তীস্থানে শত-শত বৃহদাকার প্রস্তর নির্ম্মিত মেষমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ এখন ভগ্নাবস্থায় ও কিয়দংশ ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় আমেনহিসের নির্ম্মিত কার্ণাকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় থুট্‌মসিস্ ও সাম্রাজ্ঞী হাটসপসিটুর সমাধি (ইহাঁর নির্ম্মিত পিরামিড্) ডেয়ার-এল্-বাহারিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু তৃতীয় আমেনহিস্ তাঁহার প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি কোর্ণা গ্রামের নিকট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিমন্দিরে মেম্‌নসের যে দুইটি অতিকায় প্রস্তর মূর্ত্তি (৬০ ফিট উচ্চ) নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপিও প্রাচীন যুগের গৌরবময় ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছে। খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দের প্রবল ভূমিকম্পে থিব্‌স্ নগরী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল ও সেইসময় উত্তরদিকের অতিকায় মূর্ত্তিটিও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিম্বদন্তী আছে যে এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার পর মূর্ত্তিগুলির পাদদেশ হইতে সূর্য্যোদয়ের কালে বীণাযন্ত্রের শব্দের ন্যায় মধুর ধ্বনি নির্গত হইত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম সম্রাট হ্যাড্রিয়ান্ ঈজিপ্টে যাইয়া এই অপূর্ব্ব বাদ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। হ্যাড্রিয়ানের রাজত্বের ৬০ বৎসর পরে রোম সম্রাট সেপ্টেমিয়াস্ সেভেরাস্ এই ভগ্ন মূর্ত্তির পুনর্গঠন করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহার পরেই এই সুমধুর বীণাধ্বনি বন্ধ হইয়া যায়।

ঈজিপ্টের ফ্যারাওগণের একটি বিশেষ গুণ ইহাই ছিল যে যখনই তাঁহারা যুদ্ধ জয় করিয়া ভূসম্পত্তি ও ধনরত্নাদি সংগ্রহ করিতেন তাহার এক-দশমাংশ "এমন্-রা" দেবতার সেবা পূজার জন্য প্রদান করিতেন। তৃতীয় থুট্‌মসিস্, তৃতীয় আমেনহিস্, সকলেই এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বহুসংখ্যক বৃহৎ দেবত্র সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় আমেনহিসের পত্নী 'টাই' নীচকুলোদ্ভবা ছিলেন তথাপি তিনি সম্রাজ্ঞীরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা

করিতেন। তৃতীয় আমেনহিস্ থিব্‌স্ এর 'এমন্' দেবতা অপেক্ষা মেমফিসের 'এটোম্' দেবতাকে অধিক সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন ও এই দেবতার জন্য মেমফিস্ ও থিব্‌স্ নগরীতে বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চতুর্থ আমেনহিস্ (তৃতীয় আমেনহিসের পুত্র) তাঁহার পিতার ওরসকন্যা নেফ্রিটিটিকে বিবাহ করেন ও একটি নূতন স্থানে (বর্ত্তমানের এট্-টেল্) রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজধানীতে 'এটোম্' দেবতাই প্রধান ছিলেন। 'এটোম্' ও 'এমন্' মূর্ত্তিদ্বয় সূর্য্যদেবতারই প্রতীক ছিলেন। সূর্য্যের যে রশ্মি পৃথিবীতে আলোক ও উত্তাপ দান করে সেইগুলি 'এটোম্' দেবতার রূপ ও শক্তি বলিয়া পূজিত হইত এবং সূর্য্যমণ্ডল মণ্ডিত কিরণরশ্মি 'এমন্' দেবতার মহিমা ও ঐশ্বর্য্যরূপে কল্পিত হইত। ডেয়ার-এল্-বাহারির মন্দিরে ফ্যারাও চতুর্থ আমেনহিসের কয়েকটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তিনি স্বয়ং 'এটোম্' দেবতাকে প্রধান পুরোহিতরূপে পূজা করিতেন। টেল্-এল্-এমারনার একটি সমাধি মন্দিরের প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি হইতে দেখা যায় যে এই ফ্যারাও ও তাঁহার মাতা 'টাই' একত্রে 'এটোম্' দেবের পূজা করিতেন। ফ্যারাও চতুর্থ আমেনহিস্ 'খুনিয়া টোম্' (সূর্য্যের অংশ) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে 'এমন্' দেবতার প্রভাব প্রাচীন মিশরে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। চতুর্থ আমেনহিসের রাজত্বকালে খাটি প্রদেশ, আলাসিয়া ও ব্যাবিলনের সম্রাটগণ তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ সখ্যসূত্রেই আবদ্ধ ছিলেন। এইকালে সিরিয়া দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ চলিত। টায়ার, সিডন্, জেরুসালেম, থিব্‌লস্ ও ল্যাকিস্ নগরীর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত ও জনপদবাসীগণ অশান্তিতে বাস করিত।

অষ্টাদশ বংশীয় ফ্যারাওগণের রাজত্বকালে ঈজিপ্টের ভাস্কর্য্য ও মূর্ত্তিশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বহু সমাধিমন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ ও সৌধমালার নির্ম্মাণকার্য্য হইতে স্থাপত্যবিদ্যার নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ আমেনহিসের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা তুতান্‌খামন্ সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি 'এমন্' দেবতার লুপ্ত সম্মান ও ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধার করেন ও ইঁহার রাজত্বকাল হইতে 'এটোম্' দেবতার প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অষ্টাদশ থিবন্ রাজবংশ মিশরে প্রায় ২৫০ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন (খৃঃ পূঃ ১৬০০—১৩৫০)। (ক্রমশঃ)

মরীচিকা

শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রৌদ্রদগ্ধ মরুবালুকায় এগিয়ে চলেছে পথিক।
সাথ সাথ চিতা বুকে ক'রে নিয়ে ছুটে করে দশদিক।
মাথার উপরে জ্বলছে সূর্য্য নিদারুণ তাপ তার।
ক্লিষ্ট বক্ষে চুপি চুপি উঠে যুক এক হাহাকার।
শ্রান্ত পথিক, তরুহীন মরু—নাই কুহু নাই কেকা।
হোথা অতিদূরে দেখা যায় বুঝি ঝিকিমিকি জলরেখা।
বেয়ে চলে সেথা একলা পথিক তৃষা নিয়ে ক্ষণিপুরে।
যত কাছে যায় জলরেখা ধায় দূর হতে আরো দূরে।
ছুটে চলে তবু শ্রান্ত পথিক জল চাই চাই জল—
জ্বলে যাক প্রাণ ভরাবে সে আজ শূন্য জঠরতল।

সহসা কে তারে ডেকে বলে "কেন ঘুরেঘুরে মর মিছে
জলাশয় ভেবে ছুটনাকো আর মিছা-মরীচিকা পিছে!"
শ্রান্ত পথিক থমকে দাঁড়ায়ে ডাক দিয়ে বলে "অয়ি!
ক্লান্ত-হৃদয় নিয়ে কর খেলা কে তুমি মিথ্যাময়ী?"
কে দিল জবাব মরুবালুকায় লেলিহান চিতা হ'তে
"ভ্রান্তির বশে ঘুরেছ পথিক, আমি দোষী কোন্ মতে?"
"সত্য যেমন এ মরুস্থানের মেহধারা-সরোবর;
সত্য যেমন আকাশের পটে দিনেরেও সুধাকর,
শাশ্বত আমি শোন হে পথিক দিবাকর-প্রতিশিখা।
মিছা নই আমি, নই গো নিঠুরা আমি মরু-মরীচিকা।"

সেলিউকস কি পরাজিত?

শ্রীকালীপদ হোড়

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর (খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ৩২৩) কিছিৎ পরেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশ পাবার জন্যে সেনাপতিদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। দাবীদারদের মধ্যে প্রধান হ'য়ে দাঁড়ান সেলিউকস ও এন্টিগোনাস। Phrygia থেকে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের কর্ত্তা হ'য়ে বসেন সেলিউকস। কিন্তু আর বেশী দূর এগোনো চলল না। কেননা নন্দ-বংশের ধ্বংস সাধন করে ছোট ছোট রাজ্যগুলি দলিত মথিত করে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য। এখন এঁদের মধ্যে মোটেই যুদ্ধ হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলেও তার ফলাফল কি,—সঠিক ভাবে জানা যায়না। কারণ কোন ঐতিহাসিকই খুব বেশী কিছু বলে যাননি এ' সম্বন্ধে।

Justinus বলেন, চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করেন ভারতীয়দের। Plimy বলেন চন্দ্রগুপ্ত কি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সারাভারত পদানত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এ সব ভাসা-ভাসা মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে জোর করে কিছু বলতে যাওয়া, আর যা-ই হোক পাণ্ডিত্যের পরিচয় নয়। Appianus ও Strabo কিন্তু একটু বিশদভাবেই বলেছেন। Appianus বলেন: 'He (Seleucos) crossed the Indus and waged war on Sandrakottos (i. e., Chandragupta Maurya)·····until he made friends and entered into relations of marriage with him.' Strabo বলেন: 'Seleucos gave them (i, e., parts of Ara choti, Paropami Sadae and Gedrosere) to Sandrakottos upon terms of inter marriage and of receiving in exchange five hundred elephants.'

এখন এ' গুলোকে কেন্দ্র করেই ঐতিহাসিকদের যত অনুমান। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এ' এক প্রকাণ্ড সুযোগ। ওঁরা মনে করেন চন্দ্রগুপ্তের সাথে যুদ্ধে পেরে না উঠেই সেলিউকস বাধ্য হন ওঁদের সংগে সন্ধি করতে; আর তাও অপমান জনক সর্ত্তে। কারণ ত্যক্ত রাজ্যগুলির বদলে প্রাপ্ত পাঁচশ' হাতী নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক একরকম এড়িয়েই গেছেন কথাটা। সুতরাং একদিকে ওঁদের সশব্দ পলায়ন এবং অন্যদিকে ডক্টর রমেশচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয়দের প্রচণ্ড ঢকা নিনাদ সাধারণ পাঠকদের একটু ফাঁপরে ফেলে বৈকি।

চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসকে পরাজিত করেছেন,—এ' কথা ভারতীয়েরা পান কোত্থেকে সেটাই আশ্চর্য্য। এমনকি যুদ্ধই হয়েছিল কিনা সে বিষয়েই নিঃসন্দেহ নই আমরা। কারণ একমাত্র Appianus ছাড়া যুদ্ধের কথা কেউ উল্লেখও করেননি। তাঁর আগের ঐতিহাসিকেরাও না,—পরেরও না। আর Strabo-র কথায় মনে হয়, যুদ্ধ মোটেই হয়নি। Justinus বলেন, "Seleucos came to an agreement with him." এই বোঝাপড়াটা পরাজয়ের আগেও তো হওয়া সম্ভব।

Diodorus ও Seleucos সম্পর্কে অনেক কিছু বলে গেলেও এ' যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেননি একবারও। সুতরাং Appianus এর মন্তব্যের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করলে খুব একটা দোষের হয় না নিশ্চয়ই! সেলিউকস গ্রীক অধিকার ভারতে বজায় রাখতে এলেন। সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের সংগে তাঁর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, হয়ত এ' ভেবেই ওরকম মন্তব্য করে থাকবেন তিনি।

আর যুদ্ধ হ'য়ে থাকলেও সেলিউকস পরাজিত হয়েছিলেন এ' কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারিনে। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনী বিরাট ছিল, মানি। কিন্তু এ' থেকেই প্রমাণিত হয়না তাঁর জয়লাভ সুনিশ্চিত।

শুধু অজস্র সৈন্য থাকলেই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। এ' কথার জলন্ত প্রমাণ পুরুর (Porus) বিশাল বাহিনীর স্বল্পসংখ্যক গ্রীক সেনার হাতে নিদারুণ লাঞ্ছনা। চন্দ্রগুপ্তের বাহিনী পুরুর থেকে খুব বেশী একটা উন্নত ছিলনা ; অন্ততঃ শিক্ষা-দীক্ষা, অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে। কারণ 'Cavalry' থেকে 'Infantry' ও 'elephant' এর ওপরেই তখনও পর্য্যন্ত জোর দেওয়া হ'ত বেশী। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"ও এর প্রমাণ রয়েছে।

'মহাবংশটীকা' ও 'পরিশিষ্ট পর্বন' থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন একবারেই দখল করতে পারেন নি। অনেকবার নিদারুণ পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। সুতরাং এ' থেকে অনুমান করা যেতে পারে সেনাপতি হিসাবেও তিনি খুব একটা উঁচুদরের ছিলেন না। পরে অবশ্য বহু রাজ্য জয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু সবগুলোই ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। সেলিউকসের মত রণনিপুণ প্রখ্যাত সেনাপতিকে এত সহজে হারিয়ে দেবার ব্যাপারটা তাই হজম করতে বেশ একটু দেরীই হয়।

যুদ্ধ কয়েকদিন স্থায়ী হয়েছিল, —এ' হতে পারে। কিন্তু এ' থেকেই কি বলে বসব, সেলিউকস পেরে উঠছিলেন না ? পুরুর মত এক অতিক্ষুদ্র রাজাকেও দমন করতে আলেকজাণ্ডারের বেশ সময় লেগেছিল। তা' ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্য্যোগাদিও সহায় হয়েছিল ওঁর পক্ষে। মনেহয়, চন্দ্রগুপ্তের বিরাট সৈন্য বাহিনী থেকে সেলিউকস বেশীদিন যুদ্ধ চালাতে সাহসী হলেন না। স্মরণ ওঁর প্রধান শত্রু হল Antigonus। আজ হোক্, কাল হোক্, ওঁর বিরুদ্ধে ওঁকে লড়তেই হ'বে। সুতরাং ভারতীয় যুদ্ধে শক্তিক্ষয় করা অযৌক্তিক। তা' ছাড়া এই শক্তিশালী ভারতীয় রাজাকে মিত্র করতে পারলে ভবিষ্যতে সব দিক দিয়েই সুবিধে। ভারতের কাছাকাছি গ্রীক অঞ্চল গুলির বিপদে ওঁর সাহায্য পাওয়া যাবে এবং Antigonus এর বিরুদ্ধেও তিনি ওঁকে সাহায্য করলেও করতে পারেন। এ' সব ভেবেই তিনি চন্দ্রগুপ্তকে তিনটি প্রদেশ ছেড়ে দিতে রাজী হন। ভুললে—চলবেনা, এগুলোর ওপর সুদূর ব্যাবিলন থেকে সুদৃঢ় আধিপত্য বজায় রাখা একরম অসম্ভব। সুতরাং এদের বদলে যা পাওয়া যায় তা'ই লাভ আর পাঁচশ' হাতীও একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। ইউরোপে বিরাটকায় হাতী একটা জীবন্ত বিভীষিকা। Punic wars এ ও হাতীর ওপরেই অনেকসময় জয় পরাজয় নির্ভর করত। হাতীরাই Antigonus-এর পরাজয়ের প্রধান কারণ (Battle of Ipsus) তা'ও তো আমরা জানি।

পাঁচশ হাতীর বদলে একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এড়াতে সকলেই চায়। চন্দ্রগুপ্তের কাছে হাতী সহজ লভ্য। এ' ছাড়া ওঁকে যুদ্ধক্লান্ত বলেও অত্যুক্তি হবে না। তিনটি প্রদেশ ও সেলিউকসের মিত্রতা তাঁর কাম্য ছিল নিশ্চয়ই। এই মিত্রতা নিজের দেশেও তাঁর ক্ষমতা দৃঢ় করবে। তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই বহু ষড়যন্ত্র তখন হয়ে থাকবে। এর প্রমাণ রয়েছে 'মুদ্রারাক্ষসে'। সুতরাং জয়লাভের অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ ক্ষমতা বৃদ্ধিই বোধ হয় তাঁকে সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিতে সায় দেয়।

Cambrige History of India কমেতে সেলিউকসের পরাজয় সন্দেহজনক। এর মতে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসের "Nominal Sovereignty" মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর সংগে Insta এর মন্তব্যের (তিনি ভারতীয়দের বিদেশী আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছেন) কোন মিল দেখতে পাওয়া যায়না।

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল বোধ হয় মিত্রতাকে দৃঢ় করবার জন্যেই। পরাজিত হলে বড় জোর সেলিউকস আরও কয়েকটা প্রদেশ ছেড়ে দিতেন কিন্তু বিজাতীয় বিধর্ম্মীর হাতে খামোখা নিজের মেয়েকে তুলে দেবার মত মূর্খতা ও নিষ্ঠুরতা নিশ্চয়ই তার ছিলনা। তা' ছাড়া সাড়ম্বরিক ভাবে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন—এ'ও বলা যায় না। ভারতীয় যুদ্ধে বিরাট সৈন্যক্ষয় হলে তাঁর পক্ষে Antigonus কে পরাজিত করা সম্ভব হত না। সেলিউকস যদি পরাজিত হয়েই থাকেন তবে Battle of Ipsus এর পরেও কেন তিনি প্রতিশোধ নেননি ? বরং দেখতে পাই তিনি দূত পাঠিয়েছেন চন্দ্রগুপ্তের সভায়। চন্দ্রগুপ্তও ঔষধাদি পাঠিয়েছেন ওঁর কাছে। বিজিতের প্রতি বিজয়ীর এবং বিজয়ীর প্রতি বিজিতের এরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

হয়ত এ' মতবাদ ভারতীয়দের রূঢ় ঘা দেবে। কিন্তু ভুললে চলবে না—ঐতিহাসিক হবেন নিরপেক্ষ —দেশী বিদেশী তাঁর কাছে এক। সত্য নিয়েই তাঁর কারবার।

শ্রীবুদ্ধ স্মরণে

স্বামী দুর্গানন্দ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারা মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে প্রধাবিত হইলেও প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রতীচ্য, ব্যবহারিক জগতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যতটা চেষ্টাশীল, দার্শনিক চিন্তায় বা অধ্যাত্ম-সাধনায় ততটা নয়। পক্ষান্তরে প্রাচ্য, দার্শনিক চিন্তায় ও আধ্যাত্মিক সুধানুভূতির আকাঙ্ক্ষায় যতদূর অগ্রণী, শুধু বিজ্ঞানচর্চায় সারাজীবন অতিবাহিত করিতে ততটা নয়। তাই বলিয়া তাঁহারা যে বিজ্ঞান-চর্চা আদৌ করেন না তাহা নয়। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধনুর্বিজ্ঞান, আয়ুর্বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞান-চর্চারই নিদর্শন। সাধারণ-ভাবে জীবনযাপনের জন্য তাঁহারা যতটুকু প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, শুধু ততটুকু লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু আত্মতত্ত্ব নিরূপণে তাঁহারা জীবন পণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, জীবের মুক্তি ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া মনোবিজ্ঞানের তাঁহারা যে চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ সাংখ্য দর্শনই তাহার নিদর্শন। ইহারাই ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি এবং মানবের পথপ্রদর্শক আচার্য। বলিতে গেলে ভারতকেই একমাত্র নির্বাণ-মোক্ষ ধর্মের জন্মভূমি বলা যায়।

বৌদ্ধযুগে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয়-সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ এবং দুষ্প্রাপ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা-জনিত দুঃখের হাত হইতে জীবের মুক্তির জন্য শ্রীবুদ্ধ ব্যাকুলচিত্তে, রাজ্য, ঐশ্বর্য স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিতে ও বিলাস-ব্যসন তুচ্ছ করিয়া সত্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথেই সত্যানুসন্ধান করা ভারতের চিরন্তন প্রথা—ভোগ বিলাসের পথে নয়। শ্রীবুদ্ধ সেই পথই অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন মনকে সমাধিস্থ করিতে বা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে অকৃতকার্য হইতেছিলেন, তখন শরীর ও মনকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ
কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

"এ আসনে যদি মম তনুর শরীর,
ত্বক অস্থি মাংস মোর হ'য়ে যায় লয়;
তবু মম হেথা হতে উঠিবেক স্থির,
যাবৎ সম্বোধি-রত্ন লাভ নাহি হয়॥"

এই স্থিরসঙ্কল্পই তাঁহাকে জয়ী করিল,—তিনি সম্বোধি লাভ করিলেন।

প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন তিনি বোধিবৃক্ষ-তলে স্থিরচিত্তে উপবেশন করিলেন, তখন 'মার' বা মদন (মানসিক সমস্ত কু-প্রবৃত্তিই 'মার' রূপে কল্পিত হইয়াছে) শ্রীবুদ্ধকে আক্রমণ করিল। উদ্দেশ্য তাঁহাকে সাধনভ্রষ্ট করা; কিন্তু বুদ্ধদেব তাহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অটলভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন। দিবা অবসান হইল—সন্ধ্যা আসিল। রাত্রের প্রথম প্রহরে তিনি 'পূর্বনিবাস' জ্ঞান (জাতিস্মরত্ব) লাভ করিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে তাঁহার 'দিব্যচক্ষু' (সর্বজ্ঞত্ব) লাভ হইল। তৃতীয় প্রহরে তিনি 'কার্য-কারণ-জ্ঞান' (প্রতীত্যসমুৎপাদ) অধিগত করিয়া নির্বাণ লাভ করিলেন। নির্বাণ-সুখ আস্বাদ করিতে করিতে তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে উচ্চারিত হইল :

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সম্ অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক! দিট্ঠোঽসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা॥

দেহ-ঘর নির্মাতারে অন্বেষণ করি,
বারবার করিলাম জনম ধারণ,
পরিক্লেশ করিলাম অসংখ্য সংসার,
কিন্তু হায়! তবু তাঁর দেখা না মিলিল:
বিড়ম্বনা পুনঃপুন জনম গ্রহণ।
এবারে চিনেছি তোমা ওগো গৃহনির্মাতা!
পারিবেনা গৃহ আর করিতে নির্মাণ;
গৃহভিত্তি নির্মাণের যত উপাদান
ভগ্ন, নষ্ট, বিসংস্কৃত করিয়াছি সব—
বীতক্লেশ চিত্ত লীন নির্বাণ-সাগরে।"

সম্বোধি লাভ করিয়া তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন—জগতে যে দুঃখ অবাধে রাজত্ব করিতেছে ইন্দ্রিয়াদি সহ মনই তাহার একমাত্র উৎপত্তিস্থল এবং যাহার উৎপত্তি আছে তাহার লয়ও হইতে পারে। মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির অসংযত অভিযানই যাবতীয় দুঃখের মূল; সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়ের পারেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব এবং মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সম্যক্‌রূপে নিরোধ করিতে পারিলেই নির্বাণমুক্তি লাভ হইবে। তাহার উপায় তিনি নির্দেশ করিলেন —"সম্যক সমাধি ও সম্যক বৈরাগ্য।" এই নির্বাণমুক্তির কথা শ্রীবুদ্ধ আবিষ্কার করিলেও বেদের ব্রাহ্মণভাগে ও উপনিষদে স্থানে স্থানে নির্বাণ ধর্মের উপদেশ আছে। এতদ্ব্যতীত বেদানুগামী সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রেও নির্বানের কথা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সাংখ্যদর্শন বিশেষতঃ পাতঞ্জলযোগসূত্রে যে বৈরাগ্য ও সমাধির বর্ণনা আছে তাহাও বস্তুতঃ একই।

তথাগত (যিনি নির্বাণপদ লাভ করিয়াছেন) শ্রীবুদ্ধ যে বোধি লাভ করিলেন, তাহা কেবলমাত্র আত্মমুক্তির আশায় নয়। তিনি যে জগতের জন্য, 'জীবের দুঃখ মোচনের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিরূপে তিনি আপন মুক্তি লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি যে চরম সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহা জগৎকে শিখাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার পূর্বপরিচিত পাঁচজন ভিক্ষু যাঁহারা তাঁহাকে ইতঃপূর্বে অশ্রদ্ধা পূর্বক পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীধামে ঋষি-পত্তন মৃগদাবে তপশ্চরণে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সন্ধান লইলেন এবং তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সত্য প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উদ্বোধিত করিলেন।

শ্রীবুদ্ধ শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বলিলেন: হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিতের (সন্ন্যাসীর) দুইটি চরম পন্থা পরিহার্য। (১) ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ, বিশেষতঃ কামপরায়ণতা। ইহা অধর্ম, হীনকার্য, অনর্থকর ও সংসারাসক্তেরই যোগ্য (২) কষ্টদায়ক কঠোর তপশ্চর্যা—ইহাতেও বিশেষ লাভ নাই, বরং শক্তি-ক্ষয় বশতঃ অভিষ্ট লাভে বিঘ্ন ঘটে। ভিক্ষুগণ! তথাগত (শ্রীবুদ্ধ) যে 'মধ্যপন্থা' আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে উভয় চরমই পরিহার করা চলে। এখন সেই মধ্য-পন্থা কি তাহা বলিতেছি:

সম্যক-দৃষ্টি বা যথার্থ বোধ; সম্যক-সংকল্প বা সত্য-প্রতিজ্ঞা; সম্যক-বাক বা যথার্থ উক্তি; সম্যক কর্মান্ত বা কর্তব্যকর্ম; সম্যকাজীব অর্থাৎ ন্যায় উপায়ে জীবিকানির্বাহ; সম্যক-ব্যায়াম বা যথার্থ উদ্যম; সম্যক-স্মৃতি বা সৎচিন্তা; এবং সম্যক সমাধি বা মনের প্রশান্ত ভাব। এই অষ্টবিধ মধ্যম পন্থা।

যে সত্য শ্রীবুদ্ধ আবিষ্কার করিলেন তাহা চার ভাগে বিভক্ত, তাই উহার নাম 'চতুরঙ্গ সত্য'। দুঃখের অস্তিত্ব প্রথম সত্য; দুঃখের কারণ দ্বিতীয় সত্য; দুঃখের নিবৃত্তি তৃতীয় সত্য; এবং দুঃখের নিবৃত্তির উপায় চতুর্থ সত্য।

প্রথম সত্য: জন্ম দুঃখ, দেহের বৃদ্ধি দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ। যাহা অকাম্য তাহার সহিত মিলন দুঃখ। প্রিয় বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ গভীর দুঃখের কারণ। যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষাও দুঃখ।

দ্বিতীয় সত্য: ইন্দ্রিয় নিচয়ের বিষয়-বস্তুর সহিত সংযোগ বশতঃ মনে যে ভোগ-লালসা বা 'তৃষ্ণার' উদয় হয় এবং সেই পিপাসার তৃপ্তি-সাধনে যে দুর্দমনীয় আসক্তি জন্মে ও তাহা হইতে যে মোহ

উৎপন্ন হইয়া মানুষকে ভোগাভিমানে বদ্ধ করিয়া যন্ত্রনা দেয় তাহাই দ্বিতীয় সত্য।

তৃতীয় সত্য: যিনি আত্মাভিমান দমন করিয়াছেন তিনি বাসনামুক্ত হইবেন। যেহেতু তিনি আসক্তিশূন্য সেইহেতু বাসনার আগুন প্রজ্বলিত হইবার আর কোন ইন্ধন নাই। এজন্য অগ্নি নির্বাপিত হইবেই।

চতুর্থ সত্য: অষ্টাঙ্গ মার্গ, (১) ইহা পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি ধর্ম যথার্থ আচরণ করিয়াছেন তিনিই ইহা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ধর্মকে যিনি হৃদয়ঙ্গম করেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে ধার্মিক। ধার্মিকগণই পাপকে জয় করিয়াছেন, হিংসাদ্বেষাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, স্বার্থপরতা ও বৃথাগর্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্বোত্তম সুখময় অবস্থা লাভ করিয়াছেন। স্বার্থের অস্তিত্ব যখন মোহ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখনই সত্যের উপলব্ধি হয়। যাঁহারা এই চতুর্বিধ সত্য উপলব্ধি করেন তাঁহারাই মুক্ত তাঁহারাই ধন্য।

শ্রীবুদ্ধের উপদেশ শুনিতে শুনিতে তাঁহার পঞ্চজন সত্যানুসন্ধিৎসু শিষ্য ক্রমান্বয়ে স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিলেন এবং পঞ্চম দিবসে তাঁহারা সকলেই "অর্হৎ" পদবী লাভ বা জীবন্মুক্ত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে "বহুজন হিতায়—বহুজন সুখায়" এই মহদ্ধর্ম প্রচারার্থে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং প্রচারার্থে উরুবেলা (বোধগয়া) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

(ভিক্ষু শীলভদ্র কৃত বুদ্ধবাণী এবং রমণচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত গৌতম বুদ্ধ হইতে সাহায্য লইয়াছি। —লেখক।)

(১) বুদ্ধের এই প্রথম উপদেশকে "ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র" বলে। ভারতে কালক্রমে যে ধর্মচক্র গতি হারাইয়া অচলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, বুদ্ধ তাহাতে পুনঃ গতিদান করিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রচেষ্টাকে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলে।

ব্রহ্মবিহার

মূলবাণী :

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

—ভগবান বুদ্ধদেব

অনুবাদ :

মাতা যথা এক পুত্র রক্ষা করে নিজ আয়ুদানে,
তেমনি সমস্ত জীবে রাখো দয়া পরিমাণহীন।
ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দিকে এই ধরণীর সর্বস্থানে
বাধা হিংসাদ্বেষশূন্য মৈত্রী করুণায় রহো লীন।
স্থির বা চঞ্চল থাকো, উপবিষ্ট অথবা শয়ান,
নিদ্রাপূর্বক্ষণে এই মৈত্রীভাব রাখো অনির্বাণ॥

—শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

প্রাণায়াম বিজ্ঞান*

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

আসন আয়ত্ত হইলে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। বিশেষতঃ দুই একটী ব্যাসনে স্বাভাবিক কাল উপবেশন আরামদায়ক ও অভ্যস্ত হইবার পর প্রাণায়াম আরম্ভ করা উচিত। আসনাভ্যাসে অগ্রসর না হইয়া প্রাণায়াম করিলে সুফল লাভ সুদূর-পরাহত।

প্রাণায়ামের অর্থ কি? প্রাণায়ামের শব্দগত অর্থ শ্বাসগতির ক্ষণিক বিরাম। 'প্রাণ' এবং 'আয়াম' এই দুই শব্দের সংযোগে প্রাণায়াম শব্দটী নিষ্পন্ন। প্রাণ—শ্বাস এবং আয়াম—বিরাম। পরবর্তী যৌগিক সাহিত্যে প্রাণায়ামের অর্থ 'কুম্ভক' ধরা হইয়াছে। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, ভগবান পতঞ্জলি পূরক, কুম্ভক বা রেচক শব্দ তাঁহার যোগসূত্রের কোথাও ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য তিনি এই ক্রিয়াত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাচীনতম ভাষ্যকার ব্যাসদেব, যিনি প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সূত্রকারের ন্যায় উপরোক্ত শব্দত্রয় ব্যবহার করেন নাই। ইহার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল শব্দ পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত। আধুনিক যোগ-সাহিত্যে প্রাণ বা প্রাণায়াম সূক্ষ্ম শক্তির অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু পতঞ্জলির যোগসূত্রে উক্ত অর্থ অভিপ্রেত নয়। যোগসূত্রে প্রাণ একবার এবং প্রাণায়াম দুইবার মাত্র পাওয়া যায়। এই তিন স্থলেই শব্দযোজনা এত পরিষ্কার যে, কষ্ট-কল্পনা দ্বারাও 'প্রাণ' শব্দের অর্থ 'শ্বাস' ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ সম্ভব নয়। ব্যাস প্রমুখ ভাষ্যকারগণও পতঞ্জলির মতানুবর্তী।

যোগসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের (অর্থাৎ সমাধি-পাদের) ৩৪-তম সূত্রটী এই: "প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" প্রাণের (শ্বাসের) প্রচ্ছর্দন (রেচক) ও বিধারণ (কুম্ভক) দ্বারা মনঃসংযম সম্ভব। ব্যাসাদি ভাষ্যকার উদ্ধৃত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, প্রাণ—কৌষ্ঠ্যো বায়ু অর্থাৎ ফুস্‌ফুসস্থের বায়ু। সুতরাং সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়ে একমত যে, প্রাণশব্দের অর্থ 'শ্বাসবায়ু'। যোগসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের (অর্থাৎ সাধনপাদের) ২৯-তম সূত্রটী: "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।" অর্থাৎ, যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই সূত্রে প্রাণায়াম যোগের চতুর্থ অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট। যোগসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের (অর্থাৎ সাধন পাদের) ৪৯-তম সূত্রটী: "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" নিশ্বাস (যে বায়ু পূরক দ্বারা ফুস্‌ফুসে গৃহীত হয়) এবং প্রশ্বাসের (যে বায়ু রেচক দ্বারা পরিত্যক্ত হয়) গতিতে বিচ্ছেদ (বিরাম) কে প্রাণায়াম বলে। হঠযোগের শাস্ত্রকারগণ তখনই প্রাণের অর্থ সূক্ষ্ম শক্তি ধরিয়া-ছেন, যখন তাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির কথা উল্লেখ করেন। শুধু প্রাণায়াম সম্বন্ধে তাঁহারা উক্ত অর্থ করেন নাই। সেইজন্য স্বামী কুবলয়ানন্দজীর মতে প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাস-গতির বিরাম।

যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের এই সংজ্ঞাটীও দেখা যায়। "প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।" অর্থাৎ প্রাণ এবং অপান বায়ুর সংযোগকে প্রাণায়াম বলে। শঙ্করাচার্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (২।৭) ভাষ্যে প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য এই ভাবে কীর্তন করিয়াছেন:

প্রাণায়াম বিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম্।
তস্মাৎ নাতঃপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাৎ ইতি শ্রুতিঃ॥

অনুবাদ—যেহেতু প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মদর্শন হয় সেইহেতু বেদানুসারে প্রাণায়াম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধন আর কিছুই নাই।

---

* মৎ প্রণীত "সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম" পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে প্রাণায়াম তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শিব সংহিতায় (৩।৬২) প্রাণায়ামের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে কীর্তিত :

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লভতেঽষ্টৈশ্বর্যমাত্মনি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥

অনুবাদ—যোগীবর প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা অণিমা-লঘিমাদি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য লাভান্তে পাপ ও পুণ্যের সাগর অতিক্রম পূর্বক ত্রিভুবনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন।

পতঞ্জলির মতে প্রাণায়াম চারি প্রকার এবং বিরামের প্রকৃতি অনুসারে উক্ত প্রভেদ স্বীকৃত। গভীর প্রশ্বাসের পর বিরাম হয় প্রথম প্রকারে। দ্বিতীয় প্রকারে গভীর নিশ্বাসের পর বিরাম লইতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারে সময়ে যথাক্রমে বাহিরে ও ভিতরে বায়ু ধারণ করা আবশ্যক কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারে বায়ুনিরোধের জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতে হয় না। তৃতীয় প্রকারে শ্বাসগতি হঠাৎ রুদ্ধ হয় যে কোন সময় সাধকের ইচ্ছামত। ইহাতে বিরাম দীর্ঘ হইবে, কিন্তু দৈহিক আয়াস থাকিবে না। চতুর্থ প্রকারে অনেকবার নিশ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাসত্যাগের পর বিরাম লইতে হয়। প্রযত্নরাহিত্যই তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার প্রাণায়ামের বিশেষত্ব।

পরবর্তী যৌগিক সাহিত্যের ভাষায় প্রথম প্রকার প্রাণায়ামের নাম বাহ্য কুম্ভক। দ্বিতীয় প্রকারের নাম আভ্যন্তর কুম্ভক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের নাম কেবল কুম্ভক। প্রাণায়ামের তিনটী অংশ : রেচক, পূরক ও কুম্ভক। অমৃতনাদ উপনিষদে (১৫শ শ্লোকে) পূরক এই ভাবে বর্ণিত :

বক্ত্রেণোৎপলনালেন তোয়মাকর্ষয়েৎ নরঃ।
এবং বায়ুর্গ্রহীতব্য পূরকস্তেতি লক্ষণম্॥

অনুবাদ—পদ্মনালের দ্বারা মুখে যেমন জল টানিয়া লওয়া যায় সেইরূপ ধীরে ধীরে নাসিকায় বায়ু আকর্ষণকেই পূরক বলে।

অমৃতনাদ উপনিষদে (১২শ শ্লোকে) রেচক এই ভাবে ব্যাখ্যাত :

উৎক্ষিপ্য বায়ুমাকাশং শূন্যং কৃত্বা নিরাত্মকম্।
শূন্যভাবে নিযুঞ্জীয়াৎ রেচকস্তেতি লক্ষণম্॥

অমৃতনাদ উপনিষদে (১৩শ শ্লোকে) কুম্ভকের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দৃষ্ট হয় :

নোৎসৃজেৎ ন চ নিশ্বসেৎ নৈব গাত্রাণি চালয়েৎ।
এবং ভাবং নিযুঞ্জীয়াৎ কুম্ভকস্তেতি লক্ষণম্॥

অনুবাদ—নিশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করিবে না বা গাত্রচালন করিবে না। এইভাবে অবস্থানই কুম্ভকের লক্ষণ।

কেবল কুম্ভক তত্ত্বসূত্রে প্রাণায়াম নামে অভিহিত। যোগশাস্ত্রে কেবল কুম্ভকের এই বর্ণনা পাওয়া যায় :

রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্ বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তং স বৈ কেবল কুম্ভকঃ॥

অনুবাদ—রেচক ও পূরক ত্যাগ করিয়া সুখে যে বায়ুধারণ হয় সেই প্রাণায়ামকে কেবলকুম্ভক বলে।

কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে নিশ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাসত্যাগ করিবার পর যে কোন সময় সুবিধামত বায়ুরোধ করিলে কেবলকুম্ভক হয়। ইহাতে রেচকে আটবার এবং পূরকে চারবার এবং কুম্ভকে ষোল বার মনে মনে ওঁ জপ করিতে হয়। বশিষ্ঠসংহিতায় কেবলকুম্ভকের ফল এইভাবে বর্ণিত :

কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচকপূরক বর্জিতে।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥

অনুবাদ—রেচক ও পূরকরহিত কেবলকুম্ভক অভ্যাসে যিনি সিদ্ধ হন ত্রিভুবনে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকেনা।

শিবসংহিতায় (৩।৬৩) উক্ত কুম্ভকের সম্বন্ধে এই শ্লোকটি আছে :

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটাদিত্রিতয়ং লভেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্তীপ্সিতা ধ্রুবম্॥

অনুবাদ—উপরোক্ত প্রকারে কেবল কুম্ভক অভ্যাসের ফলে যোগী ঘটাদি তিন অবস্থা লাভ করেন এবং নিশ্চিতই সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

'হঠযোগপ্রদীপিকা' হঠযোগের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক। উহার রচয়িতা স্বাত্মারাম স্বয়ং আটপ্রকার কুম্ভক উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাণায়ামের অন্য নাম কুম্ভক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাণায়ামের প্রকারভেদ বিষয়ে পতঞ্জলির মত তিনি গ্রহণ করেন নাই। পতঞ্জলির মতে

কুম্ভকের প্রকৃতি অনুসারে প্রাণায়ামের প্রকার ভিন্ন হয়। কিন্তু স্বাত্মারাম সূরী নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রভৃতি ভেদে কুম্ভভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তৎপ্রদর্শিত আটপ্রকার কুম্ভকের অভ্যাসকৌশল অভিন্ন; কিন্তু প্রত্যেক প্রকারে রেচক ও পূরকের পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

স্বাত্মারাম সূরীর মতে আটপ্রকার প্রাণায়ামের নাম—সূর্যভেদন, উজ্জায়ী, শীৎকারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা এবং প্লাবিনী। উজ্জায়ী ও ভস্ত্রিকা বিশদভাবে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। সূর্য ভেদন প্রাণায়াম এইভাবে করিতে হয়: পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে বা স্বস্তিকাসনে বসিয়া সমকায়শীর্ষগ্রীব হইয়া ডান নাকদিয়া বায়ু পূরক করুন এবং যতক্ষণ সম্ভব বায়ু কুম্ভক করিয়া ধীরে ধীরে ডান নাক দিয়াই বায়ু রেচক করুন। প্রথমে দশ হইতে বিশবার প্রত্যহ এইরূপ করিবেন এবং পরে ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়াইবেন। ইহার দ্বারা দেহে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং শীত বা বর্ষা ঋতুতে সূর্যভেদন প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। ইহা দেহে পিত্ত বৃদ্ধি করে এবং সর্বপ্রকার মাথার রোগ ও অন্যান্য রোগ আরোগ্য করে।

শীৎকারী প্রাণায়াম এইভাবে করিবেন: পূর্ববৎ কোন ধ্যানাসনে উপবেশন করিবেন এবং দুই দন্ত-পংক্তির মধ্য দিয়া জিহ্বা বাড়াইয়া ওষ্ঠাধরে লাগান এবং দুগ্ধপানের সময় ওষ্ঠদ্বয় যেভাবে প্রসারিত করিতে হয় সেইভাবে করুন এবং নাসাদ্বয় বন্ধ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের সাহায্যে বায়ু তালে তালে পূরক করুন এবং যতক্ষণ সম্ভব কুম্ভক করিয়া ধীরে ধীরে নাসাদ্বয় দিয়া বায়ু রেচন করুন। কোন প্রকার শৈশিক সঙ্কোচন এই প্রাণায়ামে অনাবশ্যক। শীৎকারীর দ্বারা দেহ শীতল হয় বলিয়া ইহা গ্রীষ্মঋতুতে অভ্যাস করা উচিত। ইহা অজীর্ণাদি সকল প্রকার তাপবৃদ্ধি হ্রাস ও নানারোগ নাশ করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রালুতা ও আলস্যাদি এই প্রাণায়াম অভ্যাসে অন্তর্হিত হয়। সকালে একশতবার এবং সন্ধ্যায় শতবার এই প্রাণায়াম তিন বৎসর পর্যন্ত করিলে জরা বিনষ্ট ও যৌবন দীর্ঘকাল রক্ষিত হয়। যাঁহারা এই প্রাণায়াম নিয়মিতভাবে অভ্যাস করেন তাঁহাদের দেহে কোন উগ্র বিষও অনিষ্টকর ক্রিয়া করিতে পারে না। প্রবাদ আছে, কাকভুষণ্ডী উক্ত প্রাণায়ামে সিদ্ধ ছিলেন।

ঘেরণ্ড সংহিতায় (৫।৭২) শীতলী প্রাণায়ামের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত:

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েৎ শনৈঃ।
ক্ষণং চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ॥

অনুবাদ—কাকচঞ্চুবৎ জিহ্বাকে ওষ্ঠাধরের বাহিরে এক আঙ্গুল টানিয়া ও নাসাদ্বয় বন্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে জিহ্বার দ্বারা বায়ু গ্রহণ পূর্বক উদরে প্রেরণ করুন এবং কিছুক্ষণ কুম্ভকান্তে নাসাদ্বয় দ্বারা পুনরায় বায়ু রেচন করুন। রেচনকালে মুখ বন্ধ থাকিবে এবং বায়ু গ্রহণান্তে ঢোক গিলিয়া বায়ু উদরে টানিয়া লইবেন। প্রথমে রোজ দশ হইতে বিশবার শীতলী প্রাণায়াম অভ্যাস করুন এবং পরে আধঘণ্টা পর্যন্ত অভ্যাস করিবেন। কেহ কেহ অন্ততঃ পাঁচ হইতে সাত মিনিট পর্যন্ত প্রত্যহ তিনবার ইহা অভ্যাস করেন। শীতলী প্রাণায়াম অভ্যাসে দেহ শীতল হয়। কফপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা অভ্যাস করা উচিত নয়। যখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে তখন ইহা অভ্যাস করিবেন না। ইহার ফলে দেহ কামদেবের মত সুশ্রী হয়। শিবসংহিতায় (৩।৯০) শীতলীর সুফল এই-ভাবে বর্ণিত:

অহর্নিশং পিবেৎ যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতিঃ দূরদৃষ্টিঃ তথা সাদ্ধর্বনং খলু॥

অনুবাদ—যে যোগী দিবারাত্রি কাকচঞ্চুদ্বারা বায়ু পান করেন তাঁহার দূরদৃষ্টি এবং দূরশ্রবণ লাভ হয় এবং তাঁহার অদৃশ্যীকরণ সুসিদ্ধ হয়।

মূর্চ্ছা প্রাণায়াম মনুমুখী মুদ্রা নামেও অভিহিত। ইহা এইভাবে করিতে হয়: সিদ্ধাসনে বসিয়া জালন্ধর বন্ধ করিয়া দুই নাক দিয়া বায়ু পূরণ করুন। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কর্ণদ্বয়ের উপর, তর্জনীদ্বয় চক্ষুদ্বয়ের

উপর, মধ্যমা ও অনামিকা নাসাদ্বয়ের উপর এবং কনিষ্ঠাদ্বয় মুখের উপর রাখুন এবং ছয় সেকেণ্ড কুম্ভক করুন। মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিসমূহ শিথিল করিয়া ধীরে ধীরে উভয় নাসা দিয়া বায়ু রেচন করুন। তখনও জালন্ধর বন্ধ থাকিবে। অন্য প্রকারেও মূর্চ্ছা প্রাণায়াম করা যায়। পূর্ববৎ একই আসনে বসিয়া মূল বন্ধ ও জালন্ধর বন্ধ যুগপৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাখিবেন। তৎপরে বাম নাসা দ্বারা পূরক, কিছুক্ষণ কুম্ভক ও ডান নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবেন। এই প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুধারণের শক্তি বৃদ্ধি হয়। কুম্ভক বেশীক্ষণ করিলে জালন্ধর বন্ধের পরিবর্তে উড্ডীয়ান বন্ধ করিবেন। চক্ষুদ্বয় স্তিমিত ও দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ করিলে পঞ্চ ভূতের পঞ্চ তাত্ত্বর বর্ণ দৃষ্ট হয়। ক্ষিতি তত্ত্বের বর্ণ পীত, জল তত্ত্বের বর্ণ শ্বেত, অগ্নিতত্ত্বের বর্ণ রক্ত, বায়ুতত্ত্বের বর্ণ সবুজ এবং ব্যোমতত্ত্বের বর্ণ নীল। মূর্চ্ছা প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হয় এবং মানসিক একাগ্রতা বাড়ে।

ভ্রামরী প্রাণায়ামে পূরকের সময় ভ্রমর ধ্বনিবৎ শব্দ হয়। এইভাবে ভ্রামরী করিবেন। সিদ্ধাসনে বসিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত রাখিয়া ভ্রূযুগল মধ্যে মন একাগ্র করিয়া জালন্ধর বন্ধ করুন। ভ্রমরবৎ শব্দ করিতে করিতে নাসাদ্বয় দিয়া বায়ু পূরক করুন। তিন সেকেণ্ড মাত্র বায়ু পূরক করিয়া ভ্রমরবৎ শব্দ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করুন। একশত চুয়াল্লিশ (১৪৪) বার এই প্রাণায়াম অভ্যাস করুন। ইহার ফলে অনাহত ধ্বনি শ্রুত হয় এবং মন সংযত হয়। অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষকের নিকট প্রাণায়াম-রহস্য শিক্ষা করা উচিত।

প্লাবিনী প্রাণায়াম এইরূপে করিতে হয়ঃ পদ্মাসনে বসিয়া হস্তদ্বয় সরলভাবে ঊর্ধ্বে প্রসারিত করুন। নাসাদ্বয় দিয়া বায়ু পূরক করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন এবং বাহুদ্বয় সংযুক্তভাবে বালিশের মত মাথার নীচে রাখুন। যতক্ষণ কুম্ভক করিবেন ততক্ষণ ভাবিবেন, "আমার দেহ পালকের মত লঘু" পুনরায় পূর্ববৎ পদ্মাসনে বসিয়া ধীরে ধীরে দুই নাসা দিয়া বায়ু রেচক করুন। দীর্ঘকাল এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে জলের উপর ভাসা বা চলা সম্ভব হয়।

প্রাণায়ামের উপকারিতা যোগদর্শনে এই সূত্রদ্বয়ে বিবৃত। "ততঃক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং। ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।" অর্থাৎ জ্ঞানের আবরণ ক্ষীণ হয় এবং মনের ধারণাশক্তি বাড়ে। ব্যাসদেব উদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ের ভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ। ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য।" অর্থাৎ প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই। ইহাতে মনোমল নষ্ট হয় এবং জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়।

শিব সংহিতায় (৩।৪৮-৪৯) প্রাণায়ামের উপকারিতা এইরূপে বর্ণিত আছে :

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
সদা সংজায়তে স্বেদো মর্দনং কারয়েৎ সুধীঃ॥
অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥

অনুবাদ—প্রথম অভ্যাসের ফলে শরীরে স্বেদ (ঘর্ম) নির্গত হয়। যখন ঘাম হয় তখন উহা গাত্রে মর্দন করিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ যোগীর দেহে সপ্ত ধাতু নিস্তেজ হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফল শিব সংহিতায় (৩।৫০) এইরূপে উল্লিখিত :

দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো ভার্ত্তবো মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাৎ গগনে চরসাধকঃ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় অবস্থায় দেহ কম্পিত হয় এবং অধিকতর অভ্যাসের ফলে সাধক ভেকবৎ ভূমি হইতে উত্থিত হন এবং আবার ভূমিতে নামিয়া আসেন।

শিবসংহিতায় (৩।৫১) আছে :

যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ু সিদ্ধিঃ ফলা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী॥

অনুবাদ—পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া যোগী যখন ভূমি ছাড়িয়া শূন্যে অবস্থান করেন তখন তাঁহার বায়ুসিদ্ধি অর্থাৎ প্রাণজয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়।

প্রাণায়ামের তিনটী অংশ থাকিলেও পতঞ্জলি বা ব্যাস কর্তৃক কুম্ভকার্থেই প্রাণায়াম শব্দ ব্যবহৃত।

পতঞ্জলি স্বয়ং রেচক ও পূরক শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন নাই। কুম্ভকের পরিবর্তে প্রচ্ছর্দন শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যাসের মতে প্রচ্ছর্দন শব্দের অর্থ ফুস্‌ফুস্ হইতে বলপূর্বক বায়ুরেচন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে পূরকের কোন প্রতিশব্দ দৃষ্ট হয় না। উহার দ্বিতীয় পদের ৪৯ সূত্রে তিনি যে শ্বাসপ্রশ্বাস শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের অর্থ যথাক্রমে গৃহীত বায়ু ও পরিত্যক্ত বায়ু; পূরক ও রেচক নহে। কারণ, পূরক বা রেচক ক্রিয়ামাত্র। আভ্যন্তর প্রাণায়াম বর্ণনাকালে তিনি অবশ্য পূরক ক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যোগসূত্রে পূরক শব্দ বা উহার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তাঁহার মতে প্রাণায়াম বা বিধারণই কুম্ভক এবং প্রচ্ছর্দনই রেচক।

এখন আমরা কুম্ভক, পূরক ও রেচকের পরিমাণ-কালাদি আলোচনা করিব। প্রাচীনকালের যোগিগণ এই সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়াছেন। কালমাত্রা বা দেশমাত্রার সহায়ে তাঁহারা ক্রিয়াত্রয় পরিমাপ করিতেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের সময়ে ঘড়ি বা কোন সূক্ষ্ম কাল-পরিমাপক যন্ত্র ছিল না। সেইজন্য তাঁহারা কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে কালমাত্রা নির্ধারণ করিতেন। মাত্রা নিম্নোক্ত পঞ্চ প্রকারে পরিমিত হইত। (১) চোখের পলক ফেলিতে (২) বা একটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে (৩) বা একবার স্বাভাবিক নিশ্বাস লইতে (৪) বা ওঁ উচ্চারণ করিতে (৫) বা হাঁটুর চারিদিকে হাত ঘুরাইয়া তিনবার স্পর্শান্তে একবার তালি দিতে যত সময় লাগে তাহাকে কালমাত্রা বলা হয়। কালমাত্রার পরিমাণ প্রায় দেড় সেকেণ্ড। সম্ভবতঃ উপরোক্ত পাঁচ প্রকার কালমাত্রা বিভিন্ন যোগী সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। এই সকল গণনা খুব নির্দিষ্ট না হইলেও বা উহাদের মত ঐক্য না থাকিলেও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। কারণ, প্রত্যেক শিষ্য গুরুর কাছে বসিয়া প্রাণায়াম শিক্ষা করিতেন। আধুনিক যোগ-সাধককে উক্ত অসুবিধায় পড়িতে হয় না। তিনি এক সেকেণ্ড অন্তর এক দুই তিন ইত্যাদি অভ্যাস করিবেন। ঘড়ি ধরিয়া কয়েক মিনিট অভ্যাস করিলেই কাল-মাত্রার জ্ঞান-লাভ হইবে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সন্ধ্যার পূর্বে ওঁ যোগ করিয়া এইভাবে জপ করিবেন —ওঁ ১, ওঁ ২, ওঁ ৩ ইত্যাদি।

কালমাত্রার ন্যায় দেশমাত্রার জ্ঞানও বিশেষ প্রয়োজন। কত জোরে পূরক বা রেচক অভ্যাস করিতে হইবে, ইহার পরিমাপের জন্য দেশমাত্রা (space unit) আবশ্যক। খুব জোরে রেচন করিলে নাসিকা হইতে অনেক দূরে বহির্গত বায়ুর স্রোত অনুভব করা যায়। রেচক যত জোরে হয় বায়ু স্রোতের দীর্ঘতা তত বেশী হয়। নাকের সম্মুখে তুলা বা তদ্রূপ হাল্কা জিনিষ ধরিলে বায়ুস্রোতের দীর্ঘতা পরিমিত হয়। সাধারণতঃ প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য বার আঙ্গুল। কালমাত্রার দিকে মনোযোগ দিলেই দেশমাত্রা স্বতঃই রক্ষিত হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পূরকের মাত্রা সর্বদা রেচকের মাত্রার অর্ধেক হইবে এবং পূরক বা রেচকে শ্বাসগতি সমবেগে চলিবে।

প্রত্যেক পূরক শান্তভাবে শেষ হইবে। অনেকে পূরকের সময় সমগ্র শরীরের পেশীগুলি সজোরে সঙ্কুচিত করিতে অভ্যস্ত। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শ্বাসযন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গের পৈশিক শক্তির প্রয়োগে এক বিন্দু বায়ু বেশী গ্রহণ করা যায় না। পূরক ও রেচকের ন্যায় কুম্ভকেও কালমাত্রা প্রযোজ্য। প্রাণায়ামের নির্দিষ্ট অবস্থায় যত বায়ু গৃহীত হয় তত বায়ু পরিত্যক্ত হয়। গৃহীত বায়ুর পরিমাণদ্বারা গ্রাহকের প্রাণশক্তি পরিমিত হয়। মনে করুন, কেহ ২৫০০ সি. সি বায়ু পূরকে গ্রহণ করেন এবং তত বায়ু রেচকে ত্যাগ করেন। যদি পূরক সমবেগে চলে এবং দশ সেকেণ্ড লাগে তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক সেকেণ্ডে ৩৫০ সি সি. বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। কিন্তু যদি পূরক করিতে দশ সেকেণ্ডের পরিবর্তে পাঁচ সেকেণ্ড লাগে তবে প্রত্যেক সেকেণ্ডে ৫০০ সি. সি. বায়ু গৃহীত হয়। যদি একই সময়ের মধ্যে এই বায়ু গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ৩৫০ সি. সি. লইতে অধিক জোর লাগিবে। যদি পূরক করিতে ১৪ সেকেণ্ড লাগে তবে এক সেকেণ্ডে ২৫০ সি. সি. বায়ু গৃহীত হয়। ইহাতে পূর্বাপেক্ষা কম জোর আবশ্যক হয়। সুতরাং সাত বা দশ বা চৌদ্দ সেকেণ্ডের পূরকে যে জোর লাগে তাহার পার্থক্য হয় কালভেদে। পূরকের সময় যতই অল্প হয় বায়ু-গ্রহণে ততই বেশী জোর লাগে। সুতরাং কালনিয়ন্ত্রণের দ্বারা বেগও নিয়ন্ত্রিত হয়। বেগ একবার নির্দিষ্ট হইলেই দেশমাত্রা অচিরে নির্দিষ্ট হয়। অতএব কালমাত্রা স্থির করিয়া পূরকের সমবেগ রক্ষা করিলে কালমাত্রা স্বতঃই নির্দিষ্ট হইয়া যায়। পূরকের ন্যায় রেচকেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

পূরক, কুম্ভক ও রেচকের মাত্রা স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট হইলে আমাদের দেখা উচিত, প্রাণায়ামের এই তিনটি অংশের মধ্যে কি কাল-সম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রচলিত মতে পূরক একমাত্রা হইলে কুম্ভক চার মাত্রা ও রেচক দুই মাত্রা হয়। অন্য প্রবাদ অনুসারে অংশত্রয়ের অনুপাত ১ : ২ : ২ হইবে। এইরূপে যদি

পূরক ষোল মাত্রায় হয়, কুম্ভক চৌষট্টি মাত্রায় হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় মতে পূরক ষোল মাত্রায় হইলে কুম্ভক ও রেচক বত্রিশ মাত্রায় হইবে। আর একটি প্রবাদ আছে যে, পূরক, কুম্ভক ও রেচক সমান মাত্রায় হওয়া আবশ্যক। একটি নির্দিষ্ট হইলে অপর দুইটি তদনুযায়ী সহজে নিরূপিত হয়। প্রথমে কুম্ভকের মাত্রা স্থির হওয়া আবশ্যক। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে দ্বিতীয় বিধিই সহজসাধ্য। এবে অভ্যাসের পথে অগ্রসর হইলে প্রথম বিধি অনুষ্ঠানে ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কুম্ভকের সময় বায়ুধারণ আরামদায়ক হওয়া চাই। রেচক বা পূরক সম্বন্ধেও এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনীয়। প্রাণায়ামের তিনটি অংশই বিনা আয়াসে এবং সুখকর-ভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। কাঁকুনি দিয়া বা জোর করিয়া বা দম আটকাইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস অতিশয় অনিষ্টকর।

স্বামী কুবলয়ানন্দ তাঁহার যোগ পরীক্ষাগারে বহু-সংখ্যক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রথম শিক্ষার্থী ও স্বাস্থ্যান্বেষিগণের পক্ষে পূরক ও রেচকের অনুপাত ১ : ২ হওয়া উচিত। কুম্ভক অভ্যাস ব্যতীত স্বাস্থ্যান্বেষীগণ রেচক ও পূরকের দ্বারাই প্রাণায়ামের ফল লাভ করিতে পারেন। কুম্ভক অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে আরম্ভ করা আবশ্যক। প্রযত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করিলে কুম্ভকেও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। প্রাণায়ামের দৈর্ঘ্য স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে স্থির করা উচিত। কিন্তু সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। মন একাগ্রভাবে শ্বাসগতির অনুগামী থাকিবে। অনেক সময় মাত্রার সংখ্যা রাখিবার জন্য শ্বাসগতি হইতে মন বিচলিত হয়। এমনভাবে মাত্রাসংখ্যা গণনা করিতে হইবে যাহাতে মনোযোগ না কমিয়া যায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

সঙ্ঘ বার্ত্তা

ধর্মালোচনা : গত মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে প্রতি সোমবার হইতে শুক্রবার ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণব দর্শনাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবতম্ শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রত্যহ দেড় শতাধিক নরনারী ইহাতে যোগদান করেন।

শ্রীরামনামসঙ্কীর্ত্তনাদি : প্রতি শনিবার বেলা তিনটা হইতে সাড়ে চার ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সঙ্গীত বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীরামনাম কীর্ত্তন ও অন্যান্য ভজন গান করেন।

সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। এই গুলিতেও বহু নরনারী সমবেত হন।

কথকতা : প্রতি রবিবার সন্ধ্যার আরতির পরে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত" কথকতা করেন। এই অনুষ্ঠানে শতাধিক নরনারী উপস্থিত থাকেন।

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৭	"প্রাচীন বাংলা সাহিত্য দেবতা ও মানুষ"	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেবতা ও মানুষ
১৪৯	,,	,,
১৫১	প্রথম কলমে ২৬ লাইনে—এরূপ থাকুন	এরূপ রক্ষ থাকুন
	২য় কলমে ২১ লাইনে—মখন	যখন
১৫২	প্রথম কলমে, ৩২ লাইনের সঙ্গিনী	সঙ্গিনী
১৫৩	,, ,, ২৫ ,, চতুর্থম্	চতুর্থম্
	২য় ,, ১৬ ,, সংকল	সকল
১৫৫	প্রথম কলমে, ১৬ ,, অপূর্ব্ব ছিল	অপূর্ব্ব ছল
১৫৬	,, ,, ৫ ,, নবীনচন্দ্র	নবীনচন্দ্রে
	,, ,, ১১ ,, ক্বনিত	ক্বনিত
১৫৮	,, ,, ২৯ ,, স্বরা	স্বর.

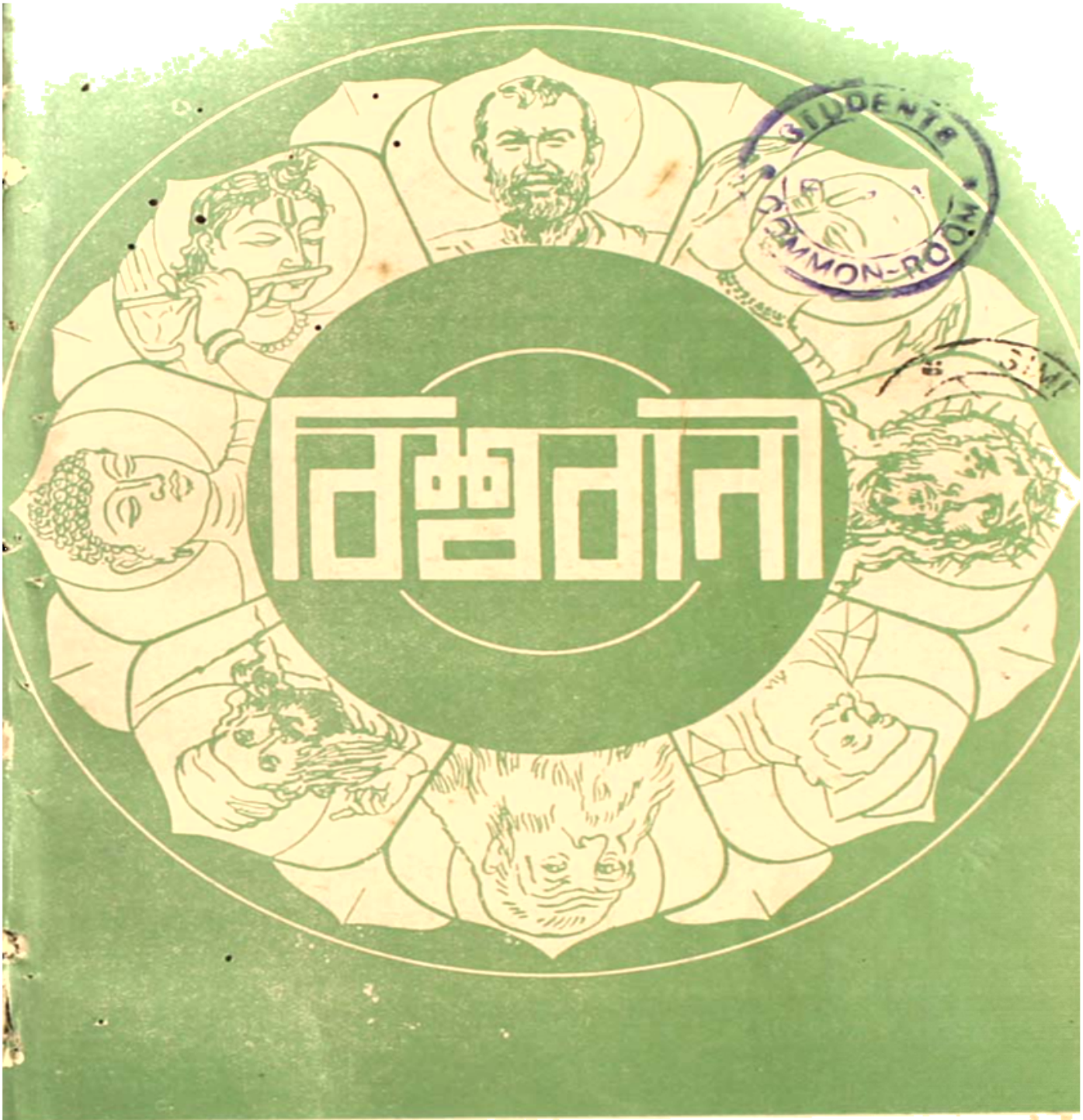

STUDENTS
COMMON-ROOM

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী বিবেকানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা

আষাঢ় ১৩৬৩

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন—বড়বাজার ১৮০১

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

কাশ্মীর ও তিব্বতে

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাশ্মীর ও তিব্বতের ভ্রমণকালে প্রদত্ত বহুস্থানের ও প্রতিমানের আলেখন। কাশ্মীর ও তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিখ্যাত মন্দির মঠ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক বর্ণনা। কাশ্মীরের রাজনৈতিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক তথ্য। তিব্বতের হিমিস মঠে যীশুখৃষ্টের অপ্রকাশিত জীবনকাহিনীর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ। **মূল্য পাঁচ টাকা**

ভারতীয় সংস্কৃতি

(India and Her People পুস্তকের অনুবাদ)

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ১৯২৫ সালে "ক্রেরলার ইন্‌স্টিটিউট অফ আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস" নামক বিদ্যার প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ভারতের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ৬৮ জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ বক্তৃতামালা।

মূল্য চার টাকা

মরণের পারে

(Life beyond Death-নামে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ।)

এই গ্রন্থে মানুষের পূর্বজন্ম ও জন্মান্তরবাদ, পুনর্জন্ম, মৃত্যুর পরে বিভিন্ন প্রকৃতির মনোভাব বিভিন্ন প্রকার গতি ও অবস্থা সম্বন্ধে মানসিক মনোযোগ ও দিব্যযোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

দেহবিমুক্ত নানাপ্রকার জীবাত্মার অনেকগুলি আলোকচিত্রের সমাবেশে সমৃদ্ধ।

মূল্য পাঁচ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বলভদ্রকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭৯, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—আষাঢ়, ১৩৬৩

সূচীপত্র

১।	আষাঢ়ে (কবিতা)	শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্ন্যাল
২।	শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ	
৩।	অহং-তত্ত্ব	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর,
৪।	নর নয়, নারায়ণ (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু
৫।	গ্রীক ও হিন্দু	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য
৬।	ইজিপ্ট সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত ...	শ্রীভুবনমোহন লাহিড়া
৭।	মহাকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত ...	শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য্য

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী.

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট, লিমিটেড্, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে (কবিতা) ...	শ্রীকালীপদ কোঙার	২১২
৯।	৺শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ পরিক্রমা ...	ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য	২১৩
১০।	দীনের ভগবান (কবিতা)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য	২২০
১১।	বাঙ্গালা সাহিত্যে ছড়ার স্থান ...	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	২২১
১২।	বিবেকানন্দ (কবিতা) ...	রণজিৎ গুহ, কাব্যভারতী	২২৩
১৩।	প্রাণায়াম বিজ্ঞান	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	২২৪
১৪।	দেবতার অন্তরালে বাঙলা সাহিত্য (সমালোচনা)	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	২২৬
১৫।	মলিকিউল ...	শ্রীমুরলীমোহন বিশ্বাস	২৩০
১৬।	ছত্রিশ হাজার বৎসরের প্রাচীন বৃক্ষখণ্ড		২৩১
১৭।	সঙ্ঘ বার্ত্তা		২৩২
১৮।	বিশ্ববাণীর প্রচ্ছদপট-পরিচয়		২৩২

"বিশ্ববাণী"-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ **চার পাতার মধ্যে,** রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ, বসু, এণ্ড কোং (ডেকরেটরস্)

৫২নং ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

ফোন :—বড়বাজার ১৬২৫

অষ্টাদশ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৬৩ | পঞ্চম সংখ্যা

আষাঢ়ে

সচ্চিদানন্দ সান্যাল

তিমিরান্তে জ্যোতিহীন ম্লানমুখে—ওই পূর্বাচলে
জাগিল প্রভাত আজি। সুপ্তজননীর নিদ্রাটুটি'
আধ-নিমীলিত আধ-জাগ্রত মলিন আঁখি দুটী ;
চাহি সন্তানের পানে তন্দ্রালস বসন-অঞ্চলে
ঢাকি' তা'র দেহখানি, যেন পুনঃ টানি' নিজকোলে
কহিছেন তা'রে—জাগো, সুখশয্যা ত্যজি' যাও ছুটি'
কর্মরথ যেথা চলে। সেই পথে পড়' গিয়া লুটি'
আত্মহারা। এস ফিরে জগতের কাজ সাঙ্গ হ'লে।

আষাঢ়ের বর্ষোন্মুখ প্রভাতের স্তিমিত আলোকে
জাগাও জননি মোরে। সুপ্তি হ'তে শুদ্ধ চেতনায়
নশ্বর হইতে চিরন্তনে, তমঃ হ'তে জ্যোতির্লোকে
লয়ে যাও মোরে ডাকি' শান্ত কর সর্ববেদনায়।
ভেঙ্গে দাও নিদ্রাঘোর, মুক্ত কর সকল বন্ধন,
দৃষ্টি দাও মহামায়া, দেহ-রথে হেরিব বামন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কথিত :

আমরা তখন কলেজে পড়তুম। বয়েস উনিশ কুড়ি এই রকম হবে। তখন কলকাতায় কেশববাবুর (নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন) খুব প্রভাব। যেখানেই তিনি লেকচার দিতেন সেখানেই দলে দলে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাঁর লেকচার শোনবার জন্যে ছুটে যেতেন। Student community-র (ছাত্র সমাজের) ওপর কেশববাবুর খুব influence (প্রভাব)। আমরা প্রায়ই রবিবারে নববিধান সমাজের হল-এ কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে যেতুম। চমৎকার সেই বক্তৃতা, আশ্চর্য্য বলবার ভঙ্গী।

একদিন সমাজে কেশব বাবু বক্তৃতা দেবার সময়ে বললেন : দক্ষিণেশ্বরে একজন সত্যিকারের মহাপুরুষ আছেন। এমন পবিত্র ও ত্যাগী মহাপুরুষ খুব কমই দেখা যায়। ভগবানের নাম শুনলেই তাঁর বারবার সমাধি হয়ে যায়।

তাই শুনে ইচ্ছা হলো—ঐ মহাপুরুষটিকে একদিন দেখতে যেতে হবে। একদিন শনিবারে বিকেল বেলায় নৌকো ক'রে আমরা কলেজের আট দশজন বন্ধুতে মিলে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে গেলুম। আমার সঙ্গে সেদিন শরৎও (স্বামী সারদানন্দ মহারাজ) ছিল।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—ওখানে সেই মহাপুরুষ থাকেন কোথায়? একটি লোক ঠাকুরের (রামকৃষ্ণদেবের) ঘর দেখিয়ে দিলে। আমরা সবাই তাঁর ঘরে গেলুম। তখন ঠাকুর তাঁর ঘরে সেই ছোট তক্তাপোষখানিতে বসেছিলেন। আমরা সবাই গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি খুব খুশী হলেন, আর আমাদের বসতে বললেন।

ঠাকুরের মূর্ত্তি শান্ত ও আনন্দময়। তাঁর চারদিকে পবিত্রতা ও শান্তি বয়ে যাচ্ছে। প্রথম দেখেই কী জানি কেন—তাঁর ওপর attraction (আকর্ষণ) হয়েছিলুম। তখন আমরা কলেজের ছেলে। তেমন ভক্তি বিশ্বাস ছিল না। তবুও কী জানি কেন—তাঁকে ভালো লাগলো। মনে হলো—ইনি আমার কত আপনার!

সেদিন ঠাকুর আমাদের বেশী কোন কথা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, "ছেলেবেলা থেকে ধর্ম্মের দিকে যাওয়া চাই। ছেলেবেলায় মনে সংসারের ময়লা থাকে না। তখন মন সরল থাকে। তাই ছেলেবেলা থেকে ভগবানকে ডাকলে তাঁর ওপর মন যায়। ক্রমে তাঁকে সরলভাবে ডাকতে ডাকতে তাঁর ওপর টান আসে। সংসারে একবার ঢুকলে মন নানা রকম বাজে বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। তখন সেই মনকে কুড়িয়ে এনে ভগবানের চিন্তায় লাগানো ভারী মুস্কিল। অল্পবয়স থেকেই ভগবানকে ডাকতে হয়। তবে তাঁর দেখা পাওয়া যায়।"

ঠাকুরের ঐ কথা আমার মনে একেবারে গেঁথে গেলো। বারবার ভাবতে লাগলুম—সত্যিই তো অল্প বয়েস থেকে ভগবানকে না ডাকলে কিছুতেই তাঁর মধ্যে মন ডুবে যায় না। এই বয়েস থেকেই তো ভগবানকে ডাকা উচিত।

ঠাকুর ছিলেন ত্যাগীর বাদসা ও পবিত্রতা-বৈরাগ্য-সংযমের জমাট মূর্ত্তি। অবতার বরে তাঁর ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। আগেকার সমস্ত অবতারের ভাব এসে ঠাকুরের মধ্যে মিলে গিছলো। স্বামিজী (পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ) তাই ঠাকুরের প্রণাম-মন্ত্রে লিখেছেন : "অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।"

ঠাকুরকে আমরা আর কতটুকু বুঝেছি। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক ভাবের মহাসমুদ্র। সেই আধ্যাত্মিক মহাসমুদ্রের এককণা ভাব ধারণা কোরতে পারলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। ঠাকুরের মধ্যে কখনও একঘেয়ে ভাব ছিল না। তিনি ছিলেন জ্ঞান, ভক্তি,

প্রেম, যোগ ইত্যাদি সমস্ত ভাবের আধার। ধর্মের এমন উদার ভাব কোনও যুগে কোথাও আর দেখা যায়নি। বড় বড় সিদ্ধ মহাপুরুষরা দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন। আপনা থেকেই তাঁর সমাধি হয়ে যেতো—কখনও চেষ্টা করতে হতো না।

ঠাকুর বলতেন, "এখানকার মনের গতি সব সময়ে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে। তোদের জন্যে ঐ মনকে টেনে টেনে বাইরে নামিয়ে আনি।" কী অপার করুণা। যে নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা ভোগ করবার জন্যে বড়ো বড়ো সিদ্ধ-যোগীরা লোকেদের কাছ থেকে দূরে লুকিয়ে থাকেন, জীবের কল্যাণের জন্যে ঠাকুর সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি থেকে মনকে নীচে নামিয়ে আনতেন।

ঠাকুর বারবার বলেছেন "এখানকার উপলব্ধি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে আরও অনেক উঁচুতে উঠে গেছে।" আমরা যখন প্রথম তাঁর কাছে যাই তখন ওসব ভেতরের ব্যাপার মোটেই জানতুম না।

একদিন আমি একখানা বাইবেল নিয়ে ঠাকুরের কাছে পড়তে লাগলুম। তাই দেখে তিনি হেসে বললেন, "বেশ তো, সখি যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।" বাইবেলের একটা জায়গায় আছে :

"For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: there are some eunuchs which were made eunuchs of men; and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of Heaven's sake. He that is able to receive let him receive."

(কতকগুলি লোক মায়ের পেট থেকে নপুংসক হয়েই জন্মায়। মানুষের মধ্যে এই রকম কতকগুলি লোক নপুংসক থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে কতকগুলি লোক নিজেদের নপুংসক অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৈহিক সংসক্তিমুক্ত করে থাকেন। যার এইরকম হবার ক্ষমতা আছে সে ঐ রকম দৈহিক সংসক্তিমুক্ত হোক)।

এই কথাগুলো পড়বামাত্রই ঠাকুর মুচকি হেসে নিজেকে দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এই যেমন একজন আছে।" আমি তো অবাক! ভাবলুম ইনি তো মোটেই ইংরিজী পড়েন নি—তবে এই কথাগুলোর মানে কী করে বুঝলেন? পরে তাঁর কৃপায় জেনেছিলুম সংস্কৃত বা ইংরাজীতে ধর্মের কোন বিষয় কেউ পড়লে ঠাকুর যোগশক্তি-তে তার মনের ভাব জানতে পেরে ঠিকমত জবাব দিতেন।

ঠাকুরকে যখন প্রথম দেখি, তখন তাঁকে মনে হতো—একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। তারপরে যতো তাঁকে দেখতে লাগলুম ততই দেখলুম তিনি বিরাট—তাঁর কূল পাওয়া যায় না। এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি—তিনি একেবারে আমাদের ধারণার পার।

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ কথিত :

শশী ভাইএর (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মতন গুরু-ভক্তি হামি কখনো দেখিনি। হামাদের মধ্যে (রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে) ঠাকুরের এমোন সেবা কেউ করেনি। ঠাকুরকে যে শশীভাই কি চোখে দেখতো তা মুখে বলা যায় না। ঠাকুরের সেবার জন্য শশীভাই জান (প্রাণ) দিতেও পরোয়া কোরতো না। ঠাকুরের সেবা করাই ছিল শশীভাই-এর একমাত্র ধর্ম্ম।

দক্ষিণেশ্বরে শশীভাই একদিন ঠাকুরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। ঠাকুর শশীভাইকে ডেকে বললেন, "তুই যার ধ্যান করিস্, সে এই—সে এই" এই কথা ব'লে ঠাকুর নিজের দেহকে দেখালেন। শশীভাই থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। অনেকক্ষণ তাঁর হুঁষ ছিলনা।

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে ঠাকুর বসেছিলেন। সেদিন তাঁর কাছে হামরা চারজন ছিলুম: শশীভাই, যোগীনভাই (স্বামী যোগানন্দ) হামি আর রাজা (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। ঠাকুর মা-কালীর কি একটা গান গাইতে গাইতে সমাধিতে ডুবে গেলেন। আমরাও চারজনে বেহুঁষ হয়ে গেলুম। তখন সেই অবস্থায় কি যে আনন্দ পেয়ে-

ছিলুম তা মুখে বলতে পারি না। সেদিন ঠাকুরের যেরূপ দেখেছিলুম, তা হামি সারা জীবনে আর কখনও দেখিনি। ঠাকুরের সেই রূপ এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

একদিন তো হামি দুপুরবেলায় তাঁর পা টিপে দিচ্ছি। এমন সময়ে তিনি হাসতে হাসতে হামায় জিজ্ঞাসা কোরলেন, "কল দেখিনি লেটো তোর রামজী এখন কি কোরছেন।" হামি জবাব দিলুম, "তা হামি কি জানে।" তিনি বল্লেন, "তোর রামজী এখন ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতীকে চালিয়ে দিচ্ছেন।"

তার মানে পরে বুঝলুম। তিনি হামার ভেতর দিয়ে তখন সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন এ শুধু তারই ক্ষেমতা। মানুষের ভেতর এমনি কোরে ধর্মের ভাব জাগিয়ে দিতেন। সে এক আলাদা ব্যাপারই হয়ে গেছে।

অহং-তত্ত্ব

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর, বি. এস. সি

আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার গ্রাম, আমার দেশ : এই আমার নিয়েই বিশ্ব-সংসার। এর পরও চিন্তা—আমার পুণ্য, আমার স্বর্গ, আমার মুক্তি। শিশু ঘুমায় কাঁদে, ভয়ে সঙ্কুচিত হয় 'আমার', 'আমি' বোধের প্রথম উন্মেষে। অহং-জ্ঞান জন্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই যে সহজ অহং-জ্ঞান তাহা কি তবে সর্বথা নিন্দনীয়! ঠাকুর শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন যতক্ষণ না ধুনুরির হাতে প'ড়ে তাঁত থেকে তুঁই তুঁই শব্দ বার হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অহং অহং। "সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ অহং-বিন্দু। আপনার চক্ষু খুলিলেই সৃষ্টি, চক্ষু মুদিলেই প্রলয়"—ইহা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি।

"অনন্তের সনে প্রভু! লও মিশাইয়া
তোমার এ আমি-রূপ জীবনের নদী।
ভাসাইয়া লও নাথ! শ্রীচরণে তব
ঘুচে যাক প্রাণ হ'তে আমিত্বের ব্যাধি।
সকলি ত তুমি নাথ! তোমারি ত সব।
তোমা বিনা আমি নাথ! রই শুধু শব।

পায়ে ধরি খুল নাথ! জ্ঞান আঁখি মম,
ঘুচাও প্রাণের কালী পিয়াইয়া প্রেম।
তুমি না দেখিলে নাথ। কে আর দেখিবে
কেহ কিগো এ দীনের মুখ পানে চাবে?
গেল দিন বয়ে গেল সময় ফুরায়,
এস প্রভু ত্বরা করি না দেখি উপায়।

কৃপা করি কৃপাময় সঙ্গে কর খেলা।
তব প্রেম দিয়ে প্রভু ভাসাও এ ভেলা।"

আমিত্বের চাপে জর্জরিত প্রাণের আকুল আবেদন ইহাতে ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। জ্ঞান-আমি আর অজ্ঞান-আমি; জড়প্রধান মন আর অপক্ষ-পক্ষে চৈতন্যময়ী মন—এ দুয়ের দ্বন্দ্বের মিমাংসাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। জড়প্রধান মনের অংশকে বলিতে হয়, 'তুমি আমার প্রকৃত আমি কি-না চৈতন্যযুক্ত মনকে বিপথে চালিত করিতে সদা ব্যস্ত, তা হ'বে না।' নচেৎ অবস্থা দাঁড়ায় :

"একেরে হারায়ে ফেলি, হারায়ে এবে সকলি,
দিবানিশি তাই ঝ'রি, বহিছহে চিন্তানল।"

হৃদয় পিঞ্জর হ'তে নকল আমি-পাখীকে উড়িয়ে দিয়ে আসল আমি-পাখীকে বসানার জন্যই এত যাগযজ্ঞ, জপতপ, ধ্যান-ধারণা। সাধকের সহজ সুন্দর কথা : "জড়-মন-রূপ বস্ত্রকে যতদিন্ বা সিরাপ

ক'রে চৈতন্যময়ী মনকে সাজাতে হ'লে,—আমি একজন হবই হব—এই প্রকার দৃঢ়সংকল্প রূপ গজ-কাঠিয়া ফিতা সর্বপ্রথমে সম্বল করা চাই। তারপর নিজ নিজ গলদ ছেঁটে বাদ-দেওয়া রূপ কাঁচিতে জড় মনটাকে ছেঁটে ছুঁটে নেওয়া দরকার। তারপর পরীক্ষারূপ আঙুলখানার গুঁতো সইতে হয়। সেই গুঁতো হাসিমুখে সইতে পারলেই জ্ঞান-ছুঁচে ও প্রেম-সুতোর সাহায্যে জড়-মন বডিস্ বা পিরাণ হয়ে চৈতন্যময়ী মনের বেশভূষা হ'য়ে পড়ে।" —নৃপেন্দ্র দে

সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, বিশাল হইতেও বিশালতর আত্মা প্রতি জীবের হৃদয়কন্দরে বিরাজিত: অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নি হিতোগুহায়াম্। এক্ষেত্রে নিজেকে হীন মনে করার প্রশ্নই নেই। যে এমত মনে করে সে প্রেমের মর্মই জানে না।

কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখেছিলেন :

"আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥"

'সোঽহমস্মি' বেদান্তের মহাবাক্য, ছোট্ট কথাটি, তাৎপর্য প্রকাণ্ড, একপরম, ব্রহ্মাণ্ডের সার বাক্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা : বটের বীজ সরষের বীজের চেয়েও ক্ষুদ্র কিন্তু তা থেকেই কালে মহীরুহ। শাস্ত্র বলেন : আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে (পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্মগ্রহণ করেন) আমি তবে ক্ষুদ্র কেন, হীন কেন হ'ব। ভক্ত তাই না অন্তরে মনে করেন : সোঽহমাবর্দে পুরুষ সোঽহমস্মি। এ উপলব্ধি অতি প্রাচীন বেদ-উপনিষদের কালে; যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ, আমি তা' হতে অভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু তৎসমুদয়ই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়: ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

"লতায় লাবণ্য, কুসুমে সুবাস।
সর্ব সৌরভেতে তোমারি বিকাশ॥"

'অহং ব্রহ্মাস্মি' বেদের এই মহাবাক্য, চরম সত্যের প্রকাশ সূচনা করে। মন্দিরে দেবতাকে বন্দী করে না রেখে জীবনে পোষণ করো। উপনিষৎ বলেন :

ঋচোঽ যো বেদ স বেদ দেবান্
যজুংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্।
সামানি যো বেদ স বেদ সর্বং
যো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম।

(ঋগ্বেদ জানলে না হয় দেবতাদেরই জানলে, যজুর্বেদ জানলে যাগযজ্ঞের কথাই বুঝলে, সামবেদে জ্ঞান হলে না হয় আর সব জানা হ'ল কিন্তু মানস বেদে যিনি জ্ঞানী তিনি ব্রহ্মাকে জানতে পারেন।)

আত্মতত্ত্ব সামান্য নয়। ভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি : 'আত্মনো গুরুরাত্মৈব।' অন্তরের আলোকই আলোক। যথার্থ পথের সন্ধান দিতে পারে সেই আলোক। বাহিরের এটা ওটা অবলম্বনের বৃথা চেষ্টা পরিত্যাজ্য। অন্তর্মুখী সাধকের স্বরূপ আরোপনিষদে বলেছেন : 'অব্যক্ত লিঙ্গা অব্যক্তাচারাঃ'। এঁদের বাহিরের বেশভূষা নাই। বাহ্য আচারের দাস তাঁরা নন, তাঁদের সব কিছুই অন্তরের মধ্যে। এহেন একত্ব-দর্শীর মন শোকমোহাতীত :

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা সর্বব্যাপী আত্মাকে আত্মমধ্যে উপলব্ধি করাই সাধনমার্গের চরম গতি। "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে"—বিশ্বকবির কথায় মধ্যে ইহারই অনুরণন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন : "নুনের পুতুলের লবণাম্বুরাশি সাগরের মধ্যে নিমজ্জন"; আর সাধক রামপ্রসাদও তাই গাহিলেন—"যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, আবার জল হয়ে সে মিশায় জলে।" বর্দ্ধমান জিলার এক গ্রামে পরম বৈষ্ণব উত্তমচাঁদ গাইতেন :

ও তোর মনের মানুষ, রইল মনে
মিছে ঘুরে পাগল হ'লি,

নদ, নদী, বন, মথুরা, বৃন্দাবন
কত কি যে ঘুরে এলি।
বল দেখি মন তথাই তোরে
কোথাও কি তার সন্ধান পেলি,
ও তুই আঁচলে মাণিক বেঁধে
আঁধার রাতে খুঁজে ম'লি।

মনুস্মৃতিতে পাই :

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ
মা বমংস্থা স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্।

আত্মাই আত্মার সাক্ষী, গতি। সে-কারণ হে পুরুষ তুমি উৎকৃষ্ট সাক্ষীস্বরূপ স্বীয় আত্মার অবমাননা কোরোনা।

কস্ত ত্বং বা কুত আয়াতঃ—এ প্রশ্ন অতি পুরাতন। আজও তার সমাধান হয়নি। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনলেন 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', তখন "অর্জুন মাম্ শব্দে—অহং শব্দে নিজ আত্মাকে না বুঝে বক্তা কৃষ্ণকে বুঝেছিলেন। ব্যাকরণ গ্রন্থে উত্তম পুরুষ অর্থে যে অহংতত্ত্বকে নির্দেশ করে, অর্জুন সেই অহংতত্ত্বকে না বুঝে, কৃষ্ণকে বেশ ভাল একজন উত্তম গুণবান ব্যক্তি বুঝেছিলেন।...যুগযুগান্তর হতে আত্মার কথা আলোচিত হয়ে আসছে। কিছুতেই ইহাকে ইদং-রূপে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে, কর্মকারকরূপে গ্রহণ করা যেতেছে না। যে গ্রহণকর্তা সেই যে আত্মা। বিশুদ্ধ কর্তৃকারক আপনাকে বিশুদ্ধ কর্মকারকরূপে পরিণত করিতে পারছেন না; চেষ্টাও ছাড়ছেন না। বিশ্ব নিজেকে ইতর বিশ্ব করতে পারছেন না; কিন্তু দর্পণ সংগ্রহ ক'রে, শুভ্র গর্ভাধান দ্বারা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি ক'রে তৎসাহায্যে আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। 'আমি নাই' এরূপ প্রত্যয়ও হয় না, অথবা আমিটা যে কি তাহাও ঠিক গ্রহণ হতেছে না, অর্থাৎ সমস্যা এই যে, আত্মাটা সদাপ্রকট হ'য়েও মহাগুপ্ত; আত্মাটা নিজ পরিচয়ের যে চেষ্টা সহস্রাধিক যুগ ধ'রে ক'রে আসছে ও অকৃতকার্য হতেছে—ইহা বোধ হয়, তাহার লীলাবিনোদ ও বড় সুখেরই লীলাবিনোদ। আমরাও দেখেছি যে, যখন যাহা পাই না, তখন তাহার প্রাপ্তি-চেষ্টাতে সুখ আছে এবং যখন তাহা পাই, তখন প্রায় তাহাতে আর আদর থাকে না। তাই বোধ হয়, আত্মা ইচ্ছা করেই এ যাবৎ স্বপরিচয় প্রাপ্তির পথে বহুপূর্বক নানা কণ্টক নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। সেই নানা কণ্টক বিঘ্ন ভ্রমের ভিতর দিয়ে তবে সত্যে নিজ পরিচয়ে উপস্থিত হোয়ে আত্মতৃপ্ত আত্মা একটা যেন নূতন চরিতার্থতা রূপ তৃপ্তি লাভ করে।"—(অভয়ের কথা)

"স্ফটিক যথা রক্তজবার বা নীল অপরাজিতার ছায়ায় সত্য সত্য লাল বা নীল হয় না, সদাই শুভ্র থাকে, তদ্বৎ বস্তুসি দেহে মমত্ব, পুত্রে পিতৃত্ব কামে কৈঙ্কর্যাদি সম্বন্ধ আত্মাতে জড়িত থাকিয়া, উপাধি-বিনির্মুক্ত শুদ্ধ আত্মাকে দুর্লভপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি আত্মা সদামুক্তই আছে। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য। কি 'কুহকই' আত্মা জানে।"—(অভয়ের কথা)

"কৃপা আমি ত ক্ষুদ্র, হীন-হীন নহি। স্ফটিক যথা সহজেই জবা-সন্নিধানে লাল হয় ও জবা তিরস্কারে ও অপরাজিতা-পুরস্কারে সহজেই লাল ত্যাগপূর্বক নীল হয়—অথচ স্ফটিক লালও হয়না নীলও হয় না। তদ্বৎ আমি জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে সদাই শুভ্র, মুক্ত।"—(অভয়ের কথা)

"অসহায় অথচ বুদ্ধিমান কোকিল-ডিম্বটা কাকের বাসা আশ্রয় করিয়া কাক-বক্ষতাপে ফুটিয়া উঠিয়া কোকিল হয়। তখন সে উড়িতে সমর্থ হইয়া, তবে কাকের বাসা ত্যাগ করে ও নিজ কুহুরবে নিজে আনন্দে বিভোর হইয়া স্বাধীনভাবে অনন্ত গগনে বিচরণ করে। চতুর কনিষ্ঠাধিকারী এই রক্তমাংসগঠিত তুচ্ছ মানবদেহকে নিজপ্রয়োজনে, কাকের বাসার মত আদর করিয়া আশ্রয় করে ও পাপত্যাগ, পুণ্যানুষ্ঠান, সাধুসঙ্গাদি উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়া অধিক অধিকার অর্জন করিয়া, দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া, ত্যক্ত-পাপপুণ্য, কর্মমুক্ত, স্বাধীন হইয়া, সোঽহং-গীতে কলাবৎ হইয়া উচ্চাধিকারের উর্দ্ধ পদবীতে, স্বমহিমায় স্বস্থানে অভয় হইয়া স্বরূপাবস্থিত হয়।

"আত্মা যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে তুমি আত্মাকে আনন্দকে, তাহার সকল রকম ছদ্মবেশের মধ্যে

তোমার নিজ প্রিয়রূপে নিশ্চয় চিনিয়া লইতে পারিবে। ভালবাসার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, তাহার নিকট প্রিয় আত্মা কদাচ আত্মগোপন করিতে পারিবে না।" (অন্তরের কথা)

"মনুষ্যের চক্ষু মনুষ্যেরই কার্যের উপযুক্ত, উহা দূরবীক্ষণ হইলেও দোষ—অণুবীক্ষণ হইলেও দোষ"। 'আমি' তে শ্রীভগবান সীমায়িত। দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের প্রয়োজন নাই, কেবল আসল 'আমিত্বে' দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা। "যে নিয়মের প্রভূত বলে ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব সাধন করিয়াছে, সিন্ধির বিন্দুর গোলত্ব সাধনেও সেই নিয়মের সমপ্রবল লাগিয়াছে।" —(ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

সীমায়িত 'আমি' আর ভূমা 'আমির' বেলাও তাই।

"তোমার নিজের মধ্যে অবস্থিত যে আত্মতত্ত্ব তাকে আবিষ্কার করো। তোমার সীমিত আমিকে ব্রহ্মানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত করো। স্বসত্তাবোধের লোপ নয়। স্বসত্তাবোধের প্রতিষ্ঠা। এই অদ্বৈত-বাদ। আমি ক্ষুদ্র নই, আমি নীচ নই, আমি মহান, আমি ভূমা, এই উদার উচ্চবোধই আত্মবোধ। আত্মবোধই আনন্দ। আর আনন্দই সৎ। জীব মাত্রেই ঈশ্বরের আভাস। জীব প্রতিবিম্ব। ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়। আসলে জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মের পরিণাম। আবার জীবের পরিণাম ব্রহ্ম। এই জ্ঞানেই আত্মস্ফুরণের স্ফূর্তি। এই জ্ঞানই মোক্ষ।...হৃদাকাশে চিদাদিত্য। চলেছি তবে আমরা আর কোন দেশে কোন সূর্যের সন্ধানে।" (পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)।

নর নয়, নারায়ণ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বসু

তোরই মাঝে সেই র'য়েছেন ভগবান
আগারে তাঁহারে আপনারে জেনে
বিপুল শক্তি সীমাহীন মেনে,
ভাঙরে শতেক মিথ্যা সে নওজোয়ান।

নরের সেবাই ঈশ্বর সেবা ঠিক্
আজ নর বলি' যারে করি হেলা
ছুড়েছি তার অপমান-ঢেলা,
কালই ত' পূজেছি দেব জানি' সাত্ত্বিক।

আকাশ হইতে নামেনিক' দেবযান
মাটীর মানুষে হয়েছে সারথী
দেব সে কৃষ্ণ, যিশু নারী সতী,
দিয়েছি বুদ্ধ নিমাই এ অর্ঘ্যদান।

পৃথ্বীর বুকে লিখা নারীর বাণী ;
গার্গী খুলভা মৈত্রেয়ী রাই
প্রেম-সাধনা প্রেমী মীরাবাঈ
মুছিছে কালিমা প্রেম সুধারাশি দানি'।

তোরাই ত' জানি তাপস মুনির দল
বিশ্বামিত্র শাক্য কণ্ব
যাজ্ঞবল্ক্য ধন্য ধন্য,
অদ্ভুত শক্তি বক্ষে রুদ্রানল।

বাণী আদর্শে কর্ তোরে রূপায়ণ
বলবে এ যুগে তুরীয়ানন্দ
রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ
আর যুগে ঠিক্ নর নয় নারায়ণ।

গ্রীক ও হিন্দু

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য

Sir Erlce Waterhouse, তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক *'The Philosophical Approach to Religion'*-এ ধর্মের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বুঝাতে গিয়ে ব'লেছেন যে, "From the standpoint of history it is clear that man's intellectual and social development proceeded in close touch with his religion • • • •. Not only was religion closely linked with moral development and the growth of human ideals, but it was also the nursery of most human arts and culture generally".

তার এরিকস্ ওয়াটারহাউস্ যাহা বলেছেন তাহার সঙ্গে আমাদেরও মতের অমিল নেই। মানুষের সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন দিকটা ধর্মের প্রসারের মধ্য দিয়েই স্ফূর্তি পেয়েছিল। ইহাই যদি হ'য়ে থাকে, তাহলে মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি ধর্মকেই ঐ সমস্ত সংস্কৃতির উৎপত্তির কারণ ভেবেছিল এবং তার ধর্মবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই (perspective) কলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে বিচার করতো। তার নিজস্ব ধর্মবোধ ও তত্ত্বের মাঝে ঐ সমস্ত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের চিন্তাধারার মিল বা সামঞ্জস্য না খুঁজে পেলে মানুষ তাকে বাতিল কোরে দিত। এইভাবে বহু চিন্তাবীরদের সনাতনী ধার্মিক ও পুরোহিতদের হাতে লাঞ্ছনার ব্যাপার আমরা ইতিহাসে পড়েছি।

জগতের প্রায় সমস্ত জাতিই তাদের নিজস্ব ধর্মবোধের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিল। ইউরোপ মাত্র রেণেশাঁসের সময়েই এই ধর্মের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হ'য়েছে। আমাদের ব্যাপারটা কি? আমরাও কি ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে নানাবিধ সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাকে যাচাই করতে অভ্যস্ত ছিলুম না? উপরোক্ত স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের দেশেও হয় নি।

এটা সত্যকথা যে নৈষ্ঠিক হিন্দু-সমাজ, বেদকেই সব কিছু চিন্তার ও জ্ঞানের চির প্রামাণ্য ব'লে ধ'রে আসছে। বেদ ছাড়া আর যা কিছু চিন্তাধারা আছে তাহা সনাতনী নৈষ্ঠিক হিন্দু-সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত।

আমাদের দেশে emancipation of thought (চিন্তার স্বাধীনতা) হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক রেণেশাঁসের অনেক স্তর পরপর প'ড়েছে, যাহা অনেক সময় গ্রীসেও সম্ভব হয় নি। তবুও ইউরোপের রেণেশাঁসের সঙ্গে আমাদের দেশের রেণেশাঁসের একটা মূলগত পার্থক্য আছে যাতে ক'রে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ইউরোপের মত আমাদের দেশে প্রসারিত হয় নি।

আমাদের দেশে রেণেশাঁসের গোটাকতক স্তর আলোচনা করা যাক। এটা সত্য কথা যে, বৈদিক যুগের চিন্তার রেণেশাঁস আরম্ভ হলো উপনিষদের আমল থেকে। যখন বৈদিক অনুষ্ঠানমূলক শুষ্ক কর্মকাণ্ডের প্রসারে মানুষ আপনার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যকে হারাচ্ছিল তখন বিশ্বাতীত ও অন্তরের নিবিড় জ্ঞানের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে। অবশ্য উপনিষদের যুগের যে নব জাগরণ, তা মাত্র একমুখী ঈশ্বরমূলক দর্শন-চিন্তার প্রসারেই হ'য়েছিল, তবুও ভারতের ইতিহাসে তাই প্রথম নব জাগরণ। উপনিষদের পরের যুগ আসে (অন্ততঃ ঐতিহাসিকদের মতে) ষড়দর্শনের যুগ। এ যুগে সূত্রাকারে ষড়দর্শন রচিত হ'য়েছিল। এইজন্য এই যুগকে ব'লে 'সূত্রকারদের যুগ।'

সূত্রকাররা হ'চ্ছেন সকলেই ঋষি। এই ঋষিবাক্য অভ্রান্ত। এই সূত্রকারদের দর্শনই খাঁটি মৌলিক চিন্তার পরিচয়। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনসমূহও মৌলিক চিন্তার পরিচয়রূপে বিখ্যাত। এই সব দর্শন-গ্রন্থ ছাড়া পরবর্তী যুগে এইরকম খাঁটি মৌলিক চিন্তার আরও নূতন নূতন অবদান আর হ'য়ে ওঠে নি। সূত্রকারদের পরে এল ভাষ্যকারদের যুগ। এইসূত্রে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে, স্বাধীন প্রতিভা সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষীদের ধারণা আমাদের কাছে কিছু অস্পষ্ট ঠেকে। প্রাচীন মনীষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হ'চ্ছে ঋষি এবং অপরটা হ'চ্ছে আচার্য্য। উপনিষদ ও সূত্রকাররা হচ্ছেন সকলেই

ঋষি। এঁদের বাক্য স্বতঃপ্রমাণ ব'লেই শ্রদ্ধা দেওয়া হ'য়েছে। এঁদের মনীষা সম্বন্ধে ধারণাটা এতই অনড় ছিল যে পরবর্তী যুগের আচার্যেরা যত বড়ই প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী হউন্ না কেন এঁদের সম-স্তরে ভাষ্যকারেরা উঠতে পারেন নি।

আর্ষ-জ্ঞানের প্রতি এই অত্যধিক পিছুটানেই পরবর্তী যুগের আচার্যদের অতুল মনীষা সবই আর্ষ জ্ঞানের ভাষ্য রচনায় নিয়োজিত হ'য়েছিল। আচার্য-প্রতিভা যত বড়ই হোক না কেন সেই প্রতিভার মূলধন নিয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ মৌলিক দর্শনগ্রন্থ রচনার চেষ্টা করতেন না, পাছে অভ্রান্ত ঋষি-বাক্যের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ হয়। তাঁদের সমস্ত প্রতিভা ও মনীষা ঐ সমস্ত ঋষি-বাক্যের ভাষ্য রচনায় নিয়োজিত করতেন। লোকে কোন চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ও মৌলিকত্বের পরিচয় পাবার আনন্দের পরিবর্তে দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্রের নূতন ভাষ্য পড়বার একই কৌতূহল চরিতার্থ করতো। এই সমস্ত কারণেই দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তী আচার্যদের শ্রুতিসম্মতভাবে ভাষ্য রচনা করবার অন্তহীন প্রয়াস।

এই পথ থেকে যাঁরা একটু স'রে যাবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের যথেষ্টই লোকনিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। আচার্য শঙ্কর ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি নিজের অতি গভীর যুক্তি ও সূক্ষ্মতম চিন্তার শক্তিতে যে সমস্ত ঔপনিষদিক ব্যাখ্যা করেছেন, সেসব অনেক ক্ষেত্রে শ্রুতির সঙ্গে মেলে নি যদিও তিনি তাহা অস্বীকার ক'রেছেন। সেই ব্যাখ্যান তবুও না মিলিলেও তাঁর অসাধারণ চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতার আদর না ক'রে শুধু শ্রুতিসম্মত নয় ব'লে তাঁর মতকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত' বলা হ'য়েছে। বিরোধী পক্ষদের আচার্য শঙ্করের প্রতি ঐ উক্তি শুধু ভ্রান্ত-ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্য কোন দেশেই বোধ হয় আর্ষজ্ঞানের এই রকম পিছুটান্ নাই। রেণেশাঁসও দেশে অনেকবার এসেছে। কিন্তু আর্ষজ্ঞানের সত্যতা চরম ও পরম ব'লে গাণিতিক ভাবে ধরে নেওয়ায় এই সব রেণেশাঁসে খাঁটি মৌলিক চিন্তার পরিবর্তে প্রাচীন উপনিষদ ও দার্শনিক সূত্রের টিকা টিপ্পনীই বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে রেণেশাঁসে নূতন চিন্তা-ধারার নব নব জাগরণের এই একটা মৌলিক বাধা মনে হয়।

তখন ভারতবর্ষের লোকের মন এখনকার মত বিজ্ঞানমুখী ছিল না। যাহা কিছু নূতন চিন্তার প্রসার হ'ত তা প্রধানতমভাবে দর্শনের মধ্য দিয়েই সাধিত হ'ত। কিন্তু উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা ও ষড়দর্শন ছাড়া পরবর্তীযুগে সবই হ'য়েছে তার ভাষ্য ও টিকা-টিপ্পনী। মৌর্যোত্তর কনিষ্ক যুগই অনেক মৌলিক গ্রন্থের রচনার যুগ ব'লে বিখ্যাত। অবশ্য এর একটা কারণও আছে। কনিষ্কের যুগের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ দান, যা ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পরিধি বাড়িয়েছে সে সবের অধিকাংশ বৌদ্ধ প্রতিভাতে সম্ভব হ'য়েছে। এদের শ্রুতিসম্মত কোনও গ্রন্থ রচনা করবার বালাই ছিল না। পরবর্তী গুপ্তযুগেও যে সমস্ত খাঁটি মৌলিক দর্শনগ্রন্থ রচিত হয়েছে তাও প্রায় অধিকাংশই বৌদ্ধদর্শন। অসঙ্গ, বসুমিত্র, দিঙ্‌নাগাচার্য প্রভৃতি এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, অন্য বিষয়ের আনুষঙ্গিকরূপে গবেষণা। জ্যোতিষের অঙ্গ হিসাবে গণিতের এবং আয়ুর্বেদের অঙ্গ হিসাবে রসায়নের চর্চাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। স্বাধীনভাবে কোন বিজ্ঞানের চর্চাকে ভারতীয় মনীষিরা তেমন আমল কোন দিনই দেন নি।

কিন্তু প্রাচীনযুগে গ্রীসে আর্কিমিডিস, ইউক্লীড প্রভৃতি পণ্ডিতকে আমরা স্বাধীনভাবে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে দেখি। গ্রীসের সভ্যতা ধ্বংস হ'য়ে যাবার পরও ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতা অটুট ছিল এবং আছে এবং তারপর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরণ অনেকবার এসেছে, কিন্তু স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার যে পত্তন গ্রীসের পণ্ডিতেরা ক'রে গিয়েছিলেন, পরবর্তী যুগে শিক্ষা ও

সংস্কৃতির নব জাগরণের ক্ষেত্রেও তার বড় হদিস পাওয়া যায় না।

গ্রীসের এই স্বাধীনচিন্ততার উত্তরাধিকারী যারাই হ'য়েছি তাদের মধ্যেই এই স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানানুশীলনের আগ্রহ খুব বেশী দেখি। মধ্য-যুগের আরববাসীরা এর সমুজ্জ্বল উদাহরণ।

পরবর্তী যুগে আমরা দেখতে পাই মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ধারাটা অনেকটা ভারতীয় চিরন্তন সাংস্কৃতিক ধারার মত। তখন অ্যারিষ্টটলের দর্শন এবং চিন্তাধারার ভাষ্য এবং টিকা-টিপ্পনীই ইউরোপীয় মধ্যযুগের পণ্ডিতদের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল, যেমন ভারতবর্ষে সূত্রকার ঋষিদের সূত্রের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করাই পরবর্তীযুগের ভারতীয় দার্শনিকদের নিজেদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেবার একমাত্র অবলম্বন ছিল। ভারতবর্ষে এটা চিরকালই চ'লে এসেছে। ভারতবর্ষে এই নিয়মটা ইউরোপে ব্যতিক্রম হিসাবে মাত্র মধ্যযুগেই ছিল।

ইউরোপের মধ্যযুগ ছাড়া প্রাচীনযুগ ও আধুনিক যুগ হ'চ্ছে সৃষ্টির যুগ, কিন্তু ভারতের প্রাচীনযুগই হ'চ্ছে মৌলিক সৃষ্টির যুগ। মৌলিক সৃষ্টির যুগ বলতে যে পরবর্তী যুগে মৌলিক দার্শনিক প্রতিভার উদ্ভব হয় নি, তা নয়। কারণ শঙ্করাচার্য থেকে আরম্ভ কোরে শঙ্কর-পরবর্তী যুগের রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রতিভায় ও মনীষায় যে কোনও দেশের মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিকগণের সমকক্ষ। শঙ্করাচার্য বেদান্ত, উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য রচনায় তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করলেও তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রতিভার সমকক্ষ।

শঙ্করের পরবর্তী কালের দার্শনিকবৃন্দও প্রতিভার মৌলিকতায় যে কোনও দেশের গর্বের বস্তু। সুরেশ্বর, বাচস্পতি, প্রকাশাত্মন, চিৎসুখাচার্য ও মধুসূদন সরস্বতীর মত অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদের প্রতিভা যে কোন সভ্যদেশে জন্মালে কিছুই অগৌরবের হতো না। এঁরা শঙ্করকে অনুসরণ করলেও এঁদের দার্শনিকতা ভারতীয় দর্শনসাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ কোরেছে। এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই সমস্ত দার্শনিকরা স্বাধীনভাবে দর্শনগ্রন্থ রচনা না কোরে ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনী রচনা করতে গেলেন কেন? এই সমস্যার উত্তরের উপর এই প্রবন্ধের একটা মোটামুটি দিগ্‌দর্শন হবে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান সাধনায় একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক্। প্রাচীন ভারত জ্ঞান-সাধনায় মননকে (intellect) সর্বোচ্চ স্থান দেয় নি। মননের পর আছে নিদিধ্যাসন। মননলব্ধ নিঃসংশয় সত্যকে নিদিধ্যাসনের দ্বারা জীবনে উপলব্ধি করা। এই নিদিধ্যাসনের দ্বারা ভারতীয় মনীষা এমন একটা চরমতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিল, যার মহনীয়তা ও উদারতা তাদের মনকে ধীর, গম্ভীর ও অন্তর্মুখী কোরে দিয়েছিল—ধীর, স্থির ও প্রৌঢ় বুদ্ধিতে পরিণত গভীর নিয়ম ও সংযমবোধ। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতীয় চিত্তের কাছে গ্রীসিয় চিত্তকে অনেকটা চপল ব'লে মনে হয়। নিদিধ্যাসনের দ্বারা উপলব্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠা জীবনচর্যার মধ্যে দৃঢ় মূল হ'য়েছিল ব'লেই ভারতীয় মননশীলতার মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ছিলনা। এই স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না ব'লেই ভারতীয় মৌলিক প্রতিভা পরমতত্ত্বমূলক শাস্ত্ররাজির মধ্যেই খুঁজতো নিজের বিকাশের পথ। নূতন করে দর্শন না। রচনায় প্রবৃত্ত হতো না। এই পরমতত্ত্বকে যাঁরা আবিষ্কার কোরেছিলেন তাঁরা ছিলেন ঋষি। এই ঋষিদের নির্দেশই সমস্ত হিন্দু-ধর্মের মূলভিত্তি।

গ্রীসে এই ঋষিসঙ্ঘ ছিলনা, সেখানে ছিল ভারতীয়দের মত আচার্য। সক্রেটিস্, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, পিথাগোরাস প্রভৃতি গ্রীক মনীষীরা মহান আচার্য শ্রেণীভুক্ত। এঁরা নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না, সেইজন্য সমাজে নিদিধ্যাসনের চর্চাও ছিল না। এই নিদিধ্যাসনের চর্চা না থাকায় সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি কোরে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ ছিলনা। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ না থাকায় প্রত্যেকেই

স্ব স্ব মননশীলতায় অপর মতবাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে অপর মতবাদের উপর নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা কোরেছেন। তার ফলে কোন সত্য দৃঢ়মূল হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে গ্রীসের জাতীয় জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠাকে সুদূর-পরাহত কোরে দিয়েছিল। এইভাবে গ্রীসের জাতীয় জীবন নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক সংহতির অভাবে খৃষ্ট-ধর্মের কাছে পরাভূত হ'য়েছিল। ভারতীয় মননশীলতা যেখানে যা কিছু স্বেচ্ছাচারিতা দেখেছে বা দেখিয়েছে—তা হলো বৌদ্ধদের সহিত বাদানুবাদে এবং নব্যন্যায়শাস্ত্রে। এ ব্যাপার ছাড়া মননশীলতার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা আর কোথাও বড় দেখা যায় নি।

নিদিধ্যাসনলব্ধ পরমতম সত্য ভারতীয় মনীষীদের জীবনে এমন একটা গভীর সান্ত্বনা ও তৃপ্তি এনে দিয়েছিল যাতে তাদের গভীর মানসে খণ্ড খণ্ড জিজ্ঞাসা তার আপাতমূল্য অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলে-ছিল। এই কারণেই জড় বিজ্ঞানের গবেষণা আর পৃথকভাবে করবার প্রেরণা তারা বিশেষ পায়নি। গ্রীসের ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। তারা পরমতম সত্যের সন্ধান পায়নি বলে তাদের মানসে একপ্রকার অস্থিরতা ছিল। অথচ সত্যের পরমতম উপলব্ধি ছিলনা ব'লে গ্রীসের এই অস্থিরতা নানা খণ্ড জিজ্ঞাসায় পূর্ণ ছিল। একদিকে মননশীলতার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপর একদিকে নানা খণ্ড জিজ্ঞাসা, এইভাবে গ্রীসের মন দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি কোরেছে। ভারতীয় মনে এই অস্থিরতা ছিলনা ব'লেই মননশীলতার উদ্দামতা ও নানা খণ্ড জিজ্ঞাসা তাদের চিত্তে বড় স্থান পেতো না। বিজ্ঞানের যে সমস্ত দিক ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সরা-সরি যুক্ত, সেখানে ভারতীয় মন আবিষ্কারকের গৌরবে গৌরবান্বিত। গণিত, আয়ুর্বেদ প্রভৃতিই এর উদাহরণ। গণিতে সংখ্যালিখন-পদ্ধতি, দশগুণোত্তর প্রণালী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদে রসায়ন ও উদ্ভিদ্য বিদ্যা প্রভৃতির আবিষ্কার হিন্দুদের বিজ্ঞান-সাধনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে হিন্দুরা গ্রীকদেরও শিক্ষাদাতা। ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন সাধন কো'রে আর তার বাইরে যে কৌতূহল তা প্রায় সবই একটা অখণ্ড তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার তলায় চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। শুধু মননশীলতা জ্ঞান সাধন প্রণালীর শেষ সীমা থাকলে ব্যবহারিক জীবনের আশুর প্রয়োজন ছাড়া আরও নানা বিশ্ব-তথ্যের প্রতি নানা খণ্ড খণ্ড কৌতূহল থাকতো, কিন্তু মননশীলতার উপর নিদিধ্যাসন, জ্ঞান সাধন প্রণালীর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হওয়ায় এবং তার মাধ্যমে পরমতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হওয়ায়, খণ্ড খণ্ড কৌতূহলের আর বিশেষ কোন আকর্ষণ ভারতের থাকে নি। সেই জন্যই ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরিধিকে আশুর লক্ষ্যে রেখেই বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল,—বিজ্ঞানের নানা শাখা সম্পর্কে বিভিন্ন পৃথক শাস্ত্র রচিত না হবার উহাই নিগূঢ় কারণ। নানা খণ্ড খণ্ড তাত্ত্বিক কৌতূহল এক অখণ্ড তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় বিলীন হ'য়েছিল। এইভাবে গ্রীক ও হিন্দু বিভিন্ন পথে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অপরিমিত ঐশ্বর্য দান কোরেছে।

"অহঙ্কারাক্তের কখনও জ্ঞান প্রভাব বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কার-বিমর্দ্দনকারিণী সেবার উপদেশ দিয়াছেন। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণের সেবা না করিলে শ্রীহরির দাস্য না করিলে কখনও এ-অজ্ঞতা মানবকে পরিত্যাগ করে না। একটু আধটু মান যশ পাইলে ইহা আরও বদ্ধমূল হয় এবং আরও অধঃপতনের কারণ হয়।"

—রামকৃষ্ণানন্দ

ঈজিপ্ট সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত

(মধ্যযুগ)

শ্রীভুবনমোহন লাহিড়ী, এম্-এ, বি-এল

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় আমেনথিসের প্রপৌত্র হার্মাহাবি, 'এটোন্' দেবতার মন্দির ধ্বংস করিয়া 'এমন্' দেবতাকে সগৌরবে থিবস্ নগরীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হার্মাহাবির সুবিচার ও সুশাসনে ঈজিপ্টে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ফ্যারাওগণের রাজত্বকালে তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণ প্রজাগণকে পীড়ন করিত ও রাজস্ব গ্রহণ-কালে সম্রাটগণের প্রাপ্য অংশ হইতে নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিত। ফ্যারাও হার্মাহাবি তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে ঘোষণা করাইয়া-ছিলেন যে, উৎকোচ গ্রহণকারী ও প্রজাপীড়ক রাজ-কর্ম্মচারীদের নাসিকা কর্ত্তন করিয়া সুদূর মরুভূমি ও পর্ব্বতে নির্ব্বাসন করা হইবে। এইরূপ কঠিন শাসনের ফলে অত্যাচারীগণের হাত হইতে প্রজাগণ রক্ষা পাইয়াছিল। হার্মাহাবির প্রস্তর মূর্ত্তিতে তাঁহার সুগঠিত দেহ ও মুখমণ্ডল, তীক্ষ্ণ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ ও চিন্তামগ্ন চক্ষুযুগল নিপুণতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রথমেই নিগ্রোদের ইথিওপিয়া রাজ্য ও তাহারপর এশিয়া-মাইনরের আর্বাদ, খাটি, আলাসিয়া ও কোলে-সিরিয়া প্রদেশগুলি জয় করেন। তাঁহার বিজয়-বৃত্তান্ত 'গেবেল্-সিল্‌সিলেহ্' স্থিত মন্দির-প্রস্তরে খোদিত ও চিত্রিত হইয়াছে। খাটি জাতিরা 'টারস্' ও 'এমানস্' পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তীস্থানে বাস করিত। প্রফেসার হেল্‌ডে ইহাদিগকে সেমাইট্ বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করেন যদিও প্রফেসার ম্যাস্‌পেরো ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের 'অজ্ঞাত বংশোদ্ভূত' আখ্যা দিয়াছেন। খাটির অধিবাসীগণ ফ্যারাও তৃতীয় থুট্‌মসিস্ ও চতুর্থ আমেনথিসের রাজত্বকালে মিশরে বহুবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিত ও মিশরের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ রাখিত। খাটি প্রদেশের অশ্ব ও রথ প্রসিদ্ধ ছিল এবং গ্রীসের ইতিহাসেও ইহার উল্লেখ আছে। খাটিদের বর্ণমালা ছিল তীরের ফলকের ন্যায় (cuneiform script) ও তাহাদের রাজ্যে দোভাষী (interpreter), সরকারি দলিল-লেখক (official scribe) রাজ্যের প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। মেঘ, বায়ু, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত ও অরণ্যে বহুবিধ দেবতা বাস করেন—এই জ্ঞানে খাটিরা তাঁহাদিগকে পূজা করিত। সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ুকে ইহারা প্রধান দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। বিভিন্ন দেবগণের মূর্ত্তি ইহারা পর্ব্বত, অরণ্য ও নির্জ্জন নদীতীরে স্থাপন করিত। দেবগণের বাহনগণও (সিংহ, হরিণ, ছাগল প্রভৃতি) তাহাদের প্রভুদের সহিত স্থান পাইত। খাটি রাজ্যে একটি প্রধান নরপতি থাকিতেন ও তাঁহার অধীনে থাকিতেন সামন্ত রাজাগণ। ইহারা সকলে প্রধান নরপতিকে যুদ্ধকালে রথ ও সৈন্যাদির দ্বারা সাহায্য করিতেন। যুদ্ধের সেনার মধ্যে পদাতিকসৈন্যই ছিল প্রধান ও ইহারা ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, তীর ও ধনুক ব্যবহার করিত। ফ্যারাও হার্মাহাবি যখন এশিয়া জয়ের কল্পনায় মিশরের পূর্ব্বসীমান্তে আগমন করেন তখন তিনি হিটাইট্‌গণকে ভূমধ্যসাগর ও লেবানন্ পর্ব্বতমালা হইতে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখিতে পান। তৎকালীন হিটাইট্‌গণের সম্রাট ছিলেন সাপালুলু। তিনি চ্যাল্‌ডিয়া ও এশিরিয়া দেশ ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের (টারস পর্ব্বতমালা হইতে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত) অধিপতি

ছিলেন। এই সব ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির মধ্যে—'জাহি', 'আলাসিয়া' ও 'আমক'র নাম প্রাচীন শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়। এশিয়া-মাইনরের খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাচীন ভৌগলিক মানচিত্রেও এই প্রদেশগুলির নামোল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন কারকেমিস্, টুনিপা ও হামাথ নগরীও হিটাইট্‌গণের অধিকারে ছিল। সেই-কালে এশিয়ামাইনর মহিসিয়া প্রদেশের ওলিম্পাস পর্ব্বত হইতে টরস পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিরামিস্ ও সরাস্ নদী পশ্চিমদিকে ভূমধ্যসাগরে এবং আইরিস্ ও হেলিস্ নদী উত্তরে ইউক্সিন্ সাগরে পড়িয়াছে। ওলিম্পাস্ ও টরস পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাইওনিয়ান্, সারডিনিয়ান্, লিসিয়ান্ ও অন্যান্য জাতিরা বাস করিত। ইহাদের পশ্চিমে ইজিয়ান্ সাগরের মধ্যে লেস্‌বাস্, চায়স্, সামস্, কস্ ও রোডস্ দ্বীপ অবস্থিত। এশিয়ামাইনরের উত্তরাঞ্চলে চ্যালিবিস্, বলকান্, ডারডেনিয়ান্, মাইসিনিয়ান্ ও ফিনিশিয়ান্ জাতিগণ বাস করিত। খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এশিয়ামাইনরের অধিকাংশ স্থান খাটি-সম্রাটের অধিকারভুক্ত থাকায় সেই দেশের সহিত ঈজিপ্টের বাণিজ্য বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। খাটি জাতি দুর্গম প্রদেশে বাস করিত ও ইহাদের প্রকৃতি ছিল উগ্র ও দুর্দ্দমনীয়। দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনরাজ তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল। ফ্যারাও হার্মাহাবি এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া খাটি সম্রাট সাপালুলুর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। এই সন্ধির ফলে সিরিয়ার উত্তরাংশে হিটাইট্‌গণের অধীনে আসে ও দক্ষিণাংশে [ফিনিশিয়া ও কেনান প্রদেশসহ] ঈজিপ্টের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহত থাকে। হার্মাহাবির পরবর্ত্তী ফ্যারাও প্রথম রামেসিস্ মিশরের 'উনবিংশ রাজবংশ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ ঈজিপ্টে ১৩০ বৎসর কাল (খৃঃ পূঃ ১৩৫০—১২২০) রাজত্ব করিয়াছিল। প্রফেসার ব্রুগস্ ও মেয়ার বলেন যে প্রথম রামেসিস্ হার্মাহাবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইনি বৃদ্ধবয়সে সিংহাসন আরোহণ করিয়া ৬।৭ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইথিওপিয়া ও সিরিয়া দেশে যুদ্ধ অভিযান প্রেরণ করা ভিন্ন ইহার অন্য কোনও কার্য্যের বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইহার স্মৃতি-মন্দিরের ভগ্নাংশ ওয়াডি-হালফার নিকট বোহানি নগরে ও থিবস্ এর 'এমন্' দেবতার মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম রামেসিসের পুত্র প্রথম সেটি প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। সেটি সিরিয়ায় যুদ্ধ অভিযান পাঠাইয়া পাকানানা (এল্ কেনান) নগরী অবরোধ করেন। পরে তিনি হিটাইট্‌গণের অধিকৃত আমুরু প্রদেশে গমন করিয়া কোডস্থ নগর অধিকার করেন। এই বিজয়কাহিনী কার্ণাকের মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। এথবাই নামক স্থানের (লোহিত সমুদ্রের তীরে) স্বর্ণখনি বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ফ্যারাও প্রথম সেটি তাহাতে পুনরায় কার্য্যারম্ভ করেন কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ খনিগুলিতে অবশিষ্ট স্বর্ণ অল্পই ছিল ও দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রদেশে দারুণ জলকষ্টের জন্য দীর্ঘকাল কার্য্য করান সম্ভব হইত না। সেটির নির্ম্মিত একটি মন্দির বর্ত্তমান বেতেসিয়েহ্ গ্রামের পর্ব্বতাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। সেই মন্দিরের প্রস্তরে খোদিত-লিপি পাঠে সেটির রাজত্বকালের অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ জানা গিয়াছে। পেপাইরস্ পত্রে চিত্রিত সেই প্রদেশের একটি মানচিত্র প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ (লেপ্‌সিয়াস্ ও চাবাস্) উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাকে তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপুরাতন মানচিত্র বলিয়াছেন। সেটির নির্ম্মিত কার্ণাক নগরীর বিরাট মন্দির ভগ্নাবস্থায় অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। প্রফেসার ম্যাসপেরো বলেন যে প্রাচীন গ্রীস ও ইটালির ভাস্করেরাও ইহার ন্যায় বিরাট ও সুন্দর-মন্দির প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ইহার একটি কক্ষ ৩২৫ ফিট লম্বা ও ১৬২ ফিট চওড়া। এই সৌধমালার মধ্যস্থিত কক্ষটি উচ্চতায় ৭৯ ফিট ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ২টি গম্বুজ ইহার অপেক্ষা ৬৩ ফিট উচ্চ। তৃতীয় আমেনথিস্ নামক মন্দির সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেটি সেই কার্য্য আরম্ভ করেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়

তিনিও ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। প্রথম সেটির সমাধি-মন্দির এবাইডস্ নগরীতে নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহাও পুরাকালের স্থপতিবিদ্যার অদ্ভুত নিদর্শন। ইহার মধ্যে সেটির প্রস্তর-নির্মিত মূর্তি আছে। এই মূর্তির নির্মাণ-কৌশল দর্শনে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ চমৎকৃত হইয়াছেন। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বহু চিত্র ও লিপি আছে। কিন্তু সেটির আসল সমাধিস্থান থিব্‌স্ এর নিকট কোর্ণাগ্রামে অবস্থিত। এই স্থানের নির্মিত সমাধিমন্দিরের সৌন্দর্য্য এবাইডসের মন্দিরের তুল্যই ছিল। সেটির 'মমি' প্রস্তরনির্মিত আধারের মধ্যে কাষ্ঠের বাক্সে রক্ষিত ছিল। সম্রাটের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, দীর্ঘচক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসিকা এই 'মমি'তে দেখা যায়। এবাইডসের সমাধিমন্দির ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রফেসার বেল্‌জনি কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। সেটির প্রস্তরনির্মিত দেহাধার লণ্ডন মিউজিয়ামে প্রেরিত হইয়াছে। সেটির পুত্র তাহার পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সেটির কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় রামেসিস্ ফ্যারাওগণের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম সেটি ১৩।২০ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই রামেসিস্‌কে সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নাহারেম্ প্রদেশের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের, বিশেষতঃ হিটাইট্‌গণের ক্রমবর্দ্ধমানশক্তি ফ্যারাওগণের চিন্তার কারণ হইয়াছিল। সেইজন্য দ্বিতীয় রামেসিস্ মিশর ও 'জাহু' প্রদেশের মধ্যবর্ত্তীস্থানে একটি প্রকাণ্ড দুর্গ ও সেনানিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও সেইস্থান হইতে এশিয়ার উপর সতর্কদৃষ্টি রাখিতেন। হিটাইট্ সম্রাট খাটুসাঙ্ক ঈমিস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে রামেসিস্ স্বয়ং যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া হিটাইট্‌গণকে আক্রমণ করেন ও খাটুসাঙ্ক পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। কথিত আছে যে এই যুদ্ধে রামেসিস্ অতুল বিক্রম ও যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিটাইট্ রথীগণ তাঁহাকে উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিলেও তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসেন। ইহার মধ্যে একবার তাঁহার জীবন অতিশয় বিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার শরীর-রক্ষক (মাত্র) ভিন্ন আর কোনও সৈন্য নিকটে ছিল না। সেই সুযোগে সম্রাটকে কতিপয় যোদ্ধা আক্রমণ করে। সম্রাটের পালিত সিংহ (যাহাকে সম্রাট প্রত্যেকযুদ্ধেই সঙ্গে লইয়া যাইতেন) সেই সময় হিটাইট্ যোদ্ধাগণকে আক্রমণ করিয়া সংহার করিলে সম্রাটের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বিবরণ নিউবিয়া প্রদেশের আবু সিম্বেলের প্রস্তরফলকে ও লক্সরের মন্দির (রামেসিয়াম্) ও এবাইডসের মন্দিরে (মেম্‌নোনিয়ম্) চিত্রিত ও বর্ণিত হইয়াছে। রামেসিসের রাজত্বের অষ্টমবর্ষে 'গ্যালিলি' প্রদেশে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয় ও সেইসঙ্গে কোলে-সিরিয়া প্রদেশ এই বিদ্রোহে যোগদান করে। এই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফ্যারাও হিটাইট্ সম্রাটের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধির বিস্তৃত বিবরণ চ্যাল্‌ডিয়া-বাসীদের বর্ণমালায় ধাতুখণ্ডে ও দুইটিক পৃষ্ঠে খোদিত হইয়াছিল। এই সন্ধিসূত্রে মিটানি, নাহারেম্, আলাশিয়া ও আমুরু প্রদেশকে ফ্যারাও পরিত্যাগ করেন ও ফিনিশিয়া, খাল্, জর্ডনের নিকটবর্ত্তী ভূমিখণ্ড, আরব মরুভূমি ও সাইনাই উপদ্বীপ গ্রহণ করেন। ফলে দেখা যায় অর্দ্ধ শতাব্দীর যুদ্ধের পরেও ফ্যারাওগণ হিটাইট্ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ জয় করিতে সক্ষম হ'ন নাই। দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকালে আফ্রিকা মহাদেশের বহুকটি জাতি : 'টিমিহু' 'টিহেনু', 'মাশুয়াসা', এবং কুশ্ ও পুয়ানিট দেশস্থ নিগ্রোগণ প্রায়ই মিশরে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ করিত। ক্রীট প্রদেশেও দুর্দ্ধর্ষ দস্যুগণ প্রায়ই অরাজকতা করিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিত। এশিয়া ভূখণ্ডে চ্যাল্‌ডিয়ার ক্ষমতা তখনও অপ্রতিহত ছিল। হিটাইট্‌গণের সহিত সন্ধিসূত্রে ফ্যারাও ঈজিপ্টের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের আক্রমণ ও অভিযান হইতে সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। এই সন্ধি দৃঢ়তর করিবার মানসে ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিস্ হিটাইট্-সম্রাট খাটুসাঙ্কর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই উদ্বাহ-কাহিনী ট্যানিস্ ও আবু সিম্বেলের স্মৃতি-ফলকে বর্ণিত আছে। এই মিলনের ফলে ফ্যারাওগণের চিরশত্রু হিটাইট্‌গণ

তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিল। এইসময় ফিনিশিয়াবাসীগণ বাণিজ্যসূত্রে মিশরের থিব্‌স্ নগরী পর্য্যন্ত বৃহৎ নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকালে স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল ও নীলনদের দ্বিতীয় জলপ্রপাত হইতে ব-দ্বীপের মোহানা পর্য্যন্ত বহু সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহু পর্ব্বতগাত্রে রামেসিস্ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া নিজের নাম খোদিত করিয়া গিয়াছেন। বীট-ওয়ালি, আর্ক-হোসেন, বেনি-হাসান, ডেয়ার-এল্-বাহারি, এল্‌কাব, গেবেল-সিলসিলেহ্ ও ওয়াডি-এস্-সিবুয়াতে তাঁহার নির্ম্মিত বহু মন্দির, স্তম্ভ ও স্ফিক্স্ (Sphinx) এর মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আবু সিম্বেলের পর্ব্বতমালা যেখানে নীলনদকে স্পর্শ করিয়াছে সেইস্থানে রামেসিস্ নিজের চারটি প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি (প্রত্যেকটি ৬৩ ফিট উচ্চ) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এখানে যে মন্দিরে 'এমন্-রা' পূজিত হইতেন তাহার পার্শ্বেই 'ওসাইরিস্' দেবতার ৮টি বিরাট প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রভাত-সূর্য্যরশ্মি ইহাদের মুখমণ্ডলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিত। মন্দির, স্তম্ভ ও সৌধমালাদি নির্ম্মাণকার্য্যে দ্বিতীয় রামেসিস্ যে অদ্ভুতপূর্ব্ব শক্তি ও রুচি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। মিশরের উনবিংশ ফ্যারাও রাজবংশের অভ্যুত্থানকালে ভাস্কর্য্য-বিদ্যা উৎকর্ষের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কঠিন-প্রস্তরখণ্ড কর্ত্তন করিয়া কিরূপে ভাস্করেরা কখনও হাস্যোজ্জ্বল, কখনও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, কখনও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি গঠন করিত তাহা বহুসহস্রবর্ষ পরেও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। দ্বিতীয় রামেসিস্ দীর্ঘ ৬৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সেই সময় নিউবিয়া, আবু সিম্বেল, লাক্সর, কার্ণাক্, এবাইডস্, হেরাক্লিওপলিস্, হেলিওপলিস্, বিউবাসটিস্, এথ্রিবিস, পাটুম্, মেনডিস্, টেল-মোকদম্, থিব্‌স্ ও মেমফিস্ প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এবাইডসের প্রস্তরে খোদিত তালিকা হইতে ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের ১৫১টি পুত্র ও ৪১টি কন্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার কতগুলি স্ত্রী ছিল তাহার সংখ্যা জানা যায় নাই। তিনি ১০০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পুত্র খামঅসিট্‌কে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সাম্রাজ্যের কার্য্য পরিচালনা করাইতেন। খামঅসিট্ ২৫ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পর রামেসিসের অন্য একটি পুত্র (মিনেপটাহ্) রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। এই মিনেপটাহ্ পরে সিসোস্ট্রিস্ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণ করিবার ৩৪ বৎসরের মধ্যেই পশ্চিমাঞ্চল হইতে দুইটি দুর্দ্ধর্ষ জাতি—(লাবু ও মাশাউশা) ঈজিপ্ট আক্রমণ করিয়াছিল। লাবু বা লিবিয়ান্ জাতির সম্রাট মারাইউর সহিত একিয়ান্, সার্দ্দানা, তুরশা, সাগালাশা (সিসিলী দ্বীপের অধিবাসী) ও লিশিয়ান্ জাতিরা যোগদান করিয়াছিল। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক শান্তি উপভোগ করিবার ফলে ঈজিপ্টের দুর্গ ও সৈন্যগণ পূর্ব্বকালের ন্যায় কার্য্যকরী ছিল না। সুতরাং আক্রমণকারী জাতিরন্দ নীলনদের মোহানার পূর্ব্বদিকস্থ দেশগুলি সহজেই অধিকার করিয়া বসিল। ঈজিপ্টের সৌভাগ্যবশতঃ সিরিয়া বিপক্ষদলের সহিত যোগদান করে নাই ও হিটাইট্-সম্রাটও সন্ধিভঙ্গ করেন নাই। এই সুযোগে ফ্যারাও তাঁহার সৈন্যগণকে বৃহত্তর রূপও এশিয়া হইতে অপসারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং মেমফিস্ ও হেলিওপলিস্ নগরীকে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ফ্যারাও সিসোস্ট্রিস্ তাঁহার অগণিত পদাতিক সৈন্য, তীরন্দাজ ও রথীগণকে অগ্রভাগে প্রেরণ করিলেন। পিরিট নামক স্থানে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হইল। মিশরের প্রবল শক্তি ও আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া লিবিয়া সম্রাট মারাইউ পলায়ন করিলেন। প্রফেসার পেট্রি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই বিজয়-বার্ত্তা প্রাচীন থিব্‌স্ নগরীতে একটি প্রস্তরফলকে আবিষ্কার করেন। সম্রাট মিনেপটাহের নির্ম্মিত বিজয়স্তম্ভ গেবেল্ সিল্‌সিলেহ্-স্থিত মন্দিরে অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

মহাকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য্য এম-এ

অনেক অতীত দিনের নিবিড় শব্দহীনতা খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ভাষা সরস্বতী চকল হয়ে উঠেন প্রকাশের আকাঙ্খায়। কবি-কণ্ঠে মুখরিত হয় অনাগত ভবিষ্যের অর্দ্ধোচ্চারণ ইঙ্গিত। "Tho' oure the home of want, I no'er repine." তবুও কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর "Captive Lady"তে এই আনন্দ-অভিব্যক্তির যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, "মেঘনাদবধ" মহাকাব্যের কবি সমস্ত কাব্য-কীর্ত্তিকে পেছনে ফেলে উত্তরপাড়ার রাজবাড়ীতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠ্‌লেন :

"দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল ; এ সমাধি-স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
যশস্বী কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী, কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

এ কোন্ আশাহীনতার মর্ম্মাভিব্যক্তি? মৃত্যুকে জেনেও সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি Shakespeare বল্‌তে পার্লেন :

"Not marble nor the gilded monuments of Princess, shall outline this Powerful rhyme."

কিন্তু আমাদের কবির কণ্ঠে কেন এই হতাশা! 'মেঘনাদবধের' কবি, 'ব্রজাঙ্গনার' কবি, 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর' নির্ম্মাতা কেন মরণকে দেখে 'সমাধি-লিপি' রেখে গিয়েছিলেন! মহাকবি শ্রীমধুসূদনকে বাঙ্গালী জাতির মনে রাখবার জন্য এ সমাধি-লিপির কি একান্তই প্রয়োজন ছিল?

কিন্তু আমরা ভুলে যাই, এটী হতাশা নয় এ কবির অভিমান। বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে অভিমান করে খৃষ্টান হয়ে গেল। মায়ের কি কান্না—'ঠাকুর আমার মধুকে ফিরিয়ে এনে দাও।' এই অভিমানী ছেলে ভুলতে পারেনি তার মাকে মাতৃসমা বাংলা আর বাংলার মধুস্রাবী ভাষাকে। অনেককালের অবরুদ্ধ জলাশয়ের বুকে সমুদ্রের কলকল্লোল জেগে উঠলো। সগর রাজবংশের তাপসপুত্র ভগীরথ চন্দ্রচূড়ের জটা-জাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এল সুপবিত্র গঙ্গাকে। তৃষাতুর বাংলা আকণ্ঠপানে পরিতৃপ্ত হল। তবুও কি নির্ম্মম অবিচার—ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার কি বিরাট লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন কবি। তাই তার অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের কাতরতা এই "সমাধিলিপি," কলকাতার পার্কসার্কাস অঞ্চলে গোরস্থানে সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরীর মত অনমন করছে কবি-আত্মার ব্যথা-বিজড়িত আহ্বান :

"দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব
বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল…"

সমগ্র বাঙ্গালীকে ডেকে তিনি শোনাতে চেয়েছেন তাঁর অভিমান। তাঁর "অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা ব্যথা সুনিবিড়।"

শ্রীমধুসূদনকে বুঝতে হলে, যে যুগে তিনি জন্মেছেন সেযুগ সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। তখন ছিল আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়। ইংরেজ-চরিত্রের আদর্শ এবং বলিষ্ঠতা মহামতি রাজনারায়ণ দত্তকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি পুত্রকে ঐ আদর্শে মানুষ করে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইংরেজী-শিক্ষা তখন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের দেশে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যে বিরাট রসচাতুরের অধিকারী তা একটু একটু করে প্রকাশিত হতে চলেছে আমাদের দেশের লোকের কাছে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

ইতিহাস-বিশ্রুত হিন্দুকলেজ।' মধুসূদন যৌবনে এই হিন্দুকলেজেরই ছাত্র ছিলেন।' এখানকার ওল্ড অধ্যাপকদের সাহচর্যে এসে তিনি পরিচিত হলেন বিরাট বিপুল জীবনের সাথে—যে জীবনের পরিধির পরিমাপ হয়না কোন বিশেষ ধর্মের শীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় সাহিত্য ও জীবনধারা তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন এদেশীয় কূপমণ্ডুকতার ওপরে আনলো বিস্তার। এর ফলস্বরূপ শ্রীমধুসূদন নিজের সমাজ ও ধর্মের গণ্ডি ছেড়ে এক উদার উন্মুক্ত জীবনের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। এই ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে যথেষ্ট। অদূর অতীতেও বাঙালী বুঝতে চায়নি যে মধুসূদনের পরধর্মাবলম্বন, নিজ হিন্দুধর্মের প্রতি অবজ্ঞা-প্রসূত নয়,—তাঁর চিরমুক্ত কবি-মনের সহজাত বিস্ফোরণ।

তাই নিদারুণ লাঞ্ছনার বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে একটা বিরাট কাব্য-প্রতিভাকে। আজকের বাঙালী হিসেবে আমরা সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছি চোখের জলে আর হৃদয়ের স্বতঃস্ফূরণ স্মৃতিতর্পণে।

ইউরোপের কোন এক খ্যাতনামা ব্যক্তি বলেছেন যে, সত্যিকারের প্রতিভা এবং বিকৃতমস্তিষ্কের মধ্যে ব্যবধানমাত্র একটা ফুলের। প্রতিভাকে স্বীকার করবার পেছনেও মনের বলিষ্ঠতা এবং বিশালতা থাকা প্রয়োজন—তা নাহলে স্বভাবতঃই প্রতিভাবানকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলে ভুল হতে পারে। শ্রীমধুসূদনের আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র কতিপয় উদারমনা ব্যক্তি তাঁর বিরাট কাব্যকীর্তিকে স্বীকার করেছেন। অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিকে অস্থিরমস্তিষ্কের আখ্যা গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা একবারও ভেবে দেখিনি যে বৈষ্ণব-কবিতার যুগ, আর মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের যুগের মধ্যে যে মহাসাগরের ব্যবধান তার বুকে সেতুর মত মহাকালের প্রহরী শ্রীমধুসূদনের বিস্ময়কর কাব্য-প্রতিভা। আমরা ভুলে যাই যে পূর্ব্বতন কবিতার গতিমুখ ফিরিয়ে নতুন পথে যাত্রা করিয়েছিলেন শ্রীমধুসূদন, যার ফলে পরবর্তীকালের বাংলা-সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। আমরা ভুলে যাই শ্রীমধুসূদন বর্ত্তমানকালের বাংলা সাহিত্যের আদিকবি।

কাব্যজীবনের সূচনায় গন্ধ-পাগল কস্তুরী-মৃগের মত প্রকাশের উন্মাদনায় কবি ছুটেছেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। এই অস্থিরতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 'Captive Lady', 'The visions of the poet.' ইংরেজী কাব্য লিখে মধুসূদন কতখানি সার্থকতা অর্জ্জন কোরতেন সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়। কিন্তু বিদেশী ভাষায় লিখিত কবির এই কাব্যকীর্ত্তি দেশ-বিদেশে প্রচুর সম্মান পেয়েছেন।

শর্মিষ্ঠা" নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী মধুসূদন খুঁজে পেলেন। বাংলার বুক-ভাসান কান্নার আকুল হয়ে ফিরে এলেন কবি—বঙ্গভারতীর মানস-পুত্র। একের পর এক নতুন পথের নিশানা নিয়ে দেখা দিল তার সমস্ত জীবনের সাধনার ফল—'তিলোত্তমাসম্ভব', 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'। উল্কার মত চঞ্চল মধুসূদনের প্রতিভা—বিরাট এবং বহুবৈচিত্রময় কাব্য থেকে নাটক, নাটক থেকে প্রহসন—দীন বাংলা-সাহিত্যের মৃতদেহের ওপর সোনার কাঠির ছোঁয়াচ দিয়ে চলেছেন কবি,—আর একের পর এক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সেই বৈদ্যুতিক স্পর্শে নব-জন্মলাভ করছে। যা দিয়েছেন তা দিয়ে মধুসূদনকে বিচার করলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হয়। আরো অনেক—অনেক কিছু তিনি দিতে চেয়েছিলেন। সব মিলিয়ে তাঁর প্রতিভা মিশরের পিরামিডের মত—সাইপ্রাস দ্বীপের বিরাট গ্রোস মূর্ত্তির মতই বিস্ময়কর।

শ্রীমধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার প্রথম দিগ্‌দর্শন "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"। অমিত্রছন্দের প্রথম হাতে-খড়ি এখানে। স্বর্গচ্যুত দেবগণের সুষমাশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমার সাহায্যে স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে। কবি নিজে বলেছেন: "I began the Poem in joke and I see I have actually done something that ought

to give our national Poetry a good life....” প্রথম কাব্য হিসেবে আঙ্গিকের বহু ত্রুটি বিচ্যুতি তিলোত্তমায় বর্ত্তমান। তবু কবিকল্পনার যে স্বাভাবিক স্ফুরণ তিলোত্তমায় ঘটেছে তা থেকে মধুসূদনের প্রতিভাকে আমরা সহজেই স্বীকার করতে পারি। কিন্তু মধুসূদনের সমগ্র কাব্যকীর্ত্তির মধ্যে তিলোত্তমার যে বিশিষ্ট স্থান রয়েছে তা শুধু অমিত্রচ্ছন্দের পরীক্ষা-মূলক প্রচেষ্টা হিসেবে নয়। আসলে তিলোত্তমাসম্ভব একখানি রূপক-কাব্য। মধুসূদনের প্রতিভা, তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থিতিস্থান বুঝতে হলে 'তিলোত্তমাসম্ভব' অপরিহার্য্য। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বভূতের অণুপরমাণু নিয়ে সৃষ্টি তিলোত্তমা—হোমার বাল্মিকী থেকে সুরু করে কালিদাস মিল্টন পর্য্যন্ত সমগ্র প্রাচ্য- প্রতীচ্যের সাহিত্যের সারসমন্বিত রত্ন মধুসূদন নিজে।

“আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্র বলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পীবর, যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনই তারে, পদ্মজন্ম লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙ্গা পাদুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে,
যেন লাক্ষারস রাগ, বনস্থল বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাথা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব শোভিল তাহাতে
মেখলা গগনে যথি ছায়াপথ যথা।
• • • •
• • • বসুন্ধরা নানা রত্নসাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পমালী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমে কুন্তলে
• • • •
অমৃত সঞ্চারে তবে দেব শিল্পীপতি
জীবাইলা কামিনীরে; সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা মূর্ত্তিমতী!”

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ নতুন এক প্রচেষ্টা। ইতালীয় সনেটকে ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত করার ফলে ইংরেজী সাহিত্যের যে প্রাচুর্য্য কবি লক্ষ্য করেছিলেন, তাকে বঙ্গ-ভারতীর প্রাঙ্গণে উৎসারিত করাবার প্রচেষ্টা মধুসূদনের এই অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি।

সুসাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন 'মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে।' রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের রামায়ণের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন: “আধুনিক কোন কাব্যের মধ্যে এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিলটনের Paradise Lost-এ ভাষার গাম্ভীর্য্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাকনা কেন তথাপি তাহা দেশের ধন নহে, তাহা লাইব্রেরীর আদরের সামগ্রী।”

কবিবর Milton-এর মানসপুত্র মেঘনাদবধ-স্রষ্টা শ্রীমধুসূদন সম্বন্ধেও বোধহয় একই কথা প্রযোজ্য। আলঙ্কারিকদের বিচারে মেঘনাদবধ মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হলেও ইলিয়াড. ওডেসী বা রামায়ণ-মহাভারতের মত ব্যাপকতা ও বিশালতা এতে নেই, সর্ব্বোপরি মেঘনাদবধের মূল সুর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। সাহিত্যের অমোঘ নিয়মে মিলটন ও শ্রীমধুসূদন দুজনেই মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে গীতিকাব্যের সৃষ্টি করেছেন। শ্রীমধুসূদনের কাব্য-সৃষ্টির মধ্যমণি ব্রজাঙ্গনা কাব্য। এই ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে যে কবিকল্পনা এবং বেদনার্ত্তসুরের প্রকাশ ঘটেছে সমগ্র মধুসূদনের কাব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ঐ একই সুর।

বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক জর্জ টমসন কবিতার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন —“Poetry has grown out of magic” মানুষ দুহাতভরে চায় দেবতার আশীর্ব্বাদ, কিন্তু পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে সে অঞ্জলিতে নিজের রক্ত,—কণ্টকা-কীর্ণ পৃথিবীতে চলার পথে মোক্ষম পাথের কল্পনা ও রূঢ় বাস্তবের মধ্যে এই যে ব্যবধান এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে কবিতার—“Poetry has grown out of magic”

যে দুঃখ—না পাওয়ার যে তীব্র বেদনা সবাইকে সমানভাবে আহত করে, একমাত্র কবি তাকে

প্রকাশ কোরে খানিকটা মুক্ত হতে পারেন। তাই ইউরোপের কবিগুরু গেটে বলেছেন :

'And when man in his agony is dumb
I, have god's gift to utter what I suffer.'

এই একই কথা অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন একজন বাঙালী কবি। এখানে তাঁকে স্মরণ কোরবার দুর্লভ মুহূর্তটুকু অস্বীকার করা উচিত নয়।

'যত ব্যথা পাই তত গান গাই
গাঁথি যে সুরের মালা
ওগো সুন্দর নয়নে আমার
নীল কাজলের জ্বালা।'

তাই কবিতামাত্রেই অন্তরিত্তর গীতি কবিতা। ত্রিকালদর্শী-কবি শ্রীমধুসূদন মেঘনাদবধ মহাকাব্য লিখবার স্বপ্ন দেখেছিলেন :

'বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি!
• • • •
• • উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

কবির এ স্বপ্ন সার্থক হয়নি। বীররসের অবতারণা করে যে মহাগীত তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন, তা বাঙালী-জগতকে অশ্রুপ্লাবনে ভাসিয়েছে।

"হুহুধারে নিবাইলা উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অশ্রুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
যৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লঙ্কা রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;
উড়ি অভ্র, রথচূড়া উঠিল আকাশে।
কবি মনে সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"

শ্রীমধুসূদনের সমগ্র কাব্য সৃষ্টির মূল সুর মেঘনাদবধের শেষ পংক্তির মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে :

"সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"

কবির মৃত্যু উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : 'আজ বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আমরা সংশয় করিনা। এই ভূমণ্ডলে বাঙালী জাতির গৌরব হইবে, কেননা বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে.....। যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভাষার ভরসা কি? বাঙালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব ধর্ম্মোপদেষ্টকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও মধুসূদন।" বস্তুতঃ বাঙালী কাঁদতেই জানে। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ কান্নারই পরিবেশ। বাংলার সমতলের নদীর কূল কূল ধ্বনি কান্নারই নামান্তর। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকাল পরবর্তী সমগ্র বাংলা-সাহিত্য কান্নারই ইতিহাস। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা দেশকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ বিস্ময়, শ্রদ্ধা আর ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে বাংলার এই নবজাগরণ অনুভব করেছিল। কিন্তু জগাই মাধাইকে সার্থক মনুষ্যত্ববোধে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল কারণ তারা বাঙালী। আর বাঙালী জীবনদর্শন চিরদিনই "মেরেছে কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না?" সুতরাং শ্রীচৈতন্য বাঙালী জাতিরই শাশ্বত রক্তবীজ, নবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিশ্ববন্দিত গীতাঞ্জলী বাংলাদেশেরই চরম অভিজ্ঞান।

সবশেষে কবি-পত্নী হেনরীয়েটার উদ্দেশে আমাদের অভিবাদন জানাই। ইনি শ্রীমধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার রাধিকা। মধুসূদনের প্রতিভা এমনই অদ্ভুত যে সেখানে সহকারিণী পরবিণী লতার মত কোন রাধার পক্ষে ঐ প্রতিভাবিকাশের পথে সহায়তা জোগাবার সামর্থ্য ছিল না। সেইজন্য প্রয়োজন ছিল এই পৌরাণী বিদেশিনী রাধিকার—যিনি আমৃত্যু ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন। দুঃখজর্জরিত অভিমানবিক্ষুব্ধ কবি-সম্রাটের শেষ কয়েকটী মুহূর্তের জন্য এর বড় প্রয়োজন ছিল, যখন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে সোদরপ্রতিম মনোমোহন ঘোষের হাত ধরে ছলছল চোখে কবি চিৎকার করে উঠেছিলেন :

"My days are numbered.
my hours are numbered,
even my minutes are numbered."

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে

শ্রীকালীপদ কোঙার

সত্যযুগ-কথা নহে, নহে তাহা দ্বাপরের স্মৃতি-রোমন্থন,
ত্রেতাযুগ-অবতংস নহ তুমি। ধর্ম মূর্তিমান,
প্রকটিত কলিযুগে ভাস্বর জ্যোতিষ্ক ওগো পূর্ণ অংশুমান,
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তোমার ঐ জীবনী মহান।

শুনি নাকি ত্রেতাযুগে হয়েছিল রাবণ-নিধন,
কলিযুগে পাপী মোরা পারি নাই করিতে বিশ্বাস ;
গল্প-কথা ভাবিয়াছি, করিয়াছি তারে উপহাস,
কৃষ্ণলীলা মিথ্যা ভেবে করিয়াছি পাপের স্মরণ।

কলিযুগে কংস নহে, অঘ, বক, কেশী নহে,
রাবণ-নিধন নাহি ছিল প্রয়োজন ;
সমগ্র জগৎ-জন তমিস্রায় নিমগন,
বিদ্বেষ, বিরোধ আর অধর্মের স্রোতধারা বহে।

আসুরিক ভাবধারা চঞ্চল করিল ধরা,
বস্তুবাদ-বিড়ম্বিত অবিশ্বাস-পূর্ণ পৃথিবীতে
ধর্মগ্লানি বিনাশিতে, সাধুজন ত্রাইতে
আসিলে, আনিলে এক মহাপ্রেমধারা।

বিবেক করিল তব বাণী সর্ব বিশ্বেতে প্রচার,
বেদান্তকেশরী কালী প্রতীচ্যেরে বেদান্ত শোনায়।
ব্রহ্মানন্দ, শরৎ-এর মহান নির্দেশ ও প্রেরণায়,
কত শত পাষণ্ডের প্রাণে হল ভক্তির সঞ্চার।

অবিশ্বাসী করিয়াছে অবতার-তত্ত্বেতে বিশ্বাস,
তোমার দৃষ্টান্ত হলো এ যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
তোমার জীবনালোকে রামলীলা সত্য বলি করিনু চিন্তন,
কৃষ্ণলীলা মিথ্যা নয়। ঘুচে গেল সব অবিশ্বাস।

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এসেছিলে মানবের দ্বারে,
কুঁড়ে ঘর আলো ক'রে, গিয়াছ যে লীলা ক'রে
কামারপুকুরে আর দক্ষিণ-ঈশ্বরে,
সে কথা স্মরিয়া আজ আঁখিলোর ঝরে।

কলিযুগে ভক্তিযোগ,—একথা বলেছ বারবার।
তব আবির্ভাব ক্ষণে, তোমারে স্মরিয়া মনে
ভক্তি-আশীর্বাদ মাগি, তোমারি চরণে,
নমিলাম তব পদে কোটী কোটী বার।

৺শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ পরিক্রমা

ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারপর ইতিমধ্যেই সঙ্গী শ্রীমণীন্দ্রবাবু বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "মহারাজ, ভেবে দেখুন এখন কি করবেন : বেলা তিনটেতে পাঞ্জাব মেলে একটা বগি গাড়ী দিচ্ছে, লাক্সা ষ্টেশনেতে এই বগি গাড়ী কেটে দেরাদুন মেলের সঙ্গে জুড়ে দেবে। আমি মনে করি সন্ধ্যা সাতটায় দেরাদুন মেলে রওনা না হয়ে এখনই রওনা হওয়া ভাল। তাহলে ভিড়ের চাপ থেকে বাঁচা যাবে এবং আরামে যাওয়াও হবে।" মণীন্দ্রবাবুর কথা আমি শিরোধার্য্য করিলাম। তারপর কুলি ডাকিলাম এবং রওনা হইলাম ঐ বগি গাড়ীতে উঠিবার জন্য। গাড়ী ঠিক সাড়ে তিন ঘটিকায় তাহার গন্তব্যপথে যাত্রা করিল। এইভাবে ক্রমে দুইদিন রাত্রায় অতিবাহিত করিয়া ৭ই মে বেলা সাড়ে দশ ঘটিকায় হৃষিকেশে পৌঁছিলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ পর্য্যন্ত লাইনের ধারে উঁচু উঁচু পাহাড় সব দেখিয়া কোন্ এক অজানার উদ্দেশে যেন মন আমার হুহুহু করিতেছিল। হৃষিকেশে পৌঁছিয়া আমি তুলসীমঠে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কয়েকজন বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজ বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন প্রায় বিশবৎসর ধরিয়া তপস্যায় নিরত আছেন। তাঁহারা অতি স্নেহের সহিত সেখানে আমায় আশ্রয় দিলেন। তারপর ঐ মঠস্থ প্রাচীন সাধু প্রবর শ্রীমৎ সারদেশানন্দজী মহারাজ আমার সঙ্গে এদিক ওদিক দু চার কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "না হে, আর বসা যাবেনা। স্নানের সময় হয়ে গেছে, এখন স্নানে যাওয়া দরকার, নতুবা পরে অসুবিধে হয়ে যাবে। স্নান করবে ত কাপড় গামছা নিয়ে চল যেখিনি ত্রিবেণীতে।" আমিও তাঁহার কথানুযায়ী ঝট্ করিয়া কাপড় গামছা লইয়া বাহির হইলাম। ত্রিবেণীর ঘাটে যাইবার রাস্তায় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৃষিকেশে কতদিন থাকবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ ?" উত্তরে বলিলাম, "ইচ্ছা ছিল বেশ কিছুদিন থাকবার, কিন্তু আমাদের স্বামিজী মহারাজের ইচ্ছা ঐ রকম নয়। বেশী থাকা হবে ত একমাস কাল।" এই কথা শুনিয়া তিনি একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার বলিলেন, "একমাসের বেশী যদি না থাকবে, তবে তোমার ইচ্ছা হলে এক কাজ করতে পার ; তা হচ্ছে কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ দর্শন। যাঁরা ওদিকে যেতে চান, এখনই হচ্ছে তার উত্তম সময়। বহুলোক ওই দর্শন মানসে প্রতিদিন এখান হতে রওনা হচ্ছেন।" তাঁহার এই কথার পর আমিও আমার স্বীকৃতি জানাইলাম এবং তিনি বলিলেন, "আচ্ছা বেশ এখন থাক, পরে এবিষয়ে কথা হবে।" একটু পরেই দেখিতে পাই পূত-সলিলা জাহ্নবী, সন্তানস্নেহে কাতরা শোকসন্তপ্তা জননীর ন্যায় আকুলি বিকুলি করিতে করিতে সীমার শেষে অসীমকে স্নেহ আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিবার জন্য সাঁ সাঁ করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। জাহ্নবী প্রকৃতই জাহ্নবী—সমস্ত পবিত্রতার আধারস্বরূপিণী, মনোলোভা ও মনোরমা। তারপর মনের আনন্দে স্নান করিলাম। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—এই ত্রিধারার মিলনেই ত্রিবেণীর সার্থকতা। যমুনা ও সরস্বতীর ধারা দুই বিভিন্ন দিক হইতে বেশ ক্ষীণ গতিতে তর্ তর্ করিয়া গঙ্গায় মিলিত হইতেছে। বহু গেরুয়াধারী, জটাবল্কলধারী ত্রিবেণীর বেলাভূমিতে প্রার্থনায় রত। গৃহস্থ ভক্তগণ এবং পুরনারিগণ সমভাবে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতেছে—"হর

হর গঙ্গে, হর হর গঙ্গে, জয় জয় গঙ্গে।" কেহবা অন্তরের নীরব নিথর ধ্যানানুকূল পরিবেশের মাধ্যমে মনের মর্মবেদনারাশি স্রোতস্বিনীর স্রোতধারায় অঞ্জলি দিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের দ্বারা মায়ের চামর-ব্যজন করিতেছে। তারপর উভয়েই দ্বিপ্রহরের আহারের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় তুলসীমঠে প্রত্যাবর্তন করিলাম। বেলা সাড়ে চার ঘটিকায় হৃষিকেশের বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন-ইচ্ছায় বাহির হইলাম। ক্রমে ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, ভরত-মন্দির, কৈলাস-আশ্রম, স্বর্গাশ্রম ও সীতা-ভবন ইত্যাদি তপস্যানুকূল তপোভূমিগুলি দর্শন করিলাম। কৈলাস-আশ্রমের পরিবেশ বড়ই মনোরম। পাহাড়ের উঁচু শিখরে বহু লতাপাতা দ্বারা আচ্ছাদিত অনেক দ্বিতল ভবনে পরিবেষ্টিত কৈলাস-আশ্রম। বহু সন্ন্যাসীর একত্র সমাবেশ সেখানে, তাঁহাদের অনেকেই শাস্ত্রজ্ঞ, প্রবীণ এবং পণ্ডিত। সকলেই আশ্রমের কাজে এবং ভাবে নিমগ্ন। সেখানকার সন্ন্যাসিগণ উচ্চৈঃস্বরে 'ওঁ, ওঁ' বলিয়া আমায় সম্বর্ধনা করিলেন। গীতা-ভবন গঙ্গার অপর-পারে প্রতিষ্ঠিত। সেইখান হইতে বহু প্রশস্ত এবং বহু বিস্তৃত প্রস্তরনির্মিত বাঁধান ঘাট রহিয়াছে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য। গীতাভবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, সমগ্র অষ্টাদশ-অধ্যায় গীতাখানি বেশ বড় বড় হরফে দেবনাগরী অক্ষরে 'ভবনের' দেওয়ালের গায়ে লেখা রহিয়াছে। নীচের লিখিত অক্ষর দেখিতে যতটুকু বড় মনে হয়, উপরের লেখাও দৃষ্টিপথে ততটুকুই বড় বলিয়া বোঝা যায়। 'ভবনে' গীতার বহুবিধ হিন্দি-সংস্করণ ভাষ্য ইত্যাদি পাওয়া যায় এবং খাদি কাপড়ের বিক্রয়-ব্যবস্থাও সেখানে ভালই রহিয়াছে। গীতা-ভবনের পরিচালক শ্রীযুত দয়ালজী বড় ভক্তিমান ব্যক্তি। তিনি নিত্য তুলসীর মালা ও তিলক ধারণ করেন এবং হস্তে তাঁহার জপের মালা শোভাবর্ধন করিতেছে। তিনি সকাল সন্ধ্যা ৺শ্রীশ্রীগীতার লীলা ও ভাবগত তাত্ত্বিক আলোচনা করেন।

স্বর্গাশ্রম গঙ্গার অপর পারে, গীতা-ভবনের পার্শ্বেই সামান্য উচ্চে অবস্থিত। ইহা ১০৮ শ্রীবাবা কালি-কমলী-ওয়ালা মহারাজের প্রতিষ্ঠিত অতি পবিত্র এবং মনোরম স্থান, তারপর ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ও ভরত-মন্দিরের প্রাচীনতাই ঐ সকল মন্দিরের বাহিরের বৈশিষ্ট্য এবং পতিতপাবন ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি ও নাম আর ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ হিসাবে ৺শ্রীশ্রীভরতের নাম ও মূর্তিই এই দুই বিভিন্ন মন্দিরের চিরন্তন ভাবাবেগের উৎস। ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরের সম্মুখে একটি রামকুণ্ড বর্তমান। ইহাতে যাত্রিগণ স্নান করিয়া সীতাপতির শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের ভক্তিগুলি জ্ঞাপন করেন। লছমন্ ঝোলাতে ৺শ্রীলক্ষ্মণের মন্দির রহিয়াছে, সেখানে নিত্যপূজা চলিতেছে। মন্দির প্রাচীন, স্থান তপোভূমি।

আজ ৬ই মে, ১৯৫৫ সন। শ্রদ্ধেয় সারদেশানন্দজী আমাকে বলিলেন, "কেদার ও বদরিনারায়ণ পরিক্রমায় যাবে ত তোমাকে কিছু জিনিষ জোগাড় করতে হবে, তারমধ্যে হচ্ছে :

এক জোড়া কাপড়ের জুতা, মোজা দুই জোড়া, হাত মোজা এক জোড়া, ছাতি এক খানা, লাঠি একখানা, তাল মিছরি অথবা লজেন্স এক পোয়া, হাল্কা ধরণের একটা জলপাত্র, কম্বল অন্ততঃ দুইখানা, দুই জোড়া কাপড়, একজোড়া পায়জামা অথবা সার্ট, গরম সোয়েটার অথবা ঐ রকম কোন গরম বস্ত্র, মোমেরবাতি এক প্যাকেট, দিয়াশলাই চারখানা, আর কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য আধসের সাবান।

এ সমস্ত জিনিষের মধ্যে যেগুলো তোমার সাথে নেই, তা এখান থেকে কিনতে হবে। এতদ্ভিন্ন তোমাকে বসন্ত ও প্লেগের Inoculation নিতে হবে। যাওয়া যখন সাব্যস্ত তখন বিলম্ব করার অর্থ হয়না। ৺শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়, তবেই হল।" আরও বলিলেন, "ভাবনার কিছু নেই, পাহাড় অতিক্রম করবার কালে প্রভুই শক্তি ও সাহস দেবেন।" এই সব কথার পর প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করিয়া আমি ৮ই মে ভোর সাড়ে চার ঘটিকায় তীর্থ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। মোটর-ষ্টেশনে

আসিয়াই দেখি এক বিরাট জনতার সমাবেশ। সকলেই যাত্রিক, টিকিটের জন্য হৈচৈ চলিয়াছে। যাত্রী হিসাবে স্বামী জয়ানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী মহারাজ আমার সঙ্গী হইলেন। তিনি বৃদ্ধ, বয়স ৬৪ বৎসর। প্রথমতঃ তাঁহাকে সঙ্গী হিসাবে পাইয়া অনেকখানি প্রফুল্লিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাই আমার অনেকখানি ভ্রম হইয়াছিল। যাক্—সে কথা যথাসময়ে বলিব। মোটরের টিকিট ক্রয় করা এক সাংঘাতিক প্রমাদ গণিলাম। ৺শ্রীশ্রীভগবানের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করাও এতখানি কঠিন নয় যাহা মনে হইয়াছিল টিকিট গ্রহণ করিবার সময়। তের পাঁচটায় টিকিটের জন্য লাইন দিয়া দাঁড়াইলাম! একেত স্বল্প পরিসর জায়গা, ইহার উপর জনতার ধাক্কার পর ধাক্কায় তরঙ্গ তুফানে দেহের দেহী বিদেহ-অবস্থা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইল। তদুপরি পায়ের জুতামোজা, কাঁধে ঝোলান ব্যাগ এবং কম্বলের গরমে একেবারে হাঁড়িতে চড়ান চালের ন্যায় সিদ্ধ হইতে লাগিলাম। বুঝিলাম, কোন বিষয়েই সিদ্ধ না হইলে সিদ্ধি করতলগত হয়না। বিশ্বাস করিলাম আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। নিশ্চয়ই প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে তুলসীমঠের শ্রদ্ধেয় স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ ও স্বামী কেশবানন্দ প্রভৃতি মহারাজগণ আমার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন এবং আমার অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আমাকে তাঁহারা উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'না, ঘাবড়াবার কিছু নেই, টিকিট তুমি পেয়ে যাবে। কোম্পানির স্বার্থেই তারা তোমায় টিকিট দেবে।' এইভাবে একটানা আড়াই ঘন্টা দাঁড়াইবার পর মোটরের টিকিট মিলিয়াছিল। উপস্থিত মহারাজগণকে প্রণাম করিয়া ৭৯নং বাসে আমি বসিলাম। সাড়ে সাতটার মধ্যেই বাস চলিল পর্ব্বতারোহণে। বাস সিংহ-ক্রিক্সে লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে অপ্রশস্ত রাস্তার মধ্য দিয়া পর্ব্বত ডিঙাইতে আরম্ভ করিল। বাস পর্ব্বতকে বুঝাইতে চাহিল, তুমি যতই কঠিন ও উঁচু হইয়া থাকনা কেন, আমি তোমার শিরে উঠিবই উঠিব। কোন দুর্গমতাকেই ভয় করিবনা। কারণ এ হেন যান্ত্রিক-যুগে যুগধর্মই আমাকে এইরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। যুগধর্মকে অস্বীকার করিবার উপায় কাহারও নাই! এমনসময় যাত্রিকদের ভিতর হইতে একজন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দুই তিন জন ঘর্ ঘর্ করিয়া বমি করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পর আমার সঙ্গী ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মহারাজও বসিয়া থাকাকালীন সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় হঠাৎ চলিয়া পড়িলেন। তখন পাটনা হইতে আগত এক বাঙ্গালীযাত্রী "আহা! স্বামিজী পড়ে গেলেন, স্বামিজী পড়ে গেলেন" বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি মহারাজের শরীর হইতে সমস্ত গরম জামা, কম্বল ও কাঁধের ঝোলান ব্যাগ খুলিয়া ফেলিলেন। ঐ ভদ্রলোকেরই ন্যাস্তে রক্ষিত শীতল জল কিছুটা চোখেমুখে এবং মাথায় দিয়া নিজ হস্তস্থিত তালপাতার পাখার দ্বারা হাওয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে কতক্ষণ পর বৃদ্ধ স্বামিজী প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু পুনরায় তিনি "আমার বমি হবে, আমার বমি হবে" এই কথা বলিতে বলিতে হড়াৎ হড়াৎ করিয়া বমি করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি নিজেকে মহাসমস্যা-সমাকীর্ণ বলিয়া মনে করিলাম। শুধু তাহাই নয়, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য না জানি পণ্ড হইয়া যায় এই বলিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। যে কোন জন, যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদাপন্ন হইতে পারে এ কথা আমার জানা থাকিলেও ওই রকম অপ্রত্যাশিত দুর্গম চড়াইপথে এক-বিংশ ৬৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ মহারাজ যে, যে কোনসময়ে অসুস্থ হইতে পারেন সেইকথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক প্রভুর কৃপায় আমরা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ মহারাজ "কোন ভয় নাই' ইত্যাদি কথা বলিয়া আমাকে সাহস দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ আমরা দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা সাড়ে বারোটা। দেবপ্রয়াগ হৃষিকেশ হইতে ৬৫ মাইল দূর। ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল। যাত্রিগণ এখানে মস্তকমুণ্ডন ও অন্যান্য বৈদিককর্ম সম্পন্ন করেন। আমরা এখানে ভাগীরথীতে স্নান করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির দর্শন এবং প্রণাম

করি। তারপর কিছু আহার্য্য গ্রহণ করিয়া বেলা তিন ঘটিকায় কীর্ত্তিনগরের বাসে শ্রীনগরের দিকে রওনা হইলাম। দেবপ্রয়াগ হইতে কীর্ত্তিনগর ষোল মাইল পথ। এখানে পৌঁছিবার পর, বাস হইতে নামিয়া নিকটস্থ ষোলান পুলের দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া অপরপারে উপস্থিত হইলাম। এস্থান হইতে শ্রীনগর সাড়ে তিন মাইল। তথায় যাইতে কখন বাস পাওয়া যায়, কখন পাওয়া যায় না। আমরা পদব্রজেই সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শ্রীনগরে পৌঁছিলাম। সেখানে বড় বাজার, খুব বড় ধর্ম্মশালা, পোষ্ট অফিস ও মোটর ষ্টেশন রহিয়াছে। এখানে বহু বাসের সমাবেশ রহিয়াছে। এইস্থান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ ২৫ মাইল। শ্রীনগর হইতে রুদ্র প্রয়াগ ও চমুলি হইয়া পিপুলকুটি পর্য্যন্ত দুই বিভিন্ন দিকের বাস পাওয়া যায়। যাঁহারা কেদারনাথে যাইবেন তাঁহারা রুদ্রপ্রয়াগের বাসে উঠিবেন। যাঁহারা কেদারে না গিয়া শুধুমাত্র ভগবান বদরিনারায়ণকে দর্শন করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে পিপুলকুটির বাসে উঠিতে হইবে। পিপুলকুটি হইতে ৺শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণ ৩৮ মাইল, উৎরাই ও চড়াই পথ, পদব্রজে অতিক্রান্ত করিতে হয়। আমরা শ্রীনগরে ধর্ম্মশালায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে সাত ঘটিকায় রুদ্রপ্রয়াগের বাসে রওনা হইলাম। সেখানে পৌনে বারোটায় পৌঁছিবার পর পুনরায় ধর্ম্মশালায় আশ্রয়গ্রহণ করিলাম। স্মরণ রাখিতে হইবে, ধর্ম্মশালা বলিতে ১০৮ শ্রীবাবা কমলীওয়ালা মহারাজের আশ্রম পরিচালিত বিভিন্নস্থানে যাত্রীদের থাকিবার ব্যবস্থাকে বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যবস্থাকে 'চটী' এই নামে অভিহিত করা হয়। ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন করিতে ভাড়া দিবার প্রয়োজন হয় না। খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হয়। তবে রান্নার সম্ভাব্য সকল প্রকার সুব্যবস্থা ধর্ম্মশালা হইতে করিয়া দেওয়া হয়। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁহারা হৃষিকেশের কালীকমলীওয়ালার আশ্রম হইতে সদাব্রতের টিকিট লইয়া আসেন, পথে প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় ওই ওই সাধুসন্তদের আহার্য্য বাবদ বিনামূল্যে আটা, ডাল, লবন, তৈল, মরিচ, ঘৃত ইত্যাদি দেওয়া হয়। আহার্য্য সকল সময়েই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগ অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর মিলনস্থল। যাহা হউক মোটর হইতে নামিয়া আমরা দুজন ধর্ম্মশালায় আসিয়া কম্বল পাতিয়া বিশ্রাম করিতেছি আর ভাবিতেছি এখানে ত রান্না না করিয়া খাওয়ার কোন সুবিধা হইবেনা কিন্তু কাঠ আর আগুন লইয়া ঠক্‌ঠকানি করিতেও যেন ইচ্ছা হইতেছেনা। এইকথা ভাবিতেছি এমনসময় দুইজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ওই ধর্ম্মশালায় আসিয়া আমাদের পাশেই বিছানা পাতিল। তাহাদের সহিত একজন ভৃত্য রহিয়াছে। তাহারা বিশ্রাম করিবার সময় আমাদের দুজনকে বেশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল তাহারা যেন কি বলিতে চায়। কতক্ষণ পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাত্মাজি! আপ্‌লোগ্ কাঁহাসে আয়ে হ্যায়। অভি খানা নহি পাকাইয়েগা?" তারপর আমি একটু চাপা-হাসি হাসিয়া বলিলাম, "যব্ জরুরৎ মালুম হোগী তব্ত খানা তৈয়ার করনাহি পড়েগী।" ভদ্রলোক পুনরায় বলিল, "ক্যা আপ্ বোলতে হ্যায়, অব্ খানা নহি পকানেসে কৈসে পায়েঙ্গে রাস্তা বিতাইয়েগা?' তাহার কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, "কি জানিরে বাপু, আমাদের জন্য এত ভাবনা কেন, তোমরা তোমাদের পথে যাও, এত সব জিজ্ঞাসা কেন?" এইরূপ ভাবিতেছি, কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়িবার পাত্র নয়। আবার বলিল, "বাবাজী মেরা সাথ হ্যায়, হম্ লোগোংকো লিয়ে খানা (দাল-রুটি) অব্ বনারেহে। আপ্ লোগ্ রাজী রহিয়েগা তো একহিসাথ্ আপলোগোংকো খানাভি তৈয়ার কর সাকতা হুঁ" এই কথা শুনিয়াই সঙ্গী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মহারাজ আমাকে বলিলেন, "নিজের থেকে আগ্রহভরে তারা যখন বলছে তখন ওইরূপ কথা বলা কি?" শেষ পর্য্যন্ত আমাকে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে হইলনা। আমাদের আটা ডাল ইত্যাদি ওই ভদ্রলোকের হাতে সঁপিয়া দিলাম।

তারপর অলকনন্দাতে স্নান করিলাম এবং আহার্য্য দ্রব্য শ্রীশ্রীরঘুপতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া মনের আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। অতঃপর একটু বিশ্রাম করিতেছি এমনসময় চার পাঁচজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মেয়েছেলে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মশালায় পৌঁছিল। ভদ্রলোক আয়গার জন্য এদিক ওদিক পাইচারী করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া বেশ পরিচিতের ন্যায় একটু মিষ্টি হাসি হাসিয়া আমাকে করজোড়ে অভিবাদন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রত্যভিবাদন করিবার সময় বলিয়া উঠিল, "আপনাকে ত হৃষীকেশেই দেখেছি। কিন্তু তখন কোন পাঞ্জাবী সাধু মহাত্মা বলে মনে করেছিলাম,"। তারপর আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা কি এখনই এগুচ্ছেন?" উত্তরে "হাঁ" বলা হইলে, ভদ্রলোক বলিল, "মহারাজ আমাদের জন্যে কিন্তু বেশ কিছুটা আয়গা অনুগ্রহ করে আটকে রাখবেন; কারণ আমাদের সাথে দুটি চাকর, তিনটি কুলি ও একটি পাচকসহ প্রায় বিশজন মেয়েছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে এসেছি। আমি 'হাঁ' 'না' কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া হাসিলাম।

আজ ৮ই মে ১৯৫৫ সন। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অলকনন্দার ধার ধরিয়া আমরা হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা দেড় ঘটিকায় রওনা হইয়া সম্মুখে ছাতোল নামক চটীতে রাত্রিযাপন করিতে স্থির করিলাম। এই স্থান হইতে ছাতোল সাড়ে চার মাইল। কুলি হৃষীকেশ হইতে ঠিক করিতে হয়। একজন কুলি কেদার ও বদরিনারায়ণ হইয়া পিপুলকুটি মোটর ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে এরূপ কথা থাকে। একজন কুলি ৩০ সের হইতে দেড়মন পৌনে দুইমন জিনিষ মাথায় লইয়া দুর্গম চড়াইপথ চলিতে পারে। একজন কুলিকে ৫৫৲ হইতে ৬৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। কুলি ঠিক করিবার ব্যাপার হৃষীকেশে সরকারী বন্দোবস্ত রহিয়াছে। ওই ভাবে কুলি ঠিক করাই নিয়ম ও কর্ত্তব্য। নতুবা রাস্তায় জিনিষপত্র চুরি হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। যাহারা পায়ে চলিতে অক্ষম, কিংবা অপরের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে তাহাদের জন্য রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ডাণ্ডি ও কাণ্ডির ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাণ্ডি চারজনে বহন করিয়া লয়। ১৫০৲ টাকা হইতে ২২৫৲ টাকা ডাণ্ডিতে খরচ হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে ডাণ্ডি একজনকেই বহন করিবে। কাণ্ডি হইতেছে বাঁশের তৈয়ারী কুড়ির ন্যায়। একজন লোক অপর একজন লোককে তাহার পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া নিয়া যায়। প্রতি মাইল বার আনা বা একটাকা নেয়। কথা হইতেছে যাহারা কিছু কিছু হাঁটিবার সামর্থ্য বা সাহস রাখেন তাঁহাদের পক্ষে কোন ডাণ্ডি বা কাণ্ডিকেই একটানা ঠিক করিবার প্রয়োজন হয়না। কারণ এক দুই চটীর পর পর ডাণ্ডি ও কাণ্ডির বন্দোবস্ত রহিয়াছে। অবশ্য এইরূপ সুবিধা একমাত্র কেদারের রাস্তাতেই পাওয়া যায়, বদরিনারায়ণের পথে অনুরূপ। প্রায় এক মাইল দূরে দূরে পাহাড়ী লোকেরা চায়ের অস্থায়ী দোকান পরিচালনা করিতেছে। সেখানে চা, খাঁটি মহিষের দুধ, ছোলাভাজা, মটরভাজা ও কোন কোন জায়গায় গরম গরম জিলিপিও পাওয়া যায়। অতিরিক্ত চা-পান এই দুর্গম চড়াই পথেতে ঠিক নয়। ছোলাভাজা ও মটর-ভাজা অনেকের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষবৎ কাজ করিয়া থাকে। কারণ সমতল ভূমি হইতে আগত লোকদের ওই চড়াইপথে এই সব ভাজা জিনিষ আমাশয়ের কারণ হইয়া থাকে। চলার পথে বহু ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্ষীণগতির ঝরণার জল পান করা ঠিক নয়।) এতদ্ভিন্ন সরকার হইতেও জলের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। পথিমধ্যে জলের কোন বিশেষ অসুবিধা হয়না। খাওয়ার ব্যাপারে প্রতি চটীতে চাউল, কাঁচা মুগ, অড়হর ডাল, আটা, লঙ্কা, তেল-লবণ ও কাঠ পাওয়া যায়। চাউল ২৲ টাকা হইতে ২৷৷০ টাকা সের, ডাল ১৷৷০ টাকা, আটা তথৈবচ। এখন যাহার যাহা সুবিধা। আমাশয়, উদরাময় ও শরীরের ব্যথা বেদনার জন্য সামান্য-কিছু ঔষধ সঙ্গে রাখা সঙ্গত। আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য চটী হইতে পিতলের বাসন চটীর মালিকগণ দিয়া থাকে। চটীতে থাকা ও বাসনপত্রের জন্য ভাড়া দিতে হয়না।

আহার্য্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিনিময়েই যাত্রীদের চটীতে থাকিবার ও বাসন ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। যাহা হউক আমরা ছাতোল চটীতে রাত্রি যাপন করিয়া ভোর সাড়ে চার ঘটিকায় নিঝুম জঙ্গলাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চন্দ্রের সামান্য আলোকছটা আমাদের পথ প্রদর্শনে কিছুটা সাহায্য করিল। ছাতোল হইতে রওনা হইবার প্রাক্কালেও ওই বাঙ্গালী ভদ্রলোক পুনরায় আমাকে বলিল, "আপনি যে চটীতে বসে পড়বেন আমরাও সেইখানে রুখে যাব আবার বল্‌ছি, আমাদের জন্যে আহারের ব্যবস্থা করতে হবে, আপনারা সাধু লোক, পরোপকারী, আমার বলবার দাবী রয়েছে।" আমি নীরব। হাসিতে হাসিতে "শ্রীগুরু মহারাজজী কী" বলিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। ভোর সাড়ে সাত ঘটিকায় 'অগস্ত্যমুনি' নামক স্থানে পৌছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গী ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মহারাজ অনেক পিছনে থাকায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম; কিছুক্ষণ পরে ওই বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেখানে পৌছিল। অবশ্য তাহার দলের আর আর লোকজন পিছনে রহিয়াছেন। ভদ্রলোক বলিল, "বৃদ্ধ স্বামিজী কিছুটা পেছনেই রয়েছেন, আপনাকে দাঁড়াবার কথা বলেছেন।" তারপর আমরা দুজন অগস্ত্যমুনির মন্দির দর্শন এবং প্রণাম করিলাম এবং আমি বলিলাম—"এখন ত এখানে থেকে-যাওয়া ঠিক হবেনা; সময় অনেক রয়েছে। অতএব আরও কিছুটা এগিয়ে চন্দ্রাপুরীতে প্রাতরাহারের ব্যবস্থা করা সঙ্গত হবে। তার আগে, চলুন কিছুটা দুধ খাওয়া যাক।" দুধের কথা জিজ্ঞাসা করায় দোকানীরা সানন্দে বলিতে লাগিল, "আইয়ে, আইয়ে, আচ্ছা দুধ হ্যায়, মিঠা দুধ হ্যায়।" আমরা উভয়েই দোকানঘরের নিকট হইতে দুধ কিনিলাম। আমার সঙ্গে মোটা মোটা রুটি ছিল। আমরা উভয়েই ওই রুটির সহযোগে জলযোগ করিলাম। বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিল, আপনাকে পেয়ে মনে বেশ সাহস পাচ্ছি। এতসব মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত ভালই ছিলাম। কিন্তু তারপর হতে মন আমার দায়িত্বের ভারে সব সময়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম কি?" বলিল, "মনোজ ঘোষ।" সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "মহারাজ, কেদারবদরির রাস্তাতে যতক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকব, ততক্ষণ আপনার আহার্য্য বাবদ কোন খরচ করবেন না। সঙ্গে ত আমাদের পাচক রয়েছেই, রান্নাও হচ্ছে। এরূপ করলে আমি খুব খুশী হব। এ obligation এর কথা নয়। তীর্থের পথে আমরা তীর্থযাত্রী হিসেবে আমাদের মহানকর্ম্ম, মহানব্রত সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা পরিচর্য্যা করা।" উত্তরে আমি বলিলাম, "এরূপ করার কোন প্রয়োজন নেই। পথ অনেক রয়েছে, তবে আহার্য্য বাবদ প্রত্যেক জনে প্রত্যেক বেলায় যত খরচ হয়, সেই পয়সা আপনি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ ক'রে আমাকে আহার্য্য দিলে এতেই অনেকখানি সুবিধে হবে।" অতঃপর ভদ্রলোক পীড়াপীড়ি করাতেও আমি রাজী হইলাম না, মাত্র বলিলাম—"প্রয়োজন বোধ করলে আমি আপনাকে বলব।" তখন ভদ্রলোক 'আপনি যা ভাল মনে করেন' এই কথা বলিয়া চুপ করিল। যাহা হউক প্রভুর ইচ্ছায় আমার রাস্তার ব্যবস্থা হইয়া গেল। তাহাদের দলের অন্যতম কুণ্ডু মহাশয় ব্যবসায়ী হইলেও সজ্জন, সন্দেহ নাই। সমস্ত পথে সতর্ক ও সবিনয় ব্যবহারে আমায় মুগ্ধ করিলেন। ক্রমশঃ সুদীর্ঘ আড়াই মাইল চড়াই পথ অতিক্রম করিয়া আমরা গুপ্তকাশীতে পৌছিলাম।

বিশাল পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর কলকল নিনাদ, অন্তহীন অনন্তের নিত্য-প্রত্যক্ষ আবৃত্তির মহান ঝঙ্কার স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে ভীষণ দুর্গম একটানা চড়াইপথে আরোহীর প্রাণপাখী যখন নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন ওই তুষারাচ্ছাদিত বহু উন্নত, শুভ্র, অতি শুভ্র শৃঙ্গের পর শৃঙ্গের "মিতালি" দেখিয়া আরোহীর অন্তর শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ওই মিতালির অফুরন্ত মধুর সমীরণ, আরোহীর সকল ক্লান্তি তাহার উন্মুক্ত বক্ষে হরণ করিয়া নিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে আরোহীর অন্তরে ওই "মিতালির"

উদ্দেশ্য কি?' তাহাদের এত "মিতালি" কাহাকে লইয়া—কাহাকে কেন্দ্র করিয়া। আরোহী দেখিল অন্তরে, বিরাটের বিরাট বক্ষে স্নেহপূর্ণ বিরাট আলিঙ্গনই ওই নিঃস্বার্থ "মিতালি"র একমাত্র প্রাণরস। বিরাটের সবকিছুই বিরাট। বিশাল বিরাটের প্রেমসুধা পান করিয়া বিরাট প্রস্তরখণ্ডের মাঝেও ভেদ করিয়া উঠিয়াছে ওই অতিকায় বৃক্ষ শ্রেণী। তার স্মরণে আসিল ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের ব্যর্থহীন সত্যানুভূতি ও সত্যদৃষ্টির কথা। তাঁহারা একদিন জগতের সম্মুখে বিরাটের স্তবগান কালে বলিয়াছিলেন, "রস বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি (বিরাট) রসস্বরূপ, রসের আকর। তাই কি পাথরের প্রতি আনাচে কানাচে রসের ফল্গুধারা প্রবাহিত হইতেছে। সেই পাথরের দেশে বাস করে যাহারা (মানুষ, পশু, বৃক্ষ, লতা গুল্মাদি) তাহারা কিন্তু পাথর হইয়া যায় নাই, বরং যাত্রীদের চিত্তকে আরও রসময় করিয়া দিবার জন্যই যেন রসের হাসির সঙ্গে, রসের হাত সম্প্রসারিত করিয়া রসেরই রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

যে হৃষীকেশকে কেন্দ্র করিয়া ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। সেই হৃষীকেশ ত্যাগ করিয়া এতদিন আরোহী ছিল কেদারের পথে। কেদারনাথ ১১৫৭০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। আজ (১৩ই মে) আরোহী দর্শন করিল চিন্ময় ভগবান ৺শ্রীশ্রীকেদারনাথকে। এখানে রাস্তাঘাট বরফাচ্ছাদিত। শীতের অত্যধিক চাপে আরোহী "ত্রাহি মাং মধুসূদন" জপ করিতে লাগিল। রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল দ্বিতল মহলের উপর-ঘরে। নীচে তিনখানা বাজাই (লেপ), উপরেও তিনখানা লেপ আরও দুইখানা মোটা কম্বল গায়ে দিয়াও শীত যায় না—তখন পাণ্ডা মহাদেব অগ্নিদেবতার আবাহন করিলেন। উদ্দেশ্য, আরোহীর আরাম বিধানের জন্য। বাসের রাস্তা হইতে সাড়ে পঞ্চান্ন মাইল উৎরাই ও স্থানে স্থানে দুর্গম চড়াই পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া ১৩ই মে পূজার কাজ সম্পন্ন করিয়া বেলা এগার ঘটিকায় আরোহী চলিল বদরিনারায়ণের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছিতে আরও ১০৭ মাইল শৈলারোহণ করিতে হইবে।

কেদারনাথ হইতে ক্রমঃ-উৎরাই-পথে ২৪ মাইল অবতরণ করিয়া 'নালা' চটী হইতে উষীবঠে আরোহী উপস্থিত হইল। এটী বড়ই রমণীয় স্থান। আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র-বৈশাখ অবধি কেদারনাথের পূজক এইখানে বাস করেন। এখান হইতেই কেদারের উদ্দেশ্যে পূজার কাজ সম্পন্ন করা হয়। বদরিনারায়ণের পথে এক পৃথক শৃঙ্গ—যাহার নাম "তুঙ্গনাথ পাহাড়"। ইহা উচ্চতায় ১৪০০০ ফুট। একটানা সাড়ে তিন মাইল দুর্গম চড়াই পথ অতিক্রম করার পর তুঙ্গনাথজীকে দর্শন করিয়া আরোহী নামিয়া আসে। তুঙ্গনাথ ও যোশীমঠের নিকট সিংহদ্বারে যাত্রীদের থাকিবার স্থানের পাশে অনেক গুচ্ছ গুচ্ছ খুব বড় বড় লাল গোলাপের প্রস্ফুটিত হাসিমুখ দেখিয়া আরোহীর অন্তর নাচিয়া উঠিল। আনন্দের ধাক্কায় অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, শরীর অবশ হইয়া পড়িল, বসিয়া পড়িল আরোহী। সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিল গোলাপকে, 'তোমাদের পরিচর্য্যা কে করে? কে তোমাদের মালী? চতুর্দ্দিকে এই বিশাল শৈলখণ্ডের মাঝে কিভাবে বেঁচে আছ তোমরা? কিভাবে কার সাহায্যে কার মনকে হরণ করবার জন্য তোমাদের যৌবনের সৌন্দর্য্যকে এত সুন্দরভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছ?' গোলাপ হাসিতে হাসিতে আরোহীর প্রাণে প্রাণে উত্তর দিল—'আমরা ঘর করি, সেই শ্যাম-মনোহর-পুরুষ অনন্তের। তিনি আমাদের একমাত্র আপনার জন, প্রাণের স্বামী—যাঁর ইচ্ছায় ও যাঁর তৃপ্তির জন্য আমরা এই যৌবনের চঞ্চলতার তরঙ্গকে পরিহার ক'রে যৌবনের শান্ত গম্ভীর অবস্থাকে ধারণ ক'রে বসে আছি, তাঁরই অপেক্ষায়। সেই চন্দন-চর্চ্চিত, পীতবসন, নীলকলেবর বনমালীই আমাদের নিশ্চিন্ত-পালক এবং তাঁর নিত্য স্নেহচুম্বনই আমাদের একমাত্র প্রাণ-সত্তা।'

তারপর আরোহী অগ্রসর হইল বিষ্ণুপ্রয়াগের পথ ধরিয়া। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকনন্দার মিলনস্থলকেই বিষ্ণুপ্রয়াগ বলা হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে

নারদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া এই স্থানেই সর্ব্বজ্ঞত্ব বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোশীমঠ হইতে আর দুইদিন পরেই আরোহী পৌঁছিবে বদরিনারায়ণে। যোশীমঠ অতি পবিত্রস্থান, প্রাচীন তীর্থ। ইহা ৬১০৭ ফুট উচ্চ, বৃহৎ ও রমণীয় পার্ব্বত্য নগর। জ্ঞানগুরু ৺শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য—তাঁহার জীবনের শেষাংশ এই পুণ্যভূমিতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এইখানে বদরিনারায়ণের পূজারী বা রাউল ছয় মাস কাল থাকিয়া ভগবান বদরিনারায়ণের উদ্দেশে নিত্যপূজা করেন। এখান হইতে পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী হইয়া ৺শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণে যাইতে হয়। হনুমানচটী হইতে বদরিনারায়ণ পাঁচ মাইল। এইখানে শীতের প্রয়োজনে বাজাই (লেপ) ও কম্বল ভাড়া পাওয়া যায়। বদরিনারায়ণ উচ্চতায় ১০৫০০ ফুট। এই আরোহার নিকট বদরিনারায়ণ যে কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা যথাযথ প্রকাশ করিবার মত প্রচুর ভাষ ও বলিষ্ঠ ভাষা তাহার রখনে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিদের অনন্ত ত্যাগ-তপস্যাপূত জীবনের রক্তিমচ্ছটা আরোহীর অন্তর মহানন্দে ও মহাভাবে আচ্ছাদন করিল। এইভাবে দর্শনাদি করিয়া বদরিনারায়ণ হইতে পরদিন ৩৮ মাইল দূরে হৃষীকেশের উদ্দেশে সে পুনরায় চলিল। "জয় বদরি বিশাললাল কী জয়, জয় কেদারনাথজী কী জয়" ইত্যাদি বলিতে বলিতে আরোহী অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দিবসত্রয়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল পিপুলকুটির মোটরষ্টেশনে।

স্মরণ হইতে লাগিল আরোহীর অন্তরে—কি ভাগ্যের ফলেই না এই অতি সুন্দর প্রকাণ্ড উপমহাদেশে—যেখানে ব্যাস, বশিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় হইয়াছে, যেখানে 'সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্'-এর নিত্য বিকাশ ও প্রকাশ, যাহার পবিত্রতার কোন সীমা নাই, প্রেমের অন্ত নাই, জ্ঞানের শেষ নাই, সেই মহাতীর্থে সে দেহ ধারণ করিয়াছে।

দীনের ভগবান

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য

মন্দিরে তুমি নাই হে দেবতা
আছো ব্যথিতের অন্তরে,
মূর্খ পূজারী তবুও তোমায়
কুসুমে, ভূষণে পূজা করে।

সেবে, পঞ্চপ্রদীপে দীপালি সাজায়,
আরতিশংখ পূজকে বাজায়,
ভকতি-অর্ঘ্য দেয় দুটি পায়
অর্পিয়া শতেক মন্তরে।

মনে কভু তার নাহি জাগে হায়
দেবতা আছে কি নাই,
স্বর্ণ দেউল ত্যজি' কোথা আর
পেতেছেন নিজ ঠাঁই।

যেথা, বিশ্ব ভরিয়া জাগিছে রোদন
উথলি' উঠিছে গভীর বেদন,
তব রথ সেথা নিতি অনুখন
দিবসে-নিশীথে সঞ্চরে।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে ছড়ার স্থান

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

শিশু-চরিত্র সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই একই রকম। অনার্য্য শিশুটির সাথে সভ্যতম সমাজের নবজাতকটীর অন্ততঃ শৈশবলীলার কোন তারতম্য নাই। কারণ তারা সদ্য প্রকৃতির ক্রোড় থেকে ছিন্ন হ'য়ে এসেছে। মানুষের হাতের হাতুড়ির বাড়ি তখনও তার দেহ-মনের উপর একটুও পড়েনি। শুধু শিশু বলেইবা কেন, বয়স্কদের বেলায়ও যেটুকু বৈশিষ্ট্য মানবজাতির মধ্যে সাধারণ, তাহা সর্ব্বদেশ-কালেই বিদ্যমান।

শিশুদের জন্য যে সব ছড়া তৈরি হ'য়েছে, সেগুলির ভাষা ক'রে তোলা হ'য়েছে শিশুদেরই উপযোগী করে। গানের সুরে ছড়া আওড়াতে হয়। এতে প'ড়ে যায় শিশু-মনের ওপর একটা ছাপ। আর যত্নে শিশুর শরীরের যেমন উন্নতি হ'তে থাকে, তেমনি সেই ছড়ার ছাপে তার মনেরও বিকাশ আরম্ভ হয়। ফলে শিশু যখন পাঁচ-ছ বছর বয়সের হয় তার তখন জান্‌বার আগ্রহ খুবই বেড়ে যায়। তার লেখা পড়ার মন হয়, আবার দেশভ্রমণেরও আকাঙ্ক্ষা জাগে।

যে সকল কবি ছড়া রচনা ক'রে চালু ক'রেছেন, তাঁরা তৎকালে-প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতি ঐ ছড়ার মধ্যে ধরে রেখেছেন। ঘুমপাড়ানি গানে প্রথমে শিশুকে আস্তে আস্তে চাপড়ান হয় আর গাওয়া হয়—

'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি, আমার বাড়ি এসো।
পাট নেই পিঁড়ি নেই, মণির চোখে বসো।'

এতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় এক জাতীয় মাসিপিসি আছেন তাঁদের কাজ হলো ঘুমপাড়ান। তাঁদের ডাকা হ'চ্ছে বাড়িতে কিন্তু বস্‌বার জন্য কোন পিঁড়ি বা পাট না থাকায় শিশুর চোখে বস্‌তে বলা হচ্ছে। শিশু নিজের পিসিকে চেনে, মাসিকে চেনে কিন্তু ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে ত দেখ্‌তেও পায়না কাজেই চেনেও না। তাঁরা তাদের চোখে যতক্ষণ বসে থাকেন ততক্ষণ তারা ঘুমিয়ে থাকে। চোখ্ থেকে স'রে গেলেই তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এইরূপ চিন্তা ক'রে ক'রে শিশুদের চিন্তাশক্তি বেড়ে চলে।

শিশুকে ঘু-পুতে চড়িয়ে যে ছড়া বলা হয় তাও তার মানসাকাশে শরতের জ্যোছনার মত আলো বিতরণ করে।

ঘু-ঘু ঘু-ঘু-ঘু, মেতি মু
সইলো সই! তোর পুত কই? হাটে গেছে।
কি মাছ আন্‌বে? সরল পুঁটি।
কি দিয়ে রান্‌বি? ঝাল মরিচ দিয়ে।
কোথায় পাবি? যেনের দোকানে।
যেনে কেন দেবে? কড়ি ভাঙ্গে নেবে।
কড়ি পাবি কোথায়? দুধ বেচে পাব।
দুধ তোর কোথায়? কেড়ে ভরা মাথায়।
খাটি না জ'লো? ক্ষীর চাঁছি হ'লো।
দু'বেলা ঘোর সাম্‌লা গরু,
পালান মোটা নাম্‌লা সরু।
মেনা গাইএর নড়ন সিং,
গোরটা নাচে তাধিন তাধিন।
পড় পড় পড় সোনার কুড়ে পড়॥

ছড়ার মধ্যে বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ থাকে আবার কৃষিকাজের কথাও থাকে:

হাতির পিঠে হাওদা, ঘোড়ার পিঠে জিন,
জল্‌দি আও জল্‌দি আও, সাহেব হেস্টিন্।

আবার:

ছেলে ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?
ধান ফুরোলো, পান ফুরোলো খাজনার উপায় কি?
আর কিছুকাল সবুর কর, রসুন বুনেছি।

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে সাহেব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা বড়ই অদ্ভুত ছিল। অশান্ত ছেলেকে শান্ত করতে হেষ্টিংস সাহেবের নাম করা হ'ত।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময় বর্গীরা বাঙ্গালাদেশে এসে নিরীহ বঙ্গবাসীর কাছ থেকে কিরূপ সর্ব্বনেশে ভাবে খাজনা আদায় করত তারই ভীষণ কাহিনী ঘুমপাড়ানি গানে দেখতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা-দেশ—ধান-পানের দেশ। এ যদি কোনক্রমে নষ্ট হ'য়ে যেত তবে রসুন চাষ করে খাজনা শোধ করবার ব্যবস্থা হ'ত।

শিশু-মনে এর যে ছাপ পড়ে তাতে উত্তরকালে তার ইতিহাস পাঠে প্রবল অনুরাগ দেখা দেয়, কৃষিকাজেও আকর্ষণ জন্মে।

তখনকার দিনে ছেলের বিয়েতে ছেলের বাপ পণ পেয়েছেন, আবার মেয়ের বিয়েতেও মেয়ের বাপ পণ পেয়েছেন। কুলীন কায়স্থের ছেলেরা মৌলিক কায়স্থের মেয়ে বিয়ে ক'রবার সময় পণ পেয়েছেন। বিশেষ কোরে বামুনের ঘরের মেয়েদের খুবই দর ছিল। বামুনেরা প্রায়ই পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ করতেন। এতে অনেক সময় অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যেত—

"বামুন জাতির এমনি ধারা, বোন্ শাশুড়ী ভাগ্নে শালা।"

বর্গীরা খাজনা না পেলে কবাবেতের বাড়ি যখন মারত, তখন ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে খাজনা শোধ করবার কথা ব'লে তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা হ'ত—

"আয় মেয়না আয় মেয়না
কবাবেতের বাড়ি।
মণির বিয়ে দিয়ে
দেব খাজনার কড়ি।"

আকাশে চাঁদ উঠলে চাঁদকে শিশুর কপালে টিপ পরিয়ে দিতে বলা হয়—

"আয় চাঁদ আয়রে!
মণির কপালে মোর,
টিপ দিয়ে যারে।
ধান ভেনে কুড়ো দেবো,
মাছ মেরে মুড়ো দেবো
গাই বিয়েলে দুধ দেবো,
কালো গরুর বাছুর দেবো।"

শৈশবে শিশুমাত্রেই থাকে স্বার্থপর। "তার হাতে দিয়ে সামান্য একদানা চিনিও অন্যের হাতে যাবার উপায় নেই—

'ওখানে কে রে? আমি খোকা।
মাথায় কিরে? আমের ক'াকা।
খাস্‌না কেনরে? দাঁতে পোকা।
ফিলুদনে কেনরে? ওরে বাবা!"

সন্তান-স্নেহ সকল জীবের সমান। বাঘিনী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও নিজ নিজ বাচ্চার কাছে স্নেহময়ী মাতা। মানুষের বেলায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় —ডাকাত ডাকাতি ক'রে তার নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়। খুনে খুন করে তার নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো পরানোর জন্য। নিজের ছড়ায় সন্তান-স্নেহের সহজ-সরল ভাব প্রকাশ করা হয়েছে—

'বুড়ী তোর ক'টি ছানা? তিনটি ছানা।
কোন্‌টি কানা? ছোট্‌টী কানা।
সেইটি দেনা? তা হবেনা।'

এই ভাবে ছড়ার সাহায্যে শিশু বাইরের জ্ঞান পেতে থাকে। আর, তারাটিক্ খেলায় শিশু গণনা শিখ্‌তে পারে। এতে ধারাপাত পড়ার ওপর তার একটা টান সহজে এসে যায়। যেমন—

'এানা ব্যানা, ত্যেনা সিস্।
ফেলে ভগর, উনিশ বিশ।'

শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাই তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য ঠাকুরদাদা ঠানদিদি ভূতের ভয় দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ জাতীয় ভয়ে সে একেবারে বিগ্‌ড়ে যায়। এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় সে 'ধরলো' 'ধরলো' ব'লে চীৎকার করে ওঠে।

'কঙ্ক কাটা ব'লে আমি তাল গাছে থাকি।
যে ছেলেটি কাঁদে তার কাঁধটি ব'য়ে নাচি।'

শিশু যখন বড় হ'তে থাকে তখন ভূতের ভয়ে অনেক কিছু করতে পারে না। একলা ঘাটে যেতে পারে না, একলা একবিছানায় শুতে পারে না; এমন

কি সিনেমাপুরে একলা ঘরেও থাকতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে ঠাকুরদাদা ঠানদিদি সাপ হ'য়ে কাটেন আর ওঝা হ'য়ে ঝাড়েন! নাতি নাতনীকে তাঁরা ভূত-তাড়ানোর মন্ত্রও শিখিয়ে দেন। এতে চলে যায় ভয়, মনে আসে সাহস।

'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি।
রামলক্ষ্মণ সহায় থাকিলে, করবে শালা কি ?'

উপসংহারে যে ছড়া আওড়ান হয় তা থেকে শিশু সংসারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অনেক মাল মসলা পেয়ে যায়।

আমার কথাটী ফুরল
নটে গাছটি মুড়ল।
কেনরে নটে মুড়লি কেন ?
তোর গরুতে খায় কেন ?
কেনরে গরু খাস কেন ?
তোর রাখাল চরায়না কেন ?
কেনরে রাখাল চরাসনে কেন ?
মাঠে ঘাস হয় না কেন ?
কেনরে ঘাস হোসনি ?
বিষ্টি কেন হয় নি।
কেনরে বিষ্টি হ'সনা ?
বেঙ্ কেন ডাকে না।
কেনরে বেঙ্ ডাকিস্‌নে ?
সাপে কেন খায় ?
কেনরে সাপ খাস্ ?
খাবার জিনিস খাসনি ?
গুড় গুড়ুতে খাসনি ?

সাহিত্যের এক নাম কাব্যশাস্ত্র। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্য ব্যতিরেকে সমাজ চলতে পারে না। কাব্যের মাধ্যমেই আমরা সহজে জাগতিক জ্ঞান আহরণ করে থাকি। বালক উইলিয়ম জোন্সের জ্ঞানতৃষ্ণার শান্তির জন্য তাঁর মাতা প্রায়ই বলতেন —পড়লেই জানতে পারবে (Read and you will know)। মাতৃক্রোড়ে অবস্থিতিকালে সংসার সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা আদৌ হয়না। তাই তার জন্য রচিত হ'য়েছে ঘুম-পাড়ানি গান, নানারকম ছড়া ইত্যাদি। এই সবগুলিই শিশুর সাহিত্য। এতে পায় সে আনন্দ ও জ্ঞানের সন্ধান।

শিশু বেড়ে প্রৌঢ় হয়, বৃদ্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্যও প্রবীণতা লাভ করে। শৈশবের সাহিত্য আর প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য সম্বন্ধযুক্ত নয়। শিশুর সাহিত্য প্রৌঢ়ের সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। সুতরাং তার স্থান বাঙ্গলা-সাহিত্যে তুচ্ছ নয়।

বিবেকানন্দ

রণজিৎ গুহ, কাব্যভারতী

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ চির আনন্দময়
সর্ব্বত্যাগী, নির্ভয়প্রাণ, সুন্দর-প্রেমময়।
তব জীবনের অমৃত-বাণী
যন্ত্রকণ্ঠে উঠিল যে ধ্বনি
কর্ম্মসাধনা মহান ধর্ম, সত্যের চির জয়।

শত যুগান্তের দৈন্য অবহেলা, লাঞ্ছনা, অপমান
ফিরে আসি' বীরে জাগ্রত কর মানুষেরি ভগবান।
মৃত্যুঞ্জয়ী হে বীরবল
কীর্ত্তির চেয়ে তুমি উজ্জ্বল
ধরণী-ধূলিতে তব চরণের চিহ্নের নাহি ক্ষয়।

প্রাণায়াম বিজ্ঞান

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। এই তিনটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না প্রধানতম। যাঁহারা বিজ্ঞানালোকে নাড়ীর আকার ও সংস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মেজর রামদাস বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৮ খৃঃ অঃ 'থিয়সফিস্ট' (Theosophist) নামক ইংরাজী মাসিকে তিনি নাড়ীতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা মৌলিক ও সারগর্ভ। ইহাই বর্তমানসময়ে প্রথমতম প্রচেষ্টা। তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Positive Sciences of the Ancient Hindus, স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং বোম্বাইয়ের ডাঃ জি. জি. রিলের Mysterious Kundalini পুস্তকত্রয়ে নাড়ী-বিজ্ঞান নূতনভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অভিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরীক্ষিত না হওয়ায় বিজ্ঞানসম্মত কিনা বলা যায় না।

আধুনিক শরীরতত্ত্বের আলোকে নাড়ীকে স্নায়ু (nerve) বলা যাইতে পারে। স্বামী কুবলয়ানন্দ উক্ত মতের সমর্থক। শিবসংহিতায় (২।১৭) আছে "সর্বাশ্চাধোমুখা নাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ। পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য…" (নাড়ীগুলি পদ্মতন্তুবৎ সূক্ষ্ম এবং মেরুদণ্ড আশ্রয়পূর্বক অধোমুখে বিস্তৃত। সুতরাং শিবসংহিতার বর্ণনা অনুসারে নাড়ীকে স্নায়ু বলাই যুক্তিসঙ্গত। ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না মেরুদণ্ডেই অবস্থিত। ডাঃ রিলের মতে ইড়া ও পিঙ্গলা দুইটি মেরুদণ্ডের উভয়দিকে অবস্থিত (Sympathetic System এর ganglated cord)। স্বামী কুবলয়ানন্দ উক্ত মত অনেকাংশে সমর্থন করেন।

ইড়া ও পিঙ্গলা মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া যথাক্রমে বাম নাক ও ডান নাকে সমাপ্ত। পিঙ্গলাকে সূর্যনাড়ী বলে। পিঙ্গলামার্গে অর্থাৎ ডান নাক দিয়া যখন নিঃশ্বাস চলে তখন শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ইড়া পথে অর্থাৎ বাম নাকে যখন শ্বাসগতি হয় তখন শরীর শীতল থাকে। এইজন্য রাত্রে ডান নাকে এবং দিনে বাম নাকে নিঃশ্বাস বহা স্বাস্থ্যকর। সুশ্রুতব্য পরিপাক বা শ্রমসাধ্য কর্মকালে ডান নাকে নিঃশ্বাস বহা ভাল। লেখাপড়া প্রভৃতির সময় ডান নাকে নিঃশ্বাস চলা উচিত। যখন উভয় নাকে নিঃশ্বাস চলে তখন সুষুম্নার দ্বার উন্মুক্ত হয়। সকালে বা সন্ধ্যায় সাধারণতঃ এইরূপ নিঃশ্বাস চলে। তখন উপাসনাদি শুভকর্ম প্রশস্ত। অধিকাংশ লোকের সুষুম্নার দ্বার বন্ধ থাকে। সুষুম্নার দ্বার উন্মুক্ত করাই প্রাণায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য। পিঙ্গলার শ্বাস দীর্ঘ ও দ্রুত, ইড়ার শ্বাস অপেক্ষাকৃত অদীর্ঘ ও অদ্রুত এবং সুষুম্নার শ্বাস অতি ধীরগামী। ইড়ানাড়ীকে চন্দ্রনাড়ী বলা হয়।

সুষুম্নার মধ্যে ষট্‌চক্র অবস্থিত। উহার অগ্রে ও পশ্চাতে গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা নাড়ীদ্বয় উৎপন্ন হইয়া বাম ও ডান চক্ষু অভিমুখে প্রসারিত পূষা এবং যশস্বিনী নাড়ীদ্বয় মূলাধার হইতে বহির্গত এবং বাম ও ডান কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

অলম্বুষা, কুহূ ও কৌশিকী নাড়ীত্রয় একই চক্রে জাত হইয়া যথাক্রমে বাহুমূল, নিজাগ্র ও পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিশিখী ব্রাহ্মণে এবং যোগচূড়ামণি উপনিষদ্‌দ্বয়ে বহু নাড়ীর নাম উল্লিখিত আছে।

পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিৎ ও বৈজ্ঞানিক প্রাণায়ামের অক্সিজেন মূল্য (Oxygen value) নির্ধারণে সচেষ্ট। কিন্তু যোগশাস্ত্রমতে ইহাতে স্নায়ু-পুষ্টি (nerve culture) সমধিক হয়। প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্কে এবং অন্যান্য স্নায়ুকেন্দ্র মেরুদণ্ডে অবস্থিত। মেরুদণ্ড

STUDENTS

৩২ খানি অস্থিখণ্ডের সমষ্টি। কিন্তু ৬ খানি অস্থি অন্যান্য খণ্ডের সহিত মিলিত হওয়ায় ২৬ খানি পৃথক্ অস্থি দেখা যায়। তন্মধ্যে ৭ খানি ঘাড়ে, ১২ খানি পীঠে, ৫ খানি কোমরে এবং তন্নিম্নে ২ খানি অধিষ্ঠিত। মস্তিষ্কে ১২ জোড়া এবং মেরুদণ্ডে ৩১ জোড়া প্রধান স্নায়ু আছে। প্রধানতঃ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী এবং অস্থিখণ্ডগুলির সন্ধিস্থল-সমূহ হইতে বহির্গত। যেগুলিকে যোগশাস্ত্রে ষট্‌চক্র বলা হয় সেগুলি সম্ভবতঃ প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয় মূলাধার চক্র হইতে নাসিকা পর্যন্ত প্রসারিত। ত্রিশিখী ব্রাহ্মণ উপনিষদের মতে সুষুম্না নাড়ী 'পদ্মসূত্র প্রতীকাশা' এবং 'বিদ্যুদাভাসনালক।' একটি কেশকে শতভাগে বিভক্ত করিবার পর প্রত্যেক ভাগকে পুনরায় এক-শত ভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয় প্রত্যেক নাড়ী তত সূক্ষ্ম। নাড়ীর সূক্ষ্মতা যোগশাস্ত্রে উক্তরূপে বর্ণিত। এই স্নায়ু-জালই সমগ্র দেহে সংযোগবিধান করে। প্রাণায়ামে স্নায়ুর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়।

যেখানে নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয় তথায় প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। খুব ঠাণ্ডা বাতাসে বসা অনুচিত। ছাদের উপর বা নদীর ধারে বা কোন কোন উন্মুক্ত স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস অতিশয় স্বাস্থ্যকর। গীতোক্ত 'চেলাজিনকুশোত্তরম্' আসনই প্রশস্ত। অর্থাৎ ভূতলোপরি কুশাসন এবং তদুপরি মৃগচর্ম ও মোটা কাপড় পাতিলে উত্তম যোগাসন প্রস্তুত হয়। চর্মাসন ব্যবহারে আপত্তি থাকিলে মোটা গালিচার আসন ব্যবহার্য। এইরূপ সামান্য আসনে বসিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাসকালে যে বিমলানন্দ অনুভূত হয় তাহা অপার্থিব। তখন যোগাসন সম্রাটের সিংহাসন অপেক্ষা লোভনীয় স্থান হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যলাভার্থ অভ্যাসকারী বসিয়া বা দাঁড়াইয়া উজ্জায়ী প্রাণায়াম করিতে পারেন। চলমান ব্যক্তিও উজ্জায়ী প্রাণায়াম অভ্যাসে সমর্থ। হঠযোগ প্রদীপিকায় আছে (২।৫২), "গচ্ছতা তিষ্ঠতা কার্য্যম্ উজ্জায়াখ্যম্ তু কুম্ভকম্।" অর্থাৎ দণ্ডায়মান বা চলমান অবস্থায় প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে আসনের প্রশ্ন উঠে না। দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম অভ্যাসকালে মেরুদণ্ড উন্নত ও হস্তদ্বয় দুই কোমরে বিন্যস্ত থাকিবে। বসিয়া করিলেও কোন ধ্যানাসনের প্রয়োজন নাই। যে কোন ভাবে সমকায়শিরোগ্রীব হইয়া বসিয়া হস্ত-দ্বয় হাঁটু দুটির উপর রাখিবেন। অবশ্য, সিদ্ধাসনে বা পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে বা সমাসনে বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও উপকারী।

স্বস্তিকাসন বা সমাসনে বসিলে হস্তদ্বয় করিতে হয়। প্রসারিত বাহুদ্বয় স্ব স্ব জানুদেশের বিন্যস্ত রাখিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সংযোগে জ্ঞানমুদ্রা হয়। কুম্ভক করিবার সময় তালুদ্বয় বন্ধ কর্তব্য। কুম্ভকের সহিত মূলবন্ধ বা উড্ডীয়ানবন্ধ অভ্যাস সাধকের ইচ্ছাধীন। কোন অভিজ্ঞ গুরুর সাহায্য ব্যতীত কুম্ভকের সহিত বন্ধত্রয় যুগপৎ অভ্যাস অনিষ্টকর হইবার সম্ভাবনা। স্বামী কুবলয়ানন্দের মতে পূর্ণ আহারের সাড়ে চার ঘণ্টা পরে বা আধঘণ্টা পূর্বে প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রকৃষ্ট সময়। অল্পাহারের অন্ততঃ দুইঘণ্টা পরে প্রাণায়াম করা যায়। শিব সংহিতায় (৩।৪৪) আছে—

সম্ভোক্তুক্তেঽতিকুপিতে বাভ্যাসঃ ক্রিয়তে যদি।
অভ্যাসকালে প্রথমং ভূর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যভোজনম্।

অনুবাদ—সদ্য ভোজনের পরে বা ক্ষুধাকালে বিবেকিগণ প্রাণায়াম করিবেন না। প্রথমতঃ যোগ-অভ্যাসকালে দুগ্ধ ও ঘৃতপান বিধেয়।

স্বাস্থ্যকামী সকালে ও সন্ধ্যায় রোজ দুইবার প্রাণায়াম করিবেন। প্রত্যহ একবার করিলে প্রাতঃকালই প্রশস্ত। মুমুক্ষুও প্রথমে রোজ দুইবার করিবেন। অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে দ্বিপ্রহরে, মধ্যাহ্নে বা মহানিশায়ও করা যায়। শিবসংহিতায় (৩।২৭) আছে—

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেষ্বেতেষু কুম্ভকান্।

অনুবাদ—প্রত্যহ চার বার—প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সূর্য্যাস্তে ও মধ্যরাত্রে মুমুক্ষু প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন।

মুমুক্ষুর একাহারী হওয়া আবশ্যক। আহারের অন্ততঃ ছয়ঘণ্টা পরে শূন্য উদরে তিনি প্রাণায়ামাভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। স্বামী কুবলয়ানন্দের মতে প্রত্যহ যোগাসন অভ্যাসের পরে স্বাস্থ্যকামী প্রাণায়াম করিবেন। তবে অধিক শ্রমসাধ্য (violent) ব্যায়ামের পরে প্রাণায়াম অভ্যাস অনুচিত। সাত বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে কোন পুরুষ বা নারীর প্রাণায়াম বা আসনাভ্যাসে অধিকার আছে। চল্লিশের পরে অভ্যাস করিতে হইলে অভিজ্ঞের পরামর্শ লইবেন। বিধি অনুসারে আসন বা প্রাণায়াম অভ্যাসে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সাবধানে ও বিধিপূর্বক অভ্যাস করিলে আসন ও প্রাণায়ামের সুফল অচিরে প্রত্যক্ষীভূত হয়।

"দেবতার অন্তরালে বাঙলা-সাহিত্য"

প্রবন্ধের সমালোচকের প্রতি

শ্রীঅনিল কুমার হালদার

"We create the God, and fall down at his feet and worship him"
—Swami Vivekananda.

'দেবতার অন্তরালে বাংলা-সাহিত্য' নামক যে প্রবন্ধটি আমি লিখিয়াছিলাম জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বিশ্ববাণীতে (১৩৬৩), 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেবতা ও মানুষ' শীর্ষক অন্য এক গবেষণালব্ধ প্রবন্ধে জনৈক সমালোচক তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পাঠকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন, লেখকের অজ্ঞানতা প্রদর্শন এবং বোধহয় সম্পাদকের হুলাদজনকতা সূচন করিয়াছেন। সমালোচক আমার ঐ লেখাটিকে 'নিবন্ধ' বলিয়াছেন, কিন্তু উহা নিবন্ধ নহে—প্রবন্ধ। মহামহাজনের মহাবচনের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, তাই 'পণ্ডিত', 'বিদ্যাভূষণ', 'ডাক্তার', অধ্যাপক', 'বর্তমানযুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক' 'উনবিংশ শতাব্দীর এক অনন্য প্রতিভা,' 'বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ঋষি'-দের মহাবাক্যই তাঁহার তূনীরের ব্রহ্মাস্ত্র এবং তাহা নিক্ষেপ করিয়া আমার হীনতা প্রমাণ করিয়াছেন: আমি কিন্তু পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, প্রভৃতি কেহই নহি, এমনকি লেখক হিসাবে এখনও অপরিচিত, সুতরাং আমি যে হীন হইব, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?

বীরবলের গ্রন্থাবলীতে দুটি কৌতুককর কথা আছে, প্রথমতঃ—'গর্জ্জন-সরস্বতী,' দ্বিতীয়তঃ 'মলাট-সমালোচনা।' আমার প্রবন্ধটি একহিসাবে প্রাচীন-বাংলাসাহিত্যের 'মলাট-সমালোচনা।' শ্রদ্ধেয় সমালোচক জনৈক 'গর্জ্জন-সরস্বতী'র মত পুনরায় তাঁহার মলাট-সমালোচনা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। সাহিত্যের পটভূমিকায় যে ঐতিহাসিক চৈতন্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্যের কলকোলাহলকে দূরে রাখিয়া সাহিত্যকে যে বাঙালীমানস অভিব্যক্ত তাহাই আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু; শুধু তাহাই নহে যে সাহিত্য দেবতাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই কথা আমি সঙ্কলন করিয়াছি; সুতরাং ইতিহাস নহে, কালানুক্রমিক বিকাশ নহে, কাব্যমূল্যের ঐকান্তিকতা অথবা সামগ্রিক বিচারবিশ্লেষণও নহে, দেবতা সাহিত্যকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছে এবং সাহিত্য দেবতাকে কিভাবে কতটুকু গ্রহণ করিয়াছে তাহাই আমার বিচার্য্য বিষয়—প্রবন্ধের নামকরণে তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

প্রথমে চর্য্যাপদের কথা: চর্য্যাপদই বাংলা-সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন। উহার রচনাকাল লইয়া এখনও দ্বন্দ্ব আছে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে উহা রচিত হয় নাই। শ্রদ্ধেয় সমালোচক অন্যদিক দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—ইহা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত। তাঁহাকে ঐতিহাসিক অথবা ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে আমি জানি না। যাহা হউক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "The origin and development of Bengali language" গ্রন্থখানি তিনি যেন মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রদ্ধেয় সমালোচক-শাস্ত্রীর মতে চর্য্যাপদ ধর্মচেতনাকে অবলম্বন করে নাই; কারণ সরহপাদ লিখিতেছেন, 'বাটত ভাঅ খাণ্ট বি বল আ'—পথে খড়্গধারী বলবান দস্যুর ভয় আছে। শাস্ত্রীমহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন ঐ 'পথ' এবং 'দস্যু'—সাধারণ 'পথ' এবং সাধারণ 'দস্যু' নহে।

কুক্কুরীপাদের চর্য্যায় ঘুমন্ত শবর ও নিদ্রাহীন বধূর রূপকটি অথবা সেই উন্মত্ত শবর-শবরীকে লক্ষ্য করিয়া (নব) শাস্ত্রীমহাশয় লিখিতেছেন, 'ধর্ম্ম-চেতনার পরিবর্ত্তে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় চর্য্যাপদে পাওয়া যায়। ধর্মচেতনার পরিবর্ত্তে বস্তুনিষ্ঠতা—অর্থাৎ ঢেঁড়সের পরিবর্ত্তে কাঁচকলা। পেয়েরটি আয়তনে বড় এবং সহজপ্রাপ্য, পাঠককে বেশী বুঝাইতে হইবে না, কারণ চর্য্যাপদের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় যাঁহারই হইয়াছে তিনিই এ' কথার মর্ম্ম জানেন। ডোম্বিনী চ্যাঙ্ড়ারী বিক্রয় করে, ব্যাডের সংসার বাড়িয়া যায়, নিত্য অতিথি আসে কিন্তু ছাড়িতে ভাত নাই, তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিতে হয়, গৃহপ্রাঙ্গণ সোনায় ভরিয়া গেল—এগুলি বাচ্যার্থ ; ইহার অতীত যে অর্থ তাহা অদীক্ষিত বুঝিবে না। এসম্বন্ধে আমার "চর্য্যা-পদের শিল্প সুষমা" নামক প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি ; সমালোচকের যদি তাহা পড়িবার দুর্ভাগ্য না হইয়া থাকে ত সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চর্য্যাপদ-এর নূতন সংস্করণ পড়িবার সৌভাগ্য হওয়া উচিত ছিল ; সেই সঙ্গে (সময় থাকিলে) ডাঃ নীহাররঞ্জনের "বাঙালীর ইতিহাস" (আদিপর্ব্ব)। কারণ ঐ প্রবন্ধেই ছিল—এই সাধনপীঠিকাগুলিতে দেহের মধ্যে দেবতার সন্ধান করা হইয়াছে। দেহের দেহলীতে যে দেহাতীতের প্রতিষ্ঠা তাহাকেই সিদ্ধাচার্য্যেরা ধর্ম্মশিক্ষার্থী তরুণযোগীকে বারে বারে উপদেশ দিয়াছেন। শবর শবরী ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতীয়ের যে কামলীলা বর্ণনা এখানে আছে তাহাও ঐ সুগভীর দৈহিকচর্য্যা অর্থাৎ যোগ-কৌশলের সঙ্কেতবহ। এই পদকর্ত্তারা দেহ ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে স্বীকার করিবে না, এই দেহ-তরঙ্গিনীতটে পূজা উপচারের আয়োজন সম্ভার করিয়া বাংলার প্রথম সাহিত্যিক তাহার সাধনারম্ভ করিলেও ঐ দেহপূজা বা দেহস্থ আত্মদর্শনরূপ সমীক্ষামূলক কাব্যরচনার যোগসূত্র প্রায়শঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া আদিরসস্তরে লালিত হইয়া একেবারে পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব কবির কাব্যে এবং সহজিয়া সাহিত্যের মধ্যে একটুখানি উঁকি দিয়াছিল।

প্রবন্ধের সমালোচক লিখিতেছেন, 'সুতরাং—রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের হাতে অনেকাংশে তুরীয়লোকে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্বের ক্রান্তিরেখায় সঞ্চরমান'—এই উক্তির বাস্তবতা কতদূর ?'—এই উক্তির বাস্তবতা ততদূর যতদূর তিনি মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ মিলাইয়া পাঠ করিয়াছেন। প্রশ্নার্ত্তচিত্তে তিনি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে আহ্বান করিয়াছেন। ডাঃ দীনেশ সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ঐ রামচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন, তিনি বংশীবাবার ভ্রাতা, ভক্তের অঙ্গ যোজিত বাণটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন।...মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, কারণ মঙ্গলকাব্য বলিতে কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল নহে, তদুপরি মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমি নিজেই লিখিয়াছি,—'ইহার ব্যতিক্রম কেবলমাত্র চাঁদসদাগর ; মনসামঙ্গলের নায়কের মধ্যে মানুষীশক্তির বিদ্রোহ সূচনা অনতিস্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।—শাস্ত্রী মহাশয় তাহা পাঠ করেন নাই ; অথবা মা হতঃ ইহা শুনিয়াই মূর্চ্ছোকাৎ, ইতি গদ্যঃ শুনিবার ধৈর্য্য তাঁহার নাই, সেইজন্যই 'ললাট-সমালোচনা' বলিয়াছি। বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। আমি লিখিয়াছি, 'পদাবলী শাখায় ভগবৎঐশ্বর্য্যের কথাটা ঈষৎ চাপা —আমি জীবনী বা চরিতকাব্যের কথাই বলিতেছি।" প্রবন্ধের সমালোচক সহুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় পদ্যাবলী লইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সোনা বাহিরে আঁচলে গিরা দিয়া পৃষ্ঠ তুলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন। পদাবলীর কথা বলিলেও উহার চতুর্দ্দিকে ভাগবতীবার্তাবরণ, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়ে—বৈষ্ণবের একমাত্র আরাধ্য ও উপাস্য দেবতাকে লইয়া যে ঊর্দ্ধাকাশের নক্ষত্রলোক উহাতে স্পন্দমান তাহা মাটীর স্পর্শ হইতে অনেক দূরে : মানস সুরধুনীর পরপারে তাঁহার বিগ্রহ। নহিলে স্থূল দেহের বেদনা ও কামমূর্চ্ছাতুর লাম্পট্যলীলায়

উহা স্তিমিত হইত, দেহের অপেক্ষা বিদেহের বন্ধনায় উহার রূপোৎসার বলিয়া যুগান্তকালেও উহা ভাস্বর —তথাপি উহা যে এমন প্রাকৃত-জনমনোহরণ করিয়াছে তাহাই শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিঃসংশয় লক্ষণ।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমার লেখা এইরূপ—'ভারতচন্দ্রের শিব প্রমথেশ হইলেও রসিক'. .....'রামপ্রসাদের গৌরী বাঙালী ঘরের অতিশয় দুরন্ত বালিকার মত ক্রীড়াপরায়ণা।' শাস্ত্রীমহাশয়ের মৌতাত কতদূর চড়িয়াছিল জানি না. ভারতচন্দ্রের শিবের মতই ব্যোম্ ভোলানাথ হইয়া তিনি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন, 'শ্রেষ্ঠ সমালোচক' মোহিতলালের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। মোহিতলাল ভারতচন্দ্রের কাব্যরূপ বিচার করিয়াছেন, কারণ তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু অভিনব নহে আরো অনেকে উহা লইয়া কাব্য রচনাও করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন। যাহাহৌক মোহিতলাল আরো অনেক কথাই ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—ডিলিট্যান্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকপণ্ডিত, উদরগতপক্ষ অধ্যাপক, সাহিত্যবিপণির ভাড়াটিয়া গদ্যলেখক, 'নেড়ানেড়ী' ইত্যাদি। "সুতরাং ভারতচন্দ্রের শিব এবং রামপ্রসাদের মা কালী-বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে আসিয়া বোধ করি এমন কোন অন্যায় করেন নাই" —অন্যায় যে করেন নাই তাহার প্রমাণ শিব ও মা কালীর অনুচরগণই আধুনিক ভাড়াটিয়া গদ্যলেখকরূপে বিরাজমান।

"প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে দেবতার প্রসাদ বাঙালী চরিত্রকে দুর্বল করে নাই"—ডাক্তার সমালোচকের (ডাক্তার কারণ অস্ত্রোপচারে সুদক্ষ) এই উক্তি সর্বৈব স্বীকার্য। তাহার কারণ তাঁহার মতে 'রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অতীন্দ্রিয়বাদ তাহার প্রমাণ।' রবীন্দ্রনাথের দেবতা ও প্রাচীন সাহিত্যের দেবতা আকাশ পাতাল তফাৎ, দেবতার এবং দৈবচেতনারও কোনরূপ সংযোগ নাই তাহার জন্য ঋষি অরবিন্দের প্রয়োজন নাই, চক্ষুষ্মান পাঠকের চক্ষুই যথেষ্ট।

সর্বশেষে প্রবন্ধের সমালোচক লিখিতেছেন, 'আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট যে জাতি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম দিয়াছে, জন্ম দিয়াছে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের'—উহার সহিত আমরাও যোগ দিতে পারি—জন্ম দিয়াছে তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির—ইত্যাদি।

এই উত্তর লিখিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমার যাহা বক্তব্য তাহা সেই প্রবন্ধেই পরিষ্কার হইয়াছে, প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিই তাহা জানেন যে আমি দেবতাকে কোথাও হাস্যাস্পদ করি নাই, সাহিত্যকেও নস্যাৎ করি নাই, শুধু 'ঘেটু এণ্ড কোং লিমিটেড্' এর কবলে পড়িয়া সাহিত্য ভাষা ও ভাবের বন্ধনসাধুত্বে উৎকর্ষ হারাইয়া প্লাবনের মতই স্ফীত কলেবর হইয়াছে তাহাই বলিয়াছি। প্রবুদ্ধ চিন্তাশক্তি ও উচ্চ কবিকল্পনার অপ্রগল্‌ভ উল্লাসে জ্যোতি বিকীর্ণ না করিয়া পুনঃপুনঃ রোমন্থনবৃত্তির পরিচর্যায় অনুরক্ত থাকায় বাস্তব-বেদনার পদচিহ্ন সেখানে বড়ই ক্ষীণ। বৈষ্ণবপদাবলীর আত্মবিস্মরণের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যে প্রাকৃত চেতনা চমকিয়া উঠিয়াছে তাহার সংবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কেহই রাখে নাই; ঐ পদগুলিও গুহ্য সাধন রীতিস্বরূপ সাধারণের অজ্ঞাত ছিল, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূল সুর দৈবনির্ভরতা এবং দৈবানুগ্রহ—মানবিকতা গৌণ—কাহারো মুখের বোল নহে, তাঃ সমালোচক যদি মূল পুঁথিগুলি পাঠ করিতেন তবে সমস্তই বুঝিতে পারিতেন। চাঁদ সদাগরের পৌরুষের মূল্য কতখানি দেওয়া হইয়াছে? লাউসেন কোন শক্তিতে শক্তিমান? বেহুলার মধ্যে অলৌকিকতা কতটুকু? এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের প্রধান চরিত্রগুলিকে ঠাস্ করিয়া চড় মারিলে, আমার বিশ্বাস, তাহারা ভ্যা-ও করিবে না, ভোঁ-ও করিবে না, তবে চপেটাঘাত অধিক হইলে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে পারে। প্রবন্ধের সমালোচক লিখিয়াছেন, 'আর একটি কবিতা 'অন্নদাপাটনী-সংবাদ'—অর্থাৎ 'কবিতা'! তাঁহার মানসনেত্রে বোধকরি প্রবেশিকা-পাঠ্যপুস্তক তখন ভাসিতেছিল। নাতিবিস্তরেণ।

বাংলা-সাহিত্যের ঐ প্রাচীন প্রকোষ্ঠে যে দেব-দেবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গণনা করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই কোনও অতীন্দ্রিয় লোকের ধ্যানলভ্য নহেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের শিবমহেশ্বর শিবায়ন্ কাব্যে পরদারলোলুপ। কোঁচপাড়ার কোঁচ নারীর সংসর্গে দিনাতিপাত করেন, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী অকারণে মানুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, অকারণে অনুগ্রহ করেন—নির্য্যাতনই তাঁহার যেন স্বভাবধর্ম্ম, বৈষ্ণব কাব্যোপাখ্যানের কায়াকল্পে আভীর পল্লীর লাম্পট্য, অবশ্য পরবর্ত্তীকালে সুন্দরতীর্থের স্বপ্ন-সমারোহে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি কেন, কোন 'নেড়ানেড়ী'ই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তশ্চৈতন্যে জনজীবনের প্রতিভাস রূপগ্রহণ করিয়াছে। তাহা দেখানো আমার উদ্দেশ্যই নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার আলোচনার কালানুক্রমিকতার হিসাব ঐতিহাসিকতার রূপবিন্যাস এবং সামগ্রিকতার সর্ব্ববিধ মূল্য নাই, কোনও বৈতথ্য নাই, তত্ত্বেরও ত্রুটি দেখি না। প্রবন্ধের সমালোচক আরও কয়েকবার ঐ প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিলে আমি কৃতার্থ হইব; তথাপি আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এই হিসাবে যে তিনি আমাকে বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিয়া বিশ্ববাণীর আর একটি সংখ্যাপূরণের সুযোগ দিয়াছেন, বন্ধুর কর্ত্তব্যই করিয়াছেন; কারণ—

"Criticism is not only medicinally salutary: it has positive popular attractions in its cruelty, its gladiatorship and the gratification given to envy its attacks on the great and to enthusiasm by its praises. • • • Its iconoclasms, seditions and blasphemies, if well turned, tickle those whom they shock".—(Bernard Shaw)*

* এ সম্বন্ধে বাদানুবাদমূলক আর কোনও প্রবন্ধ বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত হইবে না। ইতি—সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

শিব, বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন—অথবা বিষ্ণুই সর্ব্বস্ব, শিব কিছুই নহেন' তাহাও নহে। এক ভগবানকেই কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু আবার অপরে অন্যান্য নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন কিন্তু বস্তু এক। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—(ঋগ্বেদ)—একমাত্র সত্তাই আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। জগতে যতটুকু পরধর্ম্মে বিদ্বেষ-সাহিত্য ও ধর্ম্মভাবের সহিত সহানুভূতি আছে, কার্য্যতঃ তাহা এই ভারতবর্ষেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই।

·· তখনই তোমার ভক্তি এবং তোমার শিবদর্শন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, যখন তুমি শুধু তাঁহাকে কেবল শিবলিঙ্গে দেখিবে তাহা নহে, সর্ব্বত্র দেখিবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিয়া থাকেন।···সেই মূল সত্য আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবল-মাত্র আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে—জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে।

—বিবেকানন্দ

মলিকিউল

শ্রীমুরলী মোহন বিশ্বাস এম্. এস সি.

আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রত্যেকটি পদার্থ—গাছপালা ফুলফল, পশুপক্ষী, পোকা মাকড়, ঘরবাড়ী, আসবাব-পত্র, এমনকি আমাদের শরীরও তৈরী হয়েছে মিলিয়ন্ মিলিয়ন্ ও বিলিয়ন্, বিলিয়ন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে। এই কণিকারা এতই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে, কেও কোনদিনই যত ভাল করেই দেখুক, তা দেখতে পাবে না। জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপও এদের অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়নি। অথচ এই কণিকারাই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর উপাদান। নদ-নদী, হ্রদ, সমুদ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, নীল আকাশ, বিশাল পর্ব্বত, বিস্তৃত প্রান্তর, মহানগরী সুরম্য অট্টালিকা, দিগন্তব্যাপী কৃষিক্ষেত্র সমস্তই রূপ পেয়েছে, এই অদৃশ্যমান ক্ষুদ্র কণিকাদের সন্নিবেশে। দু'চোখে যা দেখ্‌ছি, মুখ দিয়ে যা খাচ্ছি, নাক দিয়ে যা ঘ্রাণ নিচ্ছি, কান দিয়ে যা শুন্‌ছি, হাত দিয়ে যা স্পর্শ কর্‌ছি—সব কিছুরই অন্তরালে এই কণিকারা বিরাজমান। এরা হচ্ছে 'মলিকিউল' বা অণু।

পদার্থের তুলনায় এই অণুরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র; কত ক্ষুদ্র, তা কল্পনা করাই অসম্ভব। একটি বালিকণার মধ্যে ১০০০০০০০০০০-র ও অনেক বেশী অণু রয়েছে। পৃথিবী তার বক্ষে এক একটি লোককে যে আকারে দেখে, যদি একটি বালিকণা দেখ্‌তে ও বুঝ্‌তে পারত তবে সে তার অন্তরের এক একটি 'মলিকিউল'কে ঠিক সেই আকারেই দেখ্‌ত।

এই মিলিয়ন্, মিলিয়ন্ মলিকিউলরা পদার্থের মধ্যে শান্তশিষ্ট ছেলেদের মত স্থির হয়ে নাই। তারা সকল সময়েই ব্যস্ত; পদার্থের মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি, লাফালাফি ও মারামারি করছে। কখনও খুব ধীরে, কখনও বা ভীষণ দ্রুত গতিতে। যে শক্ত কাঠের চেয়ারে আমরা বসি তার মধ্যেও চল্‌ছে অণুদের এই হুরন্তপনা। অথচ চেয়ারের গণ্ডী ছেড়ে তারা বাইরে যাচ্ছে না বা ছিট্‌কেও পড়ছে না। এসব তাজ্জব লাগলেও আজব নয়। নিছক সত্য, পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। মলিকিউলদের এরূপ ক্রিয়াকলাপ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে; কিন্তু উপমা দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। মনে করা যাক্, কয়েক বর্গমাইল জায়গায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হল। এই জনতাকে কয়েক শত মাইল উপরে এরোপ্লেন হতে দেখা হতে লাগল। দেখা যাবে একটি ছোট জায়গায় একটি কাল মত রাগ। প্লেন হতে একে অন্যকে মোটেই পৃথক দেখা যাবে না। অথচ জনতার মধ্যে তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে চলাফেরা করছে, কেও হয়ত খাচ্ছে সিগারেট, কেও কথা বলছে, কেও হাসছে; আমরা প্লেন হতে তা কিছুই বুঝতে পারব না; বুঝা যাবে যখনই আমরা উপর হতে নীচে নেমে জনতার মধ্যে মিশব। পদার্থের মলিকিউলদের পক্ষেও তাই। আমরা প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিষ দেখছি, হাত দিয়ে নাড়া চাড়া করছি তবুও তাদের মলিকিউলরা আমাদের নিকট হতে এতই দূরে ও আমাদের তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে তাদের গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ আমাদের গোচরী-ভূত হচ্ছে না। যদি কেও আলাদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ দ্বারা মলিকিউলদের মতই ছোট হয়ে পদার্থের মধ্যে তাদের ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে তবেই সে তাদের গতিবিধি বুঝ্‌তে পারবে।

তরল পদার্থের মধ্যে মলিকিউলদের এইরূপ খেলা সহজেই বুঝা যায়। এক গ্লাস জলে একটু নীল কালী ফেল্‌লে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে, গ্লাসের সমস্ত জল নীল রংএ রাঙ্গা হয়ে গেছে। নীল কালীর

অদৃশ্যমান মলিকিউলগুলি জলের অদৃশ্যমান মলিকিউলদের সঙ্গে পরস্পর সংঘর্ষে সমস্ত গ্লাসে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরূপে সিগারেটের ধোঁয়া কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ধোঁয়ার মলিকিউলরা বায়ুর মলিকিউলদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে বহুদূরে চলে যায়। কঠিন পদার্থের মধ্যেও অণুদের এরূপ গতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রত্যেক পদার্থের মলিকিউলই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষুদ্রতম অংশ। জলের একটি মলিকিউল সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জলবিন্দু। পাউরুটি বা বিস্কুটের একটি মলিকিউল সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পাউরুটি বা বিস্কুট টুকরো। জলের একটি মলিকিউল দুভাগে ভাঙবার চেষ্টা করলে জলের একটি অর্ধেক মলিকিউল পাওয়া যাবে না। তা ভাঙলে তাতে আর জলের কোন সত্তাই থাকবে না। চকলেট বা বিস্কুটের একটি মলিকিউল ভাঙলে আর চকলেট বা বিস্কুট পাওয়া যাবে না। যেমন মোটরের একটি ইঞ্জিনকে ভেঙে ফেললে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ পড়ে থাকে; তার কোন বিশিষ্ট অংশকে তখন আর ইঞ্জিন বলা চলে না কেন না বিভিন্ন অংশের সুসংবদ্ধ সন্নিবেশেই ইঞ্জিনের ইঞ্জিনত্ব পরিস্ফুট হয়। জলের একটি মলিকিউল বা অণুকে ভাঙলে পাওয়া যাবে দুটী হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কোনটাই জলের মত নয়—গ্যাস মাত্র। কিন্তু জল তরল পদার্থ। হাইড্রোজেন বাতাসে জ্বলে; বায়ু হ'তে নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের ফুসফুস অক্সিজেন গ্রহণ করে; এই অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু জল ফুসফুসের পক্ষে ক্ষতিকর। মানুষ জলে ডুবে মরে যখন অধিক পরিমাণে এই জল ফুসফুসে জমা হয়।

ছত্রিশ হাজার বৎসরের প্রাচীন বৃক্ষখণ্ড

রয়টারের জনৈক প্রতিনিধি অকল্যাণ্ড (নিউজিল্যাণ্ড) হইতে সোমবার ১৪ই মে ১৯৫৬ তারিখের একটি সংবাদে জানাইতেছেন—

নিউজিল্যাণ্ডের ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরীর পরিচালকবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছেন—তাঁহারা একটি অতি প্রাচীন কালের বৃক্ষখণ্ড (কাষ্ঠ) আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কাষ্ঠটির প্রাচীনত্ব নাকি পৃথিবীর যেকোনও দেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন বস্তুর অপেক্ষা অনেক শত বৎসরেরও অধিক। এই কাষ্ঠখণ্ডটি দেখিয়া এখানকার পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—ইহার সময় ছত্রিশ হাজার বৎসরের পুরাতন।

নিউজিল্যাণ্ডের ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর অন্যতম অধ্যাপক এখানে কোনও এক বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সের সভায় বলিয়াছেন—রেডিও কার্বনিক নির্ণায়ক পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা ইহার শরীরগত কার্বন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্তির কারণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

এই ল্যাবরেটরীতে ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া স্পেন এবং সিরিয়া হইতে প্রাক্ ঐতিহাসিক কালের আবিষ্কৃত অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐসমস্ত সংগৃহীত দ্রব্যগুলি নিউজিল্যাণ্ড-এর বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণার প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য অধ্যাপকেরা আনিয়া থাকেন।

সংঘ-বার্তা

বিশেষ পূজা—আগামী ৬ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই রবিবার গুরুপূর্ণিমা ও ১৯শে শ্রাবণ ৫ঠা আগষ্ট, শনিবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথি দিবস। উক্ত দুই দিবসে মধ্যাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে।

ধর্মালোচনা—প্রত্যেক সপ্তাহে প্রতি সোমবার হইতে শুক্রবার ক্রমান্বয়ে পাঁচদিন পণ্ডিত শ্রীযুত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য, সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ মহাশয় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যা সাতটা হইতে একঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রতি অধিবেশনে দেড়শতাধিক নরনারী নিবিষ্ট চিত্তে পণ্ডিত মহাশয়ের অপূর্ব শাস্ত্র ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন।

শ্রীরামলাল সংকীর্তনাদি—প্রতি শনিবার সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ বেলা তিনটা হইতে দেড়ঘণ্টা যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে শ্রীরামনামকীর্তন ও বিবিধ ভজন গান করেন। ইহার পর সাধারণতঃ সন্ধ্যা ৭টা হইতে একঘণ্টা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সাড়ে আটটা পর্যন্ত শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে "রাম-ভরসা" কীর্তন করিয়াছিলেন।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধপূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে এখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও ভগবান তথাগতের বিশেষ পূজা হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথকতা—প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কথকশিরোমণি মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত" হইতে কথকতা করিতেছেন।

বিশ্ববাণীর প্রচ্ছদপট পরিচয়

বিশ্ববাণীর অষ্টাদশবর্ষের প্রচ্ছদপটের অষ্টমূর্তির কয়েকটি নাম বুঝিতে না পারিয়া গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ঐগুলি জানিবার জন্য পত্র দিতেছেন। প্রত্যেককে পৃথক পৃথক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্ববাণীর মারফৎ প্রচ্ছদপটের মূর্তিগুলির নাম জানান হইল।

প্রচ্ছদপটখানি ত্রিভাবার। বইখানি সোজাভাবে ধরিলে দেখা যাইবে শীর্ষদেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সমাধিমগ্ন দিব্যমূর্তি। এই মূর্তির বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধদেব, জরথুস্ত্র বা জোরোয়াস্তার (পারসী জাতির প্রবর্তক), ঋষি লাউৎসে, (চীন দেশের অন্যতম ধর্ম প্রবর্তক), গুরু নানক (শিখধর্মের প্রবর্তক), যিশুখৃষ্ট (খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তক), তারপর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের দিব্যমূর্তি।

স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য চারিটাকা

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; ফোন—৫৬৭৮৫ ১৮০৫

সম্পাদক স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বলরামকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭০, মাণিক তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—শ্রাবণ, ১৩৬৩

সূচীপত্র

১।	রামেশ্বরম্ তীর্থপথে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১৩৩
২।	যাবৎ জ্ঞান না হয় তাবৎ কর্ম্ম	উমাপদ মুখোপাধ্যায়	২৫১
৩।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	শ্রীতামসরঞ্জন রায়	২৫৮
৪।	রতিই ভক্তির স্থায়ীভাব	শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৬
৫।	বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান	শ্রীহাসমোহন চক্রবর্ত্তী	২৬৯
৬।	ভালবাসি এ জীবনখানি (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাশ	২৭২
৭।	অভাব	শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	২৫৩

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৮, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৪ (৪ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন দালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

৮।	চলার পথে	শ্রীপথিক	২৫৭
৯।	যোগের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ	... শ্রীপরিমলচন্দ্র কর	২৬২
১০।	রবীন্দ্রনাথের প্রতি (কবিতা)	.... শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী	২৬৭
১১।	আজকের সাহিত্য	.... শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৫
১২।	লহ হে লহ নমঃ (কবিতা)	সচ্চিদানন্দ সান্যাল	২৭০
১৩।	গ্রন্থ-সমালোচনা	...	২৭১
১৪।	আপার বাণী (কবিতা)	... রবজিৎ গুহ কাব্য-ভারতী	২৭২
১৫।	সংঘ-বার্ত্তা		২৭২

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, যাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END - FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ, বসু, এণ্ড কোং (ডেকরেটর্স)

৫২নং ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

ফোন :—বড়বাজার ১৬২৫

বিশ্ববাণী

অষ্টাদশ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৬৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

রামেশ্বরম্ তীর্থপথে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারতের শেষ প্রান্তে পাম্বান সেতু হোতে হেরিলাম যেন
মহাসাগরের সাথে উপসাগরের মিলনের মোহানায়,
শত শত শ্বেত পরী তরঙ্গ দোলায় দুলে সঙ্গীত শোনায়
অনন্তকালের সুরে ধরি ঐক্যতান।

রঘুবীর হেথা এসে
রেখে গেছে সংখ্যাতীত শৈলখণ্ড সেতুবন্ধ করি ত্রেতাযুগে,
আজো তার ইতিহাস পক্ক-প্রণালীর কোলে মানবের বুকে,
অবচ্ছিন্ন স্মৃতিপূর্ণ লয়ে।

ধ্যান-মৌন ভারত-সাগর শোভে
অঙ্কে তার বঙ্গোপসাগর যেন বিদ্রোহীর মত কদ্ররোষে
নভোচুম্বী ঊর্মি লয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে আর ওঠে সদা ক্ষোভে
সাগরসঙ্গম মুখে। অতীতের কত কথা ভাবিতেছি বসে !!

ওপারে শ্যামল দ্বীপ,—এপারে ভারতবর্ষ।

যোগসূত্ররূপে—
উন্মত্ত জলধিবক্ষে ক্ষুদ্র-দীর্ঘ সেতু শোভে আবরণহীন ;
মাতৃস্নেহস্পর্শসম শীতল শীকরসিক্ত বায়ু প্রতিদিন
বহে, আর আনন্দের অনুভূতি যায় রেখে।

পুষ্পগন্ধধূপে
করিছে অর্চ্চনা সিন্ধু স্তবমন্ত্রে ধ্যানাতীত সেই দেবতারে —
লীলা যার সীমাহীন,—ভূমার ভিতরে আর চৈতন্যের পারে।

স্রোতে আবর্ত্তিত শত শিলাতূপ গেছে ক্ষয় হয়ে দিনে দিনে,
বন্ধন মোচন করি জলধিরে করি আশীর্ব্বাদ গেছে চলে
রঘুনাথ। মারুতির মহোল্লাস আজো যেন সিন্ধু-রল-রোলে
শোনা যায় অবিরল।
হেথা কি বিজয়া হোলো অকালে আশ্বিনে?
ট্রেণ চলে ধীরে ধীরে পামবান পার হয়ে সৈকত-অংসনে,
রামেশ্বর তীর্থযাত্রা শঙ্করের আরতনে ক্ষুদ্র দ্বীপ মাঝে:
যাত্রা মোর রামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গময় বিগ্রহের কাছে
শ্যামল দ্বীপের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবাচ্ছন্ন দেব দরশনে।
নারিকেল তালীকুঞ্জে গৌরাঙ্গ প্রভুর স্মৃতি ধ্বনিতেছে সদা,
বিশ্ব-চিত্তজয়ী বীর সন্ন্যাসী বিবেক স্বামী এসেছে একদা॥

পূর্ব্বঘাট শৈলশ্রেণী পশ্চিমঘাটের তুঙ্গ গিরিদরী হোতে
দ্রাবিড় সভ্যতা আর শিল্পকলা নিদর্শন হেরিলাম কত!
সুদূর সিংহল মোরে দিল আমন্ত্রণ।
উপকূলে অবিরত
দারুচিনি বীথিকার গন্ধ আসে ভেসে।
বাষ্পতরী দোলে স্রোতে,
লঙ্কার সমাধি-ক্ষেত্র সাগরের মহাগর্ভে; অশোক-কানন
জীবন্মৃতরূপে রাজে সিংহলের নাম ধরি—নাহিক রাবণ!!

যৌবন-উন্মদ সিন্ধু অনন্ত পরিধি লয়ে করে প্রদক্ষিণ,
উত্তুঙ্গ মন্দির মাঝে সত্য-শিব-সুন্দরের বৈশাখন লীলা
জীবনে প্রত্যক্ষ হোলো প্রথম আমার।
আজ আয়ু-সূর্য্য ক্ষীণ,
দিগন্তে পড়েছে হেলে। সিন্ধুবক্ষে অস্ত যায় রবি।
নৃত্যশীলা
নীলসিন্ধু নীলাকাশ হয়ে গেছে এক। হে শঙ্কর! ডাক মোরে
মায়া হোতে মায়াতীত মহাশূন্যে জীবন্মুক্ত ক'রে।

যাবৎ জ্ঞান না হয় তাবৎ কর্ম্ম

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে প্রত্যেক মানুষকেই কর্ম্ম করতে হয়। দেহ ধারণ ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না। কর্ম্ম আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে দেয়। একটী মানুষ আজীবন নানা কর্ম্ম সম্পাদনের ফলে জীবন-সাহাহে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। কর্ম্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্যে জন্য-জনক সম্বন্ধ। অভিজ্ঞতা জন্য-পদার্থ এবং কর্ম্ম তাহার জনক। মানুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটী গুণ দ্বারা আবদ্ধ। তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তির জীবনে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা এবং কর্ম্মে বিতৃষ্ণার আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিই কর্ম্মতৎপর। প্রবল কর্ম্মাসক্তি তাহাকে সংসারে বদ্ধ করে। তাহার প্রকৃতিতে রজোগুণাধিক্যের হেতুটী তার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার। মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে বর্ত্তমান জন্মে তার প্রকৃতি গঠিত হয়। সাধারণতঃ এইরূপ বলা হয় মানুষ দৈবাধীন; কিন্তু দৈব আর কিছুই নহে, উহা জন্মান্তরীণ বা প্রাক্তন পুরুষকার। পুরুষকারের ফলে যদি পূর্ব্বজীবনে মানুষের প্রকৃতিগঠন সম্ভব হয় ত বর্ত্তমান জন্মের পুরুষকার বা কর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্বের অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মলব্ধ প্রকৃতির সংস্কার সাধন করা অবশ্যই সম্ভব। মানুষের অন্তঃকরণের অহং-বৃত্তি যতক্ষণ কার্য্যকরী থাকে, ততক্ষণ সে কর্ম্মপরায়ণ হবেই এবং তার মনের সু বা কুবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে সে হয় সুকাজ না হয় কুকাজে রত হবে। এই সৎ বা অসৎ কাজ তার বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কৃতকর্ম্মের সংস্কার তার চিত্তে থেকে যায় ব'লে সে ঐ স্মৃতি বা সংস্কারের বশে হয় সৎকর্ম্ম-পরায়ণ বা হয় অসৎকর্ম্ম-পরায়ণ হয়। মানুষের মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের সমষ্টিকে অন্তঃকরণ বলে। মানুষের বর্ত্তমান জীবনের কার্য্যাবলি যেমন পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল, সেইরূপ বর্ত্তমান জীবনে অর্জ্জিত সংস্কার আবার তার ভবিষ্যৎ জীবনের কারণ। এইরূপ জন্মজন্মান্তর ধ'রে কার্য্য করতে করতে মানুষের মন ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার-স্বরূপ হয়ে থাকে।

মানুষ সাধারণতঃ অহং বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে কাজ করে বটে, কিন্তু সে যে আর একটী প্রবল শক্তি দ্বারা পরিচালিত হ'চ্ছে তা সে অজ্ঞানবশতঃ বুঝতে পারে না। মানুষ যদি সংসারকে বাস্তব মনে করে তা হ'লে তার ইহাও জানা উচিত যে এক মহাশক্তি এই সংসারকে পরিচালনা কচ্ছেন। সেই মহাশক্তির এক এক বিন্দু প্রতি মানুষকে, প্রত্যেক জীবজন্তুকে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা প্রভৃতিকে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রেখেছেন। তিনিই মানুষের মধ্যে অহং রেখে দিয়েছেন, যার জন্য সে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। পুত্তলিকার নৃত্য দেখে শিশু যেমন মনে করে উহা আপনাআপনিই নৃত্য করছে সে উহার পশ্চাতে যে অদৃশ্য হস্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারেনা, অজ্ঞান মানুষও সেইরূপ মনে করে যে সে স্বয়ংই সমুদয় কর্ম্মের কর্ত্তা,—তার পশ্চাতে যে সংসার-নাট্যের একমাত্র অধিকারিণী মহাশক্তির হস্ত আর অলক্ষ্যে তাকে দিয়ে নানাবিধ অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন, তা সে কিছুতে বুঝতে পারে না। সেই মহাশক্তিই ভ্রান্তি রূপে সকল মানুষের মধ্যে বর্ত্তমানা। যেহেতু মানুষ নিজেকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে এই জন্য সে ঐ কর্ম্মের সু ও কুফল ভোগ করে। সংসার এমনই একটা রঙ্গমঞ্চ যে এখানে শুধু 'সু' বা শুধু 'কু'-র অভিনয় হ'তে পারে না। উহার একটীকে বাদ দিলে অপরটী বুদ্ধিরই অগোচর থেকে যাবে। এই দুই প্রকার অভিনয়েরই আবশ্যকতা আছে। মানুষ ক্রমশঃ এই বুদ্ধিতে আসে যে 'কু'র অভিনয়ে মানুষকে তার

অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবেই, আর স্থূল অভিনয়ে যদি ওরা কিছু সুখ পায় বটে, কিন্তু উহা ত তাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দিতে পারে না। মানুষের প্রাণ কিন্তু চায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ, শাশ্বত আনন্দ ও অনন্ত শান্তি। এই শান্তি ও আনন্দ সে কিরূপে লাভ করতে পারবে এই চিন্তাই তখন তার মনকে অধিকার ক'রে বসে।

প্রথমতঃ সে মনে করে যে কর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপ ত্যাগ করতে পারলেই বুঝি উহার ফল ভোগ আর তাকে করতে হবে না এবং তখন সে অনাবিল আনন্দের অধিকারী হবে। কিন্তু যতদিন না তার চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হ'চ্ছে ততদিন তাকে কর্ম্ম করতেই হবে। কর্ম্মের বিধান অনুসারে তাকে তার নিত্যকর্ম এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করতেই হবে। মানুষ মনে করে জ্ঞানীব্যক্তিগণ ত কর্ম্ম করেন না, অতএব আমি ও কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে জ্ঞানী হই না কেন। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন আত্মজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কোন কর্ম্মের বিধান নাই সত্য, কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করলেই আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না। মনে নানা বাসনা কামনা বাসা বেঁধেছে, কর্ম্মদ্বারা তাদের আশ্রয় ভাঙতে হবে। মন যখন সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত হবে তখনই কর্ম্মত্যাগের অধিকার লাভ করা যায়; তৎপূর্ব্বে নয়। বাসনার আশ্রয় ভাঙার অর্থ যতদূর সম্ভব সেইগুলিকে পূর্ণ করে লওয়া এবং অসম্ভব গুলিকে বিচার দ্বারা বর্জ্জন করা। এই দিক থেকে বিচার করলে বুঝা যায় যে চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য কর্ম্ম করা প্রয়োজন। আমের খোসাটা নিষ্প্রয়োজন বটে, কিন্তু যদি অপক্ক অবস্থায় খোসাটীকে বাদ দেওয়া যায় ত আমটী যেমন আর বাড়তে পারে না ও উহা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, সেইরূপ পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায় কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন হ'লেও যতদিন না উহা লাভ হয়, ততদিন কর্ম্মকে বাদ দেওয়া যেতে পারে না। অজ্ঞান অবস্থায় সাত্ত্বিকতার জন্যে কর্ম্ম ত্যাগ করলে জীবনটী নষ্টই হ'য়ে যাবে। মানুষের মন স্বভাবতঃই জলের ন্যায় নিম্নগামী। সৎকর্ম্ম দ্বারা নিম্নমুখী মনকে ঊর্দ্ধমুখী করা যায়। কর্ম্ম ত্যাগ করলে মন জ্ঞানলাভের যোগ্যতা লাভ করতে পারবে না এবং জ্ঞানলাভ না হ'লে মনের শুদ্ধতা সম্পাদনও সম্ভব হবে না। তবে কি কি কর্ম্ম মানুষকে করতে হবে ও কর্ম্ম করার কৌশলটীই-বা কি ইহাও তাহার পক্ষে জানা আবশ্যক।

মানুষকে তার জীবনধারণোপযোগী যে কর্ম্ম তাহার পেশারূপে নির্ব্বাচিত, সেই কর্ম্ম সৎ পথে থেকে নিষ্পন্ন করতে হবে। পরার্থে দানাদি কর্ম্ম, জনসেবা এবং তপস্যাদি কর্ম্ম ও তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। এই সকল কর্ম্ম মানুষের চিত্তশুদ্ধিকর। প্রত্যেক সৎ কর্ম্মই যেন ঈশ্বরের পূজাস্বরূপ এইরূপ স্থির ধারণা মনে থাকা আবশ্যক। মানুষের কর্ম্মেই অধিকার আছে, কর্ম্মফলে তার অধিকার নেই, এইরূপভাবে ফলাকাঙ্খাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম করতে থাকলে কর্ম্ম তার বন্ধনের কারণ হবে না। কর্ম্মসম্পাদনে যদি মানুষের কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্খা থাকে ত উহা তার বন্ধনেরই কারণ হবে। কর্ম্মে সিদ্ধি বা বিফলতা উভয় অবস্থাতেই যদি কোন মানুষের মন অচঞ্চল থাকে, তখন বুঝতে হবে যে এই মানুষের আর সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি নেই এবং ইহার মন বিশুদ্ধ হ'য়েছে। যে ব্যক্তির মন যখন বিশুদ্ধ হয় তখন সাংসারিক জয়-পরাজয়ে উহা নির্ব্বিকার থাকে এবং তখন বুঝা যায় যে ঐ ব্যক্তি বৈরাগ্যের অধিকারী হ'য়েছে। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির কোন কর্ম্মফলে আসক্তি থাকেনা, সে কোন্‌টী নিত্যবস্তু ও কোন্‌টী অনিত্য তাহা বিচার করতে সক্ষমতা লাভ করে, জাগতিক বিষয়ের ভোগে তার কোন আসক্তি থাকে না। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির মন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্দ্ধারণে সক্ষম হয় এবং এইজন্য সে তার জীবনের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য উহা হৃদয়ঙ্গম ক'রে তাহা সিদ্ধির জন্য চেষ্টাপরায়ণ হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় সংসারে মায়াবদ্ধ মানুষের সংখ্যাই বেশী, তারা সংসারের সুখকে জীবনের একমাত্র কাম্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে করে ও তাহা লাভেই তাদের সমুদয় মন ও শক্তি ব্যয়িত হয়; জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তার সূক্ষ্ম মন দ্বারা

বুঝতে পারে যে—মুক্তি বা পূর্ণজ্ঞানলাভ ভিন্ন মানুষের জীবনধারণের আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। প্রবন্ধের শিরোনামাটী দেশগৌরব ও জাতির জনক পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ কথিত একটী বাণী। এতক্ষণে আমরা এই বাণীটীর মর্ম্মস্থলে প্রবেশ লাভ করলাম। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ জ্ঞানলাভ না করতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত যে তাকে কর্ম্মযোগী থাকতেই হবে তাহা দেখান হয়েছে। অবিদ্বান বা অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগের আচরণের ফলে যখন মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে, তখন সে হয় মুমুক্ষু।

মুমুক্ষু ব্যক্তি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে এমন এক অবস্থায় আসেন যখন কর্ম্ম তাঁকেই পরিত্যাগ করে যায়; তিনি তখন কর্ম্মত্যাগী, তাঁর তখন আর কোন করণীয় কর্ম্ম থাকে না। এই অবস্থায় তিনি হন জ্ঞানী, আত্মতৃপ্ত। গীতায় আছে :

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ৩।১৭

সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত। জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত ক'রে থাকে। অর্থাৎ মানুষ যখন জ্ঞানলাভ করে তখন তার সমুদয় সঞ্চিত কর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায়। তবে প্রারব্ধ কর্ম্ম যতদিন থাকে ততদিন তার ফলে তাকে সংসারে জীবিত থাকতে হবে ও সুখদুঃখ ভোগ করতে হবে। কারণ প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা পবিত্রতর আর কিছুই নেই, উহাই মোক্ষের অর্থাৎ পরমশান্তির নিদান। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যিনি জীবন্মুক্ত তিনি কর্ম্ম করলেও উহা কোন ফল উৎপাদন করে না, এবং তিনি কোনরূপ কর্ম্ম না করলেও কোন প্রত্যবায় হয় না। জগতে তাঁর আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না। তিনি তখন সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী পূর্ণসন্ন্যাসস্বরূপ। জগতের অনুকূল বা প্রতিকূল কোন অবস্থাই তাঁর চিত্ত-প্রশান্তিকে নষ্ট করতে পারে না।

তবে জ্ঞানের অধিকারী এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের সংখ্যা সংসারে বড় কম। যে কয়েক জন আসেন, তাঁদের কোন কর্ত্তব্য না থাকলেও তাঁদের একটী কাজ থাকে—উহা জীব উদ্ধার। তাঁদের প্রাণে সংসারের দুঃখকষ্টে ক্লিষ্ট মানবগণের জন্য একটা করুণার উৎস হয়। ঐ করুণার হিল্লোল যতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় ততদূর পর্য্যন্ত স্থানের ভাগ্যবান সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ তাঁদের শ্রীচরণতলে সমবেত হন ও উক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ গুরুরূপে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন ও তাঁহাদিগকে ভবসমুদ্র হ'তে উদ্ধারের সমুদয় ভার স্বেচ্ছায় ও করুণায় গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই একটী নিয়ম। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের পরম আদরের সন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পরমারাধ্য স্বামী শিবানন্দ মহাপুরুষ মহারাজজীকে একদিন জনৈক ভক্ত তাঁর শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, "শরীর, আর বাবা, থাকাথাকি কি? ঠাকুর ঘোড়া-তাড়া দিয়ে এক প্রকার চালিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের আর ত সংসারের কোন কর্ত্তব্য নেই, কোন কাজও নেই···কোন বাসনাই নেই। তিনি মালিক, তিনি তাঁর কাজের জন্য শরীর যে কয়দিন রাখবেন তিনিই জানেন।" এই উক্তি হ'তে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যে, সমস্ত কর্ত্তব্যের পারে চ'লে যান, তা বুঝা যায় এবং তাঁর কাজ অর্থে জীব-উদ্ধার রূপ কাজ। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "ঠাকুরের চরণে যারা আত্মসমর্পণ করেছে, যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাদের মুক্তির ভাবনা নেই। মুক্তি তাদের হ'য়ে যাবে। সে ভার আমাদের উপর আমরা তা বুঝে নেব।···ঠাকুর যাদের কৃপা করেছিলেন তাদের ত কথাই নেই, তাঁর সন্তানেরাও যাদের কৃপা করেছেন তাদের মুক্তি নিশ্চিত।" এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণ যাঁরা জীবকে মুক্তি দিতে সক্ষম তাঁরা জগতের অলঙ্কার স্বরূপ, জীবের আশা-ভরসাস্থল। এঁরা বৈরাগ্যের মূর্ত্তিস্বরূপ, জ্ঞানের প্রকটবিগ্রহস্বরূপ ও আনন্দের ঘনীভূত প্রতিমা-স্বরূপ।

এই সমুন্নত অবস্থার মূলে কর্ম্ম। কর্ম্মযোগের দ্বারা ক্রমশঃ মানুষ এই পূর্ণপ্রজ্ঞের স্তরে উন্নীত হয়। শুদ্ধজ্ঞানে কর্ম্মের প্রবেশাধিকার না থাকলেও জ্ঞান বিকাশের জন্য উহার সহায়তা অপরিহার্য্য এবং উহা চিত্তশুদ্ধির উপায়। তবে একর্ম্ম হবে নিষ্কাম কর্ম্ম। উপসংহারে প্রার্থনা করি সকল কর্ম্মের মূলে যে মহাশক্তি সেই মহামায়া আমাদিগকে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করবার সামর্থ্য ও পরিশেষে পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণানন্দ দান ক'রে আমাদের মানবজীবন ধারণের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীতাপস রঞ্জন রায়

সন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার এক নগণ্য জনপদে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্ম হইয়াছিল। গৃহাশ্রমে 'শশীভূষণ' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন এবং শক্তিমন্ত্রের সাধক তদীয় পিতৃদেবের ভগবদ্বিশ্বাস ও ধর্মানুরাগ তাঁহার শৈশব-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জন্মান্তর আধ্যাত্মিক প্রেরণার সহিত বংশগত ধর্মসংস্কার অনতিক্রান্ত শৈশবেই শশীভূষণকে ভগবান লাভে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে এবং কলেজের পাঠ্য-জীবনে মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গণিতে ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার পারিদর্শিতা শিক্ষকবর্গের নিকট তাঁহাকে প্রিয় ছাত্ররূপে পরিগণিত করিয়াছিল। ঘটনাচক্রে ছাত্রজীবনের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গৃহে তদীয় পুত্রকন্যাদিগের গৃহশিক্ষকের কাজও শশীভূষণকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং সেই সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য পরিবেশও তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত, গৃহে নিজের ভাবে 'বাইবেল', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ এবং নির্জনে ধ্যানাভ্যাস—এই সকলের মধ্য দিয়া শশীভূষণের সহজাত ধর্মপিপাসা কিশোর বয়সেই বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং ভগবান লাভের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে নিরতিশয় চঞ্চল করিয়াছিল। ফলে, ব্রাহ্মসমাজেরই অনেকের মুখে দক্ষিণেশ্বরের পাগলপূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবন-কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য শশীভূষণ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, শরৎ-হেমন্তের মধুর সন্ধিক্ষণদিনে ভ্রাতা শরৎচন্দ্র সমভিব্যাহারে শশীভূষণ প্রথম দক্ষিণেশ্বর গমন করিয়াছিলেন। আর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও উল্লসিত বদনে ঘনিষ্ঠ পূর্ব-পরিচিতের ন্যায় শরৎচন্দ্র ও শশীভূষণকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজের অন্তরঙ্গ চিহ্নিত-ভক্ত জানিয়া স্বপার্ষদ প্রেমে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শশীভূষণকে প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সাকার অথবা নিরাকার—ভগবানের কোন্ ভাবে তাঁহার বিশ্বাস আছে। নিজ অন্তরের দিকে চাহিয়া শশীভূষণ তখন উত্তরে বলিয়াছিলেন—'ভগবানের উপলব্ধি এখনো আমার হয় নাই সুতরাং সাকার অথবা নিরাকার ইহার কোনটিরই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমার কিছু বলিবার নাই।' যুবকের অকপট উক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণানন্দের প্রথম মিলন এইভাবেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগোজ্জ্বল দিব্যজীবন শশীভূষণের অধ্যাত্মমানসে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ফলে, অতিঅল্পকাল মধ্যেই তাঁহার দর্শনলাভ-আশায় শশীভূষণ দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় দর্শন তাঁহাকে পুনঃ তৃতীয় দর্শনে আগ্রহান্বিত করিয়াছিল। এইরূপ কয়েকবার দর্শন ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে তদীয় জীবনে অত্যন্ত দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। কলেজের পুঁথিগত বিদ্যালাভের আকর্ষণ অপসৃত হইয়া ভগবান লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়াছিল। এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এবিষয়ে তাঁহাকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। ঘটনাটি এখানে বিবৃত করি।...সেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠের নিকটবর্তী কোনস্থানে বসিয়া একটি পার্শী-গ্রন্থ অধ্যয়নে শশীভূষণ নিরত

ছিলেন এবং গ্রন্থপাঠে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কয়েকবার আহ্বান করিলেও তাহা শুনিতে পান নাই। পরে যখন ঐ কথা জানিতে পারিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন সকল কথা শুনিয়া শান্তস্বরে ঠাকুর বলিলেন, 'যদি পুঁথির মধ্যে ডুবিয়া নিজের কর্তব্য এইরূপে ভুলিয়া যাও তবে ভগবানলাভও সুদূরপরাহত হইবে।' সেই সতর্কবাণী সবেগে অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছিয়া তথাকার মনিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনিতে সজোরে যেন একটা চাড়া দিয়েছিল। একটিমাত্র কথাতেই যেন জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ঘটনার অনতিকাল পরেই সেই গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া তিনি জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বোধ করি সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক অর্থকরী-বিদ্যার প্রতি যে-আকর্ষণ, তাহাও চিরদিনের মতই বিসর্জন দেওয়া হইয়াছিল। কলেজের লেখাপড়ার আকর্ষণ ও মূল্য উভয়ই এই সময় হইতে একেবারে কমিয়া গিয়াছিল এবং গুরুসেবা ও ভগবানলাভ-প্রচেষ্টায় নিজের সমগ্র দেহমন অর্পণ করিয়া জীবনের সংস্কার-নির্দিষ্ট-পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইবার সুমহান ব্রতই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তর জীবনে, এই ব্রত উদ্‌যাপিত করিতে তাঁহাকে কঠোর পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। বাস্তব ক্ষেত্রের প্রতীক্ষায় বহু বাধাবিঘ্নের পাষাণপ্রাকার ভিন্ন করিয়া সুদৃঢ় নির্দিষ্ট দুর্গম পথে তাঁহাকে অটুট নিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে হইয়াছিল—তদীয় জীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে তাহারই পরিচয় আমরা লাভ করিব।

* *

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শশীমহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রথম গমন করিয়াছিলেন—একথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসের মধ্যভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলাসম্বরণ করেন। সুতরাং দুলশরীরে কিঞ্চিন্যূন তিনবৎসর কাল শ্রীগুরুর পার্শ্বে থাকিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। এইকালের শেষভাগে কাশীপুরের বাগান বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন গলরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখনই প্রায় সংসার ত্যাগ করিয়া গুরু-সেবায় শশীভূষণ নিজেকে সর্বাংশে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সংসার ও আত্মীয়স্বজন ভুলিয়া, আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া —কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রোগযন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব হইতে পারে কেবলমাত্র সেই চিন্তাটি অনির্বান-দীপ-শিখার মত অন্তরে প্রজ্বলিত রাখিয়া দিনের পর দিন যেভাবে তিনি এইকালে গুরুসেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা সহজলভ্য নহে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের প্রত্যেকেই অবশ্য যথা-শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাকার্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন কিন্তু স্বভাবগতভাবে মুখ্যতঃ সেবাধর্মী শ্রীযুক্ত শশীভূষণের গুরুসেবা তাহার মধ্যেও অনন্য-সাধারণ ছিল। রোগযন্ত্রণার উপশমের জন্য তখন অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পর পর কয়েকটি বালিশ সাজাইয়া তাহাতে হেলান দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইত। আর, শশীভূষণ পশ্চাতে বসিয়া এক-হস্তে বালিশগুলি ধরিয়া অন্যহস্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বীজন করিতেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলরোগটি 'সংক্রামক' —এইরূপ একটা ক্ষীণ আলোচনা এই সময় কোন কোন ভক্তের মুখে দু'একবার উত্থিত হইয়াছিল এবং চিরতরে উহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য ঠাকুরের মুখের লালামিশ্রিত ভুক্তির পায়েস শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ, শশীভূষণ এবং শরৎচন্দ্র অম্লানবদনে আহার করিয়া-ছিলেন। তারপর যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ গেল শশীভূষণের অন্তর জুড়িয়া তখন কী সে করুণ হাহা-কার! যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ইহকালের সবকিছু তিনি ত্যাগ করিয়াছেন—যাঁহাকে গুরুরূপে, ইষ্টরূপে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া অন্তরের আসনখানি পরে স্থাপন করিয়াছেন সহসা কোথায় গেলেন তিনি চলিয়া! ইহ জীবনে, রক্তমাংসের দুলশরীরে আর তাঁহাকে কখনো দেখা যাইবেনা। সে আনন্দঘন, সমাধি জ্যোতিঃস্নাত দেবমূর্তি বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়াইয়া

উৎসাহ-উদ্দীপনায় আর কখনো প্রবুদ্ধ করিবেনা। দিন তবে কী ভাবে অতিবাহিত হইবে? নিদাঘের দীর্ঘ প্রহরগুলি কী ভাবে কাটিবে? জীবনধারণ তাই এইকালে এক এক সময় যেন একান্ত দুর্বিসহ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অবশ্য সঙ্গেসঙ্গেই অন্তরূপ ভাবধারাও অন্তরে মাথা তুলিয়াছিল। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, ভাবরূপী ভগবানের স্তূতে স্তূতে নিত্য অধিষ্ঠানের কথা মনে উদিত হইয়া আশা উৎসাহেরও অবশ্য সঞ্চার করিয়াছিল।

ইহারই মধ্যে, আশা-নিরাশার এই দ্বন্দ্বাভিঘাতেরই মধ্যে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শশীকৃষ্ণও গৃহের মায়া চিরতরে বিসর্জন দিয়া শ্রীগুরুর নিত্য পূজার সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করিতে মঠে যোগ দিয়াছিলেন। তারপর দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর কাল, অর্থাৎ প্রায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একভাবে, অবিচলিত নিষ্ঠায় সে ব্রত তিনি পালন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, শ্রদ্ধাহীন ও নিষ্ঠাহীন বর্তমানযুগে, যে-যুগে কোন ভাবকে দশদিনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার শক্তি আমরা প্রায় হারাইয়াছি সেই যুগে, বজ্রদৃঢ়নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যের একতানতার যে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত তিনি এই-কালে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ধর্ম-ক্ষেত্রেই হউক অথবা জাতির অন্য কোন জীবন ক্ষেত্রেই হউক—আমরা তো কৈ খুব বেশী দেখিতে পাইনা।

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ যতদিন বরাহ-নগর মঠে তপস্যানিরত ছিলেন, পরিব্রাজক জীবন গ্রহণ করিয়া যতদিন না ইহারা নিরুদ্দেশ যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন ততদিন কী ভাবে, কী অপূর্ব প্রেম ও ভালবাসায় শশী মহারাজ তাঁহাদের সেবা করিতেন, তপস্যায় সহায়তা করিতেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং পরবর্তীকালে কখনো কখনো তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।...'শশী চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত, ও মাড়ীর শিরীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগ-রাগের ও আমাদের খাওয়ান-দাওয়ানের জোগাড় ওই সব করত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা চার-পাঁচটা পর্যন্ত ধ্যানস্থ চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেক-ক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের ধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি।'

বস্তুতঃ এই-যে নিষ্ঠা, যাহা শশীমহারাজের চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাহার আরও প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, আমাদের মনে হয়, সেই সময়—যখন গুরুভ্রাতাগণ একে একে মঠ ছাড়িয়া, সন্ন্যাসীর দণ্ড-কমণ্ডলুহস্তে, পরিব্রাজকবেশে বাহির হইতে লাগি-লেন—সেই সময়। ভারতীয় সাধনার ধারায় পরি-ব্রাজকজীবন সন্ন্যাসজীবনেরই এক অবশ্য বরণীয় অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে স্মরণাতীত কাল হইতে। 'রমতা সাধু, বহতা পানি'—কোন মলিনতাগ্রস্ত হয় না—এইরূপ একটি ধারণা আবহ-মানকাল ধরিয়া সন্ন্যাসীগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া, বরাহনগরের সেদিনকার তীব্রতম তপস্যায়ও যখন আশানুরূপ তত্ত্বানুভূতি হইলনা বলিয়া প্রত্যেকের মনে একটা অব্যক্ত চাঞ্চল্য জাগিয়াছে, যখন দুর্গম গিরিকন্দরে কিংবা সাধুসঙ্গের চরণধূলিপূতঃ তীর্থে তীর্থে ধ্যান তপস্যায় দেহপাত করিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেককে উদ্বেলিত করিয়াছে সেই সময়, সেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ও বৈরাগ্যের সংক্রামক প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, একটি দিনের তরেও বরাহনগর মঠ ত্যাগ না করিয়া তিনি যে-ভাবে, যে অবিচলিত দৃঢ়তায় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাপূজার নিত্যকর্মে লাগিয়া রহিলেন —তাহা আমাদের গভীর বিস্ময় উৎপাদন করে, গভীরতর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। মনে হয়, চঞ্চল চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে অঙ্গুলি নির্দেশে স্তব্ধ হইতে বলিয়া নিজ মনকে সম্বোধন করিয়া তিনি যেন কহিয়াছিলেন —

'তীর্থগমন, দুঃখ ভ্রমণ
মন উচাটন হয়োনারে।
পরমধন সে পরশমণি
যা চাবি তাই দিতে পারে।
* * * * *
যা চাবি তাই বসে পাবি
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মন প্রশান্ততর হইয়া কম্পাসের কাঁটার মত এবলক্ষ্যাভিমুখে স্থির হইয়াছিল—দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর কালের জন্য।

তাঁহার সেবা-পূজার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবিত থাকিতে যে-যে সময় যে-যে কার্যটি করিতেন এবং যে-বস্তুটি ভোজন করিতেন শশী মহারাজ তাঁহার ছবিতেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সশরীরে বর্তমান বোধ করিয়া সেইরূপভাবে ভোগ, পান ও তামাক দিতে লাগিলেন। মন্ত্র হইল 'জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' ইত্যাদি এবং 'গুরুর স্তবটি পাঠ করিতেন। রাত্রিকালে শশী মহারাজ যখন পঞ্চপ্রদীপ নাড়িতেন ও মুখে 'জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' শব্দ উচ্চারণ করিতেন তখন তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক গম্ভীর নাদ বাহির হইত। তিনি বিস্তার, উদাত্ত ও গম্ভীরস্বরে শব্দটি এরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন যে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইত এবং সেই গম্ভীর শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইত। গৃহ-প্রাচীর ও জানালাসমূহ সেই নাদে প্রতিধ্বনিত হইত…।"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে যে, যেদিন নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবেশ করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম উপলব্ধি তিনি লাভ করিয়াছিলেন সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'এই হইল নির্বিকল্পসমাধি; ইহার আস্বাদ তুমি গ্রহণ করিলে, কিন্তু এখন চাবি দেওয়া রহিল—সময় হইলে পুনরায় উহা খুলিয়া দেওয়া হইবে। যতদিন সেই-সময় না আসে ততদিন মহামায়ার নির্দেশে মানবের কল্যাণ কর।'

শ্রীগুরু-আজ্ঞায় স্বামীজীও সমাধির পরমানন্দ অক্লেশে ত্যাগ করিয়া কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর জীবনচরিতকারগণের অনেকে এই ত্যাগকে—অপরের কল্যাণের জন্য এই করায়ত্ত সমাধিসুখের বিসর্জনকে জগতের ধর্মেতিহাসে অনন্যসাধারণ এবং অতুলনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই মন্তব্যের অনুকৃতিতে শশী মহারাজের পরিব্রাজক-জীবনের প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষাকেও আমরা অনন্যসাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে চাই। বলিতে চাই—সেই সৌম্যদর্শন, দীর্ঘকায় পুরুষসিংহের জীবনকথা কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে হইলে প্রেমের দায়ে, আদর্শানুগত্যের দায়ে ছোট-বড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে-কোন প্রলোভন বা কামনা অক্লেশে ত্যাগ করিবার যে সহজাত, স্বাভাবিক সংস্কার ও শক্তি তাঁহার ছিল তাহার মহিমা ও মাধুর্য আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। কল্পনার ক্ষেত্র বিশুদ্ধ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে হইবে বরাহনগরের শূন্য মঠবাটীতে নিঃসঙ্গ একটি যুবক একান্ত একাকী দিনের পর দিন, কেবলমাত্র জপধ্যান ও গুরুপূজায়ত অবলম্বন করিয়া জীবনের মুহূর্তগুলি কাটাইয়া চলিয়াছে। অর্থাভাবে কোনদিন খাদ্য জুটিতেছে না, তৈলাভাবে নৈশপ্রদীপ নিমিত হইয়া আসিতেছে তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই; রিক্ত সন্ন্যাসী—বয়সের বুক, বিশ্বাসভরা ততোধিক হৃদয় লইয়া অকুতোভয়ে, শুদ্ধ নীরবতায় জীবনের স্থির লক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। এই চলার পশ্চাতে কী দৃঢ়তা, কী আত্মত্যাগ ও ধর্মসংস্কার নিহিত রহিয়াছে তদানীন্তন স্থান ও কালের পটভূমিকায় সে-কথা সম্যক অনুধাবন করিতে পারিলেই শশী মহারাজের পূতঃ চরিতকথা কতকটা বোধগম্য হইবে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিসুখ-ত্যাগের সহিত তাঁহার ওই কালের ত্যাগকে তুল্য বলিয় কেন আমরা বলিতে চাহিতেছি তাহাও বোধগম্য হইবে।

একথা অবশ্য সত্য যে গুরুশক্তিতে বিশ্বাস, গুরু-ইষ্টে অভেদজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী যে-কোন যথার্থ ধর্মার্থীরই জীবনের ভিত্তি থাকে, উচ্চ অধিকারী মাত্রই এসকল সম্পদে সম্পদশালী থাকেন কিন্তু পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জীবনের মূলভিত্তিই ছিল অখণ্ড দৃঢ়-বিশ্বাস। তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে, চিরদিনের স্বর্ণসিংহাসনে যে-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, একমাত্র তাঁহাকেই ইহ-পরকালের পরম অবলম্বন বলিয়া যেরূপ নিঃসংশয়ে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রাচীন আর্যবংশধরগণের সাবিত্রীদেবতা-উদ্দেশে উদ্গীত স্তুতির মতো শ্রীরাম-

কৃষ্ণকে অভিনন্দিত করিয়া যে-ভাবে তিনি বলিতেন, —'তৎসবিতুর্বরেণ্যং···' তাহার তুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও খুব সুলভ নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সেই গভীরতম প্রেম-প্রবাহ দর্শনেই স্বামী বিবেকানন্দ নিজের আকাঙ্ক্ষিত 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামটি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া শশী মহারাজকে দান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আমার চাইতেও ঐ নামের উপর শশীর অধিকার বেশী।'

বৈষ্ণবকবির গানে আছে—'যে-জন আমার গৌরাঙ্গে ভজে সেই আমার প্রাণরে।' এই উক্তি শশী মহারাজের জীবনে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। তাই দেখা যায়,—শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ ভক্তসন্তানগণের যাঁহাকে যে-সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন সেই সম্মান ও মর্যাদা তিনিও একান্ত আত্মপত্যের ভাবে চিরদিন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কখনো প্রশ্ন করেন নাই—যিনি-সম্বন্ধের আবিলতা তাঁহার চিরপরিচ্ছন্ন বিবেক-বিচারকে কখনো কোন মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে নাই। রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী জয়যুক্ত হউক, স্বামীজীর সর্বপ্রচেষ্টা অমোঘ হউক, সার্থক হউক এবং যুগচক্র প্রবর্তনের সুমহান কর্মপ্রবাহে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজ জীবন ধন্য হউক,—তাঁহার উৎসর্গীকৃত, ব্রতীজীবনে ইহা ছাড়া অন্যকোন কামনা কখনো স্থানলাভ করিতে পারে নাই। পরিব্রাজকরূপে বাহির না হওয়াতে বহু-বিচিত্র দৃশ্যাবলীর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হইতে হয়ত তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন, হয়ত বিভিন্ন প্রদেশের নানা জাতীয় নরনারীর জীবনসম্বন্ধীয় বিস্তৃত জ্ঞানও তাঁহার ঘটিয়াছিলনা—কিন্তু যে পরমজ্ঞান অন্য সকল জ্ঞানের প্রসূতি, যে-অভিজ্ঞতা লাভ হইলে অন্যকোন অভিজ্ঞতাই মানুষের কাম্য থাকেনা—সে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথাকালে তাঁহার অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাঁহার রামকৃষ্ণানন্দ নাম সর্বাংশে সার্থক করিয়াছিল···।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বিস্তৃত জীবনালোচনায় একথাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের তুচ্ছতম আদেশ, সামান্য একটু ইঙ্গিত—স্বামী বিবেকানন্দের উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত যে-কোন ইচ্ছা—নিখুঁত ভাবে পূর্ণ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। পাশ্চাত্যদেশ হইতে ফিরিবার পথে একদিন পরিহাসচ্ছলে, শুধুমাত্র পরীক্ষা করিবারই মানসে, স্বামী বিবেকানন্দ শশী মহারাজকে একটি প্রসিদ্ধ মুসলমান রুটি-বিক্রেতার দোকান হইতে রুটি কিনিয়া আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যিনি আজীবন শুদ্ধাচারী, ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যকাহারও স্পর্শিত খাদ্য যিনি কখনো স্পর্শও করিতেন না (গ্রহণ তো দূরের কথা), বংশগতভাবে যিনি অতি নিষ্ঠাবান এবং আচারগতভাবে যিনি শুদ্ধব্রত সন্ন্যাসী—সেই রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী মুহূর্ত-মাত্র দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই নির্দিষ্ট দোকান হইতে রুটি কিনিয়া লইয়া আসিলেন।

স্বামীজী একটু অপ্রস্তুত হইয়াই যেন বলিলেন, 'শশী, তুই এত গোঁড়া হয়েও মুসলমানের দোকান থেকে দিনের বেলায় সকলের সম্মুখ দিয়ে রুটি কিনে আনলি—আমার কথায় ?···'

শশী মহারাজ তদুত্তরে যাহা বলিলেন তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে স্বামীজীর আদেশ ও ঠাকুরের আদেশ তাঁহার নিকট অভিন্ন এবং ঐ আদেশ পালন করাই তাঁহার জীবনের সাধনা—উহার ভালমন্দ বিচার তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্গত নহে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসার উদাহরণ-স্বরূপ আরও একটি ঘটনা আমরা 'স্বামী-শিষ্যসংবাদ' গ্রন্থে দেখিতে পাই। ঐ গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই সে-কাহিনী অবগত আছেন।

সেদিন অপরাহ্নে কতিপয় দ্রাবিড়ী পণ্ডিত আমেরিকা হইতে সদ্য প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সংস্কৃতভাষায় শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বহুদিন সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্তা বলিতে অনভ্যস্ত স্বামীজী সেদিন পণ্ডিতদের সহিত ঐরূপ আলোচনায় কিছুটা অসুবিধা বোধ করিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঐ ব্যাপার

দেখিবামাত্র বাটীর একপ্রান্তে গিয়া নীরবে একমনে স্বামীজীর বিজয়-কামনায় জপ করিতে সুরু করেন।

ঘটনাটি বাহতঃ নিতান্ত সামান্য হইলেও শ্রীগুরুর প্রতিনিধি সঙ্কল্পিতা গুরুভ্রাতার প্রতি অকপট স্নেহ-প্রীতির অভিব্যক্তি হিসাবে বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী। এই স্নেহপ্রীতির আকর্ষণেই—স্বামীজীর আদেশপ্রাপ্তিমাত্র মুহূর্ত দ্বিধা না করিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নব্যবেদান্তের সার্বভৌম মতবাদ প্রচার করিতে সাম্প্রদায়িকতা সমাকুল, দ্রাবিড়ী-গৌড়ামির অন্যতম কেন্দ্রস্থল মাদ্রাজ প্রদেশে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন; অথচ বক্তৃতা, প্রচার প্রভৃতি কার্যের পক্ষপাতি তিনি কোনদিনই ছিলেন না। এইরূপ বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ পরিচালনার যে-গুরুদায়িত্ব ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহা একভাবে ও প্রায় একাকী বহন করিয়াছিলেন দীর্ঘ দাদশ বৎসরকাল পরে তাহা তাঁহার স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার জীবনের যে ইতিহাস তাহা মাদ্রাজ প্রদেশে প্রচারকালের ইতিহাস। ১৮৯৭ হইতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত উহা বিস্তৃত এবং বহুবিচিত্র অবস্থার সহিত অবিশ্রাম কঠোর সংগ্রামের অসংখ্য কাহিনীতে তাহা আকীর্ণ। এইকালে পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তির মধ্যদিয়া তিনি অবিচলিত নিষ্ঠায় স্বামীজীর আদেশপালন ব্যপদেশে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনালোকে হিন্দুধর্মের যে সার্বভৌম বাণী দাক্ষিণাত্যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এক্ষণে প্রদান করিব।

বর্তমানের ঔজ্জ্বল্যে ক্ষীণস্মৃতি সাধারণ মানুষ প্রায়শঃই অতীতকে ভুলিয়া যায়। অদ্যকার মাদ্রাজ রামকৃষ্ণমঠ ও ছাত্রাবাসের সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি দেখিয়া উহাদের জন্মকালের দীন, নগ্নরূপটি মনে আনা সহজ নয়। কিন্তু সেইটি মনে আনিতে না পারিলে, তখনকার কঠোর দারিদ্র্যের অবস্থা ও জনসাধারণের একান্ত ঔদাসীন্য সম্যক উপলব্ধি না করিতে পারিলে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এইকালের কর্মপ্রণালী ও বহুমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া সহজ হইবেনা। অর্থহীন, আশ্রয়হীন, মুষ্টিমেয় কয়েকটিলোকমাত্র, কতকপরিমাণে সহানুভূতিসম্পন্ন, আর চতুর্দিকে ভিন্ন ভাষাভাষী, জাতিবিচারের নিরর্থক অনুষ্ঠানে সদামত্ত জনসাধারণের সুদৃঢ় অন্ধসংস্কারের পাষাণ প্রাকার—শনৈঃ শনৈঃ উহাদেরই মধ্যদিয়া তাঁহাকে তখন অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। নিয়মিত শাস্ত্রপাঠাদির সময় হয়ত কোনদিন একটি লোকও উপস্থিত হয় নাই—ভ্রূক্ষেপহীন, নিরাসক্ত সন্ন্যাসী তবু শ্রীগুরুকে প্রত্যক্ষ সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকেই সেদিন শাস্ত্রপাঠ করিয়া শুনাইতেছেন—কিন্তু ক্লান্ত বন্ধ করেন নাই। হাতে হয়ত একটি কপর্দকও নাই অথচ পরদিনই বিশেষ কোন উৎসবের তারিখ রহিয়াছে। দুই হাত আড়াআড়ি বুকের উপরে স্থাপন করিয়া অব্যক্ত রুদ্ধ আবেগে পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীর মত সেই বিশালকায় পুরুষসিংহ আশ্রমের বারান্দায় একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি গভীর রজনীর স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে অস্থিরভাবে একাকী হয়ত পদচারণা করিতেছেন। ভগবানের প্রতি একটি দুর্দম অভিমান কণ্ঠ ঠেলিয়া উপরে উঠিতে চাহিতেছে কিন্তু কাহাকেও ঘুণাক্ষরে সে-বিষয়ে কিছুই বলিতেছেন না—আর অভাবনীয় ঘটনার অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ঠিক সময়ে মঠে আসিয়া জুটিতেছে। মাদ্রাজ মঠের আদিপৈপবের দুঃখ-দারিদ্র্যের সেই বিস্মৃত দিনগুলিতে এরূপ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মতই ছিল। নিজদেহের সুখ-সুবিধা বা একান্ত প্রয়োজনীয় আহারাদির দিকেও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এইকালে তিনি অবিশ্রাম কর্মে রত থাকিতেন। কোন কোন সপ্তাহে এক একদিন দু'তিনটি বক্তৃতাও তাঁহাকে প্রদান করিতে হইত এবং ঐরূপ দিনে—উদয়াস্ত খাটুনির পর রাত্রিতে হয়ত রন্ধন করাও তাঁহার হইয়া উঠিত না—দোকান হইতে একটি শুষ্ক রুটি ক্রয় করিয়া তাহা দ্বারাই নৈশভোজন সমাধা করিতেন। ভক্তদের মধ্যে যদি কেহ কোন সময় ঐরূপ অতিশয় কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিত তবে মৃদুহাস্যে তিনি

উত্তর দিতেন,—"দেখ, লেখক তার হাতের কলম দিয়ে কত গ্রন্থ লিখে থাকে তাতে কলম যদি কখনও মনে করে যে সে অত্যন্ত পরিশ্রম করছে তবে সেটা একান্তই নিরর্থক হবে। এই দেহকে যন্ত্র করে ভগবানও তেমনি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে যাচ্ছেন তাতে এ-দেহের কিছু মনে করা না-করা অর্থহীন। তিনি যন্ত্রী আমি তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি।"

বস্তুতঃ, এই একান্ত নির্ভরভাবই তাঁহার সকল কর্মের মূল প্রেরণা ছিল। দিনে দিনে ইহার অমোঘ প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতও হইয়াছিল, দিনে দিনে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, গভীর ভগবৎপ্রীতি, নিষ্কলুষ ত্যাগ-বৈরাগ্য মাদ্রাজের অসংখ্য নরনারীকে অবশ্যম্ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। শুধু মাদ্রাজ প্রদেশ নহে, ব্যাঙ্গালোর প্রমুখ দক্ষিণভারতের অন্যান্য বহুস্থান হইতেও ক্রমশঃ তাঁহার বাণী শুনিবার ও গ্রহণ করিবার আগ্রহ ব্যক্ত হইতে লাগিল। দীর্ঘ-কালের নীরব সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল এইরূপে ফলিতে সুরু করিয়াছিল, জাতিবর্ণনির্বিশেষে তাঁহার উদার মতবাদ এইরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রমে মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি অঞ্চলের বাহিরেও তাঁহাকে পাইবার জন্য বহুলোক আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। ক্রমে দূর ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতেও বেদান্ত প্রচারের জন্য তাঁহার আহ্বান আসিতে লাগিল এবং ঐসকল স্থানে তাঁহার পূতঃ জীবন ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন অগণিত নরনারীর মনে গভীর রেখাপাত করিল।

এই কালে, Universe and Man, The soul of Man, Srikrishna, the Pastoral and King Maker প্রভৃতি গ্রন্থও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল বঙ্গভাষায় লিখিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রামায়ণচরিত'।

তাঁহার মাদ্রাজে অবস্থানকালেই একবার শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী ও একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। নিজের আহার নিদ্রা প্রভৃতি কোন কিছুর দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যে-ভাবে সেইসময় তিনি তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা কোন মানুষের জন্য মানুষ করে না, করিতে পারে না। মানুষী তনুতে স্বয়ং ভগবতী শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর দেহাবয়বে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাম-কৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রসন্নতায় ঠাকুরই স্বয়ং প্রসন্ন হন—এইজ্ঞান শশীমহারাজের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই ঐরূপ সেবাধর্ম করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "রামেশ্বর যখন গেলুম, ১০৮টি সোনার বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা শশী করে দিয়েছিল।" পরবর্তীকালে কোন গৌরবর্ণ, দীর্ঘবপু যুবককে দেখিলে মা কখনো কখনো বলিতেন—'শশী যখন প্রথম এসেছিল তখন ঠিক ঐ রকমটি দেখতে ছিল।'

তাঁহারই ব্যবস্থায় অদ্যকার সুবৃহৎ মাদ্রাজ ছাত্রাবাস (শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী ভবন) অতি সামান্য উপকরণ লইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। একদা কারেম্বেটোর পরিদর্শনকালে পিতৃমাতৃহীন কয়েকটি শিশুর একান্ত অসহায় অবস্থা তাঁহার বিশাল হৃদয়কে বিচলিত করে এবং তাহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার সমুদয় দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। আর তাহারই ফলে ধীরে ধীরে যে বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে তদ্রূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত গড়িয়া ওঠে নাই।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবন অতিশয় নিয়মিত ছিল। ঘড়ির কাঁটার গতির মত প্রণালীবদ্ধভাবে তাঁহার সবকাজ সম্পন্ন হইত, প্রতিটি নিঃশ্বাস উপাসনার ভাবে নিয়মিত হইত। আদর্শলাভের পথে কোন কিছুর সহিত কোন প্রকার কম্প্রোমাইজ তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ফলে, শিক্ষার্থীহিসাবে যাহারা তাঁহার কাছে অবস্থান করিত তাহাদের কার্য্যকলাপের কোনও ত্রুটী বিচ্যুতি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কঠোর ভাষায় তাহাদের দোষ দেখাইতেন, তীব্র ভর্ৎসনায় শাসন করিতেন। কেহ কেহ সেই রুদ্রশাসন অনেক সময় অসহনীয়

বোধ করিত। ভাবিত, বড় বেশী কঠোর ব্যবহার করা হইতেছে,—বড় নির্মম হইতেছে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁর উদার হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্নেহ ধারায় সে অভিমান দূর হইত। অল্পভাষী এবং চাপা প্রকৃতির হইয়াও শশী মহারাজ ঐরূপ অবস্থায় কখনো কখনো ভাবের আবেগে নিয়তিশয় বিচলিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার শাসন কঠোর হইয়াছে মনে করিয়া তিনি চোখের জল ফেলিতেন এবং যাহাকে গালমন্দ করিয়াছেন তাহাকে হয়ত একেবারে বুকের কাছটিতে টানিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিতেন, —'বাবা, তোদেরই মঙ্গলের জন্য এরূপ কঠোর ব্যবহার আমি করি। তোদের কল্যাণ হোক—এ ছাড়া আমাদের আর কি কামনা আছে ?...'

সেই অকপট, নিঃস্বার্থ স্নেহের স্পর্শে শিক্ষার্থীর সকল বেদনা মুছিয়া যাইত, অপার্থিব আনন্দরসে হৃদয় পূর্ণ হইত। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় কয়েক বৎসর তাঁহার শিক্ষাধীনে ছিলেন মঠের এমন জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসীর মুখে আমরা ঐ জাতীয় অনেক ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, "দুর্দ্ধর্ষ পৌরুষ ও মাতৃসুলভ করুণা, অনমনীয় কঠোরতা ও অপরিসীম কোমলতার যে অপূর্ব্ব সমন্বয় শশী মহারাজের মধ্যে দেখিয়াছি তেমনটি আর কোথাও বড় একটা দেখি নাই। কায়মনোবাক্যে এমন ঈশ্বর-নির্ভরতা, চিন্তায় ও কর্ম্মে এমন ঐকান্তিকতা, মাধুর্য্য ও বীর্য্যের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ অন্যত্র আর কোথাও দেখি নাই যেমনটি দেখিয়াছিলাম সেই বিরাটপ্রাণ মহাপুরুষটির মধ্যে।"

বস্তুতঃ, সুগভীর আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়া, অটুট আদর্শানুগত্যের সকল দুঃখও কঠোরতার মধ্যদিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ-বাণী দীর্ঘ চতুর্দ্দশবৎসরকাল তিনি প্রচার করিয়াছিলেন এবং সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একাধিক স্থানে একাধিক স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে এবারের মত শ্রীগুরুর পদে পুনর্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দীর্ঘদিনের আহারকৃচ্ছ্রতা এবং শারীরিক অনিয়মের ফলে সন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং প্রায় আড়াইমাসকাল রোগভোগ করিয়া কলিকাতায় 'উদ্বোধন' বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট দিবা, দ্বিপ্রহরে বেলা প্রায় দেড়ঘটিকায় বহুকণ্ঠে উচ্চারিত গম্ভীর 'হরি ও রামকৃষ্ণ' ধ্বনির মধ্যে রামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামকৃষ্ণানন্দ সমাধিযোগে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সমন্বয়সমৃদ্ধ একটি সুন্দর জীবন এইভাবে বাঙ্গালীর জীবনক্ষেত্র হইতে একদা অপসৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাক্‌সর্ব্বস্ব প্রচারের যুগে, যখন নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া মানুষ সংসারে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, যখন একখানা করিলে দশখানা প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লাভ করিতে সে সর্ব্বথা তৎপর—সেইযুগে একান্ত নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজকে যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া বিবিধ বৃহৎ ও মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি জীবনপাত করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—

'গুরুগতপ্রাণতা, উদ্দেশ্যের একতানতা, সেবা-পরায়ণতা এবং অলস ত্যাগ ও ঈশ্বরভক্তি একদিকে যেমন প্রিয়দর্শন স্বামীজীকে ভক্তের নিকট আদর্শ-স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সহানুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহাকে সংসারে দাবদগ্ধ জীবগণের নিকট আশা ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়স্থলস্বরূপে অবলম্বনীয় করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে মাদ্রাজের সহস্র নরনারী গভীর দুঃখে চোখের জল ফেলিয়াছিল।

জ্ঞান ও ভক্তির যুগপৎ অধিকারী মহাপ্রাণ এই কর্ম্মযোগীকে বাঙ্গালীজাতি হারাইয়াছিল কিন্তু ভাগ্য-দোষে সে-ক্ষতির পরিমাণ সে যেন ঠিক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই আর আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে তাঁহার নামই ত অনেকের জানা নাই। তথাপি আমরা আশা করি যে, দূর কি অদূর ভবিষ্যতে একথা বাঙ্গালী বুঝিবে যে—শ্রদ্ধাহীনতা, কোন একটি আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবার

অক্ষমতা, নিজঘরের দিকে না তাকাইয়া সহস্রযোজন যুগের যে-কোন দেশের যে-কোন আন্দোলনের পশ্চাতে ছুটিবার দাসসুলভ অন্ধমনোবৃত্তি—যাহা তাহার আত্মীয়জীবনের শোচনীয় চরিত্র-দৌর্বল্য এবং যাহার ফলে বিবিধ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার বিভিন্নক্ষেত্রে সে আজ পিছাইয়া পড়িতেছে—সেই সকল দোষত্রুটির প্রতি-ষেধক হিসাবে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর মত এমন নিখুঁত আদর্শজীবন খুব বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই, তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় চল্লিশবৎসর অন্তে স্বামী সারদানন্দের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আজ আমরা বলি—'ঈদৃশ জীবন সংসারে সত্যই দুর্লভ।' বলি, স্বার্থকলুষতাপূর্ণ এই পৃথিবীতে ঐরূপ জীবনের যথাযথ আদর নাই দেখিয়াই বোধহয় জগতের আরাধ্য-দেবতা তাঁহাকে অতি অল্পকালে নিজ সকাশে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। আজ কেবল তাঁহার পুণ্য জীবনকাহিনী অক্ষয় স্মৃতির ভাণ্ডারে পরম সম্পদরূপে জাগিয়া আছে আমাদের জন্য। উহা গ্রহণ করিয়া, অনুসরণ করিয়া বাঙালীজাতি ধন্য হউক—এই প্রার্থনা করি।

রতিই ভক্তির স্থায়ীভাব

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

রতি অর্থে অনুরাগ বা আসক্তিকে বুঝায়। প্রেমিক বা প্রেমাস্পদের মধ্যে যে নিরন্তর চিন্তা অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে সতত চিন্তা দ্বারা পরস্পরের ভেতর যে বিশেষ টান বা আসক্তি জন্মায়, যার জন্য একের বিরহ অন্যের অসহ্য হ'য়ে উঠে, সেইরূপ টানকেই বা অনুরাগকেই রতি বলা হয়। এইরূপ রতিই আনন্দাভিব্যক্তির একমাত্র কারণ। শুদ্ধা বা অমিশ্রা ও মিশ্রিতা ভেদে রতি আবার দুই প্রকার। ফলাভিসন্ধিরহিত অহৈতুকী রতি—অমিশ্রা বা শুদ্ধা, এবং ফলাভিসন্ধিযুক্ত রতি—মিশ্রিতা। ভক্তিভাবটি রতির অনুগত, সুতরাং রতির প্রকার ভেদে ভক্তিরও প্রকারভেদ অবশ্যম্ভাবী। অমিশ্রা রতি, বা অপরাপর ভাবের সংমিশ্রণে উৎপন্ন নহে, তা তিন প্রকার। (১) শুদ্ধা রতি (২) বাৎসল্য রতি অর্থাৎ বাৎসল্যভাব-মূলক রতি, এবং (৩) প্রেয়ো রতি। এই তিন প্রকার রতি কোন বিরুদ্ধভাবের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় ইহাদিগকে অমিশ্রা রতি বলা হয়। ভগবদাকারে আকারিত যে রতি অর্থাৎ পরমানন্দময় শ্রীভগবানের প্রতি যে রজঃ ও তমোগুণরহিত মতি বা মনোবৃত্তি তা বিমলানন্দদায়ক ব'লে শুদ্ধা রতি নামে প্রসিদ্ধা। স্নেহবশতঃ দ্রবীভূত চিত্তে পাল্য-পালকভাব, অর্থাৎ আমি পালক এবং শ্রীকৃষ্ণ আমার পালনীয় (শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুত্রভাবে পালন করি),—এইরূপ ভাবটিকে বাৎসল্য রতি বলা হয়,—যেমন ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার। স্নেহপ্রযুক্ত দ্রবীভূতচিত্তে সেব্য-সেবক ভাব (আমি সেবক এবং শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য)—এরূপ ভাবকে প্রেয়ো রতি বলা হয়; যেমন ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অক্রূরের। অতএব শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা শ্রবণে ঐ তিনটির যে কোন ভাব গ্রহণ ক'রে ভক্তগণ ভগবদ্ভাবে বিভোর হন; কারণ ঐ ভাব তিনটিতে কোন বিরুদ্ধভাবের মিশ্রণ না থাকায়, তাঁরা অবাধে সাধনভজনে অগ্রসর হন। এই অমিশ্রা রতিকে নিরুপাধিক ফলাভিসন্ধিরহিত অহৈতুকী বলা হয়। কিন্তু মিশ্রা রতির তিন প্রকার বিভাগ আছে,—কামজ, সম্বন্ধজ ও ভয়জনিত। কামজ রতি শৃঙ্গাররসমিশ্রিত; বাৎসল্য ও সখ্য এই উভয়ের সম্মিলনে যে রতির উদ্ভব হয় তা সম্বন্ধজ; এবং ভয়প্রসূত রতিভাব প্রীতি-ভয়ানক রস উৎপন্ন

করে: এগুলি অশুদ্ধ বা মিশ্র রতি অর্থাৎ সোপাধিক বা ফলাকাঙ্ক্ষামূলক রতি। নিরুপাধিক বা শুদ্ধ রতি হল ভক্তিরসের মূল; কারণ অবিরত শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা শ্রবণে উদ্দীপনার ফলে ভক্তের চিত্ত দ্রবীভূত হ'য়ে ভগবদাকারে পরিণত হয়। এই যে শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের অবিচ্ছিন্নভাবে বৃত্তিধারা বা গতি, তাই হ'ল নির্গুণ ভক্তিযোগের যথার্থ স্বরূপ। ভাগবতও (৩।২৯।১১-১২) এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে ব'লেছেন—

"মদগুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

অর্থাৎ গঙ্গার জলপ্রবাহ যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে সেইরূপ আমার গুণ শ্রবণে সর্ব্বজনের অন্তর্যামী ও পুরুষোত্তম নামক আমার প্রতি নিষ্কামভাবে ভেদবুদ্ধিশূন্য অবস্থায় মনের যে অবিরাম গতি তাহাই ভক্তি—ইহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ।

বিশেষ প্রয়োজনবোধে এখানে বলি, ভক্তিরস অনুভব করবার জন্য প্রথমে ভক্তহৃদয়ে উদয় হয় শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার পর আসে ভক্তিরসের স্থায়ীভাব রতি, এবং তৎপরে সেই রতিই ক্রমশঃ ভক্তিরসে পরিণত হয়; সুতরাং ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক রূপ হ'ল রস। উহা রসস্বরূপ ব'লেই ভক্ত সাধকের ভক্তিলাভের জন্য এত আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। শ্রীভগবানের নামগুণাদি শ্রবণে ভক্তের চিত্তে যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন অগ্নিতে সোহাগা সংযোগে গলিত স্বর্ণের ন্যায় ভক্তের চিত্তও দ্রবীভূত হয়, এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে শ্রীভগবানের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ায় চিত্তটি ভগবদাকারে আকারিত হয়। এই ভগবদাকারই পরিণামে রসে পরিণত হয়। শ্রুতিতে আমরা পাই "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ। তিনি নিত্য, কেননা তাঁর উৎপত্তি নাই এবং বিনাশও নাই। শ্রুতিতে যে ব্রহ্মানন্দের বিষয় জানা যায়, সেই আনন্দই আমাদের হৃদয়নিহিত অজ্ঞানতিমির দূরীভূত করার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতির বিষয় হ'য়ে রসে পরিণত বা রস নামে বিদিত হয়। এই রসের অনুভূতি, স্বপ্রকাশ আত্মার স্বরূপভূত ব'লেই অন্য কোন প্রকাশের সাহায্য ব্যতিরেকে অভিব্যক্ত হওয়ায় নির্ব্বিকল্প, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধরহিত বিশুদ্ধ উপলব্ধিমাত্রে পর্য্যবসিত হয় এবং উহাতে অন্য কোন বিশেষণের আবশ্যক হয় না। কেননা রসবস্তুটি আত্মাস্বরূপ।

এখন নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প ভেদে অনুভূতি দুই প্রকার। নির্ব্বিকল্পে নিত্যসুখ বর্ত্তমান কিন্তু সবিকল্পে বিভিন্নপ্রকার বিষয়ের যোগ থাকায় সুখের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়, যা অতিসাধারণ ব্যক্তিরও অনুভূতিসাধ্য। এই প্রকার সুখের অনুভূতিকেই সবিকল্প বলা হয়। উক্ত রসবস্তু যে আনন্দস্বরূপ, শাস্ত্রাদিতেও ইহার প্রমাণ আছে যথেষ্ট, যথা—

"সত্যংজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম",
"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সাধারণ জীবগণ এই ব্রহ্মানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ ক'রে থাকেন এবং তাঁরা (জীব) চিদানন্দঘন আত্মারই যে রসস্বরূপ,—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে। তা হ'লে, নিত্য প্রকাশমান আত্মার স্বরূপভূত যে সুখ বা আনন্দের অভিব্যক্তি, তাকেই 'রস' বলা হয়। দ্রবীভূত চিত্ত যদি ভগবদাকারতায় আকারিত হয় এবং তা স্থির থাকে, তবেই উহা ভক্তিরসে পরিণত হয়, নচেৎ উহা রসত্ব প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং বিশুদ্ধা ভক্তিলাভ ক'রতে হ'লে, সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক চিত্তের দ্রবতা সম্পাদন করা, তৎপরে ভগবদ্বিষয়ে দৃঢ়তর রতি অর্জ্জন করা, তবেই সেই রতি অন্যান্য সহকারী সহযোগে ভক্তিরসে পরিণত হবে। এখন দেখা যাক্ এই ভক্তিরসের স্থায়ীভাব কখন হয়? সাহিত্য দর্পণে আমরা এর একটি নিদর্শন পাই,—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃস্থায়ীতি সম্মতঃ।"

অর্থাৎ বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ অপর কোন ভাব দ্বারা অভিভূত না হওয়াই স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।

এখন বেশ বোধগম্য হ'ল, ভক্তির ভেদভাব থাকতে ভক্তির স্থায়ীভাব আশা করা যেতে পারে না। উপস্থিত জানা আবশ্যক এই ভেদভাবগুলির মর্ম্মার্থ কি? কারণভেদেই ভক্তির ভেদভাব ঘটে থাকে। ভক্তি স্বরূপতঃ এক হ'লেও কারণ ভেদে বিভিন্ন। প্রধানতঃ ভক্তি চারিপ্রকার—রাজসী, তামসী, শুদ্ধ-সাত্ত্বিকী ও মিশ্রিতা। রজোগুণ-প্রধানা ভক্তি—রাজসী, তমোগুণোপ্রধানা ভক্তি—তামসী, বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা ভক্তি—শুদ্ধসাত্ত্বিকী এবং অপাঙ্‌ক্তিভাবে মিশ্রগুণোদ্ভূতা ভক্তি—মিশ্রিতা। ঈর্ষা-মূলক দ্বেষ হতে রাজসী ভক্তি, ভয়জনিত দ্বেষ হ'তে তামসী ভক্তি, আনন্দপ্রধান সত্ত্বগুণ হ'তে শুদ্ধসাত্ত্বিকী ভক্তি এবং কামশোকাদি কারণ হ'তে মিশ্রিতা ভক্তির উদ্রেক হয়। উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে, উহারা তিনভাগে বিভক্ত হয়, যথা—(১) দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়ফলা, (২) দৃষ্টমাত্রফলা এবং (৩) অদৃষ্টমাত্রফলা। রাজসী ও তামসী ভক্তির ফল কেবল অদৃষ্ট অর্থাৎ পরজন্মে উপভোগ্য; মিশ্রিত ভক্তির ফল দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার। মিশ্রিত ভক্তিতে দৃষ্টফল (উপস্থিত দেহোপভোগ্য ফল) এবং অদৃষ্ট ফল, (পরজন্মে উপভোগ্য ফল) দুইটিই পাওয়া যায়। মিশ্রিতা ভক্তি ও শুদ্ধসাত্ত্বিকী ভক্তি উভয়ই সুখময়ী বা পরমানন্দস্বরূপা ব'লে রতিপদবাচ্য। রাজসী ও তামসীর ফল পর-জন্মে উপভোগ্য ও ইহজন্মে দুঃখজনক হওয়ায় নির্ম্মল আনন্দের প্রতিকূলাচরণ করে ব'লে রতিপদবাচ্য হয় না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, চিত্তের রাজসী ও তামসী বৃত্তি দুটি, আপাতজ্ঞানে ভক্তিরূপে ব্যবহৃত হ'লেও রতিভাবের স্থায়িত্ব না থাকায় উহারা ভক্তিমধ্যে পরিগণিত হবার যোগ্য নহে। অতএব সাত্ত্বিক বৃত্তি অধিগত করা ভক্ত মাত্রেরই কর্ত্তব্য; কারণ ভগবদ্বিষয়ে রতির স্থায়ীভাব সাত্ত্বিক বৃত্তির মধ্যেই নিহিত। রতির স্থায়ীভাব অর্থে আমাদের বিশুদ্ধ প্রেম সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানে অর্পণ ক'রতে হবে; কেননা সেই পূর্ণব্রহ্ম অমর, অব্যয়, নিত্য এবং নিরাত সাগরের তুল্য। তাঁর প্রেমসমুদ্রে কখন জোয়ার ভাঁটা খেলে না বা তাঁর মধ্যে কোন তরঙ্গই নাই। ভক্তের চিত্তের বা দেহের শক্তিনিচয় যে ভাবেই থাকুক না কেন, শ্রীভগবানই হবেন তার একমাত্র লক্ষ্য, উপাস্য এবং প্রেমের পাত্র। শ্রীভগ-বানে যখন ঠিক ঠিক রতি স্থায়ী হয়, তখন ভক্ত বলে, "হে ভগবান! তোমাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দেব, প্রাত্যহিক কিছুই চাই না।" ফলে হয় কি? তখন ভক্তের আর 'আমার' বল্‌বার কিছুই থাকে না, এবং সংকীর্ণতা বা স্বার্থপরতা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হ'য়ে সর্ব্বভূতে হয় তার সমজ্ঞান, যা সার্ব্বভৌমিক প্রেম বা পরাভক্তিরই নামান্তর। তার এই প্রেমের বাঁধন আর কখনও শিথিল হয় না, তাই শ্রীভগবানও তার এই প্রেমডোরে বাঁধা পড়েন। এই যে সার্ব্বভৌমিক প্রেম, তাহা অমিশ্রা রতি থেকে জাত। শ্রীভগবান গীতার দ্বাদশ অধ্যায়, ২য় শ্লোকে ঠিক এই ভাবেরই কথা ব'লেছেন,—"যারা আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করে এবং সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হ'য়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার আরাধনা করে, তারাই আমার যুক্ততম ব'লে বিবেচিত হয়।" কেননা সেই সকল ভক্তগণ সতত ঈশ্বরে আসক্তচিত্ত হওয়ায় তারা বিষয়ান্তরে পরাঙ্মুখ হ'য়ে কেবলমাত্র আমাকেই চিন্তা ক'রতে ক'রতে সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত করে। ভক্তের এই ভাবটি উচ্চাবস্থা বা সিদ্ধাবস্থার ভাব,—যা সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। এই অবস্থায় একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তা, ধ্যান ও উপাসনা ব্যতীত ভক্তের জীবনধারণ করা অসম্ভব হ'য়ে উঠে; সুতরাং শ্রীভগবানের স্বরূপ যখনই ভক্তের হৃদগত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, ভগবদ্বিষয়ক রতি—যা শুদ্ধসাত্ত্বিক, তার চিত্তভূমে বদ্ধমূল হওয়ায় তার আর ক্ষয় বা শিথিল হবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ রতিই ভক্তির স্থায়ীভাব।

বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

১

কুশীনগরে মল্লদের শালবনে মহাপরিনির্ব্বাণশয্যায় শায়িত ভগবান বুদ্ধদেবকে মহাভিক্ষু আনন্দ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'ভগবন্! আমরা পরিনির্ব্বৃত তথাগতের শরীর সম্বন্ধে কিপ্রকার ব্যবস্থা করিব?' তদুত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—"অব্যাবটা তুম্হে আনন্দ হোথ তথাগতস্স সরীরপূজায়। ইধ তুম্হে আনন্দ সদত্থে ঘটথ, সদত্থমনুরুহথ, সদত্থে অপ্পমত্তা আতাপিনো পহিতত্তা বিহরথ।" অর্থাৎ—হে আনন্দ! তথাগতের শরীরপূজার নিমিত্ত তোমরা ব্যস্ত হইওনা। হে আনন্দ! তোমরা পরমার্থলাভের জন্য উদ্যোগী হও, দৃঢ়নিষ্ঠ হও, পরমার্থ বিষয়ে অপ্রমত্ত, বীর্য্যবান এবং তদ্গতচিত্ত হইয়া বিচরণ কর।

"সন্তানন্দ খত্তিয়-পণ্ডিতাপি ব্রাহ্মণপণ্ডিতাপি গহপতিপণ্ডিতাপি তথাগতে অভিসদ্ধা, তে তথাগতস্স সরীরপূজাং করিস্সন্তীতি।" (মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ৫।২৪) অর্থাৎ—হে আনন্দ! যে সকল বিজ্ঞ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গৃহপতিগণ তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁহারাই তথাগতের শরীর-পূজার (দেহসংস্কারের) ব্যবস্থা করিবেন।

বৈশাখীপূর্ণিমা-রজনীর অন্তিম যামে ভগবান তথাগত গভীর ধ্যানযোগে মহাপরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যূষকালে আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ আনন্দকে কহিলেন, "বন্ধু আনন্দ। আপনি কুশীনগরে গিয়া মল্লগণকে ভগবানের পরিনির্ব্বাণের সংবাদ জ্ঞাপন করুন এবং তাহাদিগকে যথাকর্ত্তব্য করিতে বলুন।"

এদিকে কুশীনগরের মল্লগণ, ভগবান তথাগত পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই মল্লাগারে (সভাগারে) সমবেত হইয়াছিলেন। এমনি সময়ে আনন্দ সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া মল্লদিগকে জ্ঞাপন করিলেন—

"পরিনিব্বুতো বাসিট্ঠা ভগবা,
যস্সদানি কালং মঞ্ঞথাতি।"

হে বাসিষ্ঠগণ! ভগবান পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন আপনাদের যাহা উচিত মনে হয় করুন।

মহাভিক্ষু আনন্দের নিকট বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মল্লগণ, মল্লকুমারগণ, বধূ এবং কন্যাগণ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন—

"অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বুতো, অতিখিপ্পং চক্খুমা লোকে অন্তরহিতোতি।" (অতিশীঘ্র ভগবান পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন, অতিশীঘ্র সুগত পরিনির্ব্বাপিত হইলেন, অতিশীঘ্র চক্ষুষ্মান্ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।)

২

অনন্তর মল্লপ্রধানগণ রাজকর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন যাহাতে কুশীনগরের সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য, মাল্য এবং সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র একত্র সন্নিবেশিত করা হয়। মল্লগণ ঐ সমস্ত দ্রব্য এবং পাঁচশত জোড়া নূতন বস্ত্র লইয়া সেই শালবনে ভগবান বুদ্ধের দেহসন্নিধানে উপস্থিত হইল। বস্ত্রসমূহদ্বারা চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়া তাহা পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করিল এবং ঐ চন্দ্রাতপতলে তাহারা নৃত্যগীতবাদ্য সহযোগে মালা ও সুগন্ধি দ্রব্যসকল দ্বারা বুদ্ধদেহের পূজা ও সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। ক্রমাগত ছয় দিন এইরূপ উৎসব চলিবার পর সপ্তম দিবসে মল্লপ্রধানগণ স্থির করিলেন যে, ভগবান তথাগতের দেহকে নৃত্য, গীত, বাদ্য, গন্ধ ও মাল্যাদি সহযোগে পূজা ও সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে নগরের বহির্দ্দেশে লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণদিকে সংকার করা হইবে। তদনুসারে আটজন মল্লপ্রধান (মল্লপামোক্খা)

স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বুদ্ধদেহ বহন করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিলেন কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় তাঁহারা বহুচেষ্টা করিয়াও দেহটিকে উঠাইতে পারিলেননা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহারা মহাভিক্ষু অনুরুদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। মহাস্থবির কিছিৎকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন—"অঞ্ঞথা খো বাসিট্ঠা তুম্হাকং অধিপ্পায়ো, অঞ্ঞথা দেবতানং অধিপ্পায়োতি।" —হে বাসিষ্ঠগণ! আপনাদের অভিপ্রায়একরূপ, কিন্তু দেবতাদের অভিপ্রায় অন্যরূপ। এ বিষয়ে দেবতাদের অভিপ্রায় শ্রবণ করুন। তাঁহারা বলিতেছেন—"আমরা ভগবান বুদ্ধের দেহ দিব্য নৃত্য-গীত-বাদ্য-সহযোগে গন্ধমাল্য দ্বারা পূজা ও বন্দনা করিতে করিতে নগরের উত্তরদিকে লইয়া উত্তরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া মধ্যস্থলে আনয়ন করিব। তৎপর পূর্ব্বদ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির করতঃ নগরের পূর্ব্বপার্শ্বে মল্লদের 'মুকুট-বন্ধন' নামক যে অভিষেকমণ্ডপ রহিয়াছে, সেখানেই ভগবানের দেহ সৎকার করিব।"

মল্লপ্রধানগণ দেবতাদের অভিপ্রায়মতই কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হইতে দিব্য মন্দার কুসুমরাজি বর্ষিত হইয়া কুশীনগরের পথঘাট পূর্ণ করিয়া দিল। অতঃপর দেবতাগণ ও কুশীনগরের মল্লগণ যথাক্রমে স্বর্গীয় ও পার্থিব গন্ধমাল্য ও পুষ্পাদি দ্বারা ভগবান বুদ্ধের শরীরপূজা ও বন্দনা করিয়া নানাবিধ স্বর্গীয় ও পার্থিব নৃত্যগীতবাদ্য সহযোগে যমক শালতরুর মূল হইতে বুদ্ধদেহ বহনপূর্ব্বক নির্দ্ধারিত পথ অতিক্রমান্তে মুকুটবন্ধন নামক অভিষেকমণ্ডপে আনিয়া স্থাপন করিলেন।

অনন্তর মল্লগণ মহাস্থবির আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভন্তে! আমরা তথাগতের শবদেহের সৎকার কিপ্রকারে করিব, সেবিষয়ে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ কহিলেন—"যথা খো বাসিট্ঠা রঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তি এবং তথাগতস্স সরীরে পটিপজ্জিতব্বন্তি।" অর্থাৎ—"হে বাসিষ্ঠগণ! রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের শবদেহের যেভাবে সৎকার হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য।

"রাজচক্রবর্ত্তীর শবদেহ সূক্ষ্ম নূতন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধৌত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। এই প্রকারে পাঁচশতবার বেষ্টনের পর উক্ত শবদেহ তৈলপূর্ণ লৌহ-দ্রোণীতে স্থাপন করিতে হয় এবং অপর পাত্রদ্বারা তাহা আবৃত করিতে হয়। তৎপর সকল সুগন্ধিদ্রব্যসামগ্রী দ্বারা চিতা রচনা করিয়া তদুপরি রাজচক্রবর্ত্তীর দেহকে স্থাপন করিয়া দাহ করিতে হয়। দাহান্তে চারিমহাপথের মিলনস্থানে রাজচক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে স্তূপ রচনা করিতে হয়। হে বাসিষ্ঠগণ! তথাগতের দেহও এই বিধানমতেই সৎকার করিতে হইবে।"

"চাতুমহাপথে তথাগতস্স থূপো কাতব্বো। তত্থ যে মালং বা গন্ধং বা চুণ্ণকং বা আরোপেস্সন্তি বা অভিবাদেস্সন্তি বা চিত্তং বা পসাদেস্সন্তি, তেসন্তং ভবিস্সতি দীঘরত্তং হিতায় সুখায়াতি।" (চারিমহাপথের মিলনস্থানে তথাগতের উদ্দেশে স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যাহারা সেখানে মাল্যগন্ধ বা চন্দনাদির চূর্ণ প্রদান করিবে কিংবা অভিবাদন করিবে অথবা তদ্দর্শনে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিবে, তাহাদের সেই কার্য্য বহু দিনের জন্য হিতকর ও সুখকর হইবে।)

মল্লপ্রধানগণ আয়ুষ্মান্ আনন্দের নির্দ্দেশানুসারে রাজচক্রবর্ত্তীর দেহসৎকারের বিধানমত তথাগতের দেহকে সুধৌত কার্পাস ও সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা পাঁচশত বার বেষ্টন করিয়া তৈলপূর্ণ লৌহ দ্রোণীতে রক্ষা করিলেন এবং সর্ব্ববিধ সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ঐ দেহ স্থাপিত করিলেন। তৎপর চারিজন মল্লপ্রধান স্নান করিয়া নববস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় শত চেষ্টা সত্ত্বেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলনা। মল্লগণ একান্ত বিস্মিত হইয়া মহাস্থবির অনুরুদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া তাহাদিগকে জানাইলেন,—"আয়ুষ্মান্ মহাকশ্যপ পাঁচশত ভিক্ষুসহ

পাবানগর হইতে কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আসিয়া ভগবানের পদবন্দনা না করা পর্য্যন্ত চিতা প্রজ্বলিত হইবেনা। অতএব তোমরা তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"

৩

ভগবান তথাগতের প্রিয়শিষ্য মহাশ্রাবক আয়ুষ্মান্ মহাকশ্যপ যখন পাঁচশত ভিক্ষুসহ পাবা হইতে কুশীনগরাভিমুখে আসিতেছিলেন, সেইসময় তিনি পথিমধ্যে একজন আজীবক-সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হস্তে একটি মন্দার পুষ্প এবং তিনি কুশীনগর হইতে পাবা যাইতেছিলেন। মহাকশ্যপ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধো। আপনি আমাদের শাস্তা ভগবান বুদ্ধদেবকে জানেন?" আজীবক উত্তর করিলেন, "হাঁ বন্ধু, জানি, অদ্য সপ্তাহ হইল শ্রমণ গৌতম পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মন্দার-পুষ্প তাঁহার পরিনির্ব্বাণস্থান হইতে লইয়া আসিয়াছি।"

আজীবকের নিকট ভগবান তথাগতের পরিনির্ব্বাণের সংবাদ অবগত হইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে অনেকেই একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাকশ্যপপ্রমুখ কয়েকজন বৈরাগ্যবান্ ভিক্ষু সংস্কারসমূহের অনিত্যতা ভাবনা করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিলেন। এই সময় সুভদ্র নামক এক বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিল এবং শোকার্ত্ত ভিক্ষুদিগকে বুঝাইতে লাগিল—"বন্ধুগণ! ভালই হইয়াছে, তোমরা শোক করিওনা, বিলাপ করিওনা। আমরা সেই মহাশ্রমণ হইতে মুক্ত হইয়াছি। 'ইহা তোমাদের করণীয়, ইহা করণীয় নহে' আমরা তাঁহার এইপ্রকার নির্দ্দেশের দ্বারা সর্ব্বদা উপদ্রুত থাকিতাম। এখন আমাদের যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিতে পারিব। যাহা ইচ্ছা হইবেনা, তাহা করিবনা।"

সুভদ্র জাতিতে নাপিত ছিল এবং বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। সুভদ্রের এই প্রকার উক্তি শুনিয়া মহাকশ্যপ প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি বর্ত্তমানে নীরব থাকাই উচিত বিবেচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"যাহাতে এইরূপ পাপিষ্ঠের প্রভাব সঙ্ঘে বর্দ্ধিত হইতে না পারে, অধর্ম্ম ও অবিনয় বিস্তারলাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য বুদ্ধদেশিত ধর্ম্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিব। ভগবানের দেশিত ধর্ম্ম ও বিনয় অগ্রথিত পুষ্পরাশির ন্যায় পতিত রহিয়াছে। বাতাসে অগ্রথিত পুষ্পসমূহ যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি এইরূপ পাপিষ্ঠদের দ্বারা ধর্ম্ম-বিনয়ের শিক্ষাপদসমূহ বিকৃত ও বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। অতএব বুদ্ধ-ভাষিত ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিয়া দৃঢ়সূত্রে সমস্ত গ্রথিত করিব।" এইভাবে মহাকশ্যপ মনে মনে ধর্ম্ম-বিনয় সংগ্রহ করিবার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তিনি রোদনপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন—"অলং আবুসো মা সোচিত্থ, মা পরিদেবিত্থ, ননু এতং আবুসো ভগবতা পটিকচ্চেব অক্খাতং,—সব্বেহেব পিয়েহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো, তং কুতেত্থ আবুসো লব্ভা, যন্নং জাতং ভূতং সঙ্খতং পলোকধম্মং, তং তথাগতস্সাপি সরীরং মা পলুজ্জীতি নেতং ঠানং বিজ্জতীতি।" (মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ৬।৪১) বন্ধুবর্গ! বৃথা শোক করিওনা, বিলাপ করিওনা। বন্ধুগণ, এবিষয়ে ভগবান কি পূর্ব্বে আমাদিগকে উপদেশ দেন নাই যে, সমস্ত প্রিয় ও আদরণীয় বস্তু হইতে বিনাভাব, নানাভাব, অন্যথাভাব হইতে হইবে? বন্ধুবর্গ, তাহার অন্যথা এখানে কিরূপে সম্ভব হইবে? যাহা জাত, ভূত, সংস্কৃত, তাহা নশ্বর। সুতরাং তথাগতের শরীর বিনষ্ট হইবেনা—এরূপ কথা কখনও হইতে পারেনা।

৪

আয়ুষ্মান্ মহাকশ্যপ পাঁচশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে কুশীনগরস্থিত 'মুকুটবন্ধন' নামক অভিষেকস্থানে—যেখানে বুদ্ধদেবের শব চিতার উপর স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এক স্কন্ধে চীবর স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণকরতঃ বুদ্ধদেবের

চরণে মস্তক সংলগ্ন করিয়া বন্দনা করিলেন। তৎপর পাঁচশত ভিক্ষুও উক্তপ্রকারে চিতাপ্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান তথাগতকে বন্দনা করিলেন। এইভাবে বন্দনা-কার্য্য সমাপ্ত হইলে চিতা আপনাআপনি জ্বলিয়া উঠিল (সম্মাসম্বুদ্ধস্স ভগবতো চিতকো পজ্জলি)। যেইরূপ ঘৃত বা তৈল দগ্ধ হইবার সময় ভস্ম বা মসী কিছুই দেখা যায়না, তদ্রূপ ভগবান বুদ্ধের শরীরের চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু এবং গ্রন্থি-স্থানের জলীয় ভাগ সব জ্বলিয়া গেল, ভস্ম বা মসী কিছুই দেখা গেলনা, কেবল অস্থিসমূহ অবশিষ্ট থাকিল। দাহকার্য্য সমাপ্ত হইলে অকস্মাৎ অন্তরীক্ষ হইতে উদকধারা বর্ষিত হইয়া এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে জলধারা নির্গত হইয়া চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। মল্লগণও সর্ব্ববিধ সুগন্ধি জল আনয়ন করিয়া চিতার উপর সেচন করিতে লাগিল।

অতঃপর কুশীনগরের মল্লগণ চিতা হইতে পবিত্র বুদ্ধাস্থিসমূহ সংগ্রহ করিয়া সন্থাগারে স্থাপন করিল এবং উহার চতুর্দ্দিকে বল্লম ও ধনুর দ্বারা প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তাহকাল যাবৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য, মাল্য এবং গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা পবিত্র বুদ্ধাস্থিসমূহের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিতে লাগিল।

ভালবাসি এ জীবনখানি

শান্তশীল দাশ

ছোট এ জীবন ঘিরে কল্পিকের জাল বুনে চলি,
অভিযোগ নাই কোন ; অকারণ হই না চঞ্চল।
দুটি ছোট করপুট ভরে তুলি ছোট এ অঞ্জলি,
তার মাঝে হাসিগান, আছে আলো আছে আঁখিজল।

ছোট ফুল হোক না সে, তবু তার পেয়েছি সুবাস ;
মন ভরে আছে মোর, মিথ্যা তারে পারিনি বলিতে ;
আঘাত পেয়েছি কত, কত না ফেলেছি দীর্ঘশ্বাস,
মিথ্যা সেই চলা পথ সিক্ত যাহা চরণ শোণিতে ?

অনেক পাইনি বলে হতাশায় ভরিনি জীবন ;
যা পেয়েছি, 'সত্য নয়, মিথ্যা সব, মায়ার ছলনা'
বলিনি কখনো আমি ; সকলই তা করেছি গ্রহণ ;
ছোট ছোট ফুল নিয়ে ছোট মালা করেছি রচনা।

না না বন্ধু, এতবড় মায়াবাদী হইনি তো আমি,
জীবনবিরাগী নহি, নহি আমি ক্ষুব্ধ অভিমানী ;
নহি আমি পলাতক, স্বাদ-গন্ধহীন মুক্তিকামী,
ছোট সুখ-দুঃখে ঘেরা ভালবাসি এ জীবনখানি।

"যখন প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়েই তোমার আমার হাত নাই, যখন এক মহাশক্তির দ্বারা সকলই পরিচালিত, এখন সেই মহামায়া মহাশক্তিরই নিকট সর্ব্ব বিষয়ের সংশোধনের জন্য প্রাণের সহিত প্রার্থনা করাই পরম মঙ্গলের কারণ।"

—রামকৃষ্ণানন্দ

অভাব

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বি-এ

যা ভাব নয়, তাই অভাব। এখন নঞ্ অর্থাৎ না-এর আবার ছ' রকম অর্থ হ'তে পারে বৈয়াকরণিক সিদ্ধান্তানুযায়ী ; তৎসাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ। বিরোধবোধক নঞর্থই এখানে কাজে লাগবে মনে হয়। ভাব বা 'অস্তি' অথবা অভাব বা 'নাস্তি' মূর্তং-অমূর্ত প্রত্যক্ষগোচর বিষয়-বিষয়ী কিংবা তমঃপ্রকাশের মত এমনই অত্যন্ত বিবিক্ত যে দুটো কখনও একত্রিত হ'তে পারে না। 'ক' কখনও একই কালে একই দেশে একই অবস্থায় 'আছে' এবং 'নাই' হ'তে পারে না। কেন না, উভয়ে বিরুদ্ধ।

ভাবজ্ঞান সর্বদাই জ্ঞানান্তর কোনও অস্তি, ভাতি ও প্রিয় নির্দেশ করে। প্রশ্ন হ'তে পারে, অভাব যেহেতু ভাবের বিপরীত, নিশ্চয়ই শূন্যকেই লক্ষ্য করবে আর অভাব পদার্থ স্বীকারকারী বৈশেষিক মীমাংসদর্শনগুলোও শূন্যবাদী বৌদ্ধদর্শনেরই নামান্তরে পর্যবসিত হ'বে? অভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রশ্নটি অমূলক। আচ্ছা, শুধু অভাব কি আমরা ভাবতে পারি, না, অভাব ভাবতে হ'লেই কোনও কিছুর অভাব ভাবতে হয়? অভাব কথাটি আপেক্ষিক, অভাব হ'তে হ'লেই কারও না কারও অভাব হ'তেই হ'বে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরাও বলেন contentless কোনও thought (প্রত্যয়) হ'তে পারে না।

জিজ্ঞাসা হ'তে পারে, অভাব যে আছে তার প্রমাণ কি, আর অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে গ্রহণ করার সার্থকতাই বা কোথায়? এরকম পূর্বপক্ষ সহজেই নিরস্ত হ'তে পারে, যদি আমরা জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার প্রতি লক্ষ্য দেই। প্রতি অমাবস্যা রাত্রেই আমরা আকাশে পূর্ণচন্দ্রের অভাব উপলব্ধি করি। বস্তুতঃ, আকাশে ত পূর্ণচন্দ্রের দেখা পাওয়া যায় না, তথাপি কেন ঐরূপ চিন্তা হয়, আর এই ভাবনাকে নিছক কল্পনা বলেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কোনও বিরহাকুল ব্যক্তির হয়তো কোনও স্থান সন্দর্শনে শরীর মন প্রাণ একেবারে দুঃখে ডুবে গেল। আসলে ব্যাপারটি কি হ'ল? অতীতে ঐ স্থানে এমন ঘটনা ঘটেছিল যা'তে করে ঐ ব্যক্তির প্রচুর আনন্দাভিব্যক্তি হয়েছিল, আজ সে-সব কিছুই নেই। এই না-থাকাটিই দুঃখোদ্ভবের প্রতি-কারণ হ'ল। দুঃখরূপ কার্যটি যখন সর্বসম্মত-সম্মত 'ভাব' পদার্থ, তখন তার কারণরূপ অভাবকে অলীক বলা চলে না। যা ত্রিকালে নেই তার থেকে বা তার জন্য কোনও প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। বন্ধ্যাপুত্র দেখে কেউ ভয় পান না, অখণ্ডিথের জন্য কারও লোভ হয় না, আকাশ-কুসুমের সুগন্ধে কেউ মুগ্ধ হ'ন না। তাই বলতে হয় আমাদের যে অভাব, সেটি হ'ল ভাবানুবিদ্ধ অভাব, অভাবানুবিদ্ধ অভাব নহে।

কথা উঠতে পারে, অন্ধকারে যে রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হয় এবং ভীতি কম্পনাদি হয়, সে রজ্জুতে তো কোনও কালেই সর্প নেই, তথাপি কেন পলায়ন-কম্পনাদি সংঘটিত হয়? এখানে প্রথমেই বলা যেতে পারে, রজ্জুতে সর্পের অভাবটি আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের মত নিরধিষ্ঠান নয়। শুক্তি-রজত অথবা রজ্জুসর্প ভাবরূপ শুক্তি অথবা রজ্জুকে অপেক্ষা করেই জ্ঞানে ভাসে। তা ছাড়া, প্রবৃত্তি সামর্থ্যের জন্য বেদান্তীরা রজ্জুসর্পে অথবা শুক্তিরজতে আবিদ্যক প্রাতিভাসিক সর্প ও রজত স্বীকার করেন।

অনেক দার্শনিক অভাবকে বলেছেন বিষয়গত, আবার, অনেকে বলেন, অভাব বিষয়ীগত। প্রাভা

দর্শনে এ বিষয়ে খুব বেশি বিচার হয়নি, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। নব্যবস্তুবাদী Alexander বলেন, "...negation is not merely a subjective attitude of the mind. That is only an instance of negation, in the region of mental acts. Negation or negativity is a real character of things, which means exclusion or rejection. Not-white is the character which excludes or is different from white." (১) F. H. Bradley আবার ঠিক উল্টো কথা বলেন। তাঁর মতে, "....we might say that, as such and in its own character, it (logical negation) is simply subjective: it does not hold good outside my thinking. The reality repels the suggested alteration: but the suggestion is not any movement of the fact, nor in fact does the given subject maintain itself against the actual attack of a discrepant quality. The process takes place in the unsubstantial region of ideal experiment. And the steps of that experiment are not even asserted to exist in the world outside our heads" (২) ব্রাডলির এই মত দু' দিক থেকে অসঙ্গত মনে হয়। প্রথমতঃ শুদ্ধীকরণও যে নেতি সমাধ্য একথা মানা হয়নি, আর বিষয়ের সাথে যোগ না থাকার সত্য অথবা মিথ্যা নেতিমূলক বাক্য একই স্তরের হয়েছে। Dr. F. C. S. Schiller বলেন, "Negation is a 'subjective, or better human device of thought. It is a confession of human weakness that cannot go direct to the positive core of reality. It is a tribute to the instability of being. It is always relative to human purposes." (৩) শীলারের এই মন্তব্যের মধ্যে দুটো কথা স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমতঃ অভাব বোধ মানুষের একটা দুর্বলতা, আর অভাব মানুষের প্রয়োজনাপেক্ষ। কিন্তু এই দুটোর একটাকেও আমরা স্বীকার করতে পারি না। মানুষের দুর্বলতা অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে অভাবের জ্ঞান হয় না। টেবিলে কোনও বই না দেখে যদি বলি, টেবিলে কোনও বই নেই তা হ'লে আমাদের এই কথা অজ্ঞান—প্রসূত হয় না; জ্ঞানপ্রসূতই হয়। কারণ, অভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং ঐরূপ কথা বলি। অভাবকে মানুষের প্রয়োজনাপেক্ষও বলা চলে না। ভূতলে ঘট 'না-থাকাটি' আমাদের প্রয়োজনকে অপেক্ষা ক'রে সিদ্ধ হয় না, পরন্তু, ঘট ভূতলে নেই বলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তাই দেখা গেল, শীলারের অভিমত আমরা গ্রহণ করতে পারি না কোনও মতেই।

ভারতীয় দার্শনিক প্রভাকর অভাবকে অধিকরণাতিরিক্ত আর কিছু বলেন না (অধিকরণ-কৈবল্যমাত্রম্)। ভূতলে ঘটের অভাব মানে কি? কেবলমাত্র ভূতলের সত্তা। আকাশে নক্ষত্র নেই মানে, শুধুই আকাশ আছে, আর কিছুই নেই। নৈয়ায়িকেরা প্রাভাকরদের এই মত স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, অভাব বুদ্ধি হ'তে হ'লেই বিশেষ্য-বিশেষণ, আধার-আধেয় প্রতীতির প্রয়োজন আছে। 'ঘটাভাববৎ ভূতলম্', এখানে একটি বিশেষ্য, অপরটি বিশেষণ। অথবা, ভূতলে 'ঘটঃ নাস্তি' বলে একটি থাকে আধার, অপরটি থাকে আধেয়। একই বস্তু বিশেষ্য বিশেষণ কিংবা আধার আধেয় হয় না। অভাব যদি অধিকরণমাত্র হয় তবে অভাবোপলব্ধির জন্য যে আধার-আধেয়, বিশেষ্য-বিশেষণ রূপ বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন তা' পাওয়া যায় না। অতএব মীমাংসকদের মতও গ্রহণ করা যায় না। প্রভাকরের 'অভাব' একেবারে বিষয়গত হওয়ায় গ্রহণীয় হ'ল না। অভাব যদি অধিকরণই হয় তবে 'এখানে ইহা নাই'

১। Space, Time and Deity, P. 303.

২। Principles of Logic, Book 1,, Ch III 18

৩। Formal Logic, P. 180.

এ কথারই বা অর্থ কি ? শুধু 'এখানে' বল্‌লেই তো কাজ চলে যেত ?

প্রসঙ্গতঃ, এ সম্বন্ধে Bertrand Russell (৪) এর কথা মনে পড়ে যায়। অভাব নিশ্চয়ই সত্য এবং যথার্থ কিন্তু অপরাপর বস্তুনিচয়ের মত ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ নয়। ঘটকে যেভাবে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, অনুভব করা যায় ঘটাভাবকে ঠিক সেই অর্থে দেখাও যায়না, বোঝাও যায়না। অথচ, ঘটাভাব না মেনেও উপায় নেই। Russellএর এই মত অনেকটা বেদান্তমতের কাছাকাছি।

সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভাব সম্পর্কীয় মত মেলে। উভয়েই মনে করেন, 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'। যা আছে তা নেই হ'তে পারে না, আর যা নেই তা আছে হ'তে পারে না। তবে যে আছে ও নেই বলি, সে শুধু অভিব্যক্তির তারতম্যের জন্য।

দার্শনিকপ্রবর Henry Bergson তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ Creative Evolution এ অভাব সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেছেন সেটি বুঝতে আমরা কিছু চেষ্টা করব। ইচ্ছা এবং জীবনের প্রয়োজন ছাড়া কখনও কিছু সম্পন্ন হয় না, 'আমি লিখছি।' কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন, কেন লিখছেন ? তাহলে অবিশ্যি আমাকে বলতে হ'বে, আমার ইচ্ছা হয়েছে অথবা প্রয়োজন আছে তাই লিখছি। অভাব থেকেই কাজের সূচনা। অভাব যদি কার্যারম্ভ হয় তবে অভাবের পরিপূরণ হ'বে কার্যনিষ্পত্তি। সমস্যা দাঁড়ায়, অভাব যদি শূন্য হয় তবে শূন্যের সাথে কার্যনিষ্পত্তি রূপ "কিছুকে" কেমন করে জুড়ে দেওয়া যায় ? শূন্যরূপ প্রারম্ভ পরবর্তীকে ধরে রাখতে পারে না। গণিতশাস্ত্রেও দেখা যায় কোনও সংখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে গেলেও সংখ্যার প্রকৃত স্বরূপের কোনও বৈচিত্র্য ঘটে না। বার্গসোঁর মত কি তবে অসংগত হয় না ? বার্গসোঁ নিজেও এই সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি বলেন অভাব মানে, "an annihilation of all things" কিছুতেই হ'তে পারে না। চোখ বুজে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে স্তব্ধ করেও সাধারণ লোকে যাকে অভাব বলে আমরা তা উপলব্ধি করি না।

আবার প্রশ্ন ওঠে, "হাঁ-বোধক" কোনও বাক্য যথার্থ ভাব বস্তুকে বোঝায় তবে, "না-বোধক" কোনও বাক্যও সমভাবেই কোনও যথার্থ অভাব পদার্থকেই বোঝাবে। সেই অভাব পদার্থটিরও নিশ্চয়ই বিষয়াধ্যবসায় মূল্য থাকবে। যুক্তির তাগিদে যা সত্য বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা সত্যি নয়। বার্গসোঁ বলেন, "Suppress all interest, all feeling, and there is nothing left but the reality that flows."(৫)

বার্গসোঁর মতে অভাব জ্ঞান দুটো জিনিষের উপরে নির্ভর করে। প্রথমতঃ কোনও কিছু স্মরণ করা এবং সেই কিছুকে আশা করা। আমরা সাহিত্যের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিষটি বুঝতে চেষ্টা করছি। ভবভূতির উত্তররামচরিতের নায়ক স্মরণ করছেন :

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগাৎ
অবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ .....ইত্যাদি"

এইসব স্মরণ করে আবার পূর্বতন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে আশা করছেন। আগেকার কিছুই না দেখে নিরাশ হ'চ্ছেন। চলতি কোনও দৃষ্টান্ত যদি ধরা যায় তা'হলেও দেখা যায় ঐ একই জিনিষ। কেউ হয়তো কলসী দেখে স্মরণ করলেন এই কলসীতে জল আছে এবং আশা করছেন, এখনও জল পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ, কলসীতে জল নেই, জলের অভাব আছে। এই দৃষ্টান্তদ্বয় পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায় যে প্রতি অভাব জ্ঞানেই দুটো নিরীক্ষা আছে, তন্মধ্যে একটি বাস্তব, অপরটি সম্ভাব্য। যেটি সম্ভাব্য, সেটি সর্বদাই ধারণানুগত। কলসী দেখে যখন জলের স্মরণ হয়, তখন কলসীটি হয় বাস্তব নিরীক্ষা, আর কলসীর জল সম্ভাব্য-নিরীক্ষা। কেননা, কলসীটিই আমার প্রত্যক্ষের বিষয়, কলসীর জল নহে। বাস্তব কলসীতে যদি 'ধারণা'-র জল না পাওয়া যায় তবে প্রয়োজন মেটে না বলে আমরা দুঃখিত হ'তে পারি, কিন্তু,

৪। The Analysis of Mind, P. 276.
৫। Creative Evolution, P. 311.

তাতে বাস্তব জলের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না। বাস্তব জল এখানে না থাকলেও নদী সমুদ্রাদিতে থাকে। বার্গসোঁর মতে, অভাব মানে যাকে যেখানে যে ক্ষণে যেভাবে আশা করি তার ঠিক সেখানে, সে-ক্ষণে, সেভাবে না থাকা; কিন্তু, এর দ্বারা অন্যক্ষণে ঐ স্থানেই অথবা অপরক্ষণে বা একই ক্ষণে অন্যস্থানে থাকা নিষিদ্ধ হয় না।

সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তিদেব তাঁর বোধিচর্যাবতার ও শিক্ষাসমুচ্চয়ে দুরকমের সত্য মেনেছেন—সংবৃতি ও পরমার্থ। শূন্যবাদও স্বীকার করেছেন। শূন্যের স্বরূপ ঠিক পরিষ্কার হয়নি। নাগার্জুন সর্বাস্তিত্ব ও সর্বনাস্তিত্বের মাঝামাঝি পথ নিয়েছেন। নাগার্জুনের সর্বনাস্তিত্বের জন্য দায়ী যোগাচার বিজ্ঞানবাদের অমিত প্রভাব, আর উপনিষদের প্রভাব নাগার্জুনের সর্বাস্তিত্বের উপকরণ সরবরাহ করেছিল। শেষ পর্যন্ত নাগার্জুন ভাব ও অভাবের মাঝে থেকেই সব বিচার করেছেন, ভাব ও অভাব পরস্পর বিরুদ্ধ, তাই তিনি সর্বত্রই 'বিরোধ' ও 'বাধ' (opposition and contradiction) দেখেছেন।

বৈশেষিক দর্শনে অভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কণাদ নিজে অভাব নামে স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ স্বীকার করেন নি। প্রশস্তপাদ অভাব মেনেছেন। রাম, শ্যাম নয়—শ্যাম, রাম নয়—এটি ওটি নয়। এ ত সর্বজন বিদিত। ইহাই অভাববোধের মূলে। বাৎস্যায়ন দুরকম অভাব মানেন: বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পত্নীর প্রাগভাব, আর ঘটের ধ্বংসের পরে ঘটের প্রধ্বংসাভাব। বাচস্পতি তাদাত্ম্যাভাব ও সংসর্গাভাব বা সমবায়াভাবের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বনাথ বলেন সব কিছুরই সর্বত্র সর্বকালে অভাব আছে; ঘটের অভাব ভূতলে চিরকালই আছে, ঘট যখন ভূতলে, তখন ভূতলে ঘটাভাবটি প্রচ্ছন্ন থাকে, আর ঘট ভূতলে না থাকলে ঘটাভাব প্রকট হয়। মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহের বৈশেষিক দর্শনাধ্যায়ে বলেন যা সমবায় নয় এবং অন্য কিছুর সাথে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না তাই অভাব (অসমবায়ত্বে সতি অসমবায়ঃ)। ন্যায়ের মতে অধিকরণই অভাব নয়; অভাব অধিকরণের বিশেষণ। সাংখ্য ও ন্যায় উভয়েরই মতে অভাব প্রত্যক্ষ সংবেদ্য এবং কোনও ভাবপদার্থের পরিণামে বা বিশেষণ। উদয়ন তাঁর ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে অভাবের প্রত্যক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "বাহি সাক্ষাৎকারিণী প্রতীতিঃ সেন্দ্রিয়করণিকা, যথারূপাদিপ্রতীতিঃ। তথেহকুতলে ঘটো নাস্তীত্যপি।"*

বেদান্ত ন্যায়ের মত অনুসরণ করেছেন শুধু ব্যবহার সিদ্ধির জন্য। সাধারণে মনে করে যা সত্য তা নিশ্চয়ই বিষয়ানুবদ্ধ। বেদান্ত বিষয়েরই পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। ভাবরূপ পদার্থের মত অভাবেরও একটা প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। সত্যতার মান বিষয়তা নয় কিন্তু সংগতি। ভাব কিম্বা অভাব কোনটিই শেষ পর্যন্ত সংগতি রক্ষা করতে পারে না, এজন্য সত্য নয়। উভয়েই অনির্বচনীয়। আচার্য শংকর বৌদ্ধদের শূন্য বা সর্বাত্মক অভাব খণ্ডন করেছেন। সব কিছুই শূন্য হতে পারে, কিন্তু সব কিছু শূন্য এই বোধ ত আর শূন্য হ'তে পারে না। এমনি কিছু আছে যার কাছে শূন্য প্রতীতি হ'চ্ছে কিন্তু সেই কিছুকে আর শূন্য বলা চলে না। ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্তের সাথে সাদৃশ্য আছে। তিনিও বলেন সব কিছুকে সন্দেহ করা চলে কিন্তু, আমি যে সন্দেহ করছি একে আর সন্দেহ করা চলে না। সবের অভাব হলেও চিৎ-এর অভাব হ'তে পারে না। বেদান্তের মতে অনুপলব্ধি নামক প্রমাণ দ্বারা অভাব বোধ হয়। ব্রহ্মে জগতের অভাব বোধও অনুপলব্ধি নামক প্রমাণ দ্বারাই হয়।

*। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ৩য় স্তবক, ৯১ পৃষ্ঠা।

চলার পথে

শ্রীপথিক

মনে পড়ে ছেলেবেলায় স্কুলে 'Gifts of God' নামে একটি ইংরেজি গল্প পড়তে হয়েছিল। তার সার কথা হল, ভগবান মানুষকে তাঁর সৃষ্টির সব কিছুই দিলেন, দিলেন না শুধু একটি জিনিস। সেটি হল Contentment অর্থাৎ মনের শান্তি। এটি তিনি নিজের খাস দখলে রেখে দিলেন, কেননা এটি হাতছাড়া করলে মানুষ ঐ সব উপহার নিয়েই মত্ত থাকবে, তাঁকে একবারও আর স্মরণ করবে না।

দুনিয়ার কত ভোগী লোককে দেখা হল ভগবান যাদের হাতে তাঁর সম্পদ ঢেলে দিয়েছেন কিন্তু তাদের একজনকেও দেখা গেল না যে, জীবনে শান্তি লাভ করেছে।

দেখে শুনে এই মনে হয় যে চরম মূল্য না দিয়ে এই শান্তিলাভ করা সম্ভব নয়। এর জন্যে বিষয়-ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হবে। এ মূল্য ক'জন দিতে পারে! পারেনা বলেই ত যেদিকে তাকান যায় সেখানেই অশান্তি, অতৃপ্তি।

যুগে যুগে তত্ত্বসন্ধানী সেই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন—মানুষের দুঃখ ও অশান্তির মূলে রয়েছে বিষয়-বাসনা। এই বিষয়-বাসনা-কামনা যতদিন মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে ততদিন দুঃখ ও অশান্তির গ্রাস থেকে উদ্ধারের উপায় নেই।

মানুষ চায় কি জীবনে? সে চায় সুখ, আনন্দ, শান্তি। সে জগতের নানা ভোগ্য বস্তু দিয়ে জীবনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি চায়, কিন্তু পরে সে বুঝতে পারে তা'ত হ'ল না। সুখের আস্বাদন হ'তে না হ'তে বিষাদের দীর্ঘ গ্লানি হৃদয়কে মথিত ক'রে ফেলে। এ কী বিড়ম্বনা! এ কী প্রহেলিকা! তাই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে বলে, 'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'। এর পরেও কিন্তু মানুষ বারে বারে এসবের পিছনেই ছোটে। আশার মরীচিকা হৃদয়ে নতুন উৎসাহ এনে দেয়। সে আশার ভেলায় চড়ে দুঃখ ও অশান্তির অকূল সমুদ্র পার হ'তে চায়।

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে এই দুঃখ-অশান্তির কারণ ভ্রান্তি। আমরা জগতে যা কিছুর সংস্পর্শে আসি তাদের স্বরূপ না জেনে কল্পনা দিয়ে মনের মধ্যে অন্য এক মনোহর রূপ গড়ে তুলি এবং তাদিকে তাদের অলীক রূপ নিয়ে আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে দিই। তার ফল হয় এই যে সময় এলেই আমাদের স্বপ্ন দিয়ে গড়া জগৎ ভেঙে যায়, তার বাস্তব রূপের সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু স্বপ্ন যাকে মনোহর ব'লে একবার সাগ্রহে গ্রহণ করেছে তাকে আর সহজে ত্যাগ করা যায় না। দুঃখ ও নৈরাশ্য জীবনকে তিক্ত ক'রে তোলে—এই হ'ল ভুলের ফসল। মানুষ যা কিছু পেয়ে স্থায়ী সুখের কল্পনা করে তা যে ক্ষণিক, ক্ষয়িষ্ণু, চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল তা সে বুঝেও বুঝতে চায় না। আপাত-মধুর সুখের নেশা তাকে দিশেহারা করে। ধন, জন, যৌবন—এ সব কিছুই স্থায়ী নয়। তবু কি মন তা বুঝতে চায়! নেশা এমনি জিনিস। পেতে না পেতে হারানোর ব্যথা জীবনকে জর্জর করে তোলে।

কিন্তু মানুষ কেন ভুলকে ধরে থাকে, কেন ভুল বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-পথ ত্যাগ করে না? এও এক রহস্য! প্রবৃত্তি এমনি জিনিষ যা মানুষকে কল্যাণের পথ থেকে টেনে নিয়ে যায়। চকিতে মানুষ ভুল-মূল্য বোধ হারিয়ে ফেলে। কাচকে হীরক বলে ভ্রম হয়। গরলকে অমৃত বলে বোধ হয়। অস্থায়ীকে স্থায়ীত্বের মর্যাদা দিতে চায়। ভুল যখন ভেঙ্গে যায়, কল্পনার রম্য সৌধও ভেঙে যায় তার সঙ্গে, হতাশায় দুঃখ ও গ্লানি মনকে বিষময়

ক'রে তোলে। যা মানুষকে এমনি করে পদে পদে দুঃখের আবর্তে ফেলে দেয় তাকে ভ্রান্তি বল, মায়া বল, আর যে কোন নামেই অভিহিত কর না কেন এর নাগপাশ থেকে আপনাকে চিরতরে মুক্ত করতে না পারলে দুঃখের কবল থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই।

এর পরেও কথা আছে। দেখা যায়, কত লোক যা কিছু ভোগ্য বস্তু লাভ করে সুখী হতে চেয়েছিল তার সব কিছুই পেল, তবু জীবনে সুখী হতে পারল না। সুখী হবে কি করে? এখানেও সেই মায়ার খেলা। সে নিজেকে চেনে না তাই এইভাবে সুখী হতে চেয়েছিল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভোগ্য বস্তু লাভ করলেও তার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না। মানুষের মধ্যে যিনি বাস করছেন তিনি যে অসীম, তাঁর ক্ষুধা কোন জাগতিক বস্তু দিয়ে নিবৃত্তি হতে পারে না, বাঁধনহারা মুক্তির মধ্যেই তাঁর প্রকৃত আনন্দ সম্ভব।

তাই আগে নিজেকে জানতে হবে। সে কি শুধু সুখদুঃখবোধশীল রক্তমাংসেগড়া একটি পিণ্ড মাত্র, কালের সমুদ্রে একটি বুদ্বুদের মত উঠে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া কি তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নেই! কেনই বা এই আসা-যাওয়া, কী বা এর রহস্য। কেনই বা আপনাকে প্রকাশ করার জন্যে এত ব্যাকুলতা!

সীমাবদ্ধ গতানুগতিক জীবনযাত্রা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তবে কি এই ভাল-না-লাগা বদ্ধ আবহাওয়ার মুক্ত হবার ব্যাকুলতারই অভিব্যক্তি? এরই জন্যে বোধহয় মানুষ নূতনের আহ্বানে ছুটে যায় হতে চায়, কেউবা ছুটে যায় দুঃসাহসিক হিমালয় অভিযানে, কেউবা দেশ ও ধর্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ ক'রে। জাগ্রত হৃদয় চায় আপনার পরিধি ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলতে, এবং কিছুই তার অন্তরাত্মাকে শান্ত করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ছুঁতে পারে তাঁকে—যাঁর পরিধি অনন্ত।

কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে কোথায়, কেমন ক'রে? কি তাঁর স্বরূপ? কি তাঁর পরিচয়? তাঁকে পাওয়া কি সহজ কথা! নিজের বলতে যা কিছু আছে সব খোয়াতে হবে, নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে তাঁর চরণে, তবেই তাঁকে পাবার যোগ্যতা অর্জন হবে। নিজের বলতে যা কিছু আছে,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সব যদি কায়মনোবাক্যে ছাড়তে পারা যায় তবেই আশাভরসা, নচেৎ সবই বিড়ম্বনা। এরাই ত শত্রু, তাঁকে পাবার পথ আগলে আছে, এরাই ত পথের কাঁটা। কিন্তু এদের ত্যাগ করা কি সম্ভব? এরা যে জীবনের সঙ্গে এতো প্রোতভাবে মিশে রয়েছে, এদের মায়া কাটান যাবে কেমন ক'রে? কে যেন বারে বারে হৃদয়-দুয়ারে আঘাত ক'রে ঐ কঠোর বাণী শোনায়—ঐ যাদেরকে তুমি আঁকড়ে ধরে রয়েছ, ওদেরকে ছাড়তে পার ত বেঁচে যাবে, নয়ত তোমার মরণ নিশ্চিত। এ কঠোর বাণীর মূল্য বুঝেও বোঝা হয় না। মন বোঝে ত প্রাণ বোঝে না। এই মায়ার খেলা চলবে কত কাল কে জানে!

তবে উপায়? উপায় নিশ্চয় আছে। যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন, যাঁর ইচ্ছাতে সবকিছু হচ্ছে তিনি মানুষকে শুধু কাঁদাতে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এ কিছুতে সম্ভব হতেই পারেনা। আমাদের বুদ্ধি কতটুকু। যে আমরা তাঁর সৃষ্টির একটি অণু-পরমাণুর রহস্য আমাদের বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারি না সেই-আমরা তাঁর কৌশলের মর্ম কী বুঝব, কী তাঁর গুণাগুণ বিচার করব। কেউ কি কোনদিন তা পেরেছে, না কোনদিন পারবে। তাঁর সৃষ্টিও যেমন রহস্যময়, তিনিও তেমনি রহস্যময়। এ নাহলে ত তিনি সামান্য হয়ে যেতেন। যাঁর গুণের কোন সীমা নেই, যাঁর শক্তির কোন সীমা নেই, নিষ্ঠুরতা কি করে তাতে সম্ভবে? মন বলে, তিনি মঙ্গলময় না হয়ে পারেন না, তিনি যা করেন নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন। তবে সেটা সবসময় আমরা ঠিক বুঝে উঠিনা।

আমরা তাঁকে পেতে চাই কোথা। তাঁকে চাইলে তবে ত তিনি ধরা দেবেন। সংশয় ত নিয়ত মনকে ঘিরেই থাকে। তাঁকে পাওয়া ভাল, না যা আছে তাই নিয়ে থাকাই ভাল? হাতেরটা ছেড়ে দিয়ে

কেন মরীচিকার মত তাঁর পিছনে ছুটি। এই সংশয় হলেই তুমি মরেছ। যেমনি সংশয় তোমায় ঘিরেছে অমনি তুমি তাঁর থেকে দূরে পড়ে গেলে। অমনি বাসনা-কামনা, কামিনী-কাঞ্চন তোমায় পেয়ে বসল।

এই সংশয় যাবে কেমন ক'রে! সংশয় দূর করতে হলে বিশ্বাসকে ধরতে হবে। অবিশ্বাসের দ্বারা সংশয় দূর হবে না, বিশ্বাসের দ্বারাই বিশ্বাস লাভ হবে।

তাঁকে পেলে সব পাওয়া হবে, আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকবে না, সব আকাঙ্ক্ষার পূরণ হবে, জীবনে পরমা শান্তিলাভ হবে, জীবনের সকল রহস্যের সমাধান হবে, মনুষ্য-জীবনলাভ সার্থক হবে, জীবনের সকল সমস্যার চিরাবসান হবে, অমৃতত্ব লাভ হবে—এ বোধ কি আর মুখের কথায় হয়! তা যদি হতো তাহলে ভাবনার কিছুই ছিলনা। সংসারের দুঃখ-যাতনার খরতাপে যখন হৃদয় অহরহ ব্যথিত হতে থাকে, তখনই না মানুষ পথ খুঁজে বেড়ায় কোথায় গেলে সে শান্তি পাবে। পথের সন্ধান সে পায়। সে সন্ধান কে যেন তার অন্তরের নিভৃত গুহা থেকে ইশারায় জানিয়ে দেয়। পথ যখন সে দেখতে পায়, পথে পথিকের সঙ্গে তার দেখা হয়, তখন হৃদয়ে নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস, নতুন বল আসে। আর যখন এই নতুন পথিক ভাগ্যবলে এমন কারো সাক্ষাৎ পায় যিনি তীর্থ দর্শন করে এসেছেন, তখন বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়—তবেত ঠিক পথেই এসেছি। এমনি করেই পথচলা হতে থাকে। তারপর চলার পথে যখন পথের দুধারে একের পর এক নিশানা দেখতে পাবে—যার কথা আগেই শুনেছে, তখন সন্দেহের বাকি আবরণগুলো একে একে খসে পড়বে। তখন এই পথ চলাতেই আনন্দ। চলার ক্লান্তি আনন্দের স্নিগ্ধধারায় ধুয়ে যায়। এমনি ক'রে হয়ত একদিন দূর হতে দেখতে পাওয়া যাবে গন্তব্যস্থলের আলো। তখন আর তাকে কি ক'রে রাখবে? বিশ্বাসই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। সংশয় মনকে অধিকার করলে পথ চলতে দেবেনা, ফিরে আসতে প্ররোচনা দেয়। তাই বিশ্বাসই প্রকৃত বন্ধু—বাঞ্ছিতবস্তুলাভের পরম সহায়। অবিশ্বাস ঘোর শত্রু—হৃদয়ের সব বল হরণ ক'রে পঙ্গু ক'রে দেয়। এই চলার পথে অসংখ্য বন্ধুবেশী শত্রু থাকে। কেউ বলবে, 'মরীচিকার পেছনে ছুটেছ কেন?' কেউ বলবে, ধনবান হয়ে ভিখারী হবার সাধ কেন? আবার কেউ পথের ভীষণতার আর দুর্গমতার কথা ব'লে নিরুৎসাহ করবে। এমনি আরো কত বৈরী পথ ভোলাতে কতোভাবে প্রলুব্ধ করবে। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তাদিগে ত্যাগ করার কথা দূরে থাকুক, তাদেরকে যে বড় ভাল লাগে, তাদের আপাত-মনোরম ব্যবহার যে মন মুগ্ধ করে রাখে! পরিণামের কথা ভাববার অবসর কোথায়? তাদের সাক্ষাৎ পেলে অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পেতে চায় না। তাই, তারা কাছে আসছে বুঝলে দূর থেকেই তাদের এড়িয়ে চলে যেতে হবে। এ সাবধানতা অভ্যাস করা ছাড়া উপায় নেই।

প্রাত্যহিক জীবনেই ত আমরা দেখতে পাই যে অভ্যাসের দ্বারা সবকিছু সহজ হয়, আয়ত্ত হয়। একটি পাঠ যতই শক্ত হোক বার বার পড়লে তা মুখস্থ হয়ে যায়। মাটির কলসি পাথরের ওপর রেখে রেখে পাথরেরও ক্ষয় হয়। তেমনি তাঁর স্মরণ-মনন অভ্যাস করতে করতে তা সহজ হয়ে যায়। এমন হয় একদিন তাঁর স্মরণমনন না হলে কোন কিছু ভাল লাগবে না। যেমন ভাব তেমন লাভ। মন ক্রমশঃ ঈশ্বরমুখীন হবে। মন যত তাঁর দিকে যাবে ততই মন বিষয় থেকে আপনি দূরে স'রে আসবে।

তত্ত্বদর্শী ত বলেছেন যে ভগবানকে লাভ করতে হলে—চাই পবিত্রতা, সরলতা ও ব্যাকুলতা, তা এসব ভক্তি দিয়েই হোক, নিষ্কাম কর্ম্ম করেই হোক বা অন্য কোন যৌগিক উপায়েই হোক। ঝড় যেমন চারদিক ধুলোয় ধুলো করে দেয় তেমনি অশুদ্ধভাব চিত্তাকাশ মলিন করে, তখন সেই প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ ত হতে পারে না। চিত্ত নির্ম্মল হলে তবে সেখানে তাঁর বাসযোগ্য হবে।

তত্ত্বলাভ করতে হলে শিশুর সরলতা চাই। মন,

মুখ, কাজ এক হওয়া চাই। এ না হলে সবই বিড়ম্বনা। মুখে তত্ত্বকথা আওড়ালে তাতে তত্ত্বজ্ঞ হওয়া হল না, যদি না মন তাই বুঝে থাকে—যদি না কাজের মধ্য দিয়ে তা জীবনে প্রতিফলিত হয়।

হওয়া নিয়ে কথা। ধর্মলাভ বা ভগবানলাভ মুখের কথাও হয় না, শুনেও হয় না, শাস্ত্রপাঠেও হয় না। শাস্ত্রপাঠে বা ভগবৎকথা শুনে হয়ত হৃদয়ে উদ্দীপনা হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে যদি ধর্মজীবন যাপন করতে বা ভগবানলাভ করতে সহায়তা না হয় তবে এ সব অর্থহীন হয়ে পড়ে। আধ্যাত্মিক জীবন হওয়াই সার কথা। যতটুকু সময় তাঁর অনুধ্যানে কাটে তা ধর্মজীবনলাভের উদ্দীপক ও সহায়ক হয়। এইভাব গ্রহণ করা থেকে সৎগ্রন্থপাঠ বা সাধুসঙ্গের সার্থকতা হয়। তখনই সার্থক হয় সাধুসঙ্গ যখন সাধুর জীবন দেখে সেই জীবন লাভ করতে অন্তর ব্যাকুল হয়। সাধু হওয়াই প্রকৃত সাধু-সঙ্গ।

তাঁকে পেতে হলে সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁকে চাইতে হবে। তাঁকে পাওয়ার মত এত বড় পাওয়া ত আর হতে পারে না। তবে আধা মনে চাইলে কেমন করে তাঁকে পাওয়া যাবে। সংসারের এক একটী তুচ্ছ পাওয়ার জন্যে মানুষ কত কষ্ট স্বীকার করে। আর যাকে পাওয়া হলে আর কিছু পাওয়ার থাকে না, সেই পাওয়ার জন্যে ত প্রাণপাত করতে হবে। ছোট শিশু যেমন মা ছাড়া আর কিছু জানে না, মা ছাড়া যেমন তার কিছুতেই চলতে পারে না এবং মায়ের কোলে যাবার জন্যে যেমন তার অস্থিরতা ও আকুল ক্রন্দন দেখা যায় তেমন আন্তরিক টান ও কাতরতা ভগবানের প্রতি হলে তবে ত তিনি আসন থেকে নেমে আসবেন।

যাঁকে লাভ করা মানুষজীবনের লক্ষ্য তিনি সর্ব্বব্যাপী, সদাপ্রকাশমান, অথচ বাক্যের দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। শাস্ত্রে আছে, তিনি অবাঙ্-মনসোগোচরম্। তবে তত্ত্বজ্ঞানী তাঁকে দেখেছেন, বুঝেছেন, বোধ করেছেন আর বাক্যে প্রকাশের চেষ্টাও করেছেন। উপনিষদেই দেখা যায় তত্ত্বদর্শী ঋষি কত বিচিত্র ছন্দ দিয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশের প্রচেষ্টা করেছেন। সে অপূর্ব্ব বর্ণনা অনুরাগী ভাবুক পাঠককে অধ্যাত্মভাবে আবিষ্ট ও মুগ্ধ করে। তথাপি যাঁরা ঋষি যেরূপে তাঁকে উপলব্ধি করেছেন তাই কথা দিয়ে মনুষ্যলোকে প্রকাশ করার জন্যে যেন আকুলি-বিকুলি করেছেন, কিন্তু হৃদয় যা বলতে চায় তা কিছুতেই শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে পারছেন না। তাছাড়া কত জনে কতোভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেছেন। তবু কি তাঁকে কেউ বিশেষ উপলব্ধি করতে পেরেছেন? তাঁর স্বরূপের কি কোন ইতি আছে?

তাই একজনের জানা হলে তাই দিয়ে অপরের জানা হয় না। যে-যার শুধু নিজের জানাটাই জানতে পারে, কিন্তু তা অপরকে জানাতে পারে না। তিনি যে ভাবগ্রাহ্য। ভাব দিয়েই তাঁকে ধরতে পারা যায়। যার ভাব নেই সে ধরবে কেমন করে? যে ভাবুক নয় সে ত ভাবুকের কথাও বোঝে না। তত্ত্বজ্ঞানী ভাবজগতের কথা বলেন, আর অজ্ঞানী মরজগতের বস্তুছাড়া আর কিছু বোঝে না।

সেইজন্যে ভাব না-হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রত্যয় হয় না, সংশয় থেকে যায়। এ সংশয় কেউ কারো ঘোচাতে পারে না। তত্ত্বলাভ যখন হবে তখনই শুধু সন্দেহ ঘুচে যাবে।

সংশয়ের মূলে রয়েছে অহংভাব। অহংভাব থাকতে তত্ত্বলাভ হবার উপায় নেই। অহংকার না গেলে মুক্তি নেই। 'আমি' ম'লে জঞ্জাল ঘুচবে। অহংভাব মানুষকে বিমূঢ় করে দেয়, সে নিজেকে সকল বিষয়ে কর্তা মনে করে। কর্তৃত্বভাব থেকে যত রকম রিপুর বশীভূত হতে হয়। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, জয়-পরাজয় এই সব দ্বন্দ্বভাব মনকে ঘিরে ফেলে। রাগ-দ্বেষ-হিংসার ভাব সদাই মনকে অস্থির ও কলুষিত করে। দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা তত্ত্বজ্ঞানীতেই সম্ভব। অহংভাব যার ঘুচেছে সকল কর্ম তিনি ঈশ্বরকে বরে করেন, সংসারের কিছুই তাকে লিপ্ত করতে পারে না। সে সব কিছুরই নির্লিপ্ত সাক্ষী হয়। 'আমি' 'আমার' ভাব থেকেই যত দ্বন্দ্ব, কোলাহল, অশান্তি।

যিনি অহংকারকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন জগতের কোন কিছু বিপর্যয়ই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁর সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, মান-অপমান বোধ, সব দ্বন্দ্বভাব লয়প্রাপ্ত হয়। তাঁর 'আমি' গিয়ে সবকিছু 'তিনি' হয়েছে, নদী সমুদ্রে বিলীন হয়েছে। তিনি দেখেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু সব তাঁরই প্রকাশ। তিনি ছাড়া আর পৃথক কিছু কোথাও নেই। তিনি সব হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটছে। সমুদ্রেও তাঁর প্রকাশ, আবার ঘাসের পাতার 'পরে শিশিরবিন্দু, সেও তাঁর প্রকাশ। তাঁর ইচ্ছাতে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে, তেমনি আবার গাছের পাতাটিও নড়ছে। গর্দভের বিকট রবেও তিনি, আবার কোকিলের কুহুতানেও তিনি। সবই তিনি। এই ভাবই বিশ্বপ্রেমের উৎস।

যেভাবেই তত্ত্বলাভ করতে চাও না কেন, 'অহং'কে ত্যাগ করতেই হবে। আমি কিছু করছি না, তুমিই আমায় যাকিছু করাচ্ছ সুতরাং আমার কোন কৃতিত্ব নেই। তুমি যন্ত্রী, আমাকে শুধু কৃপা করে তোমার যন্ত্র করেছ। এ অবস্থায় পরাজয়ের গ্লানি নেই, জয়ের উল্লাস নেই। নিজের সবকিছু তাঁর চরণে অর্পণ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ভগবদ্ ইচ্ছায় বিলীন হয়েছে। তাই সকল অবস্থাতেই তুষ্টি। তখন হিসাবের খাকে না, তখন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। যিনি এমনিভাবে আপনাকে তাঁর পদে উৎসর্গ করেছেন তাঁর আর ভালমন্দ বিচার থাকে না। যা কিছু হচ্ছে তা তিনিই করাচ্ছেন, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে। আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র। ভগবানের প্রতি এমন নির্ভরতা যাদের হয়েছে তাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে যেন তাঁরই প্রকাশ মূর্ত হয়ে ওঠে। এমন জীবন নিখিল বিশ্বের কল্যাণের আকর হয়।

এই ভাগবদ্-জীবন এক অবস্থা নির্দেশ করে। বাইরের আবরণ এর প্রকৃত পরিচয় নয়। সহরবাসী না বনবাসী, সংসারবাসী না আশ্রমবাসী, রাজা না প্রজা, স্ত্রী না পুরুষ, এসব গৌণ কথা দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় না। আদর্শকে বাক্যে, চিন্তায়, কর্মে প্রতিফলিত করাই ধর্ম। ধর্ম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান সত্যস্বরূপ। সত্যকে জানাই ভগবানকে জানা বা ধর্মলাভ করা, একমাত্র তিনিই সত্য, কেননা তিনিই একমাত্র নিত্য, শাশ্বত, ক্ষয়হীন, মঙ্গলময়, সুন্দর। আর সবকিছুর পরিবর্তন, ক্ষয় ও বিকৃতি আছে।

কিন্তু কথায় কথায় দিন ফুরিয়ে যায়। মলিন আবরণ তবু মনকে ঘিরে রাখে। কোথায় আলো দেখা যাবে যদি না বিরহের তীব্র অনলে সব আবরণ ও মলিনতা পুড়ে যায়। তবু ভাল, যদি অন্তর কেঁদে বলতে পারে, হে প্রভু, যদি এ জীবনে তোমায় দেখা না পাই, তবে তোমায় দেখা পাইনি সেকথা যেন মনে থাকে, যেন ভুলে না যাই, যেন শয়নে-স্বপনে অন্তরে বেদনা পাই।

—

"শ্রীশ্রীঠাকুর কহিতেন—'ভক্তের জাত নাই'। এস আমরা জগৎ জুড়ে সেই অপার্থিব একটা জাত তৈয়ার করিবার চেষ্টা করি। এই জাতির মধ্যে কেবল প্রেম—নিষ্কাম প্রেম, অকৈতব প্রেম-ভক্তির লীলা চলুক। ইউরোপের জাতিরা অস্ত্রশস্ত্রে জগৎ শাসন করতে চায়। এস আমরা শাস্ত্রবলে প্রেম, প্রণয়, শান্তিতে সংসারকে বন্ধন করি, এস এক করে ফেলি। 'দূর কর স্বার্থ, সাধ মান, ছিঁড়ে ফেল মায়ার বন্ধন'।"

—প্রেমানন্দ

যোগের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপরিমল চন্দ্র কর

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁদের অনেককেই বলতে শুনা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 'যত মত তত পথে'র উদ্গাতা ও প্রচারক। ধর্ম-কলহের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে যে কলঙ্কের কালিমা লেগে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনার মাধ্যমে তাকে বিসর্জন দিয়ে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ধর্ম মানব-জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ। সেই প্রয়োজনীয় সম্পদের সুব্যবহার যদি মানবজীবনে না ঘটে তাহলে মানব জীবনই বৃথা। কিন্তু যুগে যুগে যে সব ধর্মপ্রচারক বা মানবকল্যাণ-কামী এসেছেন তাঁরা যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধর্ম-মতের প্রচার করে গেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ধর্মমতে বা সত্য-সাধনার পথে আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্য থাকলেও সকল ধর্মই যে একই সত্যে পৌঁছানোর পৃথক পৃথক পথ মাত্র—এ কথাটা জনসাধারণ সবসময়ে বুঝতে পারেনি; আর পারেনি বলেই ধর্ম-কলহ, সাম ছেড়ে 'খোলস' নিয়ে মারামারি।

কিন্তু কলহ দূর করতে, অসাম্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতেও অনেক মহাপুরুষ এসেছেন। তাঁরা যেমন নিজের ধর্ম প্রচার করেছেন তেমনি উদার উক্তির সত্যে পৌঁছানোর জন্যে অন্যান্য পথের কথাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রত্যেক ধর্মপথের মধ্যদিয়ে সাধনা করে একই সত্যে পৌঁছেছেন। পাঁজী পুথি শাস্ত্র নিয়ে তিনি ভাষ্য করতে বসেননি, নিজের সাধনা দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভাষ্য রচনা করেছেন—সে ভাষ্য বোধির মাধ্যমে তিনি পেয়েছেন, বুদ্ধির মাধ্যমে রচনা করেননি। এইখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। 'যত মত তত পথে'র আদর্শ আমরা প্রথম পাই রামমোহনের বুদ্ধিগত লেখনীতে। স্বামী অভেদানন্দও রামমোহন শতবার্ষিকী পুস্তিকায় এ কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আদর্শের প্রত্যক্ষ রূপদাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগী অর্থাৎ তিনি যোগ করতে সিদ্ধ। ছেলেরা যেমন বিয়োগের চেয়ে যোগ করতেই ভালবাসে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও যোগেই সিদ্ধ। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এক বিরাট শিশু, যিনি বিশ্বের মায়াময় কুহেলিকায় প্রচ্ছন্নভাবে খেলা করে গেছেন। তাই তিনি যোগে সিদ্ধ বিরাট শিশু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন ভাবছি যে বিজ্ঞান সঞ্জাত জড়বাদী সভ্যতার ফলক ভিন্ন আমাদের উন্নতি অসম্ভব এবং তার মাধ্যমে সমস্তকিছু ভাল-মন্দের বিচার করছি আর আধ্যাত্মিক সত্যকে তেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছিনা, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এসে বললেন —'পণ্ডিত তুমি ভুল বুঝেছ।' জড়বাদী সভ্যতাও দরকার, তা না হলে চলবে কেন? কিন্তু তাই বলে কি আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবন থেকে বিসর্জন দেওয়া চলে? জীবনের চরমসত্যে পৌঁছানোর জন্যে তোমার সে সভ্যতার প্রয়োজন। স্বামীজী যেমন বললেন—খালি পেটে ধর্ম হয়না। ভোগ হলে তবেত ত্যাগ। কিন্তু সে প্রয়োজনের সীমারেখা টানার মাপকাঠি হবে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনার্থে তার ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে। প্রাচীনকে যারা বিসর্জন দিতে চেয়েছিল, আধ্যাত্মিকতাকে যারা মন থেকে মুছে ফেলার জোগাড় করছিল, তাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন যোগের অবতার হয়ে। বিবেকানন্দকে যদি আধুনিকতার প্রতিভূ বলে ধরি, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার বিরাট প্রতীক। তাদের উভয়ের যে মিলন, সে মিলনেও সেই যোগের বাণী; সে মিলন ঘটিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণই।

ধর্মলাভেচ্ছুকে সর্বতোভাবে ত্যাগী হ'তে হবে।

উত্তম ধারণা। কিন্তু অনেকে তার কদর্থ করে বলেন যে 'সবকিছু' ত্যাগ করতে হবে। সেই 'সব কিছু'র ভেতরে এসে পড়ে তার 'কর্তব্যে অবহেলা'র প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা। আবার, পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ এসেছেন তাঁদের অনেকেই জীবনে সন্ন্যাসকে স্থান দিয়েছেন অতি উর্ধ্বে। এমনকি তাঁরা—যেমন বুদ্ধ, শঙ্কর, প্রভৃতি এই সন্ন্যাসের উপর জোর দিয়েছেন—আদর্শ গৃহীদের কথা পড়ে রয়েছে পেছনে। বুদ্ধ চলে গেলেন সন্ন্যাসী হয়ে, শঙ্করও সেপথে জীবন দিলেন, ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যও নদীয়ার মায়া ছাড়লেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনি এলেন গৃহী ও সন্ন্যাসী—দুয়েরই আদর্শ, একাধারে বহন করে। 'নিজেই আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়', তাই সঙ্গে নিয়ে এলেন স্ত্রীরূপে সারদা দেবীকে। লীলাপটে আদর্শ গৃহী ও কঠোর সন্ন্যাসীর জীবন চললো একই রামকৃষ্ণ-শরীরে। গৃহী পেল আদর্শ গৃহী হওয়ার সন্ধান, সন্ন্যাসী পেল কঠোর সন্ন্যাসী হওয়ার নির্দেশ। এখানেও তাঁর সেই যোগের আদর্শ। দু'য়ে দু'য়ে চার হয়। যখনই চার হ'লো, দু'টো দুই-ই চারেতে মিলে গেল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায়? দু'টো দুই-ই চার-এ মিশে গিয়েও পরস্পরে অস্তিত্ব যেন বজায় রাখলো। তাঁর কাছে সমন্বয় মানে অস্তিত্বের বিলোপ নয়।

সত্যে পৌঁছানোর চারটি পথ—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও রাজযোগ। মনের বাঁধুনি অনুযায়ী যার যা ইচ্ছে সেই পথেই সে এগোতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে? চার যোগেরই সমন্বয় তিনি। শুধু তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীটিই যেন এই যোগসমন্বয়ে তৈরী চক্রবিশেষ। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান, শ্রীসারদা ভক্তি ও শক্তি, শ্রীবিবেকানন্দ কর্ম ও রাজযোগের অপূর্ব নিদর্শন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠী একটি যোগচক্র; বিয়োগের কোন চিহ্নই নেই—শুধু যোগ আর যোগ।

ধর্ম মানবের পরমবন্ধু। সেইধর্ম একান্তভাবে ব্যবহারিক ও অন্তর-গত। তাতে অধিকার সবার। কিন্তু বৈদিকযুগের পরে আমরা সেই ধর্মের কাঠামো তৈরী করেছি ক্ষমতা লাভের মাপ কাঠিতে। নারীকে রেখেছি তা'থেকে অনেকাংশে সরিয়ে; শ্রেণীবিভাগ করে ধর্মের বিভিন্নতা অর্থাৎ খোলস তৈরী করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোকে জোর করে প্রয়োগ করাতে চেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকেই সে কাঠামোতে ফাটল ধরল। ফাটল আগেও অনেক মহাপুরুষ ধরিয়েছিলেন, কিন্তু এবারের ফাটলের আর জোড়া লাগলোনা। কেননা সাথে সাথে এল শিল্প-বিপ্লবের সাম্যবাদী আলোড়ন। মানসিক বিপ্লব আনলো শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মের মাধ্যমে; জাগতিক চাঞ্চল্যের আলোড়ন তুললো নানাদেশের ত্বরান্বিত শিল্পায়ণে। যারা সচেতন, তারা নিশ্চয়ই সে ফল লক্ষ্য করছেন, না করে থাকেন তো ধীরে ধীরে লক্ষ্য করতে পারবেন। নারীর ধর্মে শুধু অধিকার নয়, তার চরম অধিকার আছে—শ্রীরামকৃষ্ণসাধ্বী সারদা দেবী তার প্রমাণ। প্রত্যেক কৃত্রিমভাসৃষ্ট শ্রেণীর ধর্মে কর্মে সমান অধিকার, শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ ও তার আদর্শ তার প্রমাণ। মানসিক ও জাগতিক জাগরণ ধর্মে ও কর্মে। বিবেকানন্দবাণী ও তার ক্রমিকরূপায়ণ তার প্রমাণ—আর সে বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।' তাই শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন বন্ধন ভেঙ্গে যোগের সন্ধান দিতে।

সাধন, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ-সরলতাই হচ্ছে সত্যসুখ, আর স্বার্থপরতা, অভিমানই সাক্ষাৎ নরক। কৃপাময় ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমাদের নূতন পথ—শান্তির মার্গ নিজ জীবন দিয়া দেখাইয়াছেন।

—প্রেমানন্দ

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী, এম-এ, কাব্যতীর্থ

ভারত-গৌরব-রবি হে রবীন্দ্র লহ এ প্রণাম।
আজি মোরা মৌন নতশিরে
স্মরিয়া তোমার প্রিয় কী আনন্দদীপ্তি অভিরাম
শুধু তাই ভাবি আঁখিনীরে।

ষড়ঋতু-আবর্ত্তনে নিত্য নব তব অবদান
বিশ্বের বেদনা মথি' বাজে তব আনন্দের গান
ভেসে আসে প্রাণ-সুরধুনী।

শুকায়ি' ফিরিছ নিত্য চিত্তাকাশে নিখিলের তুমি,
তুমি নাই, আছো তবু, তোমারে স্মরিছে মাতৃভূমি,
তব পদধ্বনি ওই শুনি।

নিত্য নব বিভীষিকা জীবনেরে করিছে বিহ্বল,
হে গুরু, অভয় দাও সবে,
শান্তির কমলবনে ঝিকিঝিকি জ্বলিছে অনল
উল্কা হেরি ছোটে নীল নভে।

বাজাও তোমার বীণ', কবিগুরু, মৃদু, মনোহর
বহাও তৃষিত বিশ্বে প্রেমপ্রীতি-অমিয়নির্ঝর
দেখা দিবে আবার জীবন,
নবশ্যামতৃণাঙ্কুরে হেসে পুনঃ উঠিবে বসুধা,
যাবে দুঃখ, যাবে ক্লেশ, মিটে যাবে সর্ব্ব গ্লানি ক্ষুধা,
সুরগঙ্গা হবে সমীরণ।

অপার দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত করোনি কভু কা'রে
তব কাব্যমণিমঞ্জুষায়
সকলে লভেছে ঠাঁই, সর্ব্বসুখদুঃখবেদনারে
বেঁধেছ যে সুরের ধারায়।

কচগুরু কবিরে তুলাতে পাঠাইয়া নারীরে জাগালে,
বিজোত্তম-রাজটীকা পরাইলে সত্যকাম-ভালে,
শরতের প্রশান্ত অম্বরে
চম্পকরঞ্জিত রৌদ্রে শুনালে গভীর বেদনায়
ছাগল শিশুর কান্না—বুঝেছে তাহারা আজি হায়
পূজার ছুটি যে এসে পড়ে।

এ দুর্ভাগা দেশ হ'তে গ্লানিভয় করিবারে দূর
চেয়েছিলে হে দেশদুলাল,
উদয়ের পথে তাই বাজাইলে বীণ সুমধুর।
ছিন্ন করি' কুজ্ঝটিকাজাল
জ্যোতির কনকপদ্ম দেখা দিল প্রথম প্রভাতে।
তুমি কোথা, কোথা তুমি, চাহি আজি তোমার সাক্ষাতে
মুক্তিপথে বাড়াতে চরণ।
অলক্ষ্যে রয়েছে সদা জানি জানি তব বরাভয়,
অন্তরে জানি যে তাই জীবনের নাই পরাজয়,
অগ্রগামী, হে শঙ্কাহরণ।

বীণাতন্ত্রে আজি হানো হৃদয়েতে ঝঞ্ঝনা ঝঙ্কার
ভেসে যাব উদ্দাম প্রবাহে,
এ নিগড় জীবনেরে করিয়াছে মহাকারাগার,
প্রাণ কেঁদে আজি মুক্তি চাহে।
যে পথে বলাকা চলে, মেলে বীজ অঙ্কুরের পাখা
সেই পথে আজি যেন যাত্রাপথ রহে মোর আঁকা।
বিশ্বকবি, লহ নমস্কার,
সুদূরের পান্থ আমি, তুমি যে ক্ষণিক দিলে ঠাঁই,
কাব্যকুঞ্জবনে তব—আজি মোর কোনো ক্ষোভ নাই
প্রণতি জানাই বারম্বার।

আজকের সাহিত্য*

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনমতের দিক থেকে দেখতে গেলে আজকে বাংলা দেশে লেখক হিসেবে যিনি সব থেকে বড়ো প্রতিষ্ঠার আসন লাভ ক'রেছেন, তিনি লাভপুর, বীরভূমের তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর এই বিরাট সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই কথাটাই স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে যে, একান্তভাবে যদি নিষ্ঠা এবং ধৈর্যের সংগে সাধনা করা যায় তাহ'লে একদিন খ্যাতির তুঙ্গ শিখরে পৌছনো অসম্ভবের কোঠায় পড়েনা। তারাশংকর আজ পর্যন্ত যা আমাদের দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আছি। তাঁর দানের ভিতরে সব থেকে যেটা মহৎ, সব থেকে যেটা স্মরণীয় সেটা হোচ্ছে সাহিত্যের প্রতি তাঁর একান্ত স্নেহ এবং নিষ্ঠা। শরৎচন্দ্রের পরে এতোটা দরদ খুব কম লেখকের লেখার মধ্যে চোখে প'ড়েছে। প্রাণ দিয়ে তিনি বাংলাদেশকে ভাল বেসেছেন।

তিনি যে ক'খানি গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন, —'কবি' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' 'মন্বন্তর' প্রভৃতি —প্রত্যেকটীতেই এর প্রমাণ আছে। বিশেষ ক'রে তিনি 'কবি'-তে যে স্নেহরস, যে দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন তা সমস্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল বললে, আশা করি অত্যুক্তি হবেনা। পশ্চিম বাংলার একটা রূপকে তিনি সাহিত্যে অক্ষয় আসন দিলেন, তাঁর প্রকাশিত সব ক'খানি বই সম্বন্ধেই একথা বলা চল্‌তে পারে। তবে 'মন্বন্তরে' তিনি একটু নতুন চেষ্টা ক'রেছেন। এবারে উপন্যাসের পটভূমি হোয়েছে, কলকাতা মহানগরী। যা তিনি এর মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন, তা প্রায় সবই স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে, তবে ত্রুটীও আছে অনেক। তবু বলবো, যিনি এপর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ লেখাই গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে লিখে এসেছেন, যিনি বাংলাদেশের গ্রামকে সত্যিকারের রূপ দিতে পেরেছেন, তাঁর হাতে সহরের এতো উজ্জ্বল প্রকাশ হঠাৎ আশা করা যায়না। এইখানেই তারাশংকরের শক্তির চরম বিকাশ। তাঁর সম্বন্ধে ভাবলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সত্যিকারের চোখ আছে তাঁর। যা একবার দেখেন, তাকে প্রাণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন। নইলে 'মন্বন্তর' তাঁর হাতে ব্যর্থ হোত। আর একটা প্রশংসার কথা এই যে তাঁর প্রচলিত ধারাকে এড়িয়ে তিনি 'মন্বন্তর'-এ যে চল্‌তি ভাষা ব্যবহার ক'রেছেন তা অত্যন্ত উপযুক্ত হ'য়েছে—স্থানে স্থানে তাঁর লিপিকুশলতা আমাদের স্তম্ভিত ক'রেছে। এই প্রসংগে বলা যেতে পারে অসংখ্য ছোট গল্প লিখে তারাশংকর যে খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন তাও বিশেষভাবে এখানে স্মরণীয়।

এ পর্য্যন্ত তিনি যে ক'খানি উপন্যাস রচনা ক'রেছেন, সেগুলির মধ্যে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে। নিঃসন্দেহে এটী তাঁর একটী অপূর্ব সৃষ্টি হোয়েছে। সেই সংগে সাধারণ রসোত্তীর্ণ রচনা হিসেবে তাঁর 'অভিযান', 'ঝড় ও ঝরাপাতা' 'পদচিহ্ন' প্রভৃতি মোটামুটি মন্দ নয় কিন্তু সব থেকে আমাদের মনে ধাক্কা দিয়ে গেছে 'সন্দীপন পাঠশালা'। অপূর্ব কয়েকটী চরিত্র চিত্রিত হোয়েছে এ বইটীতে। সব থেকে আনন্দের ঘটনা এই যে তাঁর উপন্যাসের ছায়াচিত্রের মধ্যে এই বইটাই আশ্চর্য্য রকম স্মরণীয় হ'য়ে উঠেছে এবং সেই সংগে দুঃখ করবার কারণও এই ঘটলো যে এই বইটার জন্যে কতোগুলি অর্বাচীন মানুষের হাতে চরম লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হ'য়েছে তাঁকে। এই হতভাগা দেশে মানুষের কল্যাণ-কার্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকায় এই বোধ হয় যোগ্যতম পুরস্কার।

* এই প্রবন্ধটি বেশ কিছুদিন আগে লিখিত। স. বি.

এঁর পরে যাঁর নাম আমাদের স্বভাবতঃই মনে আসে তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' লিখে যে খ্যাতি তিনি অর্জন ক'রেছেন তা বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। তাঁর গ্রন্থ 'অনুবর্তন'-এ যে ক্ষমতার পরিচয় দেখেছি তা শুধু অপূর্ব নয়, অবিস্মরণীয়। বিভূতিভূষণের রচনার প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে ঐকান্তিক দরদ এবং তার সংগে কাব্যানুভূতি। তাঁর রচনায় কাব্য এতো বেশী ক'রে থাকে ব'লেই বোধহয় পাঠকের মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়।

এঁর ছোট গল্পেও প্রচুর শক্তির পরিচয় দেখেছি। সব থেকে আশ্চর্য হোয়েছি তাঁর এতো সহজে গল্প বলবার ভংগী দেখে। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন :

"সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।"

সত্যিই তাই। বিভূতিভূষণ তা অনেক অংশে সফল ক'রেছেন; সেইজন্যে অতি সাধারণ ভ্রমণ-কাহিনী 'অভিযাত্রীক' অসাধারণের শ্রেণীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

তিনি 'উপলখণ্ড' প্রভৃতি নাম দিয়ে কয়েক-খানি যে ডায়েরী গোছের বই প্রকাশ ক'রেছেন, যথার্থই সেগুলি অভিনব হোয়েছে। এই বইগুলি পড়তে অনেক সময়ে গল্পের থেকেও চিত্তাকর্ষক মনে হয়। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য যা লিখেছেন, তারমধ্যে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'অনুবর্তন' এবং 'দেবযান' সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। শেষোক্ত বইটিতে তো রীতিমতো একটা আন্দোলনের সূচনা হোয়েছিলো।

শিশুসাহিত্যেও তাঁর হাত সমানভাবে অব্যাহত। 'বনে পাহাড়ে' প্রভৃতি গল্প-পুস্তক তার জলন্ত সাক্ষ্য। কিন্তু তিনি যে 'অথৈজল' 'দুইবাড়ী' এবং 'কেদার রাজা' প্রভৃতি ছোট ছোট তিনখানি উপন্যাস পরপর লিখেছেন, দুঃখের বিষয়, কোনটাই তাঁর পূর্ব প্রতিভাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

সব থেকে যে বইখানি তাঁর বাংলা-সাহিত্যে অমর হোয়ে থাকবে, তার নাম 'আরণ্যক'। ঠিক এই দৃষ্টিভংগীতে লেখা বোধহয় আর কোনো বই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সাহিত্যে রচিত হয়নি। যে বিরাট মৌলিকতা এবং বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আছে তা সুচিরকাল রসিক ব্যক্তিদের আনন্দবর্ধন করবে।

বিভূতিভূষণের পরে যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হোচ্ছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যাল। এঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই সকলের আগে মনে পড়ে তাঁহার কথা। এক কথায় অপূর্ব। এরকম রচনা-কৌশল, লিপিচাতুর্য দেখে মন শ্রদ্ধায় ভ'রে ওঠে। অবশ্য স্বীকার করি তাঁর লেখার সমস্ত ধারাটাই রবীন্দ্র-নাথকে অনুসরণ ক'রে, তবু বলবো এমন সার্থক অনুসারককে তো দেশে আর দেখ্‌লাম না।

প্রবোধকুমারের মহৎ গুণ তাঁর ঘটনা-বিন্যাস। কী অবলীলায় যে তিনি ছবির পর ছবি এঁকে চলেন তা দেখ্‌লে বিস্মিত হোতে হয়। ছোট গল্পেও অসাধারণ এক একটা ব্যঞ্জনা দেখেছি। উপন্যাসের মধ্যে তাঁর 'কলরব' 'প্রিয় বান্ধবী' 'নবীন যুবক' 'আঁকাবাঁকা', 'নদ ও নদী' স্মরণীয়। তবে শেষের উল্লিখিত দুখানি বইতে তিনি বিশেষ একটু সাহস দেখিয়েছেন। বিশেষ ক'রে 'আঁকাবাঁকা'তে কয়েক জায়গায় যা তিনি লিখেছেন তা প্রকৃত রুচিবোধকে পীড়িত করে। তাঁর মতো শিল্পীর কাছ থেকে এই জিনিষেরই আরো রসোত্তীর্ণ প্রকাশ আমরা আশা ক'রেছিলাম। 'মহা-প্রস্থানের পথে' এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য ব'লে মনে করি, কারণ সমস্ত বাংলাদেশে এ বই যে সাড়া এনেছে তা আর কোনো গ্রন্থে দেখা যায়নি। তবে বিশেষ দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'শ্যামলীর স্বপ্ন' পড়ে আশাহত হয়েছি। মনে হচ্ছে তাঁর লেখার তীব্রতা অনেকটা ক'মে এসেছে; অবশ্যই তিনি 'অঙ্গার'-এর মতো ভালো গল্পও লিখেছেন, তবু তাঁর এবিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

এবারে যাঁর নাম মনে আসছে, তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কল্লোল, কালি-

কলমের যুগে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রেছিলেন বলা যায়। তাঁর প্রথম রচনা 'বেদে' প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিপত্রলিখেছিলেন তা দেখে আশা করা গিয়েছিলো যে আগামী কালে তাঁর হাত থেকে একটা বিরাট কিছু দান হয়তো পাওয়া যাবে সাহিত্যে। অনেকেই প্রবল ঔৎসুক্যে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু আজো পর্যন্ত সেরকম কিছু মহৎ সৃষ্টি'র (Great art) আভাস না পেলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর নিত্য নূতন পরীক্ষার অন্ত নেই। 'আসমুদ্র' উপন্যাসটি লিখ্‌বার পর দীর্ঘকাল তিনি নীরব ছিলেন ; অবশ্য ছোট গল্পের ধারা তাঁর সব সময়েই ব'য়ে চলেছিলো। তারপরে ১৩৫০ সালে এসে লিখ্‌লেন দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ কাহিনী "যায় যদি যাক" এবং তারপরে "যে যাই বলুক"। ছোট গল্পে মুসলমান সমাজ নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা আরম্ভ ক'রেছেন তা সর্বাংশে জয়যুক্ত হ'য়েছে। "দেশ" পত্রে প্রকাশিত 'পদ্মাযাত্রা' গল্পটী নিঃসন্দেহে তাঁর অনেক সার্থক সৃষ্টির মধ্যে একটী উজ্জ্বল তারকার মতো হ'য়ে রইলো। শিশুসাহিত্যেও তাঁর দান কম নয়, কিছু কিছু কবিতাও প্রথম জীবনে লিখেছিলেন তবে তা তাঁর গদ্য-রচনাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

কবি-মন নিয়ে জীবনী রচনায় তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা সাহিত্য-জগতে অতুলনীয়। পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমাপ্রকৃতি সারদামণি প্রভৃতি আধুনিক রচনাগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এঁর পরে আমরা বনফুলের নাম করতে পারি। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই সব থেকে আগে মনে পড়ে তাঁর ছোট গল্পের কথা। এককথায় বাংলাসাহিত্যে তাঁর সব থেকে বড়ো দান এই 'ছোট গল্প'। মাত্র ১০।১২ লাইনের মধ্যে এরকম অপূর্ব লেখা ইতিপূর্বে আর কেউ লেখেননি। তিনি নাটক এবং কবিতা রচনাতেও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রধানতঃ তিনি ছোট গল্পলেখক। তিনি যে 'অদম্য' শীর্ষক একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস রচনা ক'রেছেন, অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি যে সেটী একেবারেই ব্যর্থ হ'য়েছে। 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটী তাঁর একটী অপূর্ব সৃষ্টি বলা যায়।

এরপরে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ একটা স্বকীয় ভংগী নিয়ে তিনি আবির্ভূত হোয়েছেন। অবশ্য এ-কথা ঠিক বর্তমান সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁকে যেমন আচ্ছন্ন ক'রেছে তেমন আর কোনো সাহিত্যিককে পারেনি ; কিন্তু তা হোলেও তারই মধ্যে তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছেন। এঁর প্রবন্ধ-রচনার যে ক্ষমতা দেখেছি তাতে বিস্মিত হোতে হয়। ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং সমালোচনায় ইনি বিশেষ কৃতী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এঁর পাঠক সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ, কারণ অখ্যাতিটাই তাঁর বেশী প্রচারিত। যাঁরা নিন্দা করেন তাঁরা যদি দয়া ক'রে একটুও এঁর লেখা মন দিয়ে পড়েন তাহ'লে তাঁদের মত পরিবর্তন হবেই, এরকম আমি মনে করি। উপন্যাসের মধ্যে 'লালমেঘ', 'ধূসর গোধূলি', 'হে বিজয়ী বীর', 'সাড়া' অপূর্ব-সৃষ্টি। এঁর লেখা উপন্যাস 'কালো হাওয়া' অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং স্মরণীয় রচনা। প্রবন্ধের মধ্যে 'উত্তর ত্রিরিশ' এবং 'কালের পুতুল' উল্লেখযোগ্য।

তারপরে যাঁর কথা আমাদের মনে পড়ছে তাঁর নাম শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে এই কথাটাই মনে হয় যে অসাধারণ শক্তি নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে নেমেছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে এরকম ক্ষমতা আশার কথা। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর চিন্তা এতোটা অগ্রসর ছিলো যে তাঁকে অনেক সময়ে আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারতাম না। তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'সহরতলী' অক্ষয় সৃষ্টি—কিন্তু খুব দুঃখের সংগে বলছি আজ তাঁর লেখা এতো নেমে এসেছে যে তাঁর সম্পর্কে নতুন ক'রে আর কিছুই যেন আশা করবার নেই, বিশেষ ক'রে নরনারীর

যৌন-সম্বন্ধ নিয়ে আজকাল তিনি যে নিম্ন রুচির সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, ভয়ানক আশঙ্কা হয়, শেষপর্যন্ত সেইটাই তাঁর খ্যাতির প্রকাশ প্রতিবন্ধক হবে।

এঁর পরে আশাকরি শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের নামের নাম অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। ছোট গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ, প্রবন্ধ এবং কবিতায় ইনি বিশেষ পারদর্শী। তবে ইনি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক। এঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য'-এ যে ক্ষমতার পরিচয় দেখেছি, তাতে আশ্চর্য হোতে হয়। ইনি 'পথে প্রবাসে' নামক ভ্রমণ-কাহিনী লিখে প্রথম নাম করেন। 'সত্যাসত্য' সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে পৃথিবীর সাহিত্যে এটী একটী স্মরণীয় রচনা।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের পরে শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে যাঁর নাম মনে আসছে তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী। 'শতাব্দীর অভিশাপ' নামক একটী উপন্যাস লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন—সম্প্রতি 'কালো ঘোড়া' নামক পুস্তকখানিও পাঠক সমাজে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। এ-ছাড়া 'হংসবলাকা' 'স্বাস্থনিবাস' 'বন্ধনী' 'ঘরের ঠিকানা' 'মহুয়াক্ষী' প্রভৃতি বইগুলি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ছোট গল্পেও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। তিনি 'বর্তমান' নাম দিয়ে একটী প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। নূতন লেখক সৃষ্টির দিকে তাঁর যে অনন্ত ধৈর্য এবং উৎসাহ দেখেছি তা অবিস্মরণীয়।

শ্রীযুক্তা শৈলজানন্দের নাম বাংলাদেশের পাঠক সাধারণের কাছে আজ আর মোটেই অজানা নয়। বর্তমানে কথাচিত্র পরিচালক হিসেবে তিনি অনেক বেশী নাম ক'রেছেন। অর্থাৎ লেখক শৈলজানন্দকে পরিচালক শৈলজানন্দ অনেক ছাড়িয়ে গেছেন। এঁর রচনায় যে অপূর্ব বৈচিত্র্য দেখেছি, বিশেষ গল্প বলবার যে অদ্ভুত ভঙ্গী তা অনবদ্য, সত্যিই তা প্রশংসার অতীত। বহু ছোট গল্প এবং উপন্যাস তিনি রচনা ক'রেছেন, এবং তার মধ্যে প্রায় সবগুলিই চমৎকার উত্তীর্ণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাংলা দেশের পাঠক পাঠিকা আজ তাঁকে ভুলতে ব'সেছে—প্রথম জীবনে যে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে ব'সে সাধনা ক'রেছিলেন, আজ কথা-চিত্রের মহিমায় তিনি ঠিক তেমনি ঐশ্বর্যশালী হ'য়েছেন, তাই বাংলাদেশের পাঠক পাঠিকার পক্ষ থেকে একান্ত অনুরোধ, আবার তিনি সাহিত্যে ফিরে আসুন। কে বলতে পা'রে আগামী দিনে বাংলা সাহিত্য তাঁর হাত থেকে মহৎ একটী 'সৃষ্টি' উপহার পাবেনা?

হাস্যরসের প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা হিসেবে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছেন, তাঁর বিষয় এদেশে এতো বেশী আলোচিত হোয়েছে যে এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

রচনার দিক থেকে তিনি অত্যন্ত সংযমী, তাঁর লিখিত গল্প-গ্রন্থ 'হনুমানের স্বপ্ন' এবং 'আমাদের-জাতির কথা' নিঃসন্দেহে স্মরণীয় সৃষ্টি। তবে লেখার তীক্ষ্ণতা আগের থেকে অনেক ক'মে গেছে।

তাঁর পরে যে ক'জন বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের সৃষ্টি ক'রে চ'লেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সমুদ্ধ এবং প্রমথ নাথ বিশীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বিভূতিবাবুকে রসরচনায় প্রায় সিদ্ধহস্ত বলা চলে। তবে তাঁর রচনা নিছক হাস্য রসাত্মকই হয় না—তার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম বেদনা বোধও জড়িত থাকে। তিনি 'নীলাঙ্গুরীয়' বলে একটী সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখেছেন—প্রথম দিকটা ভালো হ'য়েছিলো, কিন্তু শেষের দিকে লেখা অত্যন্ত এলিয়ে পড়েছে।

সমুদ্ধ কয়েকটী শিকার-কাহিনীর উপরে চমৎকার রসসৃষ্টি ক'রেছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল' 'দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা' প্রভৃতি লেখা মন্দ নয়।

কবি সত্যেন ভট্টাচার্যের লেখা 'দিবাস্ত' 'অরামাটী' প্রভৃতি কয়েকটী বই পড়লাম। এঁর হাত ভালোই, তবে অচিন্ত্য কুমার এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব এঁর উপরে খুববেশী রকম প'ড়েছে। এঁর কবিতা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। সমালোচনা এবং কিছু

প্রবন্ধও তাঁর আমরা প'ড়েছি। কিছু 'পূর্বাশা' পত্রিকাটী তাঁর সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন—যদিও মাত্র দু'তিনখানি উপন্যাস লিখেছেন, তা হলেও তাঁর লেখায় আমরা প্রতিশ্রুতি দেখেছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে তিনি লেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন। ছোট গল্পেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিলো, তার প্রমাণ 'সবার সাথে' নামক গ্রন্থটী। উপন্যাসের মধ্যে 'অন্ত্যেষ্টি' এবং 'তীর ও তরঙ্গ' অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ।

নিছক ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে নাম করতে গেলে আগেই শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা মনে আসে। বাংলা দেশে ছোট গল্পে তাঁর আসন যে সবার প্রথমে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কবিতাতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখেছি। তাঁর কবি-প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। কয়েকখানি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে 'উপনায়ক' বিশেষ ভালো হোয়েছে। এইটাই মনে রাখা উচিত যে তিনি প্রধানতঃ ছোট গাল্পিক—ঔপন্যাসিক নন-কথা-চিত্র পরিচালক হিসেবে শৈলজানন্দের মতো তিনিও নাম করেছেন।

ছোট গল্পে দ্বিতীয় যাঁকে মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এ কথা বলা চলে যে তিনি যে শ্রেণীর ছোট গল্প আমাদের সাহিত্যে দান করেছেন, তার তুলনা নেই। বাংলাসাহিত্য এর জন্যে তাঁর কাছে চিরঋণী রইলো। ঐতিহাসিক পটভূমির উপরে এসে সার্থক গল্প যে লেখা সম্ভব হ'তে পারে এ আমাদের ধারণার বাইরে ছিলো। তার বড়ো প্রমাণ এঁর লেখা 'বিষকন্যা' গল্পসংগ্রহটী। এঁর হাতে উপন্যাস একেবারেই জমেনি। দুঃখের বিষয় এই যে ইনিও ছোট গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছেন—আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে তাঁর আরো ভালো ছোট গল্প থেকে কেন সাহিত্যকে বঞ্চিত করছেন? এ বিষয়ে তিনি যদি একটু অবহিত হন তাহলে আমরা আনন্দিত হবো।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসুও ছোট গল্পে বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। 'বনমর্মর' 'দেবী কিশোরী' অপূর্ব। সম্প্রতি তিনি উপন্যাসে হাত দিয়েছেন। রোমান্টিক গল্পে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা আছে। সম্প্রতি উপন্যাস 'ভুলি নাই' বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেছে—কথা-চিত্রেও এটী যথেষ্ট সুপরিবেশিত হোয়েছে।

এইখানে শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্তের নাম আজ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। দীর্ঘকাল তাঁর লেখা বন্ধ ছিলো, তারপর আবার লিখছেন। এঁর 'ইহাই নিয়ম' বইটী বাংলা সাহিত্যের একটী অবদান বিশেষ।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে ছোট গল্পে শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। বাংলার গল্প-সাহিত্যের তিনি একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর নাম স্মরণীয় হোয়ে রইলো। তাঁর 'ফসিল' 'পরশুরামের কুঠার' 'গঙ্গোত্রিসার' প্রভৃতি বই, এর প্রমাণ। 'তিলাঞ্জলী' শীর্ষক একটী উপন্যাসও তিনি রচনা ক'রেছেন, রচনাটী খুবই ভালো হ'য়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে দীর্ঘকাল হোলো তিনি লেখা অস্বাভাবিক ভাবে কমিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতো প্রতিভাবান শিল্পী যদি এতো অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হোয়ে যান, তা হলে তার থেকে দুঃখের ঘটনা আর কি আছে?

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ রায় দীর্ঘকাল থেকে ছোট গল্প লিখছেন। এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু উল্লেখ যোগ্য আমরা পড়িনি, ভালো প্রাবন্ধিক হিসেবেই তাঁকে আমরা জেনে এসেছি—সম্প্রতি 'তমসা' এবং 'পদ্মনাভ' শীর্ষক দুটী-গল্প প'ড়ে মনে হচ্ছে তাঁর রচনায় প্রতিশ্রুতি আছে। 'উদয়ের পথে' নামে একটী বড়ো গল্প লিখে এবং বাণীচিত্রে তা অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করায় তিনি আমাদের দেশে সবিশেষ প্রখ্যাত হোয়েছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, রজত সেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'উপনিবেশ' উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মিত্র 'ধাপপুঞ্জ' শীর্ষক একটী উপন্যাস লিখেছেন —বইটী খুবই ভালো হোয়েছে। স্বর্গতঃ শক্তিশালী লেখক শ্রীযুক্ত সোমেন চন্দ এবং রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়কেও এখানে আমি শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি।

এর পরে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ-সাহিত্য নিয়েও কিছু বল্‌তে চাই-এর মধ্যে নাম করতে হ'লে সর্বাগ্রে আমাদের শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপকুমার রায়ের নাম মনে পড়ে। দিলীপ বাবুর 'তীর্থঙ্কর' বাংলা সাহিত্যে একটী অমর অবদান। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু এবং জ্যোতির্ময় রায়ের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ ক'রেছি। আধুনিক প্রবন্ধকারদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্প এবং উপন্যাসেও তাঁর বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় আছে। এই প্রসংগে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এবং বিনয় ঘোষের নামও শ্রদ্ধার সংগে উচ্চারণ করি।

(আগামীবারে সমাপ্য

লহ হে লহ নমঃ

সচ্চিদানন্দ সান্যাল, সাহিত্য-বিনোদ

জীবন তোমা' চাহিছে প্রিয়তম।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে আকাশভরা তারার হারে
নিঝুম ঘরে ঘুমের ঘোর নয়নে নাহি মম
নীরব ধরা ডাকিছে – 'প্রিয়তম'।
জাগে অজানা কিসের ব্যাকুলতা ?
শাঙনমেঘে বরষে কা'র সজল স্নেহ করুণা ধার
বিরহে কা'র ভুবন ভরা ব্যথা ?
মাদরী-রাতে উতল বায় কাহার কহে কথা ?

পাহাড় বাহি' ঝরণা যায় নামি',
উপলভরা কঠিন পথে ক্ষণেক নাহি থামি'
দু'পাশে তাকে শ্যামল পাড়, দুলায়ে লাল ডালিয়া ঝাড়
তবু সে কেন সাগর-অনুগামী ?
নয়ন পাতে সুখস্বপন-সম,
এস হে মোর শ্রান্তিহরা হৃদয়েভরি' নিখিল ধরা
হিয়ার মাঝে মম' হে নিরুপম,
লহ হে লহ নমঃ।

"তাঁকে লাভ করলে দেহ বুদ্ধি যায়। মরা মারা এক জ্ঞান হয়।···উপরে চেয়ে দেখ, কি কাণ্ড! অনন্ত কাণ্ড চলেছে! অন্ত কোথা তার। এ সবের এইই জিজ্ঞাসা। আনন্দেতে জন্ম, আনন্দেতে পালন, আনন্দেতে সংহার। বেদেতে এইরূপ আছে—'আনন্দোদ্ভেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তীতি।'

ওপরের দিকে দেখতে দিচ্ছে না; নিম্ন দৃষ্টি ক'রে রেখে দিয়েছে। এমনি তাঁর মহামায়া, ছোট ছোট জিনিষে ভুলিয়ে রেখেছেন। ধন্য মহামায়া!"

—ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতএব লেখকবর্গ অথবা পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। ইতি—সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

॥ ১ ॥ **ছোটদের বিবেকানন্দ :** লেখক—মণি বাগচি, প্রকাশক—কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪।

বিবেকানন্দের জীবন যেমন বীর্যের ঐকান্তিকতায় পূর্ণ, তাঁর জীবনীও যে তেমনি অনন্ত প্রেরণার উৎসস্বরূপ হবে, এটাই স্বাভাবিক ; এবং তা যদি যোগ্য লেখকের হাতে পড়ে তবে একটা অমূল্য সৃষ্টিও অসম্ভব নয়। 'মণি বাগচি' লিখিত ছোটদের বিবেকানন্দ গ্রন্থখানিতে সেই তীক্ষ্ণ, চিন্তাশীল, সৃজনক্ষম দৃষ্টি রয়েছে : দুরূহ দার্শনিকতার অবতারণা করে মনীষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীতও যে চিত্তাকর্ষক বর্ণন ভঙ্গীর দ্বারা সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, লেখক তা' বাস্তবায়িত করেছেন। বাস্তবিক গ্রন্থখানি একখানি বৃহৎ গল্পের মতো, সন্ তারিখের ক্রম-অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার দলগুলো সোল্লাসে উন্মীলিত ; অথচ ভাষাবন্ধে ও পদযোজনায় সাহিত্যকৃতির ক্ষুর্তিও ব্যাহত হয় নি। এই দিক দিয়ে এটা, নিঃসন্দেহে একখানি অপেক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্বাগত গ্রন্থ, বিশেষতঃ যাদের উদ্দেশ্যে লিখিত—সেই শিশুদের মনোহরণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ইহা রাখে ; এমনকি পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পথ-পরিক্রমাও এত সুন্দর, রসপূর্ণ, ওজস্বী যে ঠাকুর্দার মুখের গল্পের মতই 'তারপর' 'তারপর' প্রশ্নোদ্রেক করে, তথাপি তথ্য ও তত্ত্ব-সমাবেশেরও লাঘবতা নেই —ইহাই গ্রন্থখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কঠিন বক্তব্য বিষয়কে কি ক'রে চিত্তাকর্ষক করতে হয় লেখকের তা' জানা আছে এবং আমাদের শিশুর মনঃ-সংগঠনের প্রচেষ্টাও প্রশংসার্হ। শেষাংশে একাত্মটি 'বিবেকবাণী' সংগৃহীত হওয়ায় গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, নিঃসন্দেহ। সুতরাং শুধু ছেলেদের হাতে নয়, বড়দের কাছেও গ্রন্থটি লোভনীয়।

কিন্তু প্রচ্ছদপট পরিকল্পনাটী ভাল হয় নি। বিবেকানন্দের প্রতিমূর্তিটি ঈষৎ খোঁচা কৃতি হয়েছে। আমাদের মনে হয় বিবেকানন্দ ছোটদেরই হোন্ আর বড়দেরই হোন্ তিনি বিবেকানন্দই ; সুতরাং তাঁর এই অভিনব ভাবান্তর অনুচিত নয় কি ?

॥ ২ ॥ **ত্রয়ী :** পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বেদশাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক—লেখক স্বয়ং, ২৬বি, আর, জি, কর রোড—শ্যামবাজার, কলিকাতা—৪। মূল্য একটাকা। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০।

গ্রন্থখানিতে চারিটি প্রবন্ধ আছে (১) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, (২) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, (৩) শ্রীশ্রীমা সারদার আত্মকথা ও (৪) আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে আছে (১) পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদামণি (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আলোচনা (৩) আদ্যাশক্তি সারদামণি (৪) ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন।

গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র কলেবর, কিন্তু বক্তব্য বিষয় ক্ষুদ্র নয় এবং একটা বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যের নিদর্শন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীমার দিব্যজীবন, স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আগমনের মধ্যে সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং একজনকে বুঝতে হলে তিনজনকেই জানতে হয়—তাই লেখক 'ত্রয়ী' নামকরণ করেছেন। প্রবন্ধগুলি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল ; তখন যাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন, গ্রন্থাকারে পেয়ে তাঁরা খুশী হবেন খুব বেশী। ভাষার লালিত্য যেমন আছে, ভাবের ঐশ্বর্যও তেমনি অক্ষুণ্ণ। শ্রীশ্রীমা সারদার আত্মকথা—একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। বাস্তবিক গ্রন্থখানি জ্ঞানগর্ভ ও সুন্দর কিন্তু সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ গোষ্পদে সমুদ্রদর্শনের প্রচেষ্টার সমতুল।

অ. ক. হ.

আশার বাণী

রমজিৎ গুহ কাব্যভারতী

দুঃখের শোকের ব্যথার আঘাত যখন বাজে বুকে
মধুর বাজে হৃদয়-বীণার তার
মানুষ তখন হয়রে মানুষ, যায়রে তখন টুটে
মিথ্যা যত গর্ব্ব অহংকার।

সর্ব্বহারা হয়রে যখন প্রাণ
হিয়ায় বাজে সর্ব্ব জয়ের গান
ধরার বুকের বেদন-বাণী হিয়ার রবে মধুর হয়ে উঠে :
বিশ্বজয়ের শক্তি তাহার চিত্ত মাঝে নিত্য হয়ে ফুটে।

সংঘ-বার্তা

বিশেষ পূজা—আগামী ৫ই ভাদ্র, ইংরাজী ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর এবং ১৮ই ভাদ্র, ইং ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবারে শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর আবির্ভাব দিবস। তাঁহারা দুইজনই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ। উক্ত দুই দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজা হইবে।

ধর্ম্মালোচনা—প্রত্যেক সপ্তাহে প্রতি সোমবার হইতে শুক্রবার ক্রমান্বয়ে পাঁচদিন পণ্ডিত শ্রীযুত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য, সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ মহাশয় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যা সাতটা হইতে একঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রতি অধিবেশনে দেড়শতাধিক নরনারী নিবিষ্টচিত্তে পণ্ডিত মহাশয়ের অপূর্ব শাস্ত্র-ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন।

শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তনাদি—প্রতি শনিবার সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ বেলা তিনটা হইতে দেড়ঘণ্টা যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে শ্রীরামনামকীর্ত্তন ও বিবিধ ভজনগান করেন। ইহার পর সাধারণতঃ সন্ধ্যা ৭টা হইতে একঘণ্টা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথকতা—প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কথকশিরোমণি মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত" হইতে কথকতা করিতেছেন।

শারদীয়া সংখ্যা

বিশ্ববাণী

আশ্বিন ১৩৬৩ বিশেষ পরিবর্ধিত আকারে নানাবিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতাবলীতে সমৃদ্ধ হইয়া যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা আট আনা।

এই সংখ্যার জন্য বিশ্ববাণীর নিয়মিত গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী বিবেকানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা

প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

নূতন বই বাহির হইল

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(উত্তর ভাগ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

॥ গবেষণামূলক 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো। উত্তরভাগে (দ্বিতীয় খণ্ড) ভারতীয় সঙ্গীত এর বাদ্যযন্ত্র, সুর ও তালে মূর্ছার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ॥

বাঙলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তক গৌরবের দাবী রাখে ॥

॥ ভিমাই সাইজের ছয়শত পৃষ্ঠা ব্যাপী অত্যাধুনিক প্রাচীন
অপ্রকাশিত তথ্যবহুল ॥
মূল্য সাড়ে সাত টাকা।
প্রথম খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্য কিছু সংখ্যক বই এইরূপ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সম্পাদক স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—ভাদ্র, ১৩৬৩

সূচীপত্র

১।	নামমাহাত্ম্য না অনুরাগ		২৭৩
২।	গীতোক্ত স্বধর্ম	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	২৭৭
৩।	জীবে প্রেম করে যেইজন	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন বসু	২৭৮
৪।	দর্শনের ইঙ্গিত	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য	২৮০
৫।	আজকের সাহিত্য (পূর্বানুবৃত্তি)	শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৬
৬।	বাংলোভাষা সমস্যা ...	শ্রীঅনিল কুমার হালদার	২৮৮
৭।	গ্রন্থাগার আন্দোলন ...	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	২৯১
৮।	স্নোরেল নাইটিঙ্গেল	শ্রীউষা মিত্র	২৯৩
৯।	অশোক-লিপিতে নারী ...	শ্রীকালীপদ হোড়	২৯৮
১০।	বিজ্ঞানীর হাতে জলসৃষ্টি	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর	৩০০
১১।	এ্যাটম্	শ্রীমুরলীমোহন বিশ্বাস	৩০৩
১২।	বিংশ শতক (কবিতা) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৩০৫

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৮, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন আগুনে দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ২১১।১এ, হেদোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

১৭।	শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব ...	শ্রীঅসিতনাথ চন্দ্র	৩০৬
১৪।	জন্মাষ্টমী (কবিতা) ...	শ্রীবতীশচন্দ্র মিত্র	৩০৯
১৫।	বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষ ...	শ্রীঅমিয়শঙ্কর নন্দী	৩১০
১৬।	মরণ (কবিতা)	শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩১১
১৭।	সমাজে নারীর ক্রমবিকাশ	অমিয়া পাল	৩১২
১৮।	বনলতা সেন ও জীবনানন্দ দাশ	শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য, ...	৩১৫
১৯।	আত্মনিবেদনম্ ...	শ্রীশ্রীনিবাসকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ	৩১৭
২০।	পরলোকে দানবীর রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার		৩১৮
২১।	অতন্দ্রপর্ণী	শ্রীসন্তোষকুমার বসু	৩১৯
২২।	সংঘ-বার্ত্তা ...	...	৩২০

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, বাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। "বিশ্ববাণী"-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ, বসু, এণ্ড কোং (ডেকরেটরস্)

৫২নং ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

ফোন :—বড়বাজার ১৬২৫

অষ্টাদশ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৬৩ | সপ্তম সংখ্যা

নাম-মাহাত্ম্য না অনুরাগ

হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না—ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়। নামেতে একবার শুদ্ধ হলো; কিন্তু তার পরেই হয়ত নানা পাপে লিপ্ত হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ ক'র্‌ব না। গঙ্গাস্নানে পাপ সব যায়। গেলে কি হবে? লোকে ব'লে থাকে, পাপগুলো গাছের উপরে থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে, তখন ঐ পুরান পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে। সেই পুরান পাপগুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে। স্নান ক'রে দু'পা না আস্‌তে আস্‌তে আবার ঘাড়ে চড়েছে!

তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যে সব জিনিষ দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ, তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।...বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম, ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।...বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম-করা,—অনুরাগ নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে 'পরমেশ্বরের দিব্যি' শিখেছে। বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো; না হোলো না হোলো।... খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

গীতোক্ত স্বধর্ম

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

মদনুদিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'গীতার আলো' ও 'কিশোর গীতা'তে স্বধর্ম সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান নিবন্ধে গীতোক্ত স্বধর্মের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছি। অনাসক্তভাবে স্বধর্মপালনে অবশেষে মুক্তিলাভ হয়, ইহাই গীতার মর্ম-বাণী। তাই জিজ্ঞাস্য, স্বধর্ম কি? স্বধর্ম শব্দ গীতায় ২।৩১, ২।৩৩, ৩।৩৫ এবং ১৮।৪৭ প্রভৃতি শ্লোকে উল্লিখিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার ক্ষত্রিয় স্বভাব দৈন্যদোষে অভিভূত হওয়ায় তিনি ধর্মসংমূঢ়চেত। স্বধর্ম বিষয়ে তাঁহার চিত্ত বিমূঢ় জানিয়া তিনি শ্রীভগবানের নিকট তৎপক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্মসমূহ বিনষ্ট এবং পাপজ জাতিধর্মসমূহ উৎপন্ন হইবার ভয়ে তিনি ক্ষাত্রধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। এইরূপ ধর্মমূঢ় অবস্থায় তিনি ধনুর্বাণত্যাগপূর্বক শোকাকুল হৃদয়ে রথোপরি উপবেশন করিলেন। এই হৃদয়-দৌর্বল্যকে শ্রীকৃষ্ণ অনার্যোচিত স্বর্গপ্রাপ্তিরোধক অকীর্তিকর ক্লৈব্য ও কশ্মল বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার পূর্বক ২।৩১ শ্লোকে বলিলেন, "স্বধর্ম দেখিয়াও তোমার বিকম্পিত হওয়া অনুচিত। কারণ ধর্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর অন্য কিছু নাই। ধর্মযুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অপাবৃত স্বর্গদ্বার।"

এখন আলোচ্য, ক্ষাত্রধর্ম কি? অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ বর্ণনপ্রসঙ্গে ভগবান ক্ষাত্রধর্মের সংজ্ঞা দিয়াছেন। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা ও শাসনক্ষমতা—এই অষ্ট গুণই ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী ২।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরাশর ও মনুস্মৃতির বাক্যোদ্ধারপূর্বক ক্ষত্রিয়ধর্মের স্বরূপ বিবৃত করিয়াছেন। তৎকর্তৃক উদ্ধৃত পরাশর বাক্যে আছে—

ক্ষত্রিয়ো হি প্রজারক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডবান্।
নির্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্মেণ পালয়েৎ॥

অনুবাদ—প্রজারক্ষক, অস্ত্রধারী ও দণ্ডদাতা হইয়া ক্ষত্রিয় শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া ধর্মানুসারে স্বীয় রাজ্যপালন করিবেন।

মনুসংহিতায় আছে—

সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রধর্মং অনুস্মরন্॥
সংগ্রামেষ্বনিবর্তিত্বং প্রজানাং চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরম্॥

অনুবাদ—উত্তম ও অধম ব্যক্তিগণ কর্তৃক সমভাবে আহূত হইয়া ক্ষত্রিয় রাজা স্বধর্মস্মরণপূর্বক প্রজাপালন করিবেন এবং সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সংগ্রামে অপলায়ন ও প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষাই ক্ষাত্র রাজার স্বধর্ম।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর মতে রাজ-শব্দ উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে ক্ষত্রিয়জাতিমাত্রবাচী। অর্জুন স্বধর্ম-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলিলেন, "শত্রুগণ আমাকে বধ করিলেও আমি তাহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। এই সকল আততায়ীকে বধ করিলে আমাকে পাপ আশ্রয় করিবে। রাজ্যসুখলোভে আমি স্বজন-বিনাশরূপ মহাপাপ করিতে উদ্যত হইয়াছি।" বিভ্রান্ত অর্জুন ভাবিতেছেন, অর্থশাস্ত্র অনুসারে ষড়বিধ আততায়ীবধ বিহিত হইলেও ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী আচার্যাদি আততায়ীবধ নিষিদ্ধ। টীকাকার মধুসূদন ২।৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা ক্ষত্রিয়োচিত শুভ-সংকল্প নহে। মনুস্মৃতিতে আছে—

যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্তুর্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্বং প্রতিপদ্যতে॥
যজ্ঞাস্য সুকৃতং কিঞ্চিৎ অমুত্রার্থম্ উপার্জিতম্।
ভর্তা তৎসর্বম্ আদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥

অনুবাদ—কে যোদ্ধা ভয়ে যুদ্ধে নিবৃত্ত এবং অস্ত্র দ্বারা নিহত হয়, ভর্তা রাজার যা কিছু পাতক তৎসমুদয় তাঁহাকে গ্রাস করে। সেই নিবৃত্ত নিহত যোদ্ধা কর্তৃক পরলোকের পাথেয় স্বরূপ যা কিছু পুণ্য অর্জিত হইয়াছে তৎসমস্ত ভর্তার লাভ হয়।

অতএব স্বধর্মত্যাগে ক্ষত্রিয় শুধু পুণ্যহীন হয় না, সে পাপগ্রস্তও হয়। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন, 'রাজা সুকৃতম্ আদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্।' ইহার অর্থ—হতাহত ও পলায়িত যোদ্ধাদের সর্ব সুকৃতি রাজা প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রমতে রাজধর্মই ক্ষাত্রধর্ম। স্বধর্মের এক অর্থ—বর্ণাশ্রমাচার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই প্রধান চারি বর্ণ গুণ ও কর্ম বিভাগের নিমিত্ত ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট। কোন্ বর্ণের কি ধর্ম তাহা গীতা ও মনুস্মৃতিতে বিবৃত। অর্জুন স্বধর্ম বর্জনপূর্বক ব্রাহ্মণধর্মপালনে আগ্রহপ্রকাশার্থ বলিলেন, মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলে আমার কল্যাণ হইবে। ইহা যেমন অর্জুনের পক্ষে অধর্ম, তেমনি কোন ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য বা শূদ্র ক্ষাত্রধর্ম পালনে উদ্যত হইলে তাহা তৎপক্ষে অধর্ম। কারণ ক্ষাত্রধর্ম সত্ত্বমিশ্র রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, অন্য বর্ণধর্ম তাহা নহে। শুধু স্ব স্ব বর্ণধর্ম-পালনই স্বধর্ম নহে, আশ্রমধর্ম-পালনও স্বধর্ম। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের ধর্মসমূহ শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত আছে। গৃহী সন্ন্যাসাশ্রমে সচেষ্ট হইবেন, কারণ তিনি আত্মরক্ষায় প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু সন্ন্যাসী সপত্ন-নিগ্রহে অগ্রসর হইবেন না; কারণ তিনি প্রতিক্রিয়াবর্জিত। প্রতিবাদ বা প্রতিকার বা প্রতিগ্রহ সন্ন্যাসধর্ম নহে। যিশুখ্রীষ্টের কথায়, কেহ এক চড় মারিলে তাহাকে অন্য গাল বাড়াইয়া দিবে, সন্ন্যাসী আত্মরক্ষাও করিবেননা। বৈদিক-সন্ন্যাসে সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা প্রকটিত। বিধৎ-সন্ন্যাসে যে রজোলেশ দেখা যায়, তাহা দেহযাত্রার অতিরিক্ত নহে। সন্ন্যাসী সর্বতঃ সত্ত্বগুণী ও আত্মধর্মে আরূঢ়; আর, গৃহী রজোগুণী ও দেহধর্মে কর্মচঞ্চল। যিশুখ্রীষ্ট রজোগুণীর কর্তব্য নির্ধারণার্থ বলিলেন, "কেহ তোমার এক চক্ষু নষ্ট করিলে তুমিও তাহার এক চক্ষু নষ্ট করিয়া দাও। কেহ তোমার এক দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে তুমিও তাহার এক দাঁত ভাঙ্গিয়া দাও।" আর, রজোগুণী বেদান্তবাদী বলিবেন, "কেহ তোমাকে এক চড় মারিলে তুমি তাহাকে দুই চড় মার। কেহ বিনাদোষে তোমার এক পা বা এক হাত আহত করিলে তুমি তাহার দুই হাত বা দুই পা আহত কর।" তাই বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ বলিলেন, যখন তুমি বহু বীরকে বলিত করিতে সমর্থ তখনই ক্ষমা শোভনীয়। কারণ ক্ষমা সত্ত্ব-ধর্ম, রজোধর্ম নহে। যিশুখ্রীষ্ট সত্ত্বগুণী সন্ন্যাসীর ধর্মনির্ধারণার্থ বলিলেন, যদি কোন চোর কোন সাধুর ছোট জামাটী লইয়া যায় তাহাকে বড় জামাটীও দাও। শোনা যায়, গাজীপুরের পওহারী বাবা তাঁহার কুটীর হইতে কোন চোর সব দ্রব্য লইয়া যাইতে না পারায় বাকী দ্রব্যগুলি অবিলম্বে লইয়া সত্বর ছুটিয়া যাইয়া পলায়মান চোরকে দিয়া আসিলেন। হরিদ্বারের জ্ঞানী সাধু মধুরাদাসের গুহা হইতে এক চোর রাত্রে একটী দামী কম্বল লইয়া যাইতেছিল। ত্যাগী সাধু অন্য কম্বল লইয়া যাইবার জন্য সেই চোরকে সুযোগ দিয়া শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন ও বলিলেন, 'এটাও নিয়ে যাও। তোমার অভাব আমার চেয়ে অনেক বেশী।' ইহাই সত্ত্বধর্ম, ইহাই সন্ন্যাসধর্ম।

তাই গীতায় স্বধর্ম পালনের জন্য এত জোর দেওয়া হইয়াছে। গুণত্রয় ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। তমোগুণ জয় করিতে হইলে রজোগুণের অভ্যাস আবশ্যক। আবার রজোগুণ অতিক্রম করিবার জন্য সত্ত্বগুণের সাধনা দরকার। তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে যাইতে হইলে রজোগুণের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, অন্য সোজা পথ নাই। দুধকে মাখন হইতে হইলে দধি হইতেই হইবে। দধি না হইয়া দুধ মাখন হইতে পারে না। তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে লাফ দিলে সত্ত্বলাভ হইবেনা, তমোগুণই বিকৃত আকারে থাকিয়া যাইবে। জোর করিয়া তাপ দিয়া আম পাকাইলে আম মিষ্ট হয় না। বর্তমান ভারতে সত্ত্বগুণের নামে তমোগুণের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য

করিয়া যুগাচার্য বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীকেও নিষ্কাম কর্মযোগ বা সেবাধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করিলেন। কারণ রজোগুণ আশ্রয় না করিলে তমোগুণ অভিভূত হয় না। গীতার ৩।৩৫ শ্লোকে আছে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

অনুবাদ—স্বধর্মের অনুষ্ঠান অঙ্গহীন হইলেও সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা প্রশস্ততর। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্মসাধনে মরণও মঙ্গলজনক। কিন্তু সকলের পক্ষেই অন্যের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান বিপজ্জনক, অধোগতিদায়ক।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "স্বকর্ম বা স্বধর্মে নিযুক্ত হইলে মানুষ সংসিদ্ধ হয়। বিশ্বব্যাপ্ত পরমেশ্বরকে স্ব স্ব বর্ণ বা আশ্রমের কর্ম দ্বারা অর্চনা করিলে মানুষ সিদ্ধি লাভ করে।" সুতরাং ফুল-চন্দন দ্বারা ভগবানের যে পূজা হয় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আরাধনা হয় স্ব স্ব বর্ণবিহিত ও আশ্রমবিহিত কর্তব্য পালন দ্বারা। কর্তব্যনিষ্ঠাই প্রকৃত সাধনা। সত্ত্বাদি গুণবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই ব্রাহ্মণাদির কর্ম ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ক্ষাত্রকর্ম সত্ত্বমিশ্র রজোগুণ দ্বারা প্রবিভক্ত। এখন বক্তব্য এই যে, বৈশ্যধর্ম তমোমিশ্র রজোগুণ দ্বারা এবং শূদ্রধর্ম রজোমিশ্র তমোগুণ দ্বারা প্রবিভক্ত। ব্রহ্মকর্ম সত্ত্বপ্রধান। গীতার ১৮।৪৭ শ্লোকে ভগবান পুনরায় বলিতেছেন যে, শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। ইহার অর্থ, স্বীয় বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম দোষযুক্ত হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। প্রধানতঃ জন্ম দ্বারাই প্রকৃতি আমাদের গুণ-কর্ম নির্ধারিত করিয়াছেন। এই প্রাকৃত বিধান লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। আপস্তম্ব স্মৃতিতে (২।২।২।৩১) আছে, "বর্ণাঃ আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলম্ অনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্ট-দেশ-জাতি-কুল-ধর্মায়ুঃ-শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখ-মেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।" ইহার অর্থ, স্বকর্মনিষ্ঠ বর্ণীগণ ও আশ্রমীগণ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে পুণ্যফল ভোগান্তে অবশিষ্ট সঞ্চিত কর্মের সহিত বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, ধর্ম, আয়ু, বিদ্যা, শীল, সম্পদ, সুখ ও মেধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিহিত কর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গলাভ হয়।

স্বধর্ম পালনে অনিচ্ছা ও পরধর্ম পালনে ইচ্ছা হয় কেন? ইহার উত্তর ভাষ্যকার শংকরাচার্য এইরূপে দিয়াছেন—"প্রকৃতি মানুষের রাগ ও দ্বেষ অবলম্বনে মানুষকে কার্যে নিয়োজিত করে। সেইজন্য শাস্ত্রানুগামী ব্যক্তি রাগ ও দ্বেষের বশবর্তী হইবেন না। রাগদ্বেষবশে শাস্ত্রার্থ বিপরীতভাবে গৃহীত ও পরধর্ম স্বধর্মরূপে প্রতিভাত হয়।" ধর্মনিষ্ঠা রাগদ্বেষবর্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ রাগ-দ্বেষ থাকিলে স্মৃতিভ্রংশ জন্মে ও বুদ্ধিনাশ ঘটে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান 'স্বভাব' শব্দটী উল্লেখপূর্বক বলিতেছেন, স্বভাবনিয়ত কর্ম করিলে পাপ হয় না। স্বভাবনিয়ত শব্দের অর্থ—প্রকৃতি নির্দিষ্ট। প্রকৃতি-নির্দিষ্ট কর্মানুষ্ঠান সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য ও বিঘ্নবর্জিত। স্বভাব দ্বারাই স্বকর্ম বা স্বধর্ম নিরূপিত হয়। স্বভাব শব্দের অর্থ, সহজাত প্রবণতা ও কর্মশক্তি। ইহাকে জন্মজ সংস্কার বা মনোবৈজ্ঞানিক মহলের ভাষায় psychological types বলা যায়। মানুষ সর্বদা স্বভাব বা প্রকৃতির অনুবর্তী হয়। সহজাত প্রবণতার সদ্ব্যবহার ও শুদ্ধিকরণ দ্বারাই মানুষ উন্নত হয়। প্রাণীতত্ত্ব অনুসারে নিরামিষাশী হরিণকে আমিষাশী করিলে সে মরিয়া যায়। যে বিজ্ঞানপ্রবণ তাহাকে দর্শন অধ্যয়নে নিযুক্ত করা নিরর্থক। জোর করিয়া কাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালাইলে তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতে পারে। সৌন্দর্যে ও সৌরভে গোলাপ সমৃদ্ধ হইলেই সে উৎকৃষ্ট গোলাপ হইবে, গোলাপে পূর্ণতা লাভার্থ তাহাকে চম্পক হইতে হইবে না। অশ্বত্বের চরম বিকাশ লাভ করিলেই অশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। শ্রেষ্ঠ অশ্ব হইবার জন্য তাহাকে হস্তী হইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ। ইহার অর্থ, ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিলে গুণধর্মের শোধন দ্বারা মনুষ্যত্বের

ক্রমিক বিকাশ হয়। জীবন-যুদ্ধে ঈশ্বরচিন্তা থাকিলে জয়লাভ সুনিশ্চিত। ভগবানকে একান্তভাবে করিলে কেহ জীবনে পথভ্রষ্ট হয় না।

বিভিন্ন মানস গঠন বা বিচিত্র স্বভাব অনুযায়ী মানুষকে ধর্মপথে চালিত করিবার জন্যই ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ প্রভৃতি মার্গ বিহিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবার মার্গকে যোগ বলে। অনাসক্ত চিত্তে স্বধর্মপালনে স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা ব্রাহ্মীস্থিতি হয় না। কারণ, 'সর্বারম্ভাঃ হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' অগ্নি যেমন সর্বদা ধূমযুক্ত থাকে তদ্রূপ সর্বারম্ভ বা সর্বকর্ম দোষযুক্ত। কোন কর্ম নির্দোষ নহে। কিন্তু অনাসক্ত অন্তরে কর্ম করিলে কর্ম-দোষ কাটিয়া যায়। অনাসক্তির আগুনে কর্ম-মল দগ্ধ হয়। অনাসক্তিতে সমারূঢ় ব্যক্তিই স্বধর্ম পালন দ্বারা মুক্তিপথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হন। ব্যাধগীতায় আছে, মাংসবিক্রয়রূপ স্বধর্মপালন দ্বারাই তিনি জ্ঞানলাভে সমর্থ হন; তাঁহাকে অহিংস উপায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। স্বভাবকে প্রশ্রয় না দিয়া অথবা দমন না করিয়া শোধন করাই আসল সাধন। যিনি যখন যথায় যে অবস্থায় থাকুন না কেন অনাসক্তি ও ঈশ্বরচিন্তা সহকারে স্বধর্মপালন করিলেই গুণজয়ী হইবেন ও মুক্তিলাভ করিবেন। ইহাই গীতার মর্ম কথা। গুণাতীত হওয়ার জন্য সকলকে সন্ন্যাসী হইতে বা বনে যাইতে হইবে না। স্ব স্ব কর্মস্থলই কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র। শাস্ত্রানুগ ও অন্তর্মুখী হইলে কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া স্ব স্ব বর্মানুষ্ঠানই আমাদের একান্ত কর্তব্য। গীতা এইভাবে সর্বশ্রেণীর নরনারীকে সুগম মুক্তিপথ দেখাইয়াছেন।

স্বধর্মপালন শরণাগতিতে পরিণত হয়। ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, কুলধর্ম প্রভৃতি সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার শরণাগত হইলেই মানুষ পাপমুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা বর্ণহীন বা আশ্রমহীন তাহারা কি করিবে? সুতরাং কেবল বর্ণাশ্রমের কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, বর্ণাশ্রমবিহীন-গণ সিদ্ধিলাভের অনধিকারী—ইহা সত্য নহে। হিন্দু-অহিন্দু, আর্য-অনার্য, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মুক্তিলাভের বা ঈশ্বরদর্শনের অধিকারী। বৈষ্ণব, খাচস্মরী ও সংবর্ত প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত হইয়াও সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। জন্মান্তরসঞ্চিত সংস্কারবিশেষের সহায়ে সিদ্ধিলাভ হয়। ইহার দ্বারা গীতা সর্বসাধারণের জন্য সুপ্রশস্ত মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান সর্বদেশের সর্বশ্রেণীর নরনারীকে এই স্বধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। কঠোর কর্তব্য পালনে সংকল্প করিয়া প্রাথমিক অনাগ্রহ ও অনিচ্ছা উপেক্ষা করিলেই ধীরে ধীরে অনুরাগ উপস্থিত হয়। নারীগণও পতিসেবা, শিশুপালন, রন্ধনাদি গৃহকর্মকালে ঈশ্বরস্মরণ করিলে নারীধর্ম পালিত হয়। ব্রাদার লরেন্স নামক খ্রীষ্টান সাধক রান্নাঘরে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরদর্শনে সমর্থ হন। কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কোন স্বর্গত সন্ন্যাসী বহু বর্ষ রোগী সেবাদির সহিত সকাল সন্ধ্যা অপধ্যান করিতেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "রোগী, ঔষধ, পথ্যাদি সর্বভূতকে ব্রহ্মময় দেখিতেছি।" অনাসক্তি যোগে অবস্থিত হইলে সহজে ব্রহ্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়। ভাগবতোক্ত রন্তিদেবের উপাখ্যান উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের যেরূপ কর্তব্যবিমূঢ়তা আসিয়াছিল তদ্রূপ সকলেরই জীবনে এই সঙ্কটসময় আসে। জীবনে ধর্মগ্লানি আসিলে কর্তব্যমূঢ়তা অনিবার্য। শ্রীভগবানের মুখে গীতাশাস্ত্র শুনিয়া অর্জুনের মোহ নষ্ট ও স্মৃতি লব্ধ হয়। গীতাশাস্ত্র মনোযোগসহকারে শ্রবণ বা পাঠ করিলে অনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রাধ্যয়নে বা শাস্ত্রশ্রবণে কর্তব্য-মূঢ়তা অতিক্রান্ত হয়, কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়। অর্জুনকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য সাক্ষাৎ ভগবান তাঁহার সারথ্য স্বীকার করেন। অর্জুন যুদ্ধে জয়ী হইলেন ও স্বর্গারোহণ করিলেন। প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, 'তুমি এই যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে, আর যুদ্ধজয়ী হইলে মহীভোগ করিবে। ভগবানের উপদেশে অর্জুন স্বধর্ম পালনে প্রাণপণ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজ্যলাভ ও অন্তে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিল। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, অর্জুন যখন পুরুষোত্তমধামে শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করেন তখন তিনি তৎসখা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্বিতীয় কৃষ্ণরূপে সম্বোধিত হন। মহাভারতেও আছে, অর্জুন স্বর্গে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন। যাঁহারা অর্জুনবৎ স্বধর্মসাধনে প্রাণপণ করিবেন তাঁহাদেরও এই সৌভাগ্য লাভ হইবে।

"জীবে প্রেম করে যেইজন"

শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন বসু

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সন্ত কবীর সাহেবের তিসাহরে আছে :

"পুণ্য বড়া উপকার হ্যায়, সবকে উপর ভাখ
জীব দয়া চিত রাখিয়ে, বেদ পুরাণ হ্যায় সাখ।"

(পরোপকারই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। জীবের প্রতি দয়াতে হৃদয় পূর্ণ রাখ। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র শিব-জ্ঞানে জীবসেবা করিবার উপদেশ দেয়।)

জীব যে শিব, এ জ্ঞান যখনই আসবে তখনই সাধকের সাধনা পূর্ণ হবে। তখন আর মায়াবাদী-দের মত সব ছেড়ে যাওয়ার বাসনা আসবে না। জীবন্ত একের মাঝে বহুর ধারণাকে সত্য করলেই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্রের সহজ সাধনা হবে। ব্রহ্মকে পাবার পথ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র ঘেঁটে চোখ বুজিয়ে ব'সে থাকবার প্রয়োজন হবে না। আমাদের বাউলরা বলেছেন—ভিতরে আছেন বল্‌লে জগৎ লজ্জা পায়, আর বাহিরে আছেন বল্‌লে মিথ্যা বলা হয়। তিনি ভিতর বাহির দুই নিরন্তর। "দূর নেহি ত পন্থ নেহি"। তাঁকে পাবার পথ নেই, কেন না পথ আঁকতে হ'লেই দূরত্ব থাকবে ও দূর না থাকলে পথ কি? ব্রহ্মতে আমাতে দূর নেই ব'লেই ত পথ নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ত অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭।৭

এ সব শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হ'লেই জীবপ্রেমের মাঝে আপনার ক্ষুদ্র অহংকে বিলিয়ে দেওয়া যাবে। কেবল অনুভূতির রাজ্যে ব'সে আপনার মুক্তি কামনা না করে যখনই তুমি ঈশ্বরের দাসভাবে থাকবে, অনন্ত সুখলাভ করবে। 'হোয় রহে যব দাস রহ, তব সুখ পাওরে অন্ত।'

এ বিশ্বে যা যেথায় ঘটছে সবই ত' সেই একের মাঝে পরিবর্ত্তন। এক হলাদিনী শক্তির মাঝে সৃষ্টি আর ধ্বংস, সংঘটন-বিঘটন, উত্থান আর পতন। এই সমস্তকে নিয়েই একের পরিচয়। "যদা তত্-মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" —অব্যক্তরূপ আমাকর্ত্তৃক সুন্দর জগৎ বিস্তৃত (গীতা ৯।৪) · ভাগবতে আছে—স্থাবর পদার্থ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত উত্তমাধম জীবসমূহে ও ভৌতিক বিকারসমূহে সেই এক পরব্রহ্মই আত্মা, ভগবান্ বা ঈশ্বর। তাই—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুতসৌহৃদম্।" এইজন্যই অপরের মঙ্গলের মাঝে নিজের মঙ্গল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অপরের সেবা হ'লেই ঈশ্বরের সেবা। জীবে প্রেম হলেই ঈশ্বরে প্রেম। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীকে সাধু তুকারাম বলেছিলেন—

"সর্ব্বাভূতি দেখ এক আত্মা।"

সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে দেখতে পারলেই সব দ্বেষ-হিংসা, মান-অপমান-ঘৃণা দূরে পালিয়ে যাবে। তখন আর স্বাজাত্যের অহং, সাম্রাজ্যবাদের অহং, দেহবর্ণের অহং থাকবে না, আসবে পরিপূর্ণ মিলন, আপনার ক্ষুদ্রতার প্রাচীর ভাঙবার সচেতন মনোভাব আর আত্মচেষ্টা। তখনই খৃষ্টীয় সাধকের মত' বলতে পারবো—"It is truly the atone-ment that He taught, the at-one-ment of the individual life with the life of God —My God and your God."

আপনাকে সকলের জন্য বিলিয়ে দেওয়াই ত' মুক্তি। কেবল নিজেদের অর্থ, মান আর সুখ খুঁজে খুঁজেই আমরা আমাদের বোঝা বাড়াই। এক অখণ্ডের মাঝে আপনার অবস্থানকে ভুলে ক্ষুদ্র অহংকে বাড়িয়ে কত অনর্থ ঘটাই। কিন্তু অন্যের সেবায় জীবন দিলেই আমরা মহত্তর জীবনের স্বাদ পেতে পারি। সকলেই যখন একই অখণ্ডের অংশ তখন অপরের ক্ষতি মানেই ত' নিজের ক্ষতি। অপরকে ঘৃণা করা হলো ঈশ্বরে ঘৃণা।

আবার ত্যাগ না হ'লে প্রেম হয় না। 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

জীবের সেবা করতে গেলেই অর্থত্যাগ, স্বার্থত্যাগ আর আরামত্যাগ হবেই। প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদের জন্য আপনার দেহের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রাখে না তেমনই ঠিক ঠিক সেবা করতে গেলে নিজের স্বাস্থ্য ও শক্তির দিকে আদৌ লক্ষ্য থাকে না। নিরবিচ্ছিন্ন সেবার মাঝে প্রকৃত প্রেমের ফুল ফোটে। রোগীর সেবায় যখন নিজেকে ভুলে যাওয়া যাবে তখনই ত' ঈশ্বরের সাথে মিলন। ক্ষুদ্র আমি'কে 'বড় আমি'র সাথে মিলিয়ে দেওয়াই হলো মুক্তি। জীবসেবাই যখন ঈশ্বরের সেবা, অপরের মঙ্গল মানেই নিজের মঙ্গল তখন কর্ম্মের ফল নিয়ে বিচারের প্রয়োজন হবে না। 'সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ' স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বুদ্ধের মত সহজ শক্তি নিয়ে অপরের সেবা করতে হবে। আমাদের তৎকালীন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—"ধীয়া দেয়ম্, ভীয়া দেয়ম্, হ্রীয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্।"

ধীয়া দেয়ম্ অর্থে বিচারপূর্ব্বক দেয়। আমি কে? যিনি চাইছেন তিনিই বা কে? এ বিচার সেই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং" এ এসে স্থির হবে।

ভীয়া দেয়ম্ অর্থে ভয়পূর্ব্বক দেয়। ঈশ্বর-সেবা করতে গিয়ে যেন এতটুকু অশ্রদ্ধা না জাগে।

হ্রীয়া দেয়ম্—লজ্জাপূর্ব্বক দেয়। যে রোগী আমার সাহায্য চাইছে সে যে ঈশ্বর। তাই তাকে সাহায্য করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য বিনয়মিশ্রিত লজ্জা।

সংবিদা দেয়ম্—সেবা করা হচ্ছে, উপকার এখনো হয় না কেন, এই ভাব্‌না।

বুদ্ধের মত যখন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সেবাধর্ম্মে জীবের প্রেমারতি করতে পারা যাবে তখন ঈশ্বর আপনি আসবে। "মনের তখন অবাধ স্বাধীনতা; তাহার দৃষ্টিতে কোনও সঙ্কোচ নাই, সত্যকে সে ধরিতে পারিয়াছে, জ্ঞানের বহির্দ্বারের কোনও অপেক্ষা সে রাখে না। সকল ব্যক্তিকে ও বিষয়কে সে তখন দেখে ভগবানের দিক হইতে, সর্ব্বদর্শী ভগবানের জ্যোতিতে। তাহাদের লইয়া ভগবান করিবেন কি, আর তাহাদের স্বরূপই বা কি, এইরূপে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়ে—প্রকাশের আলো আসে ভগবানের নিকট হইতে, প্রজ্ঞা আসিয়া যে আত্মার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া ভগবানের সহিত মানুষের চিত্তের যোগ স্থাপন করিয়া গিয়াছে।" (অনন্তের সুর—প্রিয়রঞ্জন সেন)।

এইজন্যই আত্মকল্যাণকামী জীবের প্রয়োজন—'জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।" শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অকাতরে প্রেম বিলিয়ে দেওয়ার মাঝে কেবল ঈশ্বরের প্রতি প্রেমনিবেদনই রয়েছে।

কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই অজ্ঞানের মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠবে। Each for all and all for each এই ভাব মনে রাখলে আত্মতৃপ্তির কথা মনেও আসবে না। তখন সেবকের নিমন্ত্রণ আসবে যেখানে আছে রোগ জরা ব্যাধি। অপরের দুঃখ দেখলেই ছুটে যাবে আপনার ক্ষুদ্র অহংএর গণ্ডী পার হয়ে। আর 'অনিত্যম্ সুখম্' স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেখানে জ্যান্ত ঈশ্বরকে সেবা করা যাচ্ছে সেখানে কেবল বিচার ক'রে করে অনর্থক কালক্ষেপ করবার প্রয়োজন কি? কবির মতনই যেন বলতে পারি—

"দুয়ারে যাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।"

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—মানবজাতির কল্যাণের দ্বারাই আমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ঈশ্বর উর্দ্ধাকাশে বা পাতালে বাস করেন না। তিনি প্রতি মানুষের মধ্যে বিরাজমান।

ভালবাসার জন্য ভালবাসা—স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। এই ভালবাসার মাঝে আছে অনাবিল আনন্দ। আর তাকেই বলে ঈশ্বরে ভালবাসা—জীবে প্রেম। যেদিন শতশত নরনারীর অশ্রু ঈশ্বরের অশ্রু ব'লে মোছাতে পারবো সেইদিন বনের বেদান্তকে ঘরে আনা হবে। আমাদের প্রবলভাবে বিশ্বাস করা চাই—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে সম্মুখে প্রকাশমান। কেবল তখনই রামকৃষ্ণের বাণীমূর্ত্তি বিবেকানন্দের সেই বাণী স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

দর্শনের ইঙ্গিত

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য

জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতি অপরাপর প্রাণীদের বেলায় আশা ছেড়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের বেলায় দেখি অন্য ব্যবস্থা। প্রকৃতি যেমন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তেম্‌নি মানুষের মধ্যেও নিজেকে উপলব্ধির জন্য সমস্ত প্রয়াস সংহত করেছেন। কানামাছি ব'লে এক রকম খেলায় একটা ছেলের চোখে রুমাল বেঁধে দেওয়া হয়। পরে তাহাকে ছেড়ে দেওয়া হয় অন্যান্য ছেলেদের ধরবার জন্য। প্রকৃতিদেবী মানুষকেও তেম্‌নি সব কিছুর অনধিগত অবস্থায় জগতের খেলাঘরে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মানুষকে সমস্ত চেষ্টা ও বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে ধরতে হবে।

সমষ্টিগতভাবে মানুষকে বহু পুরাকালে প্রকৃতি ঐরকমভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার ব্যষ্টিগত-ভাবে জগতে চিরকাল এই রকম ব্যাপারই ঘট্‌ছে দেখতে পাই। এই প্রকৃতিকে ধরবার চিরকালই একটা বড় রাস্তা ছিল, এখন আর একটা রাস্তা হয়েছে। যেটা চিরকালই ছিল সেটা হ'চ্ছে 'দর্শন', এখন যেটার বিশেষভাবে প্রচার হ'য়েছে সেটা হ'চ্ছে 'বিজ্ঞান।'

সহজ বুদ্ধির একটা সুন্দর লোভনীয় প্রভাব আছে, তাহা মানুষকে অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির ঠেলায় তার ভুলবার জো কি? প্রকৃতি যে আপনার স্বরূপকে মানুষের মধ্যে ওতপ্রোত ক'রে দিয়েছেন: তার প্রমাণ হল তার সহজ-বুদ্ধির উপর স্বাধীন-বুদ্ধিতে। এই স্বাধীন বুদ্ধি প্রকৃতির মূলসূত্র অন্বেষণে দর্শনের প্রভাবে কি রকম আবেগসম্পন্ন তাহা আমাদের জান্‌তে হবে।

প্রকৃতির মূল সূত্র অন্বেষণে দর্শনের জিজ্ঞাসা আমাদের অন্তর জগতের মধ্যে কিরকম ভাব ও অর্থব্যঞ্জনা নিয়ে ফুটে উঠে তাহা বিশেষভাবে নির্ণয় করাই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দর্শন যে সত্য সম্বন্ধে বলে, সেটা হ'চ্ছে জ্ঞানের সত্য। জ্ঞানের দৃষ্টিটা হ'চ্ছে অখণ্ড। মনুষ্য এবং জগৎ সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাসার মূল ধরণটি হ'চ্ছে পূর্ণতা-প্রবণ। বুদ্ধি এর একটা পর্য্যায় মাত্র। বুদ্ধির কোদাল জ্ঞান-মাটির স্তূপ থেকে নিজের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য খণ্ড আকারে কিছু পরিমাণ কেটে নেয়।

বিখ্যাত দার্শনিক স্বর্গীয় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'দার্শনিকীতে' 'জড়জীব ও ধাতু-পুরুষ' শীর্ষক প্রবন্ধে জীবের আধানপদ্ধতির আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজের কথাতেই এই আধান-পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া যাক্। তিনি বলেছেন যে, "বিভিন্ন প্রাণীর বিচিত্র প্রাণ প্রক্রিয়ার ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি জীব পুরুষের প্রাণ-ব্যাপারের একটি স্বতন্ত্রতা ও বিশিষ্টতা আছে। তাহার গ্রহণ, ধারণ, বর্জ্জন, বহির্জগতের সহিত ব্যবহার, বহির্জগতকে সে যে প্রণালীতে আপন প্রয়োজনের অন্তর্গত করে, বহির্ব্যাপার তাহার মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, এবং সেই প্রতিফলনের অনুপাতে সে কিভাবে আপনাকে চালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে, সে সমস্তগুলিরই এক একটি বিশিষ্ট প্রণালী আছে। সেই প্রণালীটি সেই জীবপুরুষের অন্তর্হিত আধান পদ্ধতি হইয়া রহিয়া সেই জীব-পুরুষের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে আপনাকে সুব্যক্ত করিয়া তোলে।" দার্শনিকপ্রবর যে আধান-পদ্ধতির কথা বলছেন তাহা একান্তভাবেই দেহসম্পৃক্ত, জৈব। এই স্তরে বুদ্ধির যে দিকটা বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্যে পড়ে তাহা হ'চ্ছে সহজ ও সহজাত। দর্শন-জিজ্ঞাসার কোন কিছু হদিস আমরা এ স্তরে খুঁজে পাইনা। দর্শন জিজ্ঞাসার কিছু হদিস পেতে গেলে মনের যে নিগূঢ় স্তরে আমাদের যেতে হবে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিকী

পুরুষকে তাহাকে 'বৌদ্ধ পুরুষের' পর্য্যায়ে ফেলেছেন। 'বৌদ্ধ পুরুষের' তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেন নাই। তবে অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা চিন্তা করি, আলোচনা করি, প্রত্যেক ভাব বা জিনিষের কার্য্য-কারণকে বা পারম্পর্য্যকে ধারণা করি, সেই সমগ্র বৃত্তি-টাই হ'চ্ছে আমাদের 'বৌদ্ধ পুরুষ'। এই বৌদ্ধ পুরুষের, ঐ সমস্ত চিন্তা বা ভাবকে প্রকাশ করবার একটা ধরণ বা প্রণালী আছে, তাহা দার্শনিকের মতে ঐ বৌদ্ধ পুরুষের আধান পদ্ধতি. তাহাকে ধাতু পুরুষ বলে। দর্শন-জিজ্ঞাসার সূচনা এই ধাতু পুরুষ থেকেই আরম্ভ হয়। এই ধাতু পুরুষের একটা সমগ্র সংহত ও স্বচ্ছ বোধকেই জ্ঞান বলা হয়। বুদ্ধি এর একটা নিম্নস্তর মাত্র।

জ্ঞানের মধ্যে যে আস্পৃহা থাকে তাহা ঐ ধাতু পুরুষের প্রকাশের ইচ্ছা। দর্শন-জিজ্ঞাসার তথ্যগত রূপ এইরকমভাবে দেখান যেতে পারে। তত্ত্বগত দিক দিয়ে বুঝতে গেলে একটা বিষয় আমাদের বোধে অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠে। একটু ভাল ক'রে বুঝলে আমরা অনুভব করি যে দর্শনের জিজ্ঞাসাও একটা আবেগ বা আস্পৃহার পরিণামের অবস্থা, চরম পরিণাম নয়। সেটা হ'চ্ছে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'উপনিষদের আলো' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে ব'লেছেন যে···'দর্শন, তত্ত্বের আলোচনা করে মননের দ্বারা। বিচারের একটা রূপ আছে, সে রূপকে সে অতিক্রম কর্ত্তে পারেনা। বুদ্ধি বিচার করে কিন্তু তার পিছনে থাকে অনুভূতি। অনুভূতির রূপকে অবলম্বন ক'রে বিচার প্রণালী প্রস্তুত হয়।···বিচার দেয় বুদ্ধির উৎকর্ষ, অনুভূতি দেয় তত্ত্বের সংবাদ।" সাধারণতঃ দর্শন-জিজ্ঞাসা এই বিচারমূলক কিন্তু তার পরিণতি হ'চ্ছে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায়। সত্যের প্রতি সমস্ত জীবনব্যাপী শ্রদ্ধাই হ'চ্ছে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মূল প্রেরণা।

শুধু মাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহলই এই শ্রদ্ধার প্রকৃতি নহে—সত্যের প্রতি সারাজীবনব্যাপী একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং আস্পৃহার মধ্যেই এই শ্রদ্ধার জন্ম। জগতের সমস্ত দর্শনের মধ্যেই এই শ্রদ্ধাকে অল্প-বিস্তরভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানেই অন্যান্য বিষয় বা শাস্ত্রের জিজ্ঞাসা হ'তে দর্শনের জিজ্ঞাসার পার্থক্য। নিজের মধ্যে গহন এবং গভীর সত্যকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করবার ব্যাকুলতার মধ্যে এই দর্শন জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্যই নিহিত। পিথাগোরাস ব'লে একজন গ্রীক দার্শনিক বলেছেন 'where philosophy ends religion begins' এই কথাটার অর্থ অনুধাবন করলে দর্শন শাস্ত্রের জিজ্ঞাসার ও গতির এবং আমাদের মধ্যে তার প্রেরণার চিরন্তন দিকটা আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সত্যকে যখন আমরা তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করি তখন তাহা আমাদের কাছে দার্শনিক সত্যরূপে প্রতিফলিত হয় এবং যখন সেই তত্ত্বকে জীবনের মধ্যে আচরণ করি তখনই তাহা হয় ধর্ম্ম। তা হলে আমরা এটাই বুঝতে পারলুম যে দর্শনের জিজ্ঞাসা যদি আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে উত্থিত হয় তবে তার নির্দ্দিষ্ট গতিবিধিই হয় জীবনের চর্য্যার মধ্যে। দর্শনের জিজ্ঞাসা শুধু যে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল নয় তাহা এ থেকেও বোঝা যায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল সারাজীবনের আস্পৃহা ও জিজ্ঞাসাকে সরিয়ে রেখে শুধু এককভাবে বিষয়ের অনুসন্ধান করে। দর্শনের জিজ্ঞাসা জীবনের সমস্ত স্তরের সঙ্গে অন্বিত। তত্ত্ব জিজ্ঞাসার আবেগ যখন বুদ্ধি, জ্ঞান এবং অনুভূতি প্রভৃতি চৈতন্যের নানা স্তরের কানা উপচে যায়, তখন সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অখণ্ডভাবে তাকে উপলব্ধি করার জন্য জীবনের মধ্যে সেই তত্ত্বের চর্য্যা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। তখনই তাহা হয় ধর্ম্ম বা আরও ভাল কথায় বলা যায় সাধনা। বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকে সত্য অনুসন্ধানের কৌতূহল, চৈতন্যের সমস্ত গভীর স্তর ও বৃত্তির কাছে ঐ কৌতূহলের কোন দায় নেই, দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রের জিজ্ঞাসার মূলে শুধু কৌতূহল নেই, আছে সমগ্র জীবন সমন্বিত সত্যাকাঙ্ক্ষা। এই সত্যাকাঙ্ক্ষার দায় আছে চৈতন্যের সমস্ত গভীর স্তরে। দর্শনের জিজ্ঞাসার ভিতর স্বতঃই বুদ্ধিবৃত্তিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী ভাবের সুগভীর সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব বিদ্যমান।

জ্ঞানের ভিতরকার সামঞ্জস্য সূত্রটির প্রতি দর্শনের জিজ্ঞাসা স্বতঃই প্রসারিত হয়। সেইজন্যই অনেক পণ্ডিত বলেছেন জ্ঞানের মধ্যে সত্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষাই বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্রের কাজ। বাহিরের বস্তু কি নিয়মের দ্বারা আমাদের অন্তরজগতে পরিচিত হয়, চোখে দেখে মনের মধ্যে কি ঘটন বিঘটনে তাহা বাহিরে বিশেষ বিশেষ বস্তুরূপে পরিচিত হয় এবং ঘটন বিঘটনের এই শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সূত্রটির রহস্য কি—এই সমস্ত সংশয়ই সাধারণভাবে দার্শনিক মানস-ভূমির সৃষ্টি করে। তারপর ভিতরের গভীর স্তরের সহিত যত পরিচয় ততই দর্শনের শ্রীবৃদ্ধি।

আমরা দর্শনের মধ্যে যাহাকে বস্তু হীনতার মোহ বলি, তাহার একটা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য্য আছে। বাহিরে প্রকাশমান যে বস্তু, ভিতরে জ্ঞানের মধ্যে তাহার সূত্র কোথায় নিহিত, এটা বুঝবার জন্য দার্শনিক যেতে চায় বস্তুর সবচেয়ে গোড়ায়। বস্তুর সবচেয়ে গোড়ায় পরমাণুর মধ্যে সংকল্প-বিকল্পের আকারে জ্ঞানের সঙ্গে তার নিত্য যোগ কোথায়, কোথায় সে মানুষের গভীর মানসভূমিতে এক হ'য়ে আছে, ইহাই দার্শনিক দেখতে চায়।

মানুষ নিজে চৈতন্যময় ব'লে চৈতন্যের মধ্যে সব কিছুর অবস্থানকে যেন দ্বিধাশূন্য মনে নিতে পারে। মানুষ বহুর মধ্যে একেকে খোঁজে অন্য কোথাও নয়, এক সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় চৈতন্যের মধ্যে। জ্ঞানের সমৃদ্ধিতে এই চৈতন্যের আরও স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। চৈতন্যবান মানুষ বিষয়কে শুধু বিষয়রূপে সহ্য করিতে পারে না, বিজ্ঞানের কঠোর বাস্তব পরীক্ষা তাকে বিষয়ের মধ্যে, চৈতন্যের স্ফুরণকে দেখবার বেগবান ইচ্ছা থেকে টেনে রেখে দেয়। দর্শনের জিজ্ঞাসার মধ্যে মানুষের চৈতন্যের প্রতি এই পিছুটানও খুব অস্পষ্ট নয়। জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে বাহিরের বিষয় বস্তুকে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে দেবার তার একটা গূঢ় প্রচেষ্টা থাকে সেইজন্যই সে যেতে চায় বস্তুর সর্ব্ব গোড়ায়।

কোথায় বহির্জগত ও অন্তর্জগত এক হ'য়ে মিশেছে, সেই একের মধ্যে তার সমস্ত গভীর বৃত্তি পূর্ণভাবে চরিতার্থতা পেতে চায়। তার এই চরিতার্থতা সম্ভব হয়না যদি এই অন্তর্জগত ও বহির্জগত কোন অচেতন ও যান্ত্রিক নিয়মের মধ্যে এক হয়। তা হলে বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের Neutral particulars বা নিরপেক্ষ উপাদান নিগূঢ় দার্শনিক মনকে তৃপ্তি দিতে পারত। বিভিন্ন স্থান হ'তে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষা নিত বোধই হ'চ্ছে এই নিরপেক্ষ উপাদান। এই দর্শন বুদ্ধির তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু আত্মতৃপ্তি দিতে পারে না। যে সমস্ত দর্শনে প্রাণতত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়পরতার প্রতিক্রিয়া অতি সূক্ষ্মভাবেও রয়ে গেছে, সে দর্শনে, দর্শন-জিজ্ঞাসারই সব চেয়ে গোড়াকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রাণও ইন্দ্রিয়-ভূমিতে থেকে নানা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সেই প্রাণও ইন্দ্রিয়ের জেরকেই অতি সূক্ষ্মভাবে ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে উন্নত জীবন ধারার মধ্যে ব্যাখ্যা করতে চায়, তবুও প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ভূমি ছেড়ে বিজ্ঞানময় ভূমিতে দাঁড়াতে চায়না, যেখানে চৈতন্যের প্রকাশ অবারিত ও অবাধিত। জীব বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকে অবলম্বন করে নানা জ্ঞানের যতই নূতন নূতন সূত্র ব্যাখ্যাত হ'চ্ছে ততই ঐ প্রাণবাদী দর্শনের কলেবর বাড়ছে কিন্তু পরম ও চরম সত্যকে জানবার গভীর ও ঐকান্তিক আগ্রহের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা উঠেছিল সেই গভীর জিজ্ঞাসায় কিছুতেই তৃপ্তি হ'চ্ছেনা। মানুষ প্রথমে সরলভাবে ঐ পরম সত্যকে জেনে এই আকাঙ্ক্ষার পূরণ ও পরিতৃপ্তি চেয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে মানুষ দূরেই সরে যাচ্ছে।

বর্ত্তমান যুগের বড় বড় বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ, শ্রোডিংগার, এডিংটন, জীন্স্, আইনষ্টাইন ও প্লাংক প্রভৃতিরা 'চৈতন্যই যে বিশ্বসৃষ্টির আদি'—তাঁদের বাণীতে এই তত্ত্বের কাছাকাছি যাচ্ছেন। আবার দর্শন শিশু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে আবার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলেছেন, "আত্মিক দৃষ্টিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির জন্মদাতা"—(বিজ্ঞান ও দর্শন পৃঃ ৭৫)। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

এ কথাটা ব'লেছেন ক্রমপরিণতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। কারণ আমরা প্রথমে দেখতে পাই যে বিজ্ঞান জড়বাদের মধ্য দিয়েই আরম্ভ হ'য়েছিল। জ্যোতিষিক, ভূতাত্ত্বিক, জীবতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতির গবেষণার প্রথম বৈজ্ঞানিক ভাবে উন্মেষ হ'য়েছিল চৈতন্যকে আদি ক'রে নয়, জড়কেই আদি ক'রে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বৈজ্ঞানিক জড়বাদের গবেষণায় মানুষের আত্মিক দৃষ্টি হারিয়েই গিয়েছিল। শুধু হারিয়ে যাওয়া নয়, মানুষ তার প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাই পোষণ করে আস্‌ছিল। এর সবচেয়ে বড় প্রকাশ হ'য়েছে ডারুইন ও মার্ক্সবাদে। যার প্রতি এতদিন অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা পোষণ করে আসা হ'য়েছে, বিজ্ঞানে জড়ের একটু সূত্র পেয়েই সে আমাদের মধ্যে আবার জেগে উঠছে।

কিছু আভাস পেয়ে এত উৎফুল্ল হ'য়ে উঠা কেন? কয়েক শতাব্দীর জড়বিজ্ঞানমূলক গবেষণার দ্বারা এত পার্থিব সমৃদ্ধি—এসমস্ত ভুলে গিয়ে কিছুমাত্র আভাস পেয়েই চৈতন্যের প্রতি এত পক্ষপাত কেন? এ প্রশ্নের সমাধানের উপরই দর্শন জিজ্ঞাসার মূল আকাঙ্খাটি নিহিত। আমরা যাকে জড় বলি, তার যেটা জড়ীয় প্রভাব সেটা পরোক্ষ ও অলসভাবে আমাদের মধ্যে নিছক বুদ্ধির কৌতূহল জাগায়। এই বুদ্ধির কৌতূহল নিয়ে চেতনা জড়কে নানাভাবে ভেঙেচুরে গড়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নানা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করে। এখানে বিজ্ঞানী হ'চ্ছে বিধাতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা, তাছাড়া জড়ের দিক হ'তে আর কোনও প্রভাব তাকে নিয়ন্ত্রিত করেনা।

স্বরাট প্রভুত্বের মধ্যে যে আনন্দটা থাকে, তার পুঁজি শুধু একদিকেই থাকে। প্রভুত্ব দিয়ে সে যে আনন্দ করে সেই আনন্দের সব কিছু রহস্য তার নিজের অধিগত ব'লে সুচিরকালে নানা বৈচিত্রের মধ্যে ও সংঘাতের মধ্যে তার আনন্দ-প্রয়াস জীবিত থাকতে পারেনা। জড়ের মধ্যে সদাজাগ্রত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি চৈতন্যসত্তার দ্বারা কোন রকম প্রভাবিত না হ'য়ে কঠোর নিরপেক্ষতা নিয়ে অগ্রসর হয়। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা অতি কঠোর। বজ্র যেমন কঠিন, নির্ব্বিকার ও অচঞ্চল, বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ বুদ্ধিও প্রায় তদ্রূপ। স্বরাট প্রভুত্বের মধ্য দিয়ে এই কঠোর নিরপেক্ষতা বিশ্লেষণী ও পরীক্ষামূলক একই বুদ্ধি বৃত্তির প্রত্যয় সমষ্টির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ইহার ফলে আরও নানাবিধ বৃত্তি, চিন্তার আরও সমস্ত গভীরতার স্ফূর্তি হীন হ'য়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়াও হয় মানুষের মধ্যে সুদূর-প্রসারী।

মানুষের সমস্ত কর্ম্মে, চিন্তায় ও ব্যাপারে স্ব-নির্ভরতার সঙ্গে থাকে পরনির্ভরতা। মানুষের বৃত্তির মধ্যে যেমন স্বরাট প্রভুত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্খা আছে, তেমনি আছে পরতন্ত্রের, পরনির্ভরতার আকুতি। কারণ স্বরাট প্রভুত্বের বা স্বাতন্ত্রের মধ্যে যেমন শক্তি, সামর্থ্য দাক্ষিণ্য ও গুরুত্বকে লক্ষ্য করা যায়, তাকে শুধু একক ভাবে বহন করার মানসিকতা মানুষের কাছে অনেকটা যান্ত্রিক ও সংঘাতশূন্য ব'লে মনে হওয়ায় মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ একক বলিয়া বোধ করে। বাল্যকাল হ'তেই মানুষ পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবের স্নেহ ও নির্ভরতার মধ্যে পালিত হ'য়েছে। তার সংস্কারেও এই পরনির্ভরতা ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। এই নির্ভরতার সংস্কারই তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতির পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট চেতনার মধ্যে নিজের নির্ভরতা কল্পনা ক'রেছে। এম্‌নি ক'রেই এই নির্ভরতা তার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে একটা সমন্তাত্ত্বিক বিশিষ্টতা লাভ ক'রেছে। পর নির্ভরতার এই যেমন মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে তেম্‌নি একটা তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে।

নিজেদের চেতনা, যে অস্তিত্ব, জ্ঞান ও প্রকাশের মধ্যে খাড়া হ'য়েছে, সেই অস্তিত্ব, জ্ঞান ও প্রকাশ শুধু বিচিত্রভাবে 'হয়ে উঠার' সম্ভাবনার পূর্ণ। এই সম্ভাবনা-বোধ আমাদের গূঢ় স্বভাবে ওতপ্রোত হ'য়ে এই পৃথিবীতে নানা প্রকারে হ'য়ে উঠার প্রেরণা দেয়। এই বিচিত্র সম্ভাবনা-বোধের সঙ্গে আমাদের শুধু পরীক্ষামূলক বুদ্ধিবৃত্তিরই লেনদেন নাই, আছে

চিন্তা ও জ্ঞানের নানা স্তরের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্পর্ক। শুধু জড় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বৃত্তি ছাড়া, জ্ঞানের, চিন্তার নানা স্তরের সঙ্গে মানসিকতার যে লেনদেন চলে, তাহা কোনও না কোন প্রকারে আমাদের অস্তিত্ব ও প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে অন্বিত। দর্শন, মনতত্ত্ব থেকে কবিতা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু জ্ঞান ও চিন্তার ভাব-ভূমিই হ'চ্ছে চেতনার মধ্যে। চেতনার এই উচ্চুলতা আমাদের গভীর স্বভাবে তার চিরকালের আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। আমাদের চিন্তায় ও জ্ঞানে তাহা ওতপ্রোত হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। সেইজন্য তাকে ছেড়ে আমরা যতদূরই যাইনা কেন, পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির মত চেতনার মধ্যে আমাদের ফিরে আসতেই হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কালমাত্রায় সপ্তদশ শতাব্দী হ'তে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত চেতনাকে আড়ালে রেখে, জ্ঞান এবং ভাবের অন্তঃস্তরকে সুপ্ত রেখে, যান্ত্রিক বিজ্ঞানের গবেষণা চলেছিল। এখানে বৈজ্ঞানিকের খণ্ড বুদ্ধি বিধাতার স্থান নিয়েছিল। চল্‌বার পথে এর পাথেয় ছিল শুধু আন্তর শ্রদ্ধাপুত কৌতূহল। কিন্তু এত ক'রেও যেন কিছু হ'লনা, চেতনার সুগভীর প্রভাবে আবার বিজ্ঞানে ভাববাদ আরম্ভ হ'য়েছে।

পদার্থ বিজ্ঞান যখন বিশ্বের স্বরূপ রহস্য অন্বেষণে বস্তু থেকে তেজ বা শক্তির মধ্যে বিজ্ঞানকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে তখন থেকেই ভাববাদের সূচনা হ'য়েছে বলা যায়। এই বৈজ্ঞানিক শক্তিবাদ আরও প্রশ্রয় পেয়েছে হাইসেনবার্গের অনির্দ্দেশ্যবাদ, ম্যাক্সের কণিকাবাদ এবং আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ দ্বারা। বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই বল্‌ছেন যে এই সমস্ত মতবাদ নির্দ্দিষ্ট যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়না। উপরোক্ত মতবাদ সমূহ প্রকৃতির যে গভীরতম রহস্যের ব্যাপার আভাসে ইঙ্গিতে জানায়, তার মধ্যে মানুষের ভিতর যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্রষ্টা-খণ্ডবুদ্ধি আপনার খেই হারিয়ে ফেলে। বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্ জীন্‌স্ বলেছেন যে..... "শুধু অন্তর্চেতনা বোধ থেকে পদার্থবেত্তা শুদ্ধগণিতের যে সব নিয়মাবলী গঠন ক'রেছেন মনে হয় তাদের সঙ্গে প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় আছে"। শুদ্ধগণিত সম্বন্ধে তিনি ব'লেছেন—"শুদ্ধগণিত বলিতে গণিত শাস্ত্রের যে সব বিভাগকে বুঝায়, যাদের উদ্ভব শুদ্ধ চিন্তা থেকে, শুধু মনোরাজ্যের সীমায় নিবদ্ধ যুক্তি থেকে যাদের সৃষ্টি; এর বিপরীত হল ব্যবহারিক গণিত (applied mathematics), যা বহিঃপ্রকৃতির কোন কল্পিত ধর্ম্মকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগে বহির্জগৎ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়"। (বিশ্বরহস্য —দি মিস্টিরিয়স ইউনিভার্স) বৈজ্ঞানিক রহস্য এই শুদ্ধ চিন্তার স্তরে পৌঁছেছে বলে ভিতরকার কলরোল আরম্ভ হ'য়েছে। শ্রদ্ধাহীন নিরপেক্ষ বুদ্ধি নিয়ে যে যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে মানুষ জগতকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা ক'রেছিল, তাতে গভীর বিদারণ রেখা পড়েছে। এই বিদারণ রেখার সামান্য আভাষ পেয়েই বৈজ্ঞানিকের ভিতরকার নানা বুদ্ধি ও চিন্তার স্তর যারা এতদিন সুপ্ত ছিল, তারা সকলেই জেগে উঠেছে। তাহা জেম্‌স্ জীনসের বিখ্যাত পুস্তক 'Mysterious Universe' এর অন্তর্গত 'Into the deep waters' 'অতল বিশ্বসমুদ্রে' (অনুবাদ) শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই যেন খানিকটা বুঝা যায়। তিনি এখানে বলছেন—"বিজ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বের দিক থেকে সবাই প্রায় একমত হ'য়ে আজ এ বাণী ঘোষণা করছেন—জ্ঞানের স্রোত বয়ে চলেছে এক অধ্যাত্মিক বাস্তবতার দিকে, বিরাট যন্ত্রের চেয়ে এক বিরাট চিন্তার সঙ্গেই বিশ্বের বেশী সাদৃশ্য রয়েছে ব'লেই মনে হয়। জড়ের রাজ্যে মনের আবির্ভাবকে এখন আর আকস্মিক ও অনধিকার প্রবেশ ব'লে মনেই হয়না; বরং তাকে জড়রাজ্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে আমাদের স্বাগত অভিনন্দন জানান কর্ত্তব্য। এই মন আমাদের ব্যক্তি মন নয় (Individual mind) এ হল এক 'সর্ব্বগত মন' যেখানে আমাদের মনঃসৃষ্টিকারী পরমাণুরাজি 'চিন্তারূপে' বিরাজমান।" (অতল বিশ্বসমুদ্রে বিশ্বরহস্য-অনুবাদ)।

উপরোক্ত মত, অধ্যাত্ম দর্শন মতে সৃষ্টিতত্ত্বেরই যেন আভাষ দিচ্ছে। এক আদি বিশ্বচৈতন্যের

মধ্যেই সকলের উৎপত্তি ও স্থিতি এই অধ্যাত্ম তত্ত্বই যেন এখানে ফুটে উঠেছে। এ যেন পরোক্ষভাবে উপনিষদের "স ঐক্ষত, অহম্ বহুস্যাম" তিনি ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব—এই গভীর উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সমস্ত দেখেই মনে হয় পরিপূর্ণ আদর্শের পথে বিজ্ঞান যেতে চায়।

বিজ্ঞানের বিংশতি শতাব্দীর এই অধ্যাত্মিক মতবাদে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বা জিজ্ঞাসারও প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। এই জিজ্ঞাসাটা দার্শনিক জিজ্ঞাসার মত। এই জিজ্ঞাসার কথা জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন্ স্পষ্টভাবেই ব'লেছেন। তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

আদি থেকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী বা জিজ্ঞাসা এই রকম ছিল না। কারণ বিজ্ঞান আরম্ভ হ'য়েছিল জড়কে নিয়ে এবং ব্যবহারিক জীবনে তার কার্য্য ছিল মানুষের ভোগবৃদ্ধির দিকে, এইজন্যই বিজ্ঞান-চর্চ্চার মধ্যে আত্মিক দৃষ্টির কোন অবসর ছিলনা। শুধু ছিল নানাবিধ মনোরঞ্জনের একটা বুদ্ধিবৃত্তিক তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মতবাদে এই বুদ্ধিবৃত্তিক তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্থানে আত্মিক দৃষ্টির অতি দূরাগত অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ লোক এই জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে এখনও অজ্ঞ আছে। অবশ্য জিজ্ঞাসাটা প্রায় একই রকম ব'লে, বিজ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য দর্শন এবং দার্শনিকের চিন্তাধারার সঙ্গে মিশে যাবেনা, কারণ উভয়ের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ-প্রণালীর বিভিন্নতা বর্ত্তমান। জড়বিজ্ঞান তার চিন্তাধারায় এখনও এতদূর অগ্রসর হয় নাই যাতে ক'রে সে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে শুধু জ্ঞান-সর্ব্বস্ব করতে পারে।

দর্শন প্রথম থেকেই তার চিন্তাধারাকে জ্ঞান-সর্ব্বস্ব ক'রে চলে। জ্ঞানের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে সামান্যই ব'লে গেছি। জ্ঞান হ'চ্ছে পূর্ণতা-প্রবণ, যে পূর্ণতা অন্তরের সমস্ত বৃত্তি সমন্বিতভাবে হ'য়ে উঠে। এই 'হ'য়ে উঠার' প্রেরণাই দর্শনের জিজ্ঞাসার এবং দার্শনিকের মূল ভাবভূমির মধ্যে ওতপ্রোত।

এই 'হ'য়ে উঠার' পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনের জিজ্ঞাসা উদ্বুদ্ধ হ'লে, তার চিন্তা, যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সহিত একটা পার্থক্য থেকে যায়। সেই পার্থক্য, জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের পার্থক্যের মত। কারণ 'হ'য়ে উঠার' মধ্যে যে আবেগ আছে, তা চরিতার্থতা পেতে চায় একটা বিরাট ও একক চেতনাদর্শের মধ্যে নিজেকে ওতপ্রোত ক'রে দিয়ে। দর্শনশাস্ত্রের যেখানে তত্ত্বসমন্বিত দিক, সেখানে আছে নিরপেক্ষ সত্তা কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাত্র কৌতূহল বা বুদ্ধিবৃত্তিক তৃপ্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য নেই, আছে সমস্ত চৈতন্যময়তার আনন্দ, তাতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মাত্র আপনার বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সত্যানুসন্ধিৎসার সম্বন্ধ নেই, তাতে আছে সমস্ত চেতনার সঙ্গে আনন্দের, জ্ঞানের এবং প্রজ্ঞার স্বচ্ছতার সম্বন্ধ।

এইজন্যই আমাদের মনে হয়, দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতার মত নয়। সে (দর্শন) নিরপেক্ষ বটে তবে দার্শনিকের সমস্ত উপলব্ধি এবং চৈতন্যময়তার দ্বারা অনেকতঃ আচ্ছন্ন।

আমাদের মনে হয় দর্শনশাস্ত্রের জিজ্ঞাসার একটা সামগ্রিক ইঙ্গিত, এইরকমভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে নিহিত। তাহার আনন্দ আমাদের চেতনার সমস্ত জ্ঞান, স্ফূর্ত্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেরণার মধ্যে ওতপ্রোত।

আজকের সাহিত্য

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

কবিতার ক্ষেত্রে এখন যাঁরা একান্ত ভাবে ব্রতী আছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিত দত্ত, সমর সেন, হেমচন্দ্র বাগচী, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, গোপাল ভৌমিক, দীনেশ দাশ এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সব থেকে বেশী নাম ক'রেছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় এখন কচিৎ কবিতা লেখেন। তাঁর কাছে আমাদের অনেক আশা ছিলো। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র রায়ের রচনাতেও পুনরুক্তি আছে।

এই উপলক্ষে দুজন শক্তিশালী মৃত কবির নাম শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করি : তাঁদের নাম যথাক্রমে কাননী রায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য।

বিবিধ রচনার মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে টিকে থাকবার উপযুক্ত হোয়েছে, যেমন—শ্রীমতী রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' ও 'ঘরোয়া', শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্র নাথ'। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর 'নির্বান'। শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্র নাথ কথিত এবং শ্রীমতী রাণী চন্দ লিখিত 'জোড়া সাঁকোর ধারে'-ও চমৎকার। দৃষ্টিপাত এর লেখক 'যাযাবর'-এর কথাও এখানে স্মরণ করি।

এই প্রসংগে আরেকটী রচনার কথা মনে পড়ছে : সেটী শ্রীমতী রাণী মহলানবীশের লেখা 'দাক্ষিণাত্যে রবীন্দ্রনাথ', পরিচয় পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হোয়েছিলো, অবিলম্বে এটী তাঁর পুস্তক আকারে প্রকাশ করা উচিত। এই রচনাগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জান্তে পেরেছি।

এইবার আসে নাট্য-সাহিত্যের কথা। কোনো কিছু মন্তব্য করতেই দুঃখ হয়। আজ পর্যন্ত এক-খানা নাটক পড়তে পারলাম না যা নিয়ে এখানে কিছু লিখ্‌তে পারি, এদিক থেকে শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বনফুল অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউই সফলকাম হন নি।

সমালোচনা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁর সে শক্তি অস্তমিতপ্রায়, রুচিটাকে আরো একটু মার্জিত ক'রে যদি প্রকৃত সমালোচনা-সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন তাহলে আমাদের সাহিত্যে তা বিশেষ কল্যাণকর হবে।

সমালোচনার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ দাসগুপ্ত, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, নলিনীকান্ত সেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছেন এবং করছেন তবে দুঃখের কথা এই যে এঁরা এঁদের নিজেদের পাণ্ডিত্যের আড়ালে আসল কর্তব্যটাকে হারিয়ে ফেলেছেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর রায় সে দিক থেকে এঁদের মধ্যে খানিকটা মোহমুক্ত বলা যায়। সমালোচনা-সাহিত্যে 'আমাদের সাহিত্য-ভবন'-এর কিছু কিছু প্রচেষ্টাও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য 'মাতৃভূমি' এবং 'মন্দিরা'তে এঁরা কয়েকখানি বই এর পূর্বাংগ সুষ্ঠু সমালোচনা ক'রেছেন ও করছেন।

একটা আশা এবং আনন্দের কথা এই যে আজকে অনেক তরুণ লেখক অনুবাদ-সাহিত্যের দিকে ঝুঁকেছেন। কোন লেখক সাধারণতঃ মৌলিক রচনা ছেড়ে সহজে অনুবাদের দিকে আস্‌তে চান না।

এদিক থেকে সর্বপ্রথম আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই

শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি যা ক'রেছেন, তা বাঙালী পাঠকপাঠিকা চিরকাল মনে রাখবে। তাঁর পরে যাঁরা অনুবাদ-সাহিত্যে নেমেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অলোক গুহ, গোপাল ভৌমিক, শিশির সেন, অরুণ ভাদুড়ী, সমীর ঘোষ, শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষাল এবং শ্রীমতী পুষ্পময়ী দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমারের 'প্যান' ও আধুনিক সোভিয়েট গল্পের জন্যে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এই অনুবাদ বিমুখতার দেশে দলে দলে আরো কর্মী এসে যোগ দিন আমাদের এই একান্ত প্রার্থনা। এই দিক থেকে আমার কথা এই যে যদি শিক্ষিতা মহিলারা একটু এবিষয়ে করুণা করেন তাহ'লে আজকে অনুবাদের যে দৈন্য আছে, আগামী কালে তা আর থাকবেনা, এ বিষয়ে তাঁরা কি একটু অবহিতা হবেন?

এইবারে আমাদের 'শিশু-সাহিত্য' সম্বন্ধে সামান্য দু একটি কথা ব'লে এই আলোচনা শেষ করবো।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রভৃতি নিয়ে আমাদের শিশুদের হাতে যা দিয়েছেন, তার জন্যে এ দেশের সমস্ত শিশু-জগৎ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইলো। এ ছাড়া—শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী', সুকুমার রায় চৌধুরীর কবিতা আমাদের অক্ষয় সম্পদ। দুঃখের বিষয় এই যে আজকে শিশু-সাহিত্য বলতে যেন কতোগুলি আজগুবি এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী এবং ডিটেক্টিভ বই ছাড়া আর কিছু লেখা হচ্ছেনা। এদিক থেকে সাহিত্যের চরম ক্ষতি ক'রেছেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, অথচ ইচ্ছে করলে যে তিনি ভালো রচনা দিতে পারতেন তার বহু প্রমাণ পেয়েছি।

শিশু-সাহিত্য সত্যিকারের কিছু কিছু ভালো জিনিষ দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অখিল নিয়োগী এবং শিবরাম চক্রবর্তী। যদিও শেষোক্ত লেখকের পূর্ব-নিপুণতা আর নেই তবুও আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক ভালো জিনিষ পেয়েছি।

কবিদের মধ্যে সকলের আগে আমাদের মনে পড়ে শ্রীযুক্ত সুনির্মল বসুর কথা। এরকম অপূর্ব ছন্দ-নৈপুণ্য সত্যেন্দ্রনাথের পরে আর দেখা যায়নি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুর্ভাগা বাংলাদেশের একজন ধনী প্রকাশকও সাহস ক'রে তাঁর কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ করলেন না। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী সম্বন্ধেও এই কথা; এ লজ্জা শুধু প্রকাশকদের নয়, সমস্ত দেশের। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচীর শিশুদের জন্যে লেখা কবিতাগুলি অপূর্ব।

শিশুসাহিত্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এই উপলক্ষে স্মরণ করি। ইংরেজী বুক অফ্ নলেজের অনুসরণে তিনি যে 'শিশু-ভারতী' আমাদের দিয়েছেন তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ রইলাম। এই বৃহৎ কর্ম এ চেষ্টার আড়ালে তাঁর শিশুদের জন্যে যে কল্যাণ-চিন্তার প্রয়াস কে দেখেছি তার জন্যে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। 'শিশু ভারতী' নামকরণ করার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রচেষ্টাকে যে আন্তরিক সমর্থন ক'রেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, এই আমাদের একান্ত কামনা।

আনন্দবাজারের আনন্দ মেলার সম্পাদক 'মৌমাছি'র প্রচেষ্টাও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশে যা তিনি দিচ্ছেন তা সম্পূর্ণ নূতন, অন্ততঃ বাংলা কাগজে এরকম প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। সব থেকে বড়ো কাজ ক'রেছেন তিনি 'মনিমেলা' নামক সংঘ গড়বার কাজে সহায়তা ক'রে, তাঁর চিঠি ও প্রশ্নোত্তরগুলি প্রশংসনীয়।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আমাদের দেশে এমন একজন নিপুণা লেখিকার আবির্ভাব দেখলাম না যাঁকে নিয়ে আমার এই আলোচনায় আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারি।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর অগণ্য অপাঠ্য বইয়ের মধ্যে দু' একখানি স্মরণ যোগ্য হোয়েছে। 'মাটির দেবতা' এদের অন্যতম। তাঁর পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র স্মরণ করা যায় শ্রীমতী প্রতিভা বসু এবং শ্রীমতী বাণী রায়কে। প্রথমা

লেখিকার 'সেতুবন্ধ' এবং দ্বিতীয়ার 'প্রেম' শীর্ষক উপন্যাস দুখানিতে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় আছে. তবে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'An acre of Green Grass' নামক বইতে শ্রীমতী প্রতিভা বসুকে যে ভাবে প্রশংসা ক'রেছেন আমাদের কাছে সেটা বাহুল্য এবং স্তুতিবাদ বলে মনে হ'য়েছে!

কবিতায় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীও খানিকটা খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর লেখার কথা এই সংগে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর 'বুকের বীণা' 'আঙিনার ফুল' চমৎকার!

এটা ঠিক যে এখনো সাহিত্যে আমাদের অনেক অভাব আছে, অনেক চিন্তা করবার বিষয় আছে, সে ভরসার সাহিত্যিকের হাতেই ন্যস্ত। আশাকরি তাঁরা সমস্ত বাঙালী জাতির এই বিরাট সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং থাকবেনও—আগামী দিনে আরো ভালো রচনার সৃষ্টি হোক আমাদের অন্তরের তাই একমাত্র কামনা।

অন্তে এ আলোচনার মধ্যে কল্লোল-যুগের পূর্ববর্তী দু একজনের নামও অনিবার্যভাবে এসেছে।

বাংলা ভাষা-সমস্যা

শ্রীঅনিল কুমার হালদার

বাংলা সাহিত্যে ভাষা-সমস্যার আরম্ভ তখন হইতে, যখন হইতে ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত; বর্তমান-কালে সেই সমস্যার প্রাবল্য—সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক লেখকের বক্তব্যই যেন তাহা, অনেকে বলেন বিদ্রোহ, কিন্তু উহাও সেই সমস্যার নামান্তর।

এই সমস্যার সর্বপ্রথম সন্ধান 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ পাওয়া যায়—তাহারই স্রোতোধারা 'হুতোম্ প্যাচার নক্‌শায়' গড়াইয়া পড়িয়াছে। তখন ঊনবিংশ শতাব্দী—যে শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ ও বাংলা-সাহিত্যে মহাপ্লাবন আরম্ভ হইয়াছে।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র;—'লবণসোড়া যন্ত্রণাহ' ও 'ভট্টাচার্য্যের চানা'র দলের মধ্যে ঐ ঐতিহাসিক সংগ্রাম নবরূপ ধারণ করিল। তিনি লিখিতেছেন,—'বাংলা ভাষা বড় মোটানার মধ্যে পড়িয়াছে! ত্রিপথ-গামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্রলেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিকে সংস্কৃতের স্রোতে মহাগাদে উজান বহিতেছে—কত 'দুষ্টহার প্রাড়বিবাক্ মল্লিমুচ্' গুণ ধরিয়া সেকেলে বোম্বাই নৌকাসকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিকে ইংরেজীর ভরাগাঙে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, ঘরকারজান, ইথোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, শিনেস, বজরা ফুঁড়ে লক্ষের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত, মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃপাময়ী এই বাংলাভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্তে পড়িয়া লেখক তুলা-রূপেই ব্যতিব্যস্ত।'

মাইকেল বাংলা পদ্যের ভাষার প্রাণমূলে জল-সিঞ্চন করিলেন—শুষ্ক শুষ্ক মুঞ্জরিয়া উঠিল। অপূর্বোদ্ভাসা কাব্যসরস্বতী ললিত লবঙ্গলতা-রূপ তনু সৌকুমার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নটীর ন্যায় নৃত্যমুখর হইয়া উঠিল। অতঃপর কিছুদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকার জুড়ি হাঁকাইতে' লাগিলেন। বাংলাভাষা কলমন্ত্রে গাহিয়া উঠিল বিশ্বের বিচিত্র কাহিনী। বাংলা ভাষার ঐ পুরাতন সমস্যাই নূতন করিয়া দেখা দিল বীরবলের হাতে: "সবুজপত্র" তাহার মুখ্য-বাহন; রবীন্দ্রনাথও শিং ভাঙিয়া ঐ তরুণদের দলে যোগ দিলেন। ইহার পর শরৎচন্দ্রের ভাষায় সাধু ও কথ্যরীতি একাকার হইয়া গিয়া একটা চমৎকার লাবণ্য ও চারুত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক

কবিতায় শব্দ-সাহচর্য্য অতিমাত্রায় প্রকট এবং কয়েকটি উগ্রপন্থী লেখকের হাতে পড়িয়া তাহা সাধারণ 'অশিক্ষিত' পাঠকের নিকট বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে।

প্রাচীনপন্থীদের যুক্তি এই: সাধুভাষার ভিন্ন সাহিত্য রচিত হইতে পারে না, ঐ ভাষায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাকে সাধু বলিত উহা তাহাও নহে, বাংলা চল্‌তি বুলি তাহাতে অনেক স্থান পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের মমার্জ্জিত ভাষাসম্পদ বিসর্জ্জন দিবার কোনও হেতু নাই। যাঁহারা আরো অগ্রবর্ত্তী, তাঁহাদের মতে এই তথাকথিত চল্‌তি ভাষা অতিশয় কৃত্রিম ও সাহিত্য-রচনার অনুপযোগী।

নব্যপন্থী বলেন, তা কেন, যে ভাষায় ঘরে কথা বলি, যে ভাষায় চিন্তা করি, সে ভাষায় লিখিব না কেন? লোককে বুঝানই যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তবে সরলভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। আর একটা বড় যুক্তি—আমরা নূতন ভাষা সৃষ্টি করিব; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পুরাতনকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

বাংলা-গদ্য অর্থাৎ গদ্যসাহিত্যের বয়স বড় বেশী নয়, সুতরাং তাহাকে লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। গদ্যসাহিত্যরচনা করাও যথেষ্ট শক্তিমানের কাজ—তাহাতে শক্তি ও সাধনা উভয়ই যোগ করিতে হয়। Raleighর ভাষায়—"To write perfect prose is neither more nor less difficult than to lead a perfect life"—।

কিন্তু তাহারও উপরে একটা বড় কথা হইল—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখনও হস্যমান, এবং ইহা প্রসিষ্ণু ভাষা; সুতরাং এখনই কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাঁধিয়া দিলেও সে কোন নিয়ম মানিবে না; কারণ গঠনের মুখে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম চলে না।

চলিত ভাষার একটা প্রধান লক্ষণীয় এই যে ইহাতে কথ্য রীতিকে লেখ্য মর্য্যাদা দিবার সজ্ঞান চেষ্টা আছে। এ' চেষ্টার জন্য ভাষা ওজস্বিনী, তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়। সাধুভাষা অপেক্ষা ইহাতে ভার কম কিন্তু ধার অধিক। শরৎচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তীলেখক চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিবার জন্য তাহাদের মুখে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। একমাত্র এই সংলাপের গুণে 'পদ্মানদীর মাঝি'—(মাণিক বন্দ্যোঃ) একটা অদ্ভুত সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।

যে ভাষায় ঘরে কথা বলি তাহাতেই বাহিরে অর্থাৎ সাহিত্য রচনা করিতে হইবে—ইহা অর্থহীন। ঘরে যাহারা আটপৌরে শাড়ী পরে, বাহিরে যাইবার বেলায় তাহারা সৌখীন ও দামী কাপড় বাহির করে। ঘরে যাহারা নেংটি পরে সভা-সমিতিতে যাইতে হইলে তাহারা কেতাদুরস্ত হইয়া যায়। বাঙালী যেদিন ঘরে ও বাহিরের ভেদরেখা ঘুচাইতে পারিবে সেদিন তাহার সাহিত্যের ভাষার দ্বন্দ্বও মিটিতে পারে। সেইজন্য "perfect prose" এর সঙ্গে "perfect life" এর তুলনা।

প্রত্যেক ভাষার একটা অন্তর্নিহিত সঙ্গীতধ্বনি আছে—শক্তিমান কলাবিদ্ তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন—যাঁহারা ঠিকমত ধরিতে পারেন তাঁহারাই ভাষা সৃষ্টি করেন। ভাষার ঐ সঙ্গীতধ্বনি ফুটাইয়া তোলা বড় সহজ কথা নহে, তজ্জন্য প্রাণপাত সাধনা ও সহজাত প্রতিভা চাই; সেই মানস-অনুশীলনে ঐ ভাষাই বিশিষ্ট রীতিতে পরিণত হয়।

ভাষার এই দ্বৈরথযুদ্ধে কিছু কিছু রক্তপাত ও চিকিৎসা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে: যথা—'বাঙ্‌লা বানান সংস্কার' এবং 'বাংলা পারিভাষিক শব্দ-সৃষ্টি' ও সঙ্কট।

মাগধীপ্রাকৃত হইতে বাঙলা ভাষার উৎপত্তি হইলেও সংস্কৃতের সহিত যে ইহার রক্তের সম্পর্ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দেরই (তৎসম, তদ্ভব, অর্দ্ধ-তৎসম ইত্যাদি) আধিক্য। চলিতরূপে সে প্রভাব অনেকটা এড়ান যায়। সেইজন্য আধুনিক লেখকের দুই একজন অতীতকে ব্যঙ্গ করেন, বাঙ্‌লাকে স্বয়ম্ভু ভাষা বলিয়া অভিহিত করেন। পৃথিবীতে বোধহয় কোন ভাষাই স্বয়ম্ভু নহে।

এই ভাষা-সমস্যার সুযোগ লইয়া একদল

শক্তিহীন লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে এবং বোধহয় তাহাদের আস্ফালনই সর্ব্বাধিক। তাঁহারা একাধারেই ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণ। বাংলার তাবৎ সাময়িক পত্রে এইরূপ লেখকের দুই একটির সন্ধান মিলে; মোহিতলাল ইঁহাদিগকেই "বিশ্বপণ্ডিত" আখ্যা দিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।

রচনার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গুণ হইল প্রসাদগুণ,—এই মাধুর্য্যের সন্ধান যাঁহারা দিতে পারেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ লেখক। একথা সর্ব্বথা স্মরণীয় যে, যে ভাষা-সমস্যার কথা বলিতেছি তাহা সর্ব্বৈব সাহিত্যের সম্বন্ধে। সাহিত্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করাই বড় কথা নহে; পাণ্ডিত্য সংগোপনেই লেখকের কৃতিত্ব; ঐ গোপন করার যে সংযম ও শালীনতা তাহাই রচনাকে শ্রিসম্পন্ন ও তাহার চতুর্দ্দিকে জ্যোতির বলয়রেখা দান করে এবং তাহাতে ঐ শ্রেষ্ঠগুণ—প্রসাদগুণ আসে; একমাত্র উহারই খাতিরে বাংলাসাহিত্যের প্রাক্ আধুনিক যুগের সার্থক কবি ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,—

"পড়িয়াছি যেইমত বর্ণিবারে পারি,
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।"

—"অতএব কহি ভাষা যাবনীমিশাল"—অর্থাৎ ভারতচন্দ্র যুগের খাতিরে ভাষাসাঙ্কর্য্যকেও নির্দ্দোষ বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। তিনি একটা বড় কথা বলিয়াছেন,—

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক, ভাষা কাব্যরস লয়ে।"

শ্রেষ্ঠ কলাবিদের হাতে ভাষা নব কলেবর ধারণ করে এবং সে ভাষার বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গিমা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকৈবশিষ্ট্যের মতই অনন্য ও অননুকরণীয়। লেখকের প্রেরণা ও আবেগ যদি অকৃত্রিম হয় এবং তাহার পশ্চাতে যদি একটা সুকঠোর নিষ্ঠা থাকে তবে ঐ ভাষারই মাধ্যমে সে আত্মসাক্ষাৎকারের আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। ভাষার মাধ্যমে এই আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস ও পুরস্কার তাহার প্রাণচৈতন্যে শীতলতা ও মাতৃমমতার মত গভীরতম আশ্বাসের একটা স্পর্শে শিহরিয়া উঠে। ঐ অনন্যসুলভ শিহরণ মাতৃভাষা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে; তাই মাতৃভাষার জগতের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁহার প্রাণের আরাম খুঁজিয়া পাইয়াছে; কৃত্রিম সংস্কার তাহার বহিরাবরণ মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে পূর্ব্ব-জীবনের ভাষাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—সেইজন্য রবীন্দ্রতীর্থের ধ্বজাবাহকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক-প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া সেই পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত। কিন্তু একথা জানা উচিত যে—"fools may not speak wisely what wise men do foolishly".

এবং একথা অনস্বীকার্য্য যে ভাষা ও ভাবের একীকরণে যে বিশিষ্ট রীতি-রূপ—সাহিত্যে যাহাকে শৈলী বলে—তাহারই মধ্যে লেখকের পরমায়ু নির্ভরশীল।

আমাদের সাহিত্যিকরা সম্প্রতি দুইটি ভাষা লইয়া বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের অমিতরায় গভীর-পার্ব্বত্য প্রদেশের ক্ষীণ স্বর্ণধারার নিকট তরুণী লাবণ্যর পার্শ্বে বসিয়া বলিতেছে,—

"আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু আর একটা চল্‌তি। কিন্তু এছাড়া আরও একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা;—এই রকম আমগায় জন্তে। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো, সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইএর দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড় লজ্জা;...সত্যি বলুন লাবণ্যদেবী এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?" ('শেষের কবিতা')

লাবণ্য সেইদিন একেবারে নিরুত্তর ছিল। বোধ হয় তাহার ঠিকভাবে উত্তর দিতে হইলে এক শত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। সে কথা যাউক, কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম—সেই ভাষা-সমস্যার সমস্যাটা এইবার কোথায় গড়াইল?

গ্রন্থালয় আন্দোলন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি-এল, বিদ্যাবিনোদ

পুস্তক প্রীতি : পুস্তক প্রীতি বর্দ্ধিত করা গ্রন্থ-সেবকের কর্ত্তব্য। গ্রন্থাগারে যে-পুস্তকগুলি উপেক্ষিত, তন্মধ্যে উপাদেয় বিষয়গুলির প্রতি সভ্যগণের মন আকর্ষণ করিতে হইবে। জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত তুলিয়া আনিয়া, সকলকে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। উহা অমৃত-ভাণ্ডারে নিষ্ফলভাবে সঞ্চিত রাখিলে লাভ হইবে না। গ্রন্থাগার-জীবনে নিষ্ক্রিয়তার সার্থকতা নাই, উহাকে পঙ্গু করিয়া দিলে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। উহা সক্রিয়, সজীব করিয়া রাখা চাই। ধারাবাহিক বক্তৃতা, ঐতিহাসিক কাহিনীর বিবরণ, বিজ্ঞান-বার্ত্তার বিশ্লেষণ, গল্পের মধ্য দিয়া জ্ঞানোন্মেষ, ধর্ম্মালোচনা, সাহিত্য-চর্চ্চা, চিত্র-প্রদর্শন, আলোক-চিত্র বা আলেখ্য-প্রদর্শনী দ্বারা গ্রন্থ-প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। ভাগবত-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-উপনিষদের সরস ও সরল ব্যাখ্যা অধ্যায় ও সাংসারিক জ্ঞানের মূলে অগোচরে ও নির্ব্বিবাদে জল সিঞ্চন করিয়া থাকে। গ্রন্থাগারকে সচল করিতে পারিলে, পাঠ-স্পৃহা নিঃসন্দেহ রূপে বাড়িয়া যাইবে।

পথ-নির্দ্দেশ : গ্রন্থাধিক্য পাঠাগারের আয়তন বৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই, তবে বিশাল বপু অপেক্ষা সক্রিয়-সজীব-কমনীয়-কান্তি বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পাঠক যেখায় দিশাহারা হইয়া পড়ে, সে-স্থানে পথ-নির্দ্দেশ প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিক প্রদীপ হস্তে মায়া-পথে তাঁহাকে পরিচালনা করিবেন, পথ দেখাইবেন। বিষয়-বিভাগে গুরুত্ব আরোপ করিয়া, জ্ঞানের গভীরতাবশতঃ অতলতলে তলাইয়া না গিয়া জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির উদ্ঘাটন বাঞ্ছনীয়। সকল প্রশ্নের সন্তবমত সদুত্তর সকল বিদ্যার্থী আশা করেন। জ্ঞান বা বিদ্যা-বারিধির গভীরতা ভিন্ন পল্লব-গ্রাহিতার প্রয়োজনও সময়ে সময়ে লক্ষিত হয়। এই জন্য দীপ-শলাকার ন্যায় আলোক বিস্তার করিবে সুগঠিত গ্রন্থ-তালিকা ও সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়-পঞ্জী। শুনিতে পাওয়া যায়, পাঠকের সুবিধার জন্য ও সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে পঁয়ত্রিশটির উপর বিভিন্ন বিভাগ আছে। গায়ক বাড় পুরাতন রাজ-প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য। কোনেমারা পাবলিক লাইব্রেরী অবস্থিত মাদ্রাজ সহরের ভিক্টোরিয়া গ্রামে রাজার সুরম্য নৃত্যশালায়। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার বেলভেডিয়ারে আলিপুরের লাট-প্রাসাদে প্রায় আট লক্ষ পুস্তকের সংগ্রহ লইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে। মনে জাগে—আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা।

শিক্ষালাভ : রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পথ দুর্গম। ইহার চারিধারে আবার প্রচণ্ড গড়খাই।.....বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-লাভ সুকঠিন, ভাব প্রকাশে অস্পষ্টতা বা জটিলতা আসে, শিক্ষা-দান কার্য্যে নানা বাধা দেখা যায়।

গ্রন্থাগারের সাহায্যে শিক্ষা লাভ সুকর। পথের ব্যবধান ইহাতে ঘুচিয়া যায়, গড়খাই অন্তর্হিত হয়। নিজ ইচ্ছামত, রুচিমত বিভিন্ন বিষয়ে সুপাঠ্য পুস্তক ধীরে ধীরে পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করা যায়। জীবনে অফুরন্ত সময়, অবসর বিনোদনের জন্য এমন বিশ্রাম-কুঞ্জ আর নাই। কত প্রকার গ্রন্থ—সরল, মধুর, ঐতিহাসিক গবেষণা-মূলক কাব্য, নীতিজ্ঞান-বিষয়ক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, গল্প-উপন্যাস—ক্লান্ত-মনের পক্ষে হালকা-ধরণের গ্রন্থ, শ্রান্ত জীবনের পক্ষে বিরাম-কানন, আরাম-কুঞ্জ! গ্রন্থাগার সকলেরই অভাব মিটায়, জ্ঞান-পিপাসা দূর করে; পথহারা পথিককে পথ নির্দ্দেশ করে; ধর্ম্মালোচনা, তত্ত্ব-জ্ঞান—শান্তির প্রস্রবণ, এমন জন-প্রিয়, সাম্যবাদী কুঞ্জবন সংসারে বিরল।

জ্ঞানচর্চ্চা : মহাপরিনির্ব্বাণের কিছু পূর্ব্বে বুদ্ধদেব প্রিয়শিষ্য আনন্দকে সংবোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আনন্দ! নিজেই নিজের প্রদীপস্বরূপ হইয়া থাক। 'আত্মদীপা বিহরথ'—বাহিরের আশ্রয় চাহিওনা। ধর্ম্মকেই প্রদীপ-স্বরূপ অবলম্বন কর, ধর্ম্মকেই আশ্রয় কর। নিজের অন্তর ব্যতীত অন্য কোথাও আশ্রয় অনুসন্ধান করিওনা। ভিক্ষুগণের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবেন,যিনি এইভাবে স্বাবলম্বী হইয়া চলিতে পারিবেন—আমার দেহত্যাগের পূর্ব্বেই হউক, আর পরেই হউক।" সাশ্রুলোচন আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "আমার অন্তর্ধানে শোক করিওনা, ইহার পর বহু ভিক্ষু জ্ঞানী হইয়া উপদেশ দিবেন, তবে আনন্দ! তাঁহাদিগকেও নিয়মিত জ্ঞান-চর্চ্চা করিতে হইবে। আমার বাণী ও তাঁহাদের বাণী তোমাদের গুরুর কার্য্য করিবে। সংসারে কেহই চিরস্থায়ী নহে।"

জ্ঞান-চর্চ্চা বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সাগর-সঙ্গমে কপিলমুনির আশ্রম বাঙ্গালীর ললাটে জয়টীকা পরাইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের সমারোহ—চিন্তাশীলতার কল্পধারা। নালন্দার সুবিশাল গ্রন্থাগার "রত্নোদধি" নয়তলা প্রাসাদের আকারে স্থাপিত ছিল। বিশ্ববিশ্রুত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞানান্বেষী, বিদ্যার্থী, আচার্য্য, উপাচার্য্য, অধ্যাপক আগমন করিতেন জ্ঞান-সাধনার উদ্দেশ্যে। এই জ্ঞান-তীর্থের সর্ব্বাধ্যক্ষ শীলভদ্র বাঙ্গালীর গৌরব। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া দেশের ব্যবধান উত্তীর্ণ হইয়া, পথের দুর্গমতা তুচ্ছ করিয়া তিব্বতে জ্ঞান-যজ্ঞে আহুতি দিতে গমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু, সুপণ্ডিত হলায়ুধ, সুবিজ্ঞ মধুসূদন সরস্বতী ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম জ্ঞানানুশীলন ক্ষেত্রে এক একজন দিক্‌পাল। চর্য্যাপদের যুগে আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-স্তম্ভ।

ইতিহাস মাহাত্ম্য : গ্রন্থাগার আমাদের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করে, মনীষার বিকাশ, চিন্তার প্রাখর্য্য সাধন করে। জ্ঞানানুশীলনের ফলে কল্পনার উন্মেষ হয়, কর্ম্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়, দেশ-প্রীতি ও সমাজ-উন্নতি-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়; আমরাও জানিতে পারি আমাদের অতীত গৌরব-কাহিনী। ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা হইতে জানিতে পারি—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বিজয়সিংহ, গোপালদেব, শশাঙ্ক, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, রাজা গণেশ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রভৃতি বীরগণ নিজনিজ ক্ষেত্রে বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ না করিয়াও দেশবাসী সাধারণ পাঠাগার হইতে জানিতে পারেন যে, শূদ্র জাতীয় গোপালদেব যে পাল-বংশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা উপর্য্যুপরি চারিশত বৎসর ধরিয়া সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিল। এই শূদ্রবংশপ্রভাবে বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে উত্তর ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব করিয়াছে। ভারতের গৌরবময় যুগে পাল-রাজাদের আমলে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান ও বিটপাল প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় কৃষ্টির ধারা অনুসরণ করিলে বুঝা যায়, সুদক্ষ শিল্পী কর্ণভদ্র, সুপ্রসিদ্ধ মহিধর, শিল্প-বিশারদ শঙ্করদেব পাল-রাজগণের গৌরব বৃদ্ধি করেন। ভারতের সরস ইতিহাস, বাঙ্গলার গৌরবময় ইতিবৃত্ত, বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রভৃতি পাঠে দেশের উপাদেয় তথ্যগুলি উজ্জ্বল আকারে উদ্ঘাটিত হয়।

বাঙ্গালা দেশের কৃষ্টি, সাধনা, জ্ঞান-চর্চ্চা ও শিক্ষা-বিস্তারের কথা বলিতে গিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। দেশ যখন তন্ত্রশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যায় বিব্রত, দেশবাসী যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবনতির পর চিন্তা ও ধর্ম্ম অনুশীলন ক্ষেত্রে হীনতায় পঙ্গু, উৎকট তান্ত্রিকতায় বিভ্রান্ত, তখন আবির্ভাব দেখা গেল গৌড়-চন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। অদ্বৈত আচার্য্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভু ও প্রেমধর্ম্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব অগাধ পাণ্ডিত্য, অপরিমেয় জ্ঞান ও অপরিসীম ঈশ্বর-প্রেম দ্বারা দেশবাসীর চৈতন্য ফিরাইলেন। প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অবিচল সাম্যবাদের সাহায্যে মানব-মনে তিনি আনিলেন প্রেমের বন্যা, জাগাইলেন জ্ঞানের শিখা, জাগাইলেন শিক্ষা

সংস্কৃতির প্রেরণা-আলোক। রূপ ও সনাতনের বাণলা ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বহুলোকের মনের গতি ফিরাইয়াছিল। মহাপ্রভুর জ্ঞান, নিষ্ঠা ও ভক্তি ভারতকে দিল নূতন রূপ, নূতন দীক্ষা, নব আচরণের জন্য নূতন শিক্ষা।

উপসংহার—উপসংহারে মহাকবি কালিদাসের ভাষায় ব্যক্তিগত বক্তব্য শেষ করি। রাজা দুষ্মন্তের মুখ দিয়া জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি—মহাকবি কালিদাস "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে বলিয়াছেন,—

সিদ্ধন্তি হ্যুরু কর্মসু যন্নিযোজ্যাঃ
নন্তাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।

অনুচর যা ভৃত্য যে কোন দুষ্কর কর্মে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা নিয়োগ-কর্তা প্রভুর অনুগ্রহ বশতঃই আনিতে হইবে। আমার এই কর্মে যে সিদ্ধি, খ্যাতি, সম্মান ঘটিল, তাহা কেবল সেই প্রভু—শ্রীভগবানের অনুগ্রহে।০

---

*নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের হীরক-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে লেখা নিবেদনের প্রতিলিপি (২৬।২।৫৬)।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

উমা মিত্র

হ্যাম্পশায়ারের শান্ত পরিবেশ ঘেরা একটি সুন্দর বাগানবাড়ী। মা ডাকছেন, 'ফ্লো', 'ফ্লো'…

খোপা খোপা কোঁকড়া সোনালী চুলে ঘেরা একটি মুখ নিবিষ্ট মনে কি যেন করছে। মায়ের ডাক তার কানে পৌঁছালই না। মা ডাকতে ডাকতে কাছে এসে দেখেন ফ্লোরেন্স কুকুরের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। পথের কুকুর…একটি দুষ্টু ছেলে ঢিল ছুঁড়ে তার পাকে আঘাত করেছে। ফ্লোরেন্স দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো কুকুরটিকে। দুটি নীল চোখে তার কি অপরিসীম সহানুভূতি!

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের রাজত্বের সময় ইটালীর মনোরম সহর ফ্লোরেন্সে এক সম্ভ্রান্ত নাইটিঙ্গেল পরিবারে একটি দুষ্টুমিষ্টি মেয়ের জন্ম হয়। মেয়েটির পিতামাতা সুন্দর সহরের নামেই তাঁদের কন্যার নাম রাখলেন 'ফ্লোরেন্স'।

গ্রীষ্মে ডার্বিশায়ার পাহাড়ে আর শীতে হ্যাম্পশায়ারের সুন্দর বাসভবনে অতি আনন্দেই অতিবাহিত হয়েছিল ফ্লোরেন্সের শৈশব ও কৈশোরকাল।

ধীরে ধীরে, প্রাকৃতিক শোভায় লালিত, ফ্লোরেন্সের অন্তরাকাশ বৃহৎ জীবনাদর্শের প্রেরণায় অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। যিনি উত্তরকালে হবেন একজন মহিয়সী মহিলা, বিশ্ববিশ্রুতা রমণী ও শত শত দুঃস্থ আহতের জীবনে সঞ্জীবনী সুধা। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁকে অতি সন্তর্পণে, অতি নির্জনে গড়ে তুলছিলেন।

তিনি ও তাঁর বোন গৃহেই লেখাপড়া, নাচগান ও ছবি আঁকায় পারদর্শিনী হয়েছিলেন। শীতের দিনে অধ্যয়নে কঠোর পরিশ্রম করতেন। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দুপুরগুলি ঘোড়ায় চড়ে জলাভূমি, উপত্যকা ইত্যাদি নিভৃতস্থানে গিয়ে চিত্তবিনোদন করতেন।

এমনিভাবে একে একে সতেরোটি বছর কেটে গেলো ফ্লোরেন্সের জীবনে। তাঁর চেয়ে বছরখানেকের বড় রাণী ভিক্টোরিয়া তখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী। সেই সময় অধ্যয়ন তাঁর শেষ হলো।

গ্রাম্য জমিদারের মেয়ের মতো পীড়িতের পরিচর্যা, বাইবেলের ক্লাশ-পরিচালনা ও গ্রাম্য লোকেদের বিষয়ে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি।

প্রীতিসম্মিলনী, নাচের আসর, বিদেশ ভ্রমণ—

এমনকি রাজেন্দরবাবুর পরিচিত হয়েও তাঁর পরিতৃপ্তি হলোনা।

তিনি ছিলেন প্রিয়দর্শিনী, আনন্দময়ী বালিকা। অটুট স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে তিনি সব কিছুতেই যোগদান করতেন। কিন্তু এসব-কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পেতেন না। যেন তাঁরতেন তাঁর জীবনপাত্র সেবা মাধুরীতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো কই!

অতি কৈশোরকাল থেকে তাঁর অন্তরের নিভৃত মণিকোঠায় এক শাশ্বত কল্যাণের সুর স্পন্দিত হত। কিসে তার বিকাশ—কোথায় তার সার্থকতা, তা' তিনি তখনও উপলব্ধি করতে পারতেন না। এক অজানা অতৃপ্তি তাঁর মনের আকাশ ছেয়ে থাকতো।

পীড়িতের সেবায়, আহত প্রাণীর শুশ্রূষায় তিনি উপলব্ধি করতেন এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি। সেগুলির সম্পূর্ণতা পাবার সাথে সাথেই আবার তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন। কোন আদর্শের কাজে—কল্যাণের কাজে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে চান। সে আত্মাহুতির আহ্বান তাঁর সমস্ত অন্তর মথিত করেও পথ খুঁজে পেতনা।

বিংশ শতাব্দীর কোলে যদি জন্ম নিতেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, তাঁর আত্মবিকাশের পথে থাকতো না কোনও বাধা। তিনি ইচ্ছামতো নিজেকে বিকশিত করার ক্ষেত্র পেতেন। নার্সিং বা ডাক্তারী যে কোনও পথে নিজের চরিতার্থতা খুঁজে পেতেন।

কিন্তু একশত বৎসর পূর্বে, যে যুগে তিনি জন্মে-ছিলেন, তখন নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণী ভিন্ন বাড়ীর বাহিরে কাজ করার কথা কেউ চিন্তাও করতেন না। ফ্লোরেন্সের পিতা ছিলেন বিত্তশালী। কাজেই কন্যার অর্থোপার্জনের কোনও প্রয়োজনই ছিলনা।

তাঁদের মতো অভিজাত পরিবারের মেয়েরা যা' করেন, কন্যাও খুশীমনে সেই সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকবেন—অর্থাৎ প্রাতে কিছুক্ষণ ভৃত্যদের তত্ত্বাবধান, পুষ্পচয়ন ও যথাযথস্থানে সেগুলির বিন্যাস কিছুক্ষণ বা চিত্রাঙ্কন ও এমব্রয়ডারী করবেন ও মাঝে মাঝে ভোজসভা ও নাচের সভায় যোগদান করে একদিন কোন উপযুক্ত যুবককে বিবাহার্থে মনোনীত করে বিবাহোত্তর জীবনও এই একই ধারায় প্রবাহিত করবেন—এইটেই ছিল তাঁর পিতামাতার ধারণা। তাঁর দিদি ও মামাতো-পিসতুতো বোনেদের ও বান্ধবীদের সকলেরই জীবনধারা বাঁধা ছিল এই চিরাচরিত প্রথায়।

কিন্তু ফ্লোরেন্স তাঁদের সমস্ত আকাঙ্খাকে নির্মূল করে দিলেন। ফ্লোরেন্সের ২৪ বছর বয়সে মা-বাবা যখন চাইছেন নির্বিঘ্নে তাঁর বিবাহপর্ব সমাধা করতে, ফ্লোরেন্স তখন প্রকাশ করলেন বিবাহে তাঁর প্রবল অনাসক্তি। চিত্ত তাঁর চঞ্চল অধীর; তাঁর মনোবীণায় অহরহ ঝঙ্কৃত হচ্ছে যে মহান আদর্শের আহ্বান—সে তাকে স্থির থাকতে না পেরে মা-বাবাকে জানালেন যে সেলিস্ বেরী হাসপাতালে তিনি নার্সের শিক্ষানবীশী করতে যাবেন।

বিনামেঘে বজ্রপাত। ফ্লোরেন্স যদি নিজহাতে তাদের পরিবারের মধ্যে একটি বোমা নিক্ষেপ করতেন, তাতেও তাঁরা এত স্তম্ভিত ও আহত হতেন না। মার্জিতরুচি, সুশিক্ষাসম্পন্না, আলোকপ্রাপ্তা কুমারী নাইটিঙ্গেল যাবেন সেই অমন পরিবেশে! যে শুশ্রূষার কাজ শুধু কতকগুলি বৃদ্ধা অশিক্ষিতা নীচমনোভাবাপন্না স্ত্রীলোকেরা গ্রহণ করে, সেই কাজে যোগদান করবেন তিনি! এ তাঁদের কল্পনারও অগোচর।

কিন্তু ফ্লোরেন্স সংকল্পে অটল। পিতামাতার অসম্মতিতে তাঁর জীবন-স্বপ্ন বিলীন হতে চলেছে। তিনি যদি দুর্বল চরিত্রের নারী হতেন, তাহলে হতাশার কঠিন শিলায় তাঁর জীবনাদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন অনন্যা। ব্রতী হয়েই তিনি পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন; তাই বাধা যত প্রবল, সংকল্পেও তিনি তেমনি অটল।

আপাততঃ তাঁকে মায়ের কাছে কর্তব্যপরায়ণা বাধ্য মেয়ের মতই বাড়ীতে থাকতে হলো। অভিজাত পরিবারের চিরাচরিত প্রথায় তিনিও নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু অবসরবিনোদন করতেন তিনি ডাক্তারী জার্নাল ও হাসপাতালের রিপোর্ট পড়ে। মায়ের সাথে বিদেশের বড় বড় শহরে পাড়ি দিতে হলেও এবং নাচ, গান, পার্টি, অপেরা করেও তাঁর সময় ও

উত্তম দু'ই অট্টুট থাকতো শহরের কারখানা এবং জলা ও বস্তি অঞ্চলের ক্ষুদ্র স্কুল ও হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করায়।

রোমের কনভেন্টে কিছুদিন ও প্যারিসের "Sister of charity" রূপে দু'এক সপ্তাহ তিনি কাটিয়েছিলেন। তাঁর মা ও দিদি যখন কিছুদিনের জন্য জার্মানীতে অবসর বিনোদন করছিলেন, তিনি সেই সুযোগে নিকটস্থ এক নার্সিং ইনষ্টিট্যুশনে তিন মাস কাটিয়েছিলেন।

গৃহ-জীবনে যখন তিনি আবার ফিরে এলেন, তখন নমতা বজায় রাখা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। জীবনের স্বাদ তখন গেছে বদলে। যে আকাঙ্ক্ষা অন্তর্বাহিনী ফল্গুনদীর মতো এতদিন নিঃশব্দে বয়ে চলেছিলো তার গতি হলো দুর্বার।

কাটলো আরো কয়েকটি বছর। চৌত্রিশ বছর বয়সে ফ্লোরেন্সের জীবনে এলো সুযোগ। তাঁর পিতামাতাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার সম্মতি দিতে হলো। ক্ষুব্ধা মা বলে উঠলেন, "একটি 'বনহংসী'কে আমরা এতদিন ধরে লালন করলাম!"

তাঁরা কন্যাকে একটি ছোট শুশ্রূষাগারের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ রূপে নিযুক্ত হতে অনুমতি দিলেন। কুমারী নাইটিঙ্গেলের আদর্শ জীবন শুরু হওয়ার এ শুধু সূচনামাত্র। নবারুণের প্রথম অভ্যুদয়ের মতো তাঁর অন্তরাকাশ যে বিরাট সম্ভাবনায় অনুরঞ্জিত। এ শুধু তার পটভূমিকা!

তাঁর নার্সিংহোমে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করবার ঠিক এক বৎসর পর ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধলো। ব্রিটিশ এবং ফরাসী জাতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ যাতে কাল স্থায়ী অথচ তীব্র হবে এই ছিল কর্তৃপক্ষদের অনুমান। তাই হাজার হাজার সৈন্য তাঁরা পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু শীত এসে গেলেও যুদ্ধ শেষ হলো না। দারুণ শীতে সৈন্যরা মর্মান্তিক কষ্ট পেতে লাগলো। ইংলণ্ডে পৌঁছালো এই খবর। কুমারী নাইটিঙ্গেল পড়লেন এই দুঃসংবাদ। গভীর মমতা ও সহানুভূতিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো তাঁর অন্তর।

হাজার হাজার সৈন্যকে মৃত্যুবরণ করতে হতো কামানের মুখে নয়, যুদ্ধক্ষেত্র হতে আহত অবস্থায় ফিরে উপযুক্ত খাদ্য ও নিপুণ শুশ্রূষার অভাবে। এই অগণিত আহতকে পরিচর্যা করার জন্য ছিল শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ডাক্তার। তখনকার দিনে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নার্স প্রেরণের কথা কারুর কল্পনায়ও স্থান পেতোনা।

ফ্লোরেন্সের দুটি নীল চোখে ঘনিয়ে এলো চিন্তার ছায়া। নিজের মনেই তাঁর প্রশ্ন উঠতে লাগলো—তাঁকে দিয়ে কোনও সাহায্য হতে পারে না? তিনি কি এই দুঃস্থদের সেবায় পারেন না নিজেকে উৎসর্গ করতে? এই তো মহান সুযোগের শুভলগ্ন এসেছে তাঁর জীবনে। পায় হতেই হবে এর সিংহদ্বার।

সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধের মন্ত্রী সিডনী হার্বার্ট ছিলেন তাঁর পরম বন্ধু। তাঁরই সুপারিশে গভর্ণমেণ্ট তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

সুরু হলো তাঁর যাত্রার আয়োজন। ৩৮ জন সেবিকাসহ ক্রিমিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করলেন। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে কোনও সরঞ্জাম নিতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তবুও তিনি মার্সেলস্‌ থেকে প্রচুর পরিমাণ জিনিস নিয়ে গেলেন।

হেডকোয়ার্টার্স বুটারীতে পৌঁছে যে দৃশ্য তিনি দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময় ও দুঃখের সীমা রইল না। কিন্তু অভিভূত হলেও শীঘ্রই তিনি তাঁর সেবিকা-বাহিনীকে নিয়ে নিপুণ হাতে কাজ সুরু করে দিলেন।

একটি ভগ্নপ্রায় বড় বাড়ীতে সৈন্যদের হাসপাতাল হয়েছিল। মেঝেগুলি এত বিশ্রী যে উপযুক্তভাবে ধোওয়া-মোছার অভাবে ঘরের বাতাস দূষিত। বড় বড় ইঁদুরের উৎপাত। চার মাইল জুড়ে রোগীদের বিছানা। বেডগুলি এত কাছাকাছি ফেলা যে পাশ দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। আলো বাতাসের অভাবে ঘরের আবহাওয়া অবর্ণনীয়।

রোগীদের জন্ত বাসন, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই। ট্রে, প্লেট, ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি কিছুই ছিলনা। রান্নার ব্যবস্থাও অতি নিকৃষ্ট। এই সব অব্যবস্থা ছাড়াও কর্তৃপক্ষের প্রবল বাধার বিরুদ্ধে তাঁকে রীতিমত মানসিক দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কারণ দুএকজন তরুণ ডাক্তার ভিন্ন অপর কোনও ডাক্তার বা সার্জেন কোনওরকম সংস্কার ও পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেননা।

কুমারী নাইটিঙ্গেলের আগমনকে তাঁরা কেউই সুনজরে দেখেন নি। সার্জেনরা তাঁকে প্রথমে সহকর্মিনীরূপে মেনে নিতে একেবারেই রাজী ছিলেননা। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতার কাছে সকল বিরোধিতাই মাথানত করেছিল। তাঁরা মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। এই ভাবে সকল বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্যে কখনও কর্তৃপক্ষকে অনুনয়বিনয় করে, কখনও নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করে তিনি অনুকূল অবস্থায় এসেছিলেন। পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্ন পোষাক সব কিছুরই ব্যবস্থা তিনি করলেন। বিশৃঙ্খলা, অপরিচ্ছন্নতা ও হট্টগোলের পরিবর্তে এলো শান্তি ও নিয়মতান্ত্রিকতা।

মার্সেলস্ থেকে আনা তোয়ালে, চামচ, কাঁটা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি রোগীদের মধ্যে বিতরণ করে তিনি তাদের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন। যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্ত তিনি পাঠাগার প্রমোদাগারের ব্যবস্থা করেছিলেন। চারঘাইল জুড়ে ছিল সেই হাসপাতাল। কিন্তু যখন, যেখানে তাঁকে সবচেয়ে প্রয়োজন হতো, সেখানেই হাসিমুখে তাঁকে উপস্থিত দেখা যেতো। শয্যাশায়ী কোনও রোগীকে তিনি শোনাতেন গল্প, কখনও স্নেহ কোমল হাতখানি বুলিয়ে দিতেন কোনও আহতের দেহে মাথায়। যারা উত্থানশক্তিরহিত, তাদের বাড়ীর জন্তে তিনি লিখতে বসতেন চিঠি। ডাক্তার যাদের সম্বন্ধে নিরাশ হতেন এমন কত রোগী তাঁর শুশ্রূষায় নিরাময় হয়েছিল। তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারই ছিল সৈন্তদের কাছে মূল্যবান ঔষধ। অতিরিক্ত মদ্যপান না করে অর্থ সঞ্চয়ের জন্ত তাদের উৎসাহ আর পরামর্শ দিতেন। কোনও রোগীর বাড়ীতে টাকা 'মানিঅর্ডার' করা, কাহারও বা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া সবকিছুর ব্যবস্থাই তিনি করতেন। সৈনিকদের জীবনে এ যেন স্বপ্ন। এ দৃষ্টি-কোণ দিয়ে তারা কখনও চিন্তা করেন নি।

"প্রদীপধারিনী মহিলার" প্রদীপখানি যেন তাঁদের জীবনে নূতন আলোক সম্পাত করলো। তিনি ছিলেন তাদের জীবনে সূর্যরশ্মির মতো প্রাণময়ী। প্রদীপখানি ধরে যখনই তিনি রোগীপরিদর্শনে যেতেন তখন তারা মনে মনে তাঁকে পূজা করতো। বিছানায় পতিত তাঁর ছায়াকে তারা চুম্বন করতো। একজন সৈনিকের উক্তি আছে, এই মহিয়সী মহিলা আসার পূর্বে এখানে শুধু ছিল অভিসম্পাত ও শপথ গ্রহণ। তিনি এলেন আর এখানে বিরাজ করতে লাগলো গীর্জার পবিত্রতা। (Before she came, there was cursing and swearing, but after that, it was as holy as a church')

তখন স্কুটারীর হাসপাতালে সবকিছু সুব্যবস্থা হয়ে গেলো, তিনি তখন ক্রিমিয়ার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছোট ছোট হাসপাতালগুলি পরিদর্শনে ও উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করলেন।

স্কুটারীর হাসপাতালের রোগীদের সেবা ছাড়াও তাঁকে সিড্‌নী হার্বার্ট্ ও অন্তান্তদের চিঠি লিখতে হতো। গভর্ণমেণ্টের কাছে তাঁর কাজের বিবরণী, কোনও কোনও বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা জানানো বা উন্নতিমূলক কোনও ব্যবস্থার জন্ত আদেশ পাঠাতে হতো। এত সব কাজের মধ্যেও তিনি পায়ে হেঁটে বা অশ্বপৃষ্ঠে দূর পার্বত্যপথ ভেঙ্গে চলতেন। প্রবল তুষারপাত বা ঝঞ্ঝাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা এগিয়ে যেতেন ছোট ছোট হাসপাতালগুলির সংস্কারকল্পে।

শ্রান্তি-ক্লান্তিহীনা এই মহিয়সী রমণী আপন সত্তার প্রতি অণুপরমাণু উৎসর্গ করেছিলেন এই সেবা ব্রতের দীক্ষায়।

অত্যধিক পরিশ্রমজনিত অবসাদ ও দুশ্চিন্তাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

চিকিৎসকেরা তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে একান্তভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পণ করেছিলেন যে একটিমাত্র সৈন্যও স্কুটারীতে থাকতে তিনি সেস্থান ত্যাগ করবেন না।

সৌভাগ্যের বিষয় যে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। শান্তি ঘোষণা করার চার মাস পর কুমারী ফ্লোরেন্স ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তাঁর স্বদেশবাসীরা তাঁর কাজে অত্যন্ত উদ্দীপনা বোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে জনসাধারণ কোনও রকম সভা-সমিতি করে অভিনন্দন জানায়, বা হৈচৈ করে—এ তিনি মোটেই চাননি। তাই যারা সহরের অধিবাসীরা যখন তাঁর আলোচনায় মুখরিত, তিনি তখন নিঃশব্দে ফিরে গেলেন তাঁর সেই পুরাতন ছায়া-ঘেরা নিভৃত গৃহে।

কর্তব্যের প্রেরণায় যে স্বাস্থ্যকে তিনি তিলে তিলে ক্ষয় করেছিলেন, তাকে পুনরুদ্ধার করতে ব্রতী হলেন তখন।

স্বদেশবাসীর অন্তর কিন্তু কুমারী নাইটিঙ্গেলকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যগ্র। তাই শীঘ্রই তারা ৪৪০০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করে তাঁকে উপহার দিল।

তিনি এর একটি কপর্দকও নিজের জন্য ব্যয় করেননি। লণ্ডনে তিনি একটি হাসপাতাল ও নার্সদের কোয়ার্টার তৈরী করেন। সেখানে যা'তে নার্সেরা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ ক'রে, সর্বতোভাবে এই মহৎ সেবাব্রতের অধিকারিণী হতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটিকে।

স্বাস্থ্য তাঁর সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকেরা একবাক্যে তাঁকে পূর্ণবিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দৈহিক বিশ্রাম নিলেও স্কুটারীর বিভীষিকাময় স্মৃতি তাঁর অন্তরকে আজন্ন করে রেখেছিলো। কি ক'রে তিনি বিশ্রাম নেবেন? অসংখ্য আহতের মর্মবেদনায় তাঁর অন্তর যে আলোড়িত।

শান্তির সময়তেও নাগরিক জীবনের থেকে সেনা-নিবাসের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ। ভবিষ্যতে যা'তে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তারই ব্যবস্থার বিধানায় শুধুও তিনি ব্যস্তপরিকর হয়েছিলেন।

তাঁর বহু অনুরাগী সহকর্মী ছিল—যারা তাঁর হয়ে সামান্যতম কাজ করতে পারলেই নিজেদের ধন্য মনে করতো। তাদেরই সাহায্য ব্যতিরেকে অফিসের (কর্তৃপক্ষের) সহিত দীর্ঘ বাক্‌বিতণ্ডা চালিয়ে তিনি—বোধ হয় জয়ী হতে সক্ষম হতেন না।

বর্তমানে সৈনিকজীবনে পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের মূল ভিত্তিপ্রস্তর তিনিই স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টায়। সেনানিবাসের আমূল সংস্কার ক'রে নূতন ভাবে ব্যারাক্ তৈরী করতে তিনি কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিলেন।

নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে রাজা তাঁকে "Order of Merit"-এর পুরস্কারে অলঙ্কৃত করেছিলেন। এ পুরস্কার অত্যন্ত মূল্যবান। এ সম্মানলাভ কচিৎ কাহারও ভাগ্যে হয়। কিন্তু সবথেকে মূল্যবান যা তিনি লাভ করেছিলেন, তা হচ্ছে তাদের তাঁর স্মৃতির প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এই শ্রদ্ধা ভালবাসা তাদের প্রেরণা দিচ্ছে আর্ত ও পীড়িতের অন্ধকার রাত্রে মুক্তহস্ত স্নেহমমতা নিয়ে সেবাব্রত গ্রহণ করতে।

তাঁর আদর্শ, তাঁর সমগ্র সাধনা তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর লেখা 'Notes on Hospital' নামক পুস্তকে।

তাঁর আত্মা সঞ্চারিত হয়ে আছে প্রতিটি সুযোগ্যা সেবিকার অন্তরে, আর সুরম্য হাসপাতালের প্রতিটি গৃহে।

যে আদর্শের বীজ তিনি অঙ্কুরিত করে গিয়েছেন তাই আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

আজ বিশ্বের সভ্যজগতের নরনারী, বিশেষ করে সমগ্র নারীজাতি এই প্রদীপধারিণী মহীয়সী মহিলার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, ভবিষ্যতেও জানাবে—

" A lady with a lamp shall stand
In the great history of the land
A noble type of good
Heroic womanhood."

অশোক-লিপিতে নারী

শ্রীকালীপদ হোড়

পণ্ডিতগণের মতে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে এ'দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন অশোক (খৃঃ পূঃ ২৭৩-২৩২ অব্দ)। সন্তানতুল্য প্রজাদের নৈতিক উন্নতি সাধন করবার জন্যে তিনি তাঁর অমূল্য উপদেশাবলী খোদাই করে গেছেন প্রস্তর-গাত্রে, স্তম্ভে এবং গুহায়। এ সব লিপি থেকে তৎকালীন দেশের সম্বন্ধে এমন কতকগুলো তথ্য জানতে পারি, যা শুধু ঐতিহাসিকের শুষ্ক গবেষণাকেই তৃপ্তি দেয়না, সাধারণ মানুষের আগ্রহকেও বাড়িয়ে তোলে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই।

ওঁর অনুশাসনগুলো পড়ে একটি বিষয়ে আমরা স্থির-নিশ্চয় হ'তে পারি, বহু বিবাহ সম্বন্ধে। সাধারণ লোকের কথা কিছু না থাকলেও ওঁর নিজের স্ত্রী-সংখ্যার প্রতি ইংগিত রয়েছে অনেক জায়গায়। ৫ম শিলানুশাসনে (Rock edict v) ও ৭ম স্তম্ভানুশাসনে (Pillar edict vii) তিনি বলেছেন, তাঁর অবরোধন (Harem) নাকি ছড়িয়েছিল রাজধানী পাটলীপুত্র ও অন্যান্য প্রাদেশিক সহর-গুলিতে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (অশোকের পিতামহ) আমলে এদেশে ভ্রমণরত মেগাস্থিনিসও বহুবিবাহের কথা স্পষ্ট করেই বলে গেছেন। নাটকে, কাব্যে কালিদাসও বলে গেছেন বহুবিবাহের কথা। এ'ছাড়া সিংহলীয় গ্রন্থানুসারে অশোকের পিতা বিন্দুসারের পুত্রসংখ্যা নাকি প্রায় একশোটি! অশোকও তাঁর ভাইবোনদের কথা বলে গেছেন। এদেরও বাসস্থানগুলো ছড়িয়েছিল রাজধানী ও অন্যান্য প্রাদেশিক সহরগুলোতে। অশোক-ব্যবহৃত 'দেবীকুমার' বোধহয় তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদেরই বোঝাচ্ছে। অশোকের দ্বিতীয়া স্ত্রী, তীবর মাতা কারুবাকীর উল্লেখ পাই তথাকথিত "সপ্তস্তম্ভের অনুশাসনে।" এখন এই "দ্বিতীয়া" কথাটিই "প্রথমা"র কথা মনে করিয়ে দেয়। বিদিশা নগরীতে "দেবী" বলে যে তাঁর আর এক স্ত্রী বাস করতেন এ' কথা পালি গ্রন্থ থেকে জানা যায়। অশোক সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে 'পুত্র', 'প্রপৌত্র' ইত্যাদি কথাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু "দারক" কথাটি ব্যবহার করেছেন, মাত্র একবার। কারো কারো মতে "উপপত্নী পুত্র" বোঝাতেই অশোক ব্যবহার করেছেন কথাটা। সে যাই হোক তাঁর আগে, পরে এবং নিজের সময়ে বহুবিবাহই যে চলতি ছিল তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অশোকের 'ওলোধন' বা 'অবরোধনে'র সংগে বোধহয় কিছু মিল আছে কালিদাসের 'অবরোধ-গৃহে'র (৫ম ও ৬ষ্ঠ অংক ; অভিজ্ঞান শকুন্তলম্)। 'অবরোধন' কথাটাই যেন স্ত্রী-পরাধীনতার মূর্ত প্রতীক। কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই ধরণের কথাই বলে গেছেন। রাণীদের কড়া পাহারায়-রাখবার কথা আছে ওতে।

তবে রাণীদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখতে চাননি অশোক। ওঁর অন্তঃপুরগুলিতে উপদেশামৃত বর্ষণ করতে 'ধর্ম মহামাত্র'দের বারে বারে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি। রাণীদের দানশীলা করে তোলবার ভারও ছিল ওঁদের ওপর।

ধর্মমহামাত্রদের মতই ছিলেন স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও 'ধর্ম' প্রচারের জন্যে নিয়োগ করা হ'ত এঁদের। মনে হয়, বিহার-বাসিনী ভিক্ষুণীদের দেখাশোনা করার ভার ছিল এঁদের ওপর। কারো কারো মতে স্ত্রীলোকদের প্রতি রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্তব্যের ভার নিতেন এঁরা। নারী-কর্মীও ছিল অশোকের সময়। সন্তানপালিকা চতুর্থ ধাত্রীর কথা তো তিনিই উল্লেখ করে গেছেন ৪র্থ স্তম্ভানুশাসনে (Pillar edict iv)। এ ছাড়া 'সমাজ' বলে একরকম উৎসব করতেন তিনি।

নৃত্যাদি হ'ত ওতে। হয়ত অন্যত্র মেয়ের পেশাই ছিল ওই।

স্ত্রী-জাতির ওপর অশোকের শ্রদ্ধাও ছিল অসাধারণ। অসংখ্যবার তিনি বলেছেন: "সাধু মাতরি চ পিতরি চ শুক্রসা অর্থাৎ মাতাপিতার প্রতি সুশ্রূষা সাধু।" (ডক্টর অমূল্য সেন)।

মাতাকে তিনি বাদ দেননি এবং প্রত্যেকবার মাতাকে স্থান দিয়েছেন পিতার আগে।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুণীদের কথাও অনেক বলে গেছেন অশোক। ভিক্ষুদের সঙ্গে একত্রে বাস করেন না এঁরা। শাস্ত্র আলোচনায় এঁদের দিন কাটে। তবে বোধহয় মাঝে মাঝে এরা ভিক্ষুদের মতই কর্তব্য ভুলে গিয়ে দলাদলিতে যোগ দিতেন। দলাদলির জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন অশোক। কৌটিল্য তবু মেয়েদের জন্যে শাস্তিভার কিঞ্চিৎ লঘু করবার নির্দেশ দিয়েছেন—কিন্তু এ ক্ষেত্রে অশোক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাঁর চোখে নারী পুরুষ সব সমান।

নবম শিলানুশাসনে (Rock edict ix) তিনি বলেছেন, মেয়েরা ছেলে হ'লে নানারকম উৎসব ক'রে থাকে। মেয়ে হ'লে করে কিনা তার উল্লেখ নেই। এ থেকেই কি মনে হয়না—এখনকার মত তখনকার সমাজেও মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই আদর ছিল বেশী?

আজকালকার মত তখনও মেয়েরা বারো মাসে তেরো পার্বন করত। অশোক কিন্তু এদের কোন প্রয়োজন দেখতে পাননি। তাঁরই কথায়—'এত তু মহিড়াএ বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং কধোতে।'

অর্থাৎ 'ইহাতে মহিলারা বহু বহুবিধ ক্ষুদ্র নিরর্থ মংগল করে।' (অশোকলিপি—ডক্টর অমূল্য সেন)।

এগুলো সত্যসত্যই নিরর্থ কিনা সে বিচার করবার ভার আমাদের নয়। তবে লক্ষণীয় এই, প্রায় বাইশ শ' বছর পরেও ভারতীয় মেয়েদের শিরায় শিরায় সেই সনাতন রক্তস্রোতই বয়ে চলেছে। পাশ্চাত্যের উগ্র প্রসাধন দ্রব্য এখনও আমাদের মেয়েদের ললাট থেকে চন্দনের শুভ্র ফোঁটাটি একেবারে মুছে দিতে পারেনি।

"উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, নারীজাতির উন্নতির উপরে আমাদের জাতির মহত্ত্ব নির্ভর করিতেছে। বালিকা ও নারীরা সুশিক্ষা লাভ না করিলে দেশের কল্যাণ কখনই ফিরিয়া আসিবে না। যে সমস্ত বালিকারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে ভবিষ্যতে ইহারাই একদিন আমাদের দেশের সন্তানদিগের জননী হইবে। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের হিন্দুসমাজ ও জাতির প্রাণ ও গৌরবস্বরূপ। বালিকারা যাহাতে যথার্থভাবে সুশিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের জীবনের আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।"

—স্বামী অভেদানন্দ

বিজ্ঞানীর হাতে জলবৃষ্টি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর বি. এস্-সি.

মানবসভ্যতার আদি হইতে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি এক বিশাল সমস্যা। মেঘ ও বৃষ্টি সমাজ-কল্যাণের মূলে। তাই মেঘের সহিত রাজার তুলনা রহিয়াছে প্রাচীন সাহিত্যে—পর্জন্যইবভূতানাম আধারো পৃথিবীপতে। প্রকৃতির খেয়ালে মেঘের স্বল্পতাহেতু অনাবৃষ্টি ও আধিক্যে অতিবৃষ্টি। দুইই সমভাবে কৃষিকর্মের ক্ষতিকারক। যাহাতে সময়মত বারিপাত হয় সেজন্য শুরুতি থেকে যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা পুরাকালে প্রচলিত দেখা যায়। যজ্ঞাদ্ভবতি-পর্জন্যো যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভব—যজ্ঞ হইতে মেঘ ও বৃষ্টির উৎপত্তি—এ প্রবচন অতি প্রাচীন। জলের দেবতা বরুণদেব, প্রজাগণের বিশেষ পূজ্য। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে ধরাতল শস্য-শ্যামলা, অন্নধার উর্বর মরুভূমি। রাগরাগিনীদ্বারা দেবতাকে প্রীত করিয়া সময়োচিত জলসিঞ্চনের প্রত্যাশা করেন মানবকুল। মেঘদূতে মেঘ সচেতনরূপে প্রতিভাত। আবার মেঘের কমনীয় রূপ শ্রীকৃষ্ণে সৌম্যকান্তির দ্যোতক। 'বর্হাবিবৃংহিতকরাম্বনীরদাভাং'—যাঁহার হস্ত বাঁশী শোভিত, যিনি নবনীরদকান্তি। নীলমেঘললিতাঙ্গ-বিভবং'—নীলমেঘের ন্যায় যাঁর শরীরের মনোহর-কান্তি। মেঘের সহিত চাতকের ঘনিষ্ঠতা গুরু নানকের রচিত বিশ্বপতির বন্দনায় আছে। পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে তন্ময় হইয়া আরতি দেখিতে রত। দাঁড়াইতে হইবে সে খেয়াল তাঁর নাই; এদিকে পাণ্ডারা তাঁকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইল। সেই সময়ে বিশ্বপতির উদ্দেশে তাঁহার এই আরাধনা-গীতি—

"চাতক সমান নানক আজি
চাহে তোমার কৃপার বারি,
তোমার নামের গানের জোরেই,
চায় সে দিতে খেয়ার পাড়ি।"

যে মহেঞ্জোদারোর সুপ্রাচীন সভ্যতা বর্তমান যুগেও সকলকে চমকিত করে, তাহার উত্থান-পতনের মূলেও এই জলবায়ু, বারিপাত। ভূগর্ভ হইতে তথায় যে সব নিদর্শন মিলিয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে সিন্ধু-উপত্যকা সেকালে এরূপ রুক্ষ মরুময় প্রান্তর ছিল না। সম্পূর্ণ অনুকূল আবহাওয়া থাকায় উহা উন্নত ও সুসভ্য ভূখণ্ড হইতে পারিয়াছিল এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কালক্রমে বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং ক্রমশঃ ঐ অঞ্চল জনবিরল উষর প্রদেশে রূপান্তরিত হইয়াছে। অতএব মানবের লক্ষ্য চিরকালই যাহাতে সময়মত পর্যাপ্ত বারিপাত হয়—কমও নয়, বেশীও নয়। স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা সাপেক্ষ উপায় অবলম্বন করিয়াছে মানবজাতি যুগে যুগে এ উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে। তারই আভাস পাই বৈদিক মন্ত্রে, যজ্ঞিয়াদির উৎকীর্ণ মূর্তি-চিত্রাদিতে, যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপে আর ধ্বন্যাত্মক উপাসনায়—রাগরাগিণীতে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান বিষয়ে সে বিশেষ অগ্রসর, তাই সেই পথে এই চিরন্তন সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা চলিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে বারিপাতন এখন বহু বিজ্ঞানীর আগ্রহ গবেষণার বিষয়। দেশে দেশে নানা ভাবে পরীক্ষণ চলিতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাদিতে ফলাফল প্রচারিত হইতেছে। আমাদের দেশও এক্ষেত্রে অনগ্রসর নহে।

বিজ্ঞানের বলে বিনামেঘে বৃষ্টি করান যাইতে পারে কি? এই প্রশ্ন প্রথমেই মনে উদয় হয়। আকাশে যদি পর্যাপ্ত মেঘ থাকে তবে না হয় বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রীতে মেঘটা বিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বে কোন অঞ্চলের উপর বারিপাতন সম্ভব হইতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা বোঝা যায়। কেন না—

'বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং মুলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ।'

(বায়ু মেঘাবলী, তৃণমূল ও ধূলিনিচয়কে কিয়ৎকালের জন্য সংযুক্ত করিয়া আবার বিযুক্ত করে।) আর যদি

ত্রিসীমানায় মেঘ দেখা না যায় সে অবস্থায় কি বিজ্ঞানী মেঘের ব্যবস্থা করিয়া বৃষ্টি ঘটাইতে পারেন ? —ইহাই দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য। পরীক্ষা অনুসারে দেখা গিয়াছে যে ইহাও সম্ভব।

প্রকৃতির রাজ্যে তাপ ও চাপের তারতম্য হেতু জলভাগ হইতে প্রতিনিয়ত জল বাষ্পাকারে পরিবর্তিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ক্ষুদ্র জলকণিকা সকলসময়েই বাতাসে ভেসে বেড়ায়। অতিরুক্ষ গ্রীষ্মেও আকাশ এতই শূন্য নহে। অনুকূল অবস্থায় সেই অদৃশ্য কণিকা ঘনীভূত মেঘে রূপান্তরিত হয় বলিয়া তখন পরিদৃশ্যমান। তখনই আমরা তাদের সত্তা দেখিতে পাই। বলিতে গেলে মেঘ সর্বদাই রহিয়াছে, সূক্ষ্ম আর নয় ত স্থূল দেহে। জলীয় বাষ্পই তার প্রকৃতি আর তা থেকে পরম্পরাগতভাবে উদ্ভূত মেঘবৃষ্টি ইহার বিকৃতি, বিকার বা রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতির নিয়মে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সূক্ষ্মরূপ থেকে মেঘ স্থূলাকারে আসিতেছে। বিজ্ঞানসেবী কৃত্রিম কৌশলে, সহজে, অল্প সময়ে এবং প্রয়োজনমত এই রূপান্তর ঘটাইতে চাহিতেছেন। আনুসঙ্গিক জটিলতা বাদ দিলে ইহাই মানুষের হাতের জলবৃষ্টির ইতিকথা। এক্ষণে তাহার চেষ্টা :

(১) বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া নিজ প্রয়োজনমত সময়ে বৃষ্টি উৎপাদন করা। ইহা করিতে পারিলে প্রকৃতির খেয়ালের অপেক্ষায় বা অনিশ্চয়তায় আকাশপানে চাহিয়া থাকিতে হইবে না ;

(২) অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে জলকণা যদি বাতাসে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সুযোগে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগে যাহাতে মেঘ-সঞ্চার ত্বরান্বিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা। এ পন্থা প্রকৃতির নিয়মের পরিপূরক ও সহজসাধ্য ;

(৩) কোন অঞ্চলে স্বতঃ মেঘ দেখা গেলে বর্ষণের আগে যাহাতে উহা অন্যত্র সরিয়া না যায় তাহার উপায় করা।

পাটনায় এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষণ হইয়াছে। সাতটি বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস, চূর্ণ লবণ আর সোডিয়াম নামক দাহ্য পদার্থ দিয়ে আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাতাস লাগিলে সোডিয়াম আপনা থেকেই জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে গ্যাস বিস্ফোরণ, সঙ্গে সঙ্গে লবণকণা চারিধারে ছড়াইয়া পড়িল। এই গুলিকে কেন্দ্র করিয়া মেঘ পুঞ্জিভূত হইতে দেখা যায়। আর এর ফলে অর্ধঘণ্টার মধ্যে পাটনার উপর প্রবল বারিপাত। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত দফায় দফায় মুষল বর্ষণ হইতে থাকে। ইহা একটি নূতন প্রণালী বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে। মেঘ-মধ্যে লবণচূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া বৃষ্টিপাত সম্ভব হইয়াছে আরও একদেশে। বর্তমান বৎসরে মে মাসের ছয় তারিখে দার-এস-সালেম হইতে রয়টার প্রচারিত এক সংবাদে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। আফ্রিকা মহাদেশের টঙ্গানাইকার টাবোরায় এই পরীক্ষণ কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বারিপাতের স্বল্পতাপ্রযুক্ত এ অঞ্চলে অতিশয় জলকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলে জলসরবরাহের দুটির ধরা-জল নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন বিজ্ঞানসেবী তৎপর হইলেন এবং এই উপায়ে যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বারিবর্ষণের জন্য অনেক বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করিয়া দেখা হইতেছে। আকাশযান হইতে বিস্তৃত অঞ্চলের উপর সিলভার আইওডাইড নামক রসায়নিক পদার্থ সূক্ষ্মকণিকা আকারে ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—এক পরীক্ষণে। কিছু পরেই বায়ুমণ্ডলের জলকণা চারিদিক থেকে ঐ অঞ্চলের উপরিভাগে জমা হইতে লাগিল আর ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া পড়িল—অচিরাৎ ভীষণ বেগে জলবৃষ্টি সুরু হইল। আমূল কৃত্রিম বারিপাত না হইলেও বিজ্ঞানের কৃতিত্ব স্বীকার্য বটে। এ কাজে অসুবিধাও আছে—ইহা বলিতে গেলে একরূপ অপচয়ও বটে। প্রকৃতির বিধানে রহে-বসে যাহা মানবকল্যাণের বরাদ্দ হইয়া আছে, লোকে বলপূর্বক আপনার ইচ্ছামত তাহা নিঃশেষিত করিতে উদ্যত। আশপাশের জলকণা টানিয়া আনার ফলে সে সব অঞ্চল অভাবে পড়িবে ইহা সুনিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথ

এইরূপ রাক্ষুসে অপচয়ের কথাই বলিয়াছিলেন—ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মানব দানবের মত অজস্র সম্পদ নিঃশেষ করিতে উদ্যত। তবে বিজ্ঞানী কৃত্রিম বারিপাতের সমাধান করিবার সময়ে আনুসঙ্গিক এই অপচয়-বিষয়েও সচেতন, ইহাই আশার কথা।

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোন কোন ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থায় ইহা সম্ভব হইবে। সিড্‌নে সহরে এক সভায় ডাঃ আই, সি, বস, (কমনওয়েলথ্ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান) ঘোষণা করিয়াছেন যে এখানে যাহা সাধিত হইয়াছে অন্য কোথাও এতদূর অগ্রগতি দেখা যায় নাই। তাঁহাদের সাফল্যের মূলে রহিয়াছে গোড়ার কথায় অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া। তাঁহারা মেঘের গঠন, প্রকারভেদ, মেঘের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য, কোন্‌গুলিই বা বৃষ্টির জনক, ইত্যাকার মূল বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহারা নূতন আলোক পাইয়াছেন—অন্য কুত্রাপি এ বিষয়গুলিতে এত মন দেওয়া হয় নাই। এক শ্রেণীর মেঘ বৃষ্টির অনুকূল নয়, এতদিনের এই ধারণা ভুল বলিয়া তাঁহারা ধরিতে পারিয়াছেন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ দ্বারা। এই সব সন্ধানের ভিত্তিতে তাঁহারা অগ্রসরও হইয়াছেন কিছু বেশী। মিতব্যয়িতার সহিত অধিক বারিসঞ্জনের চেষ্টায় তাঁহারা নব নব পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। চরম ফলাফল না পাওয়া গেলেও নির্দ্দিষ্ট এলাকায় অধিকতর জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; তবে এখনও অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্ষার আগমন ত্বরান্বিত করাও আমাদের করায়ত্ত হইবে—একাধিক বর্ষার বন্দোবস্তও আকাশকুসুম নয় একথা ইহারা বলেন।

বিগত বর্ষে জেনেভায় নিখিল-বিশ্ব-আবহাওয়া-মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। ভারতীয় প্রতিনিধিদের পৌরহিত্য করেন শ্রী এস, বসু। এদেশের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসকলের তিনিই উচ্চতম কর্মচারী। জেনেভা অধিবেশনের পর ৩০মে, ১৯৫৫ সালে তিনি বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসেন। অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শ্রীবসু সাংবাদিকদের কাছে বলিয়াছেন যে লণ্ডন সহরে কমনওয়েলথ্ প্রতিনিধিদের একটি সভা হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় অনেক কথা সে সভায় উঠে, কৃত্রিম বারিপাত তাহাদের অন্যতম। এ যাবৎ যাহা যাহা সাধিত হইয়াছে সব আলোচিত হয়। প্রতিনিধিগণ সবদিক বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশ করেন এ সমস্যার শেষ ছেদ এখনও দেওয়া সম্ভব হয়নি বিজ্ঞানীর। সত্য বটে, সিল্‌ভার আইওডাইড বা জল-সিঞ্চন দ্বারা মেঘ উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে, ফলাফল কিন্তু সর্বতোভাবে আশানুরূপ নয়। এযাবৎ চেষ্টায় কিছুটা অগ্রগতি হইলেও বারিপাতন নিশ্চিতরূপে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান-সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই। বিজ্ঞানী নব নব ভাবে চিন্তা আর চেষ্টা করিয়াছেন যাতে অদূর ভবিষ্যতে নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার বৈজ্ঞানিক ডঃ বিগ আবার নূতন কথা জানিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় তিন মাস গবেষণা করিয়া তিনি এ মত পোষণ করেন যে উল্কাপাতের সঙ্গে মেঘ-বৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহা পূর্বে কেহ বলেন নাই। কৃত্রিম বারিপাতনে একথা মনে রাখিলে উপকার হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে। উল্কাপাতের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে এক রকম ধূলিময় পদার্থ দেখা যায় তাদের মধ্যস্থতায় আকাশের সূক্ষ্ম জলকণা মেঘে পরিণত হয়। যদি বিজ্ঞানী অনুরূপ ধূলিকণার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন তাহ'লে তাঁহার হাতেই জলবৃষ্টির ভাগ্য আসিয়া পড়িবে। অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত কার্নাভানে ডাঃ বিগ এইসব পর্যবেক্ষণ চালাইয়াছেন।

আণবিক বোমা বিস্ফোরণ এ ক্ষেত্রে আবার একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এ সব বিস্ফোরণ-পরীক্ষণে বায়ুমণ্ডলে অনেক অঘটন ঘটিতেছে—যাহা পূর্বে কেহ ধারণাই করিতে পারিতেন না। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে এইসব কারণে মেঘের উত্থান পতনের স্বাভাবিক আনুকূল্যের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে এবং বর্তমানে প্রায় অর্ধেক দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ পূর্বে মেঘ সমুদ্রে জন্মিয়া,

বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে নানাভাবে, নানা ঋতুতে প্রবহমান বাতাসের গতিতে সঞ্চারিত হইয়া, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দেশে গিয়া উপস্থিত হইত আর ঠিক সময়ে বর্ষা বৃষ্টির আবির্ভাব হইত সেই সেই অঞ্চলে। এখন কিন্তু আর সম্ভব হইতেছে না—সমুদ্রতটের কিছু ভিতরে যাইতে না যাইতেই মেঘগুলি ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে এই আণবিক-পরীক্ষণ-ক্লিষ্ট বায়ুমণ্ডল, আর সেইখানেই বর্ষণ হইতেছে। ভিতরের দেশভাগ জলশূন্য হইবে এইভাবে। প্রকৃতির বারি-বণ্টন ব্যবস্থা এইবার ব্যাহত হইবে ইহা কোন কোন বৈজ্ঞানিক আশঙ্কা করিতেছেন। অতএব বিজ্ঞান—একাধারে প্রকৃতি-রাজ্যের সুশৃঙ্খল কার্যে অসুবিধার সৃষ্টিও করিতেছে আবার কৃত্রিম উপায়ে বারি-পাতনের কার্যে মন দিয়া পরিপূরক পন্থার অনুসরণও করিতেছে।

এ্যাটম্

শ্রীঅমূল্যমোহন বিশ্বাস (এম, এস্‌সি)

ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পদার্থ মলিকিউল্ দিয়ে তৈরী। অথচ পদার্থের অন্ত নাই কেন? কেন পদার্থের এত বিভিন্ন রূপ? এক টুক্‌রো কাগজ এক খণ্ড পাথর হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ কাগজও মলিকিউল দিয়ে তৈরী, পাথরও তৈরী মলিকিউল দিয়ে। একটি চকলেট একখণ্ড কাঠের মত আদৌও নয়। রবারের বল নিয়ে বেশ খেলা যায়; মোটেই ভাঙবে না। কিন্তু কাঁচের মার্বেল যাবে ভেঙে। যদি সব পদার্থই মলিকিউল দিয়ে তৈরী তবে তাদের মধ্যে এরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ কেন? কেন গ্যাস অতি খল্প, ইস্পাত ভীষণ শক্ত, মাখন অত্যন্ত নরম। কারণ, কোন পদার্থ যে ধরণের মলিকিউল দিয়ে তৈরী, অন্য একটি পদার্থ তৈরী তা হ'তে অন্য ধরণের মলিকিউল দিয়ে। কাগজ যে মলিকিউল দিয়ে তৈরী, পাথর তৈরী তা হ'তে ভিন্ন মলিকিউল দিয়ে। কাগজের মলিকিউলের আকৃতি-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহার পাথরের মলিকিউলের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই কাগজে পাথরে এত পার্থক্য। কোন জিনিষ টান্‌লে রবারের মত বাড়বে, না টুক্‌লে গ্লাসের মত ভেঙে যাবে, কোন পদার্থ মাখনের মত নরম হবে, না ইস্পাতের মত হবে শক্ত, তা নির্ভর করে সেই পদার্থের অন্তর্নিহিত মলিকিউলদের পরস্পর সন্নিবেশ ও সজ্জার ধারার উপর।

মলিকিউল স্বয়ং আবার তৈরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টিতে। এই কণিকাদের বলে এ্যাটম্ বা পরমাণু। প্রাকৃতিক পরমাণু মোট ৯২ পর্য্যায়ের। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম্, ...ইউরেনিয়াম্। এ্যাটম্‌দের মধ্যে হাইড্রোজেন ক্ষুদ্রতম, ইউরেনিয়াম্ বৃহত্তম। হাইড্রোজেনের ওজন ১·৬৭ × ১০-২৪ গ্রাম; হাইড্রোজেন অপেক্ষা ইউরেনিয়াম্ ২৩৮ গুণ ভারী। ওজন তার ৩৯৫ × ১০-২২ গ্রাম। মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে আরও কয়েকটি এ্যাটম্ তৈরী করেছে। নেপচুনিয়াম্, প্লুটোনিয়াম্, আমেরিসিয়াম্, কুরিয়াম্। তাহলে, এ্যাটম্ দিয়েই মলিকিউল তৈরী। মলিকিউল দিয়ে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোম্—সবেরই সৃষ্টি।

আণবিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের সাহায্যে খুব ছোট হয়ে কেও জলের একটি মলিকিউলের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখবে যে, জলের প্রতিটি মলিকিউল তৈরী হয়েছে দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন এ্যাটম্ সমন্বয়ে। এরূপ মাখনের প্রতি মলিকিউলের জন্ম ১২০টি এ্যাটমের সম্মিলনে। এই এ্যাটমদের মধ্যে, ৪০টি কার্বন, ৭৪টি হাইড্রোজেন ও ৪টি অক্সিজেন। চিনির প্রতি মলিকিউল সংগঠিত ১২টি কার্বন, ২২টি হাইড্রোজেন ও ১১টি অক্সিজেন—মোট ৪৫টি এ্যাটম্ সমাবেশে। ডিমের শ্বেতাংশের প্রতিটি মলিকিউলে আছে ৭২টি কার্বন, ১১২টি হাইড্রোজেন, ১৮টি নাইট্রোজেন, ২২টি অক্সিজেন ও ১১টি সাল্‌ফার

এটম্। জল মলিকিউলের ২টি হাইড্রোজেন, মাখনের মলিকিউলের ৭৪টি হাইড্রোজেন, চিনির মলিকিউলের ২২টি হাইড্রোজেন, ডিমের শ্বেতাংশের মলিকিউলের ১১২টি হাইড্রোজেন একই গুণাবলম্বী সেই হাইড্রোজেন এটম্। প্রকৃতিতে মিলিয়ন্, মিলিয়ন্ প্রকারের মলিকিউল আছে, কিন্তু এটম্ আছে মাত্র ৯২ প্রকারের।

আমরা প্রত্যেক এটম্‌কে এক একটি অঙ্ক বলে ভাবতে পারি, আর এক একটি মলিকিউলকে বল্‌তে পারি কয়েকটি অঙ্ক দ্বারা সংগঠিত একটি সংখ্যা। অঙ্কশাস্ত্রের সকল সংখ্যাই ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ৮, ৯—এই দশটি অঙ্কের কয়েকটির বিভিন্ন সন্নিবেশে গঠিত। ৩৫২ একটি সংখ্যা। সংখ্যাটি ৩, ৫, ২ অঙ্কত্রয়ের ঐ ক্রমে সংযোগে সৃষ্ট। '৩' এর স্থান অন্য একটি অঙ্ক যেমন '৪' দ্বারা পূরণ করলে পাওয়া যাবে একটি নূতন সংখ্যা। সংখ্যাটি ৪৫২। ৩১২ হ'তে ৪৫২ সম্পূর্ণ পৃথক। এরূপ '০' হ'তে '৯' পর্য্যন্ত দশটি অঙ্কের কয়েকটিকে বিভিন্ন ক্রমে সাজালে পাওয়া যাবে বিভিন্ন সংখ্যা। সংখ্যাগুলি সকল সময়েই হ'বে পৃথক—তা যে কোন অঙ্কই ব্যবহার করা যাক্। কিন্তু প্রত্যেক অঙ্কের মূল্য, তা যে কোন সংখ্যাতেই ব্যবহার করা যাক্, থাকবে সর্ব্বদা অটুট। '২' সর্ব্বদা '২'-ই থাকবে। ৩৫২-র 'দুই' ও ৪৫২-র 'দুই' একই দুই। যেমন মাত্র দশ রকম অঙ্কের সাহায্যে বিভিন্ন সংখ্যা তৈরী হয়েছে, সেরূপ ৯২ প্রকার এটমের মাধ্যমে রূপ পেয়েছে বিভিন্ন পদার্থ।

অনেক সময় পদার্থের স্বরূপ নির্ভর করে তার মলিকিউলের অন্তর্গত এটমদের সাজসজ্জার চংয়ের উপর। এক টুকরো কয়লা যে মলিকিউল দিয়ে তৈরী, একটি হীরকও তৈরী সেই মলিকিউল দিয়ে; অথচ কয়লা ও হীরকে স্বর্গ-মর্ত্ত প্রভেদ। কারণ, কয়লার মলিকিউলে এটমগুলি যে ভঙ্গিমাতে সাজান, হীরকে তা অন্য ভাবে। তাই কয়লা কয়লাই, হীরক হীরকই। যেমন, ৩, ৫, ২ অঙ্কত্রয়কে বিভিন্ন ক্রমে সাজালে পাওয়া যায় ৩২৫, ২৫৩ ইত্যাদি সংখ্যা। এই সংখ্যাগুলি পরস্পর একেবারে পৃথক, যদিও তারা প্রত্যেকে মূলত ৩, ২, ৫ অঙ্কের সংযোগে গঠিত।

৯২ প্রকার এটমের বিবিধ সম্মিলনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম বলে এই ৯২ প্রকার এটমদের বলে মূল বা মৌলিক পদার্থ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদার্থের প্রতি মলিকিউল বিভিন্ন প্রকার এটম্ দ্বারা তৈরী। ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থের মধ্যে মাত্র ৯২টি পদার্থ আছে যাদের মলিকিউল বিভিন্ন প্রকার এটম্ সমন্বয়ে গঠিত নয়। এদের প্রতি মলিকিউল একই প্রকৃতির এক বা একাধিক এটম্ দ্বারা নির্মিত। তাই, এই ৯২টি পদার্থ মৌলিক। বাকী সমস্তই যৌগিক। যৌগিকদের প্রতি মলিকিউল তৈরী দুই বা ততোধিক ভিন্ন প্রকৃতির এটম্ দ্বারা। লোহা একটি মৌলিক পদার্থ। লোহার প্রতি মলিকিউল কেবল একটি লোহা-এটম্ দ্বারা তৈরী। তামা, সীসা, স্বর্ণ প্রভৃতিও মৌলিক পদার্থ। তামার মলিকিউল তৈরী একটি তামা-এটম্ দিয়ে। এক্ষেত্রে একটি এটমই একটি মলিকিউল। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদিও মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের প্রতিটি মলিকিউল একই প্রকৃতির দুটি এটম্ দিয়ে তৈরী। এটম্ দুটি হাইড্রোজেন। কিন্তু জল যৌগিক পদার্থ। জলের প্রতিটি মলিকিউল তৈরী দুটি বিভিন্ন এটম্ দ্বারা। এই এটমরা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

মলিকিউল ও এটম্ সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব ও চিন্তাধারা মানুষের কেবল অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা। তাদের রূপ কল্পনার তুলিতে আঁকা। কোনদিনই কোন যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের স্থূল চক্ষুর সামনে তাদের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেনি। সাধারণ মাইক্রোস্কোপের ক্ষেত্রে একথা এখনও প্রযোজ্য। তবে ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবনের পর প্রোটিন প্রভৃতির মত বড় বড় মলিকিউলদের সঙ্গে মানুষের চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে। এই প্রোটিন মলিকিউলে সহস্র সহস্র এটমের অবস্থান।

বিংশ শতক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ.

স্বাক্ষর করিবে কিসে !
কী লিখেছো—কী লিখেছে সর্ব্বসাধারণ,
এ শতাব্দীর দীর্ঘ ইতিহাসে
বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পণ্ডিত সজ্জন ?
কোন্ সত্য, কী আদর্শ কোন্ গতি পথ ?
মানুষের পথের চলায় ধ্রুবতারামম
দেখাইছে পথ, পুরাইছে তার মনোরথ ;
অন্তরে জাগিছে কোন্ প্রাণ-প্রিয়তম !
হে দার্শনিক ! লিখেছো দর্শন-তত্ত্ব
আত্মজ্ঞানে কর নাই নিজেরে দর্শন,
সেই জ্ঞানে জ্ঞানী যিনি পূর্ণজ্ঞানময়
কর নাই তাঁর পায়ে আত্মনিবেদন।
প্রবৃত্তি রচিল' তব যত কিছু জ্ঞান
যা জমেছে শতাব্দীর পাতায় পাতায়,
সেই জ্ঞান মানুষেরে করে নাই জ্ঞানী
অগ্রগামী পথের চলায়।
তুমি বৈজ্ঞানিক। দেবতার শক্তি
আজ করেছো প্রকাশ
বিজ্ঞান-বিজয়ী বিশ্বে
এ শতাব্দী বিজ্ঞানের নবীন আবাস।

হে বিজ্ঞানী ! কোথা তব জয়—
যে বিজ্ঞানে মানবতার হলো পরাজয় ?
দেবতার শক্তি আজি করি উদ্ঘাটন,
আনিয়াছো সারা বিশ্বে মহা আলোড়ন
দেবত্ব প্রতিষ্ঠা হায় পারোনি করিতে,
বিজ্ঞান ফুজ্ঞান দিলো মানুষের চিতে।
মরণের মহা অস্ত্ররূপে হে বৈজ্ঞানিক
তব আবিষ্কার,
তোমারেই প্রতিপলে দিতেছে ধিক্কার।
বিশিষ্ট বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী বিশ্বে যিনি
পরম বিজ্ঞানী তিনি পরম কারণ,
"তিনি" হীন যে বিজ্ঞান, যত আবিষ্কার
শিবহীন দক্ষযজ্ঞসম আনে বিশ্বে বিকট মরণ।
হে পণ্ডিত ! তব ঘেটে কী দিয়েছো
শাস্ত্র মর্ম্মবাণী,
যা করিবে রুদ্ধ আজ
হিংসা, দ্বেষ, মৃত্যু, হানাহানি।
টীকাভাষ্যে ভরে গেলো শতাব্দীর পাতা,
রহিলো তেমনি শূন্য মানুষের চরিত্রের খাতা।
একটি অক্ষরও হায় হলোনা লিখিত
অলিখিত কথ্যভাষা পারিলোনা মর্ম্মতল
করিতে চিত্রিত।

নেতৃত্বের অভিমানী তুমি হে নায়ক !
কোথায় চলেছো নিয়ে আজি মানুষেরে,
ভাসায়েছো লক্ষ্যহীন অনির্দ্দিষ্ট পথে রাষ্ট্র তরণীরে।
কোথা পথ নাহি জানো যাবে কোন্ দিক্,
অনন্ত চলার পথে ভ্রান্ত তুমি নিজেই পথিক।
নেতৃত্বে তোমার তাই এলো শুধু বাদ-বিসম্বাদ,
আসিলো না ঈশ্বরের দান অমৃতের জীবন-প্রসাদ।
মতবাদে ভরে গেলো দেশ, মহাস্তরে সুরু হলো
আত্মকলহ শুধু হিংসা দ্বেষ।
ধর্ম্মগুরু, ধর্ম্মহীন রাজ্য রাজনীতি
অন্ধকারাবাসে তার হলো পরিণতি।
মূল মূল তুচ্ছ করি শাখা নিয়ে শুধু
দুঃখ কভু নাহি পারে করিবারে
আত্ম সংরক্ষণ,
এই বিধি পৃথিবীর ইতিহাসে
অনাদি অনন্ত হতে' বিধি-চিরন্তন।
এ বিধিরে তুচ্ছ করে যারা,
সর্ব্বস্ব খাকিতে হয় তাদের সর্ব্বহারা।
এ বিংশ শতক !
মানুষের চোখে চোখে লেগেছে চমক্—
এমন সুদিন আর এই পৃথিবীতে,
আসে নাই কোনদিন এমন ভঙ্গীতে।
দর্শনে বিজ্ঞানে জ্ঞানে গণ আগরণে
সভ্যতার যাত্রাপথে বিচিত্র উত্থানে
আজিকার বিশ্বে নাকি এ শতাব্দী মহান বিস্ময় ;
"আন্তর্জাতিক" খ্যাতি যার, নব অভ্যুদয়।
এ শতাব্দী রবে বিশ্বে অক্ষয় হয়ে
বিশ্বধ্বংসী মহাযুদ্ধ দু'টী
সাথে রবে রক্তাক্ষরী ইতিহাস নিয়ে,
কেহ ভুলিবেনা নাগাসিকি হিরোশিমা,
কেহ করিবেনা ক্ষমা—
নেকড়ের আবরণে মানুষের এই হিংস্র রূপ—
যুগে যুগে মানুষের দুখ করিবে নিষ্কৃপ।
এযুগ রহিয়া আছে ইথ নের শেষটুকু আগে
তৃতীয় সমর কবে মহানন্দে দিবে করতালি,
আণবিক শক্তি দিয়ে পুরাইয়া
দানবীয় মনো অভিলাষে
মানবিক পৃথিবীরে করে দিবে চিরতরে খালি।
কেহ রহিবে না—
মৃত্যু হবে জয়ী, এ শতাব্দীর বক্ষে রবে
চিরন্তনী লেখা
"আত্মপ্রবঞ্চনা"।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব

শ্রীঅসিত নাথ চন্দ্র

অবতার প্রসঙ্গে ভারতীয় স্মৃতি এবং পুরাণকারগণ বলেন যে অবতার পুরুষগণ ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাববান। পার্থিব জীবের ন্যায় কর্মবন্ধন তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারেনা। জন্মাবধি তাঁহার স্বভাবগুণে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—ভোগসুখলাভের চেষ্টা তাঁহার চিত্তে কখনও উদিত হয় না। তাঁহার সম্পূর্ণ কর্মশক্তি এবং চেষ্টা অপরের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয়িত হয়। মায়ার অজ্ঞান-বন্ধনে তিনি কদাপি বদ্ধ হন না এবং তাঁহারা ধর্মসংস্থাপনের জন্যই দেহধারণ করেন।

ভারতের ধর্ম প্রত্যক্ষ ভগবান-সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক যুগ হইতে বিশিষ্ট মনীষিগণ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকলে অনুরক্ত হইয়া তাহার রহস্যোদ্ঘাটনের নিমিত্ত সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচিত্র দর্শন, অনুভূতি এবং শক্তি-প্রকাশ পর্য্যালোচনা করিয়া সাধারণে ঐ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস এবং অনুরাগসম্পন্ন হইয়াছেন। এই সকল ধর্মসংস্থাপক আচার্যগণ ঋষি, মুনি, আপ্ত, অধিকারী বা প্রকৃতি-লীন পুরুষ নামে অভিহিত হইতেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঔপনিষদিক যুগে মানব নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির সাফল্য লাভ করিয়া যখন সমস্ত জগৎকে বিরাট ব্রহ্মপ্রকাশ রূপে বুঝিতে পারিল তখনই সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হইল এবং তাঁহার বিশেষভাবে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাস করিল অর্থাৎ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের নরদেহে আংশিক বা পূর্ণ প্রকাশ রূপে গ্রহণ করিল। ভারতে যুগোপযোগী বিভিন্ন অবতারগণ অবতীর্ণ হইয়া লোক-কল্যাণ এবং ধর্মসংস্থাপন করিয়াছেন। বরাহপুরাণে পূর্ণাবতার প্রসঙ্গে উক্ত আছে—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ।

মহাভারত শান্তিপর্বে দেখা যায়,—

হংসঃ কূর্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাদুর্ভাবাদ্দিজোত্তম।
বরাহো নরসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ।
রামো দাশরথিশ্চৈব সাত্বত কপিরেব চ॥

এই সকল অবতারগণ ভারতের যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া ধর্মের গ্লানি দূরীভূত করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায় অবতারগণ বিভিন্ন শক্তির অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য-পদ্ধতিও বিভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮) উক্ত আছে,

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

ইহারা (অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবতারবৃন্দ) পরম পুরুষের কেহ অংশ, কেহ কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুরোপদ্রুত ব্যক্তিগণের সুখ-সম্পাদন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীকৃষ্ণকে মাত্র অবতার বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই পরন্তু তিনি যে স্বয়ং ভগবান, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। বস্তুতঃ অবতারবাদ সনাতন ধর্মেরই একটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের লোকে এই অবতারবাদ বিশ্বাস না করিলেও সনাতন হিন্দু-ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে যুগধর্মের প্রয়োজনানুসারে ভারতের ভাগ্যাকাশে এক একটি মহাশক্তিশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া ধর্ম এবং ধার্মিকব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন। ইহারাই ঈশ্বরের অবতার; কারণ ইহাদের মধ্যে ঐশ্বরিক মঙ্গলময়ী শক্তির অধিক বিকাশ। ইহাদের আবির্ভাবে কি সামাজিক কি রাষ্ট্রনৈতিক কি ধর্মক্ষেত্রে একটি জাগরণের সাড়া পড়ে এবং ইহাদের কলুষনাশী শক্তিপ্রভাবে সমগ্র পঙ্কিলতা নির্মল হইয়া যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

হে অর্জুন! যখন অধর্মের উত্থান নিমিত্ত ধর্মের গ্লানি হয় তখন সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত দুরাত্মাগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

এখানে 'আমি' অর্থে ঈশ্বরাবতার অথবা ঈশ্বরের প্রতীক। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"সনাতন সার্বজনীন ধর্ম যখন কালপ্রভাবে গ্লানিযুক্ত হয়, যখন মায়াপ্রসূত অজ্ঞানের অনির্বচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পার্থিব ভোগসুখলাভকেই সর্বস্ব জ্ঞানপূর্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, এবং আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় নিত্য পদার্থ সকলকে কোন এক ভ্রমাত্মযুগের স্বপ্নরাজ্যের কবি-কল্পনা বলিয়া ধারণা করিয়া বসে—যখন ছলে বলে কৌশলে পার্থিব সর্বপ্রকার সম্পদ্ ও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিয়াও সে প্রাণের অভাব দূর করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধ তমসাবৃত অকূল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে থাকে—তখনই শ্রীভগবান্ স্বকীয় মহিমায় সনাতন ধর্মকে রাহুগ্রাস-মুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন এবং দুর্বল মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান্ হইয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্বক তাহাকে পুনরায় ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ না থাকিলে কার্যের উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর নহে—তদ্রূপ সার্বজনীন অভাব দূরীকরণরূপ প্রয়োজন না থাকিলে ঈশ্বরও কখনও লীলাচ্ছলে নরীর পরিগ্রহ করেন না।"

যখনই দেশের এবং জাতির ইতিহাসে যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক আচার ব্যবহার কলুষে পঙ্কিল হইয়া উঠে, দুর্নীতির প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং ধর্মের নামে অধর্মের প্রাবল্য লক্ষিত হয় তখনই অবতার-পুরুষগণ আগমন করেন, নূতন ভাব—নূতন চিন্তা এবং নূতন প্রেরণা যোগাইতে। সেই নবভাবে ভবিষ্যত গড়িয়া উঠে এবং দেশ-কাল অনুযায়ী ধর্ম প্রবর্তিত হয়। ভারতের ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মহামানবগণ আবির্ভূত হইয়া দেশের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যদিও ইহাদের প্রবর্তিত ধর্মে অনেকের পূর্ণ আস্থা না থাকে তথাপি এই সকল মহাপুরুষগণ যে সকল সামাজিক এবং নৈতিক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মাত্র এই কারণে এইসকল মহামানবগণের আবির্ভাবও যে দেশের জনসাধারণের কল্যাণপ্রদ তাহা অতি জড়বাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে।

মহাভারতের আদিপর্বে ক্ষত্রিয়বংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে সর্বলোকপূজিত, জগৎকর্তা অনাদিনিধন নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েন। লোকে যাঁহাকে অব্যক্ত, অবিনাশী ব্রহ্ম, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, প্রভাব, প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্মা, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ধ্রুব, অক্ষর, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, বিধাতা, অজ, মোক্ষস্বরূপ এবং নির্গুণ বলিয়া নির্দেশ করে সেই সর্বভূত-পিতামহ ধর্মসংবর্ধনের নিমিত্ত অন্ধক-বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হয়েন।" শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অবতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সমুদ্রের কথা ধর না। মহাসাগর বিশাল ও প্রায় অপার জলরাশি। কিন্তু বিশেষ কারণে মহাসাগরের বিশেষ বিশেষ অংশে, জল জমে বরফ হয়ে যায়। যখন জল জমে বরফ হয়, তখন তা সহজে নাড়াচাড়া করা এবং বিশেষ বিশেষরূপে ব্যবহার করা যায়। অবতার কতকটা তার মত। যেমন মহাসমুদ্র তেমনি আছেন জড়ের ও চেতনের মধ্যে অনন্ত শক্তি, কিন্তু কোন কোন উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে ঐ অনন্তশক্তির এক একটি অংশ যেন ইতিহাসে মূর্তিমান হন। তাঁকে তোমরা বল মহাপুরুষ, মহামানব। কিন্তু তিনি ঠিক

বলতে গেলে সর্ব্বব্যাপী ঐশীশক্তির স্থানীয় প্রকাশ অর্থাৎ কি না ভগবানের এক অবতার। মহাপুরুষদের মহত্ত্ব সাংঃ ঐশীশক্তির প্রকাশ।" উপরি-উক্ত মহাপুরুষগণের বাক্য-প্রমাণে বোঝা যায় অবতারপুরুষ কার্য্যকারণ ব্যপদেশে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। এখানে ভগবান অর্থে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১।২।১১

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব কহিয়া থাকেন। ঐ তত্ত্ব কোথাও ব্রহ্ম কোথাও পরমাত্মা এবং কোথাও ভগবান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই তত্ত্ব যাঁহার ভিতরে সম্পূর্ণ প্রকাশ তিনি দেহরূপ গণ্ডিদ্বারা আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভগবান-পদবাচ্য এবং যাঁহাদের ভিতর ইহা অংশ, কলা ইত্যাদি ক্রমে প্রকাশ তাঁহারাই অবতার।

যাদবকুলাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলার অনুসরণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এইরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি, এইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তিযোগের মূর্ত্ত প্রকাশ এবং সমবেত সংযোগ কখনও হয় নাই। খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে দ্বারকা আসিবার কালে কুন্তিদেবী এবং যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা, সুভদ্রাকে আশীর্ব্বাদ, দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ, ধৌম্যকে বন্দনা এবং গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা তৎপরে দ্বারকার গুরুজনদিগকে প্রণাম, বন্ধুস্থানীয়গণকে আমন্ত্রণ এবং তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন তাঁহার সামাজিক নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ বলা যায় যে খাণ্ডবদাহনকালীন তাঁহার শৌর্য্যে এবং বীর্য্যে প্রসন্ন হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র বরদানোন্মুখ হইলে তিনি এই বর গ্রহণ করেন—যেন অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার কদাচ প্রণয় বিচ্ছেদ না হয়। তদানীন্তন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার অবিসংবাদী প্রভুত্ব স্বতঃই প্রমাণিত। মহাভারতের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই যাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। প্রতি ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎদর্শিতা এবং রাজনীতি-বিশারদতা প্রমাণিত হয়। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও মানব-কল্যাণের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচার এবং স্বীয় জীবনে তাহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত উপদেশাবলী এতাবৎ জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হয়। তাঁহার ভক্তিশিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ব্রজ-গোপীবৃন্দ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিতেন এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমরূপে দর্শন করিতেন। ব্রজগোপীগণের ভক্তির সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার মুখে বলাইয়াছেন,—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িত শ্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১০।৪৬।২

মথুরা নগরে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমাতেই গোপীদিগের মন, আমিই তাহাদের প্রাণ, এবং আমার নিমিত্তই দেহাত্মবুদ্ধি, পতি পুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে থাকিয়াও আমাকে মনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার বিষয়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে ভালবাসা এবং ভক্তি অর্পণ ইহাই ভক্তিধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। গোপীপ্রেমামৃতে উক্ত আছে :

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ। নিগূঢ়প্রেমভাজনম্।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে পার্থ! গোপিকাগণ তাঁহাদের নিজের দেহ আমাতে অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, আমার প্রীত্যর্থে তাহাকে অলঙ্কারাদির দ্বারা বিভূষিত করিয়া থাকেন, তাহাতে গোপীদের নিজের স্বার্থ কিছুই নাই। সেই গোপীগণ ব্যতীত অন্য কেহ আমার নিগূঢ় প্রেম-ভাজন নাই।

সুতরাং যে মানব একাধারে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির প্রতিমূর্তি, বিদ্যা, শক্তি এবং বুদ্ধিতে তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতীক স্বরূপ, তাঁহার ভিতর বিরাট ঐশীশক্তির স্ফূর্তি উপলব্ধ হয়। তাঁহারাই বিরাটের স্বরাটত্ব প্রমাণ করেন। ইঁহারাই জড় ও চেতনের মধ্যে যে অনন্তশক্তি, সেই শক্তির মূর্তিমান বিকাশ, সর্বব্যাপী ঐশীশক্তির স্থানীয় বিগ্রহ, অর্থাৎ ঈশ্বরের অবতার।

জন্মাষ্টমী

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

তুমি আসো : দেখা গেছে, শুনা গেছে, লেখা আছে
তোমারি মুখের বাণী,—সার তাহা বিশ্বাসীর কাছে।
শক্তি-মত্ত কেহ শুধু দুর্বলেরে মারিতেই জানে,
যে যত অ বল, তারে যত পারে তত জোরে হানে ;
আর কেহ মার খায়, মরে যায়, পড়ে' মৌন মুখে
শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই, ইচ্ছা নাই—দাঁড়াইবে কবে।
এই লগ্ন—ধরণীতে নরদেহে তোমার আসার।
আসিয়াছ, কার্য অন্তে চলে' গেছ তুমি কতবার।
একবার এসেছিলে, সেই তিথি সমাগত আজি :
সে-বারতা ঘরে ঘরে শঙ্খে শঙ্খে উঠিয়াছে বাজি।
কৃষ্ণা-অষ্টমীর তিথি, এই ভরা-দুর্যোগের রাতি
অন্ধকার, হাহাকার, সর্বনাশ করে মাতামাতি ;
মেঘে মেঘে জড়াজড়ি, মহাকাল যাদার ডমরু,
'ত্রাহি-ত্রাহি' আর্তরোলে ডাকে জীব, হিয়া দুরু-দুরু।
অগণিত কংস রাজা অট্টহাসে বিভৎস ভয়াল ;
বিজলী চমকে ওই, নিভে-জ্বলে প্রেতের মশাল :
বসুদেব-দেবকী'রা রুদ্ধকণ্ঠ পাষাণের চাপে,
ভীত-ত্রস্ত ধরাতল থেকে থেকে টলমল কাঁপে।
বিশ্ব-জোড়া একদশা, এক দৃশ্য মানুষের কৃত,
'সত্য-শিব-সুন্দর' কি ধরা হতে হবে নির্বাসিত !
দেবতার সৃজনের প্রতিকূলে ধ্বংস-অভিযান
কে রুখিবে তোমা বিনা, কিসে বিশ্ব পাবে পরিত্রাণ ?

বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষ

শ্রীঅমিয়শঙ্কর নন্দী

পৃথিবীতে মানুষ পরিমিতকাল পর্য্যন্ত বসবাস করুক এই তো বাঞ্ছনীয়। সুদূর অতীতকাল হতে আরম্ভ করে অতি আধুনিক সময় পর্য্যন্ত যে ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার মধ্যেও একটা সাধারণ তথ্য এই দেখতে পাই যে মানুষ কেবলই আনন্দের আকাঙ্খা করেছে; কী করে সুখী হবে, সে তারই চেষ্টা করেছে এবং এখনও করে চলেছে। তার এই আনন্দের অনুসন্ধান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করেছে—কখনও সুন্দর, কখনও বা অসুন্দর রূপ নিয়েছে, ভালমন্দের বিচার এক্ষেত্রে অবশ্যই করা চলে—তবু এ কথাটুকু কি করে বিস্মৃত হব যে মানুষের এই অবিরাম আনন্দানুসন্ধানই যুগে যুগে বিচিত্রপথে অগ্রসর হয়ে বর্ত্তমান সভ্যতার জন্ম দিয়েছে?

কিন্তু চিরবাঞ্ছিত পরিপূর্ণ আনন্দ এখনও মানুষের করতলগত হয়ে গেল। আরামের, বিলাসের সহস্র সম্ভার তার চারিদিকে থরে থরে সাজানো—একজন সাধারণ মানুষও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যতটুকু সুবিধা ও ভাল ভাল সামগ্রী উপভোগ করে থাকে—অতীতে একজন রাজার পক্ষেও সে সম্ভোগ সম্ভব ছিল না। তবু কৈ, তাকে তো তৃপ্ত দেখি না? অগণিত ও অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী—এ দু'শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে তারতম্য—সে হচ্ছে পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। মনের দিক থেকে উভয়কেই দেখি অতি চঞ্চল—নিরবধি ছুটোছুটি করছে। কি জানি সেসুখ না, কি হারিয়ে গেল—কে বুঝি আমাকে ডিঙিয়ে গেল—আমার কোন সুবিধাটা অচেনা শত্রুর দ্বারা নষ্ট হল এরকম নানা চিন্তায় ধনী দরিদ্র সবাই নিয়ত উদ্বিগ্ন। একটু সুস্থে চোখ মেলে তাকাবার ক্ষমতাও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে।

উদার আকাশ, নির্ম্মল বাতাস, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ শ্রী কিছুই তাদের মনকে মুগ্ধ করে না। ফুলের গন্ধের চেয়ে শিশি'র সুগন্ধি তাদের অধিকতর প্রিয়, উন্মুক্ত গগনতলের বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর তাদের বিচরণ ভূমি নয়, ক্ষুদ্র Drawing room এর গালিচা বিছানো কাঠের আসবাব কণ্টকিত স্থান অবসর বিনোদনের আদর্শ কেন্দ্র। জীবন ও প্রকৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধনকে অস্বীকার করবার অসুস্থ নেশাকেই মানুষ আজ সভ্যতার পরিচয় বলে ধরে নিয়েছে। তার দেহ হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসহিষ্ণু, মনের সাহস যে পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে ভীরুতারই নামান্তর। সুস্থ প্রাণবন্ত দেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে সে বিকৃত পথে পরিচালিত করছে। মনখুলে সরলভাবে কথা বলা culture এর পরিপন্থী।

যান্ত্রিক কলাকৌশল যে উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তাতে বহু মানুষকে হতে হয়েছে বৃত্তি-চ্যুত। অঙ্কের মত সূক্ষ্ম বিষয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ পরিচালনা আবশ্যক, যন্ত্র সে কাজের ভারও আজ আংশিক নিয়ে নিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ যন্ত্র আরও পূর্ণতা লাভ করে' বুদ্ধিবৃত্তির চালনাকে অনাবশ্যক করে দেবে, - মানুষের সে কি দুর্দ্দিন। অসম্ভব নয়, একদিন যন্ত্রই মানুষের হয়ে চিন্তা করবে, মানুষের হয়ে কথা বলবে, মানুষের হয়ে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করবে—সে শুধু একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে পড়ে থাকবে—তার দেহের সঙ্গে থাকবে কতগুলো mechanical connection, operate করবার জন্য শুধু একটা বোতাম টিপতে হবে।

নিয়ত অনুশীলনহীন মস্তিষ্ক ক্রমান্বয়ে মানুষকে একটা জড় মূক জীবে পরিণত করবে। এই সভ্যতার ধ্বংসে অবধারিত হবে। তারপর বুঝি ফিরে যাবে সে তার আদিম আরণ্য জীবনে। ভবিষ্যৎ মানুষের এই-রকম একটা অবস্থার আভাস এখন থেকেই কি আমরা পাচ্ছি না? উহা কি সত্যই আমাদের কাম্য? আনন্দ তো স্বস্থ অন্তরের অনুভূতি—সে

অনুভূতি আসে সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে। কিছুই যদি মানুষের করবার না থাকে তবে আনন্দ সে পাবে কোথা থেকে ?

আধুনিক যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা মিশে মানুষের দৈহিক আরামের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে কিন্তু এই আত্যন্তিক আরাম যেন একটা রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির বিশ্রাম গ্রহণের মতো। শুধু চেয়ে থেকে থেকে অলস প্রহর গোনা।

মরণ

শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হে সখা আমার
চল কোথা নিয়ে যাবে মোরে !
স্বর্গ, নরক
কিম্বা পাতালের দোরে।
উদ্বেলিত সাগরের
ঊর্মির অন্তরে,
অথবা যুগ যুগ ভ্রমে
জীবন্ত মন্তরে,
সৃষ্ট প্রবাল-প্রাসাদ
আছে কি আমার লাগি ?
সিন্ধুধৌত কলেবরে
সতত নবীনা,
যুগ যুগ প্রতীক্ষায়
আলস্য বিহীনা,
প্রাণময়ী সিন্ধুকন্যা
আছে কি সেথায় জাগি ?
ধ্যানমগ্ন হিমাদ্রির
প্রস্তরিত বুকে,
চঞ্চলা পর্বত-বালা
সন্তরিছে সুখে,
বিঘূর্ণিত আলোড়নে
হিমানী-নির্ঝর পরে ;
অনাঘ্রাত পুষ্প যেথা
রহিয়াছে ফুটে,
অদৃষ্ট তরুর কোন
শ্যাম-কলপুটে,
অনাস্বাদিত ফল
আছে—অনাগত তরে।
যেথা নিত্য নবপ্রাণ
দানে বিহারিকা,
নিকষ আঁধার মাঝে
তারার মালিকা,
লজ্জারক্তরাগ
ফুটে উষার অধরে ;
কিম্বা অজানা স্থানে
নামগোত্রহীন,
অমৃত ভাণ্ডারে যেথা
হয়ে আছে লীন,
নূতন জীবন রস
লবে কি সেথায় মোরে ?
তব অন্তরালে শুনি
অশ্রুত-সঙ্গীত,
মুক্তপ্রাণ আপনার
হারাল সম্বিৎ,
যেথা মন, নিয়ে চল
হে মোর মরণ।
হোক সে অজানা পুরী
হোক যাহা কিছু,
সুগম, দুর্গম হোক
যাব তব পিছু,
জীর্ণপ্রাণ দিয়ে লব
নবীন জীবন।

সমাজে নারীর ক্রমবিকাশ

অমিয়া পাল

আদিম সভ্যতার যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময়ে সমাজে স্ত্রীজাতিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান গরিমায় জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রেই তাঁরা পুরুষদের চেয়ে অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠস্থানীয়া ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই খুব উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন এবং বেদ পুরাণ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের জীবন-যাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। তাই তাঁরা গৃহের কাজ কর্ম সেরে অবসরসময়ে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। অন্যদিকে প্রকৃতির সুমহান সৌন্দর্য তাঁদের মনকে কাব্য ও দর্শনের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত করছিল। সে সময়ে ঘোষা, অপলা ও লোপামুদ্রা প্রভৃতি কয়েকজন মেয়ে-ঋষির নামও পাওয়া যায়। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—স্ত্রী স্বাধীনতার যোগ্যা নয়, একথা তখনকার দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

সেসময়ে সমাজে মেয়েরা উৎপাদন করতো এবং পুরুষেরা শিকার করতো। শিকারই ছিল পুরুষদের জীবিকানির্বাহের একমাত্র প্রধান অবলম্বন। আদিম সভ্যতার যুগের ক্রমবিবর্তনের ফলে সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটলো। এই সময়ে পুরুষেরা পশু পালন বা পশুচারণ করতো এবং উৎপাদন ব্যাপারেও তারা অগ্রণী হয়ে এলো। এরূপে উৎপাদন পুরুষদের হাতে এসে গেল। সেদিন থেকেই মেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আরও সঙ্কুচিত হয়ে এলো এবং সমাজ-জীবনেও তা'দের নানা পরিবর্তন ঘটলো। সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও প্রকৃত উন্নতি সাধিত হলো। যতদিন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, ততদিন সমাজে নারীদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশিষ্ট স্থানটীও নষ্ট হয়ে গেল এবং তা'রা সামাজিক উৎপাদনের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে সংসারে প্রবেশ করলো। ইহাই হলো নারী জাতীর আদিম ইতিহাস। সেদিন থেকেই সমাজের শীর্ষস্থানে পুরুষেরা মহা আড়ম্বরের সহিত অধিষ্ঠিত হলো এবং সমাজ পুরুষদের দ্বারা শাসিত হ'তে লাগলো। মানুষ হিসাবে স্ত্রীজাতির সমাজে কোন স্বাধীনতা এবং অধিকার আর রইলো না। অর্থনৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তা'রা, মান-সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার থেকেও বঞ্চিত হ'লো।

পূর্বতন সমাজে মায়ের সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকার ছিল। কিন্তু সমাজ এপ্রথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো, এবং তার পরিবর্তে পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকার-প্রথা প্রবর্তন করলো। তখনকার যুগে সমাজে বহু বিবাহেরও প্রচলন ছিল। অর্থনৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বহু বিবাহের প্রচলনও বন্ধ হয়ে গেল। এবং সমাজের বিধিব্যবস্থারও প্রচুর পরিবর্তন দেখা দিলো। গত দুই হাজার বৎসর থেকে সমাজে নানা বিপ্লব ও আন্দোলন ঘটেছে এবং সমাজে নানা পরিবর্তনও এসেছে কিন্তু নারীদের সমাজে অধিকার ও স্বাধীনতার কোন পরিবর্তনই হয়নি। নারীদের স্বাধীনতা সমাজপতিরা স্বীকার করে নেয়নি। তাদের মতে নারীদের স্বামীর নিকট আনুগত্যেই মঙ্গল; কারণ তারা শক্তিতে দুর্বল ও অক্ষম। আত্মরক্ষার্থে স্বামীর নিকট নারীর আনুগত্যই শ্রেয় এবং অন্তরমহলই নারীদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান। এমন কথাও শোনা গেছে, জার্মানীর হিটলার নাকি নারীদের বলেছিলেন, 'Go back to the kitchen.' কোন কোন উচ্চ শিক্ষিতেরা মেয়েদের এই দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্টতা স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন যে, মেয়েদের কর্মক্ষেত্র বিরাট, এই বিরাট ক্ষেত্রে নারীরা প্রতিনিয়তই নিত্য নব-নবরূপে দেখা দেয়। সমাজ-গঠনের কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীর দান অতুলনীয়।

বিশেষ ক'রে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রতিযোগিতায় শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে মানসিক প্রতিভারই প্রয়োজন বেশী। কোন কোন পোড়া সমাজপতি কোন যুক্তির অবতারণা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁরা বলেন যে, মেয়েদের সার্থকতা নারীত্বে, মাতৃত্বে। সুতরাং তাদের পরাধীনতারই প্রয়োজন। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা না পেলে মানুষ বড় হ'তে পারে না—এসব বড় বড় ফাঁকা বুলি পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায়। কিন্তু এই আধুনিক যুগেও মেয়েদের স্বাধীনতার দিকে তাকালে লজ্জায় মাথা আপনিই নীচু হয়ে আসে।

সমাজে অবরোধ-প্রথার ফলে নারীদের মান-সম্মান ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য, স্বামী পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগেও ইতর অভদ্র অশিক্ষিত স্বামীরও অভাব নেই। সংসারে নারীকে ইতর স্বামীর সমস্ত লাঞ্ছনাই নীরবে সহ্য করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর লাঞ্ছনা এত চরমে উঠে যে, স্ত্রী বাধ্য হয় আত্মহত্যা করতে। এমন কথাও শোনা যায় যে, পূর্বকালে রোমের ধনিক শ্রেণী স্ত্রীদের ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতো মাতৃত্বের অনুভূতিতে। মেয়েদের এই পরাধীনতার প্রধান অন্তরায় হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। বর্তমান সভ্যতার এই আর্থিক পরাধীনতাই নারীদের জীবন-বিকাশের পথে প্রধান বাধা স্বরূপ। যার নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, যার আর্থিক স্বাধীনতা নেই, যাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, সমাজ তাকে সম্মান করে না। আর্থিক সম্পত্তির উপরেই যে কোনও ব্যক্তির মান-সম্মান নির্ভর করে।

প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে স্ত্রীজাতি পুরুষদের সঙ্গে পাশে পাশে এগিয়ে চলছে। বিশেষ ক'রে এখনকার দিনের চীনের নারী-সমাজের প্রতি তাকালে সত্যিই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিছুদিন আগেও চীনের নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। গরু-ছাগলের ন্যায় তাদের বিক্রয় করা হতো। সমাজে, ক্রীতদাসীর মত তাদের স্থান ছিল। চীনের মেয়েদের দুর্বল ক'রে রাখার জন্য এবং পায়ের শোভা বর্ধনের জন্য লোহার জুতা পরিয়ে রাখতো,—ইহাই নাকি তখনকার চীন-সমাজের রীতি ছিল। পার্ল বাক তাঁর সৃজনী প্রতিভার দ্বারা সেসময়ে চীনের নারী-সমাজের নির্যাতনের কাহিনীটি 'গুড আর্থ' (Good Earth) নামে তাঁর বইখানিতে চিত্রিত করে গেছেন। এই কাহিনী থেকেই চীনের নারীদের সামাজিক চিত্রটী প্রতিভাত হয়।

কিন্তু আজ মার্কসের (Karl Marx) মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের সমাজে নানা পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেখানকার নারীরা সমাজে পুরুষের সমান অধিকার পেয়েছে। তাই আজ চীনের নারীসমাজ পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে এবং পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে তালে তালে, ধাপে ধাপে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে। মার্কস্ বলেছেন যে, নারীরা সমাজে পুরুষের সমান অধিকার না পেলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতো দূরের কথা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজে নারীদের অবরোধ প্রথার ফলেই তারা পরনির্ভরশীল। এই আর্থিক পরাধীনতাই তাদের স্বাবলম্বন ও প্রগতির প্রধান বাধাস্বরূপ। যতদিন এই নারীজাতি সমাজে উৎপাদনের ব্যাপারে পুরুষের সমান অংশ গ্রহণে বঞ্চিত থাকবে ততদিন নারী-শ্রেণী স্বামী পুত্রের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে না। সোভিয়েট রাশিয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি,সেখানে নারী জাতি উৎপাদন-ব্যাপারে সমাজে পুরুষের সমান অধিকার পেয়েছে। বৌথ খামারে তারা কর্মী ও কারখানায় তারা শ্রমিক হয়েছে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

আমাদের দেশের নারীরা এখনও সামাজিকতার বন্ধনে আবদ্ধ। তাই তাঁরা এখনও—এই আধুনিক সভ্যতার যুগেও অভদ্র ও অশিক্ষিত স্বামীদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে। বিশেষতঃ অবরোধ-প্রথা প্রবর্তনের ফলেই এদেশের নারীরা অজ্ঞ, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাপন্ন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভারতীয় নারীদের এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য

সমাজপতিরাই দায়ী। আমাদের দেশে এখনও এক শ্রেণীর গোঁড়া লোক আছেন যাঁরা স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী। এদের অভিমত এই যে, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। কোন কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী এবং স্ত্রীকে শুধু ভোগের সামগ্রীরূপেই দেখেন না, তাঁরা নিজ নিজ স্ত্রীর ব্যক্তিগত সামাজিক পদমর্যাদা ও স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে, নারী জাতির কর্মক্ষেত্র বিরাট; অফুরন্ত তা'দের কর্মপ্রেরণা; সমাজের তারা একটি শক্তি। সমাজ-গঠনের কাজে তাদের মূল্য, পুরুষ অপেক্ষা অধিক। সুতরাং মাতৃত্বেই নারী জাতির সার্থকতা নয়। শিক্ষার দ্বারাই নারীজাতির অন্তর্নিহিত সুপ্ত সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রগতির দিকে নারীরা এগিয়ে চলুক, এইটাই তাঁরা কামনা করেন। আমাদের দেশে এখনও ব্যাপক শিক্ষা-প্রসারতা লাভ করেনি। এই ব্যাপক শিক্ষার প্রসারতার পক্ষে প্রধান বাধাস্বরূপ অর্থনৈতিক সমস্যা। সমাজের অধিকাংশ বিধবাই তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে নির্যাতন ও লাঞ্ছনা পেয়ে আসছে। এই নির্যাতন ও লাঞ্ছনার পিছনে রয়েছে তা'দের পরনির্ভরশীলতা। এই নির্যাতিতা পরনির্ভরশীলা মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলা ও স্বাবলম্বিনী করে তোলার জন্য কতকগুলি নারীশিক্ষাসমিতি নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। গবর্ণমেণ্টও কতগুলি নারী-সমিতিকে সাহায্য করছে। নারীদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ব্যাপারকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবর্ণমেণ্টকে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে এই নির্যাতিতা ও পরনির্ভরশীলা নারীদের আত্মনির্ভরশীলা ক'রে তুলতে তৎপর হ'তে হবে এবং অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক শিক্ষার অভিযান চালাতে হবে।

আধুনিক একশ্রেণীর অভিজাত নারীর আমদানী দেখা যায়, তারা নানা রংয়ের সমাবেশে সজ্জিতা হয়ে, অধর রঞ্জিত ক'রে নিজদের শিক্ষিতা ব'লে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। তাঁরা আভিজাত্যের গর্বে উৎকট বিলাসিতার মাধুর্যের হাওয়ায় ভেসে চলছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে পালিশ করা কে. টী. মিটারের চিত্রটীকে যে ভাবে তুলি দিয়ে অঙ্কিত ক'রে সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন ইদানীং আমাদের সমাজেও মাঝে মাঝে ঐরকম দু'একটি কে. টি. মিটারকে দেখা যায়, যারা সিগারেট ফুঁকিয়ে চলাটা আভিজাত্য বলে গর্ব বোধ করে। এরকম শিক্ষা সমাজের কোন কল্যাণেই আসবে না, বরং সমাজের নিকট হেয় ও অনাদৃত বলে প্রতিপন্ন হবে।

অন্যান্য স্বাধীন প্রগতিশীল রাষ্ট্রের নারীসমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায়—আমরা অনেক পিছনেই রয়েছি; তা সত্ত্বেও এটুকুই আশার কথা যে, আমাদের নারীসমাজও প্রগতির পথে এখন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে। আমাদের নারী সমাজেও কেহ কেহ ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনীয়ার হয়েছেন। কেহ কেহ আইন সভার সদস্যা হয়েছেন, কেহ বা মন্ত্রীর আসনও অলঙ্কৃত করেছেন; কেহ বা কোনও রাজ্যের (Province) গভর্ণরও নিযুক্তা হয়েছেন এবং সমাজ-সংগঠন ব্যাপারেও এগিয়ে আসছেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্র-পুঞ্জের (U. N. O.) সাধারণ পরিষদে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। এর দ্বারা ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতীয় নারী-সমাজও গৌরবান্বিতা হয়েছে। সমাজের প্রত্যেক নারীকেই কেবল যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হবে, তা নয়, সমাজের সংগঠন ব্যাপারে তা'দের এগিয়ে আসতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে নারীদের আত্ম-সচেতন হতে হবে, সমাজের গঠনমূলক সবরকম কাজে তা'দের আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবেই নারীসমাজ সামাজিক পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে।

"বনলতা সেন" ও জীবনানন্দ দাশ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য, এম, এ

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতার সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, ভাঙাগড়ার কি এক বিরাট প্রক্রিয়া সমগ্র বাংলাকাব্যকে অভিভূত করে ফেলেছে। এ বিস্ময় শুধু আজকের বাঙ্গালী পাঠকের জন্যই নয়, ভবিষ্যতের সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের জন্যও বটে। যুগের গতির সাথে মানবজীবনের পরিবর্তন ঘটে (অথবা মানবজীবনের পরিবর্তনই যুগের গতি নির্ধারিত করে), এবং এই পরিবর্তন সংক্রামিত হয় সমগ্র শিল্পে, সাহিত্যে। এই অর্থে শিল্প সবসময়েই প্রগতিশীল।

রবীন্দ্রযুগ এবং তৎপূর্ববর্তীযুগের স্থৈর্য এবং শান্ত সমাহিত সুর পরিম্লাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ আর তার সমকালীন কবিদের কবিতা। কিন্তু মানুষের জীবন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; তাকে চলতেই হয়। তাই বিশ্বসৃষ্টির নিয়মানুসারে জীবনের রূপ বদলালো। সাথে সাথে বাংলা কবিতারও মোড় ঘুরে গেল। সৃষ্টি হোল নতুন সাহিত্য। এসিয়ে এল নতুন এক যুগ। রবীন্দ্র-যুগের শান্তি, স্থৈর্য আর সমাহিতিতে পড়ল পূর্ণচ্ছেদ। মানুষের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার বিপ্লব এবং দুই-দুটো বিশ্বযুদ্ধ আর তার পরবর্তী জীবনের বিক্ষিপ্তি আর বিচ্ছিন্নতার মধ্যে আর যাই হোক রবীন্দ্রনাথের কবিতা আশা করা যায়না। তাই কবিতা হয়ে উঠল গভীরভাবে অন্তর্মুখী ও দুর্বোধ্য। এই যুগধারার ছায়া রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতার মধ্যেও স্পষ্ট। কাজেই এ যুগের কবিতা আকস্মিক নয়, সুদূর হিমালয়ের গঙ্গোত্রীতেই এর উৎস। তবু বর্তমান যুগের কবিতা বলতে একটা ভীতি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যে পুরোপুরী বিদ্যমান। যারা একটু রক্ষণশীল তাদের মতে, কিছুই হচ্ছে না; বাংলা কবিতা আসলে রবীন্দ্রনাথের পরে যারা পড়েছে; এবং এখন যা দেখা যাচ্ছে তা কবিতার প্রেতাত্মা। দুর্বোধ্যতার পুরু আস্তরণে নিজেকে ঢেকে পাঠকের ভীতি উৎপাদন করাই তার উদ্দেশ্য। অবশ্য দুর্বোধ্যতার জন্য দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির উদাহরণ আধুনিক বাংলা কাব্যে বিরল নয়। কিন্তু তাই বলে দু একজনের দুর্বুদ্ধির বোঝা সমস্ত যুগের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে ভুল ব্যাখ্যা করাটাও নিশ্চিতভাবে বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

যুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতা সম্পর্কে অনেককেই বলতে শোনা যায় যে আধুনিক কবিতা শুধু অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটেই নয়, অর্থহীনও বটে। এই অস্পষ্টতা ও আপাতঅর্থহীনতার কি কোন কারণ নেই?

যেখানে জীবন বিপর্যস্ত, প্রতি পদে পদে হতাশার হিমশীতল স্পর্শ, সেখানে কবিতায় সমাহিতি, হাত-পা ছড়িয়ে জীবনের জয়গান না থাকাইতো স্বাভাবিক। এ যুগের এই ভাঙ্গ-চুর হয়ত আগামী যুগের বৃহৎ কোন কলার্থতাকে ডেকে আনবে। কিন্তু তাই বলে বর্তমানকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। আজকের যুগের বেদনা আর দীর্ঘশ্বাসকে ভুলে গিয়ে, আগামী যুগের সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের জয়গান করা তো সম্ভব নয়, অন্ততঃ এ যুগের কবিদের পক্ষে। তাই আধুনিক কবিতার মূল সুরই হোল হতাশার সুর—জীবনের প্রতি পদক্ষেপের বেদনাদগ্ধ ইতিহাসের প্রতি অভিমান-বিক্ষুব্ধ কবিহৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস।

আরেক শ্রেণীর কবিতা আছে যেখানে কবি বাইরের বিরাট বিপুল জীবনকে ছেড়ে একান্তভাবে নিজের মধ্যে ডুব দিয়েছেন। এখানে জীবনকে আনবার কোন প্রয়াস নেই, জীবনের বৃহত্তর "ট্র্যাজিডি" এখানে কবিহৃদয়ের বেদনা-মধুর অনুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু হতাশা এবং হতাশা থেকে পালিয়ে যাবার এই প্রচেষ্টা ছাড়াও

আরেকটা সুর বাংলা কবিতায় আছে। বর্তমান যুগের হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেও ছিটেফোটা আনন্দ রয়েছে। এখনও কৃষ্ণচূড়া তার নরম হাত বুলিয়ে দিতে চায়। শহুরে জীবনের বদ্ধ দালানায় দু গণ্ড—মাত্র দু-গণ্ড আকাশ এখনও কবি-হৃদয়কে তোলপাড় করে তোলে। সোনালী ডানার চিলের ঝকিয়ে কান্নার মধ্যে এখনও কবি বহুদিন আগেকার কোন প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর অনুভব করেন। ঘাস এখনও সবুজ, শত সহস্র ব্যর্থতার রক্তাক্ত ঘাস আজও নিঃসঙ্গ শিশিরের সস্নেহ প্রলেপে সবুজ হয়ে ওঠে। বর্তমান জীবনের হতাশাও যেমন সত্য, এগুলিও তেমনি সত্য। আধুনিক বাংলা কবিতার এই সুরটি মূর্ত হয়ে উঠেছে কয়েকজন বলিষ্ঠ কবির লেখনীতে। এই সুরের অন্যতম সাধক ও বাহক হচ্ছেন "বনলতা সেন"-এর কবি জীবনানন্দ দাশ।

"বনলতা সেন" ও অন্যান্য কয়েকটি কবিতা কবির জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "রবীন্দ্র পুরস্কার" পেয়েছে। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর 'বনলতা সেন' এর স্থান কোথায়, সে বিচারের ভার আগামী যুগের ঐতিহাসিকদের ওপর। কিন্তু হাজার হাজার বছর সুদূর বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ আর বিদিশা, শ্রাবস্তি, উজ্জয়িনী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে, প্রচুর পরিশ্রম করে যে বনলতা সেনের পরিচয় কবি পেয়েছেন, তার সম্বন্ধে এযুগের অনুসন্ধিৎসু পাঠক হিসাবে দু-একটা কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবি-জীবনের প্রারম্ভে আধুনিক কবিদের অধিকাংশের মতই বর্তমান জীবনের জটিলতায় বিপর্যস্ত এবং এর ফলহীনতায় বিরক্ত হয়েছেন।

বহু কবিতায় তাঁর সেই হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসের স্পষ্ট আভাস রয়েছে। "সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত" এই পৃথিবীকে তার মনে হয়েছে "যেন কোটী কোটী শূয়োরের আর্তনাদে উৎসব সুরু করেছে।" জীবনকে তখন তিনি "শত শত শূকরের চিৎকার" আর "শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর" ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন নি। তবু মাঝে মাঝে সন্দেহ জেগেছে। মনে হয়েছে যেন জীবনকে বুঝতে তাঁর কোথায় ভুল হচ্ছে। কবি যেন তার জীবনদর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংশয়হীন নন্। এই কুয়াশার আবরণ উন্মোচিত হ'তে অনেক সময় লেগেছে। দীর্ঘ দিনের আত্মানুসন্ধানের ফলে কবি জানতে পেরেছেন হতাশা, নৈরাশ্য, দীর্ঘশ্বাস—এরাই জীবনের সব নয়। জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় এখানে নয়। শত সহস্র ভুল, ভ্রান্তি, সংকীর্ণতা, খণ্ডতা, সন্দেহ, সংশয়—মানুষের জীবনের সামগ্রিক রূপের পরিচয় দিতে পারে না। তার কীর্তির চেয়ে মানুষ অনেক বড়, তাইত জীবনের রথ কীর্তিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। ক্রমে কবি বুঝতে পেরেছেন জীবনের সমস্ত ফলহীনতার মধ্যেও একটা চরম ফলার্থতা গুপ্ত আছে। এ উপলব্ধি হঠাৎ আসেনি। সারা জীবন ধরে কবি এই অমৃতের সন্ধান করেছেন। তাঁর সমগ্র কবি-জীবনের ইতিহাস এই সাধনারই ইতিহাস। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবনানন্দের সাধনা ভারতের চিরকালের অধ্যাত্ম-সাধনার সমগোত্রীয়। সৃষ্টির মর্মমূলের সে আনন্দের অনুসন্ধানে কবি কৃতকার্য হয়েছেন—বর্তমান জীবনের অপূর্ণতা আর সমস্ত খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্তির মধ্যে তিনি পূর্ণতার সন্ধান পেয়েছেন। এই সংশয়হীন বিশ্বাসের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি তাঁর "বনলতা সেন।" এখানে জীবন আর আনন্দকে কবি একাত্ম করে দিয়েছেন। "বনলতা সেন" শুধু মাত্র একটি কবিতা নয়, এ কবি জীবনানন্দ দাশের কবিজীবনের আত্মোপলব্ধির প্রামাণ্য ও শেষ সোপান।

আত্ম-নিবেদনম্

শ্রীশ্রীশিবকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

বালত্বং শিশুভিঃ সমং মম সমৈঃ সংক্রীড়তঃ সংগতং
ভার্য্যাচিত্তবিনোদনং বিদধতো যাতং মুদা যৌবনম্।
বার্দ্ধক্যেন কৃশং নিপীড়িতবপুঃ পূজাতপোযোগ্যতা-
হীনং মাংশরণং প্রপাহি ভগবন্ হে রামকৃষ্ণাধুনা ॥১॥

বাল্যসাথী সনে মোর খেলিতে খেলিতে
হয়েছে অতীত দেব, শৈশব সময়
তরুণী ভার্য্যার চিত্ত ক'রে বিনোদন
কাটায়েছি রঙ্গরসে যৌবন আমার
বার্দ্ধক্যে পীড়িত তনু পূজা জপতপ
করিতে সামর্থ্যহীন হয়েছি এখন
ভগবন্ রামকৃষ্ণ! করি নিবেদন
রক্ষ তব হীনহীন অকৃতী সন্তানে ॥১॥

হৃদয়কমলসংস্থাং পশ্যতো হৃদ্যমূর্তিং
পতিতজনশরণ্যং ধ্যায়তঃ পাদপদ্মম্।
তব সুচরিতগাথাং গায়তো জীবিতং মে
ভবতু তনুবিমুক্তং প্রার্থ্যতে রামকৃষ্ণ ॥২॥

মম হৃদিপদ্মে তব মোহন মূরতি
জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে সদা দেখিতে দেখিতে
পতিত পাবন যুগ্ম পদ শতদল
করিতে করিতে ধ্যান জীবন আমার
তোমার চরিত গাথা গাহিতে গাহিতে
এ দেহ বিমুক্ত হ'ক, এই নিবেদন ॥২॥

"দুঃখ পেলে ভগবানকে মনে পড়ে। দুঃখের সৃষ্টি ঐ জন্য, কষ্ট পেলে ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

অবতারকে চিন্তা করলে তাতে মন প্রাণ সমর্পণ করলেই সব হয়ে যায়।

গুরু যা বলবেন তাই ভাল। তাঁর উপদেশে কাজ করতে হয়।

যে ভগবানের কথা এনে দেয় সেই পরম সুহৃদ।"

—ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পরলোকে দানবীর রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার

মহাকালের বিধানে—

৭ই আগষ্ট, '৫৬, বাংলা ২২শে শ্রাবণ, '৬৩ তারিখটি বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যপুঁথিতে একটি অতি দুর্দিনরূপে চিহ্নিত হইয়া রহিল। এইদিন দেশ তার এক বরেণ্য সন্তান ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে হারাইয়াছে। এই মহাপ্রাণ, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিকের নাম কয়েক বৎসর আগেও বিদ্বৎসমাজের বাহিরে সর্বসাধারণের মধ্যে খুব বেশী পরিচিত ছিল না। পরিণত বয়সেই তাঁর লোকান্তর ঘটিল; দীর্ঘকাল তাঁর কর্মবহুল, অনলস ও ত্যাগ-পূত জীবন—আমাদের সম্মুখে ছিল; তবু তাঁর সম্বন্ধে সম্যক সংবাদ আমরা রাখি নাই এমনই নীরব, হৈ-হল্লোড়হীন সরল অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। জীবনের শেষ অঙ্কে এই আপন-ভোলা মহামানবকে যেন অজ্ঞাত বাস হইতে বিধাতা লোকলোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। দেশের জ্ঞানীগুণিগণ স্বাধীন রাষ্ট্রজীবনে হরেন্দ্রকুমারকে অন্যতম পুরোধা নির্বাচন করেন এবং তাঁর হস্তে স্বেচ্ছায়-সানন্দে নিজেদের শাসন-সংরক্ষণের জন্য রাজদণ্ড তুলিয়া দেন। একজন অভিজাত শিক্ষা-সেবীকে রাজ্যপাল মনোনয়ন,—সংস্কৃতিবান সভ্য মানুষের ইতিহাসে ইহা যেন এক অভিনব ঘটনা।

রাজ্যপাল-প্রাসাদে রাজকীয় সম্মানের আসনে বৃত হইয়াও রাজর্ষি রাজসমারোহে আত্মবিস্মৃত হন নাই। চালাইয়া চলিয়াছেন—লোক-কল্যাণে আপন স্বভাবসিদ্ধ প্রিয় ত্যাগ-যজ্ঞের সাধন। অশিক্ষিত, রুগ্ন, দুঃস্থ নারায়ণের সেবায় অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছেন—নিজের অর্থ, অবসর, আরাম। নিজের দিবার যাহা,—তাহাই যথেষ্ট মনে না করিয়া 'পরের তরে' ভিক্ষাপাত্র হাতে অসঙ্কোচে 'পরের দুয়ারে' দাঁড়াইয়াছেন।

তিনি ছিলেন—নিষ্ঠাবান খৃষ্টান, ছিলেন—ব্রতী শিক্ষক, 'plain living and high thinking' আদর্শের অন্যতম ভারতীয় প্রতীক। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন—জাতীয়তাবাদী নির্বিরোধ-ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন—নিজের সকল সঞ্চয় পরহিতে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার মত উচ্চ হৃদয়বান দুর্লভ দানবীর।

এই অজাতশত্রু মানুষটির সহজ-সুন্দর জীবন-শতদল দেশের গণ-মানস-সরোবরে বহুদিন অম্লান থাকিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করুন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়: হরেন্দ্রকুমার কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত খৃষ্টানপরিবারে ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে ইংরেজী ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বি-এ পর্যন্ত পরীক্ষায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় নাই। কিন্তু ১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম-শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার শিক্ষক-জীবন। প্রথমে কলিকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলে, পরে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে, তৎপরে সিটি কলেজে শিক্ষকতা করেন। ইংরেজী সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি-এইচ-ডি। স্বভাবতঃই স্যার আশুতোষের বিশেষ প্রশংসা ও স্নেহভাজন ছিলেন। এক সময়ে তিনি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর বিশেষ যোগ্যতা থাকায় দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের পরিদর্শকরূপে তাঁকে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে তিনি কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছেন। ভারতীয় খৃষ্টানপরিষদ তাঁর মূল্যবান সেবায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে সংযুক্ত বাংলাদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর ভারতীয় গণপরিষদের সহঃসভাপতি নির্বাচিত হন। কিছুদিন মাইনরিটি সাবকমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫১ সালে ২৫শে অক্টোবর তিনি পশ্চিমবঙ্গের

তৃতীয় রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। তাঁর মানবপ্রীতির জন্য এই কালে তাঁর নাম সাধারণের মধ্যে সমধিক প্রচারিত হয়। এই পদে নিযুক্ত থাকাকালেই তাঁর ইহজীবনের অবসান ঘটিল।

নিজে অতি সাধারণ জীবন যাপন করিয়া তিনি দেশ ও জনের হিতার্থে নিজের বিপুল অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁর পূর্বাপর দানের মোট পরিমাণ—১৪ লক্ষ টাকা। রাজ্যপালের বেতন স্বরূপ মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ৫০০৲ টাকা মাত্র নিজের জন্য রাখিয়া তিনি ৫০০০৲ টাকা নিয়মিত প্রতি মাসে দান করিয়াছেন। আবার দেশের মহৎ কার্যগুলির জন্য সাধারণের কাছেও অর্থ-প্রার্থী হইতেন। তাঁর এই কর্মবহুল জীবনেও দেশ ও জনের হিতকামনায় Indians In British Industries প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজী পুস্তক তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অতলস্পর্শী

শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত

নয়ন মাঝে মূরতি তব, মুদিলে আঁখি দেখিতে পাই ;
হৃদয়-মাঝে পরশখানি, বাহিরে তোমার চিহ্ন নাই।
কল্প-লোকের অতীত তুমি, কল্পনাতে নাই যে তাই,
কামনার চরম—ওগো পরম প্রভু, তোমারে চাই।

জগৎ-জনের সৃষ্টিকারী, বসুন্ধরা তোমারই প্রাণ ;
মানব-আয়ু সলিল বায়ু সূর্য্য শশী তোমারই দান।
ধরার-দুঃখ-সুখের তারে সদাই বাজাও বীণার তান ;
মানবলোকের অশ্রু হাসি সে যে গো প্রভু তোমার গান।

মম এ প্রাণে দুঃখ দিয়ে আপন করি নাও হে নাও ;
আঁধার রাতে চলিতে পথে শকতি সাথে সাহস দাও।
হৃদয় মাঝে শতেক কাজে বসিয়া প্রভু যে গান গাও,
না দিলে দেখা, চলিতে একা আমারে তুমি চালায়ে যাও।

"শৈশব হ'তে বার্ধক্য অবধি আমাদের আমিত্ববোধ কিংবা স্বরূপত্বের কোন বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয় না। আমিত্ববোধের এই যে অবিচ্ছিন্নতা—একে পদার্থতত্ত্ব কি রসায়ণ-বিদ্যার নিয়ম-অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বেদান্তদর্শনের মতে—চিন্তা অনুভূতি অথবা বুদ্ধি, যান্ত্রিক বা আণবিক গতির ফলে উৎপন্ন হ'তে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে—গতি গতির সৃষ্টি করে। তা যদি হয় তো দেহের আণবিক গতি কেমন ক'রে চৈতন্য সৃষ্টি করবে? নিশ্চয়ই কোন: উচ্চতর শক্তির কল্যাণে তা সম্ভব হয়। এই শক্তিকেই তো সাধারণ ভাষায় বলা হয় 'আত্মা'। দেহের আণবিক বা রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রভাব আত্মার ওপর পড়ে না; এই আত্মাই সে-সব পরিবর্তনের কারণ। আত্মার কোন রূপান্তর বা মৃত্যু নাই।"

—স্বামী অভেদানন্দ

সংঘ-বার্তা

শ্রীগুরুপূর্ণিমা-উৎসব—বিগত ৬ই শ্রাবণ ১৩৬৩ (ইং ২২শে জুলাই ১৯৫৬) পূর্ণিমা তিথি দিবসে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে গুরুপূর্ণিমা উৎসব যথাবিধানে প্রতিপালিত হইয়াছে। এই পুণ্য তিথির উপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের আবাস-কক্ষে মঠের সাধুসন্ন্যাসিগণ এবং ভক্তবৃন্দ সমবেত হইয়া গুরুবন্দনা ও পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। বিধিবিহিতভাবে সেদিন শ্রীগুরু-পূজা ও অর্চনার পরে অনেকগুলি ভজনগান ও স্তোত্র পাঠাদি হইয়াছিল বেলা ১ টা অবধি।

ধর্মালোচনা—শ্রাবণ মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার হইতে শুক্রবার ক্রমান্বয়ে পাঁচদিন যাবৎ পণ্ডিত শ্রীযুত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য, সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সন্ধ্যা সাতটা হইতে একঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই ভাদ্র মাসেও সেই ভাবে পাঠ চলিতেছে।

শ্রীরামনাম সংকীর্তনাদি—শ্রাবণের প্রতি শনিবার সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ বেলা তিনটা হইতে দেড়ঘণ্টা যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে শ্রীরামনামকীর্তন ও বিবিধ ভজনগান করেন। বর্তমান মাসেও সেইরূপ হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথকতা—প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কথকশিরোমণি মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত" হইতে কথকতা করিতেছেন। গতমাসে কথকতার বিষয়বস্তু ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনপথে—তান্ত্রিক, রামাৎ প্রভৃতি সাধনা।

অভেদানন্দের জন্মোৎসব: ১২ই আশ্বিন, ১৩৬৩ (ইং ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬) শুক্রবার কৃষ্ণানবমী—শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ৯১-তম শুভজন্মতিথি। তদুপলক্ষে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ঐ তারিখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও তাঁহার বিশেষপূজাদি হইবে। কথকতা ও ভজনাদি করিয়া ঐ দিন তাঁহার পূতজীবনকথা আলোচিত হইবে। কীর্তনাদিরও ব্যবস্থা থাকিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে রাত্রি এগার ঘটিকা পর্যন্ত উৎসবের কার্য চলিবে।

বিশেষপূজা: ১৮ই আশ্বিন, ১৩৬৩ (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৬) বৃহস্পতিবার শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের শুভজন্মতিথি। তদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার বিশেষ পূজা হইবে।

শ্রীশ্রীশারদীয়াপূজা: (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে) ২৫শে আশ্বিন ১৩৬৩ (ইং ১১ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ শে আশ্বিন শনিবার—এই তিন দিন বেদান্ত মঠে জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর যথাবিধানে পূজার্চনা হইবে এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর কালী-কীর্তনাদির ব্যবস্থা থাকিবে। সকলশ্রেণীর ধনী নির্ধন নরনারী ভক্তবৃন্দ নির্বিবাদে যাহাতে মহামায়ার প্রতিমাপূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা হইতেছে।

নিবেদন

বিশ্ববাণীর যে গ্রাহকের যে টাকা আজও বাকী আছে তিনি তাহা অনুগ্রহপূর্বক যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া বিশ্ববাণী কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার সহায়তা করুন।

নিবেদক
কার্যাধ্যক্ষ—বিশ্ববাণী

॥ স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত ॥

শারদীয়া সংখ্যা

১৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য ৪৲ • প্রতি সংখ্যা ১৷০
এই সংখ্যার মূল্য ১৷০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা-৬

সম্পাদক স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯নি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

১।	সাকার না নিরাকার		৩২১
২।	মাতৃবোধন-প্রসঙ্গ		৩২২
৩।	দুর্গোৎসবে বাংলার বৈশিষ্ট্য	... স্বামী ভূমানন্দ	৩২৫

সূচীপত্র

৪।	শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গ	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৩৩১
৫।	বেদের স্বর	অধ্যাপক অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী	৩৩৯
৬।	সকামের পূজা (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু	৩৪৩
৭।	বৌদ্ধদর্শন ...	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৩৪৪
৮।	মাতৃপূজার অঞ্জলী	স্বামী ভজনানন্দ	৩৫৩
৯।	মহাবলীপুরম্‌কাঞ্চীপক্ষীতীর্থপথে (কবিতা) ...	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৫৪
১০।	হিন্দুধর্মের পুর্নসংজ্ঞা ...	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৩৫৬
১১।	আরতি (কবিতা) ...	শ্রীশাশ্বতীলাল দাস	৩৬২
১২।	ভাষা ও উপভাষা	অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর	৩৬৩
১৩।	নাট্যকার দীনবন্ধু ও 'সধবার একাদশী'	শ্রীঅনিল কুমার হালদার	৩৬৬
১৪।	কবি নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনা	অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায়	৩৭১
১৫।	রবীন্দ্রসঙ্গীতে অতীন্দ্রিয় সাধনার প্রজ্ঞা ...	শ্রীঅমিত ঘোষ ...	৩৭৭

শারদোৎসবে
আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

সূচীপত্র

১৬।	শেষের বন্ধু (কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৩৮৪
১৭।	রাবণবধের নেপথ্য ...	শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র	৩৮৫
১৮।	'পথের পাঁচালী'র অপু ...	শ্রীসন্তোষকুমার বসু	৩৯০
১৯।	স্বামী অভেদানন্দের স্মরণে	স্বামী বেদানন্দ	৩৯৫
২০।	স্বামী অভেদানন্দের তীর্থ-তীর্থে		৩৯৭
২১।	অভেদানন্দ বন্দনা (কবিতা)	শ্রীনলিনীবালা বসু	৩৯৮
২২।	রামকৃষ্ণঃ শরণম্ (কবিতা) ...	স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী	৩৯৯
২৩।	গীতার সাধনা ...	শ্রীকুঞ্জবন্ধু সেন ...	৪০১
২৪।	স্বামী ভজনানন্দ	শ্রী	৪০৫
২৫।	বঙ্গগৌরব জীমূতবাহন	অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ...	৪০৬
২৬।	এস মা আর্ত্তত্রাণকারিণী (কবিতা)	শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪০৯
২৭।	বিশ্বলীলার ধারা ...	শ্রীঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪১০
২৮।	সংসার ও প্রকৃতি (কবিতা) ...	শ্রীমতী সুষমা ঘোষ ...	৪১২
২৯।	জগজ্জননী মা ...	শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ...	৪১৩

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, বাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY & CO.

Dealers in:-

WEST END - FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ, বসু, এণ্ড কোং (ডেকরেটরস্)

৫২নং ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

ফোন :—বড়বাজার ১৬২৫

ডি, রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফটো
২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬
ফোন: ৩৪- ৩৭১১

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়
মোহিনী মিলস্ লিমিটেড
— ১নং মিল — — ২নং মিল —
কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)
এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লঙ্গুথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ
চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী
রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত
পেটেণ্ট
ইক্-মিক্ কুকার
ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অপূর্ব্ব-ব্রহ্মজ

স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় কথায় কথায় মাথা ধরা
টাকেট্ট অকার সহিত

সক্রিয় ষড়গুণ মকরধ্বজ

চরম-বিশ্লেষণের ফলে তাহার ক্ষেত্রশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি
পাইয়াছে সেইজন্য ইহা সমধিক মহৌষধ।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণমাত্রা) থাকে

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

বিবেক সমিতি

গ্রাম মনোহরপুর পোঃ ডানকুনি, জেলা হুগলী

পূজাপার্ব্বণ ও বিশেষ অনুষ্ঠানে এই সমিতির শুদ্ধাচারে প্রস্তুত সুগন্ধি গোলাপ, জেসমিন, চন্দন ও ধোড়শাঙ্গ ধূপকে মনে রাখবেন।

মূল্য প্রতি প্যাকেট—চার আনা ও ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান :

(১) ৬৯নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(২) দশকর্ম্ম ভাণ্ডার (বড়বাজার) ২০৯ হারিসন রোড
(৩) সমিতির শিল্প বিভাগ।

সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই

শুভবিবাহে কালের উপযোগী আধুনিক
রুচিসম্মত প্রাচ্যের অপূর্ব্ব
সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

বেনারসী

তসর . গরদ . মটকা
সিল্ক . টিস্ . শাড়ী

জহরলাল পান্নালাল

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা
ও গ্রাম বেনারস, অমৃতসর

সর্বপণ্য-শোভিত

ভারতের সর্ব্ববৃহৎ বিপণি

কমলালয় ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩

আধুনিক ডিজাইনের খাঁটী গিনি সোনার গহনা বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।
ফোন নম্বর : ৩৭—৩৯৮২

—পূজার উপহার—
বিনামূল্যে চায়ের কাপ ও ডিস
পাতা ও গুঁড়া চা—২৲ পাউণ্ড
Puja Spccial—২৸০ „
এক পাঃ চা কিনিলে বিনামূল্যে কাপ-ডিস দেওয়া হইবে।
জনপ্রিয় লুজ চা ব্যবসায়ী
মনোরমা টী কোং
৭৬।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

শর্ম্মা এণ্ড কোং
৬৬ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
আধুনিক রুচিসম্মত ও সস্তায় জুতা সরবরাহ করা হয়
●
বোম্বাই মেসার্স জে, জে, এণ্ড সন্স-এর
চপ্পল সকল সময়েই পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

NEW BOOK ON MUSIC :

SANGITASARA-SAMGRAHA

BY

GHANASHAM NARAHARI CHAKRAVARTY

Critically edited and Introduction by

SWAMI PRAJNANANANDA

Demy 8vo. Containing illuminating chapters on music, musical instruments, dance, drama, angaharas and chhanda,

For the first time this important book on Indian Music is being published from the Ms. of the early 18th century A. D.

Price : Rs. 7/8/-

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH – Calcutta-6.

নূতন বই বেরুলো

॥ শ্রীগিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত ॥

শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ

॥ শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলনের বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলী এবং দুষ্প্রাপ্য চিঠি ও প্রমাণ-পঞ্জী সম্বলিত।

॥ এইরূপ তথ্যবহুল পুস্তক ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি ॥

ডিমাই সাইজের ৮৫০ পৃষ্ঠা। দাম ১২॥০ টাকা

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলায় উনবিংশ শতাব্দী

॥ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী এবং তাঁহার দর্শন, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি মতবাদের সহিত তুলনামূলক আলোচনার একমাত্র বই ॥

মূল্য চার টাকা

নবভারত পাবলিশার্স ॥ ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

বিশ্ববাণী

অষ্টাদশ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৬৩ | অষ্টম সংখ্যা

সাকার না নিরাকার

"তা ঈশ্বর শুধু সাকার বল্লে কি হবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য, নানারূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুইই বলেছে, সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে।

কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গ'লে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে—ঠাকুর, তুমিই সাকার, তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্চ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে।

তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।

হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

মাতৃ-বোধন-প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

শরৎপ্রকৃতির মায়ের আগমনী-বার্তায় দিগ্‌দিগন্ত যখন রূপচকল, আনন্দোচ্ছল, যখন তৃণে তৃণে শ্যাম-রোমাঞ্চ ও বনে বনে কুসুম-শিহরন দেখা দিল, তখন সারাবৎসরের রুদ্ধশ্বসিত কলুষগ্লানি উৎসর্জন ক'রে আমরাও সমবেত হই পূজামণ্ডপে মাতৃপদপ্রান্তে। নববৈশাখের প্রাঙ্গণে যেমন নববর্ষের শঙ্খধ্বনি, তেমন বাংলার প্রশান্ত শরৎ-আকাশতলে শারদীয়ার প্রীতি-তরঙ্গ : এই শারদীয়া-তিথিতে আমাদের জাতীয় উৎসবের যে সার্বজনীনতা উপলব্ধ হয়, দেশব্যাপী অন্তর-বিনিময়ের যে মাহেন্দ্রক্ষণ দেখা দেয় এবং বাঙালীর আধিমানসিকতায় যে রূপোৎকণ্ঠা সহসা আবির্ভূত হয়—তা' যুগপৎ অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব। দারিদ্র্যের বিকট ব্যঙ্গও ঐশ্বর্যের সানাই-এর সুরে 'নাই। নাই।' ব'লে মূর্ছনা সৃষ্টি করে। তাই বলি, বিশ্বমাতৃত্বের বেদীমূলে দুর্গতি-নাশিনী দুর্গার শুভ উদ্বোধন—সে উদ্বোধনও জনজাগৃতির পটভূমিকায়; সেজন্য রূপাতীতের অরূপতা এবং সীমাহীনের সীমায় প্রকাশ উভয়ই সম্ভব এবং আপন অবয়ব অপসৃত হওয়াও আশ্চর্য নয়। দুর্গোৎসবই, আমাদের দেশে, একটামাত্র দৃষ্টান্ত—যা সর্বমিলনের বার্তা বহন করে আনে।

॥ ২ ॥

ভৌম বাংলার ঐ ভাবকুঞ্জাবনের তালা সাজিয়ে এই শরৎ-ঋতুর নূপুর-নিক্কণও অতি মধুর : একদিকে প্রাকৃতিক ভাবসমারোহ আর একদিকে মানসিক উল্লাস, এই দুইএর অপূর্ব সম্মিলনে সৃষ্টি হয় পূজা-মঞ্চের সার্থক প্রেক্ষাপট; আকাশ-বাতাস 'সুরার মত সুরভি' এবং পরাণও অঞ্চলবরণ, সুতরাং ভাবসম্মিলনের দুর্জয় বাধা আর নেই;—নেই যখন, তখন মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীতে রূপান্তরিত করা কি দুঃসাধ্য? পর্বতনন্দিনীর মধ্যে মানবকন্যার প্রতিভাস কল্পনা করা এবং মাতৃশিরাশোণিতের ঋণস্পন্দন অনুভব ক'রে অশ্রুসজল হয়ে ওঠা, তাঁর সুখদুঃখের অনিশ্চিত আশঙ্কায় চিন্তিত হওয়াও কি অত্যন্ত অস্বাভাবিক? আবার শাস্ত্রের বিধুরেখায় ঢাকিয়ে সেই উপনিষদের আর্ষদৃষ্টিলাভ, জগৎ-ব্রহ্মের ধারণা, অর্থাৎ ক্ষর-অক্ষরের অসীম অভিব্যক্তি এবং আকাশবাতাসের মধুমৎ স্পর্শ—সেই 'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—এই চেতনাও স্বতঃ উদ্ভূত হয়। রূপ-কল্পনার দিক দিয়ে এই শক্তিরূপিনীর মধ্যে, রূপোন্মাদনার মধ্যে একটা কান্ত, বরাভয়, প্রশান্ত মূর্তি—যা অন্য কোনও দেবদেবীকল্পনায় এতটা প্রকাশিত হয় নি, তাতে শুধু বাহ্যচক্ষুই নয় অন্তশ্চক্ষুও পরিতৃপ্ত হয়। ঐতিহাসিকতার বাতাবরণে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির ও কৃষ্টিগত যে রাখীবন্ধনের ইঙ্গিত এখানে রয়েছে, ধর্মও দেশ-নৈতিকতার মর্মমূলে তা' নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছে এবং সার্বভৌম ধ্যানতন্ময়তায় সর্ববিধ সাম্প্রদায়িকতাও নিশ্চিহ্ন। শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে ভিন্ন ভিন্ন অসুরগণকে মহামায়া যখন নিধন করলেন তখন দেবগণ কর্তৃক তাঁকে যে স্তুতি-নিবেদন করা হয়েছে সেই স্তবেই একথার

যাথার্থ্য প্রমাণিত : জড় ও চৈতন্যের, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রাণমূলে যাঁর অধিষ্ঠান তাঁর কথাই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাবলীর মর্মবস্তু।

॥ ৩ ॥

'দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥' ১

—'হে শরণাগতদুঃখহারিণী! প্রসন্না হও। হে অখিল জগতের জননি! প্রসন্না হও। হে বিশ্বেশ্বরি! প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমিই এই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বরী, অতএব তুমিই বিশ্বকে রক্ষা কর।'

'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে ॥' ২

—'হে অলঙ্ঘ্যবীর্যে! যেহেতু তুমি মহীস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ, অতএব জগতের একমাত্র তুমিই আধারভূতা। জল-স্বরূপে অবস্থান করিয়া এই সকল বিশ্ব তোমাকর্তৃক সংবর্ধিত হইতেছে।'

'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥' ৩

—'তুমি অনন্তবীর্যা-বৈষ্ণবীশক্তি, অতএব সংসারের মূলকারণ পরমা মায়া তুমি। হে দেবী! এই সমস্ত বিশ্ব তোমাকর্তৃক সম্মোহিত রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে প্রসন্না হইয়া তুমিই আবার মুক্তির হেতু হও।'

'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥' ৪

—'হে দেবি! সমস্ত বেদাদি বিদ্যা আর জগতের যাবতীয় মোহিনী স্ত্রীশক্তি সকলই তোমার মূর্তিবিশেষ। তুমি একাই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমাকে স্তব করা কি করিয়া সম্ভব হয়? কেননা, স্তবনীয়ের পরাপরোক্তিই স্তব।'

'সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বাং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ।
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥' ৫

—'যখন তুমি সর্বভূতস্বরূপা, দীপ্যমানা এবং তুমি স্বর্গ ও মুক্তি প্রদায়িত্রী, তখন তোমার স্তব করিতে আবার পরম উক্তি কি হইতে পারে? হে সকলহৃদয়াবস্থিতে বুদ্ধিরূপে! হে স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনি দেবি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।'

'বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥' ৬

—'হে দেবি! যেহেতু তুমি বিশ্বেশ্বরী, সেইজন্য এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ; যেহেতু তুমি বিশ্বাত্মিকা, সেইহেতু এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি বিশ্বেশ্বরেরও বন্দনীয়া। যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রতি ভক্তিবিনম্র হন, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয় হন।'

তাই—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'[৭]

—'যিনি চৈতন্যরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমো নমঃ।'

॥ ৪ ॥

এই বিশ্বাত্মিকা দেবীর মধ্যে, আর একদিকে অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অসীম পরিতৃপ্তি, জীবনের ঐকান্তিকতার যে নশ্বরতার বেদনা অহর্নিশ আমাদিগকে অধীর করে তোলে তার চরম নিবৃত্তি এঁরই পদপ্রান্তে হয়—তাই তিনি ভক্তকল্পলতিকা। রামায়ণের রামচন্দ্রের অভীষ্টই তিনি শুধু পূরণ করেন না, সুরথ রাজারও মনোভিলাষ তিনি পূর্ণ করেছেন। আমাদের জাগতিক দুঃখ-দৈন্য হরণ ক'রে আমাদের অভিলষিত বরপ্রদান করেন। তাই আজ মাতৃ-বোধনের প্রারম্ভ-ক্ষণে প্রার্থনা করি— 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।'

॥ ৫ ॥

আমাদের সংসার আবার হাসিতে ভরে উঠুক, মর্ত্যলোকের ধূলিকণায় নিহরন সঞ্চার করে আবার উঠুক দুন্দুভি, দুর্মিষ্ট কণ্ঠস্বর। বাঙালীর আধি-মানসিকতায় উল্লাস ও উদ্দীপনার অনুভূতি জন্ম দিক্ সার্থক শিল্পায়নের। ধ্যানের অতীতলোকে সারা বৎসর যা' ছিল, আজ তা মূর্তি পরিগ্রহ করলো বাস্তবের রুঢ় আলোকশিখায়। বাংলার পল্লীর দুয়ারে দুয়ারে ভিখারীর খঞ্জনীর কলস্বনে যে অমার্জিত হৃদয়ের অনাবিল প্রকাশ লক্ষ্য করেছি, আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করি। লোকসাহিত্যের অন্তরালে যে মানসপ্রকাশ আছে তা কি আমরা কোনদিন বিশেষভাবে অনুভব করেছি? কাব্যের সেই 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'—রসসম্বলন ক্ষমতাই তার উৎস-স্বরূপ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনেও সেই অসংখ্য গণমানস অপরিবর্তনীয়ই আছে, সুতরাং বোধন ও শারদীয়া উৎসবের গভীর-চারী স্রোতঃসন্ধান করতে হলে এর সন্ধান আমাদের করতেই হবে এবং শহর কোলকাতার বুকে কৃত্রিম আলোকের মৌখিক অভ্যর্থনায় নয় পল্লীর নিরাড়ম্বর পরিবেষ্টনীতেই উপলব্ধ হবে এই উৎসবের অন্তর্দেশ। কারণ, মা স্বয়ং শক্তিস্বরূপিনী হলেও শক্তির চাদায় তাঁকে বাঁধা যায় না, বাঁধা যায়—ভক্তির নৈবেদ্যে।

"মা জাঁকজমক চাহেন না, শুদ্ধাভক্তি চাহেন। তোমরা ভক্তির সহিত যাহা করিবে তাহাতেই তিনি প্রসন্না হইবেন। বর্ত্তমানে রাজসিক জাঁকজমক লইয়া আসল সাত্ত্বিক পূজা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।"

—স্বামী অভেদানন্দ

দুর্গোৎসবে বাংলার বৈশিষ্ট্য

স্বামী দুর্গানন্দ

ভারতের বহুস্থানে বহুপ্রকার প্রতিমা গঠন করিয়া দুর্গাদেবীর অর্চনা হইলেও বঙ্গদেশের প্রতিমা গঠনে একটা বেশ সুষ্ঠু পরিবেশ দেখা যায়। শুধু সিংহবাহিনী দেবী দুর্গাই বাংলায় পূজিতা হন না; এখানে শ্রীদুর্গার সহিত ঐশ্বর্যরূপিনী দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যারূপিনী দেবী সরস্বতী, জ্ঞানঘনমূর্তি সর্ববিঘ্ননাশক বিনায়ক বা গণেশ এবং দেবসেনাপতি কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবীর এবং দেবগণেরও পূজা হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, এই সঙ্গে পুরাণোক্ত মহিষাসুর বধেরও কাহিনী সন্নিবিষ্ট আছে। এই উৎসব উপলক্ষে শুধু দেবতাগণই যে পূজা পান, তাহা নহে, তাঁহাদের বাহন, এমন কি—অসুরাদিও পূজিত হইয়া থাকেন।

অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এ প্রতিমার রহস্য। যেন মনে হয়, জন সমাজে জনগণের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্যই এই রহস্যময় প্রতিমার পূজার প্রয়োজন রহিয়াছে। সমাজে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিতে হইলে যেন এই আদর্শই চাই। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন অর্থবল, সুতরাং তাহার প্রতীক হইলেন—লক্ষ্মীদেবী; চাই বিদ্যা, সেইজন্য তাহার প্রতীক বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী; জনকল্যাণ সাধনে যে উদারতা ও জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন, তাহার প্রতীক হইলেন,—সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং যে শক্তির বলে যাবতীয় ঐশ্বর্য শত্রু-কবল হইতে রক্ষিত হয় তাহার প্রতীক দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়। পূজায় যদি এই সকল দেবতার একত্র সমাবেশ ও কৃপাদৃষ্টি থাকে, তবেই মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার আবির্ভাব হয় এবং তিনি অরাতি সংহার করিয়া তাঁহার শরণাগত সন্তানদের রক্ষা করিয়া থাকেন।

কথিত আছে মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক-ভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ করিবার জন্য রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজ-পুরোহিত পণ্ডিতবর রমেশ শাস্ত্রীর সহিত পরামর্শ করেন। রমেশ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে চারিটি মহাযজ্ঞের উল্লেখ আছে, যথা:—বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ। কিন্তু কলিযুগে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়া রমেশ শাস্ত্রী উদয়নারায়ণকে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তাহার পর কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন। ঐ পূজা বসন্তকালে হইয়াছিল। চণ্ডীতে কথিত আছে, রাজা সুরথ বসন্তকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। তাই নাম বাসন্তী-দুর্গোৎসব। শারদীয়া পূজার পুরাণোক্ত ঘটনা পরে উল্লেখ করিব।

রমেশ শাস্ত্রী দুর্গাপূজা পদ্ধতিও লিখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব তত্ত্ব লিখিয়া দেবী পূজার বিধি ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশীয় বর্গীসর্দার রঘুজী ভোঁসলেও (বিরারের রাজা) বঙ্গদেশে চৌথ আদায় করিতে আসিয়া কাটোয়া নগরে (বর্তমান বর্ধমান জেলা) বাংলার প্রথানুসারে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগে আর্য ঋষিদের মধ্যে শক্তিপূজার যে প্রচলন ছিল, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে উক্ত ১২৫তম দেবী সূক্তই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহা ছাড়া ১২৭ তম সূক্তটি 'রাত্রি-সূক্ত' নামে কথিত। ইহাতে রাত্রিদেবতাকে বাক্, সরস্বতী, অদিতি ও দুর্গাদেবী বলা হইয়াছে। ফলে সেই একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশকে এক একটি বিশেষ নামে, যথা—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, ভদ্রকালী, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং অদ্যাবধি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র সেই মহাশক্তিরই বিভিন্নরূপে—আরাধনা হইতেছে। মাতৃভাবে শক্তিপূজা বৈদিকযুগ হইতে কেবল ভারতেই প্রচলিত আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই ভাবে ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া পূজা করিতে দেখা যায় নাই।

কিরাত জাতির মধ্যে দেবী দুর্গা ও চণ্ডীদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। সেইজন্য চণ্ডীর আর একটি নাম 'কিরাতিনী'। পদ্ম পুরাণে আছে,—"ব্রহ্মার অনুরোধে রাত্রিদেবী হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাহার গৌরবর্ণকে ঢাকিয়া কৃষ্ণবর্ণা হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।" ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বৈদিক রাত্রিদেবীই পুরাণে পার্বতীরূপে গৃহীতা ও পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। মেনকার কন্যা উমা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করেন; সেইজন্য মেয়েরা উক্ত তিথিতে উমা চতুর্থী ব্রত পালন করেন।

কালিকাপুরাণোক্ত উমা কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। শিবের সহিত বিবাহ হইবার পরে শিব একদিন উর্বশী প্রভৃতি সুন্দরী অপ্সরাদিগের সম্মুখে উমাকে বার বার 'কালী-কালী' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। ইহাতে উমা আপনাকে অপমানিতা বোধ করিয়া নিজের গায়ের কৃষ্ণবর্ণ মোচনের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্তা হন। এবং ব্রহ্মার বরে কৃষ্ণকলারূপ কোষ (খোলস) ত্যাগ করিয়া গৌরী অর্থাৎ গৌরবর্ণা হইয়াছিলেন। এই কারণে উমার অপর একটি নাম 'কৌষিকী।' বেদের রাত্রি দেবী কৃষ্ণবর্ণা, তিনিই 'কালী' নামে অদ্যাবধি রাত্রিতে পূজিতা হইয়া থাকেন।

দুর্গার আর এক নাম 'কাত্যায়নী'। পুরাণে বর্ণিত আছে,—'মহর্ষি কাত্যায়ন' নামে একজন মুনি হিমালয়ে তপস্যা করিতেন। একদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার আশ্রমে আসিয়া মহিষাসুরের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বধের জন্য নিজ নিজ দেহ হইতে শক্তি বাহির করিয়া এক দেবীকে সৃষ্টি করেন। সেই দেবীকে মহর্ষি কাত্যায়ন প্রথমে পূজা করেন, আর সেই জন্যই দুর্গার নাম কাত্যায়নী হইয়াছে। সেই দুর্গাদেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন এবং শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়ন দ্বারা পূজিতা হইয়াছিলেন এবং দশমীতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে,—রামচন্দ্র যে অকাল-বোধন করেন, তাহাও আশ্বিন মাসে। এই দুর্গাদেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিরূপিণী। আবার ইনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া, ইনিই শেষনাগ-শয়নশায়ী নারায়ণের অঙ্গে সম্ভূতা হইয়া নারায়ণকে যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাঁহাকেই আদ্যাশক্তি মহাকালী বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে জ্যোতিষ্মতী যজ্ঞের কথা আছে তাহাতে যে যজ্ঞকুণ্ড রচনা হইত, তাহার নাম দক্ষ-তনা—দক্ষতনয়া অথবা দক্ষসুতা। তাহার উপরে একটি শীত-বর্ণের মূর্তি স্থাপন ও সেই

মূর্ত্তিটিকে 'জ্যোতিষ্মতী অগ্নি' অথবা 'হব্যবাহনী' বলিয়া কল্পনা করা হইত। এই হব্যবাহনী দেবী আহুত হবি দেবতাদের উদ্দেশে বহন করিতেন বলিয়া বিশ্বাস। এই হব্যবাহনী দেবীই পরবর্তীকালে দুর্গাদেবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, "বৈদিক যজ্ঞ যেমন দক্ষ-কন্যা বা দক্ষতনয়া নামে অভিহিতা হইতেন তেমনি আবার বৈদিকযুগের শেষের দিকে যজ্ঞাগ্নিকে শিব বা মহাদেব বলিয়াও কল্পনা করা হইত। বেদের রুদ্র অগ্নি এবং এই রুদ্রই শেষে শিব নামে পরিচিত হইয়াছেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ বিশেষতঃ অশ্বমেধ পরবর্তীকালে ছদ্মবেশে দুর্গোৎসবে পরিণত হইয়াছে।"

উপনিষদ ও পুরাণে অশ্বমেধের অশ্বকে সূর্য ও অগ্নি বলাও হইয়াছে। সূর্য ছিলেন একমাত্র উপাস্য এবং তাঁহারই প্রতীক হিসাবে অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করা হইত। ইহার পূর্বে অবশ্য রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। তাহারও পূর্বে অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদিরও প্রচলন ছিল। যাহা হউক সূর্য পূজাই ক্রমশঃ নবগ্রহ পূজায় পরিণত হয় এবং তাহা পরে সুরথ রাজার সময় বাসন্তী-দুর্গারূপে রূপান্তরিতা ও পূজিতা হইয়াছেন। সুতরাং সূর্য বা মিত্র পূজাই যে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া শ্রীদুর্গা এমন কি সমস্ত দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মিত্র পূজার জন্মভূমি ভারতবর্ষ। এখান হইতেই এই ভাব পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছে। গ্রীকদের—'হেলিয়স্', রোমকদের—'সোল', পারসিকদের 'মিত্র' বা 'মিথু', ক্যালডিয়াবাসীদের—'বোল' বা 'বেল' কানানাইটদের—'মোলক', ইজিপ্টবাসীদের 'রা, ও সাইরিস, 'হোরাস বা থ' ইহারা সকলেই ঐ এক মিত্র দেবতার বা সূর্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ। বেদে মিত্র দেবতার আর এক নাম বিষ্ণু, তিনি সহস্র শীর্ষ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ও পূজিত হইয়া থাকেন।

এই মিত্র বা মিথু দেবতাই বাংলায় ইতুদেবতা হইয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসেই 'ইতু-পূজার' প্রচলন আছে। পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে এই উদ্দেশ্যেই ইতুপূজার প্রচলন। ইনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি আদ্যাশক্তি এবং এই আদ্যাশক্তিই দুর্গাদেবী। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা জটাজুট সমন্বিতা মহিমাময়ী এই দেবী সূর্য দেবতার প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নরূপকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। দশদিক ব্যাপী সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিই শ্রীদুর্গার দশভূজ রূপে কল্পিত হইয়াছে এবং প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন জ্যোতিই দেবীকে ত্রিনয়নারূপে সুশোভিত করিয়াছে।

জীব ও জগৎ প্রসব করেন, পোষণ করেন এবং নাশ করেন বলিয়া সূর্যের একনাম সবিতা সুতরাং দেবীদুর্গাও সবিত্রী বা প্রসবিত্রী। সাবিত্রী বলিয়া ইনি পূজিতা। পর্বতের গহ্বর হইতে সূর্য উদিত হন এজন্য দুর্গাকে পর্বত দুহিতা বা পার্বতী, গিরিজা, শৈলসুতা প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয় এবং তিনি শিবের সহধর্মিণী বলিয়া চণ্ডী, চামুণ্ডা, কালী, কপালিনী, ভবানী, বিজয়া গৌরী ইত্যাদি নামে পরিচয় দেওয়া হয়। জগজ্জননী তিনি 'আম্মা' বা 'উমা'। উমাই মেনকার কন্যা। এই উমাকে 'মা' বলিয়াই ভারতবাসী হিন্দুগণ শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন ও অর্চনাদি করিয়া ধন্য হন এবং তাঁহারই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ বা প্রতীকরূপে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিকে তাঁহার পুত্র কন্যারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদেরও পূজা

দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলার এই দুর্গোৎসবের আয়োজন যে সত্যই মহত্তময়, এই বিচিত্র কাহিনীগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যে ব্রহ্ম-শক্তি বিশ্বাতীতা তিনিই বিশ্বজননী চিন্ময়ী মহামায়া। তাঁহার সৃষ্ট জগতে তিনি বিশ্বোত্তীর্ণা নহেন। বিশ্বের প্রত্যেকটি ধূলিকণাতেও তাঁহার স্নেহ মমতা ও অকৃত্রিম ভালবাসা যেন নিবিড় সম্বন্ধে মিশিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের সন্তানগণের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য তাঁহাকে আপনা হইতেও আপনার করিয়া রাখিয়াছে। সহস্র কিরণমালী সূর্যরশ্মির মত তাঁহার করুণাধারা প্রবাহিত হইয়া সমানভাবে যেন সর্বত্র প্লাবিত করিতেছে। তিনি একাধারে ভয়ঙ্করী ও ক্ষেমঙ্করী হইলেও শরণাগত সন্তানের প্রতি সর্বদাই তিনি ক্ষেমঙ্করী। করুণাময়ী দশভুজা মূর্তি প্রলয়কালে হয়তো আরও ভীষণ হইতে পারেন, হয়তো তিনি সহস্র হস্তে সহস্র প্রহরণধারিণীরূপে আবির্ভূতা হইতেও পারেন, কিন্তু তাহা হইলেও সন্তানগণের প্রতি তাঁহার অপার করুণার অভাব কোন দিনই হইবে না। শত্রুর কাছে ভীষণ হইলেও সিংহ-শাবকের কাছে সিংহিনী যেমন কোন সময়েই ভীষণা নয়, তেমনি অসুরগণের সম্মুখে ভীষণা হইলেও জগন্মাতা তাঁর সন্তানগণের কাছে সর্বদাই করুণাময়ী।

পরিশেষে বক্তব্য,—ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঋতুতে মহাশক্তি দুর্গার মাতৃভাবে আরাধনা এবং উৎসবাদির প্রচলন থাকিলেও বসন্ত ও শরৎকালে বাংলার হিন্দুগণ তাঁহাকে কন্যারূপেই গৃহে আনয়ন করেন এবং সাধ্যানুসারে পূজার্চনা করিয়া আনন্দোৎসবে উল্লসিত হইয়া থাকেন।

গিরিরাজমহিষী মেনকা যেমন বৎসরান্তে হৈমবতী উমাকে কৈলাসপতি মহাদেবের আলয় হইতে নিজালয়ে আনয়ন করিয়া আনন্দোৎসব করিতেন,বাংলা দেশের জননীরা দুর্গোৎসবে সেই ভাবটিই ফুটাইয়া তোলেন। শুধু তাহাই নয়, ভাবে ও ভাষায় এবং আবাহন ও নিরঞ্জনে কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনয়ন ও পুনরায় শ্বশুরালয়ে প্রেরণের সমুদয় অভিনয়টী ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। বাঙ্গালী গৃহস্থের এইটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। মানুষ যতপ্রকার সম্বন্ধ লইয়া সমাজবদ্ধ হয় ভগবানের সহিত ততপ্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে চায়। এইভাবে ভগবানের উপাসনাই ভক্তের পক্ষে সহজসাধ্য। তন্মধ্যে মাতৃভাবের উপাসনা নির্দোষ এবং পুত্রকন্যারূপে বাৎসল্য প্রেমে উপাসনা আরও সহজ, অতীব মধুর। মা যশোদার বাৎসল্য প্রেমের তুলনা নাই এবং কন্যারূপে মেনকারাণীরও বাৎসল্য প্রেম অতুলনীয়। মেনকা তাঁহার আদরের মেয়েকে বৎসরান্তে ঘরে আনিবেন তাই সারা বৎসর উৎসুক চিত্তে ব্যাকুল হইয়া দিনগণনা করিয়া কাটাইতেছেন। এমন কি সময় সময় ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া গিরিরাজের কাছে গিয়া আকুল আবেদন জানাইয়া বলিতেছেন—"যাও যাও গিরি আনতে গৌরী উমা আমার বড় কেঁদেছে।" কখনও ভিখারী জামাতার কথা চিন্তা করিয়া এবং মেয়ে কষ্টে আছে ভাবিয়া জামাতার প্রতি কপট অভিমানভরে বলিতেছেন "ওহে গিরিরাজ! গৌরী অভিমান করেছে। মনদুখ নারদে কত না করেছে।" "মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য ধরে, জামাই যাকি ভিক্ষা করে, এবার নিতে এলে পরে, আর উমারে পাঠাব না। এবার মারে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানবনা।" আবার কখন উমাকে আনিবার

কল্পনা করিয়া বলিতেছেন, "গিরি! গণেশ আমার শুভকারী, পূজে গণপতি শেলাম হৈমবতী, যাও হে গিরিরাজ আন গিয়ে গৌরী। বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে যোগন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন। এবার ঘরে আসব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী।"

বাংলার সাধককুলের এইসকল অমূল্য আগমনী-সঙ্গীতে উমার প্রতি মেনকার কি অকৃত্রিম ভালবাসা, কি অলৌকিক স্নেহের টান, মেয়েকে কাছে পাইবার কি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা, প্রত্যেকটি যেন কল্পনায় ভরা! এই প্রাণমাতানো সঙ্গীত পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে। এইভাবের আগমনী, বাউল সঙ্গীত ও সংকীর্তন—এগুলি বাংলার নিজস্ব সম্পদ। শুধু কন্যাকে আনিলেই আনন্দোৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে না, তাই যেন কন্যার পুত্রকন্যাদিগকেও সঙ্গে আনিতে হইবে। ইহাই বাংলার দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য। বাংলার নরনারীর প্রাণ শরতের প্রারম্ভে শ্রীদুর্গার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মেঘমুক্ত শরতের মধুরিমা যখন আকাশ-বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে তখনই ভারতের হৃদয়ে আগমনীর সুর বাজিয়া উঠে। জগজ্জননী দুর্গা ধবল তুষার কৈলাস-শিখর হইতে তখনই বাংলা-মায়ের কোলে নামিয়া আসেন। সঙ্গে থাকেন শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। শুক্লাপঞ্চমী হইতে নবমী পর্যন্ত মায়ের ঘরে মার যত্ন আদর ও সকলের পূজা গ্রহণ করেন এবং দশমীতে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন। ভক্ত মা-দুর্গাকে এইরূপে বাৎসল্য প্রেমের মধ্য দিয়া আরাধনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, সকল বন্ধন তার খসিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় ও তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

আমরা সাধকপ্রবর মহাত্মা কমলাকান্তের দুইটী প্রাণস্পর্শী আগমনী-সঙ্গীত এইসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কন্যা উমার শিবের সংসারে দুঃখকষ্টের সংবাদ নারদের মুখে শ্রবণ করিয়া মাতা মেনকা গিরিরাজের কাছে কাতর প্রাণে নিবেদন করিতেছেন:

রাগিনী-সুরট-সিন্ধু, তাল—ধিমা তেতালা

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে—
মনদুখে নারদে কত না কয়েছে।
দেব দিগম্বরে সঁপিয়া আমারে মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে।
হরের বসন বাঘ ছাল, ভূষণ হাড়মাল জটায় কাল ফণি দুলিছে,
শিবের সম্বল, ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারই মন ভুলেছে।
একে সতিনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে,
তাহা সুরধুনী, স্বামী সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।
কমলাকান্তের নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লয়েছে।
তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী ভিখারীর ভিখারিণী হয়েছে।

রাণী মেনকাকে প্রবোধ দিবার ভঙ্গিতে গিরিরাজ কেমন উচ্চাঙ্গের ভাবপূর্ণ উত্তর দিতেছেন যাহা শুনিলে প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া যায়।

রাগিনী—যোগিয়া, তাল—জলদ তেতালা

যারে যারে কহ রাণী, গৌরী আনিবারে।
জান ত জামাতার রীত অশেষ প্রকারে।

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ফণেক বাঁচয়ে ফণি
তভোধিক শূলপাণি ভাবে উমা মা'য়ে।
ভিলে না দেখিলে ময়ে, সদা রাখে হৃদি পরে,
সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে॥
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর কায়া,
সে অবধি শিবজায়া বিচ্ছেদ না করে॥
অবলা অল্পমতি, না জানে কার্যের গতি,
যাব—কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সাথে দেহ
তার মা বটে, মানাদে যদি আনিবারে পারে॥*

* স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 'শ্রীদুর্গা' হইতে এই প্রবন্ধের কিছু কিছু উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

"আমি জগতের যে সকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতিসমূহের তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে,—আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক, এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলিই—তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য-প্রণালী বিচার করিলে দেখা যায়—মানব-জাতিকে সুখী করিবার সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। এই কারণেই আমি কোনরূপ সংস্কার চাহি না। আমার আদর্শ—জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি। যখন আমি আমার দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তখন সমগ্র জগতে আমি এমন দেশ দেখিতে পাই না—যাহা মানবমনের উন্নতি বিধানের জন্য এত করিয়াছে। এই কারণেই আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্দা বা গালাগালি দিই না। আমি আমার জাতিকে বলি,—'যাহা করিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গ

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মানুষের দেহ ধারণ। জগতের হিতসাধন অর্থে জগতের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা। জগতের বিশালত্বের বিষয় চিন্তা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, জগতের অনন্ত দুঃখ মানুষ তার স্বল্প শক্তির দ্বারা দূর করতে কখনও সক্ষম হয় না। তবুও ঐ সামান্য শক্তি জগতের হিতসাধনে নিয়োজিত করতে হবে, উহার দ্বারা কাঠবিড়ালীর সাগর-বন্ধনে সহায়তা করার ন্যায় যতটুকু জগতের মঙ্গলসাধন করা যায়। তবে এই যে জগৎ সেবার আয়োজন উহার একটী সুমহান ফল আছে, সেটি হ'চ্ছে আত্মশুদ্ধি। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয় এবং একমাত্র চিত্তের শুদ্ধতাই মুক্তিলাভের দ্বারস্বরূপ। কর্মমীমাংসাশাস্ত্রোক্ত ফলপ্রসূ কর্মবাদ বর্ত্তমানযুগে অচল। বর্ত্তমানযুগে নিষ্কাম কর্মযোগের সহিত জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধনই যুগধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্ম আধুনিক হ'লেও উহা চিরপুরাতন। আমাদের শাস্ত্রশিরোমণি উপনিষৎ আমাদিগকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। একমাত্র উপনিষদের অনুশীলন করলে জ্ঞানলাভ করবার জন্য আমাদের আর শাস্ত্রান্তরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না। একমাত্র বেদ বা উপনিষৎ গ্রন্থকে অবলম্বন করে আমাদের দেশে বহু বহু শাস্ত্র রচিত হ'য়েছে। এমন কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থের নাম করা যাচ্ছে, যাদের মধ্যে একটি মাত্রকে আশ্রয় করলেই প্রয়োজনীয় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করা যায়। উত্তরমীমাংসা, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মহানির্বাণ তন্ত্র, দেবীভাগবতের অন্তর্গত দেবী গীতা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব কথোপকথনমূলক ১১শ স্কন্ধ —এইরূপ কয়েকখানি অতি গৌরবময় শাস্ত্র। যাঁর সময় অল্প তিনি এইগুলির মধ্যে যে কোন একখানিকে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করবার জন্য অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই সফলকাম হবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণুভাগবতকে মুখ্যতঃ ভক্তিশাস্ত্র বলা হ'লেও উহা জ্ঞান ও ভক্তির একখানি অতি উচ্চাঙ্গের সমন্বয়-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবগণের অতিশয় প্রিয়। ভাগবতেই বলা হয়েছে—শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং। ভাঃ ১২।১৩।১৮। এই মহাপুরাণখানি একখানি উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-গ্রন্থ বটে সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। ভাঃ ১২।১৩।১২ (শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্ব্ববেদান্তের সার সন্নিবেশিত হ'য়েছে।) আরও বলা হ'য়েছে :

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্।

—(ভাঃ ১২।১৩।১০)

১ (সর্ব্ববেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ যে বস্তু তাহাই এই পুরাণের বিষয় এবং কৈবল্যলাভই

এই পুরাণের প্রয়োজন।) ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যে ইহা একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলারই নেই। শ্রীভগবান জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও ভক্তরাজ উদ্ধবকে বল্‌ছেন :

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
—(ভাঃ ১১।১৪।১৯)

(আমার প্রতি প্রবৃদ্ধা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করতে পারে, যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা কিম্বা দান আমাকে সেরূপ বশীভূত করতে পারে না।) ভাগবত ত্রিবিধ যোগের নিরপেক্ষ সমালোচনা করে বল্‌ছেন :

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাং॥
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

(কর্ম্মে অনাসক্ত বাসনাহীন সর্ব্বোচ্চ অধিকারীর জন্য জ্ঞানযোগ, অবিরক্ত ও চিত্তশুদ্ধিকামীদের জন্য কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরক্ত নন আবার কর্ম্মে একান্ত আসক্তও নন, তাঁর পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হ'য়ে থাকে।) জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম বা ভক্তিযোগের যে কোন একটীকে আশ্রয় কর্‌তে হ'লে গুরুর সাহচর্য্য আবশ্যক। জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণজী উদ্ধবকে বলেছেন :

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
—(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

(ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে মৎস্বরূপ বলে জানবেন, তাঁকে কখনও অবজ্ঞা করবেন না, মানুষবোধে তাঁর ওপর দোষারোপ কর্‌বেন না, কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।) সেই গুরু কিরূপ ? ভাগবত বলেন :

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
—(ভাঃ ১১।৩।২১)

(যিনি শব্দ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও উপশম-অবলম্বী তিনিই গুরু)। অতএব উৎকৃষ্ট মঙ্গল জানিতে ইচ্ছুক শিষ্য তাঁর শরণ গ্রহণ করবেন।

এইবার, ভাগবতে জ্ঞানযোগ বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় তার সারসংক্ষেপ দেবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। জ্ঞানযোগের প্রধান আলোচ্য বিষয় আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, জগতের মায়িকত্ব ও মায়ার স্বরূপ, সংসার-বৈরাগ্য, ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবন্মুক্তি। আত্মাই একমাত্র সত্য, ত্রিকালে বর্ত্তমান এবং যে নানাত্ব দেখা যায় তাহা মায়ার কার্য্যমাত্র। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই যে তিন অবস্থা—উহা বুদ্ধিরই। চেতনস্বরূপ আত্মার যে এই তিনের প্রতীতি হয় ইহা মায়ার কার্য্য। আত্মাতে বিকারাদি হয়না। যথা :

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।
মায়ামাত্র মিদং রাজন্! নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি॥
—(ভাঃ ১২।৪।২৫)

. জীবাত্মা বাস্তবিকই নিরাকার, জ্ঞানমাত্রই তাঁর স্বরূপ। স্বীয় মায়ার প্রভাববশতঃ তিনি এই সব স্থূলরূপ ধারণ করেন। জীব পরমাবিদ্যা দ্বারা ভ্রম বুঝ্‌তে পারলেই আপনাকে জ্ঞানময় ব্রহ্ম বলে জান্‌তে পারে। আত্মা একমাত্র।

এক এব পরোহ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু তদাত্মানং চ ॥

—(ভাঃ ১১।১৮।৩১)

অর্থাৎ যেমন এক চন্দ্র নানা জলপাত্রে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মা প্রাণীসমূহে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন। সমুদয় ভূত একাত্মক এবং ঐকাত্ম্য দর্শনই জ্ঞান। আত্মাই বিশ্বরূপে সৃষ্ট হন ও স্রষ্টারূপে সৃষ্টি করেন, পালিত হন ও পালন করেন, লীন হন ও লয় করেন।

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥

—(ভাঃ ১১।২৮।৬)

অহঙ্কারের জন্যই জীবে শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা প্রভৃতি এবং জন্ম মৃত্যুর সংঘটন দেখা যায়, আত্মা স্বচ্ছস্বরূপ হওয়ায় উহারা আত্মার নহে। ঐগুলি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নহে, আত্মার উপর অধ্যস্ত। যথা :

শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্মমৃত্যুর্ন চাত্মনঃ॥

—(ভাঃ ১১।২৮।১৬)

আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে যে বিবেক, তাহাই জ্ঞান। জীবাত্মা নিত্যস্বরূপ। ইনি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান তিন কালেই বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অনিত্য। শরীরাদি অচেতন। আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ। যে পঞ্চভূতময় শরীর জন্মের পূর্ব্বে বিজ্ঞানস্বরূপ নয় ও মৃত্যুর পরও বিজ্ঞানস্বরূপ নয়, সেই পঞ্চভূতময় শরীর জন্ম ও মরণের মধ্য অবস্থায়ও বিজ্ঞানস্বরূপ হ'তে পারে না। জড় ব'লে দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত আত্মা নয়। আত্মা সত্ত্বাদি ত্রিগুণের সহিত সংযুক্ত হন না। যেমন ঘটটী ভগ্ন হ'লে ঘটস্থ আকাশ মহাকাশ স্বরূপ হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির দেহ বিলয়ে তিনি আবরণশূন্য হ'য়ে ব্রহ্মস্বরূপই হন।

ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথাপুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥

—(ভাঃ ১২।৪।৫)

প্রকৃতির কার্য্যরূপ দেহই জন্মগ্রহণ করে ও মরে। সেই দেহে যিনি আত্মা তিনি জন্মানও না, মরেনও না। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ ও নিত্য আকাশের ন্যায় অদৃশ্য, দেহাদির আধার, আদিশূন্য ও অবিকারী। এরূপ পদার্থ একটিমাত্র থাকতে পারে। ইহা অদ্বিতীয়।

অতএব জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। রাজা পরীক্ষিৎকে আত্মজ্ঞান দান করাই ভাগবত শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পরমহংসাগ্রগণ্য মহাত্মা শুকদেব তাঁকে বলছেন :

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে।
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥

—(ভাঃ ১২।৫।১২)

আমি ব্রহ্ম, দেহ হ'তে ভিন্ন আমি দেহের মত বিনষ্ট হব না। তক্ষক আমাকে দংশন করবে না। আমি পরমপদ ব্রহ্মই—' এইরূপ চিন্তা ক'রে পরমব্রহ্মে আত্মাকে যোজনা কর, দেখবে লেহনকারী বিষমুখ তক্ষক, দেহাদি বিশ্ব আত্মা হ'তে ভিন্ন নয়।

আত্মতত্ত্ব আলোচনার পর এইবার ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হ'চ্ছে। এই বিশ্বের হেতুভূত ব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত। যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বেও সুবর্ণ থাকে এবং ঐ দ্রব্য ভগ্ন হ'লে অর্থাৎ নাম ও রূপের বিলয়ে উহা সেই সুবর্ণই থাকে ; সেইরূপ স্থূলরূপে প্রকাশিত জগৎ থাকুক বা না থাকুক, ব্রহ্ম চিরকালই আছেন। কার্য্য ও কারণ মধ্যে কারণ নিত্য ও কার্য্য অনিত্য। কার্য্য ব'লে জগৎ অনিত্য এবং সর্ব্বকারণ ব'লে ব্রহ্ম নিত্য। অবিদ্যা সম্বন্ধশূন্য পরমাত্মাতে যে ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি ভেদ কল্পনা ইহা বাদিগণের বুদ্ধির ভ্রম। তাদের নিজবুদ্ধি ব্যতীত ঐ ভ্রমের আর কোন অবলম্বন নেই। যথা :

এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে।
আত্মন্নতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্ত হি॥

—(ভাঃ ১১।২৮।৩৭)

শ্রীভগবান নিজ স্বরূপ ও তাঁর মায়াশক্তি সম্বন্ধে বলছেন :

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥
শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥

—(ভাঃ ১১।১১।১-২)

(জীব সত্ত্বাদিগুণ জন্য বদ্ধ ; গুণত্রয় আমার প্রকৃতিমূলক বলে আমার মোক্ষ নেই এবং বন্ধনও নেই। আমার মায়ায় জীবের শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, দেহপ্রাপ্তি ও জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি হ'য়ে থাকে, স্বপ্নে যেমন নানা প্রকার দর্শন হয়। অতএব ইহা যথার্থ নয়।) মনের কল্পনা ও স্বপ্নাবস্থার বুদ্ধি যেমন মিথ্যা, তেমনই আত্মার বিষয়ভোগ, নানাজন্মলাভ ও সংসারও মায়াময় অর্থাৎ মিথ্যা। যথা :

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ! তথা সংসার আত্মনঃ॥

—(ভাঃ ১১।২২।৫৪)

আকাশ যেরূপ নিজের অন্ত পায় না, সেইরূপ ভগবান আপনিই আপনার মায়ার অবধি নির্দ্ধারণ কর্‌তে পারেন না। এই বিশ্ব তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট হ'য়েছে। প্রত্যগাত্মাতে বহুরূপতা মায়া মাত্র। সত্যে নানাত্ব নেই, উহা একমাত্র, কেবল। এই বাক্য ও মনের অগোচর, অবিভক্ত, সত্যস্বরূপ এক পরব্রহ্ম, সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষরূপে দুই প্রকার হন। প্রকৃতি কার্য্য ও কারণরূপিণী এবং জীব পুরুষ নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ ও জীবজগতের ধারক। কাল এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক। আর ব্রহ্মরূপ আমি—প্রকৃতি, জীব ও কাল এই ত্রিবিধস্বরূপ। এইজন্ত মূলতঃ আমিই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এখানে পূর্ণব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ, তাহাও বুঝান হ'য়ে গেল। উদ্ধব (ভাঃ ১১।৯।২৮) প্রার্থনায় বল্‌ছেন :

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্‌! স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌ বপুঃ॥

তিনি তাঁর মায়াকে আশ্রয় ক'রেই জগতে অবতীর্ণ হন। উদ্ধবের প্রশ্ন,—আত্মা চেতন, দ্রষ্টা ও বিশুদ্ধ, তাঁর সংসার হ'তে পারে না, দেহ অচেতন, কাষ্ঠের ন্যায় জড়, তারই বা সংসার হয় কি ক'রে? এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন যে—

যাবদ্দেহেন্দ্রিয় প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণং।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদ পার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ॥

—(ভাঃ ১১।২৮।১৩)

(যে কাল পর্য্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকবে, সেই পর্য্যন্ত সংসার অযথার্থ হ'লেও বিবেকহীন ব্যক্তির পক্ষে ফলবান হ'য়ে থাকে অর্থাৎ সে সংসার-ফল সুখ দুঃখাদি ভোগ করে।) স্বপ্নে যেমন নিজের শিরশ্ছেদ উপস্থিত হ'লেও বস্তুতঃ ঐ অনর্থ উপস্থিত হয় না, সেইরূপ অনিত্য দেহাদি না থাকলেও অবিবেকী ব্যক্তির পক্ষে সংসারপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে। উহা বিবেকী ব্যক্তির মোহ জন্মাতে পারে না—যেমন স্বপ্ন জাগ্রত ব্যক্তির মোহ জন্মাতে পারে না।

১১শ স্কন্ধের ২৬শ অধ্যায়ে ঐলগীত বর্ণন প্রসঙ্গে বৈরাগ্য সম্বন্ধে উপাদেয় উপদেশসমূহ আছে। দেহ সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে ইহা অতি মলিন, দুর্গন্ধাদিযুক্ত ও অপবিত্র। ইহা ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত সকল অবস্থায় তুচ্ছ। বিবেকবিহীন ব্যক্তিই এইরূপ দেহের মোহে আকৃষ্ট হয়। অর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে।
নাশোপভোগে আয়াসত্রাসচিন্তা ভ্রমো নৃণাম্॥

—(ভাঃ ১১।২৩।১৪)

(অর্থের উপার্জ্জনে, উহার বৃদ্ধিতে, রক্ষায়, ব্যয়ে, নাশে ও উপভোগে মানুষের পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা ও ভ্রম জন্মে থাকে।)

অর্থ আত্মীয় বিচ্ছেদের হেতু। অতএব বিবেকী ব্যক্তি এই সকল চিন্তা কর্‌বেন ও যাতে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে পারেন, তার প্রতি যত্নশীল হবেন। তিনি 'মায়ামাত্রমিদং

আত্মা জ্ঞানেন মহি সংস্তেৎ।' ভাঃ ১১।১৯।১। অর্থাৎ সবই মায়াময় জেনে তাঁর জ্ঞানকে আমাতে নিবিষ্ট করবেন। জ্ঞানী ব্যক্তি আমার প্রিয়তম। জ্ঞানের দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তা' তর্পণ, তীর্থসেবা, জপ, দান ও অন্যান্য পবিত্রকার্য্যাদি দ্বারা লাভ করা যায় না। 'তপস্তীর্থং জপোদানং পবিত্রাণীতরাণি চ। নালং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা। —(ভাঃ ১১।১৯।৪)

শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব ব'লেছেন—"একবার পাকা সোহহং হ'য়ে তারপর দাসভাবে থাক। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও, দাসভাবে থাক। ব্রহ্মজ্ঞানের পর লীলা আস্বাদন, যেমন পাঁঠরি-ওঠরি ঠিকঠাক ক'রে সহরের রং দেখে বেড়ান।" ভাগবতেও শ্রীভগবান বল্‌ছেন :

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥
—(ভাঃ ১১।১৯।৫)

(অর্থাৎ তুমি আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হ'য়ে প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ যতদিন তোমার দেহ থাকবে, ততদিন আমাকে ভজনা কর।) শ্রীকৃষ্ণ আরও বল্‌ছেন—তুমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দেহবিকার মায়ার কার্য্য। উহা তোমার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহেরই জন্ম-মৃত্যু হ'য়ে থাকে। জ্ঞানস্বরূপ তোমার জন্ম বিনাশ নেই।—শরীর প্রকৃতির কার্য্য।—তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। তবে যতদিন দেহাদি উপাধিগ্রস্ত হ'য়ে থাকবে ততদিন যেন আমারই অংশস্বরূপ। উপাধি বিলয়ে তুমিই ভূমা, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ। আত্মজ্ঞ জীবন্মুক্তের অবস্থা সম্বন্ধে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণমুখে বল্‌ছেন :

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥
—ভাঃ ১১।২৯।১২

অর্থাৎ নির্ম্মলান্তঃকরণ আমার ভক্ত, আকাশের ন্যায় আবরণশূন্য পরমাত্মা আমাকে সমস্ত প্রাকৃত জড় পদার্থে ও সর্ব্বজীবে অবস্থিত দর্শন করেন। তিনি সর্ব্বভূতকে আমা হ'তে অভিন্ন মনে ক'রে তাহাদিগকে সম্মান করেন ও জ্ঞান অবলম্বন ক'রে আমার ধ্যানে মগ্ন থাকেন। (ভাঃ ১১।২৯।১৩) তিনিই পণ্ডিত যিনি ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, চোরে ও ব্রাহ্মণকে-দানকারীকে, সূর্য্যে ও স্ফুলিঙ্গে ও শান্ত ও ক্রূর ব্যক্তিতে সমদর্শী। কি প্রকারে সমদর্শী হবেন? না, পরস্পর অসমান কর্ম্ম, গুণ ও স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুতে সর্ব্ব-কারণ আমাকেই দেখেন। যথা :

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক পণ্ডিতো মতঃ॥
—ভাঃ ১১।২৯।১৪

যে পর্য্যন্ত 'সর্ব্বভূতে আমি' এই-জ্ঞান না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত আমার ভক্ত বাহ্যবস্তুবাক্য দ্বারা

ও মনের বৃত্তিদ্বারা সর্ব্বভূতের সেবা কর্‌বেন ও এইরূপ সেবা কর্‌তে কর্‌তে তাঁর নিকট সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং বলে বিবেচিত হবে। যথা :

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।
—(ভাঃ ১১।২৯।১৭)

ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা, মোক্ষলাভের উপায় সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। আমার ধর্ম্ম নির্গুণ। এই গুণাতীত ধর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হ'লে কোন প্রকার বিঘ্নের দ্বারা উহা বিফল হয় না।

উপদেশদান শেষ ক'রে শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ-মুখনির্গত যে বাক্য শুনেছিলেন, তাহাই শ্রীভাগবতের সার কথা। শুকদেবের উদ্দেশ্য সফল হ'ল, কারণ মহারাজ আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। তাঁর উক্তি :

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥
—(ভাঃ ১২।৬।২)

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্ম নির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥
—(ভাঃ ১২।৬।৪)

অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥
—(ভাঃ ১২।৬।৭)

অর্থাৎ আমি কৃতার্থ হ'য়েছি যেহেতু আপনি আমাকে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করালেন। আমি এখন আর তক্ষকাদি মৃত্যুর কারণ সকল হ'তে ভয় পাচ্ছি না, কারণ আপনা কর্ত্তৃক অভয়স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হ'য়েছি অর্থাৎ আমি বুঝেছি যে আমি আত্মাস্বরূপ, আমার মৃত্যু হ'তে পারে না, আমি আনন্দস্বরূপত্ব লাভ ক'রেছি। জ্ঞানবিজ্ঞান নিষ্ঠার দ্বারা আমার অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত সংস্কার দূরীভূত হ'য়ে গেছে, কারণ আপনি আমাকে পরমমঙ্গলস্বরূপ বিষ্ণুর পরমপদ দেখাইয়াছেন।

উপসংহারে বলা যায় ভাগবতকে যদি কেবলমাত্র ভক্তিগ্রন্থ বা কেবলমাত্র জ্ঞানগ্রন্থ বলা যায় ত ভুল হবে। ইহা একখানি সমন্বয়-গ্রন্থ। সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে যদি ইহাকে কেবল মাত্র ঐ দুইয়ের একতর ব'লে প্রতিপন্ন কর্‌তে চেষ্টা করা যায়, তা'হলে ভাগবতের মহিমা বৃদ্ধি করা অপেক্ষা খর্ব্ব করাই হবে। ভক্তিপন্থী হ'য়ে এবং ভাগবতকে প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার ক'রে 'জ্ঞান' শব্দ শ্রবণমাত্র কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান কর্‌লে ভাগবতকেই অমান্য করা হবে, কারণ ভাগবতই বল্‌ছেন—'কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং।' এই কৈবল্য লাভই জীবের জন্মধারণের উদ্দেশ্য, তা তিনি ভক্তিপন্থীই হউন আর জ্ঞানপন্থীই হউন। আবার জ্ঞানপন্থী হ'য়ে ভক্তিকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলে বুঝ্‌তে হবে যে ইনি আর্য্যদর্শনের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর্‌তে পারেন

নি। যে ব্যক্তির জীবনে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত হ'য়েছে, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি তিনটীই চাই। শুধু একটী হ'লে ধর্ম্মজীবন পরিপূর্ণরূপে গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে না। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নির্ম্মমভাবে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর্‌তে হবে। নিজের চারিধারে যদি এই তিনের পরিবেশ রচনা করা যায় ত তবেই ভাগবতোক্ত ভাগবতোত্তম হওয়া যায়। সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মায় সর্ব্বভূতকে যিনি দেখতে পারেন তিনিই উত্তম ভাগবত হ'তে পারেন। যথা :

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

—(ভাঃ ১১।২।৪৫)

আবার যিনি এই সবই মায়াময় অর্থাৎ ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা জ্ঞান কর্‌তে পারেন তিনিও ভাগবতোত্তম। 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯) যে সাধকের মন ব্রহ্মে সমাহিত, তিনি নিজের মধ্যে ধ্যেয় ব্রহ্মকে এবং সর্ব্বপ্রকাশক ধ্যেয় আত্মাতে নিজকে সংযুক্ত দেখে থাকেন। যথা :

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্‌ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্‌॥

—(ভাঃ ১১।১৪।৪৩)

নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বপর্য্যন্ত তিনি সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, পরমাত্মাতে আনন্দিত, পরমাত্মার ধ্যাননিরত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হ'য়ে একাকী এই পৃথিবীতে বিচরণ কর্‌বেন। যথা :

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান সমদর্শনঃ॥

—(ভাঃ ১১।১৮।২০)

নির্ব্বিকল্প সমাধি-দশায়, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে মায়িক ভেদ, জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, তা' আর থাকে না। তখন খণ্ড আকাশ মহাকাশের স্বরূপ লাভ করে। আকাশকে ত খণ্ড খণ্ড করা যায় না, তবে মায়া-সৃষ্টি ব্যষ্টি অহঙ্কারবশতঃ আকাশের খণ্ডত্ব অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবত্ব কল্পনামাত্র; যখন অহঙ্কাররূপ আবরণ আকাশের গা হ'তে অপসারিত হয়, তখন সেই মহাকাশরূপ ভূমা ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন যিনি অনাদিকাল হ'তে আছেন ও অনন্তকাল হ'য়ে থাকবেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের ইহাই জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত।

বেদের স্বর

অধ্যাপক শ্রীঅযোধ্যা নাথ শাস্ত্রী, ব্যাকরণাচার্য্য

বেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল স্বর। বেদের সাধারণ স্বর উদাত্তস্বর, অনুদাত্তস্বর ও স্বরিতস্বর ধর্ম্মস্বরূপ। ধর্ম্মীরূপ স্বর কেবলমাত্র সামবেদে গানেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মস্বরূপ স্বর সমস্ত বেদেই প্রযুক্ত হয়। ত্রিবিধ স্বরই সমস্ত বেদে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত আর একটী স্বর আছে যাহাকে প্রচিত স্বর কিংবা একশ্রুতি বলা হয়। উদাত্তস্বর, অনুদাত্তস্বর ও স্বরিতস্বর এই সমস্ত ধর্ম্মের আধারভূত বর্ণের উচ্চারণোপযোগী স্থানাবয়ব সম্পর্কবশতঃ ইহাদেরও মুখ হইতেই উচ্চারণ হয়। পাণিনি বলিয়াছেন, উচ্চৈরুদাত্তঃ (১।২।২৯) নীচৈরনুদাত্তঃ (১।২।৩০) সমাহারঃ স্বরিতঃ (১।২।৩১) ইত্যাদি। উচ্চৈঃ ও নীচৈঃ শব্দের অর্থ উচ্চস্বর কিংবা নিম্নস্বর নয়; কিন্তু উচ্চারণ ক্রিয়ার কর্ম্মের অধিকরণ উর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগ। উচ্চারণ ক্রিয়ার কর্ম্ম বর্ণই হইয়া থাকে; কেননা যাহা উচ্চারিত হয় তাহাই উচ্চারণ ক্রিয়ার কর্ম্ম। তাহা হইলে বর্ণোচ্চারণের অধিকরণ যে উর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগ, ইহাই উচ্চৈঃ ও নীচৈঃ শব্দের অর্থ; কিন্তু, যেহেতু তালু প্রভৃতি স্থান হইতেই বর্ণের উচ্চারণ হয়, সেইজন্য তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগ হইতে যে স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয়, উহাদের উদাত্ত ও অনুদাত্ত সংজ্ঞা বৈদিকগণ করিয়া থাকেন। উদাত্তস্বর ও অনুদাত্তস্বরের সম্মিশ্রণ হইলে স্বরিত স্বর হয়। প্রচিত স্বর অনুদাত্তেরই অবস্থা বিশেষ; কিন্তু ইহার উচ্চারণ উদাত্তেরই ন্যায় হয় বলিয়া পাণিনি এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার ও "অক্ষরাশ্রয়া" (ঋ. প্রা. ৩-২) সূত্র দ্বারা ইহাদের বর্ণধর্ম্মস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন।

বৈদিকগণ ত্রৈস্বর্য্যের উচ্চারণকালে মুখ ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গেরও সঞ্চালন করিয়া থাকেন। শাখাভেদে অঙ্গসঞ্চালনও ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদী, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী ও অথর্ব্ববেদীগণ মস্তক সঞ্চালন দ্বারা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই স্বরত্রয়ের অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু শুক্লযজুর্ব্বেদীগণ হস্তসঞ্চালন দ্বারাই ত্রৈস্বর্য্য ব্যক্ত করেন। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যে পাণিনীয় শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, "হস্তেন তে" (শুক্ল, যজুঃ, প্রা-১.১২১) "হস্তেন বেদং বোহবীতে" (পা. শিক্ষা—৫৪)। সামবেদীগণ সামবেদ গানকালে হস্তাঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা উদাত্ত প্রকৃতি স্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। উদাত্তের উচ্চারণকালে কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহার নির্দ্দেশ পাণিনীয় শিক্ষায় পাওয়া যায়, যথা—উদাত্তং প্রদেশিনীং বিদ্যাৎ প্রচয়ং মধ্যতোঽঙ্গুলিম্ নিহতং তু কনিষ্ঠিকাং স্বরিতোপকানিষ্ঠিকম্ (৪৪)

যেমন উচ্চারণে বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত লেখার পদ্ধতি ও বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুসারে ভিন্নপ্রকারে দেখা যায়। যথা—ঋগ্বেদে অক্ষরের উপরে ও নিম্নে একটী রেখা টানিয়া দুইটি স্বরের প্রদর্শন করা হয়। অক্ষরের নিম্নে একটী তির্য্যক রেখা টানিয়া অনুদাত্ত, উপরে একটি ঊর্দ্ধরেখা টানিয়া স্বরিত এবং কোনও প্রকার চিহ্ন না দিয়া উদাত্ত প্রদর্শন করা হয়, যথা—

"অগ্নিমীলে" এই পদাংশে অকারের নিম্নে তির্য্যক রেখা অনুদাত্তের, মকারের পরবর্ত্তী ঈকারের উপরে ঊর্দ্ধগামী রেখা স্বরিতের ও "গ্নি" শব্দের ইকারে চিহ্নরাহিত্যের দ্বারা উদাত্তের বোধ করান হয়। প্রচিতস্বরও উদাত্তেরই মত চিহ্নরাহিত্য দ্বারাই জ্ঞাত হইয়া থাকে, যথা—"দে" শব্দের একারে প্রচিতস্বর চিহ্নরাহিত্যের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছে। "গ্নি" শব্দের ইকারেও "দে" শব্দের একারে উদাত্ত ও প্রচিতস্বরের জন্য কোনও চিহ্ন দেওয়া হয় না। চিহ্ন না দেওয়াই ইহাদের জ্ঞাপক।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ত্রৈস্বর্য্যের চিহ্ন অধিকল ঋগ্বেদেরই মত; কিন্তু শুক্লযজুর্ব্বেদে উদাত্ত ও অনুদাত্তের চিহ্ন ঋগ্বেদের ন্যায় হইলেও স্বরিতের চিহ্নে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়, যথা—শুক্লযজুর্ব্বেদে স্বরিত বিশেষ জ্ঞাপন করিতে হইলে অক্ষরের নিম্নে '৪' লিখিতে হয়, যথা—"বাতুমসি" এইস্থলে "তু" শব্দের নিম্নে '৪' লিখিয়া স্বরিত স্বরের জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কোন কোনও স্থলে অক্ষরের নিম্নে কাকপদ চিহ্ন অর্থাৎ (∠) এইরূপ চিহ্ন দ্বারা স্বরিত বিশেষের জ্ঞাপন করান হয়। কিন্তু সাধারণ স্বরিতের চিহ্ন ঋগ্বেদেরই মত অক্ষরের উপরে ঊর্দ্ধগামী রেখা।

কঠশাখায় উদাত্তেরই চিহ্ন ঊর্দ্ধগামী রেখা এবং স্বরিতবিশেষের চিহ্ন অক্ষরের নিম্নে কাকপদ চিহ্ন অর্থাৎ (∠) এইরূপ। অনুদাত্তের জন্য কোনও চিহ্ন দেওয়া হয় না, যথা; "কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং, কিমু পৃচ্ছসি মাতরম্" এইস্থলে অক্ষরের উপরে ঊর্দ্ধগামী রেখা উদাত্তের এবং চিহ্ন না দেওয়া অনুদাত্তের জ্ঞাপক।

অথর্ব্ববেদে স্বরিত ও অনুদাত্তের চিহ্ন ঋগ্বেদেরই ন্যায়; কিন্তু স্বরিত বিশেষের জন্য অনুশাকার '২' চিহ্ন দেওয়া হয়; যথা "কন্যা ২" এইস্থলে "২" চিহ্ন স্বরিতবিশেষের জ্ঞাপক।

সামবেদে উদাত্ত প্রভৃতি স্বর জ্ঞাপন করিবার জন্য কোনও প্রকার রেখা দেওয়া হয় না; কিন্তু অক্ষরের উপরে সংখ্যা লিখিয়া উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের জ্ঞান করান হয়। অক্ষরের উপরিবর্ত্তী ১, ০, ২ ক্রমশঃ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের জ্ঞাপক। প্রচিত স্বরের

১ ০ ১ ২
জন্য কোনরূপ চিহ্ন দেওয়া হয় না, যথা "অগ্ন আ য়াহি" এইস্থলে উদাত্ত অকার ও উদাত্ত আকারের উপরে '১' সংখ্যা লেখা হইয়াছে। 'গ্ন' এই অনুদাত্তের উপরে '০' সংখ্যা এবং "য়া" এই স্বরিতের উপরে ২ সংখ্যা লেখা হইয়াছে; কিন্তু "হি" এর ইকার প্রচিত বলিয়া উহার উপরে কোনরূপ চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। এইরূপ উপর্য্যুক্ত প্রকারে বৈদিক মন্ত্রে স্বরের উপযোগ হইয়া থাকে।

যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণে একশ্রুতিই দেখা যায়; কিন্তু ত্রৈস্বর্য্যের প্রয়োগ কোথাও দেখা যায় না। যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণেই একমাত্র মন্ত্রেরই মত ত্রৈস্বর্য্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পাঠে ও লেখায় সংহিতারই ন্যায় প্রযোজ্য; কিন্তু শুক্লযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে উদাত্ত ও অনুদাত্তের স্বর প্রযুক্ত হইলেও লিখিবার সময় কেবলমাত্র অনুদাত্তেরই চিহ্ন শুক্লযজুর্ব্বেদীগণ দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে উদাত্ত বিশেষ ও অনুদাত্ত বিশেষকে ভাষিক স্বর বলা হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদের

প্রাতিশাখ্যে ইহার নির্দেশ পাওয়া যায় "স্বৌ" (১.১২৯) সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য উব্বট বলিয়াছেন যে শতপথ ব্রাহ্মণে যে উদাত্ত ও অনুদাত্তের প্রয়োগ আছে উহা ভাষিত লক্ষিত স্বর। ভাষিত ও ভাষিক দুইটীই একার্থবাচক। যখন উদাত্ত অনুদাত্তের পূর্ব্বে থাকে তখন সেই অনুদাত্তের পূর্ব্ববর্তী উদাত্তাক্ষরের নিম্নে একটী তির্য্যক্ রেখা টানিয়া দেওয়া হয়, যথা "হুতেঽন্না আদধীত" ইত্যাদি স্থলে "তে" অনুদাত্তের পূর্ব্ববর্তী উদাত্ত 'হু' এর নিম্নে একটী তির্য্যক রেখা দেওয়া হইয়াছে। স্বরিতের পূর্ব্ববর্তী উদাত্তাক্ষর জ্ঞাপন করিবার জন্য কিন্তু ঐরূপ দুইটী তির্য্যক্ রেখা টানিতে হয়, যথা—"বীর্য্যম্" ইত্যাদি স্থলে "র্য্য" এই স্বরিতের পূর্ব্ববর্তী "বী"এর উদাত্ত ঈকারে।

স্বরিত-স্বর জাত্য ও অজাত্য ভেদে দুই প্রকার। ঋগ্বেদিগণ বলেন—যে স্বরিত স্বভাব-সিদ্ধ অর্থাৎ উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে যাহা জাত নয় তাহাই জাত্যস্বরিত অর্থাৎ উদাত্ত সম্পর্ক ব্যতীত যাহা সিদ্ধ। তদ্ব্যতিরিক্ত স্বরিত অজাত্য অর্থাৎ যাহা উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে জাত, তাহা অজাত্যস্বরিত।

শুক্লযজুর্ব্বেদীগণ বলেন—একপদে নীচপূর্ব্বঃ সমবোজাত্যঃ (ত. প্রা. ১.১১১) অর্থাৎ যদি এক-পদেই যকার কিংবা বকার বিশিষ্ট স্বরিতের পূর্ব্বে অনুদাত্ত থাকে, সেই স্বরিতকে অজাত্যস্বরিত বলা হয়, যথা—"কন্যা" "ধানুষসি" ইত্যাদি। ভাষ্যকার আচার্য্য উব্বট বলেন—অনুদাত্তও যদি পূর্ব্বে না থাকে অর্থাৎ যে স্বরিতের পূর্ব্বে কিছুই না থাকে, তাহাও অজাত্য স্বরিত, যথা ; 'কঃ' "স্বঃ" ইত্যাদি।

যে অজাত্যস্বরিতের পরে অনুদাত্ত থাকে সেই অজাত্য-স্বরিতের উপরে ঊর্দ্ধগামী রেখা দেওয়া হয়, যথা—'অগ্নিমীলে' এইস্থলে "মী" এই অজাত্য-স্বরিতের পরে "লে" এই অনুদাত্ত আছে বলিয়া 'মী' শব্দের উপরে ঊর্দ্ধগামী রেখা দেওয়া হইয়াছে।

জাত্যস্বরিতের পরে যদি উদাত্ত কিংবা স্বরিত থাকে, তাহা হইলে স্বরিত ও অনুদাত্তের যথাযথ চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও জাত্যস্বরিতের পরে সংখ্যা লেখা হয়। এই সংখ্যা কম্পস্বরের জ্ঞাপক অর্থাৎ স্বরিতের পরে উদাত্ত কিংবা স্বরিত থাকিলে, উহা কম্প নামে বহুচশাখায় ব্যবহৃত। কোনও স্থলে (১) ও কোনও স্থলে (৩) লিখিয়া ঐরূপ কম্পস্বরের জ্ঞাপন করান হয়, যথা—"অহংভূ র্ং ১ সহসা" (ঋ. ৮।৯১।১) "কন্যা ৩ বার্ব্বহতী" (ঋ. ৮।৯১।১) "শতচক্রং যো ৩ হোবর্ত্তনিঃ" (ঋ. ১০।১৪৪।৪) ইত্যাদি। প্রথম দুইটী উদাত্তের পূর্ব্ববর্তী স্বরিত এবং তৃতীয়টী স্বরিতের পূর্ব্ববর্তী স্বরিতের উদাহরণ। কম্পস্বরে আবৃত্তি পূর্ব্বককম্পন করিতে হয়, যতবার আবৃত্তি করিতে হয়, উহারই জ্ঞাপক সংখ্যা। যথা, তিনবার আবৃত্তিপূর্ব্বক কম্পন করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ (৩) লিখিয়া থাকেন।

প্রাতিশাখ্য অনুসারে স্বরিত সাত প্রকার—(১) ক্ষৈপ্র, (২) প্রশ্লিষ্ট, (৩) অভিনিহিত, (৪) প্রশ্লিহত, (৫) পাদবৃত্ত, (৬) তৈরোবিরাম, (৭) তৈরোব্যঞ্জন।

(১) ক্ষৈপ্র—উদাত্ত ইকার কিংবা উদাত্ত উকারের স্থানে, অনুদাত্ত অকার পরে থাকিতে যদি "য়" কিংবা "ব" হইয়া যায়, যথা—যোজা দ্বিন্দ্র তে হরী (ঋ. ১।৮২।১) অংং ভূ ১ক্র সহসা (ঋ. ১০।৪৯।৮)।

(২) প্রশ্লিষ্ট—যদি উদাত্ত ইকার কিংবা উদাত্ত উকারের পরে অনুদাত্ত ইকার কিংবা অনুদাত্ত উকার থাকে, এবং উহাদের স্থানে দীর্ঘ একাদেশ হওয়ার পর স্বরিত হইলে, যথা—ক্রচীব ঘৃতম্" (ঋ ১০।৯১। ১৫) "মাহির্ভিন্" (তৈ. সং. ৭।৫।২।২) ইত্যাদি।

(৩) অভিনিহিত—বিভিন্ন পদস্থ উদাত্ত একার ও উদাত্ত ওকারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত অকারের লোপ হওয়ার পর স্বরিত হইলে, যথা—"তেহ বর্ধস্ব বর্ত্তবস"—(ঋ. ১৮৫।৭) "সোহব্রবীৎ"—(তৈ. স ২।৩।৬।১) ইত্যাদি।

(৪) প্রশ্লিষ্ট—ভিন্নপদস্থ উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত যদি সংহিতায় স্বরিত হইয়া যায় তাহা যথা ; "ইষে ত্বা"—(শু, যজু ১।১) "তং তে দুহ্নকা"—(তৈ. সং ৩ ২।১০।২।)

(৫) পাদবৃত্ত—যে স্থলে পূর্ব্বপদের উদাত্ত অন্ত্যস্বর ও উত্তরপদের অনুদাত্ত আদিস্বরের মধ্যে কোনও ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবধান না থাকে, এবং সেই পূর্ব্বপদস্থ উদাত্তের পরবর্ত্তী অব্যবহিত অনুদাত্তের স্থান যদি সংহিতা বশাৎ স্বরিত হইয়া যায়, যথা ; "তা অস্মাৎ স্বষ্টা—"(তৈ, সং, ২।১।২।১) "স ইধানঃ"—(তৈ, সং, ৪।৪।৪।৫) ইত্যাদি

(৬) তৈরোবিরাম—যদি পদের অবগ্রহকালে উদাত্তের পরে স্বরিত থাকে, যথা। "বজ্রপতিম্" এই পদের পদপাঠে "বজ্রপতিম্" এইরূপ পৃথক পৃথক পদদ্বয়ের পাঠ করিয়া অবগ্রহ করিবার সময় উদাত্তের পরে স্বরিত আছে বলিয়া ইহা তৈরোবিরাম-স্বরিত।

(৭) তৈরোব্যঞ্জন—যদি কোন একটী পদে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরিত হইয়া যায় এবং সেই উদাত্তস্বর ও অনুদাত্তস্বরের মধ্যে যদি ব্যঞ্জনের ব্যবধান থাকে, যথা; "স ইন্দ্রো হ মন্ত ত" (তৈ, সং, ৭।১।৫।৪) "তদশ্বোঽভবৎ" (তৈ সং ৫।৩।১২।১) ইত্যাদি।

উপর্য্যুক্ত বর্ণগত ধর্ম্মস্বরূপ উদাত্ত প্রভৃতি স্বর সমস্ত বেদেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু সামবেদে সঙ্গীতোপযোগী ধর্ম্মীস্বরূপ স্বর গানে প্রযুক্ত হয়। লিখিবার সময় এই সঙ্গীতোপযোগী স্বরসমুদয় ব্যক্ত করিবার জন্য অক্ষরের শীর্ষে স্বরের ক্রমিক সংখ্যা বসাইতে হয়। সামবেদের এই গেয়স্বর সাত প্রকার—(১) ক্রুষ্ট, (২) দ্বিতীয়, (৩) তৃতীয়, (৪) চতুর্থ, (৫) মন্দ্র, (৬) অতিস্বার্য্য, অতিক্রুষ্ট বা সপ্তম। সামগানের ক্রুষ্ট প্রভৃতি এই স্বরগুলিই ক্রমে লৌকিকগানের স্বররূপে পরিণত হইয়াছে। ক্রম কিন্তু এক নয়। সামবেদে ও লৌকিকগানে স্বরের ক্রম বিভিন্ন। ষড়জ ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, বৈবত ও নিষাদ। এই স্বরসপ্তকই সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি রূপে লোকে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্বর সপ্তকের আদি অক্ষর গৃহীত হইলে ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি রূপে ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধ্বনি অপেক্ষায় উত্তরোত্তর ধ্বনি ক্রমশঃ উঁচু কিংবা চড়া হইয়া যায়। এইরূপ ক্রমকে আরোহক্রম বলে। এই স্বরসপ্তকেই আবার মন্দ্র, মধ্যম ও তার নামক তিনটী ধ্বনি উচ্চারিত হইয়া থাকে। সামগানের স্বর ও লৌকিকগানের স্বরে কতদূর সাম্য ও বৈষম্য আছে, ইহা নারদীয় শিক্ষায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :

যঃ সামগানাং প্রথমঃ সঙ্কেতোর্ধ্যস্বরঃ।
যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধার স্তৃতীয়ঋষভঃ স্মৃত।

অর্থাৎ, লৌকিকগানের ষড়্‌জ ঋষভ প্রভৃতি স্বরের মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া বিপরীত

ক্রমে গৃহীত হইলে সামগানের ক্রুষ্টা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য্য ও অতি ক্রুষ্ট স্বর লৌকিকগানের ক্রম অনুসারে মধ্যম গান্ধার, ঋষভ, ষড়্জ, নিষাদ, ধৈবত ও পঞ্চম হওয়া উচিত, এই ক্রম অনুসারে সামগানের স্বর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং লৌকিকগানের স্বর ম, গ, রে, সা, নি, ধ, প হইবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিপর্ব্ব দ্বারা উপর্য্যুক্ত স্বর প্রদর্শন করা হয়। যথা—অঙ্গুষ্ঠের আদ্য পর্ব্বদ্বার ক্রুষ্ট, তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব দ্বারা দ্বিতীয়, মধ্যমার মধ্যমপর্ব্ব দ্বারা তৃতীয়, অনামিকার মধ্যমপর্ব্ব দ্বারা চতুর্থ, কনিষ্ঠিকার মধ্যম ও মূলপর্ব্ব দ্বারা মন্দ্র ও অতিস্বার্য্য এবং অঙ্গুষ্ঠের শেষ পর্ব্ব দ্বারা অতিক্রুষ্ট স্বর ব্যক্ত করা হয়।

লিখিবার সময় করকরের উপরে ও অগ্রে সংখ্যা চিহ্ন দ্বারা উপর্য্যুক্ত স্বর প্রদর্শন করা হয়। যথা—"কয়ানস্ত্রিত্র" এই সামাংশটী লিখিতে হইলে 'ক'ও 'য়া'এর উপরে ৩ এবং অগ্রে ৫ লিখিয়া গেয়স্বর তৃতীয় এবং ধ্বনি মন্দ্র ইহাই ব্যক্ত করা হয়।

সামগানের অনেক সূক্ষ্ম পদ্ধতি আছে যাহা বর্ত্তমানযুগে বিলুপ্তপ্রায়; তবে গ্রামে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।*

সকামের পূজা

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু

আরতি করিতে তোমা দীপ জ্বালি দেউলে দেউলে
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাকঢোল করি কত পূজা ও উৎসব;
বন-ফুল ফলে পত্রে অর্ঘ্য আনি বিধি উপচারে—
উচ্চারিয়া মন্ত্র যত কামনার, তুমি জানো সব।

ধন মান যশ রূপ চাহি' দিই অঞ্জলি চরণে
পিতা পুত্র পিতৃব্য বা আছে যত স্নেহ-পরিজন,
সবার সুখের লাগি' ঝরে কত অশ্রুবারিধার
মূর্ত্তির মাঝারে থাকি' দেখ' চাহি তুমি নিরঞ্জন।

বাসনা রেখার নাই তাই যদি হয় ভালবাসা
কেমনে বসিয়া থাকি তুমা মুক্তি আনন্দের আশে,
এতটুকু শান্তি তরে ধূপ জ্বালি বেদীতে তোমার
একি প্রভু নয় শুধু বন্ধন সে কামনার পাশে?

তোমারে বাসিতে ভালো আপনারে চিনি' লবো যবে
আমার সকল ভুলি' তোমা মাঝে হব যে মহান্,
সেদিন অন্তরে নিত্য পূজা হবে ষোড়শোপচারে
কেবল উৎসবে নয়, থাকি যেথা যাগযজ্ঞ স্থান।

---

*এই প্রবন্ধে অন্তির্মীলে, কিং, ব্রাহ্মণস্তি, পির্তরং, মাতর্যং; কং, ঘং, অহংমা, যার্যাযাহতী, শতক্রতু, প্রতীব, দীদ্যুস্তিভিন্, বর্ধত, ঋতবস, এবং ঘা শব্দের জন্যে যথাস্থানে 'ঊর্দ্ধগামী রেখা' দিয়া ছাপার সম্ভব না থাকায়, তৎতৎ স্থানে রেফ ব্যবহৃত হইয়াছে।—বি. স.

বৌদ্ধদর্শন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি-এল, বিদ্যাবিনোদ

বৌদ্ধদর্শনের চারিটি সূত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে :

প্রথম সূত্র—সংসারে অনাবিল সত্য হইতেছে দুঃখ। ইহা সর্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন সত্য। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, পুরুষ-নারী যুবা-বৃদ্ধ কেহই ইহার প্রভাব হইতে এজগতে মুক্তি পাইতে পারেন না। জগতের অস্তিত্ব, মানব জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে দুঃখ-বোধ অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় সূত্র—দুঃখের মূলকারণ অজ্ঞানতা। দুঃখ যখন সর্ব্বজীবনে দুরতিক্রম্য, প্রাণ-ধারণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তখন মূল কারণ উৎপাটিত করিলে দুঃখ নিঃসন্দেহে দূরীভূত হইবে। অজ্ঞানতা বুঝাইতে আমাদের পরিবেষ্টনীর সত্যকার রূপ সম্বন্ধে। আমাদের পারিপার্শ্বিকের সহিত আমাদের নিজেদের সম্বন্ধ সম্পর্কীয় অজ্ঞানতা। ইহা দূরীকরণের উপায় শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ, সৎপুরুষের আলোচনা এবং সর্ব্বোপরি উপলব্ধি।

তৃতীয় সূত্র—জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করিতে হইবে, তাহা হইলে দুঃখের নিরসন হইবে। ইহা স্বয়ং-সিদ্ধ।

চতুর্থ সূত্র—মানবজাতির সকল কর্ম্মের প্রেরণা বা উৎস হইতেছে কোন না কোন বাসনা। মনস্তত্ত্ববিদ্ মাত্রেই বলিয়াছেন, কর্ম্ম সকল সময়েই বাসনাপ্রসূত। চতুর্থ সূত্র অনুসারে, বাসনামাত্রই অজ্ঞানতা হইতে যখন জাত, তখন জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, উপলব্ধির উজ্জ্বল আলোকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে মূলের অন্য বাসনা লোপ পাইবে। বাসনার নিষ্কাশনে স্থগিত হইবে কর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন এবং তাহার সহিত জন্ম-পরিবর্ত্তন। জন্ম-চক্র প্রবর্ত্তন বাসনার সহিত নিরসন হইলে মানবজাতি পাইবে মুক্তি বা মোক্ষ অথবা নির্ব্বাণ।

তৃতীয় সূত্র এবং চতুর্থ সূত্র সমপর্য্যায়ভুক্ত; চতুর্থ সূত্র যেন তৃতীয় সূত্র হইতে উদ্ভূত। পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে, মানব-মন হইয়া উঠে অবিচলিত অবিকম্প, অপরিবর্ত্তনীয়। তখন সকলেরই চিত্ত নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় স্থৈর্য্য সম্পাদন করে, তখন না থাকে অশান্তি, না থাকে উত্তেজনা, বিহ্বলতা বা উদ্দীপনা। হিন্দু-শাস্ত্র-মতে—তুরীয়ভাব। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রন্থের আদর্শে—সমাধি। ভাবের হয় বিমোচন, তখন রাগের হয় তিরোধান।

এই কর্ম্মাতীত অবস্থার আরম্ভ—ধ্যান, চিন্তন, অনুশীলন ও উপলব্ধিতে। ইহার বীজ নিহিত থাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের উদ্যম, আন্তরিকতা, অনাসক্ত ভাবভোতনায়।

এই মহামূল্য সূত্র কয়টি ভিন্ন, বৌদ্ধধর্ম্মে অষ্ট মার্গের উল্লেখ আছে :

সৎইচ্ছা—সাধুবাসনা সাধনার উপায়

সৎমত—সদ্বুদ্ধি মুক্তির সোপান

সৎবাক্য—জীবনকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়

সৎকর্ম—মানসিক উন্নতির সহায়ক

সৎজীবন বা শুদ্ধ জীবন—সাধনার উপযুক্ত পরিবেষ্টনী

সৎ বা শুদ্ধচেষ্টা—জীবন পরিশুদ্ধিরহেতু

সম্যকজ্ঞান—মুক্তিপথের আলোকস্বরূপ

সম্যক-ধ্যান—সাধনার প্রক্রিয়া বিশেষ

এ সবই আত্মোন্নতির উপায় ও চিত্তশুদ্ধির প্রক্রিয়া, সাধুর সৎমার্গে বিচরণ করিবার অবলম্বন। প্রবুদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন এই অষ্টমার্গ সিদ্ধিলাভের উপায়, মুক্তিরাজ্যে পৌঁছিবার আলম্বন।

অনেকের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন নির্দেশ বৌদ্ধধর্ম বা দর্শনে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, মহামতি সাধকপ্রবর বুদ্ধদেবও শিষ্যবর্গকে এ বিষয়ে গবেষণা করিতে বিশেষ নির্দেশ দেন নাই। বৌদ্ধধর্ম, নীতি-প্রধান ধর্ম। অষ্ট-মার্গ নীতি-পথের নির্দেশক, নীতি-বোধের সহায়ক মাত্র।

শুনা যায়, তিব্বতীয় লামাগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সামাজিক সমস্যা সমাধান হয় না সমষ্টিগত প্রচেষ্টায়। সমাজের কল্যাণ ও দেশের উপকার নির্ভর করে ব্যক্তিগত উন্নতি-সাধনা ও উপকারের উপর। ব্যষ্টির উন্নতিতে সমষ্টির উন্নতি, ব্যক্তির কল্যাণে সমাজের কল্যাণ, অর্থাৎ সকলেই যদি নিজ নিজ আত্মোন্নতি সাধন করেন, সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভে প্রয়াস পান, তবে জাতির বা সমাজের কল্যাণ এবং উন্নতি আপনি সাধিত হইয়া যাইবে। সমাজ ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়। অতএব প্রয়োজন, ব্যক্তিগত সাধনা। প্রতিটি ব্যক্তি স্বকীয় চেষ্টায় উন্নত হইলে, সমাজ উন্নীত হইবে। বৌদ্ধধর্ম যুক্তি-প্রাণ ধর্ম, ইহার ভিত্তি জ্ঞানের উপর। অষ্টমার্গ অবলম্বন করিলে নীতিজ্ঞান প্রতিভাত, প্রতিফলিত হইবে। রিপুদমন করিয়া শান্ত ও সংযতচিত্তে বাসনা পরিহার করিলে জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য হইবে, মানব-হৃদয় পূর্ণবিকশিত হইবে।

বৌদ্ধ মঠে, সমষ্টিগতভাবে প্রার্থনা ও সাধনার রীতি আছে। বৌদ্ধ চৈত্যে সমবেত প্রচেষ্টায় একত্রভাবে ধ্যান-ধারণা মন্ত্র-পাঠ, মন্ত্র-উচ্চারণ, ধর্ম-চক্র প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। জ্ঞানলাভ করিয়া দুঃখ-জয়ের পন্থা-নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ভগবান বুদ্ধ। তদ্নির্দেশে পুঁথি-পাঠ, জ্ঞান-চর্চ্চা, ধ্যান, চিন্তা প্রভৃতি সংসাধিত হয়। মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মালাজপ হিন্দুশাস্ত্রেরও বিধি, ধ্যান-চিন্তা হিন্দুধর্ম্মেরও নির্দেশ। স্তব-পাঠ, স্তোত্র-উচ্চারণ, মন্ত্রপাঠ হিন্দুদর্শনেরও রীতি এবং নীতি।

হিন্দুশাস্ত্রের মত, বৌদ্ধধর্ম্মেও নিহিত আছে, একের উন্নতি বহুর মধ্যে প্রচারিত হয়, ব্যক্তির পুণ্য সমাজের মধ্যে জ্যোতি বিকিরণ করে। ব্যষ্টির সাধনা ও পুণ্যফল সমষ্টির প্রতি স্তরে প্রভাব বিস্তার করিবে, কিছুই নিষ্ফল যাইবে না। সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্মের আকর্ষণী শক্তি আছে, ছড়াইয়া পড়িবার গুণ আছে। এই বিস্তৃতি-প্রদান-প্রকৃতির জন্যই একের সাধনায় অপরের মঙ্গল হয়, দেশের বা জাতির এবং সমাজের কল্যাণ হয়। একের পুণ্যসাধনা অপরের উপর ফল বিস্তার করিবে। পরম দার্শনিক ও সাধকপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ এজন্য জনবিরল

স্থানে ধ্যান করিতেন, চিন্তা করিতেন, তপস্যা করিতেন। সৎচিন্তার ফল সকলে ভোগ করিবে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী অহিংস আচরণ অভ্যাস করিতে সকলকে নির্দেশ দিয়াছেন। কার্যে, বাক্যে ও চিন্তায় অহিংসনীতি অনুধাবন ও অনুসরণ ছিল তাঁহার মন্ত্র।

অষ্টমার্গে সিদ্ধ ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্ব বলা হয়, কেহ কেহ 'বোধি সৎ' আখ্যা পাইয়া থাকেন। তখন তাঁহার চিন্তা স্বকীয় চিন্তা নহে, তাঁহার দুঃখ তাঁহার নিজস্ব নহে, তাঁহার আনন্দও তাঁহার নিজের নহে—স্বদেশের, স্বদেশবাসীর, জাতির ও জগতের। বৌদ্ধধর্মমত অনুসারে, জীবন ধরিয়া (বোধি-সত্ত্ব হইবার পর) কেবল ধ্যান করিলে মানবজাতির কল্যাণ সাধন হইতে পারে, প্রাণিজগতের মঙ্গল ঘটিতে পারে। পৃথিবীর প্রতি পুণ্য প্রতিধ্বনিত হয় প্রাণিজগতে, জগতের প্রতি সৎ-চিন্তা, সৎ-কর্ম ও সৎ-বাক্যের অংশ আছে, মানবজাতির মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির। ঐগুলির প্রতি কণা জগতের দূরতম কোণেও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আনন্দ ও উপলব্ধি যখন তাঁহার নিজস্ব নহে, ঐগুলির ফলাফলও তাঁহার স্বকীয় সত্তার মধ্যে গণ্ডীভূত নহে। কোন কর্মই নিষ্ফল হইতে জানে না। অসৎকর্ম-প্রসঙ্গেও, বৌদ্ধধর্মের এই মত। এইজন্য প্রতি অসৎ কর্মেও দায়িত্ব আছে প্রতিটি মনের। এ কারণে প্রয়োজন হয় সজ্ঘশক্তির, চৈত্য-বিহারের।

অশোকের অনুশাসন : সম্রাট অশোকের অনুশাসন (Edicts) চৌদ্দ দফা বলিতে পারা যায়। এইগুলি তাঁহার রাজ্যের সীমানার নিকট ছয়টি বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত। তবে কোন একস্থানেই একটি সম্পূর্ণ দফা পাওয়া যায় নাই। অনুশাসনের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে : উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (পাকিস্তানে) অন্তর্বর্তী (১) শাহবাজগিরি (২) মানশিরা, এবং হিন্দুস্থানের (৩) ডেরাডুন জেলার কলসী, (৪) উড়িষ্যার মধ্যে ধৌলী, (৫) মাদ্রাসের মধ্যে জৌগদা, (৬) হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত মাস্কি, (৭) মহীশূর অন্তর্বর্তী ব্রহ্মগিরি, (৮) বোম্বাইয়ের মধ্যে সোপারা এবং (৯) সৌরাষ্ট্র মধ্যে গীর্ণার নামক স্থানে।

বোম্বাই হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বেসিনের সন্নিকটে ভুঁইগাম গ্রামে একটি বিদ্যালয়-ছাত্রের অনুসন্ধিৎসার দরুণ একটি অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সামগ্রী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়। বালকটি তাহার গ্রামে একটি মাটির ঢিবির নিকট একটি প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত দেখিতে পায়। যেটুকু মাত্র বাহিরে ছিল তাহা কারুকার্য-খচিত দেখিয়া সে একজন বস্তু-চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বোম্বাইয়ের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে শ্রীযুত নারায়ণ অনন্ত গোরেকে উহা দেখান। ইতিহাস-রসিক গোরে উহা নিরাপত্তার জন্য নিকটবর্তী পল্লী কোপার্দে স্থানান্তরিত করেন। পরে তিনি উহা বোম্বাই সহরে লইয়া গিয়া কারুকার্যের ছাপ তুলিয়া রাখেন। প্লাষ্টারের এই ছাপ তৎকালীন শিল্প-প্রতিভার যে পরিচয় দেয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উৎসাহী গোরে বলিয়াছেন সম্রাট অশোকের নবম অনুশাসন —ব্রাহ্মী অক্ষরে যা লিখিত আছে, ইহা তাহার অংশবিশেষ। ইহা ২৩০০ (দুই হাজার তিন শত) বৎসরের পুরাতন হইবে—ইহার আকার দূরত্ব-নির্দেশক অর্দ্ধক্রোশ-সংখ্যক প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়।

আরও দুইটি প্রস্তরখণ্ড ঐ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তরখণ্ড দুইটি

পরবর্তী যুগের রচিত এবং দেবনাগরী অক্ষরে খোদিত। ইহা হইতে বহু তথ্য অবগত হওয়া যাইবে। বৌদ্ধ ইতিহাসের বহু সত্য হস্তগত হইবার সম্ভাবনা আছে, যদি এই সকল ভূমি সুষ্ঠুরভাবে খনন করা যায়। ঐতিহাসিক, গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই মনে করেন।

নবাবিষ্কৃত শিলাখণ্ডটি পুরাতন হইলেও খোদিত অংশ সুপরিষ্কার, সুস্পষ্ট, পাঠ করিতে কষ্ট হয় না। ইহার উপরিভাগ সুমসৃণ—২৭ ইঞ্চি লম্বা, ২৩ ইঞ্চি প্রস্থে, চতুর্দ্দিকের পরিধি সাত ফিট এবং পুরু ১০ ইঞ্চি। ইহাতে এগার লাইন শিলা-লিপি আছে এবং ডেরাডুন জেলার অন্তর্গত কলসী নামক স্থানে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনের সহিত ইহার যথেষ্ট মিল আছে। ইহার আদ্য লাইন এইরূপ 'দেবানাম্ পিয়দাস্ত রাজা এবম্ আহ' (রাজা অশোক কহিলেন)। পুণ্য সম্বন্ধে সম্রাটের অভিমত পরবর্তী দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। ক্রীতদাস ও ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার, অপর মনুষ্য ও জীবের প্রতি যথাযথ আচরণ-বিধি—নবম অনুশাসনের অর্দ্ধভাগের অধিক রচনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুপ্পারক : ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুপ্পারক অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত ছিল। ইহা অধুনা সোপার নামে অভিহিত। থানা জেলার অন্তর্গত বেসিন তালুকের মধ্যে এই সোপার খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কঙ্কনের রাজধানী ছিল।

বুঁইগাম এই বর্ত্তমান সোপার (সুপ্পারক) হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে, যে পুরাকালের বহু তথ্যপূর্ণ প্রমাণাদি এই স্থানের ভূমিতলে পাওয়া যাইতে পারে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সোপারায় একটি প্রস্তরের ভগ্নাংশ প্রাপ্ত হইবার ফলে জানা যায়, উহা সম্রাট অশোকের অষ্টম অনুশাসনের ভগ্নাবশেষ মাত্র। যে দুইটি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি রামচন্দ্রদেব ও তাহার অনুচরগণ-সংক্রান্ত লিপি সংবলিত। ইনি দেবগিরির পঞ্চম রাজা রামচন্দ্র যাদব (খৃষ্টীয় ১২৭১-১৩০৯) নামে পরিচিত। প্রস্তর ফলকটীর মাপ ৪′ × ১½′।

নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ প্রস্তর-লিপির চিত্র (ফটো) হইতে দেখা যায়, লিপির নিম্নে উৎকীর্ণ আছে—একটি বন্য এক নারীকে আক্রমণ করিতেছে। এই শিলা-লিপি নষ্ট করিতে যাইলে এই প্রকার বিঘ্ন ঘটিবে—ইহা তাহারই ঘোতনা করে (symbolic representation).

দ্বিতীয় শিলা-ফলকের আয়তন ১′—২′ × ১′—৬″ হইবে। ইহার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। ইহা পাওয়া যায় সোপারার তিন মাইল দূরে কোপার্দ গ্রামে। বৌদ্ধদর্শনের নীতিমূলক আদর্শ বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয়।

সুপ্পারকের বিভিন্ন নাম ও উল্লেখ বহুস্থানে দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত সূর্য্যারক এই সুপ্পারক ভিন্ন আর কিছু নহে। ঐ পুরাণের মতে অপরান্ত দেশসমূহ—সূর্য্যারক, কালিবন, দুর্গ, আনীকট, পুলিন্দ, সুনীন, ক্রপণ, স্বাপদ, কুরুমী, কটাক্ষর, নাসিক, উত্তর নর্মদ, ভৃগুকচ্ছ, সমাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, আবন্ত্য ও আর্বুদ। অপরান্ত দেশ বহুবিস্তৃত ও ইহার অন্তর্গত সুপ্পারক (সূর্য্যারক) বর্ত্তমানে সোপারা বুঝা গেল। স্কন্দপুরাণেও খৃষ্ট ইঃ,

অপরান্ত দেশসমূহের মধ্যে শূর্পারক একটী। ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন, বর্ত্তমান উত্তর কোঙ্কনই অপরান্তদেশ এবং শূর্পারক উহার রাজধানী ছিল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বীর বিজয়সিংহ বোম্বাই সহরের নিকট সমুদ্র-উপকূল দিয়া দক্ষিণদিকে অভিযানের সময় শূর্পারকে অবতরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত অপরান্ত দেশে শাসনকার্য্যের জন্য বিশিষ্ট ধর্মমহামাত্র ও ধর্মযুক্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রচারক সঙ্ঘের নেতা ছিলেন যোনক ধর্মরক্ষিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি তথায় সাইত্রিশ হাজার নরনারীকে দীক্ষা দেন। উক্ত ধর্মরক্ষিত "অগ্গিক্খন্ধোপমা সুত্ত" প্রচার করেন। ফলে প্রায় এক সহস্র পুরুষ ও ঐ সংখ্যক নারী সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সমাজ-নীতি-অনুশাসন : বৌদ্ধধর্ম সাধারণতঃ নৈতিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতির জ্ঞান ভিন্ন বৌদ্ধধর্মের প্রসার নাই। ব্যক্তিগত বা লৌকিক, আনুষ্ঠানিক এবং সামাজিক নীতির আলোচনা, বিধি ও প্রয়োগ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম পরিপুষ্ট। সমাজ-নীতির আদর্শ অশোক-অনুশাসনে প্রভূতপরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। তৃতীয় অনুশাসনে দেখা যায়, সম্রাট অশোক বলিতেছেন—'আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র যুক্ত (প্রাদেশিক রাজকোষের কর্ম্মচারী বিশেষ), রজ্জুক (কর-নির্ধারণ জন্য জরিপাদির কার্য্যে নিযুক্ত উচ্চ কর্ম্মচারী) এবং প্রাদেশিক সংজ্ঞক কর্ম্মচারিগণ যেন এখন হইতে প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার করিয়া পরিদর্শনার্থ ভ্রমণে (অনুসন্ধানে) বহির্গত হয়।' অন্যান্য কার্য্যের সহিত নিম্নোক্ত ধর্ম্মোপদেশ দানও তাহাদের কর্ত্তব্য। যথা, মাতাপিতার কথা শুনিবে; মিত্র, পরিচিত, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের দান করিবে; প্রাণিদিগকে অহিংসা, অল্পব্যয়তা এবং অল্পসঞ্চয়রূপ সৎকার্য্য করিবে।

চতুর্থ অনুশাসনে সামাজিক নীতি এই প্রকার দৃষ্ট হয়: 'প্রাণিহত্যা, জীবহিংসা, জ্ঞাতির প্রতি অসদ্ব্যবহার (অসম্প্রতিপত্তি) প্রভৃতি বহুশতবর্ষেও বর্দ্ধিত হয় নাই। আজ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্ম্মোপদেশের ফলে জ্ঞাতির প্রতি সদ্ব্যবহার, ব্রাহ্মণ-শ্রমণের প্রতি সদ্ব্যবহার মাতা-পিতা ও বৃদ্ধ ব্যক্তির বাক্য-শ্রবণ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজা এইরূপ ধর্ম্মানুচরণ আরও বর্দ্ধিত করাইবেন এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মে ও শীলে নিষ্ঠাবান থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন।'

পঞ্চম অনুশাসনে দেখা যায় মহারাজ অশোক বলিতেছেন—'আমি অভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষে (খ্রী: পূ: ২৫৭) ধর্ম্ম মহামাত্রগণের পদ সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ের (পাষণ্ডের) মধ্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য এবং ধার্ম্মিকদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হিত ও সুখের জন্য চেষ্টা করিতেছি। তাঁহারা যবন, কম্বোজ, গন্ধার, রাষ্ট্রিক, পৈতনিক এইরূপ অন্যান্য অপরান্ত দেশবাসিগণের মধ্যে কার্য্য বিশেষে ব্যাপৃত আছে। দাস (অথবা শূদ্র) আর্য্য অথবা বৈশ্যগণের, ব্রাহ্মণ ও ইভ্যগণের (রাজন্যবর্গ)—এই চারি বর্ণের মধ্যে অনাথ ও বৃদ্ধগণের হিত ও সুখানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের বন্ধনমোচন-কার্য্যে তাঁহারা সচেষ্ট। আবদ্ধ ব্যক্তির সন্তানাদির জন্য, দায়গ্রস্তকে ধনদান জন্য, নির্য্যাতিতের শৃঙ্খল-মোচন ও বৃদ্ধের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত।'

ষষ্ঠ অনুশাসনের সমাজ-নীতি—'সর্ব্বলোকের হিতসাধনই আমার অভিনবিত কর্ত্তব্য, উৎসাহ

ও কর্ম সম্পাদনই ইহার মূল বা উৎস। সর্বলোকের হিতসাধন ব্যতীত মহত্তর কর্ম নাই।' সাম্যভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে।

সপ্তম অনুশাসন-নীতি—'যদি কেহ বিপুলভাবেও দান করে, সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও দৃঢ় ভক্তির অভাবে সে দান অতীব হীন।'

নবম অনুশাসনের নীতি—'দাস ও ভৃত্যগণের সহিত সদ্ব্যবহার, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রাণিহিংসা-ব্যাপারে সংযম, ব্রাহ্মণ-শ্রমণদের দান—এই সকল ও এতাদৃশ অন্যান্য সৎকার্যের নাম ধর্মমঙ্গল। ইহা দ্বারা স্বর্গলাভ সম্ভব।'

একাদশ অনুশাসনের নীতি—'দাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার; মাতাপিতার উপদেশ পালন; বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের দান, প্রাণিহত্যা বর্জন—এইগুলি পালন করিবে। সেজন্য পিতা-পুত্র, ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী সকলেরই এই কথা বলা কর্তব্য ইহা ভাল, ইহা করা উচিত। এই কার্যে ধর্মদানের ফল হয়, ইহলোকে আনন্দলাভ, পরলোকে সমস্ত পুণ্যের সৃষ্টি হয়।' ইহাতে ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

দ্বাদশ অনুশাসনের উপদেশ—

'প্রিয়দর্শী রাজা সমস্ত পাষণ্ডকে (ধর্মসম্প্রদায়কে) প্রব্রজিত ও গৃহস্থকে দান ও বিবিধ প্রকার সম্মান প্রদর্শন দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। অস্থানে অকারণে যেন আপন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রশংসা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা না হয়। উপযুক্ত স্থলে গুরুতর কারণ থাকিলে যেন উহা সামান্যমাত্র হয়, পর-সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। ইহা দ্বারা আত্মসম্প্রদায়ের উন্নতি, পরসম্প্রদায়েরও উপকার করা হয়।' ইহাতে সহনশীলতা সূচিত হইতেছে।

বৌদ্ধ-ধর্মের সার কথা দৃষ্ট হয় অশোকের অনুশাসনগুলিতে। ইহার সারমর্ম বলিষ্ঠ, সুসংবদ্ধ, নির্মল সমাজ গঠনের আগ্রহ। পিতামাতা ও গুরুজনের বশ্যতা, অহিংসা, সংযম, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ ও অন্যান্যকে দান প্রভৃতি অনুশাসনগুলির মূল বস্তু এবং নীতি উপদেশ। দ্বিতীয় স্তম্ভ-লিপিতে অশোক মহারাজ বলিয়াছেন, "ধর্ম কি?" ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বিবৃত করিয়াছেন, 'ধর্ম অসিনবের অর্থাৎ পাপের স্বল্পতা, কল্যাণ-কর্মের প্রাচুর্য, দয়া, দান, সত্য ও শৌচ।' তৃতীয় স্তম্ভ-লিপিতে ব্যক্ত হইয়াছে—'চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দম্ভ ও ঈর্ষা—ইহারাই অসিনবের অর্থাৎ পাপের দ্বার।' সপ্তম স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ আছে—'দয়া, দান, সত্য, শুচিতা, মৃদুতা ও সাধুতা—এই সকলই ধর্ম।'

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম-এ, বি-এল সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত "বিতস্তি যাগ্‌গ" গ্রন্থে বহু বৌদ্ধনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অতিথি সেবা : বৌদ্ধ ধর্মে অতিথি-বৎসল হইবার বহু নির্দেশ দেখা যায়। অতিথিপরায়ণ হইয়া পুণ্যার্জন-নীতি বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। "দীঘনিকায়ে" লিখিত আছে, 'আদর্শস্থানীয়া পত্নী সর্বদা পতির পরিবারস্থ জনগণের প্রতি সেবাপরায়ণা হইবে।' বৌদ্ধজনমত ও শাস্ত্রবিধি অনুসারে অতিথি সেবার কার্য তিনটি পর্যায়ে বিভাজ্য :

(১) গৃহীগণের মধ্যে অতিথিসেবার আদর্শ উচ্চ আকার ধারণ করিয়াছিল। গার্হস্থ্য-সমাজের অধীন ব্যক্তিগণের মধ্যে উহার নির্দেশ ছিল। উক্ত গ্রন্থে দেখা যায়, সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত অতিথি-সৎকার করা সাধু নাগরিকের কর্তব্য। জাতকের কাহিনীতে এমনকি নায়ককে অতিথিগণের জন্য সেবাব্রতী হইতে ও তৎপ্রতি বন্ধুজনোচিত ব্যবহার ও সাদর অভ্যর্থনায় গৌরব বোধ করিতে দেখা যায়। জাতকে (৪-৩৯৮) উক্ত আছে 'যে গৃহী তাঁহার অতিথিকে অভুক্ত বসাইয়া রাখে তাঁহার অতিথি-সেবা বৃথা।' বুদ্ধদেব কর্তৃক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইলেও, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় এই প্রকার বহু আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, দেখা যায়।

(২) বৌদ্ধধর্ম প্রচারকালে বহু প্রব্রাজিত দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এই ধর্মের উদ্ভবকালে বহু ধর্মপ্রচারক বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করিতেন। ইঁহাদের ভিক্ষু বলা হইত। গৃহীগণের ভিক্ষুসমাজকে অতিথিসেবায় আপ্যায়ন করিবার নীতি প্রাচীনকালে দেখা যাইত। ভিক্ষুসমাজে নানাজাতীয় লোক থাকিলেও অধিকাংশ সময়ই এই সকল ভিক্ষু বা প্রব্রজিতকে স্নান, আহার ও বস্ত্রদান পুণ্যের ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। অতিথিধর্মী বহু ব্যক্তি অতিথিসেবা পর্যায়ের নিয়মগুলি পালন করিতেন। বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়সমূহে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেন। তাঁহাদের অতিথিরূপে গ্রহণ করিলে বহু নিয়ম পালন করিবার বিধি ছিল। বৌদ্ধগণ প্রব্রজিতগণকে আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাইলে তাঁহারা ঐ সকল বিধি নিয়মের অধীন হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের আতিথ্য সম্বন্ধে বিধিনিষেধ পালন করিতে হইত। আতিথ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করা বৌদ্ধগণ পাপাচার বলিয়া মনে করিতেন। বিনয়পিটকে অশোকের প্রশস্তিগুলিতে সকল ধর্মের প্রব্রজ্যাগ্রহণকারীকে অতিথিসেবাপরায়ণ হইবার নির্দেশ আছে। সম্রাজবংশীয় জৈন সাধু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও বুদ্ধদেব তাঁহাকে জৈন প্রব্রজিতদের প্রতিও অতিথিবৎসল হইবার আজ্ঞা দেন।

(৩) **ভিক্ষু-সমাজের মধ্যে অতিথি সেবা :** বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীগণ পরস্পর পরস্পরের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। পর্যটনকালে এই প্রথা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল। মূলতঃ, বৌদ্ধধর্ম বিধি-নিয়মের ধর্ম। বিধিনিষেধের দ্বারা চরিত্র সংগঠন, আত্মার উন্নতি ইহার প্রধান উপদেশ। চিত্তশুদ্ধি, সংযম অভ্যাস, হিতকর কার্য, চিন্তা ও প্রয়োগ ইহার বিশেষ মন্ত্র, অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-উপাচার।

আগন্তুক যে স্থলে অতিথি হইয়াছেন, তাঁহার ও সেবক-ভিক্ষুর উভয়েরই স্বকীয় মর্যাদা সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ আছে। বিনয়পিটকে, অতি সরলভাবে নানা বিধি-নির্দেশ ও নিষেধাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সেবাপরায়ণ হইবার নীতি বৌদ্ধ হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল বলিয়া আরোগ্যশালা, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বৌদ্ধভারতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। রোগীর চিকিৎসা, আতুরের সেবা বৌদ্ধধর্মের সারকথা, রোগীর সেবা, দুঃস্থ-বিপন্নের সেবা প্রভৃতি ব্যবহারিক নীতিগুলি বৌদ্ধগণের আদর্শজীবন, মনুষ্যত্ব বিকাশ ও উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে এখনও অতিথিকে দেবতার মত গণ্য করা হয়। ভারতীয় কৃষ্টিগত আদর্শ :

গুরোরগ্নির্দ্বিজাতীনাম্ বর্ণানাম ব্রাহ্মণোগুরুঃ
পতিরেকোগুরুস্ত্রীণাম্ সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।

গৃহস্বামী প্রতিদিন অতিথিরূপ দেবতার আকাঙ্খা করে। যদি কোনদিন কোন সন্ন্যাসী অনাহূতভাবে আগমন করে তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের ভারতবাসী সেইদিন দেওয়ালী বা দশেরা পর্ব্বের ন্যায় শুভদিন বলিয়া মনে করে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কেরল, মহীশূর, মাদ্রাস প্রভৃতি দেশে প্রভাতে গৃহিণী দ্বারদেশে আলিম্পন দিয়া থাকেন, অভ্যাগত বা অতিথির শুভাগমন প্রতীক্ষায়।

ভারতীয় সেবাধর্ম্মের আদর্শ ভারতের বাহিরে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। চিকিৎসালয়, আরোগ্যশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার বাসনা সেবাপরায়ণ হৃদয় হইতে উদ্ভূত। সেবাব্রতী আতুরের, দুঃস্থের, রোগীর কষ্ট-দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রাচীন ভারতে এইজন্য বহু চিকিৎসাগার, পশু চিকিৎসাগারের আদর্শ দেখা যাইত। সম্রাট অশোক ও অন্যান্য বহু সম্রাট, জানবীর ধনাঢ্য ব্যক্তি পরোপকার সাধনে এইভাবে ব্যাপৃত থাকিতেন। পরে এই নীতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারের সহিত বহির্ভারতে গৃহীত হয়। কম্বোজ রাজ্যের একটি লিপিতে দৃষ্ট হয়, তথায় ১০২টি (হাসপাতাল) চিকিৎসালয় ছিল ; এগুলির মধ্যে বহুসংখ্যকই রাজা সপ্তম জয়বর্ম্মার কীর্ত্তি। তিনিও এগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাবাৎসল্য ও জনকল্যাণের পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল আরোগ্যশালা নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত দেবমন্দিরের ন্যায় পরিচালিত হইত। রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করার ফলে বহু লোক মৃত্যু ও রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইত। ইহা চারিবর্ণের জন্য উন্মুক্ত থাকিত, জাতি বিচার করা হইত না। দরিদ্র, রোগী, আতুর সকলেই সমভাবে সেবা, ঔষধ, পথ্যাদি লাভ করিত। বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ বৌদ্ধ-ভারতের রীতি ছিল।

কম্বোজের আরোগ্যশালায় বহু রোগী সাহায্য লাভার্থ আগমন করিত। রোগের চিকিৎসার জন্য অকাতরে ধন ব্যয় করা হইত। বৌদ্ধ নৃপতিগণের দৃষ্টি এবিষয়ে সর্ব্বদা সচেতন ও উদার। মহাবংশেও ঔষধ বিতরণ ও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধদেবের একটি বিধান অনুসারে—রোগীর প্রতি যত্ন করা সকলের কর্ত্তব্য ছিল। অন্যান্য অনেক রাজা (হিন্দু রাজাও) এ বিষয়ে আগ্রহশীল থাকিতেন। চম্পা, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি দেশেও সেবাপরায়ণ মনীষীদের পরোপকার ব্রত, সেবা-ধর্ম্ম, অতিথিসৎকার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-তন্ত্র : বৌদ্ধতন্ত্রে, আচার অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার বিধির উল্লেখ আছে। তথায় দৃষ্ট হইবে গ্রহশান্তির কথা। অসৎগ্রহ আমাদের দুঃখ-বিপদের হেতু, একারণে গ্রহশান্তির প্রয়োজন। "অপরাজিতা নিত্যাভপত্রা" মূর্ত্তি-পূজা হইয়া থাকে। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের নায়িকাগণের মধ্যে ইনি অন্যতমা। ইহার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ, উহাদ্বারা ইনি সর্ব্ববিধ অসৎগ্রহ নাশ করেন। দৃষ্টি ক্রোধব্যঞ্জক হইলেও ইহার প্রকৃতি হিতকর, স্বভাব-মধুর। জীবগণকে দুষ্ট

গ্রহাদি হইতে রক্ষা করাই ইঁহার কার্য্য। ইঁহার মুকুটের উপর ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি থাকে। বৌদ্ধ-তন্ত্রের আর এক দেবী অপরাজিতার পূজাও প্রচলিত ছিল।

বিপদ-বিনাশের নানা প্রক্রিয়া ও নীতি বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়। যে ষড়বিধ উপায়ে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে, সেগুলি 'অপরিহানির সূত্রে' ভগবান বুদ্ধদেব জেতবনে প্রচার করেন।

অপরাজিতা : বৌদ্ধশাস্ত্রে একদিকে অপরাজিতাকে পীতবর্ণা, দ্বিভুজা, একমুখী, পদ্ম-দ্বারা গণপতিদলিতা; দক্ষিণকরে চপেটমুদ্রাধরা, বামকরে তর্জ্জনীশাখা, করালবদনা, অবিরলনী, মস্তকোপরি ব্রহ্মাদি বৌদ্ধ-দেবতা কর্তৃক ছত্র-ধৃতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র মতে দেবী অপরাজিতা প্রকৃতপক্ষে দুর্গা বা দুর্গা-শক্তি। ইঁহাকে গণদেবতারও আখ্যা দেওয়া হয়। ইনি সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশিনী, সর্ব্ব-কাম-প্রদায়িনী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ সারথি হইতে সম্মত হইয়াছেন। রথ প্রস্তুত, অর্জ্জুন রথে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অর্জ্জুন দেবী দুর্গাকে স্মরণ করিয়া রথারোহণ কর। তিনি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। বামনপুরাণে ইনি গৌরী ও অহল্যার চারিকন্যার অন্যতমা—জয়া, বিজয়া, অপরাজিতা ও জয়ন্তী। মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার পূজার সময় দুর্গাপূজার বৈগুণ্য নিরসনের জন্য বা বিজয় কামনায় অপরাজিতা পূজা করিতে হয়। পূজার উপকরণে ও বিধি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কোথাও, বিজয়ার দিন বিসর্জ্জনের পর কুল-প্রথানুসারে অপরাজিতার পূজা করিতে হয়। ষষ্ঠীর দিন আশ্বিনের নবমী পর্য্যন্ত দেবী দুর্গার পূজা করিয়া দশমীতে দেবীকে জলে স্থাপন বা বিসর্জ্জনই বিধি। ইহার পর অপরাজিতার পূজা করণীয়। অপরাজিতার বৌদ্ধমত ও হিন্দুমত একপ্রকার মিলিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বহুকাল সংমিশ্রণের ফলে পূজানুষ্ঠান আচারানুষ্ঠানের স্থান লইয়াছে।

কালিকা পুরাণে বিজয়াদশমীকৃত্যে দেখা যায় দুর্গাদেবীর বিজয়ার পর জলক্রিয়া অথবা চরণ ষটবারিদ্বারা শান্তিজলের পর দক্ষিণকরে শ্বেত অপরাজিতা বন্ধন করিবার রীতি ছিল। বর্ত্তমানে কিন্তু হরিদ্রারঞ্জিত জলে দর্পণ রাখিয়া দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বা চরণ-দর্শন বিধিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বে "অপরাজিতা করস্থলতা করোতু বিজয়ং মম" এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া উপরি-উক্ত রাখী বন্ধনের প্রথা ছিল।

"কেহবা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেহবা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

মাতৃপূজার অঞ্জলী

স্বামী অভেদানন্দ

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবী ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥"

আজ 'মহাষ্টমী'। জগৎ-জননী শক্তি-রূপিনী মা-দুর্গার পূজা। তিনি চিন্ময়ী, নিত্যা, এক অখণ্ড সত্তা। নাম-রূপাত্মক, বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট, খণ্ড খণ্ড ভাবসমূহ—যেমন, বিদ্যা-অবিদ্যা, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি, তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইলেও, এবং পুনরায় তাঁহাতে লয় পাইলেও, তিনি কিন্তু এ সবের পারে, ঊর্দ্ধে, স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিতা। ত্রিগুণাত্মিকা হইয়াও তিনি ত্রিগুণাতীতা, ভাবাতীতা। ভক্ত সাধকের প্রাণের আকুলতায় এই চিন্ময়ীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে দিব্য বহির্বিকাশ, তিনি দশপ্রহরণধারিণী হয়ে, দশ দিকে শরণাগত ভক্ত সন্তানদের সর্বদা রক্ষা করছেন। মাতৃভাবে তাঁর এই আগমন অসুর বোঝেনা। তাই তিনি পশুরাজের উপর স্বমহিমায় বিরাজমানা হয়ে, অসুরের পাশব প্রবৃত্তিকে দলন ক'রে, তার দিব্য স্বভাব বিকাশের সহায়তা করেছেন। এই চিন্ময়ীকে পূজা করতে করতে ভক্ত সাধক, শক্তিরূপিণীর কৃপায়, ক্রমে নিজ আসুরিক প্রবৃত্তিকে দলন ক'রে, জয় ক'রে দৈবী সম্পদ লাভে সমর্থ হয়। মহাদশমীতে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে বিসর্জন দিয়ে মাতৃ-ভক্ত চিন্ময়ীকে পুনঃ নিজ হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করেন।

• • • • • •

এখানে একটি প্রশ্ন। মাতৃভক্ত কি মাকে একবার বাইরে (মৃন্ময় মূর্ত্তিতে) আর একবার অন্তরে (চিন্ময়রূপে) দর্শন ক'রে, উপাসনা ক'রে কৃতকৃত্য হন?—উত্তর—না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মাতৃ-দর্শন ভক্ত সাধকের অন্তর্জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, বহির্জগতের সর্বত্র প্রতিবিম্বিত না হচ্ছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মাতৃভাবে ভরপুর হ'য়ে ভক্ত সাধক প্রতিটি নরনারীর ভিতর সেই মাতৃসত্তাকে উপলব্ধি করতে না পারছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এই শক্তি-সাধনার, মাতৃ-উপাসনার বিরাম নাই জানবে। যে মুহূর্ত্তে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একাকার হয়ে, সেই এক অখণ্ড মাতৃ-সত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, সেই মুহূর্ত্তে সিদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত। মাতৃ-সাধক তখন সাধনার চরম অবস্থায় উপনীত হ'য়ে সত্যই কৃতকৃত্য হন এবং তাঁহার মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়।

শক্তি সাধনার ও মাতৃপূজার ইহাই পরম রহস্য।

প্রসীদ প্রসীদ ত্বং দেবী বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

মহাবলীপুরম্ কাঞ্চীপক্ষীতীর্থপথে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাজভবনের আবাসিক আঙিনা হোতে সবে
প্রত্যূষের প্রারম্ভিক আলো রেখা হেরিলাম নভে।
প্রাঙ্গণে পুষ্প-বীথি আম্রকদলতা দিল দেখা
মোদের সম্মুখে। রাষ্ট্রপরিবহনের শীর্ষে লেখা
'অতিথিগণের তরে সংরক্ষিত'। ভ্রমণের লাগি
নারী পুরুষের কলকোলাহল আর ডাকাডাকি'
চলে চারিভিতে। সাঙ্গ হোলো প্রাতরাশ। যাত্রাসুরু,
মাদ্রাজ সহর ছাড়ি দীর্ঘ পথে বক্ষ দুরু দুরু
ঝঞ্ঝাসম পরিবহনের ক্ষিপ্র গতি বেগে;
কিজানি কোথায় শেষ হয়ে যাবো কার ধাক্কা লেগে।
অগ্র পশ্চাতের পানে চেয়ে দেখি অসংখ্য বাহন,
তার মাঝে স্বেচ্ছাসেবকের দল, ভোজ্য অগণন,
আর রাষ্ট্র-প্রতিনিধি। দু'শো মাইলের পরিক্রমা
সমগ্র দিবসে। কত ভাব মর্ম্মে রহে জমা
মোদের মাঝারে। পল্লীপথে লোকযাত্রা চলিয়াছে,
ঘট ভরে যায় বধূ গৃহে, নত শিরে নম্র লাজে।

দু'ধারে উন্মুক্ত ক্ষেত্র, শিচ্ ঢালা রাজপথ ধরি
মোরা চলি দেব-দেউলের দেশে কলরব করি।
জনসঙ্ঘ সম্ভাষণ জানালো মোদের। মোরা থামি
ক্ষণকাল প্রকৃতির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে: সেথা নামি
হেরি কত তালিকুঞ্জ গিরিপদবর্ত্তী জলাশয়,
রবিরশ্মি ঝরিতেছে। পর্ণ কুটীরের অঙ্কে রয়
গোধনেরা। পল্লবে পল্লবে দোলে বাসন্তী হিল্লোল
দুরন্ত শীতের মাঝে চিরবসন্তের দেশে দোল
দেয় কুহু কেকা বারো মাস। তাম্রবর্ণ নরনারী—
যেদিকে নেহারি। পর্ব্বত সমুদ্র অরণ্যের সারি
হাতছানি দিয়ে ডাকে। অতীতের সুবর্ণ নগরী
কাঞ্চীতীর্থ ইতিহাস স্মৃতি-বিজড়িত, অঞ্চলরী
করি আভরণ, দিল আতিথ্য মোদের,—হেথা রহি
পূজিলাম যত আঁকা শিবলিঙ্গে বেদনারে বহি।

হেরিলাম গোপুরম্ জলাশয় অলিন্দ বিশাল
বিপুল স্তম্ভের শ্রেণী আজ আর নাহি মহীপাল।
পল্লবেরা, কীর্ত্তি যারা রেখে গেছে দক্ষিণ তোরণে
এই মহাভারতের—নব নব শিল্প সৃষ্টিসনে।
বিকৃতলী বামনেরে ধীরে ধীরে করি প্রদক্ষিণ,
শঙ্করের বৈজয়ন্তী আজো হেথা হতেছে উড্ডীন।
এলো দিনমণি মধ্যাকাশে, তার প্রখর কিরণ,—
গৈরিক মৃত্তিকা হোতে ধূলিকণা ওঁড়ে অনুক্ষণ।
কাঞ্চী হোতে যাত্রা দূর-পক্ষীতীর্থে, হেথা নিত্য আসে
শুভ্র দুটি বিহঙ্গম নির্দ্দিষ্ট লগনে! রহে পাশে
পুরোহিত। তারা করে সেবা দেবতার অন্নভোগ,
তাদের দর্শন তরে মধ্যাহ্নেতে আসে বহু লোক
শতশত বর্ষ ধরি। দেবদেবী বিহগমিথুনে
ভাবে, আর করে ভক্তিতে প্রণাম সবে। মোরা শুনে
পরম আগ্রহে চলি উৎকণ্ঠার সন্দর্শন তরে
উঁচুনীচু পথ আর তৃণশুন্য হেরিনু প্রান্তরে।

দেখা যায় শৈলশ্রেণী এদিকে ওদিকে। অগ্রসর
হ'য়ে চলি বহু দূর, পাষাণের উপলকঙ্কর
আশেপাশে। শেষে আসি উচ্চশৈলে আরোহণ আর
অবতরণে সিক্ত তনু। পাষাণ সোপানে অনিবার
করি পদক্ষেপ। পঞ্চশত পংক্তিভেদ সাধ্যাতীত
পার হ'য়ে মহাদেব অনুগ্রহে মোরা উপনীত
বিহগমিথুন যেথা করিছে ভোজন। পার্ব্বতীর
সাথে শিব হেরিলাম দেবালয়ে। চিত্তস্থির
হোলো মোর ধ্যানাচ্ছন্ন প্রাণে। হেথা হোতে চলিলাম
সাগরসৈকত পানে,—মহাবলী পুরমের নাম
সুবর্ণ অক্ষরে লেখা ভারতের ইতিহাস মাঝে
প্রাচীন যুগের আলোক স্তম্ভের কীর্ত্তি হেথা রাজে।

বন্দরের ঐতিহ্যের হেরিনু স্বাক্ষর—নিদর্শন
মহান শিল্পের। গুহামাঝে চিত্র নানা সুশোভন
জীবন্ত উজ্জ্বল। সাগরের অলোকাভাসে অবলুপ্ত
দুটি মন্দির। অনন্তশয়নে বিষ্ণু যেথা সুপ্ত
সেই দেবালয় জেগে আছে, সিন্ধু লোলজিহ্বা লয়ে
করিছে লেহন তারে গর্ভে নিতে মায়াবিনী হ'য়ে।
পৌরাণিক স্মরণীয় কাহিনীর শতচিত্রাবলী
খোদিত পাষাণ গাত্রে—হর্ষভরে উঠিল চকলি
হৃদয় পরাণ মম। বিদায়েরে ত্যজি শিল্পপুরী
আবার ফিরিনু মোরা সাথে লয়ে প্রাণের মাধুরী।

হিন্দুধর্মের পূর্ণসংজ্ঞা

স্বামী অখণ্ডানন্দ

বর্তমান ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার আদিশাস্ত্র ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক। ইসলাম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম প্রাচীনতর, খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম প্রাচীনতর এবং বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম প্রাচীনতর। চীনের তাও ধর্ম এবং পারস্যের জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্ম প্রায়শঃ বৈদিক ধর্মের সমসাময়িক হইলেও বৈদিক ধর্মমূল তদপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। শিখধর্ম, শাক্তধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অপ্রাচীন। ভারতীয় নরনারীগণের মধ্যে শতকরা আশি জন হিন্দু। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, একদা ভারতে ষাটকোটী হিন্দু বাস করিতেন। তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা প্রদানকালে কোন ধর্মসভায় ভারতীয় হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত মন্তব্য করেন। ইহা শুনিয়া কোন ইংরাজ শ্রোতা উত্তেজিত হইয়া সর্বসমক্ষে বলেন, যদি হিন্দুধর্ম এতই প্রাচীন তবে তখন হিন্দুগণ ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচার করিতে আসেন নাই কেন? প্রত্যুৎপন্নমতি স্বাধীনচেতা বিবেকানন্দ সত্বর উত্তর দিলেন, "কারণ তখন ইংলণ্ডের সুগন্ধ অস্তিত্বই ছিল না এবং ইংরাজগণ তখন গায়ে রঙ মাখিয়া বানরবৎ গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত।"

হিন্দুধর্মের সংজ্ঞাদান সুকঠিন। এই ধর্ম প্রাচীন, সমৃদ্ধ, ব্যাপক ও বিচিত্র বলিয়া উহাকে সংজ্ঞাবদ্ধ বা নামান্বিত করা দুঃসাধ্য। উহার 'হিন্দু' নাম প্রথমতঃ ভৌগলিক অর্থে ব্যবহৃত। পারস্যবাসিগণ হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ দুর্গম পার্বত্য পথে আসিয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা সিন্ধুনদ কর্তৃক বিধৌত বা প্লাবিত দেশকে সিন্ধু বলিত। হিন্দু শব্দটী সিন্ধুশব্দের অপভ্রংশ। সিন্ধু দেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক পালিত ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলে। হিন্দুধর্ম সিন্ধুদেশে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা ভারতব্যাপী এবং জাভা, মালয় ও বোর্নিও প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহে প্রসারিত। সুতরাং হিন্দুধর্মের উক্ত নাম তমসাচ্ছন্ন অতীতেই অর্থহীন হইয়াছে। পারস্যদেশের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তাতে হিন্দুনাম বহুবার উল্লিখিত দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীকগণের নিকট এই নাম পরিচিত ছিল। স্বদেশে হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম, বৈদিক ধর্ম, আর্যধর্ম ও ভারতধর্ম প্রভৃতি নামেও অভিহিত। স্মৃতিতে ইহার নাম মানব-ধর্ম। চতুর্বেদ ইহার আদিশাস্ত্র বলিয়া ইহাকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। বেদ শব্দের গভীরার্থ মনোযোগসহকারে প্রণিধেয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রাহ্মী প্রজ্ঞাকে বেদ বলে। কোন পুরুষ কর্তৃক বেদ বিরচিত নহে এবং ইহার জন্মকালও নির্দেশ করা যায় না। ইহা অনাদি ও অপৌরুষেয়। প্রাচীন ভারতের অসংখ্য মুনিঋষির আধ্যাত্মিক অনুভূতির সুদৃঢ় ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমানধর্ম যথাক্রমে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া উহাদের জন্মকাল সুনির্দিষ্ট; কিন্তু হিন্দুধর্ম সনাতন ও স্বয়ম্ভু। ইতিহাস ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন আলোক সম্পাত করিতে পারে না। অতি পুরাকাল হইতেই ইহা ভারতে প্রচলিত। এইজন্য ইহার নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন, সুপ্রাচীন। সার্বকালিক উপযোগিতাই

ইহার লক্ষ্যার্থ। সনাতন শব্দ গীতায় ও অন্যান্য শাস্ত্রে বারংবার উল্লিখিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধদেব সনাতন ধর্মের নব সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "বৈরভাব দ্বারা বৈরভাব প্রশমিত হয় না; অবৈরভাব দ্বারাই বৈরভাব বিজিত হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম।" অবশ্য অহিংস নীতিকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত সংজ্ঞা তথাগত কর্তৃক প্রদত্ত।

বৈদিক আর্যগণকে হিন্দু বলা হইত। দ্বাদশ শতকের এক শিলালিপিতে 'হিন্দু' নাম খোদিত পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকগণও ভারতবাসীকে হিন্দু বলিত। পারস্যবাসী ও গ্রীকগণের ন্যায় মুসলমান ও ইহুদিগণ হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিত। আর্য শব্দ বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহুবার উল্লিখিত। বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্বপুরুষগণের ধর্মকে আর্যধর্ম নামে অভিহিত করিতেন। আর্য শব্দের অর্থ ভদ্র বা সভ্য। সভ্য হিন্দু আর্য বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। আর্যত্ব ও হিন্দুত্ব একার্থবোধক। ইংরাজ মনীষী বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীমতী রাইস ডেভিডস্ বলিতেন, "বুদ্ধদেব হিন্দুরূপে জন্মিয়া ও পালিত হন এবং হিন্দুর ন্যায় জীবনযাপন ও দেহত্যাগ করেন।" হিন্দুদের দেশ বলিয়া ভারতভূমির নাম হিন্দুস্থান হইয়াছে। হিন্দু ও হিন্দুস্থান শব্দদ্বয় ঐতিহাসিক ও অর্থপূর্ণ। ইংলণ্ডে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে হিবার্ট বক্তৃতাবলী প্রদান করেন তাহাতে তিনি হিন্দুধর্মকে মানব-ধর্ম বলিয়াছেন। সর্ববিধ ধর্মমতের সমাবেশ হিন্দুধর্মে থাকায় ইহাকে উক্ত নাম দেওয়াই সমীচীন। খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ ভারতে আসিবার পূর্বে সমগ্র ভারত হিন্দুগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল বলিয়া তখন উহার নাম হইয়াছিল ভারত-ধর্ম। অতএব আমাদের ধর্মকে কোন্ সংজ্ঞায় ভূষিত করা উচিত? ইহার কোন পূর্ণসংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কি-না। সম্প্রতি বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, ব্রাহ্ম ও আর্যসমাজীগণ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি চলিতেছে। ইহাদিগকে হিন্দু বলা প্রয়োজন। পণ্ডিত জহরলালের জামাতা পার্শী। কবি কাজীনজরুল, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, ব্যারিষ্টার আসফআলি প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমানগণও হিন্দু-নারীকে বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদিগকে অহিন্দু বলা সঙ্গত নহে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মপ্রভাবে অসংখ্য অহিন্দু হিন্দু হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদের দিব্যালোকে হিন্দুধর্মে নিম্নতম পৌত্তলিকতা হইতে উচ্চতম ব্রহ্মবাদ পর্যন্ত সর্ববিধ ধর্মমত সুরক্ষিত হইয়াছে। এইহেতু আমাদের ধর্ম তেত্রিশ কোটী হিন্দুর জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। ঋগ্বেদে আছে, 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' ইহার অর্থ, ব্রহ্ম বস্তু একমেব অদ্বিতীয় হইলেও বিপ্রগণ কর্তৃক বহু নামে বর্ণিত। উপনিষৎ বলেন, বহু গাভী বিবিধ বর্ণের হইলেও যেমন এক সাদা দুধ দেয় তেমনি বহুবিধ ধর্মমত এক লক্ষ্যে সাধককে লইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ নানাপ্রকার ধর্ম সাধনপূর্বক একই সত্য লাভ করিয়া বলিলেন, 'যত মত তত পথ।' তাই হিন্দুধর্ম সূর্য, কালী, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতার সহস্র নাম দিয়াছেন। ভক্ত-কবি পুষ্পদন্ত, শিব-মহিম্নঃ স্তবে সত্যই বলেন, "হে প্রভো, বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগ, শৈব ও বৈষ্ণব-মত প্রভৃতি মানব-রুচির বৈচিত্র্যহেতু ঋজু ও কুটিল মার্গের বিধান দিয়াছে। কিন্তু যেমন নদীসমূহের গম্যস্থল সমুদ্র তেমনি সর্বলোকের একমাত্র গতিস্থান তুমিই।" সমন্বয়ই হিন্দুধর্মের মূলসূত্র। অধিকারবাদ ও ইষ্টবাদ অবলম্বনে হিন্দুধর্ম এই বৈচিত্র্যের মধ্যে অদ্ভুত

ঐক্য-সূত্র রক্ষা করিয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-অধ্যাপক ডাঃ টি. এম. পি. মহাদেবন তৎপ্রণীত Outlines of Hinduism নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে বলেন, হিন্দুধর্মকে একটী মতবাদ (creed) না বলিয়া একটী মোক্ষমার্গ (conduct) বলা উচিত। ইহা একটী চিন্তা-ধারা নহে, ইহা একটী সাধনপথ। ইংরাজ মনীষী হ্যাভেল সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, "ভারতের হিন্দুধর্ম মতবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হয় নাই। ইহাতে মানবীয় আচরণের সুচিন্তিত পরিকল্পনা বিদ্যমান। ইহা আধ্যাত্ম উন্নতির বিভিন্ন স্তরে ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী।"

গোবিন্দ দাস তাঁহার 'হিন্দুধর্ম' নামক ইংরাজি পুস্তকে বলেন, "ইহা অতিশয় অনির্দেশ্য। বস্তুতঃ নরদেহের বিকাশধারাবৎ ইহা যুগে যুগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্যন্ত ইহা একটী বটবৃক্ষের বন্যুকবৎ ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া সুবিশাল কলেবর লাভ করিয়াছে। ইহা নানাদেশে অসংখ্য ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মমত আত্মসাৎ করিয়াছে, কোন কিছুই বর্জন করে নাই। ইহা সর্বগ্রাসী ও সর্বসহ। সর্বশ্রেণীর মানুষ ইহাতে ধর্মালোক পাইবে। ইহা প্রসারণক্ষম ও পরিবর্তনশীল। ইহা অমর ও অজর।" হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের মিলনভূমি, সর্বমতের ঐক্য-কেন্দ্র এবং সর্বদর্শনের সঙ্গমস্থল বলা সঙ্গত। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার India through the Ages নামক পুস্তকে বলেন, হিন্দুধর্ম একটী ধর্ম নয়, ইহা সর্বধর্মের সমন্বয়-ক্ষেত্র। ইহা অদ্বৈত-কেন্দ্রিক বলিয়া সমন্বয়-সঙ্গীত ইহাতে শত সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

অদ্বৈত-ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনন্ত বৈচিত্র্যের মূলে অক্ষুণ্ণ ঐক্য বিরাজমান। স্যার হার্বার্ট রিস্‌লে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ এবং ভারতীয়দের এক জাতি বা এক রাষ্ট্ররূপে গণ্য হইবার দাবীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনিও তৎপ্রণীত People of India নামক পুস্তকে (২৯৯ পৃষ্ঠায়) স্বীকার করিতে বাধ্য হন, "ভারতে বিদেশী দর্শকের চক্ষে ধর্ম, প্রথা, ভাষা, সামাজিক রীতি ও ভৌগলিক ভিন্নতার বিবিধ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তৎপশ্চাতে কন্যাকুমারী হইতে হিমালয় পর্যন্ত সারা দেশ ব্যাপিয়া তথাপি বিদ্যমান হিন্দুজীবনের সাদৃশ্য ও ঐক্য। এমন এক সার্বজনীন চরিত্র, এক সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তির দেশ জুড়িয়া অন্বেষিত, যাহাকে অংশে অংশে বিভক্ত করা অসম্ভব।" হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বত্র সার্বজনীন বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনিয়ার উইলিয়ামসের Hinduism, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের Hindu View of Life, স্বামী বিবেকানন্দের Essentials of Hinduism, বীর সাভারকরের Hindutva, স্বামী নির্বেদানন্দের Hinduism at a glance এবং ডি. এস. শর্মার Renaissance of Hinduism এবং Primer of Hinduism এবং what is Hinduism প্রভৃতি পুস্তকে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও সংজ্ঞা ও বিশেষত্ব আলোচিত।

মহাত্মা গান্ধী সত্যই বলেন, "সত্যানুসন্ধানই হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র। যদি আজ ইহা নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় ও উন্নতিবিমুখ হইয়া থাকে ইহার কারণ আমরা বিদেশীয় শত্রুপুঞ্জের সহিত বহুশতক সংগ্রামের ফলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। যখনই এই ক্লান্তি দূর হইবে তখনই উহা অভূতপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িবে।" ফরাসী মনীষী রোমাঁ্যা রোলা বলেন, "হিন্দুধর্ম বিভিন্ন মতের সমন্বয় সঙ্গীত, বিচিত্রবর্ণ পুষ্পরাশির মালা। অসীম বৈচিত্র্য সত্ত্বেও

ইহার ঐক্য অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন এবং ইন্দ্রকাল হইতে শ্রীনগর ও কেদারনাথ হইতে কন্যা-কুমারী পর্যন্ত সুবিশাল মহাদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখিয়াছে। যেমন অন্য দেশে রাজনৈতিক ঐক্য বলবান, তেমনি ভারতে ধর্মীয় ঐক্য সুদৃঢ়।" দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সম্রাট অশোক উৎস্থাপিত স্তম্ভসমূহে এই উদার বাণী খোদিত করাইয়াছিলেন, "দেবপ্রিয় মহারাজ ধর্মবিশ্বাসের সর্বরূপকে সম্মানিত করেন। তিনি ধর্মদান অপেক্ষা অন্য কোন দানকে বা সম্মানকে বড় মনে করেন না। স্বীয় ধর্মকে শ্রদ্ধা করা এবং অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা না করাই আমার মূল নীতি। আমার এই উদার নীতি যে অমান্য করে সে অন্যের অনিষ্ট অপেক্ষা নিজের অনিষ্ট অধিকতর করে।" বৈদিক যুগে সমন্বয়ের সামগান যেমন বাজিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি বৌদ্ধযুগেও ঘটিয়াছিল। ধর্মাশোকের যে বাণী উল্লিখিত হইল তাহা বুদ্ধবাণীর প্রতিধ্বনি।

চিরকাল অনুদারতা হিন্দুধর্মে অনুৎসাহিত। অল্প জ্ঞানের ফলে সংকীর্ণতা উৎপন্ন হয়। তথাগত বুদ্ধদেব ক্ষুদ্রচেতার ধর্মজ্ঞানকে অন্ধদের হস্তীদর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তৎকথিত উপাখ্যান সংক্ষেপে এখানে বিবৃত হইল। একদা একদল ভিক্ষু শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাটনে বহির্গত হন। তাঁহারা তথায় অনেকগুলি সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িককে এইরূপে বিবদমান দেখিলেন—ইহা সত্য নহে, ইহাই সত্য। ইহাই সত্য, ইহাই অসত্য। তাহারা বিরুদ্ধ মতগুলি শুনিয়া বিচলিত হইলেন এবং তথাগতের সমীপে উক্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। ভিক্ষুদের কথা শুনিয়া ভগবান উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুগণ, ঐ সাম্প্রদায়িকবৃন্দ ধর্মান্ধ ও অনুদার। তাহারা সত্যও জানে না, অসত্যও জানে না। এইরূপ অজ্ঞানের অবস্থায় তাহারা বিতর্ক বা বিতণ্ডা করে। এই সম্বন্ধে একটী গল্প শোন। এই শ্রাবস্তিতে পূর্বকালে এক রাজা বাস করিতেন। একদা তিনি কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, এই নগরের সমস্ত অন্ধকে আনিয়া একত্রিত কর। রাজার নির্দেশে উক্ত ব্যক্তি শ্রাবস্তীবাসী অন্ধগণকে আনিয়া তৎসমীপে সমবেত করিলেন। রাজা তখন তাহাকে বলিলেন, উহাদিগকে একটী হাতী দেখাও। অবিলম্বে রাজাজ্ঞা পালিত হইল। উৎসুক অন্ধগণ হস্তীদর্শনার্থ অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে হাতীর মাথা, কাণ, দাঁত, শুঁড়, পা, পীঠ, লেজ ও পুচ্ছ স্পর্শ করিল। তাহারা স্ব স্ব দর্শনের বিষয় পরস্পরকে বলিতে লাগিল। এই সময় কৌতূহলী রাজা তথায় আসিলেন এবং অন্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেমন হাতী দেখিলে, একে একে আমাকে বল।" তদুত্তরে অন্ধগণ স্ব স্ব অনুভব রাজার নিকট ব্যক্ত করিল। যে অন্ধ হাতীর মাথায় হাত দিয়াছিল সে বলিল, রাজন্, হাতীটা হাঁড়ির মত। যে অন্ধ হাতীর কাণ স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল, রাজন্, হাতীটা একটা কুলোর মত। যে হাতীর দাঁত ছুঁইয়াছিল সে বলিল, আমেরটা লাঙ্গলের ফালের মত। যে হাতীর শুঁড় ধরিয়াছিল সে বলিল, উহা নিশ্চয়ই সাপসদৃশ। যে হাতীর পেট স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল, হাতীটা ধানের মরাইর মত। যে হাতীর পায় হাত দিয়াছিল সে বলিল, ইহা একটি থামের মত। যে হাতীর পীঠ ধরিয়াছিল সে বলিল, উহা প্রস্তরময় শীল (mortor) তুল্য। যে হাতীর লেজ অনুভব করিয়াছিল, সে বলিল, উহা বড় নড়ার মত এবং যে হাতীর পুচ্ছ ধরিয়াছিল, সে বলিল, উহা শিখিপাখার মত। অনন্তর অন্ধগণ পরস্পরের উক্তি প্রতিবাদ পূর্বক ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হইল এবং অত্যন্ত উত্তেজিত

হইয়া মারামারি করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন তথাগত বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, যাহারা সত্যদর্শন করে নাই তাহারা উল্লিখিত অন্ধগণ তুল্য সত্যের আংশিক বিবৃতি দেয় এবং ইহাকে চরম সত্য ভাবিয়া ঝগড়া করে।

যে গল্পটি উল্লিখিত হইল, ইহা বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মীয় সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে বলিতেন। নিশ্চয়ই তিনি কাহারো নিকট ইহা শুনিয়াছিলেন। আমরা এতক্ষণ ধরিয়া হিন্দুধর্মের স্বরূপ বিবৃত করিলেও উহার কোন সংজ্ঞা দিতে পারি নাই। বস্তুতঃ এই ধর্মের সংজ্ঞাদান অপেক্ষা স্বরূপবর্ণনা সহজসাধ্য। গোবিন্দ দাস ইহার একটী সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলেন, হিন্দুধর্মের কোন সংজ্ঞাই পূর্ণ হয় না, প্রত্যেক সংজ্ঞাই অপূর্ণ বা অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। হিন্দু হইতে হইলে হিন্দু পিতামাতা হইতে জন্মও প্রয়োজন নহে। ব্রাত্য স্তোম নামক প্রাচীন প্রথা দ্বারা শত শত অহিন্দু, এমনকি এক এক অহিন্দু জাতি হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে। ব্রাত্য স্তোমের বিষয় তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, প্রাকবিংশ ব্রাহ্মণ (১৭+১—৪), বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র (২৪।৬), কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র (২২।৪) এবং লাট্যায়ন সূত্র (১৮।৬) প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশদ আকারে বিবৃত। অহিন্দু জাতির হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্তির কথা রামায়ণে ও মহাভারতে উল্লিখিত। যে সকল হিন্দু অনিচ্ছায় ধর্মান্তরিত ও যে সকল হিন্দু নারী বলপূর্বক ধর্ষিত হইয়াছে তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনঃগ্রহণের জন্য দেবল স্মৃতি সুবিধান দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। হিন্দু সমাজের মধ্যবর্তী নিম্ন শ্রেণীকে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নয়নের বিধান আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যমান। এক শাশ্বত সুনীতি শুদ্রকে স্বীকার পূর্বক আমাদের ধর্ম মানুষকে দেবতার পদবীতে উন্নয়নে সদাসচেষ্ট। কোন গ্রন্থে আছে—

গণিকাগর্ভসম্ভূতো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
তপসা ব্রাহ্মণো জাতঃ সংস্কারাঃ তত্র কারণাঃ॥
জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্যাঃ ঋষ্যাক্যাঃ তু পরাশরাঃ।
বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বম্ প্রাপ্তাঃ যে পূর্বমদ্বিজাঃ॥

অনুবাদ—মহামুনি বশিষ্ঠ বেশ্যাপুত্র হইয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। শুভ সংস্কারই ইহার প্রধান কারণ। ব্যাসদেব কৈবর্ত জননীর গর্ভজাত এবং তৎপিতা পরাশর চণ্ডালীসুত। যাঁহারা পূর্বে অদ্বিজ ছিলেন তাহারা অনেকেই উক্ত উপায়ে দ্বিজত্ব লাভ করেন।

হিন্দুস্থানের ভৌগলিক সীমার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইলেই হিন্দু হইবে, এমন নহে। কারণ, বিদেশে প্রবাসী হিন্দুগণের সন্তানগণও হিন্দুই হইয়া থাকে। বেদে বিশ্বাসও হিন্দুত্বের সর্ত নহে। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধগণ বেদে অবিশ্বাসী হইয়াও হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়। গীতাতেও এই মত সমর্থিত। চাতুর্বর্ণ্য স্বীকার না করিলেও হিন্দু হওয়া যায়। আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ ও শিখ সমাজ চতুর্বর্ণ অস্বীকার করিয়াও হিন্দু নামে পরিগণিত।

গো-ব্রাহ্মণের সেবায় বিশ্বাসী না হইলেও হিন্দু হওয়া যায়। কারণ এক শ্রেণীর হিন্দু গোমাংস আহার করে। বৈদিক যুগে গোমাংস আহার প্রচলিত ছিল এবং বেদে ও

মহাভারতে অতিথিকে গোঘ্ন বলা হইয়াছে। সাঁওতালাদি অসভ্য হিন্দুগণ মুসলমানদের মত গোমাংস আহার ভালবাসে; আবার কোন কোন হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে গরম জলও খায় না। হিন্দু হইবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস বা আস্তিকবুদ্ধিও প্রয়োজন নহে। মীমাংসকগণ ও যোগিগণ নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক হইয়াও হিন্দুসমাজ্য। শিখাসূত্র ধারণ, পানাহারের বিধি এবং ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমে বিশ্বাসও অপরিহার্য নহে। আধুনিক হিন্দুগণ এই সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। অবতারে বিশ্বাসও অনাবশ্যক। আগা খাঁর পদানুগ খোজা মুসলমানগণ দশাবতারে বিশ্বাসী। হিন্দুদের দশাবতারের মধ্যে কল্কির স্থানে তাহারা আলিকে বসাইয়াছে এবং খোজা সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ যিনি যখন হইবেন তিনিই অবতাররূপে পূজিত হন। পশ্চিম ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বাধ্য হইয়া ইসলাম গ্রহণপূর্বক খোজা নামে অভিহিত। তাহারা এখনও উপবীত ব্যবহার করে। ভারত-প্রবাসী পার্শী নর-নারীগণও আর্য বলিয়া অন্যাবধি উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণগণ অধুনা যজ্ঞসূত্র ধারণ করে না; কিন্তু পার্শী নারীগণ স্বদেশ পারস্য হইতে চিরতরে নির্বাসিতা হইয়াও উহা বর্জন করে নাই। বানারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এ. বি. ধ্রুব লিখিয়াছেন, "খোজাদের ব্যবহারার্থ গুজরাতী ভাষায় অথর্ববেদ রচিত হইয়াছে।" এই বৃহৎ গ্রন্থ বহু পীর কর্তৃক লিখিত। মধ্যযুগে আল্লোপনিষৎ মোগল সম্রাটদের উৎসাহে সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছিল। বেদানুরাগ ধর্মান্তরিত হিন্দুদেরও মজ্জাগত। অহিন্দুগণও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকারে সাহসী বা সমর্থ হয় নাই। উল্লিখিত গুজরাতী পুস্তকে পীর ইমাম শাহ দশাবতারের স্তোত্ররচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহম্মদকে শ্রীহরির অবতার বলা হইয়াছে। ইসলাম ধর্মে অবতারবাদ অস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও খোজাগণ অবতারে বিশ্বাসী। ইহা নিঃসন্দেহে হিন্দু সংস্কৃতির দুর্জয় প্রভাব। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি জেনারেল স্মাট্স মহাত্মা গান্ধীকে সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "আমরা আপনার দেশবাসীদিগকে ভয় করি না; আমরা আপনার সংস্কৃতিকে ভয় করি।" হিন্দুধর্ম যুগে যুগে দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী নবরূপধারণে সমর্থ। সনাতনধর্মের যুগোপযোগী রূপকে স্মৃতিধর্ম বা যুগধর্ম বলা হয়।

ইংরাজ মনীষী ভ্যালেন্টাইন চিরল তৎপ্রণীত India old and new নামক পুস্তকে বলেন, "প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম ও নমনীয় মহাশক্তি বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্যময় অগণিত বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপ্রথাকে এমন এক সামাজিক পরিবেশে সমন্বিত করিয়াছে, যাহাতে স্বদেশীয় জাতিসমূহ সহজে আশ্রয় পাইয়াছে এবং যাহা আর্য হিন্দুর উন্নতি বিধানে সর্বপ্রকারে সমর্থ।" বীর সাভারকর তৎপ্রণীত 'হিন্দুত্ব' শীর্ষক গ্রন্থে হিন্দুধর্মের পূর্ণসংজ্ঞা দানে অসমর্থ হইয়া বলেন—

আসিন্ধুসিন্ধু পর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥

অনুবাদ—সিন্ধু নদী হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ভারতভূমি যাহার নিকট পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমিরূপে গণ্য তাহাকেই হিন্দু বলা উচিত।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, 'যতো অভ্যুদয়ঃ নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।' ইহার অর্থ, যাহা

হইতে ঐহিক উন্নতি ও পারত্রিক মুক্তিলাভ হয় তাহাই ধর্ম। এই অর্থে হিন্দুধর্মে মূর্ত হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, হিন্দুধর্মে বিশ্বচিন্নয়ী (World-moving) ও রাষ্ট্র সৃজনী মহাশক্তি বিরাজমান। হিন্দুধর্মকে Indianism বা ভারতবাদ বলা চলে। কারণ, ইহা ভারতীয়তার বিমূর্ত বিগ্রহ। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধযুগে সমগ্র প্রাচ্যকে আর্যভাবাপন্ন করিয়াছে এবং বর্তমানযুগে সমগ্র পৃথিবীকে বেদান্তমুখী করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

আরতি

শান্তশীল দাশ

আরতি করিগো কার ? দেবতা কি আছে দেবালয়ে ?
পূজা উপচার লয়ে চলে শুধু মিথ্যা অভিনয়।
অভিমানী পূজারীর অকারণ উচ্চ কোলাহল ;
শূন্য মন্দিরের মাঝে প্রতিধ্বনি ওঠে বারবার।

দেবতা দেখেছি আমি নিপীড়িত মানুষের মাঝে।
যেথা কাঁদে অসহায় অবিচারে আশাহত প্রাণ ;
ছদ্মবেশী বর্বরেরা যেখানে আঘাত হানে শুধু—
সত্য, প্রেম, ন্যায়, নিষ্ঠা অধোমুখী ঘৃণায় লজ্জায়।

দেবালয় হ'তে নেমে (আর্তের হৃদয় যেথা কাঁদে,
আকাশের পানে চেয়ে নীরবে জানায় অভিযোগ)
সেই বঞ্চিতের দলে এক পাশে নিয়েছে আশ্রয়
দেবতা ; দেখেছি আমি দু'নয়নে বেদনার ধারা।

বিফল হবে না জানি এ বেদনা, এই আঁখি ধারা,
রুদ্র অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে এই ধরণীতে।
রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে ধ্বংস হবে সর্ব মলিনতা ;
অমঙ্গল মুক্ত হবে এ ধরণী সেদিন আবার।

আলোকে উজ্জ্বল সেই প্রলয়, প্রশান্ত ধরণীতে
দেবতার পূজা হবে অন্তরেতে প্রতি মানুষের ;
বাহ্য উপচারে নয়, প্রীতির পবিত্র মন্ত্র দিয়ে—
সেই মন্ত্র জপি আমি নিশিদিন নিভৃতে গোপনে।

ভাষা ও উপভাষা

অধ্যাপক বীরেন্দ্র ঠাকুর, এম. এ

সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ভাষা হচ্ছে সেই অর্থবান ধ্বনি, যা মানুষের মুখ থেকে নির্গত। কিন্তু, পারিভাষিক অর্থে, ভাষা হচ্ছে একটা জাতি বা দেশের ভাবপ্রকাশের এমন এক অর্থবান মৌখিকধ্বনিময় বাহন, যা মোটের মাথায় স্বপ্রতিষ্ঠিত ও অনন্য-নির্ভর। যে-বুলি বা বাঙ্‌ময় প্রকাশ কমবেশি আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ, যা পদ-ইডিয়ম-বাক্য-ছন্দরীতির বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়তা অর্জন করেছে, সংকুচিত অর্থে, তাই হল ভাষা। আর, একটি স্বতন্ত্রী, স্বকীয়তা-বিশিষ্ট ভাষা ভিন্নভাষার সংস্পর্শে এসে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে-রূপ নেয়, তাই হল উপভাষা। অর্থাৎ, একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বাবলম্বী, বৈশিষ্ট-গর্বী ভাষা হতে উদ্‌ভূত আঞ্চলিক ভাষাকেই উপভাষা বলা যেতে পারে। স্থূল অর্থে ভাষা বলতে ভাষা ও উপভাষা দুই বোঝায়। কিন্তু, সূক্ষ্ম বিচারে, ভাষা আর উপভাষা এক জিনিস নয়।

একই ভাষা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নানা উপভাষার সৃষ্টি করে। ভাষা থেকেই উপভাষা জন্মায়; কিন্তু, এমনি এক উপভাষা আবার তেমন-তেমন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে, যাতে সে ভাষা-নাম পাবার অধিকারী হয়। তার মানে, উপভাষা থেকেও ভাষার উদ্‌ভব হতে পারে। কিন্তু, সব ভাষাই যে উপভাষা থেকে জাত, তা বলা যায় না। একথা অবশ্যই বলা যায় যে, সব উপভাষাই কোন-না-কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলি কোন উপভাষা থেকে জাত নয়। কিন্তু, তার পরবর্তী যুগের অনেক উপভাষা থেকে গড়ে উঠেছে কতক-কতক ভাষা; আর, এমন হয়েছে যে তার কতকগুলি তো জগতের শ্রেষ্ঠভাষানিচয়ের মধ্যে বলে বিচারিত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয়, বা ইন্দো-আর্য, তিব্বত-চীন, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠীগুলির আদিতম ভাষাগুলিকে কোনো উপভাষা থেকে উদ্‌ভূত বলে ধরবার উপায় পাওয়া যায় না। কিন্তু, এইসব আদিম ভাষাগুলি থেকে জাত উপভাষাগুলির কিছু কিছু অন্তত জগতের সেরা ভাষা-গুলির অন্যতম বলে ধরা যায়; যেমন, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, গ্রীক, লাটিন, প্রভৃতি।

ভাষা থেকে জাত উপভাষাগুলোও কালে এক একটা ভাষায় পরিণত হতে পারে; কিন্তু, সেখানেই গতির শেষ নয়। সেই এক একটা ভাষা থেকে আবার কতকগুলো-করে উপভাষার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, ইন্দো-আর্য ভাষা থেকে প্রাচীন-ভারতীয় আর্য-নামক উপভাষা হল, এই উপভাষাটা আবার ভাষা হয়ে দাঁড়ালো কালক্রমে। প্রাচীন-ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে আবার শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, পৈশাচিক ও মাগধী নামক উপভাষাগুলোর উদ্‌ভব হল; এই উপভাষাগুলোও যে স্থাণু বা নিশ্চল হয়ে রইল, তা নয়: এরা আবার এক একটা ভাষায় পরিণত হল। এখানেও শেষ নয়। এগুলো ভাষারূপে পরিণত হবার পর যখন নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করল তখন ঐ ভাষাগুলো থেকে আবার

কতকগুলো উপভাষা জন্মাল। যথা, মাগধী প্রাকৃত নামক উপভাষা ভাষার স্বকীয়তা ও গৌরব পাওয়ার পর তা থেকে আবার মগহী-মৈথিলী-ভোজপুরী, ওড়িয়া, আসামী, রাঢ়ী-বাংলা নামক উপভাষাগুলো গজিয়ে উঠল। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। এই উপভাষাগুলো ফের ভাষা হবার সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করল।

একটি ভাষা কথিত হতে হতে কয়েকটি কারণে রূপান্তরিত হয় উপভাষায়। তখন উপভাষাটি শক্তিসামর্থ্য লাভ করতে করতে সেইটিই বিশেষ ব্যবহারের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রাচীন ভাষাটি লেখ্যভাষারূপে যদি-বা বর্তায় তো কথ্যভাষা থাকে না আর। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এমনি করে রূপান্তরিত হয়ে চলে ভাষা ও উপভাষা। একটি উপভাষা কথ্য হতে হতে যখন যথেষ্ট শক্তসামর্থ্য হয়ে ওঠে, তখন সেটি লেখ্যভাষার সম্মান দাবি করে; অন্তত, প্রয়োজন ও কার্যকরিতার তাগিদে তার দাবি মানতে হয়। তখন নিত্যব্যবহারের ভাষা, জীবন্ত ভাষাকে উপেক্ষা করা যায় না, করা সংগতও হয় না: তাকে স্বেচ্ছায় আবাহন না জানালে সে জোর করে সেঁধিয়ে অনর্থ বাধাতে সচেষ্ট হয়। আর, তখন শাবেক ভাষায় সব কাজ ঠিকমত চলে না, চলবার নয়ও। তখন হিসেবী কাজ হচ্ছে চলতি ভাষাকে মেনে নেয়া; মেনে নিয়ে তাকে ঐতিহ্যের অনুগত করা। এতে এই হয় যে, শাবেক ভাষার যেটুকু উপস্থিত পরিবেশের উপযোগী, সেটুকু সসম্মানে রক্ষিত হয়। এখানে সমন্বয় না ঘটাতে পারলে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই কথাটা ভেবেচিন্তে মনে রাখবার যে, শাবেক ভাষার মর্যাদা দিতে হবে বলে যে চল্‌তিভাষাকে উপেক্ষা অবহেলা করতে হবে, তা ঠিক নয়। চল্‌তিভাষায় স্বীকৃতি মানেই শাবেক ভাষার অবমাননা নয়; শাবেক ভাষার মানমর্যাদা যেটুকু থাকবার, সেটুকু চল্‌তিভাষার স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই থাকতে পারে, শুধু জোর করে জীর্ণ-প্রাচীন ভাষার সবটুকু রক্ষা করার চেষ্টায় নয়।

ভাষা হতে উপভাষা হয়, আবার, উপভাষা হতেও ভাষা হয়। কিন্তু, সব ভাষারই উপভাষা হয় কিনা, এবং, সব উপভাষাই ভাষায় পরিণত হয় কি না, তা বিচার্য। সব উপভাষাই যে ভাষায় পরিণত হয় না, বা হতে পারে না, একথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কোন-কোন উপভাষার ভাষক-সংখ্যা এত কম, আর, শক্তিসামর্থ্য এত অল্প যে উপভাষা হিসেবে টিকে থাকাই দায় হয় তার, ভাষারূপে বিবর্তিত হওয়া তো দূরের কথা। এমন উপভাষার প্রায়ই সম্ভাবনা থাকে সন্নিহিত কোন উপভাষার সঙ্গে মিশে-যাওয়ার, নিদর্শ কথ্যভাষায় আত্মগোপন করার, অথবা, লুপ্ত হবার। আধুনিক যুগে এই কথাটা প্রায় সূত্রের মত মেনে নেয়া যায় যে, সব ভাষারই কিছু না কিছু উপভাষার সৃষ্টি হয়। এখন ভিন্নভাষী লোকদের মেলামিশি হবার সুবিধা-সুযোগ এত বেশি যে, যে-কোন ভাষার উপভাষা সৃষ্টি না হয়ে পারে না। কিন্তু, এ-যুগে আবার এও লক্ষ্য করা যায় যে, উপভাষাগুলির নিদর্শ কথ্যভাষার সংগে মিশে এক হয়ে যাবার ঝোঁক হয়, অথবা, নিদর্শ কথ্যভাষা অঞ্চলে অঞ্চলে গৃহিত হয়ে আঞ্চলিক উপভাষাগুলির লোপ পাবার ভাবগতিক দেখা যায়। অতি প্রাচীন যুগে কোন কোন দুর্গম অঞ্চলের অল্পসংখ্যক লোকেদের ভাষা হয়তো অমিশ্রিত সুতরাং অপেক্ষাকৃত অবিকৃত থাকতে পেত; অর্থাৎ, এমন-জাতের ভাষার ঔপভাষিক রূপ পাবার সম্ভাব্যতা কম ছিল।

এখনো কোনো কোনো ছোট ছোট ঘাপবাসীদের ভাষার ঔপভাষিক রূপান্তর না থাকা, অথবা, কম থাকা হয়তো-বা সম্ভব হতে পারে। তবে, এমন সম্ভাবনা খুব কম; আর থাকলেও, তার স্থায়িত্ব যে দীর্ঘকালীন হতে পারে না, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভাষার ঔপভাষিক রূপ পাওয়ার এবং উপভাষার ভাষার জাতে ওঠার বাস্তবিক অবস্থার কথা বিচারিত হল। এখন এর উচিত অনুচিতের প্রশ্নটা আলোচনায় তোলা যাক অর্থাৎ, ভাষার ঔপভাষিক রূপ-বৈচিত্র্য-গ্রহণের ঝোঁককে কতখানি সমর্থন করা উচিত, আর কতখানি নয়; পক্ষান্তরে, উপভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও পুষ্টিই-বা কতখানি সমর্থনীয়, কতখানি অসমর্থনীয়। ভাষার ঔপভাষিকতা-প্রবৃত্তি একেবারে দমিত করা চলে না। তবে, একথা জানতে হবে যে, ভাষার বহু-ঔপভাষিকতা অর্থাৎ, রূপবৈচিত্র্যের বহুলতা, অনিষ্টকর। উচ্চারণে, কথায়, বচনে, প্রবচনে—ভাষার সর্বত্রই যদি ঔপভাষিক পার্থক্য রইতে থাকে বা বাড়তে থাকে তো ভাষার ঐক্য সংহতি বিপন্ন হয়, ভাষায় ভাঙন ধরে; উপভাষাগুলোর, অন্তত, কোন-কোনটার ভাষা হয়ে-ওঠবার আপ্রাণ আশ্‌কারা পায়। এতে মূলভাষার উন্নতির পথ কিছুটা অন্তত কণ্টকিত হতে বাধ্য। কিন্তু, এই সূক্ষ্ম বিচারটুকুকে পাশকাটিয়ে যেতে দেয়া চলবে না যে, উপভাষার অস্তিত্ব ভাষার পক্ষে কেবলই গতিরোধক নয়, বরং, উপভাষাকে সুপরিকল্পনার কাজে লাগাতে পারলে ভাষার বৈভববৃদ্ধির উপায় হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের ফলে ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং তা থেকে ছন্দবৈচিত্র্য হবার কিছুকিছু নিশানা মিলতে পারে। কিন্তু, এইভাবে ছন্দবৈচিত্র্যের উপায়কে কাজে-লাগানোর পর উচ্চারণ-বৈষম্য দূর করে উপভাষাগুলিতে নির্দশ উচ্চারণের সমরূপতা প্রতিষ্ঠিত করে ভাষার ঐক্য-সংহতি লোকৃত করবার চেষ্টা রাখা উচিত, নইলে, উচ্চারণ বৈষম্য বিভিন্ন উপভাষীদের মধ্যে পারস্পরিক দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে জাতীয় সংহতিও নষ্ট করতে চাইবে। উপভাষাগুলির উচ্চারণ-বৈষম্য দূর করে উচ্চারণের মিল ও সংগতি আনবার জন্যে নির্দশ উচ্চারণের অভিধান প্রণীত হওয়া দরকার; এবং এজন্যে যন্ত্রের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকে একই পদার্থের বোধক পৃথক পৃথক পদ ভাষার সামর্থক শব্দের সম্পদ বাড়ায়। কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস ও অনুপ্রাস এবং কাব্যাত্মক গদ্যরচনাতেও অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক নামক অলংকার রচনা করতে অনুকূল্য করে। তাছাড়া, সমার্থক শব্দের প্রাচুর্য ভাষার মনোটনি দূর করে এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টিরও সহায়ক হতে পারে। উপভাষাগুলির ইডিয়ম, বাচনভঙ্গি ও প্রবচনের বৈচিত্র্যও ভাষার প্রকাশশক্তি বাড়িয়ে ভাষাকে সম্পদশালী করে তোলে। কিন্তু, ইডিয়ম, বাচনভঙ্গি ও প্রবচনের পার্থক্য-বৈচিত্র্য ভাষার শক্তিসম্পদের পরিপোষক হতে হলে এসবের সংগ্রহ হয়ে কোষগ্রন্থ বিরচিত হতে হবে। সব অঞ্চলের লোকদের কাছে এগুলি সহজপ্রাপ্য ও বোধ্য না-হতে-পারলে এগুলি সম্পদ হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবে না। যাতে এগুলি ভাষার শক্তি ও সম্পদ বাড়ায়, তার জন্যে এগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হবে নির্দশ কথা ও লেখা-ভাষায় গ্রহণ করে। আঞ্চলিক উপভাষায় ছড়া, গান, গল্প, কাহাকাহিনী ভাষায় নবকলেবর নিয়ে নির্দশ ভাষার সাহিত্যের সমৃদ্ধি আনতে পারে। এইরকম নানাভাবে উপভাষা ভাষার ঐশ্বর্য ও শ্রী সৃষ্টি করবার যোগ্যতা রাখতে পারে। তবে, এই যোগ্যতাকে মূলভাষার

পুরুষার্থলাভের দিকে উদ্‌দিষ্ট করতে হবে। আসল কথা, মূলভাষার ঐক্য বজায় রেখে যদি উপভাষাসমূহের সম্পদ ভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়, তবেই শুভ। উপভাষানিচয় যতখানি তা করতে সমর্থ, ততখানিই তাদের উপযোগিতা।

'ভাষা থেকে উপভাষা, তা থেকে ভাষা, আবার ভাষা থেকে উপভাষা হয়ে হয়ে চলতে পারে। কিন্তু চলতে পারে বলেই চলতে দেয়া চলবে না। একটা কোথাও থামতেই হবে। নইলে শুধু অকলে অকলে নয়, গ্রামে গ্রামে, এমন কি পাড়ায় পাড়ায় উপভাষা গড়ে উঠে ভাষা ও জাতির সংহতি নষ্ট করবে; কারণ, ভাষাই এখন জাতির সবচেয়ে শক্ত বাঁধন। 'নানান দেশের নানান ভাষা' বা উপভাষা হোক তত ক্ষতি নেই, কিন্তু যোজন-যোজন অন্তর ভাষার রূপান্তর দেখা গেলে নানা অসুবিধা। মূল ভাষার বাঁধুনি শক্ত করে গড়ে-তুলে সে-অসুবিধা দূর করতে হবে।

নাট্যকার দীনবন্ধু ও 'সধবার একাদশী'

শ্রীঅনিল কুমার হালদার

—"Drama is no more setting up of the camera to nature: it is the presentation in parable of the conflict between Man's will and his environment: in a word, of problem." —Bernard shaw.

বঙ্গ-নাট্য সরস্বতী যে কিঞ্চিৎ অধিক নিদ্রাতুর, তাঁর চটুলচরণ পরিক্রমার নূপুরছন্দ যে দীর্ঘক্ষণ পরে পরে ধ্বনিত হয় তা আমরা জানি, তবে মাঝে মাঝে সহসা-নিদ্রোত্থিতের মত তিনি অট্টহাস্য করেন; মাইকেলের হাতে যখন তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হলো, লোকে তার কিছু পরেই সবিস্ময়ে দেখলো দীনবন্ধুর হাতে সে রেখে কিছু কিছু অলঙ্কারও উঠেছে। তারপরেই নিঃসীম স্তব্ধতা। নাটকের চকিত-চমক বাঙ্গলাসাহিত্যাকাশে জ্যোতিসঞ্চার তো করেই নি, উপরন্তু সেই বিদ্যুদ্বিলাসও ক্ষণে ক্ষণে অপগত হয়েছে: সে যাই হোক্ দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে ঐ নাটকীয় কলাকৌশল যে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে তা' নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের বস্তু। বাংলাসাহিত্যে দীনবন্ধুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, ভাব-উদ্দীপনের অত্যুল্লাসের সঙ্গে ভাষাবন্ধন সাযুজ্যের ফলে তাঁকে একটা অনন্যর দীপ্তি দান করেছে: তাঁর কথাবস্তু পাঠকের চিত্তে তীব্রবেগে সংক্রামিত হয় এবং ক্রমশঃ এমন একটা স্থানে আঘাত করে যেখানে অতি সহজেই রসক্ষরিত হয়; সুতরাং সাধারণ পাঠক তো বটেই চিন্তাশীল পাঠকও নির্বাক হয়ে যায়। আর সর্বোপরি তাঁর গাঢ়-নিবদ্ধ অপূর্ব সংলাপ—অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরথ। দীনবন্ধু ভাষার জন্য চিন্তা করেন নি, কারণ তিনি যে চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন তার নাড়ীনক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে, ফলতঃ ঠিক স্থানে ঠিক কথাটিই বেরিয়ে আসে।

একহিসাবে "সধবার একাদশী" এবং মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা"—দুইখানি প্রহসনই এক সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত, গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তু মোটামুটি এক, এমনকি বিন্যাস কৌশলেও সাদৃশ্য রয়েছে। ওখানে নিমে দত্ত, এখানে নবকুমার দুজনেই মদ খায় এবং ইংরেজী বলে। কুলাঙ্গার দুজনেই; ওখানে সুরাপান নিবারিণী সভা, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিনী; দুখানি প্রহসনেরই নামকরণ শেষ বাক্যাংশে গিয়ে স্ফূর্ত হয়েছে।—অপূর্ব্ব। কিন্তু গ্রন্থদ্বয়ের অন্তরালে দীনবন্ধুর নিজেরই যেন একটা চাপা ক্রন্দন, অন্ততঃ বেদনা রয়েছে, কিন্তু মাইকেল নির্ম্মম; তাঁর অন্তরের বিষাক্ত ঘৃণা প্রশ্নবোধক বাক্যেই নিঃশেষিত: তাঁর একটা কঠিন উদ্দেশ্য একেবারে স্ফুট স্বরূপ, কিন্তু দীনবন্ধু একেবারে নির্লিপ্ত, হৃদয়ের ভাব মুখ দেখে বোঝা যায় না, তিনি যখন সকলের চোখের উপর হাসেন, তখন একই সঙ্গে নিজের মনে তাঁর অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। নিমচাঁদের কৌতুককর কথাবার্ত্তায় আমরা যখন হাস্য সংবরণ করতে পারিনা, ঠিক তখনই মাতাল অবস্থায় নিমচাঁদ বলছে—

"মহাদেব! বোম্ ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ড শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিৎ হইয়া শয়ন) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মলজ্জামানমর্য্যাদা-পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ? তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয়, তা গিয়েছ।

"Things at the worse will cease,
Or else climb upward
To what they were before —"

—হা জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরা-হস্তে নিপাতিত করে?"—এই যে, 'রে পাপাত্মা', রে দুরাশয়, রে মাতাল, রে নিমচাঁদ। তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে কি হয়েছ?'—মাতালের পানোন্মত্ততার মধ্যেও যুক্তির ক্রমপরম্পরা এই পতনকে আরো ভীষণ এবং মর্ম্মান্তিক করে তুলেছে। প্রহসনের হাস্য-রসের ফোয়ারায় চোখের জলকে মিশিয়ে দেওয়ার কৌশল, অর্থাৎ ট্র্যাজিক চরিত্রের সেই আত্মবীক্ষণ বা আত্মবিশ্লেষণ শক্তির সংযোজন এই চরিত্রে হয়েছে বলে নিমেদত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে নাট্যরস সংবেদনা সমুজ্জ্বলে উৎসারিত। নিমেদত্তের ঐ অধঃপতনে দৈহিক চৈতন্য যতই স্খলিত হোক, মস্তিষ্ক বিকৃতির এতটুকু পরিচয় নেই—তার মাতলামির মধ্যে গভীরচারী মননশীলতার সন্ধান পাওয়া যায়—যেমন,

'নিম—(যোড়হস্তে দেয়ালস্থ ক্রিওপ্যাটরা ছবির প্রতি) মা! পাপাত্মার পরিত্রাণ হেতু আপনি কি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণ হলেন? মা! ভাষায় বলো। আমার কোন পুরুষে প্রাকৃত অধ্যয়ন করে নাই; জানি! আমি অতি হীন, সহায়-সম্পত্তিহীন, কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরি নামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করা • • • এই দেখ চুপ করেছি, আর কথা কবো না—মা, যদি দেখা দিলেন, তবে এই

করে যাবেন—মাইরি মা, এইবার নিতান্তই চুপ করলেম—মা, তুমি হচ্ছো জগতের মা, তোমার কাছে—সাত খোঁহাই জননি, এইবার চুপ করবো, তুমি অন্তর্ধান হয়ো না।'—

অথবা—

'নিম—ঃ ঃ ঃ আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলিন যার পর নাই Edifying, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Look on Human understanding পড়ে এরূপ হয়নি।

রাম—ব্যাটা মদ খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছে।

নিম—To tell you the truth, Ram Babu, you would make a capital professor of Moral philosophy.'

আবার—

'নিম—দেখ দেখি বাবা, আশ্চর্য্যের কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে! পীড়া হয়, প্রতীকার কর, মেডিক্যাল সায়ান্স হয়েছে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ মিলনের সুখ পাবি—

'Rich the treasure,
Sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain.'

—এই সমস্ত সংলাপেই যুগপৎ হাসি ও কান্নার গঙ্গাযমুনাসংগম: মাঝে মাঝে আকিংখোর কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না কি? ধীশক্তির সমুন্নতি সত্ত্বেও সে যেন নিজের অবশে কোন অদৃশ্য শক্তির স্রোতে ভেসে চলেছে; যে 'I read English, write English, speechify in English, dream in English' বলে সেও অটলের মেঘনাদ বধ কেবার কথা শুনে চীৎকার করে ওঠে—"ওর ভালমন্দ তুমি বুঝবে কি? তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার শ্যাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গালার মিল্টন।"—সুতরাং নিমচাঁদ কোন মানস জগতের অধিবাসী? নব্য ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী বাবুর সে প্রতিনিধি?' না, মধুসূদনের প্রতিবিম্ব? দীনবন্ধু এসম্বন্ধে নিজেই বলেছেন—'মধু কি কখন নিম হয়?' ওষ্ঠ্যতীত নিমচাঁদের চরিত্রে নারীঘটিত যে কলঙ্কের ইঙ্গিত করা আছে মধুসূদন ছিলেন তা' থেকে বহুদূরে; তাঁর উন্মার্গগমনের সঙ্গে যোগসূত্র আছে বটে কিন্তু মাইকেলের জীবন প্রহসনের বস্তু নয়—ট্র্যাজেডির অমূল্য উপাদান, দীনবন্ধু ব্যক্তিগত জীবনেও মাইকেলকে শ্রদ্ধা করতেন দেবতার মত, আর পূর্ব্বেই বলেছি দীনবন্ধু নাট্যকার হিসাবে নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত—ঔদাসীন্যের শিলাতটে তাঁর প্রতিভা মুখর হয়ে ওঠে। সমাজসংস্কারের দিকে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ চক্ষু—নীলদর্পণ থেকে আরম্ভ করে জামাই বারিক পর্য্যন্ত তা' গভীরভাবে মুদ্রিত, সে হিসাবে সধবার একাদশীতেও নব্য ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীসমাজকে কটাক্ষ করা হয়েছে যেমন করেছেন মাইকেল তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়। যদি তাও না হয়ে থাকে যমনাট্যঘরকে জীবিত রাখতে এ' সাহায্য করেছিল প্রভূত পরিমাণে, নিঃসন্দেহ: কারণ—"On the stage comedy, as a destructive, derisory, critical,

negative art, kept the theatre open when sublime tragedy perished. From Moliere to Oscar wilde we had a line of comedic play-wrights who, if they had nothing fundamentally possitive to say, were at best in revolt against falsehood and imposture, and were not only, as they claimed, 'chastening morals by ridicule', but in Johnson's phrase, clearing our minds of cant, and thereby shewing an uneasiness in the presence of error which is the surest symptom of intellectual vitality.—সধবার একাদশী কমেডি না হলেও কমেডির কাজ ওরি দ্বারা সাধিত হয়েছিল। দীনবন্ধুর শাণিত বিদ্রূপবাণ বঙ্গসমাজের চিত্তকে জর্জরিত করে নি? মাইকেলের মেঘনাদবধের ওপর মন্তব্যটাও লক্ষ্যনীয়। চরিত্রভ্রষ্ট বাঙালী যুবক পিতৃধর্মবিদ্বেষী, পতিতমন্য এবং পরিণামে অনুতপ্ত—জীবনের এই অবক্ষয় তথা ব্যর্থতা নাটকটির ওপর ঘনমেঘ সঞ্চার করলেও মাঝে মাঝে হাসির ঝাঝায় তা' প্রায় কেটে গেছে। অর্থাৎ মূলবস্তু-উৎকেন্দ্রিকতা কোথাও বড় একটা দেখা দেয়নি।

ঐ হাস্যরসের মধ্যে নির্মলতার চাইতে অশ্লীলতার গন্ধ আছে বটে, কিন্তু সে অশ্লীলতায় সাহিত্য-রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ' ধারণা অযথার্থ। যুগ পরিপ্রেক্ষিত একটা দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয়তঃ শুচিস্মিত হাস্যরস—বঙ্কিমের হাতেই হয়েছে। এই দীনবন্ধুই যখন নীলদর্পণ লিখতে বসেন তখন প্রতিভার অম্লান জ্যোতি আমাদের আমোদিত করে, তথাপি সেই ক্ষেত্রমণি, আদুরী, সাধুচরণের কথায় কতখানি গ্রাম্য রুচিবিকার অভিব্যক্ত হয়েছে? যাই হোক যে হাস্যরসের কথা বলছিলাম—অটল, নিমচাঁদ ও কাঞ্চনের মধ্যে মদ্যপানের মত্ততা যখন দর্শক অর্থাৎ পাঠককে উন্মনা করে তুলছিল ঠিক সেইসময় ভোলাচাঁদের প্রবেশ ঘটিয়ে পরবর্তী ঘটনার জন্যে ব্যগ্র ও উৎসুক করে তুলেছেন নাট্যকার। যেমন:

'ভোলা—অনার্ড সার, স্মেল সার, আই স্মেল সার, ইউ স্মেল সার, অনার্ড সার, স্মেল সার, ওল্ডটম, স্মেল স্মেল সার—

নিম—তিনি হন কে?

অটল—ভুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

'ভোলা—সান ইন্‌লা সার—স্মেল সার, কান্টি স্মেল সার—বাড়ি থেকে কান্টি খেয়ে বেরিয়েছিলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ বাবুরা, ফ্রেণ্ডস সার ওল্ড টম খাইয়ে দিলে—মিক্ সেড সার, এক্সকিউজ সার।

নিম—ভুক্তেশ্বর বাবু অমন বিজ্ঞ লোক হয়ে এই মূর্খ অবতারের হস্তে কন্যাটি প্রদান করেছেন?

ভোলা—ইউ নো মাই ফাদার ইন্‌লা সার—ইউ মাই ফাদার ইন্‌লা সার (নিমচাঁদের পদধূলি গ্রহণ) ইউ মাই ফাদার ইন্‌লা সার—আই সান্ ইন্‌লা সার।'

এদের কথাবার্তা যখন বেশ এগিয়ে চলেছে ঠিক সেইসময় রামমাণিক্য প্রবেশ করায় ঘটনা নয় পাঠকের মনটা আবার অন্যদিকে ঘুরে গেল। রামমাণিক্য বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে ওঠে—

'বাঙ্গাল বাঙ্গাল করো ক্যান? বাঙ্গাল সায়েবে ভাসে আসছে নাহি? কিন্তুপুর কলকত্তা অষ্টদিনের ব্যবধান, ক্যাবল নিকট, ব্যাসকোস কি?'

এবং—'পড়ির যাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কয়া মস্তক গুরাই দিচে—বাঙ্গাল কউশ ক্যান—এতো অকাজ কাইচি তবু কলকত্তার মত হবার পারছি না, কলকত্তার মত না করছি কি? ... গোরার বারীর বিসকাট বক্কোন করচি, বাতিল খাইচি—এতো কর্য্যাও কলকত্তার মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপদেহতে আর কাজ কি, আমি জলে ঝাপ দিই, আমারে হাজরে কুত্তীয়ে বক্কোন করুক্।' (পতন)

এই রামমাণিক্যকে দিয়া লেখক আবার অন্য কাজও সাধিত করেছেন—

'কেনা—আপনি কি ইংরাজী পড়েছেন?

রাম—পড়চি, বোরো গোলমাল ঠ্যাহে।

কেনা—কেন?

রাম— মর্দ্দাগোর পেরনাউনে হি, হিজ, হিম অইচে, মাইয়াগোর নামে শি, হার, হার অইচে; যদি মর্দ্দাগোর হি, হিজ, হিম অইল, মাইয়াগোর শি, শিজ, শিম অইবে না ক্যান।

নিম—আর কি?

রাম—আর এই হালার পুং 'কোম্'; এবোজির কোম্ডা যে দিহি দেইচো, সে দিহি লাগ্চে; কোম আইবারও অয়, যাইবারও অয়। আমাগোর মাস্টের বক্কোচন্দ্র বলেন কোমডা গর্ভস্রাব, কোম আছেন ও যানও, আর কহন কহন থাহেন।'

এই লেখকই তাঁর জামাই বারিক'-এ জামাই বারিক বর্ণনায় লিখ্লেন,—'একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালাবাবুদের বৈঠকখানায় বস্লে শালাবাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ের করে দিয়েছেন, সব জামাইরা সেখানে থাকে; জামাই, ভাইকি-জামাই, ভাগ্নী-জামাই, নাত-জামাই, জামাইয়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।

—এখন কতগুলি আছে?

—সাড়ে বাহান্ন জন।'

অর্থাৎ নাট্যকারের উদ্ভাবনী কৌশলেই পরিহাসকুশলতার অন্যান্য প্রকাশ। দীনবন্ধুর এই বাক্সংযোজনে জীবন ও জগতের বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত, যেটা প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য্য। বস্তুবিশ্বের এই জ্ঞান এবং তার সম্বন্ধে তিনি এত-ওয়াকিবহাল যে যখন যা'কে ধরেন তার স্নায়ুশিরাশোণিতের স্পন্দন অনুভব না করে ছাড়েন না—এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দীনবন্ধুর মধ্যে ছিল সর্ব্বাতিরিক্ত—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবোচ্ছ্বাস কিছু কিছু বাষ্পময়; গিরিশচন্দ্রের অনেক জায়গায় সেই প্রবীণ অভিনেতার কণ্ঠস্বর শোনা যায়: তবে মাইকেল ও দীনবন্ধু প্রহসনের দিকদিয়ে প্রায়শঃ হাত মিলিয়ে চলেছেন। যেমন—

'সার—আ ইউ, টোম্ চোট্টা হেয়?

যাবাজী—(সভয়ে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি গো, গো, গো,—

সার—হেং হস্তর গো, গো, গো,—চুপরাও, ইউ রাডী বিগর ডেকলাও টোমারা যোগমে কিয়া

হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ ও আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ—হাম বড়া হিন্দু হুয়া রাটে কিস্‌তে! হা, হা, হা!'

(একেই কি বলে সভ্যতা?)

—দীনবন্ধুর সমজাতীয় উদাহরণ ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি।

'সধবার একাদশীতে' একদিকে হাসি, আর একদিকে বেদনা, একদিকে পরিহাস আর একদিকে অশ্রুজল; একদিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অন্যদিকে ক্রন্দন, একদিকে অবিমিশ্র কৌতুক, অন্যদিকে অসহ্য যন্ত্রণা। মৃত্যু পথযাত্রীর ওষ্ঠে স্মিতহাসির মত নিমচাঁদের হাস্যোদ্রেককারী সংলাপে হৃদয়ের গুরুভার বিষাদ, নৈরাশ্য, আত্মধিক্কারী ক্রিয়াকাঙ্ক্ষা পাঠককে অশ্রুসিক্ত করে তোলে অথচ পরিস্থিতির বিন্যাসকৌশলে হাস্যসংবরণও অসম্ভব—এই চিত্তচমৎকারিত্বই প্রহসনটির ফলশ্রুতি, এবং সমস্ত কুশীলবই যেন স্বয়ংক্রিয়, তাদের পশ্চাতে নাট্যকারের সজ্ঞান কারুকলার অস্তিত্ব প্রায় নেই বলে পাঠকের মনে হয়—এই মনে হওয়াটাই উচ্চাঙ্গের আর্ট। দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার নিকট বাংলা সাহিত্য ঋণী, নিঃসন্দেহ; আর সবচাইতে উৎকৃষ্ট হলো তাঁর বাক্‌বিন্যাস অর্থাৎ সংলাপ—এ' সেই সংলাপ যা একনিমিষে আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে পাত্র-পাত্রীরা আমাদের প্রতিবেশী, নিকট আত্মীয় অর্থাৎ সেই—"One touch of nature makes the whole world kin."

কবি নবীনচন্দ্রের গদ্য রচনা

অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

'মধুচক্রের' বিশিষ্ট কবিকণ্ঠেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীনচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠা। খণ্ড কবিতায়, বর্ণনাত্মক কাব্যে, মহাকাব্যে, জীবনীকাব্যে তাঁহার কবিমর্ম্মের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

কিন্তু নবীনচন্দ্রের একাধিক গদ্যরচনাও যে তাঁহার কাব্যসমূহের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে এবং তাহারাও যে কবিমনের উষ্ণস্পর্শ হইতে বঞ্চিত নহে—একথা তাঁহার কাব্যরসমুগ্ধ আমরা সব সময় স্মরণ রাখিনা। ভাবপ্রবণ কবির গদ্যলেখক হইবার পক্ষে প্রকৃতিগত কোন বাধা নাই, রবীন্দ্রনাথই তার উজ্জ্বল উদাহরণ, কিন্তু নবীনচন্দ্র সাহিত্যে যে ধারার প্রতিনিধি, তাহাতে গদ্যপ্রবণ মনোভঙ্গীর প্রকাশ ছিল সঙ্কুচিত। প্রহসন ব্যতীত মধুসূদনের গদ্যভঙ্গী আড়ষ্ট, তাঁহার মূল্যবান পত্রাবলী বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলে হয়ত আমরা বুঝিতে পারিতাম—বাঙ্গালা গদ্যে ব্যক্তি-পরিচয়ের আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হইতে চলিয়াছে। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা তেমন মিলে না।

সাহিত্য-জীবনের সূচনা হইতেই নবীনচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব-সীমায় আসিয়া পড়েন। বঙ্কিম বাঙ্গালা গদ্যকে কী যে অপূর্ব শ্রী-দীপ্তি-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রকাশ-ক্ষমতায়

সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা আজ নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। নবীনচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিরা এমন প্রাণবান গদ্যের সূর্যালোকে অভিষিক্ত হইবার সুযোগ পান নাই। নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ আবেগপ্রবণ কবি, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে একটি পরিহাসচতুর রসিক মন বাস করিত তাঁহা শুধু মহাকাব্য বা কাহিনীকাব্যের ছন্দোবন্ধেই সমগ্র রসনির্ঝরকে বাঁধিয়া রাখে নাই। নবীনচন্দ্র আত্মাদরবিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও অত্যন্ত সামাজিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন, তাই বহুজনের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া আপনাকে উপভোগ করিবার মত যে রসরসিকতা —তাহা তাঁহার ছিল। এই প্রকৃতির লোকের পক্ষে কাব্যের রূপমণ্ডল ছাড়িয়া কখনো কখনো গদ্যের সমতলভূমিতে সকলের সঙ্গে আনন্দকীর্তনে যোগ দেওয়া অস্বাভাবিক নহে; বিশেষতঃ যখন সেই সময়কার বাঙালা গদ্যেই 'কপালকুণ্ডলার' মত রোমান্স, 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' মত সমাজচিত্র, 'কমলাকান্তের দপ্তরের' মত রসমধুর নক্সা রচনা সম্ভব হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের প্রথম গদ্যরচনা 'প্রবাসের পত্র' লেখা হয় ১৮৯২ সালে। এই গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছেন,—"সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীনবাবু ভ্রমণ উপলক্ষে যেখানে যাইতেন, সেখান হইতে সহধর্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলি তাড়াতাড়ি লেখা, হয়ত রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বিশ্রাম-গৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিতেছেন। তবু পত্রগুলি মনোরম হইয়াছে।"

সাধারণতঃ 'পত্র' একান্ত ব্যক্তিগত ভাব-বিনিময়ের সূত্র হইলেও লিপিনৈপুণ্যে অনেক সময় তাহা সৃষ্টিধর্মী রচনাশিল্পে পরিণত হয়। বিদেশী সাহিত্যে চিত্তহারী রসপূর্ণ পত্রসাহিত্যের অভাব নাই। এদেশে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রগুচ্ছ অপূর্ব সাহিত্যরস করিত হইয়াছে। 'পত্রের' কুশীলব তো মাত্র দুইজন,—তাই পত্রলেখকের সম্মুখে তখন সমগ্র পাঠক-সমাজ জীবন্ত হইয়া উঠেনা, একটিমাত্র ব্যক্তিই লেখকের সমস্ত আগ্রহের আশ্রয়। তাহাকে সকলের মত শুধু তথ্য জানাইয়া তৃপ্তি নাই, লেখকের উপলব্ধ রসসত্যটুকু তাহার অন্তরে সঞ্চারিত করাই প্রধান লক্ষ্য। (বলাবাহুল্য, এখনকার দিনের রাজনৈতিক 'পত্রাদির' লক্ষ্যই সর্বসাধারণ, তাই সেগুলি 'খোলাচিঠি')। তবে দুইটি রসিক হৃদয়ের অলক্ষ্য আনাগোনার ভাষা অগণ্য কৌতূহলী পাঠক যেন আড়ি পাতিয়া শোনে। যদিও তাহারা উদ্দিষ্ট নহে, তবু তাহাদের সেখান হইতে কেহ তাড়াইয়াও দেয়না। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ব্যক্তিগত হইয়াও সর্বজনীন, সাধারণের উপভোগ-সম্ভারও সেখানে প্রচুর। নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী ততটা ভাবৈশ্বর্যময় ও কাব্যরসসিক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারত পরিক্রমারত অবস্থায় এই 'প্রবাসের পত্র' সহধর্মিণীকে লিখিত হইলেও মনে হয়—হয়ত বা নবীনচন্দ্রের সজ্ঞান মনে সেগুলির সর্বজনভোগ্য রসাবেদন সম্পর্কে কোন সংশয় ছিলনা। তাই ঐ পত্রসমূহে এক একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের বিশেষ দ্রষ্টব্যের সাধারণ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এবং ঐতিহ্য পরিচয় যেমন আছে, তেমনি কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিরুচির প্রকাশও আছে, আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে গুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে আন্তরিকতার সুর।

পূর্বেই বলিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির পরিমণ্ডল-প্রভাবে নবীনচন্দ্রের গদ্যও অনেকটা স্বচ্ছন্দচারী এবং মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ছাড়া নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক রসিক

হৃদয়ের পরিচয় তো আছেই। বঙ্কিমের মতই কোথাও ধ্বনিগাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, কোথাও বা সহজ ছন্দ বর্ণনার ভাষা, আবার স্থান বিশেষে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা প্রয়োগে তাঁহার লেখনী সম্যক পটু ছিল। দার্জিলিঙ্গ দেখিয়া লিখিতেছেন—"আমি দার্জিলিঙ্গ দেখিলাম। সেই মহিমার মূর্তি হিমাচল দেখিলাম। বাল-সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত, তপ্ত-কাঞ্চনাভ, কাঞ্চনশৃঙ্গ দেখিলাম, জগতে বুঝি এমন মহান দৃশ্য আর নাই। হিমাদ্রি পার্শ্ব ও সানুস্থিত, শৈবিমালায় সুশোভিত, শীতল পাদপশ্রেণীতে উপবনীকৃত, দার্জিলিঙ্গের মনোহারী চিত্রখানি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম।" শৈশব-সুহৃদ উমেশের পত্নীর বর্ণনায় চমৎকার ছন্দতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভাষাও সেখানে সহজ ব্যঞ্জনায় প্রাণবান,—"ঠাকুরাণীটিকে দেখিতে প্রথমে আমাদের মধুবাবুর ফুলেশ্বরীর মত বোধ হয়।.....এ ফুলেশ্বরীর গাম্ভীর্যমাখা ঈষৎ হাসিটুকু, জ্যোৎস্নার অমৃতভরা ভাবটুকু বুঝি সেই ফুলেশ্বরীতে নাই।" 'পুষ্করতীর্থে'র ব্রহ্মার মন্দিরের বর্ণনায় নবীনচন্দ্র সুন্দর কৌতুকরসের সঞ্চার করিয়াছেন। যেমন—"অবতরণ সময়ে ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করি। লোকটি নিতান্ত অরসিক ছিলেন না। তাঁহারও শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের দুই বনিতা। সাবিত্রী দেবীর যজ্ঞে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া, তিনি নবযৌবনসম্পন্না বালস্ত্রী গায়ত্রী-দেবীকে বিবাহ করেন। সাবিত্রী দেবীও আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী, তিনি চটিয়া লাল। পাহাড়ে চড়িয়া নবদম্পতীকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার চরণধৌত জল তাঁহাদের মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। বড় বেজার কথা! স্বয়ং ব্রহ্মার যদি এই দশা হয়, তবে আমরা গরীব কোথায় যাই? মন্দিরে ব্রহ্মার শ্বেতপ্রস্তরের চতুর্মুখ মূর্তি এবং পার্শ্বে সেই ছোট ঠাকুরাণী, বুড়া এত চোটের পরেও নবযৌবনের মায়া ছাড়িতে পারে নাই।"

এমনি বিচিত্র রসসৃষ্টি লইয়া স্থানবিশেষের পরিচয়লাভের প্রয়াস এবং প্রকাশের নিদর্শন এই গ্রন্থের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। 'প্রবাসের পত্র' পত্রসাহিত্য এবং ভ্রমণকাহিনীরূপে উপেক্ষণীয় তো নহেই, বরং নবীনচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে আরও মূল্যবান। আবার উহার সর্বত্রই ভারতের ঐতিহ্য-সম্পদের প্রতি ভক্ত ও স্বদেশবৎসল লেখকের যে গভীর অনুরক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে, পরাধীন ভারতের গ্লানি কলঙ্কের জন্য যে ক্ষুব্ধবেদনা-ফল্গু বহিয়া গিয়াছে, তাহা নবীনচন্দ্রের মনোধর্মের বলিষ্ঠ দিকটিই প্রকটিত করিয়াছে। আবার ভারত-ঐতিহ্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস সুস্থমনা নবীনচন্দ্রকে একেবারে অন্ধ ও পশ্চাৎমুখী করিয়া রেখে নাই; পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের শুভঙ্কর রূপ তিনি 'রুড়কি' পরিদর্শনকালে উপলব্ধি করিলেন।—"সলিলস্বরূপা গঙ্গাদেবীর শক্তি আমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্বপুরুষরা বুঝিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছেন—তাঁহার শক্তিপ্রভাবে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহারা সে শক্তি কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।.....পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, যে শক্তি ঐরাবতকে উড়াইতে পারে, তাহার দ্বারা কলের চাকা ঘুরান যাইতে পারে।.... যেখানে গঙ্গা প্রথম তাঁহার জন্মস্থান বা পিত্রালয় হিমাচল হইতে পদতলস্থ সমতলভূমিতে পড়িয়াছেন, সেখানে গঙ্গার পার্শ্বে হরিদ্বারে গঙ্গা অপেক্ষা গভীরতর করিয়া খাল বা কেনেল কাটিয়া গঙ্গার স্রোত ফিরাইয়া, জলশূন্য স্থানের মধ্যে বহুতর স্রোত বহাইয়া, শেষে কানপুরে লইয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবার গঙ্গার পূর্বস্রোতে ফেলিলেন। ইহাতে অন্তরবর্তী স্থানসমূহে

স্বর্গ ধরিতেছে।.....ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, তাহা উপাখ্যান। ব্রিটিশসিংহ যে এ অঞ্চলে গঙ্গা আনিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।..তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাক্ত। তাহারাই শক্তির প্রকৃত পূজা করিতেছে। আমাদের পূজা কেবল পুতুল-পূজাই বটে।"

১৯০০ সালে নবীনচন্দ্রের 'ভানুমতী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উপন্যাস শুধু গল্পরচনা বা কাহিনীমাত্র নয়, তাহার শিল্পকৌশল সম্পূর্ণ সতন্ত্র, ঔপন্যাসিকের প্রতিভাই ভিন্নজাতীয়। নবীনচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিলনা, কাজেই উপন্যাস হিসাবে 'ভানুমতী' অত্যন্ত অপটু রচনা। চট্টগ্রামে ১৮৭১ সালে সাইক্লোন বা মহাঝড়কে পটভূমিকা করিয়া এক বেদের পালিতা কন্যা ভানুমতীর মধ্যে বিচিত্র অলৌকিকতা আরোপ করিয়া লেখক বৈরাগ্য ও সেবাধর্মের এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কাহিনী অসংলগ্ন, চরিত্রচিত্রণও দুর্বল। বর্ণনীয় বিষয়ের কতকাংশ কখনো কখনো অমিল পয়ারছন্দে প্রকাশ করিবার লোভ কবি নবীনচন্দ্র সংবরণ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যপদ্যময় চম্পূ বিদ্যমান। রোমান কবি Petronius Arbiter এর Matron of Ephesus গল্পে, ফরাসী সাহিত্যে Count Anthony Hamilton এর রচনায়, ইংরেজীতে Cowley-র Essayতে এই গদ্যপদ্যে কাহিনী বলার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। 'ভানুমতী'তে নবীনচন্দ্রের এইরূপ প্রয়াস স্বকপোলকল্পিত কিংবা বিদেশী সাহিত্যের আদর্শজাত, ঠিক বলা যায়না; তবে তাহার ফলে তাঁহার রচনার গতি বেগবান না হইয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ বা বিশেষত্ব ইহাতে কিছু না থাকিলেও বর্ণনা ও ভাষারীতিতে বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলার' প্রভাব লক্ষণীয়। নবীনচন্দ্র জানাইয়াছেন, দ্বাদশবর্ষবয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী 'আশার' আগ্রহাতিশয্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক সপ্তাহ মধ্যে 'ভানুমতী' রচিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।—"ভানুমতী বালিকার পাঠোপযোগী সরলভাষায় একটি সরল গল্পবিশেষ। তবে নরনারীর ইন্দ্রিয়জনিত প্রেম ভিন্ন বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে পারে কিনা, এবং উপন্যাসে গদ্যপদ্য ব্যবহার করিলে কিরূপ লাগে, উপন্যাস লেখকদের চিন্তা করিয়া দেখিতে দেওয়া—এই দুটি আমার উদ্দেশ্য ছিল। এই খানে 'ভানুমতীর' নূতনত্ব।" কিন্তু বস্তুতঃ ভানুমতীর ভাষা আদৌ 'বালিকার পাঠোপযোগী সরলভাষা' নহে। নবীনচন্দ্রের অপর দুটি উদ্দেশ্যের বাস্তবপরীক্ষাও এ ক্ষেত্রে যে সার্থক হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য।

যাহা হোক, আখ্যায়িকাটিতে পূর্বাপর চট্টগ্রামের এক সুন্দর স্থানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে বর্ণনাও বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। —"শরৎকাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্যের কিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি; পূর্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎ শস্যক্ষেত্রখচিত তটভূমি।" (১ম অধ্যায়) "পূর্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ণ আসিল। অপরাহ্ণের পর সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্র ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উন্মত্তের মত

জমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অস্তসময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে। আজি অচঞ্চল শবমালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রীড়া করিতেছে।"

(৭ম অধ্যায়)

পাঁচভাগে সম্পূর্ণ নবীনচন্দ্রের দীর্ঘ আত্মজীবনকাহিনী "আমার জীবন" প্রকাশিত হয় ১৯০৮—১৯১৪ সালে। একালে বড়, মাঝারি প্রায় সব কবি-সাহিত্যিকই আত্মজীবনী লিখিতেছেন, কেহ কেহ-বা আপন সাহিত্যগোষ্ঠীর কীর্তিব্যাখ্যানে তৎপর। মনে হয়, এই যুগটাই যেন উত্তমপুরুষের স্বগত ভাষণপূর্ণ। কিন্তু সেকালে বাঙ্গলাদেশে আত্মজীবনী রচনার রীতি তেমন প্রবর্তিত হয় নাই, কবির ক্ষেত্রে তাহা আরও কম ছিল। মধুসূদন তাঁহার ইংরেজী পত্রাবলীতেই কবি-হৃদয়ের যাহা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ উল্লাস, সব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তো নিজের সম্পর্কে প্রায় নীরব। আবার তাঁহার একেবারে বিপরীত নবীনচন্দ্রের মধ্যে আত্মঘোষণা অত্যন্ত প্রকট; মনে হয়, রাজপথের মাঝখানে দিগ্বিজয়ীর নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে নিজের কথাই দীর্ঘকাল ধরিয়া দশজনের কাছে বলাতেই যেন তাঁর গ্লানিহীন আগ্রহ, অন্যের তাহাতে ঔৎসুক্য না-ই বা থাকিল! 'আমার জীবনে' যদি আমরা ভাবাবেগোচ্ছ্বল হৃদয়বান কবি-নবীনচন্দ্রকে হাসি-অশ্রুর আলো-অন্ধকারে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতাম তবে কত না আনন্দ হইত। কিন্তু তাহা কবি-জীবনের লেখ্যচিত্র না হইয়া শেষ পর্যন্ত উচ্চ রাজপদে সমাসীন ক্ষমতাগর্বী ডেপুটি নবীনচন্দ্রের রাজকর্ম এবং তাহার আনুষঙ্গিকের রোজনামচা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার জাতীয় কবির উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির চিত্র আত্মপ্রচার ও দম্ভপ্রকাশের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অখণ্ড পাঠকালে ধৈর্যজনিত ক্লান্তি কাটাইয়া উঠিতে পারিলে মনে হইবে, জীবনীটির রচনারীতি আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দ; বর্ণনার মনোহারিত্বে, রসকৌতুকউজ্জ্বলতায়, মানবচরিত্র বিশ্লেষণে তাহা অনেকস্থলে উপন্যাসের গৌরব লাভ করিয়াছে। পরিমিত আয়তনের মধ্যে নিরাসক্ত দর্শকের দৃষ্টি লইয়া নবীনচন্দ্র যদি শুধু নিজ কবি-জীবনটি বিশ্লেষণ করিয়া যাইতেন তবে সুন্দর এক 'কবিকাহিনী' আমরা তাহাতে পাইতাম, কবি-সঙ্গ মধুর মনে হইত।

আত্মজীবনী রচনা সেই কারণেই দুরূহ, কেননা তাহাতে আত্মপ্রচারের স্বাভাবিক আগ্রহ প্রশমিত করিতে হয়। একটা সহজ বিনীত ভাবের পরিবেশ তাহাতে রচনা করা প্রয়োজন। আত্মজীবনীও যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং রচনানৈপুণ্যে উপন্যাস বা রম্যরচনার পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে তার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'। বিশ্লেষণশীল রসিক দর্শকের দৃষ্টিতে নিজ কবি-পুরুষটিকে কখনো আগ্রহ-মমতায়, কখনো বা কপট বিদ্রূপে অন্য দশজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি যেন কৌতুক বোধ করিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে কবি-প্রতিভা-শতদলের এক একটি দল উন্মোচনের ইতিহাসও গাঁথা হইয়া যাইতেছে। অবশ্য 'জীবনস্মৃতি' পরিণত রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় বহন করে না, কিন্তু 'প্রভাত-রবিকে' যে নিরাসক্ত প্রণয় বিনীত দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, 'মধ্যাহ্ন-রবি' এবং 'সান্ধ্য রবি'কেও তিনি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নিশ্চয়ই দেখিতে পারিতেন, কেননা শিল্পবোধ ও মাত্রাজ্ঞান রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অস্তিত্বেরই অঙ্গীভূত। তবু খ্যাতির সিংহদ্বারে উপনীত হইবার সঙ্গেসঙ্গেই নিজ জীবনের

স্মৃতির উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব পরিমিতি ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। কেননা তাহার পরেই আত্মঘোষণার আশঙ্কা বিদ্যমান। কৌতূহলী পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন,—তুলনায় 'আমার জীবনের' প্রথম ভাগই সুখপাঠ্য, কেননা তখনো ঔন্মেষমুখী কবিই তাহাতে প্রধান ; দত্তবর্ম পরিহিত ভেপুটি' তখনো রঙ্গমঞ্চে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নাই। প্রথম ভাগ হইতেই দুই একটি কৌতুকরসাশ্রিত রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ব্যঙ্গ ও ইঙ্গিতপ্রধান রচনাভঙ্গীর প্রভাব ইহার স্থানে স্থানে লক্ষণীয়। তাঁহার কলিকাতার সতীর্থ ষষ্ঠীচরণের অদ্ভুত প্রকৃতি লইয়া তিনি যে 'ষষ্ঠীমাহাত্ম্য' কীর্তন করিয়াছেন তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনি কৌতুকাবহ। সাধারণ ছাত্রদের মনে পরীক্ষাভীতি সকল যুগেই সমান। নবীনচন্দ্র আপন সরস উক্তিতে সকল যুগের ছাত্রদের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—

"আমি 'বিশ্ববিদ্যালয়কে' যমালয় বলিয়া জানি। 'চেয়ারম্যান' স্বয়ং যম, 'রেজেষ্ট্রার' চিত্রগুপ্ত ; 'সিণ্ডিকেট' যমদূত-সমিতি ; পরীক্ষা 'বৈতরণী' ; এবং পরীক্ষকগণ 'গাভী'। তাঁহাদের লাঙ্গুল-অবলম্বন করিয়া এই বৈতরণী পার হইতে হয়।"

আবার অন্যদিকে বর্ণনাত্মক রচনার উদাত্ত গাম্ভীর্যও প্রশংসনীয়। চট্টগ্রামের বর্ণনায়—"আমার মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী। বনমাতার দিগন্তব্যাপী পর্বতমালায় কবিতা তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাঁহার পাদস্থিত নির্ঝরকণ্ঠে কবিতা অবিরল গীত হইতেছে, তাঁহার নীল কোমল সিন্ধুগর্ভের তরঙ্গভঙ্গে কবিতা লীলাতরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদনদীস্রোতে রত্নধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধুমুখে ছুটিতেছে।.....অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার তেমন প্রকৃতিগত ছিল।"

কবি নবীনচন্দ্র উদ্যোগী, বহুকর্মা, এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবন-কাহিনীর সহিত তৎকালীন বাঙ্গালার সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনও জড়িত হইয়া গিয়াছে, সেই হিসাবে গ্রন্থটি মূল্যবান।

"ছেলেবেলা থেকে যদি তোমার মনে প্রবল ইচ্ছা থাকে যে, তুমি একজন বড় সাধক হবে ও এই জন্মেই ভগবান লাভ করবে তবে অবশ্যই তাই হবে। আসলে তোমার চিন্তাস্রোত যে-দিকে বইতে থাকবে সেই দিকেই তোমায় টেনে নিয়ে যাবে। মনের শক্তি অসাধারণ।"

—স্বামী অভেদানন্দ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে অতীন্দ্রিয়সাধনার প্রজ্ঞা

শ্রীঅজিত ঘোষ

জীবজগৎ ও অনন্ত মহাশক্তির মধ্যে পরস্পরসম্বন্ধী যে সত্য, তাকে উদ্ঘাটিত ও প্রকাশিত করা কবি ও দার্শনিক উভয়েরই উদ্দেশ্য ও কাম্য। কিন্তু এই একই উদ্দেশ্য হলেও উভয়ের পথ ও দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। দার্শনিক চান তাঁর বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে। কিন্তু কবির প্রকাশভঙ্গী সরল, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবি তাঁর আত্মানুভূতিতে যে সত্য উপলব্ধি করেন, রচনাশৈলিতে ও ভাবরসের মাধুর্যে তা প্রকাশ করেন। দার্শনিকের যুক্তিতেই যুগে যুগে সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলে এসেছে। কিন্তু কবির কাছে যুক্তিবাদের স্থান নেই—সত্যের রূপ তাঁর কাছে আপনিই ধরা পড়ে। সেখানে ঋষির মতই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। এজন্যই কবি ও ঋষিতে কোনো প্রভেদ নেই এবং কবি ঋষিরই পর্যায়ভুক্ত।

মানবজীবনে এক অতৃপ্তির বেদনা চিরন্তন হয়ে আছে। মনের ধর্মই 'নাল্পে সুখমস্তি'। এই রূপ-রস-গন্ধময় জড়জগতের চিরগতিশীল আবর্তন ও বিবর্তনের প্রবাহে জীবন ও মৃত্যু এবং সুখ-দুঃখের মধ্যে মানব পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারে না। পারিপার্শ্বিক আনন্দ-পরিবেশের মধ্যেও তার অন্তরের নিভৃতে নিরানন্দ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। এক অজানা অভাববোধ হতেই এই নিরানন্দের উদ্ভব। প্রকৃতির রূপমাধুর্য ও জীবনযাত্রার প্রেমপ্রীতির মধ্য হতেও তার মন অজানা রহস্যপথে সীমা হতে অসীমের পথে ছুটে যেতে চায়; তার বিরহী মন যেন এক না-পাওয়ার বেদনা অনুভব করে। এই বেদনাবোধ এতই সূক্ষ্ম যে, সে অনুভূতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে স্পন্দন তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, সে স্পন্দন অনন্ত মহাশক্তির অনুভূতির স্পর্শমাত্র। কিন্তু, সেই অনন্তকে বোঝবার মত আত্মানুভূতি তার কোথায়? এ আত্মানুভূতি ঋষির আছে, কবির আছে; দার্শনিকের আছে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিতে তাকে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা। কবির আছে এই আত্মানুভূতির ভাবনা-সঞ্জাত কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা। কাব্যসৃষ্টির যেখানে সার্থকতা সেখানেই কাব্য অমর। কাব্যের এই আত্মানুভূতির সার্থকতাই কবির 'মিস্টিসিজম্' বা অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতির প্রজ্ঞা।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে দেখি—"এই অসীম বিশ্বে যে অনন্ত ও অদ্বিতীয় মহাশক্তি আপন লীলায় ও রূপে পরিব্যাপ্ত, সেই মহাশক্তিই ব্যক্তি ও বস্তুর রূপ ধারণ করে সীমার মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। সুতরাং ব্যক্তি তো অসীম রহস্যেরই রূপান্তরমাত্র। কিন্তু সীমার যে গণ্ডী, অসীমের এই প্রকাশেও তা অবিচ্ছিন্ন থেকে যায়। অসীমের রূপ ও শক্তি সসীমের অভিব্যক্তিতে ওতঃপ্রোত উৎসারিত থাকে। সাগরজলের ঢেউগুলি যেমন সাগরের শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, আবার সাগরেই বিলীন হয়, তেমনই

জীবও সেই পরমশক্তির আধারে অভিব্যক্তি লাভ করে। এই রূপান্তরিত অবস্থায়ও (জীবে) সেই পরমশক্তির স্বরূপ অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে—সম্বন্ধ পৃথক্ করা যায় না। জীব ও ব্রহ্মের-এই সম্বন্ধের জ্ঞান ও অনুভূতি জীবে যত স্পষ্ট হয়, জীবনও তত আত্মানুভূতির পরিতৃপ্তিতে আনন্দময় ও মধুময় হয়ে ওঠে।"

কবি স্বভাবতঃই প্রেমিক। কিন্তু সে প্রেম সাধারণ জীবনধারার নিত্যদিনের মানবীয় প্রেম নয়। সে প্রেম চায় অনন্তের রাজ্যে পরম প্রেমাস্পদের চিত্তে প্রবেশ করতে। যে প্রেমিকের প্রেম অসীমের দিকে চলেছে, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সসীম জগতের সীমা পার হয়ে অসীমের মাঝে প্রবেশ করতে চায়। অসীম ও অনন্তকে অনুভব করবার কৌতূহল প্রেমরসের বেদনায় সঞ্জীবিত কবি-চিত্তকে অসীমের অনির্বচনীয় লীলায় পরমসৌন্দর্যের পরিবেশে ও অনন্তের নিগূঢ় অভিপ্রায়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ নিয়ে আসে। তখন কবির চিত্তে যে রসানুভূতি ও সত্যানুভূতির বিকাশ হয়, তা তাঁর হৃদয়বীণায় অপরূপ রহস্যানুভূতির ঝঙ্কার তোলে। এই রহস্যানুভূতিই কবির একান্ত সাধনার ধন। জীব ও ব্রহ্মের নিগূঢ় সম্বন্ধটুকুই 'মিস্টিসিজম্'এর তাৎপর্য। দার্শনিকের ভাষায় জীব Finite বা Emperical self এবং ব্রহ্ম Infinite বা Transcendental self. বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটী ছন্দে বিরাট্ হতে অণু-পরমাণুর মধ্যে যে মহাসঙ্গীতের কলতান নিত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, যার সুর পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন-মহিমায় নিরবচ্ছিন্ন সুর, তাকে স্পর্শ করেই কবির রহস্যানুভূতি জেগে ওঠে। তখনই হয় এই অনুভূতি-সঞ্জাত প্রজ্ঞার বিকাশ। যে পরমরসের ভাবনায় কবির চিত্ত অতীন্দ্রিয়ের নাগাল পাবার চেষ্টা করে, সেই প্রেমের পথেই পরমপুরুষ তাঁকে আপনার করে নেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের কথায়—The Transcendental self stoops down, as it were, and touches the eyes of the Emperical self, and there breaks upon the man an experience, secret, strange and wondrous which quickens within him, lays hold on him and becomes his very being.—Eastern Religion and Western Thoughts.

এই রহস্যানুভূতির প্রজ্ঞা (mystic experience) আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যতটা দেখতে পাই, জগতের অন্য কোনও কবির মধ্যে তত দেখতে পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে তাঁকে অনুধাবন ও বিচার করতে গেলে তাঁর গানগুলিকেই প্রাধান্য দিতে হয়। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি প্রধানতঃ গীতধর্মী। তাঁর গানই তাঁকে বিশ্বসভায় অমর করে তুলেছে এবং এই গানই রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর গানের মধ্যেই দেখি, অজ্ঞের ও অনন্তের আকর্ষণে হৃদয় তাঁর উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—পরম-রসঘন অতীন্দ্রিয়ের গোপনচারী স্পর্শে তাঁর হৃদয়বীণায় অভিনব মোহন সুরের দোলা দিয়ে গেছে।

গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্য, গান, পূরবী প্রভৃতি কবির কাব্যগুলি প্রধানতঃ এরূপ 'মিস্টিক' গানের সমষ্টি নিয়ে সঙ্কলিত হয়েছে। পার্থিব পরিবেশে জীবনদোলায় দুলতে দুলতে কবি যেন সহসা চিন্ময়ের মোহন রূপ দেখতে পেলেন এবং মনপ্রাণ দিয়ে যেন সেই রূপসুধারস পান করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি গাইলেন—

আমার নয়নভুলানো এলে।
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।

আবার—

সবার সাথে চলতেছিল
অজানা এই পথের অন্ধকারে,
কোন্ সকালের অন্ধকারে
পাশে আমার দেখতে পেলাম তারে।
এক নিমেষেই রাত্রি হোলো ভোর,
চিরদিনের ধন যেন সে মোর,
পরিচয়ের অঙ্ক যেন
কোনখানেই নাইকো একেবারে।

কখনও দেখি, তিনি যেন এই শুভমুহূর্তটীর জন্যই প্রতীক্ষারত—

দুয়ার মোর পথপাশে সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

অন্যত্র—

কখন আমার খুলবে দুয়ার,
নাইকো দেরি, নাইকো দেরি।
তোমার তো নয় ঘরের মেলা
কোণের খেলা গো,
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে
জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি।

আশাপথ চেয়ে থাকলেও কবি কিন্তু সেই অসীমের সঙ্গে আপনার প্রাণ ও মনের মূলগত সম্বন্ধটুকু বিস্মৃত হননি।

কবির এই অতীন্দ্রিয়তার দৃষ্টিভঙ্গীর একটী বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অন্তরলোকে যেন একটা অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার বেদনা মুহ্যমান হয়ে উঠেছে। সেখানে এক কুহেলীময় আলোছায়ার খেলা। আর্টের ক্ষেত্রে এই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে এক অভিনব জয়যাত্রা বলা যেতে পারে। অসীমকে যেন তিনি বুঝেও বুঝে উঠতে পারেন না। যা চিরমহস্যময়—অবাঙ্‌মনসগোচর, তা তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকবেই। হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে সেই অসীমের যে সুর যখন কোন শুভমুহূর্তে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে এবং তার বিভূতি অন্তরাকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, পরিপূর্ণতার মধ্যে তাকে ধরা যায় না। এই রহস্যানুভূতির সেসব ধারণাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃত সত্য হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে বাঁশীর ধারা বহে।
কখন্ শুনি, কখন্ শুনি না যে, কখন্ কী যে কহে।

আমার মুখে আমার কোলাহলে, আমার আঁখিজলে,
তাহারি সুর জীবন-গুহাতলে গোপন গানে বহে।

যিনি স্পর্শাতীত তাঁকে স্পর্শ করা এবং যিনি ইন্দ্রিয়াতীত তাঁকে ইন্দ্রিয়দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি করা মরজগতে সম্ভবপর নয়। তাই তিনি বলেছেন—

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে ?

আবার বলছেন—

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

অথবা—

আমি জানি আমার চেনা
কোনকালেই ফুরাবে না
চিহ্নহারা পথে আমায়
টানবে অচিন্ ডোরে।

এই অচেনার অন্বেষণেই কবি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন—

আমি তাহেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।

এ খোঁজার যেন শেষ নেই। জীবনধনকে পেয়েও যেন তিনি পাচ্ছেন না। সীমার মধ্যে—মিলনের শুভলগ্নের কাছে এসেও যেন একটা ব্যবধান থেকে গেছে।

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে,
মিলনের মাঝে বিরহকাঁদায় বাধা রে।

আবার দেখি—

মনের মাঝে বাজলো যেদিন দূর চরণের ধ্বনি,
সেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী ;
যখন বাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আঁধার ঘেঁষি,
সেদিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি।

কিন্তু এও স্বীকার করেছেন—

তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর।
যবে আমার জনম হবে ভোর,
চলে যাবো নবজীবন-লোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
প'রবো তব নবমিলন-ডোর।
তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর।

মানবাত্মা তো বিশ্বাত্মারই অংশমাত্র এবং মনই তার প্রকাশ। এজন্যই কবি নিজের মন দিয়ে বিশ্বাত্মার সন্ধান করতে চেয়েছেন :

মন রে ওরে মন,
তুমি কোন্ সাধনার ধন।
পাইনে তোমায় পাইনে,
শুধু খুঁজি সারাক্ষণ।

মনকে বেদনায় ও বিরহে আলোড়িত করতে না পারলে মনের গভীরতায় ভাবনার ছোঁয়া লাগে না। তাই তাঁর এরূপ সন্ধানের মধ্য দিয়ে একটী বেদনার আভাস পাওয়া যায়। আবার, এরূপ সন্ধানের মধ্য দিয়েই যেন তিনি সারাজীবন চলতে চেয়েছেন :

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না!
মন উড়েছে উড়ুক নারে
মেলে দিয়ে গানের পাখনা!

তিনি জানেন, তাঁর প্রার্থিত ধন তাঁর নাগালের বাইরে বিরাজ করছেন। তাঁকে মনোময় করেও তিনি সেই অসীম সত্তাকে স্পর্শ করতে পারেন না। তাই তিনি গেয়েছেন :

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

কবি নিজেই বলেছেন—'জীবন মিথ্যা ও মৃত্যুই সত্য' অর্থাৎ, জীবন ও মৃত্যুর পরপারে যে অমৃত সত্তা বিরাজমান তাকেই তিনি সত্য বলতে চেয়েছেন। যিনি সত্যদ্রষ্টা তাঁর কাছে জাগতিক পরিবেশ বড় কথা নয়—সুখ-দুঃখময় জীবনের কলরব ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা বড় প্রশ্ন বা সমস্যা নয়। তাঁর মন জীবন-মরণের সীমানা পার হয়ে আনন্দঘন সৌন্দর্যরসে বিভোর হতে চায়। এজন্যই তিনি বলেছেন :

জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।

যুগে যুগে যে ঋষির চিত্ত শান্তিময় নির্বাণের পথ লক্ষ্য করে চলে এসেছে, সেই পথ তিনিও লক্ষ্য করেছেন। এই জীবনাতীত অনুভূতির স্পর্শ যখন তাঁর মনে এসে লেগেছে তখন তিনি গেয়েছেন—

দিন যদি হোলো অবসান,
নিখিলের অন্তরমন্দির-প্রাঙ্গণে
ঐ তব এল আহ্বান।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—"হে অসীম মহাশক্তি, তুমি যখন প্রকটিত হও, তখনই তোমার শক্তি ও সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য আমার অনুভূতিতে ধরা পড়ে। তোমার অপ্রকট অবস্থায় তোমার শক্তির ধারা অজ্ঞেয় থাকিয়া যায়। এই কারণে, তোমার সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ যখন বুঝিতে পারি, আমার রূপ তোমারই শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া যখন অনুভব করি, মাত্র তখনই তোমার স্বরূপ আনন্দ ও মধুময় হইয়া ওঠে। তোমার বিকাশরহস্য বুঝিতে পারিয়া, আত্মজ্ঞানে তোমার সহিত আমার যে সংযোগ তাহা দেখিয়া, বিশ্বপ্রাণের আত্মানুভূতি লাভ করি, আমি বুঝিতে পারি যে, আমি তোমার আলোর ছায়া—তোমার বিকাশ এবং তোমার

শক্তিরই রূপ লইয়া, সাগর-লহরীর মত তোমাতে বিকশিত ও লীন থাকি। 'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর'। কেন না, আমি শুধু তোমারই শক্তির রূপ লইয়া প্রকাশিত হই। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তোমার অনন্ত বৈচিত্র্যের শক্তির একমাত্র পরিচয়।"

অসীমকে উপলব্ধি করতে গিয়ে যে অনুরাগ ও ব্যগ্র তিতিক্ষায় কবির জীবন ভরে উঠেছে তার ভিতর সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে দুঃখবাদ। দুঃখ মানব-জীবনকে অমরত্বে ভরে। এজন্য জীবনধারা ও সংস্কৃতিতে দুঃখবাদের একটা গৌরবময় স্থান আছে। দুঃখের মধ্য দিয়েই অধ্যাত্ম-জীবনের সুখ উপলব্ধি করা যায় এবং এই দুঃখেই মানব-প্রকৃতির সম্যক্ পরীক্ষা হতে পারে। দুঃখের এই ভাবনা নিয়ে এবং দুঃখোত্তর আনন্দরসের সমন্বয়ধারণায় ভক্ত দুঃখকে পরম কল্যাণকর বলে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে এই দুঃখবাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু দুঃখবাদী হলেও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবের অভিজ্ঞান বা symbolism গ্রহণ করেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অতীন্দ্রিয়তার পথ অনুসরণ করেছে। প্রাণবাদের চেতনা দিয়ে তিনি দুঃখবাদকে বরণ করেছেন এবং তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা এই দুঃখের ভিতর দিয়েই পরমসত্যকে আকর্ষণ করেছে। তাই তিনি গেয়েছেন :

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমায় নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।

তিনি জানেন, দুঃখ দিয়ে তাঁর জীবনপাত্র ভরে উঠলে তাঁর জীবনের সার্থকতা। এজন্যই তিনি অন্তরে দুঃখের আগুন জ্বালাতে চেয়েছেন—

এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো,
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ রূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-সাধনাকে উপনিষদের আদর্শে ধ্যানে গড়ে তুলেছেন। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই অনন্ত শক্তিময় বিশ্বেশ্বরের আবাসস্থল। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে তাঁর সুরের ধ্বনি মুখরিত হয়ে রয়েছে। কবি নিজেই লিখেছেন—"বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি আসিতেছে, প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেছে। এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ যেন আমার অন্তরের একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোক-রশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ, বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না; আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম।" এখানেই কবির আত্মানুভূতির শুরু। এই আত্মানুভূতি অবশ্য কোনও নূতন কথা নয়—সাধকের সাধনায়,

কবি ও ভক্তের ধ্যান-ধারণায়, সমাধির সার্থকতায় এই শাশ্বত সত্যই যুগে যুগে প্রকাশ পেয়েছে। কবিও সেই সত্য উপলব্ধি করে অসীমের মাঝে আত্মসমাহিত হয়েছেন। তাই তাঁর বিভিন্ন গানে সেই আত্মানুভূতি বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পরম সত্যের সন্ধানই যেন এখানেই সার্থকতা লাভ করে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এরূপ একটী গানে দেখি—

আকাশভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীমকালের হৃদ-হিল্লোলে
তোমার-ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

আর একটী গানে বলেছেন—

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটী ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অধরা অশ্রুনীরে,
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে।

অন্যত্র—

নানা ভাই ছিল নানা,
আজ তারে হ'ল জানা,
বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম।
আজ নাই আধা-আধি,
ভিতর বাহির বাঁধি
এক দোলাতেই দোলে
মোর অন্তরতম।

এরূপ কত অসংখ্য গান যে তাঁর রয়েছে সে হিসাব দেওয়া আয়াসসাধ্য। এই সমস্ত গানগুলিতেই তাঁর অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি মানবসুলভ আন্তরিকতায় ও প্রেমের সরস প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে। অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম ছায়াময় অনুভূতিগুলি ভাষা, ভাব ও রসমাধুর্যে বিভূষিত হয়ে, সুর ও ছন্দ-সঙ্গতির অভিব্যঞ্জনায় তাঁর অনন্যসাধারণ প্রেম ও সাধনা আপন স্বকীয়তায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। কবির সঙ্গীতসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে অসীম নিগূঢ় রহস্যের মায়াজাল স্বতঃস্ফূর্তি হয়েছে, তাহারই ভাবনায় আমরা আমাদের অন্তরলোকের অজ্ঞেয় সত্যের আলো প্রতিভাত দেখতে পাই। এজন্য তাঁর গানের ভাবনা impression আমাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়—সহজাত আনন্দরসে হৃদয়-মন পরিপূর্ণ করে তোলে। যে সত্যটুকু আমাদের অন্তরে সুপ্ত ও অনির্বচনীয় থাকে, কবি তাকে জাগিয়ে তোলেন। মনের এই নিভৃততম সহজাত উচ্ছ্বাসকে সম্যকরূপে জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানগুলি অমরত্বের পর্যায়ে স্থান পেয়েছে—হয়তো যুগে যুগে এই সঙ্গীতরসধারা মানবমনে অনুরণিত হবে।

শেষের বন্ধু

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ফুরায়ে এসেছে বেলা
সন্ধ্যা ধীরে দেখা দেয় দিকচক্রবালে।
গোধূলির পিছে আছে ঘন অন্ধকার
এখনই আসিবে নামি।
কাল যায় মিলাইয়া কালে
শঙ্কা জাগে মনেতে আমার।

জন্মিলে মরিতে হবে—জানি তাহা তবু ভয় পাই,
আঁধার চাহি না আমি, চাই পেতে আলো।
আলো—আলো আরও আলো চাই,
বলি ডেকে "হে অচিন্ত্য! আলো আলো
তোমার হাতের আলো জ্বালো।"

মরণ—সে মিছে নয়, অতি সত্য কথা
তবু সে সত্যেরে আমি এড়াইতে চাই;
ভয়াল মূরতি তার কল্পনায় আনি
শিহরিয়া চক্ষু মুদি অন্ধকারই দেখিতে যে পাই।
কল্পনার রথ আমি ফিরাইতে চাই
জোর করি টানি।

হায় মৃত্যু! জানি তুমি একদা আসিবে,
নীল হয়ে যাবে দেহ
দৃষ্টিহারা হবে মোর আঁখি!
শিয়রে দাঁড়াবে তুমি, কত ভালো আমারে বাসিবে
সেদিনে তোমারে বন্ধু, দিতে পারিব না আমি ফাঁকি।
আমার পৃথিবী—যারে বাসি বড় ভালো
এর আলো, ফুল, গান, এর অধিবাসী,
এদের বন্ধন হতে মুক্ত তুমি করিবে আমায়
স্পর্শে তব দূর হবে সুখ দুঃখ রাশি,
যারে পেতে চাই আমি, মুছে দেবে মিগ্ধ সেই আলো।

এ সুন্দর পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি,
ভালোবাসি ব্যথা, শোক, বেদনা ও হাসি।
ছাড়িতে চাহি না আমি মোর প্রিয় আত্মপরিজনে
তবু মোরে যেতে হবে—যেতে হবে দূরে
একা তব সনে।
জন্মিলে মরিতে হবে—সেই সত্যে অন্তরে জাগাই,
তুমি যে শেষের বন্ধু—জানি জানি প্রিয়
তুমি ছাড়া আর কেহ নাই।

রাবণবধের নেপথ্য

শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র

[ত্রেতা যুগ। লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু—রাবণবধে বিশেষ এক বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অবস্থায় রামচন্দ্রের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনার জন্য স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যোগে দেবতাদের এক বিশেষ সভার আয়োজন হইয়াছে।

সময়—সকাল বেলা। স্থান—দেবরাজের সভাগৃহ। তিনি নিজে বসিয়া আছেন; ব্রহ্মা আসিয়া বসিয়াছেন। অন্যান্য দেবগণ আসিবেন; সভা-ভৃত্য 'সুন্দর' সকলের জন্য আসনাদি ঠিক করিয়া রাখিতেছে।]

বৈতালিকের গান

জয়তু জয়তু শতক্রতু, বজ্র আয়ুধধারী!
বাসব, দেবরাজে জয়তু, জয়তু চির-অসুরারি॥
আখণ্ডল, সুরবর জয়তু সুরন্দর,
অমরকুল পালন-পর, জয়তু ত্রিলোক বিহারী॥

ইন্দ্র। বিষম ভাবনার কথা, পিতামহ!

ব্রহ্মা। হ্যাঁ, আর এ ভাবনা শুধু তোমার আমার নয়,—সমস্ত দেবলোক রামচন্দ্রের বিপদের চিন্তায় কাতর। আর দেরী করা চলেনা; তাঁর জন্য আমরা কি কর্তে পারি, এবার দেখা কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র। অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে আপনি বয়সে, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় সকলের বড়। বলুন পিতামহ—আপনার কি পরামর্শ?

ব্রহ্মা। পাঁচজনে বসে' আলোচনা হওয়া সঙ্গত। তা'তে বয়সে ও জ্ঞানে একজন ছোট'র কাছেও হয়ত একটা ভাল পরামর্শ পাওয়া যেতে পারে।

ইন্দ্র। বায়ুকে আমি, রামের অবস্থা সঠিক জানবার জন্য লঙ্কায় পাঠিয়েছি। আর যম, অগ্নি, বরুণ—এদের এই সকালেই সভায় উপস্থিত হ'তে বলেছি। এই যে—

(যম ও অগ্নির প্রবেশ)

ব্রহ্মা। এই বুঝি সকাল হ'লো, অগ্নি।

অগ্নি। তার মানে?

ব্রহ্মা। রাত ত' অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, ভাই!

অগ্নি। এই বয়সে 'মধ্যম-নারায়ণ তেল' মাথায় না মাখ্‌লে আপনার ঘুমের উৎপাত থাকে না, —রাত যখন-তখন শেষ হ'তে পারে। আমাদের যে তা' নয়!

ইন্দ্র। সকাল বেলায় ঠাট্টার সময়—তুমি চট্‌তে চাও নাকি, অগ্নি? পিতামহ ঠাট্টা করেছেন, তা' বোঝো না?

ব্রহ্মা। স্বভাবো মূর্ত্তি·····

অগ্নি। আঃ, আপনার 'মং' 'ধং' রাখুন না—! দেবরাজ! ঠাট্টা আমি বুঝি। সকাল বেলা, —'সুপ্রভাত' বল্‌বেন, তা নয়—"এই বুঝি সকাল হ'লো"—আবার "বং-নং"……

ইন্দ্র। (হাসিয়া) আচ্ছা, তুমি বসো, অগ্নি। (অগ্নির উপবেশন)
দেখ, ঠাকুরদা লজ্জা পেয়েছেন। যাক্—যম বেশ শান্ত, সুবোধ। এসেই—চুপ্‌ চাপ্‌ বসে' পড়লো—

অগ্নি। হুঁ,—আগে উনি শান্তই থাকেন।

ইন্দ্র। যাক্, যে জন্য তোমাদের ডেকেছি। একটা—বিশেষ আলোচনা আছে। কিন্তু বরুণ এখনো আস্‌ছে না,—দেখ

অগ্নি। কেন, সকালবেলাতেই আপনার গলা শুকালো নাকি? 'বরুণ বরুণ' করে' অস্থির! কেন, আমরা কি কেউ না? কিছু না? না-ই-বা এলো সে: কি কথা—তাই বলুন।
(বরুণের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। পৃথিবীকে প্রাতঃস্নান করাতে যেয়ে দেরী বুঝি?

বরুণ। না, ঠাকুরদা, পৃথিবীর স্নানাহার এখন বন্ধ। দিন রাত নিজের চোখের জলে ভাস্‌ছে। রাবণের ভারে নিজের দুর্দশায়, আর সে দুষ্টের উৎপীড়নে কন্যা সীতার দুর্গতিতে পৃথিবী আর সে পৃথিবী নেই। (অগ্নির পাশের আসনে বসিবার উদ্যোগ। অগ্নির তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া দূরে গমন)

অগ্নি। আমার আসন এদিকে দে' ত', সুন্দর! (সুন্দর তাহা করিলে অগ্নির উপবেশন)

বরুণ। (অগ্নির নিকটে যাইয়া) আমার আসনও এখানে আন্‌, সুন্দর! (সুন্দর হাসিয়া অগ্রসর হইল। অগ্নির আবার আসন ত্যাগ)

অগ্নি। দেখুন দেবরাজ, দেখুন পিতামহ—সবাই যদি আমায় এভাবে জ্বালাতন করেন, তবে—

ব্রহ্মা। তুমি যে জলেই থাকতে চাও, ভাই!

ইন্দ্র। আচ্ছা, তুমি আমারই কাছে বস,—এসো—। (অগ্নির তাহা করণ)
উঃ, সুন্দর! একটু বাতাস কর্‌ ত' বাপু!
আঃ কি গরম! ঘেমে গেলাম যে! (অগ্নির আসন ত্যাগ)

অগ্নি। আমি তবে কি কর্‌বো?

বরুণ। কি কর্বে?—ঐখানে, এক কোণে বসে' মিট্‌মিট্‌ কর।

অগ্নি। দেখ—বরুণ!

ব্রহ্মা। আরে, ওকে তুমি তাড়িয়ে তোল না কেন?

অগ্নি। তাহলেও ও' আমার কর্ম শেষ কর্তে পারে,—তা দেখা আছে।

ব্রহ্মা। তাড়িয়ে শুষে' ফেল—

অগ্নি। বাষ্প হ'য়ে আকাশে যাবে, আবার যেমন—তেমনি হ'য়ে নেমে আস্‌বে। শুনেছি, রক্ত-বীজের শেষ নেই, এ শালা—জল-বীজেরও তাই—

ইন্দ্র। এদের একটা মিট্‌মাট্‌ করে' দিতে পার না, যম? আমাদের কাজের কথা হচ্ছেনা।

যম। ভাল করে' বাধ্‌তেই দিচ্ছেন না। এখন আমি কি করে, কি কর্বো?—বলুন—

(নেপথ্যে নারদের গান শুনা গেল)

ব্রহ্মা। ঐ নারদ আসছে—

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

হরি হে, হরি—
গোলোকছাড়ি, লঙ্কায় পড়ি' আছ কি করি'?
মর্ত্যে পেয়েছ কি অমৃত বল,—
দেব-লোক যাহে ভুল হয়ে গেল
আমরা এখানে তোমার বিহনে মরি হে, মরি।

ইন্দ্র। দেখ দেবর্ষি, অগ্নি আর বরুণের বচসা চলছে। তুমি দেখতো একটা মিট্‌মাট্‌—

নারদ। কোন মিট্‌মাটের মধ্যে আমি নেই, দেবরাজ।

ইন্দ্র। —কেন?

ব্রহ্মা। স্বভাবো মূর্ত্তি বর্ত্ততে—(হাস্য)

নারদ। থেকে কি হবে? হাত পা থাকতে—মুখে মুখে যে কোন্দল—তার কি মিট্‌মাট্‌ হতে পারে?

ব্রহ্মা। যা বলেছ। তোমার একথা বেদের মন্ত্র হবার যোগ্য—দেবর্ষি।

নারদ। না বলে' কি করি! মুখে মুখে সব; কেউ কারো গায়ে হাত দেবেন না! এইত' দেখুন,—'অগ্নি' বল্‌লেই ত' হয়; তা নয়, বরুণ ওকে বলে,—'অগ্নিশর্মা'

অগ্নি। এঁ্যা,—একথা আমায় বলনি ত', দেবর্ষি! কখন বলেছে—? কবে?

নারদ। বলে' কি হবে? এইত আজ বল্‌ছি—কৈ, তুমি কি কহো?

অগ্নি। এত বড় কথা,—বরুণ।

নারদ। আবার সে-কথাও বলি। বরুণ জলের দেবতা; জলের অন্য নাম, "অপ্‌"। কিন্তু অগ্নি ওকে বলেছে, 'অপদেবতা'। এ'ও আমার নিজে শুনা-কথা।

বরুণ। সত্যি নাকি, অগ্নি?

নারদ। ভাবুন দেবরাজ, বুঝুন পিতামহ, এমনকথা যেখানে, সেখানে লাটালাঠি ছাড়া মিট্‌মাট্‌ কি করে' হতে পারে।

অগ্নি। (বরুণকে) আচ্ছা, দেখ্‌বো—

বরুণ। (অগ্নিকে) থাক, দেখ্‌বো—

অগ্নি। দেখ্‌বে? দেখাবো?

বরুণ। তবে দেখাচ্ছি—; গালিওনা কিন্তু—

নারদ। (সুরে) হরিহে, হরি—

(নেপথ্যে ধরিত্রীর গান শুনা গেল)

ইন্দ্র। (সকলকে চুপ থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া) ওকি! কেউ কাঁদছে না?

বরুণ। পৃথিবী,—দেবরাজ।

ইন্দ্র। (বরুণকে) থাম—

(নেপথ্যে ধরিত্রীর গান চলিল)

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি—আমারে।
উঃ ওঃ হো,—সহেনা এ যাতনা যে।
সর্বসহ দেহও আমার—সহেনা বহেনা আর ;
প্রাণ যায়, যায় আমার,—রাবণের ভারে।
আয়রিষ্টী সীতা আমার অভাগিনী মেয়ে গো,
মায়ে-ঝিয়ে এ জ্বালা কি এড়াবো বিষ খেয়ে গো !
মা-কালী কি পাষাণী হায়,—রাক্ষসকে সে নিজে বাঁচায় ;
কাঁদি আমি, কাঁদে আমার সীতা যে—।

ইন্দ্র। আহা—। (বায়ুর প্রবেশ)
লঙ্কা থেকে ফিরতে তোমার এত দেরী হ'লো—বায়ু !

অগ্নি। জানেন না দেবরাজ ! সেখানে পুত্র হনুমানের মুখ-চন্দ্র দেখ্‌তে গেছে—

বরুণ। সে চন্দ্রের কর্ম তুমি শেষ করেছ। মুখের সমস্ত লোম নির্মূল ; এখন দেখ্‌তে কদাকার।

বায়ু। দেখ অগ্নি, দেখ বরুণ,—পরিহাস বা বিতণ্ডার সময় এটা নয়। ওদিকে—কি অবস্থা তা শুনবে ?

ইন্দ্র। ওদের কথা বলো না। তোমার সংবাদ কি, বল।

বায়ু। সংবাদ ভাল নয়। রাম নিরুৎসাহে ঘুমে গেছে—। পৃথিবী হতাশায় মুসড়ে পড়েছে। বুঝি—রাবণ বধ হ'লো না—

যম। রাবণের সঙ্গোপাঙ্গ ত' প্রায় সব শেষ। এখন একা রাবণ—আর ক্ষুদে দু'চারটে মাত্র বাকী।

বায়ু। তা হ'লেও আর তার ভয় নেই। সে স্বস্তিতে তুষ্ট করে' দুর্গার আশ্রয় পেয়েছে। যুদ্ধ-রথে দেবী কালীমূর্তিতে তাকে কোলে নিয়ে বসেছেন,—সকলে তা জানেন। এখন বুঝুন,—রামের কি সাধ্য—সেখানে দুষ্টকে বধ করে।

অগ্নি। দেবরাজ, এবার লঙ্কার উপর সঙ্কর আপনার বজ্র ছেড়ে দিন্ না—

ইন্দ্র। হ্যাঁ, তুমি যাও যম, তোমার গাঢ়-নীল ছায়ায় লঙ্কা ছেয়ে ফেল ; অগ্নি যাও, প্রবল দাবানলের রূপে সমস্ত লঙ্কা পুড়ে' ছারখার করে' ফেল ; বায়ু যেয়ে সে ছাই উড়িয়ে সাগরের জলে মিশিয়ে যাও ; প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসে ধুয়ে' মুছে'—বরুণ, লঙ্কার চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করে যাও—

নারদ। (সুরে, সহর্ষে) হরি হে, হরি—

ইন্দ্র। এই-ই আমাদের কর্তব্য, কি বলেন—পিতামহ ?

ব্রহ্মা। তা' কি করে হয়। তা'তে রামের কি লাভ হবে ? তোমাদের এ ব্যবস্থায়—রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, তাদের বানর সেনাগণ, তাদের হিতৈষী আর যে-যে লঙ্কায় আছে,—সকলেই যে মারা' যাবে।

ইন্দ্র। তবে কি উপায় আছে, বলুন—?

ব্রহ্মা। উপায় আমি একটি মাত্রই দেখ্‌ছি—

অনেকে। কি? কি উপায়, বলুন—

ব্রহ্মা। রাবণ স্তুতিতে দুর্গাকে তুষ্ট করেছে,—রাম তার চেয়ে বেশী কিছু করুক। সে মাতা ভগবতীর রীতিমত পূজা করুক।

ইন্দ্র। এই অকালে দেবীর পূজা!

ব্রহ্মা। তা' ছাড়া উপায় নেই। তুমিও ত' অসুরদের বিনাশের জন্য একবার অকালেই দেবী দশভুজার পূজা করেছিলে—

ইন্দ্র। রাম কি তা' পারবে?

ব্রহ্মা। পারতেই হবে। পূজার বিধি আমরা তাকে জানিয়ে দেবো।

যম। রাম প্রবাসে—বড় বিব্রত অবস্থায় আছে। পূজার বিধি শক্ত হ'লে—চলবে কি করে?

ব্রহ্মা। শক্ত তত নয়; তবে তাড়াতাড়ি কর্ত্তে হবে। কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে মায়ের বোধন কর্ত্তে হয়। সে-তিথি চলে গেছে। শুক্লা প্রতিপদে বোধন চলে, সে-দিনও গত হয়েছে। এখন সামনে ষষ্ঠী তিথি, ঐদিন বোধন কর্ত্তে হবে। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিন যথাবিধি সে উপচারে পূজা মায়ের পূজা কর্ত্তে হবে।

বায়ু। তা হ'লে অগৌণে একজনকে যেতে হয়।

ইন্দ্র। তুমি আবার যেতে পার না বায়ু? তা হ'লে তাড়াতাড়ি হ'তো—।

নারদ। উনি এইমাত্র পরিশ্রম করে' এলেন—

ইন্দ্র। তবে, দেবর্ষি, তুমিই না হয়—

নারদ। আমার কিছু অসুবিধে আছে; নইলে কি আর কথা ছিল?

ব্রহ্মা। বেশ, তবে তোমরা যদি বল,—আমিই না হয় যাচ্ছি।

নারদ। এই বয়সে আপনিই বা কি করে' এতটা সাহস করেন?

ব্রহ্মা। উপায় ত' নেই! দেবী কৈলাসে এখন ঘুমিয়ে আছেন। আমিও এখানে চণ্ডীর বোধন করে যত সত্বর পারি, লঙ্কায় রামের কাছে যাচ্ছি।

যম। এ ব্যবস্থা ভাল—

বায়ু। হ্যাঁ, ওঁর একটু কষ্ট হলেও পিতামহই একাজের যোগ্যতম পাত্র।

(নারদ গমনোদ্যত)

ইন্দ্র। দেবর্ষি কি চলে যাচ্ছ?

নারদ। যাই আর কি—একবার কৈলাসের দিকে। দেখি, মহামায়া সত্যি জাগবেন নাকি; রাবণকে সত্যি ছাড়বেন নাকি—

ইন্দ্র। রাবণকে তাঁর ছেড়ে যাওয়া কি তুমি পছন্দ করনা?

নারদ। বড় শক্ত জিজ্ঞাসা, দেবরাজ।

ব্রহ্মা। শ্রীদুর্গা না ছাড়লে, রাবণ বধ হবে না। আর সে যতদিন বেঁচে থাকবে, রামচন্দ্রেরও গোলোক দেখা হবে না। তুমি না—নারায়ণের জন্য বড় কাতর—নারদ! (হাস্য)

নারদ। কাতর ত', কিন্তু তাঁকে দেখার চেয়ে,—দেখার জন্য কান্নায় আমি বেশী আনন্দ পাই,

পিতামহ। তিনি এসে পড়লে, বীণা বাজিয়ে আর কা'কে ডাকবো? (সুরে). হরি হে, হরি—..... । (গান করিতে করিতে নারদের প্রস্থান)

ইন্দ্র। আশ্চর্য ঋষি!

যম। তাইত আমরা 'দেবর্ষি' বলি—

ব্রহ্মা। অহেতুকী ভক্তি ওর। হ্যাঁ, আর আমি দেরী কর্বো না। অনেক কাজ। দেবীর বোধন, তারপর—লঙ্কায় যাওয়া। তা'হলে সর্বসম্মতিক্রমেই আমি একাজে ব্রতী হচ্ছি, কি বল?

অনেকে। হাঁ, হাঁ—

ইন্দ্র। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

'পথের পাঁচালী'র অপু

শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত

একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যিনি বাংলাদেশের পাঠকদের মনোহরণ করিয়াছিলেন, তিনি কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ এবং তাঁহার সেই পুস্তকখানির নাম 'পথের পাঁচালী'। সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম দৃষ্টিতে রসিক পাঠকদের মন জয় করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই ছিল। বাংলার অতীত স্মৃতভূমিতে তাঁহার বাস, বর্তমানের অঙ্গে তাঁহার প্রাণস্পন্দন, ভবিষ্যতের দিব্য-দৃষ্টিতে তাঁহার পথচলা। গত, আগত ও অনাগত—এই তিনের সমন্বয়ে তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

মানুষের কর্ম, জ্ঞান, চিন্তা—সর্বোপরি মন যে কত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহার দয়া-মায়া, ভক্তি-ভালবাসা কেমন করিয়া দেবত্ব লয়—প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া উঠে, দেহগত ভালবাসা কেমন করিয়া বেহাতীত প্রেমে রূপান্তরিত হয়, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত —বিভূতিভূষণের সাহিত্য।

সাহিত্য জীবনের সমালোচনা নয়, জীবনের সৃষ্টি—একথা যেমন বিভূতিভূষণ দেখাইয়াছেন, তেমনি সেই জীবন কত বিরাট, মহান হইতে পারে তাহাও তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশিত। এই সাহিত্য দেখাইয়াছে, পথের প্রান্তে তীর্থক্ষেত্র মানুষের কাম্য নয়, পথের দুধারে দেবালয়ের মঙ্গলাশীষ আহরণই তাহার কাম্য; একের সঙ্গে অপরের বিচ্ছেদ ও হানাহানিই মানুষের মনের ইতি নয়, মৈত্রী ও প্রীতির সেতুবন্ধনই আজিকার মানুষের প্রাণের প্রীতি।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে একটি প্রধান চরিত্র দেখা যায়, তাহা 'পথের পাঁচালী'র অপু। এই অপু 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপূর্ব্ব নামে পরিচিত। এই চরিত্রটি বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি শিশুমনের প্রতিনিধি এই অপু। বাল্য ও কৈশোরের স্বপ্নভরা আনন্দমাখা দিনগুলি কেবল অপুর কিশোর মনকে পত্রপুষ্প সাজাইয়া মঙ্গলঘটে অভিষেক করে নাই, দেশের যেখানে যত পল্লীবালক আছে, সকলের দুয়ারে এখনও তাহার আনন্দবার্তা জানাইয়া যায়। অনুভূতিপ্রবণ, কল্পনাবাসী মধ্যবিত্ত পল্লীবালকের মনে জাগে যে আশা, প্রাণে আসে যে আনন্দ, তাহার আবেগ-উচ্ছল কাহিনীই অপুর ইতিবৃত্ত। পার্থক্য যাহা, তাহা শুধু পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর তারতম্য। তাই অপুর মত যাহারা সরস্বতী পূজার দিন দূরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যায় না তাহারা যে বাংলার আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়, পল্লিপার্শ্বের গাছে গাছে পাখীর কলস্বর শোনে—ইহা মিথ্যা নয়। বসন্ত-সন্ধ্যায় কোকিলের 'কুহু রব, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক, আবার বর্ষার জলসিক্ত মাটীর সোঁদা সোঁদা গন্ধের সঙ্গে 'বউ কথা কও'-পাখীর একটানা ক্লান্ত কণ্ঠস্বর তাহাদের শিশুমনকে উদাস-উতল করিয়া তোলে। ইহাদের স্বপ্নবিভোর দৃষ্টি আম্রমুকুলের তীব্র গন্ধে, তাহার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া-বেড়ানো মৌমাছির দল, 'চোখ গেল' পাখীর ডাক আর বনকুসুমের ফলফোটা ছায়াবহুল পথে যে আনন্দ কুড়াইয়া পায়, যে কোন মূল্যবান সম্পদের চেয়ে তাহা কম নয়। ইহাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বিভূতিভূষণ বলিয়াছেন :

"যে জীবন কতশত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিসর্পিত; সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ভুলে-ফলে, দুঃখ-সুখে ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।"

তাই ঝড়ের সময় একলা দিদির সঙ্গে শুধু নয়, পাড়ার সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে বাগানে বাগানে আম কুড়াইতে যাওয়া, বন্ধুতার 'রেলগাড়ী খেলা', আষাঢ় তেলাকুচো ফল, খেজুরের চাপ, লাল সুরকি লইয়া দোকান সাজাইয়া বসিবার সৌভাগ্যে এই পল্লীবালকেরা বঞ্চিত হয় না। কোথায় পাকে কামরাঙা, কোথায় আছে চৈচীফল, কোন্ মাঠের প্রান্তে মটর-খেঁসারির ক্ষেত—তাহাও এই শিশু-অপুদের অজানা নাই।

মায়েদের হাতে মার খাইয়া দিদি বা বোনেরা যখন ভয়ে বাড়ী হইতে পলাইয়া যায়, তখন এই শিশু-অপুরাই বেদনায় ভুকরাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদের মাকে কি বলেন', "দিদির জন্যে মন্ত মন কেমন কর্‌ছে ?"

আবার রাত্রিতে একই বিছানায় ভাই-বোনের সেই কথাবার্তা কেবল অপু-দুর্গার নয় :

"...খুব লেগেছে রে দিদি ? কোথায় মেরেছে মা ?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি বা মেরেছে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্‌কন্ করছে, এইখানে, এই দেখ্ হাত দিয়ে ! এই—

এইখানে ? তাইত' রে। কেটে গিয়েছে যে ? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি ?

থাক্‌গে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেলবেলা যাবো বুঝলি ? কামরাঙা যা পেকেছে !

এই এই এত বড় বড়, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েছি—মিষ্টি যেন শুড়—।"

"অপু-দুর্গার এই প্রীতি কেবল লেখকের কল্পনা নয়,—বাংলাদেশের ছোট ছোট-ভাই-বোনেদের এই-ই সত্যকার কৈশোর-রূপ।

শিশুর বাল্য ও কৈশোরের এই রূপই যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ অভিভূত করিয়াছে। যাদুকর যেমন সম্মোহন-বিদ্যা দ্বারা মানুষকে অভিভূত করে, তেমনি এই শিশুরাও মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টি, মনের সরলতা দিয়া মানুষের বশ করিয়া লয়; তাহাদের ভুলিয়া যা থাকিতে পারে না। মায়ের বুকের পীযূষধারায় তাহাদের দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে; ফোলা ফোলা অধরৌষ্ঠ দেখাইয়া তাহারা জননীর মুখের চুমু কাড়িয়া লইয়াছে, দন্তবিহীন হাসি দিয়া কাড়িয়া লইয়াছে মন। অভিমান দেখাইয়া যাহারা জননীর রাগ লইয়াছে, কান্না দিয়া লইয়াছে অহংকার, রোগ দিয়া ব্যাকুলতা। মায়ের হাসি, অশ্রু, উদ্বেগ,—অন্তরের সমস্ত করুণামাধুর্য যাহারা মায়ের মত হরণ করিয়া মানুষ হইয়াছে যাহারা, সেই শিশু-অপুদের কি জননী ভুলিতে পারে, না ভোলা যায়! তাই—

"লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটী যাদুমন্ত্র করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই; আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি সুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন আর যাদো, বড্ড হেসেছ, আজ বড্ড হেসেছ—আমার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও।"

আবার কোনদিন সন্ধ্যায় পল্লীর নির্জন গৃহাঙ্গনে জ্যোৎস্নাভরা আকাশের নীচে মা ও ছেলের খেলা চলে। শিশুকে ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে মা যখন ঘুমপাড়ানি বা ঐ রকম একটা গ্রাম্য ছড়া সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া বলে, তখন,—

"খোকা টাঁপা টাঁপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মল-পরা অসম্ভব ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত।"

ইহাতো কেবল একা অপুর কথা নয়; ইহা পল্লীগ্রামের শিশুমাত্রেরই আনন্দ-মুখর কাহিনী। এতটুকু খেলার জন্যই, শিশুর নিকট হইতে এই আনন্দ পাইবার নিমিত্ত জননী তাহার সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া লয় আর সন্ধ্যান্ধকারে ভাঙা হারিকেন কিংবা প্রদীপের সামনে অথবা গোবর-নিকানো উঠানে মাদুর বিছাইয়া শিশুপুত্রকে বুকে চাপিয়া তাহার ননীর মত গড়ভরা মুখে ভরিয়া দেয় স্নেহসিঞ্চিত চুম্বন। এইসময়ে আর কাহাকেও জননী পছন্দ করে না, ইহা কেবল মাতা-পুত্রের আনন্দ-মিলন।

যিশু ও মেরী। মায়াদেবী ও বুদ্ধ। শচীমাতা ও নিমাই, আর শ্রীকৃষ্ণ-যশোদা!

সেইজন্যই বিশ্বভিক্ষুগণ যাহা বলিয়াছেন, আজ পর্যন্ত কেহ তাহা মনেও আনিতে পারেন নাই। "মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিত্য আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশব-তারল্য, চাঁদ হাসিয়া গড়া-মুখ, আধো

আধো আধোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়—রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না।"

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে মাতৃঋণ মানুষ জীবনেও পরিশোধ করিতে পারেনা। কিন্তু পুত্র কি মায়ের কাছে শুধু ঋণী। জন্মাবধি সেকি তাহার জননীকে দেয় নাই কিছুই? পুত্রকে পাইয়া জননীর অন্তরের মণিকোঠায় কোন সম্পদ কি সঞ্চিত হয় নাই? বিভূতিভূষণের উপরিউক্ত কথাই এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর।

মায়ের পর আবার সেই দিদির কথাই আসিয়া পড়ে। কেননা পল্লীপ্রধান বাংলাদেশের মা-মাসী-দিদি-পিসীরাই শিশুদের নির্ভরস্থল। ইহাদের বুকে শিশুদলের ঘুমাইবার স্থান, মুখের রূপকথাই মনের ঐশ্বর্য্য আর প্রাণ-উজাড়-করা কল্যাণকামনাই শিশুর পরবর্ত্তী জীবনের পাথেয়।

আঁতুড়ে অবস্থায় মায়ের অনুপস্থিতিতে এই দিদিই ছোট্ট ভাইটীকে পাহারা দিয়াছে, আর একটু বড় হইলে কোলায় শোয়াইয়া গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। খেলার সঙ্গী হইয়াছে দিদি, ঝড়ের সময় আমবাগানেও দিদি, বাহুর হারাইয়া উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে স্বাধীন-ভাবে ছুটিয়া বেড়াইবার কালেও দিদি। সেই দিদির মৃত্যুর পর দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় অপুর বেদনাহত অন্তরের কথা চিরকালের শিশুমনের পরিচয়: "আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে"

সকলের দিদির পক্ষে মৃত্যু তো সম্ভব নয়, আর সব শিশুই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে না। তবে এমনি একটা বিচ্ছেদের সময় শিশুদল বেদনায় অস্থির হয়।

বিয়ের পরে দিদিরা যখন চন্দন-চেলি পরিয়া অপরিচিত শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে সাশ্রুনয়নে যাত্রা করে, তখন এই শিশুরাই কেহ বা ভুকরাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিদিকে ধরিয়া থাকে—যাহাতে তাহার যাওয়া না হয়; কেহ বা ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া ফুলিতে থাকে আর একটু ডান্‌দিটে যাহারা, তাহারা ক্রমীয় অপসৃয়মান পাল্‌কী বা গাড়ীর দিকে চাহিয়া গোপনে দুই ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া লয়।

কিন্তু অশ্রু তো শিশুজীবনের সম্বল নয়। তাহার চলার পাথেয় হইল স্বপ্ন, কল্পনা, আনন্দ। তাই দু'দিনেই ধূলিশয্যা ছাড়িয়া বালক উঠিয়া দাঁড়ায়, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলে দিদির বিচ্ছেদ-বেদনার অশ্রু। অগ্রসর হয় চলার পথে। সেই পথ দেখাইয়া চলেন পথের দেবতা:

"সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলেভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেলো সামনে, সামনে, শুধু সামনে ...দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্য্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে .. !"

এই পথই বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর হইতে যৌবনে—আরও আহ্বান-সুদূরের দিকে অগ্রসর হয়—পরিশেষে ফিরিয়া আসে যথাস্থানে। পুত্র কাজলের মধ্যে হয় বালক অপুর পুনর্জ্জন্ম। জীবনের সমস্ত বীথিপথ ঘুরিয়া, সুখ-দুঃখের কত পান্থশালায় দিন কাটাইয়া

ক্লান্ত চরণে পথিক 'অপুর্ব্ব' ফিরিয়া আসে। কিন্তু কৈশোর জীবনের সে আনন্দ, সে হৃদয়-উতল-করা সুখ বুঝি কোথাও নাই!

অপুর মত এই সব শিশুদের জীবনেও চড়ুইভাতি করা কত দিন, সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলার কত আনন্দ, নদীর ধারে না হোক, গ্রামের কোন নির্জ্জন স্থানে নকল অভিনেতা সাজিয়া গৌরববোধ করিবার কত স্বপ্নমাখা দিনগুলি মিলাইয়া যায়। ইহাদের জীবনেও কত রাণুদি, কত লীলা-অপর্ণা, কত দুর্গাদিদি, ছেলেবেলার জানা-অজানা কত সাথীর দল আসে—আবার মহাকালের চলার পথে মিলাইয়া যায়, কে তাহার খোঁজ রাখে। অপুর মতই কত শিশু উত্তরকালে জননী, আমা, বাল্যসঙ্গিনীদের হারাইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে, সে কথা কয়জন জানে! তাহাদের সেই চলার পথে কত জননী, কন্যার চরণচিহ্ন পড়িয়াছে;—পড়িয়াছে ঘোম্‌টা-টানা কত বধূর অলক্তকরঞ্জিত ভীত পদক্ষেপ; আবার কত হরিণ-নয়না কিশোরীর কলহাস্যমুখর বার্ত্তাবিনিময় মহাকালের বীথিপথকে আনন্দধারায় সিক্ত করিয়া দিয়াছে। জীবনের এই অক্ষয় সম্পদগুলিকে বিভূতিভূষণ সাহিত্যের মধ্যে গ্রথিত করিয়া কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াছেন। তাই উত্তরকালে এই অপুর মুখ দিয়া তিনি স্বীকার করাইয়াছেন—"জীবন খুব বড় একটা রোমান্স,—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স; —অতি তুচ্ছতম, হীনতম একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।"

কিন্তু শৈশব-জীবনের সে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি বুঝি কোথাও নাই। তাই অপু ফিরিতে চায় তাহার কৈশোর জীবনে। বনদেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলে—"এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবনের ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশবছরের শৈশবটা—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?"

জীবনের একস্থানে আসিয়া সব মানুষই বোধহয় এই এক কথাই চিন্তা করে। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের বিমলা তাই বুঝি বলিয়াছিল:—"কতদিন লাগবে আর—কত যুগ, কত যুগান্তরের সেই ন'বছর আগেকার দিনটীতে আর একটি বার ফিরে যেতে?" কিন্তু সেই হারান-দিনগুলিকে তো ধরিয়া রাখা যায় না। তবু আক্ষেপ করে মানুষ, তবু আজিকার পরিণত বয়সের বাঙালী চায়—অতীতের সেই বাংলা, আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঢাকা, বিলভরা পদ্মফোটা বাংলা আবার ফিরিয়া আসুক। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ আর ঘরে ঘরে হাসি ফুটিয়া উঠুক।

যেখানে মায়েরা রূপকথা বলিয়া খুম পাড়াইবে পুত্রকে: মাসী গান শোনাইবে, পিসী কোলে করিয়া পাড়া ঘুরাইয়া আনিবে; ইস্কুলে যাইবার সময় দিদি চুল আঁচড়াইয়া কাপড় আঁটিয়া টিপ্ পরাইয়া দিবে ছোট্ট ভাইটীকে—সেদিন ফিরিয়া আসুক। যেখানে মায়েরা সন্ধ্যাকালে তুলসীতলায় প্রদীপ আনিয়া গলায় আঁচল দিয়া পুত্রের মঙ্গলের জন্য প্রণাম করে তাহার প্রাণের ঠাকুরকে: যেখানে ভগিনীরা সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে প্রথম-দেখা তারকা লক্ষ্য করিয়া সন্ধ্যামণি ব্রত উদ্‌যাপন করে, ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতীরা পুণ্যিপুকুরের মন্ত্র বলে; সকালবেলায় শিবপূজা করিয়া মনোমত বর প্রার্থনা করে কন্যার দল আর সন্ধ্যান্ধকারে ঘাটে প্রদীপ ভাসাইয়া কল্পিতবরকে আপনার সৌভাগ্য গণনা করে বধূ,—সেদিন ফিরিয়া আসুক।—এ কামনা শুধু "পথের পাঁচালী"র অকথিত বাণী নয়, বিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, প্রতারণা ও কোলাহলমুখরতার যুগে বাস করিয়া বোধহয় অধিকাংশ বাঙালীই মাঝে-মাঝে এই কথা মনে করেন।

স্বামী অভেদানন্দের স্মরণে

স্বামী বেদানন্দ

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শুধু একাধারে সত্যদ্রষ্টা মহাযোগী, মহামেধাদার্শনিক, বিরাট কর্মী, মহাজ্ঞানীপণ্ডিত ও ব্রহ্মজ্ঞমহাপুরুষমাত্রই নহেন, পরন্তু ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের তিনি বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সন্তান—সমগ্র জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শপ্রচারের সুযোগ্য অধিকারী। একমাত্র বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কোন শিষ্যই এমন সুদুর্লভ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। পাশ্চাত্য দেশে ভারতের সভ্যতা সাধনা ও সংস্কৃতির আদর্শ প্রচারের মহাকার্য্যে তিনিই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সর্ব্বপ্রধান সহকর্মী ও অবিচ্ছিন্ন সহচর। "যদি আমি কাল দেহত্যাগ করি তবে সমগ্র জগৎ আমার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার মুখ হইতে আমার বাণী শ্রবণ করিবে"—ইংলণ্ডে এক প্রকাণ্ড জনসভায় স্বামী অভেদানন্দের প্রথম বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের এই ঘোষণাই প্রমাণিত করে যে স্বামী অভেদানন্দই স্বামী বিবেকানন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। যে মহাকার্য্যের বীজ পাশ্চাত্যদেশে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রোপিত হইয়াছিল স্বামী অভেদানন্দের সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরব্যাপী অক্লান্ত, অনলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সেই বীজ আজ বহুশাখাপ্রশাখা-সমন্বিত বহুমূলপ্রসারী দৃঢ়মূল বিরাট বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত।

স্বামী অভেদানন্দের প্রচার কার্য্যের মধ্যে ছিল একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—এক অপরূপ অভিনবত্ব। তাঁহার আশ্চর্য্য দার্শনিক-মনীষা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বিচিত্র বাগ্মিতা, অকাট্য যুক্তি, চিত্তাকর্ষণশক্তির অপূর্ব্বতা, সুনির্ম্মল চরিত্র ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অপরিমেয় আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্যদেশের বিদগ্ধ ও মনীষীমণ্ডলীর মধ্যে এমন আগ্রহ ও অনুরাগের সৃষ্টি করিয়াছিল যে তিনি নিউইয়র্ক, বোষ্টন, সানফ্রান্সিস্কো, এবং লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, প্রাগ প্রভৃতি মহানগরীর বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্বৎসভা, সংস্কৃতি সমবায় ও ধর্ম্মমহাসম্মেলনে সসম্মানে বক্তৃতা দিতে আহূত হইতে লাগিলেন। এমন কি রেভারেণ্ড ডক্টর হিবার নিউটন প্রভৃতি উদারচেতা মহাপণ্ডিত ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামিজীকে আমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রচার-কার্য্যের ফলে পাশ্চাত্যদেশের, বহু সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর নিকট ধর্ম্মগুরু বলিয়াই তিনি শুধু বরণীয় হন নাই, পরন্তু ম্যাকসমূলার, পল ডয়সন, ল্যানম্যান প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মনীষীরাও তাঁহার অপ্রমত্তজ্ঞান ও দার্শনিক প্রতিভাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। উইলিয়ম জেমসের ন্যায় প্রখ্যাতনামা মনীষীও স্বামিজীর যুক্তিতর্কের সারবত্তা ও অকাট্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সভ্যতার যে মৃত্যুহীন অমেয় মহিমা, যে সমুজ্জ্বল গৌরব তাহা স্বামী অভেদানন্দের অব্যর্থ অন্তর্দৃষ্টিতে সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইজন্য এই স্বদেশপ্রাণ যোদ্ধা-সন্ন্যাসী সেই সুদূর বিদেশে নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব অবস্থায় প্রচারকালে স্বাধিকারপ্রমত্ত শক্তি ও ধনগর্ব্বিত বিদেশীদের নিকট নিজের দেশ ও জাতিকে কখনও কোনও রূপে ম্লান ও অবনত হইতে দেন নাই। নানা বাধাবিঘ্ন বিপত্তি বিরোধিতা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া স্বামী অভেদানন্দকে একেশ্বর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। যেখানেই কোন বিদেশী ভারতধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন, সেই প্রতিপক্ষ যতই বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানে প্রবল হউন স্বামিজীর

অমিততেজ, কুশাগ্রবুদ্ধি ও বিদ্যাবৈভবের কাছে তিনি স্তম্ভিত ও পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন। India and Her People গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাবলী, তাহা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যদেশের বহু সহস্র সুশিক্ষিত ব্যক্তির মন হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদ্বেষ, অজ্ঞতা, ভ্রান্তধারণা ও উপেক্ষার ভাব চলিয়া যায়। স্বামিজীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহার বক্তৃতা, ধর্মব্যাখ্যান শুনিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে আমেরিকার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বুঝিতে সক্ষম হন, ভারতবর্ষ নগ্ন, নরখাদক, অসভ্য বর্বর জাতির বাসস্থান নয়—ভারতবর্ষ মানবসভ্যতার আদি জন্মভূমি। ভারতবর্ষ সুসভ্য জাতির দেশ।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বে স্বামিজীর ছিল অসাধারণ অধিকার। আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় উদ্ভাবনা আবিষ্কার ও তাহার ক্রম-অগ্রগামী চিন্তাধারার সহিত স্বামিজী সাক্ষাৎ ও সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন। ধর্ম ও দার্শনিক ব্যাখ্যানে সেইজন্য স্বামিজী কোনও গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, বিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং মধ্যযুগের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে আদৌ প্রশ্রয় দেন নাই। স্বামিজীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মমত ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অদ্বৈতবেদান্ত-প্রতিপাদক তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক উদার সংস্কারমুক্ত, পরিপূর্ণ অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া স্বামিজী মানবজীবন, ধর্মসাধনা ও দার্শনিক মতবাদকে দেখিতেন। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়কে তিনি প্রকৃত দার্শনিকের বিশ্লেষণী শক্তি দ্বারা তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি তন্ন-তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিতেন। বৈজ্ঞানিকের সমীক্ষণ-শক্তি তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল বলিয়া কাহারও উক্তি, সিদ্ধান্ত অথবা মতবাদের মধ্যে যুক্তির সারবত্তা থাকিলে তবে তাহা গ্রহণ করিতেন—অন্যথা তাঁহার বিচারশক্তিদ্বারা সেই বিষয়ের অসারতা প্রমাণদ্বারা তখনই তাহা খণ্ডন করিয়া দিতেন। কোনও জ্ঞাতব্য বিষয়কে সেই জাতীয় অন্যবস্তুর সহিত তুলনামূলকভাবে তিনি দেখিতেন বলিয়া তাহাদের গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সকলদিকই তিনি আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেন। তিনি শুধু যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা স্বীয় মত সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করিতেন না—পরন্তু তাহার উপর তিনি ইহাদের সত্যতা দেখাইবার জন্য দিতেন তাহাদের ঐতিহাসিক প্রমাণ। ইহার উপর নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে স্বীয়মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেন। এইসকল কারণেই আমেরিকার প্রখ্যাতনামা পত্রিকাসকল স্বামিজীর প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে অকুণ্ঠিতভাবে বলিয়াছে :

"Swami Abhedananda preaches no mushroom creed." "He bases his arguments, not on theological hypotheses but on scientific facts." "It is impossible to quarrell with his book. He writes too interestingly and he is a man with a mission."

এইভাবে ভারতের সভ্যতাকে ভারতের সাধনা ও ধর্মাদর্শকে যে দিব্যদ্রষ্টা বহুমুখী প্রতিভাশালী মহাকর্মী ঋষিপ্রকল্পপুরুষ বিশ্বের সভায় বরেণ্য করিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রতি পাশ্চাত্যের বিদ্বৎসমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মানের ঐকান্তিকভাব জাগ্রত করিয়াছেন, সেই স্বামিজী মহারাজের বিচিত্র জীবন ও দিব্যবাণী কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাহা সমগ্রভাবে সমস্ত ভারতবাসীর,—তাহা সমগ্র মানবজাতির মৃত্যুহীন, শাশ্বত সম্পদ। জ্ঞানে, কর্মে, পুণ্যে, সংযমে, পবিত্রতায়, স্বদেশপ্রীতিতে মানবপ্রেমে ও জাতীয়তায় যে আশ্চর্য্য ও জীবন্ত আদর্শ স্বীয় জীবনে স্বামিজী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক মুক্তিপ্রয়াসী ও মহত্বকামী নরনারীকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করিবে। আজ (১২ই আশ্বিন, ১৩৬০) তাঁর ৯১তম শুভ জন্মতিথি দিবসে তাঁর ধ্যানদীপ্ত জ্ঞানগভীর পরমপ্রশান্ত ক্ষমাসুন্দর আনন্দমূর্তিকে আমরা বারবার ভক্তিভরে প্রণাম করি। তিনি আশীর্বাদ করুন ভারতের ধর্মাদর্শ, জাতীয়তা ও সমস্ত সাধনা সর্বতোভাবে আমাদের সকলের জীবনে সার্থক, সত্য ও সফল হউক,—আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই।

স্বামী অভেদানন্দের ভাব-তীর্থে

১। জ্ঞান কি বাহির থেকে কেউ দিতে পারে? জ্ঞান তোমার ভিতরেই আছে। বিশ্বাস কর—তুমি অনন্ত জ্ঞানের আধার। শুধু বই পড়লে কি হবে? তোমার ভিতরে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে—তাতে ঘা' মার তা'হলে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে—Knock and it shall be opened unto you.

২। আট বৎসর বয়স থেকে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের মধ্যে সব ভাব ঢুকিয়ে দাও। তারপর যা খুসি করুক। ছেলেবেলাতে যেটি করবে সেটি চিরদিন স্মরণ থাকবে। ছেলেবেলাতে ঘুলে কি তারা খেলেছে, যুবক হয়েও তোদের সে-সব মনে আছে। কুড়োনের দিয়ে কিছু হবে না। পরমহংসদেব বলতেন—'টিয়ে পাখীর কি ময়না পাখীর বা শালিখের যখন গলায় কাঁটি উঠে তখন আর সে পড়ে না। কাদা যখন নরম থাকে তখন যা খুসী গড়া যায়, শক্ত হয়ে গেলে কিছুই হয় না।' ছেলেবেলা থেকে মনকে যে দিকে চালাবে সে সেইদিকেই চলবে।

৩। যে বাহ্যিক বিভিন্নতা আমরা দেখতে পাই তাহা আত্মার নয়; উপাধিতে—মনে, দেহে। আমাদের মধ্যে হাজার শ্রেণীবিভাগ থাকুক না, আমরা সকলেই ভগবানের সন্তান, সুতরাং এক।

৪। যে যোগী সেই ভোগ করতে পারে, যে যোগী নয় সে ঠিক ঠিক ভোগ করতে পারে না, তাকে রোগ ভোগ করতে হয়। জনক রাজা যোগী ছিলেন তাই তিনি ভোগও করতে পেরেছিলেন।

৫। আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে, নিজের ভিতরে শান্তি ও সন্তোষ যদি না থাকে তবে যেখানে যাইবে সেখানে কোন না কোনপ্রকার অশান্তি ও কষ্ট পাইবে। বিচার দ্বারা মনের চারিদিকে দেওয়াল তুলিয়া দিবে। বাহিরের পরিপার্শ্বিক অবস্থার ঝামেলা ভিতরে ঢুকিতে দিবেনা। ইহাই সাধনা জানিবে।

৬। মনের অনুকূল স্থান দুনিয়ায় পাইবে না। প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে অনুকূল করিয়া লইতে শিখিবে। মনই সব।

৭। গাছের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যায়! গাছের ন্যায় তিতিক্ষা অভ্যাস করিবে এবং সহ্যগুণ বাড়াইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—শ, ষ, স। সহ্য করিতে থাক। মন চঞ্চল করিও না।

৮। ঝড়ের আগে পলাইয়া নিজের স্বাচ্ছন্দ্য যে খোঁজে তাহাকে বীর বলা যায় না; সে তো কাপুরুষ। তোমাদের মধ্যে কাহাকেও আমি কাপুরুষ দেখিতে চাহিনা। বুক পাতিয়া দুঃখ কষ্ট লইবে এবং কখনও হাল ছাড়িয়া নৌকা ডুবাইবে না।

৯। গুরু এবং ইষ্ট এক ও অভিন্ন। গুরুর ধ্যান করিলে গুরু ইষ্টকে দেখাইয়া দেন। ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস চাই।

১০। কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম হয়না। ধর্ম লাভের জন্যে চাই সমস্তকর্মকে ঈশ্বরের উপাসনায় পরিণত করা। সমস্ত কাজের মধ্যে যদি ঈশ্বরের অনুভূতি ফুটে উঠে তবেই ধর্ম জীবনের সার্থকতার প্রমাণ। 'ধর্মজীবন' মানে সমস্ত জীবনটাকে ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ করে ফেলা।

১১। আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানই ধর্মের আসল দিক (essential parts)। নিজের দিব্যস্বরূপকে উপলব্ধি করার ফলে যে জ্ঞানলাভ হয়—তারই নাম আত্মজ্ঞান আর হীনসংস্কার ও পশু-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করার নামই আত্মসংযম। পশু-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

১২। ধূম যেমন অগ্নি ছাড়া থাকেনা, কর্মও তেমনি দোষকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। ধর্মের ভাল ফলও আছে আবার মন্দ ফলও আছে। কর্মের স্বরূপই হ'লো ভাল ও মন্দ, এই উভয় ফল মেশানো। Time, space and causation (কাল, দেশ ও নিমিত্ত) এর ভেতরই কর্ম, কারণ কামনা ছাড়া কর্ম হয়না। ইচ্ছা বা বাসনা মানুষ বা প্রাণী মাত্রেরই

আছে। মনের active (সক্রিয়) বা manifested (ব্যক্ত) অবস্থাই বাসনা, সুতরাং মন থাকলেই বাসনা থাকবে। বাসনাই হ'ল change (পরিবর্তন)। এই change এর (পরিবর্তন) ক্রমাগতই চলেছে—এক মুহূর্তও স্থির নেই। এই change-এর (পরিবর্তনের) পারে যাওয়া মানেই শান্তি—equilibrium (সমতা)। যোগী ও সাধকেরা মনে এই change (পরিবর্তন) কেই অতিক্রম করে শান্ত ও সমাহিত হ'ন।

১৩। জীব আর ঈশ্বরে ভেদ কোথা? ভেদ তো তোমাদের মনে। ভেদই 'ভ্রম', যাকে শঙ্কর অধ্যাস বলেছেন। এই ভ্রম বা অধ্যাসের জন্যই 'আমি একটি জীব আর নিয়ন্তা একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'—এ রকম ভেদ আমরা মনেই কল্পনা করি। এই কল্পনা আত্মা বা ঈশ্বরে অধ্যস্ত হয় বলেই তো আমরা বলি 'আমি ক্ষুদ্রজীব' আর 'ঈশ্বর বা ভগবান আমা থেকে ভিন্ন।' এই ভেদ ভাবাটাই আসলে 'ভ্রম'।

১৪। মানুষ আগে নিজেকে চিনুক। নিজের স্বাধীনতা আগে, তারপর দেশের স্বাধীনতা। First be, then make (আগে নিজেকে তৈরী করো, তারপর দেশকে ও জগৎকে তৈরী করবে)। যে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনা how is it possible for him to make another man free? (কেমন করে তার পক্ষে অপর মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব?) রাজ্যের কামনা বাসনা আর নাম যশের তোমরা দাস হয়ে রয়েছ, আগে ঐ গুলোকে দূর কর দেখিনি। তারপর জগদ্ধিতায় কাজ করবে।

অভেদানন্দ বন্দনা

শ্রীনলিনীবালা বসু

অজ্ঞান-আঁধার-রাশি বিদূরিত করি
মহা করুণায়
দেখাইতে শুভ সত্য পথ সুমহান
আসিলে ধরায়।
পুঞ্জ পুঞ্জ তমো রাশি করি অপসার
জ্ঞানের আলোকে,
মুক্তির অভয় মন্ত্র লিখি মানবের
হৃদয় ফলকে
নিমিষে হরিয়া নিলে বিষাদ গভীর
বেদনা করুণ,
অন্তরে আনিয়া দিলে আশার বারতা
প্রেমের অরুণ।
হে হিরণ্যগর্ভশায়ী মহান পুরুষ!
কোটী সূর্য্য সম
তোমার আভায় ধরা উজল,—দূরিত
মায়া মোহ তম।
না জানি তোমার তত্ত্ব মহাভাবময়
স্বরূপ না জানি
চরাচরব্যাপী হেরি রূপাতীত রূপ
বস্তু বলি মানি।
তুমি আদি অন্তহীন নিত্য নিরঞ্জন
অক্ষর অব্যয়
সত্য শিব সুন্দরের অসীম প্রকাশ
অচিন্ত্য চিন্ময়।
নমো হে অচর-চর ধরণীপালক
নিখিলের গুরু।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, সেবকবৎসল,
ইচ্ছা-কল্পতরু।
তোমার জনম তিথি এসেছে ফিরিয়া
আজি সুলগনে
পূজিছে চরণ সবে প্রেম শতদলে
ভকতি চন্দনে
আমার নাহিক কিছু, তাই আঁখি-জলে
অর্ঘ্য রচিলাম
রাখিনু চরণতলে মম মানসের
অনন্ত প্রণাম।

রামকৃষ্ণঃ শরণম্

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

সদা ভ্রমংশ্চিরন্তনঃ স্বভাবদুরূপকল্মাৎ
তদা বসেৎ পুরন্দরো মুদা মনোমধুব্রতঃ।
প্রভা প্রবর্ততে প্রভো হৃদম্বরে তমোহুদো
যদা হি রামকৃষ্ণ তে বহেৎ কৃপাসমীরণঃ ॥ ১

সদা ভ্রমন্নিতস্ততঃ স্বধামতত্ত্বধাতুরো
মরৌ মরীচিকাং গতস্তদা সুখং সুহাগতঃ।
পথপ্রদর্শকং স্বয়ং জয়েতি নামপূর্বকং
যদা হি রামকৃষ্ণ তে কৃপাপহং পদোদকম্ ॥ ২

সদা পলায়িতো ভয়াদ্ ভবাটবীচরো মৃগো
বনানলাদ্ বনেচরং গতোঽপি পালিতস্তদা।
প্রকামমম্বুদো মহাঽদেতি তেঽপহেতুকো
যদা হি রামকৃষ্ণ তেঽস্তকান্তকঃ কৃপাশ্রয়ঃ ॥ ৩

কথং দশ অপদ্দশা ন কিং নখেন্দবো দশ (সন্তি)
কথং মনো বিষাকুলং ন কিং গিরাং সুধাঝরী। (অস্তি)
কথং তমো প্রসেদ্ধিশো ন কিং স্মিতপ্রভাতিদূরতঃ (অস্তি)
কথং রজো দহেদ্ধিনং ন কিং রজঃ পরা রুচিঃ (অস্তি) ॥* ৪

যথা চিরং নিরঞ্জনং সমাধিমৌনমস্থিতং
তথা জগৎ-সুহৃদ্বরো জগজ্জরণ্যজন্মনা।
স্বয়ং পরঃ পুমান্ সবৈ স্বলীলয়ৈব সাবরা
সশক্তিকো যুগপ্রভু র্যুগং পুনাতু রক্ষতু ॥ ৫

(১)

বাহিরে কোথাও তো নয়, আপনার ভাব সরসীতে
নিরালায় ফুটি-ফুটি মর্ম শতদল!
চকিতের সুরভি পরশ! কিন্তু, কৈ আলো হৃদয় মাঝারে!
ঘুরে সারা তিমিরান্ত খুঁজিয়া কমল!
মরমিয়া মধু পুরস্কারে, নিয়ে আসো মন মধুপেরে,
হৃদয় উজলি, পদ্মকোরক বিকাশি,
তমোহারী তোমার কিরণে! কর কৃপা-অনুকূল বায়।
আর সে বিমুখ যায় যাবে না তো ভাসি!
ভাব পদ্ম ফোটাবার তরে, পথের বিপায়ী আত্মমধু পরিবেষে,
তুমি অনির্বাণ জ্যোতিঃ! রামকৃষ্ণ! পরমপুমান্!
গতিব্যাজ-সঙ্কটে সুহৃদ, তব কৃপা সমীরণ!

---

* 'রজঃ পরা রুচিঃ' পাঠান্তরে (১) তমঃ পরা রুচিঃ, অথবা (২) মনোময়া রুচিঃ, অথবা (৩) পরো মধুবিদঃ।

(২)

ফেলি দূরে, ভুলি নিজধাম, এলা হোথা ঘুরিয়া অশান্ত,
তৃষাতুর মাগি একফোঁটা স্নিগ্ধবারি !
কিন্তু একি হ'লো। পথভোলা, পথে পথে জীবন ভিখারী,
মরু মরীচিকা মাঝে হইবে প্রাণান্ত !
'ভয় নেই, নেই ভয়' ওগো আর্ত্ত !
জেনো শুধু 'রামকৃষ্ণ' নামে 'জয়' দিলে মেলে পথ
নিজধাম ফিরিবার তরে ! আর, কৃপা ওষ্ঠাগত প্রাণ
জুড়াইতে, তাঁরি পাদোদক চির রাখিল শপথ।

(৩)

সদা ভয়ে পলায়িত তুমি,
ওগো ভবাটবীচর মৃগ !
ঘিরিয়া ধরিল বনানল,
ভয়ে ছুটে পড় হিংস্র শ্বাপদ কবলে !
নিজবাসে আগুন জ্বলিলে, পরবাসে ততোধিক ত্রাসে
কেন বারংবার ক্রূর মরণেরে মাগো !
উদি অহেতুক প্রেমাধৃক, সুমহান্, অঘোরে বরষি,
নিভায় যে সর্ব্বজ্বালা প্রেমের ঠাকুর !
রামকৃষ্ণ ! 'কৃষ্ণ' নাম প্রেমকল্পতরু ! আর, তব 'রাম' নামে ধর
কৃতান্তেরো অন্তকারী নিজ কৃপাশর।

(৪)

কেন বল, ওগো আর্ত্তজীব ! হৃদ দশা দহে নিরন্তর !
ভাসে কেন ও চরণে তবে দশনখ শশী !
কেন মন বিষেতে আকুল। কৃপাঘন ঠাকুরের মুখে
তোমাতরে ঝরে নাকি সারসত্য কথামৃত রাশি !
দেখিছ আঁধার দশদিশি ! শ্রীবয়ানে অই দুটি দিঠি,
মহাভাব-স্নিগ্ধজ্যোতি, চালে নাকো নিখিল উজলি !
ভবরণঃ প্রখর দহনে, কেন বল, কোথা জুড়াইব !
রজতাপে অনুদিন যাই শুধু জ্বলি !
বিরজা বিশোক ধামে চির, উদ্ভাসিত যে ময়ূখ-রুচি,
শান্ত, কান্ত, সৌম্য ছটা তার, ঐ দিব্য ভালে যে উছলি !

(৫)

সর্ব্বনাম, বর্ণ, রূপ পারে, শুদ্ধ যে অনঘ নিরঞ্জন,
অত্যদ্ভুত সমাহিত মৌন স্থিতি তার !
তথা জন্ম জগৎ শরণ্য, জগতের একান্ত সুহৃৎ।
নিত্য আর লীলা-গভীরাম্বরাশি—পার তার কবে, কেবা পায় !
তবু সত্য নিত্য হে পুরুষ ! স্বলীলায় আপনি সারদা।
যুগযুগ যুগপিতা, যুগের জননী।
মহতী বিনষ্টি ভয়ভীত, যুগ আজ আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে—
পূত কর, স্নিগ্ধ কর, শান্ত কর, রাখো নাথ ! যুগের পরাণী।

গীতার সাধনা

শ্রীসুন্দরবন্ধু সেন

বিষাদ যোগেই গীতার আরম্ভ। ধর্মসংকট উপস্থিত হোলে হৃদয় মথিত কোরে সংশয়াকুল বিষণ্ণচিত্তেই নানা প্রশ্ন ওঠে। এই প্রশ্নের নাম জিজ্ঞাসা। গীতার প্রথম অধ্যায়কে দার্শনিক ভাষায় "অথা তো ধর্ম জিজ্ঞাসা' বলা যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতাভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের সূচনার প্রারম্ভে বলেছেন, "জিজ্ঞাসা বিনা জ্ঞান হয় না।" দুঃখ বিনা সুখ হয় না। ধর্মসংকট হৃদয় মথন ইত্যাদি সকল জিজ্ঞাসুদের একবার হবেই হবে। ধর্মসংকট কাকে বলে? ধর্মের নানা অর্থ নানা সম্প্রদায়ে প্রচলিত রয়েছে। ধৃ ধাতুর সাধারণ অর্থ ধারণ করা, অর্থাৎ যা আমাকে ধারণ করে রয়েছে, যা আমাকে শ্রেয়'র পথে নিয়ে যায়। আবার ধৃ ধাতু মানে প্রবর্তন করা কিংবা পাইয়ে দেওয়া। স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকেও ধর্ম বলা যায়। মনুসংহিতার আর একটী নাম মানবধর্মশাস্ত্র। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। যা স্বভাবকে ধারণ করে রাখে, যা ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণকর তাকেই আমরা সচরাচর ধর্ম নামে অভিহিত কোরে থাকি। বৈশেষিক দর্শন বলেন, 'যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি স ধর্মঃ।" অভ্যুদয় মানে কল্যাণ, নিঃশ্রেয়স অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ। যাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তার নাম ধর্ম। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকের মতে "তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" তত্ত্বজ্ঞান হোলে নিঃশ্রেয়স,—পরমকল্যাণ অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। কর্মক্ষেত্রে যখন প্রকৃতিবিরোধী কর্মদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, যখন মানুষ কর্তব্যকার্যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়,—চিরপ্রচলিত ভাবের সঙ্গে নবাগত ভাবের সংঘর্ষ হয়— তখন তাকে জিজ্ঞাসু কোরে তোলে। অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থেকে সংশয়ের উৎপত্তি। মানুষের চিত্তে সংশয়ের উদয় যখন হয় তখন তাকে তা নিরসন করবার জন্য ব্যাকুল হতে হয়,—যিনি সংশয় ছিন্ন করতে পারেন তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে মানুষ জিজ্ঞাসা করে। গীতার প্রারম্ভটী অতুলনীয়। "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।" তত্ত্বমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে মহারথী অর্জুন মহাসমরের প্রাক্কালে আঠার অক্ষৌহিনী যুদ্ধার্থী রথী মহারথী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে সংশয়াকুলচিত্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত ও কম্পান্বিত কলেবর। আজ তাঁর মনে প্রশ্ন উঠছে 'এই কি ধর্ম? কোটী কোটী প্রাণিহত্যা, নিজের গুরু পিতামহ আত্মীয়স্বজন, বধ কোরে কি রাজ্যসুখ ভোগ করব?" যাঁদের মৃত্যু বা বিরহে হৃদয় শোকাচ্ছন্ন আর জীবনধারণ বৃথা বোধ হয়, তাঁদের অস্ত্রে নিহত করতে হবে? এই কি ধর্ম? না-না এতো ধর্ম নয়—কুলধর্ম নাশ, ইহপারলৌকিক ধর্মনাশ, বর্ণসঙ্করে সমাজের গ্লানি ও বিপ্লব—এ তো ধর্ম নয়। মহা মহা অধর্ম। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা, অত্যাচারের প্রতিকার করা, আততায়ীকে বিনাশ করা। ধর্ম ও অধর্ম কি? পাপ-পুণ্য কি? শ্রেয় ও প্রেয় কি? এই প্রশ্নের সমাধান করবার জন্য অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসু। তিনি বিনীতভাবে শ্রীভগবানকে বলছেন—

"কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

(কার্পণ্যদোষে অভিভূত হয়ে আমার স্বভাব চঞ্চল হয়েছে ; আমি ধর্মবুদ্ধিবিমূঢ় হয়েছি আমি তোমার শরণাগত। তোমার শিষ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমায় নিশ্চিত শ্রেয়ঃ সাধনের উপদেশ দাও।) যার ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ হয় নি, যে অজ্ঞান সে-ই কৃপণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ এইরূপ অজ্ঞানীকে কৃপণ বলে নির্দেশ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁর ভাষ্যে বলেন, "কৌরবেরা আসুরী ও পাণ্ডবেরা দৈবীবৃত্তিসম্পন্ন। এই দুটী বৃত্তি পরস্পর সম্মুখীন হলে সংঘর্ষ হয়।" মানবদেহে চিত্তক্ষেত্রে এইরূপ যুদ্ধ চলছে, কুরুক্ষেত্র সমরের চেয়ে তা কম নয়। কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম ও কর্মক্ষেত্র উভয়ই বলা হয়েছে। তীর্থরূপে ধর্মক্ষেত্র এবং মহাসংগ্রামের স্থান —কর্মক্ষেত্র।

অর্জুনের শোক মোহ দূর করবার জন্য শ্রীভগবান নিয়ে এলেন প্রথমে নিত্যানিত্য-বিচার ; তিনি বুঝিয়ে দিলেন—দেহ অনিত্য, দেহী নিত্য।

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥"

(যিনি অখিল জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি অবিনাশী। এই অব্যয় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে পারে না)। অস্ত্র তাঁকে কাটতে পারে না, আগুন পোড়াতে পারে না, জল ভেজাতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করতে পারে না,—ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী স্থির। অচল—সনাতন। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী। যাঁরা আত্মবিদ্, তাঁদের অজ্ঞানতাজনিত শোক মোহ থাকে না। কেউ আত্মাকে দর্শন কোরে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন, কেউ আশ্চর্যরূপে আত্মার বর্ণনা করেন, কেউ আশ্চর্যবৎ হয়ে শোনেন। শুনে,' বলে,' দেখে'ও কেউ আত্মাকে জানতে পারে না। আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, "একজন সাগরদেখে এসেছে। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে 'কেমন দেখলে ?' সে মুখ হাঁ করে বলে 'ওঃ ! কি দেখলাম ! কী হিল্লোল কল্লোল !' ব্রহ্মের কথা—তাঁকে জানা সেই রকম। তিনি কি বস্তু তা মুখে বলবার শক্তি থাকে না।"

গীতায় শ্রীভগবান বলছেন—"দেহ আর দেহী এক নয়। দুটী ভিন্ন বস্তু।" দেহ অস্ত্রে কাটে, আগুনে পোড়ে, জলে ভেজে, বাতাসে শুকোয় ; তার জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় আর বিনাশ—এই ছয় বিকার আছে। দেহী বা আত্মার এ সব কিছু নেই। এই দেহী—আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। দেহ শুধু একটা আবরণ বা কোষ মাত্র। দেহকে দেহী মনে কোরেই যত গোল। এই দেহাত্ম বুদ্ধি যায় কিসে ? অবিদ্যা, অজ্ঞানতা দূর হোলে। ধোঁয়ায় যেমন আগুন, ময়লায় যেমন আয়না, জরায়ুতে যেমন গর্ভ ঢাকা থাকে, কাম বা বাসনার আবরণে তেমনি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আবৃত। এই আবরণ দূর করার উপায় কি ? মহাশত্রু কামকে ধ্বংস করতে হবে। কাম বা বাসনা এল কোথা থেকে ? শ্রীভগবান বলছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।" রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা আর আসক্তির উদ্ভব কোরে মনকে মাতিয়ে তোলে। শ্রীভগবান বলছেন—"তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।" এটিই কর্মাসক্তিরূপে জীবকে বন্ধন করে। এই রজোগুণ এল কোথা থেকে।

শ্রীভগবান বলছেন—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।"

(সত্ত্ব, রজ আর তম এই তিনটী গুণ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়ে অব্যয় দেহীকে দেহাত্মবুদ্ধিতে বেঁধে ফেলে।) প্রকৃতিই ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি এটী করেন কেন ? শ্রীভগবান বলছেন—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥"

এর ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর বলেন "ব্রহ্মের স্বরূপভূতা মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি থেকে সর্বভূতের উদ্ভব।" শ্রীধর স্বামীপাদ বলেন—"বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্ব ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ।" শ্রীভগবান বলছেন,—"আমার স্বকীয়া মায়াশক্তি সমগ্র জীব জগতের প্রধান আধার, নিখিল জীবজগৎ প্রসবিনী জগজ্জননী; আমি তাদের বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতি পুরুষ – এই উভয়কেই অনাদি বলে জানবে।" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। মণি আর তার জ্যোতি, অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; একটী বাদ দিয়ে আর একটীকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তি ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। একই বস্তু যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে' কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন তখন তাঁকে কালী বা শক্তি বলি। একই ব্যক্তি—নাম, রূপ ভেদ।" সমস্ত ক্রিয়াশক্তির মূল প্রকৃতি—তাতে অবস্থিত পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তা। "সুখদুঃখ সম্ভোগঃ সংসারঃ।" গুণের সংসর্গেই জীবের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম হয়। এই সংসাররূপ অশ্বত্থগাছের মূল উর্ধে—"ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্।" মূল উর্ধে কেন? এই অনাদি সৃষ্টি প্রবাহের মূল উৎস অব্যক্ত মায়াশক্তিমান ব্রহ্ম—অব্যাকৃত প্রকৃতিসংযুক্ত চৈতন্য বা পরমাত্মা। এই সংকট থেকে জীবের উদ্ধারের উপায় কি?

শ্রীভগবান বলছেন—

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী।"

(যাঁকে পেলে আর জন্ম হয় না—যাঁর থেকে চিরন্তনী সংসার-গতি বিস্তৃত হয়েছে, সেই আদিপুরুষ পুরুষোত্তমের শরণাগত হয়ে তাঁর সন্ধান করতে হবে)। এই পুরুষোত্তম কে?

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

পরমদয়াল শ্রীভগবান ভক্তের কাছে ধরা দিয়ে বলছেন—"দেখ, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বা ঊর্ধতম তাই লোকে আর বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে থাকে। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আমারই অধিষ্ঠান, স্মৃতি আর জ্ঞানরূপে আমি উদিত হই, আবার আমি তা কেড়ে নিই—আমিই বেদের বেদ্য, বেদান্তের জ্ঞানদাতা আচার্য বা গুরু, আমিই প্রকৃত বেদার্থবেত্তা।" গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছি; পুতুল নাচের পুতুলের মত আমার মায়াশক্তিতে নাচাচ্ছি। যদি এর থেকে রেহাই পেতে চাও তবে সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হও। আমার কৃপায় পরমশান্তি আর শাশ্বতপদ লাভ করবে।" শরণাগতির আর কৃপালাভের সাধন কি? শ্রীভগবান অভয় দিয়ে অর্জুনের ব্যপদেশে জগতকে বলছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও, আমার প্রীতির জন্য নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান কর, শরণাগত হয়ে আমাকেই সর্বাঙ্গে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করবে। এতেই আমাকে পাবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; তাই তোমাকে এই গুহ্যতম সাধনার কথা বলছি—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্বপ্রকারে ধর্মশাস্ত্রবিহিত কর্ম হোক, শাস্ত্রনিষিদ্ধ অধর্মই হোক, জীবধর্ম, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম বা প্রচলিতধর্ম হোক বা সাধারণ মানবধর্মই হোক, এই সব ধর্মাধর্মের ফল প্রাপ্তির দিকে না লক্ষ্য রেখে সব ত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাগত হও। তোমার কর্মজনিত যতকিছু পাপ থাকুক, সব থেকে আমি মুক্ত করবো। তুমি অনুশোচনা করো না।"

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ বা রাজযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন পথ সকল পথের গম্য স্থান—শ্রীভগবান বা পরমাত্মা পরমব্রহ্ম। তাই শ্রীভাগবতে বলা হয়েছে—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

তত্ত্ববিদ্ সিদ্ধমহাপুরুষেরা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে থাকেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে বলেছেন : "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।" এই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বে স্থিতিলাভ করলে সাধক ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

অর্থাৎ যাঁরা ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেছেন, তাঁরা শোক বা কামনা করেন না। তাঁদের তো কোনও বিষয়ে অভাব নেই—জন্মমৃত্যু-রহস্য তাঁরা জানেন। সর্বভূতে তাঁরা ব্রহ্মদৃষ্টিতে আমাকেই দেখতে পান। তাঁরা সমদর্শী। উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কোনরূপ ভেদবুদ্ধি তাঁদের থাকে না। এইরূপ ব্রাহ্মী-স্থিতিতে স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিমগ্ন সাধক আমাতে পরমাভক্তি লাভ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে গোপীমায়েরা গীতোক্ত শরণাগতি-সাধনের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। স্বয়ং শ্রীভগবান বলেছেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেবং দয়িত শ্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

গোপীদের মন-প্রাণ দেহাত্মবুদ্ধি সব আমাতেই মগ্ন ছিল। নিজেদের দেহবুদ্ধি ত্যাগ করে আমাকেই শ্রেষ্ঠ প্রভু বা পরমপতিরূপে মনবুদ্ধিগত হয়েছিল তাদের আর কোনও আত্মবুদ্ধি ছিল না।

ব্রজনারীরা কাত্যায়নীব্রত করে পরমাপ্রকৃতির কাছে গোবিন্দকে চেয়েছিল একমাত্র হৃদয়-দেবতা ও পরমপতিরূপে। মা কাত্যায়নী বা কৃষ্ণে কোন ভেদ নেই—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। "রাধাকৃষ্ণ এক তত্ত্ব। দেহ ভেদ মাত্র।" একই তত্ত্ব। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন "প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করছি। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।"

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। আমিই পিতা, আমিই মাতা, আমি বিধাতা পিতামহ ব্রহ্মা।"

আজ শারদীয়া মহোৎসবে দশপ্রহরণ-ধারিণী সিংহবাহিনী দশভূজা ব্রহ্মময়ী পরমাপ্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী শ্রীশ্রীমাদুর্গাকে সেই পরমব্রহ্মের অব্যাকৃত শক্তিরূপেই অর্চনা ও স্মরণ করব। বৈদিক ঋষিরা উদাত্তস্বরে গায়ত্রীরূপে মহাশক্তিকে আবাহন করে' উপাসনা করতেন।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে।

গীতা ও গায়ত্রীরূপিনী মহামন্ত্রময়ী মহাশক্তিদায়িনী শ্রীভগবদ্বাণী।

"সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো মনুঃ।
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদিস্থিতে
চতুর্ণকার সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

স্বামী ভজনানন্দ

শ্রী.....

বিগত ২৯ শে বৈশাখ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ (১২ই মে, ১৯৫৬) শনিবার শুভ অক্ষয়াতৃতীয়া যোগে অপরাহ্ণ ৩টা ৩৬ মিঃ সময়ে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্র-শিষ্য ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর আদর্শানুগ, একান্ত একনিষ্ঠ সন্ন্যাসীপ্রবর শ্রীমৎস্বামী ভজনানন্দ মহারাজ প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের অভয় পদে লীন হইয়াছেন।

১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ১৮ই চৈত্র ইং ১৮৮২ খৃঃ, ৩১ শে মার্চ্চ, মেদিনীপুর সহরে এক বিখ্যাত বসু-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবধি ধর্ম্ম ও অধ্যয়নে প্রবল স্পৃহা, ব্রহ্মচর্য্যানুরাগ, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং নির্জ্জনে ধ্যানানুশীলন তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হয়। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীসারদামণির নিকট দীক্ষিত হইবার ১৮ মাস পরে ১৯১১ খৃঃ অঃ দুর্গাপূজার পঞ্চমী তিথিতে সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক, তিনি বেলুড়মঠে যোগদান করেন। শ্রীমৎস্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের নির্দ্দেশে তিনি বেলুড়মঠের প্রাচীন সাধু ব্রহ্মচারীদের নিকট 'চারুদা' নামে পরিচিত। প্রেমানন্দ স্বামীর পত্রাবলী হইতে এই 'চা-দা' (চারুদা)র পাণ্ডিত্য ও তপস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। বেলুড়মঠে ধ্যানকালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'এক দৈববাণী' শুনিতে পান এবং সেই দৈববাণী অনুসারেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। প্রায় ৯।১০ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে (ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ, উদ্বোধন অফিস, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে) তিনি সাধন-ভজন ও তপস্যাদি করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমেই ভজনানন্দের অবস্থানকালে, জয়রামবাটী হইতে, তাঁহাকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের এক চিঠি হইতে জানা যায় যে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছানুসারে ও আশীর্ব্বাদে মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠে, কংসবতী নদীর উপকূলে ঠাকুরের নামে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ খৃঃ অঃ মহালয়ার দিন (সেদিন আবার সূর্য্যগ্রহণ যোগ ছিল) উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তদবধি সেই মনোরম আশ্রমে ধ্যান, তপস্যা, স্বাধ্যায়াদি লইয়া তিনি জীবনাতিপাত করেন।

কোন এক বিশেষ কারণে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে প্রায় ২৪ ঘণ্টা তপস্যাদি লইয়া থাকিবার অনুমতিসূচক এক চিঠি দিয়াছিলেন। তিনি আত্ম-জীবনীর এক স্থানে লিখিয়াছেন—'মাত্র ৪।৫ ঘণ্টা খাওয়া, শোওয়া, শৌচ স্নানাদি কার্য্যে (যাহা না করিলেই নয়) ব্যয় করিয়া বাকি ১৯।২০ ঘণ্টা তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।' দিবানিশি কেবল তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করা খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সাধুর পক্ষেই সম্ভব। সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে প্রায় দেড় ঘণ্টা ও শেষ প্রহরে মাত্র এক ঘণ্টা তিনি নিদ্রা যাইতেন। বাকি সমস্তরাত্রি, নিয়মিত জাগিয়া, তিনি বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত নিজেকে নিয়োজিত রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সুতীব্র তপস্যার আলোকে সমুজ্জ্বল, মাতৃগতপ্রাণ স্বামী ভজনানন্দের সমগ্র জীবন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দময় হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ, প্রত্নতত্ত্বাদি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী প্রকাশিত হইলে জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে।

বঙ্গগৌরব জীমূতবাহন

অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম. এ, কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ

প্রাচীনকালে যে সব নিবন্ধকার বাংলাদেশের গৌরববর্ধন করেছেন, তাঁদের মধ্যে জীমূতবাহন, শূলপাণি আর রঘুনন্দন এক একটি দিক্‌পাল। তিনজনের মধ্যে জীমূতবাহন অগ্রবর্তী। শূলপাণি আর রঘুনন্দন উভয়েই এঁর নাম করেছেন।

পালরাজত্বের অবসানসময় জীমূতবাহনের সারস্বত সাধনার কাল। তখন টীকা-ব্যাখ্যা-নিবন্ধ রচনার যুগ। গতানুগতিক শাস্ত্রচিন্তার অবসন্ন স্রোত কোনক্রমে চিরন্তন পথ বয়ে চলেছে মাত্র। এমনসময়ে জীমূতবাহন তাঁর প্রদীপ্ত মনীষা আর অখণ্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে প্রাচীন ধারাকে এক স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করলেন। তাঁর নিবন্ধগ্রন্থ কেবল শাস্ত্রবচনের সঙ্কলনমাত্র নয়, তার সঙ্গে হয়েছে সংস্কার প্রয়াসী বৈদগ্ধ্যের অপূর্ব সংযোগ। নারীর ধনাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও বিধবার উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় জীমূতবাহনের স্বাধীন মত সে যুগের সমাজের পক্ষে খুবই অনাসাঙ্গ।

জীমূতবাহনের পর অচিরকাল মধ্যেই গৌড়রাজ্যে চরম দুর্যোগ উপস্থিত হয়। উপপ্লবের তাণ্ডবে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি সবই প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', 'কালবিবেক' আর 'ব্যবহারমাতৃকা' এই তিনখানি গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। 'দায়ভাগ' আর 'কালবিবেক' 'ধর্মরত্ন' নামে এক মহানিবন্ধের অংশ। সমগ্র নিবন্ধটি কত বৃহৎ ছিল তা কে জানে?

বংশ পরিচয়

জীমূতবাহন কোন গ্রন্থেই নিজের কথা লেখেন নি; বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাও স্পষ্ট কথায় বলেন নি। গ্রন্থশেষে তিনি 'পারিভদ্রীয়' বলে বংশ পরিচয় দিয়েছেন, গ্রন্থমধ্যেও নিজেকে 'পারিভদ্র-কুলোদ্ভূতঃ' বলেছেন—

পারিভাদ্রকুলোদ্ভূতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ।

নানা শাখায় বিভক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের এক অংশ আজও 'পারিহাল' বা পারিগাঞী নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ জীমূতবাহন রাঢ়ীশ্রেণীর এই শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বাসস্থান

রাঢ় দেশেরই কোন এক স্থানে জীমূতবাহন বাস করতেন। তিনি আকাশে নক্ষত্র-বিশেষের উদয়কাল নির্দেশ করিতে গিয়ে 'কালবিবেক' গ্রন্থে একাধিকবার রাঢ় দেশের তারা-পথ সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

বিভিন্ন দেশে অগস্ত্যের উদয় হয় বিভিন্ন সময়ে। রাঢ় অঞ্চলে ভাদ্রমাসের সাতদিন অবশিষ্ট থাকতে অগস্ত্যোদয় দেখা যায়, আর উজ্জয়িনীতে দেখা যায় তিনদিন থাকতে।

"রাঢ়াদিষু সপ্তদিনাবশিষ্টে ভাদ্রে তত্তোদয়ঃ। উজ্জয়িন্যাঞ্চ দিনচতুষ্টয়াবশিষ্টে।"

একই কথা জীমূতবাহন আর একবার রূপান্তর করে বলেছেন—

'উজ্জয়িনী নগরে ভাদ্রমাসের ছাব্বিশ দিনের পর অগস্ত্যের উদয় হয়, রাঢ়ে হয় তেইশ দিনের পর।

[(উজ্জয়িন্যাং) সিংহস্থ ষড়্‌বিংশতিদিনেষু গতেষু অগস্ত্যোদয়ঃ
রাঢ়াদিষু তু সিংহস্থ ত্রয়োবিংশতিদিনেষু গতেষু]

সে যুগে উজ্জয়িনী ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ পরিশীলন কেন্দ্র। কাজেই বাংলাদেশে বাস করেও জীমূতবাহনের মত বহুজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে উজ্জয়িনীর মানমন্দিরে পর্যবেক্ষিত গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানগত বিবরণ জানা অসম্ভব না হতে পারে। কিন্তু রাঢ়ের আকাশ সম্পর্কে সবিশেষ সন্ধান রাখা কেবল রাঢ়বাসীর পক্ষেই সম্ভবপর।

জীমূতবাহনের গ্রন্থে ভোজদেবের নাম পাওয়া যায়। ভোজরাজ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমভাগে ধার-নগরে রাজত্ব করতেন। জীমূতবাহন অবশ্যই এ সময়ের পরবর্তী।

আবির্ভাব-কাল

'কালবিবেক' গ্রন্থে সিংহস্থ রবি আর তুলাস্থ রবির আলোচনা প্রসঙ্গে জীমূতবাহন পর পর দুটি শকাব্দের উল্লেখ করেছেন। এ দুটি বৎসর ১৯০১ আর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পড়ে। জীমূতবাহনের আবির্ভাবকাল এরই কাছাকাছি হওয়ার কথা।

জীমূতবাহনের তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে 'কালবিবেক' রচিত হয়েছিল ধর্ম-কর্মে শুভাশুভ কালনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে। এর পূর্বে কাল সম্পর্কে এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আলোচনা আর কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। পূর্বগামী গ্রন্থকারদের নাম উল্লেখ করে জীমূতবাহন বলেছেন—'জিতেন্দ্রিয়, শঙ্খধর, অঙ্গুক, সন্নয়, হরিবংশ, ধবল আর যোগোক পূর্বে কাল নিরূপণ করেছিলেন। কিন্তু আজ আর তার মূল্য রইল না'।

গ্রন্থ বিবরণ

[জিতেন্দ্রিয়-শঙ্খধরাঙ্গুক-সন্নয় হরিবংশ-ধবল-যোগোকৈঃ।
কৃতমপি কালনিরূপণমধুনা নিঃসারতাং যাতি ॥]

পূর্বগামীদের লক্ষ্য করে জীমূতবাহন আরও বলেছেন—'তাঁরা কেউ কেউ কালতত্ত্ব একেবারেই উপলব্ধি করতে পারেন নি, কেউ বা সংক্ষিপ্ত বচনে কালের কথা শেষ করেছেন। যাতে বিষয়টি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদেরও সুখবোধ্য হয়, আমি তেমন করে লিখছি'।

[কালঃ কৈশ্চিদবুদ্ধঃ কৈশ্চিৎ সংক্ষিপ্তশ্চ বচননিবদ্ধঃ।
ইতি মন্দমতীনামপি সুবোধকরণো মযা ক্রিয়তে ॥]

এ গ্রন্থে সৌরমাস, চান্দ্রমাস, অধিমাস, সংক্রান্তি, তিথি-নক্ষত্র, গ্রহসংস্থান প্রভৃতি নানাপ্রকার জ্যোতিষিক তত্ত্বের বিবৃতি-প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন মতামত আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে খ্যাতিমান্ নিবন্ধকারগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে কালবিবেকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। গ্রন্থখানি যে পণ্ডিতসমাজে যোগ্য সমাদর লাভ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জীমূতবাহনের আর এক গ্রন্থ 'ব্যবহার মাতৃকা'। এতে আছে শাস্ত্রানুগত বিচার-প্রণালীর নির্দেশ আর বিচারার্থী বাদি-প্রতিবাদীর কার্যক্রম। 'ব্যবহার' শব্দের অর্থ বাদ-প্রতিবাদ, মামলা-মকদ্দমা, 'মাতৃকা'র অর্থ মূল কর্ম। ব্যবহার-মাতৃকা মামলা-মকদ্দমার পদ্ধতি গ্রন্থ। গ্রন্থারম্ভে ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ বিবৃতির পর গ্রন্থকার আলোচ্য বিষয়কে চারভাগে

ভাগ করেছেন—ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ আর নির্ণয়পাদ। এতে আলোচিত হয়েছে ব্যবহার পদের সংজ্ঞার্থ, সুবিচারকের লক্ষণ ও কর্তব্য, ধর্মাধিকরণের প্রকারভেদ, বিচারার্থীর আবেদন, প্রত্যর্থীর উত্তর, নানাশ্রেণীর প্রতিভূ বা জামিন এবং নানা রকমের সাক্ষ্যপ্রমাণ। সর্বশেষ আছে বিচার বা নির্ণয়। জীমূতবাহন এ গ্রন্থে নানা জনের নানা মত উদ্ধৃত করে নিপুণভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন।

জীমূতবাহনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'দায়ভাগ'। 'দায়' বা পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগব্যবস্থা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। 'দায়ভাগে'র সাতটি টীকা মুদ্রিত হয়েছে। অপ্রকাশিত টীকার সংখ্যা আরও বেশি। এত অধিক টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থের অসামান্যতার নিদর্শন। উত্তরাধিকার নিরূপণ আর স্ত্রীধন নির্ণয়ে দায়ভাগের প্রসিদ্ধি অসাধারণ। এতে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্য, ঋজিষ্ঠ ধীশক্তি আর উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যথা বিধবার ধনাধিকার সমর্থনে জীমূতবাহনের উদ্যম তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। সম্পত্তি বিভাগব্যবস্থায় অবঙ্গীয় হিন্দুসমাজ 'মিতাক্ষরার' শাসনে চালিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে দায়ভাগের অখণ্ড প্রতিপত্তি। এদেশে মিতাক্ষরার মত গ্রাহ্য নয়। বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির বিখ্যাত টীকা। জীমূতবাহন এ টীকার নাম করেননি। কিন্তু 'মিতাক্ষরা'র গৃহীত মতবাদ বহু স্থলে খণ্ডন করেছেন। তিনি প্রারম্ভেই বলেছেন—প্রাচীন লেখকদের বিচিত্র ব্যাখ্যায় নানারূপ সংশয় জন্মে, সংশয় অপনোদনের জন্যেই আমার গ্রন্থ রচনা।

[বহুবিধপূর্বনিবন্ধব্যাখ্যাসঞ্জাতসংশয়চ্ছেত্তৎ।
জীমূতবাহনকৃতং প্রকরণমপহুরয়ে যোগ্যম্ ॥]

জীমূতবাহন আরও লিখেছেন—যাঁরা আচার্যের মর্যাদাগৌরবে বিভ্রান্ত হয়ে দায়বিভাগের তত্ত্ববোধে অনিচ্ছুক, এ গ্রন্থ দিয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করা অসাধ্য। যাঁরা শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণে আস্থাবান্, তাঁদের জন্যে আমার প্রয়াস।

[নাচার্যগৌরবপরাহতদায়ভাগতত্ত্বপ্রবোধমনোরঞ্জনমত্র শক্যম্।
কিন্তু প্রমাণপরতন্ত্রধিয়াং মুনীনাং সংবাদমাত্রফলয়ে কৃতিনঃ প্রয়াসঃ ॥]

নানারূপ শাস্ত্রযুক্তির অবতারণার পর জীমূতবাহন 'দায়ভাগে' ঘোষণা করেছেন—

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

১। পুত্রহীনা বিধবা একান্নবর্তী পরিবারে থাকলেও স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন। [অবিশেষেণৈব বিভক্তাভক্তাপেক্ষয়ৈব অপুত্রস্য ভর্তুঃ কৃৎস্নধনে পত্ন্যধিকারঃ]

২। পুত্র জাতমাত্রই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয় না। পিতার যদি মৃত্যু ঘটে, কিংবা তিনি যদি সংসার ত্যাগ করেন অথবা কোন কারণে স্বাধিকারচ্যুত হন, তবে পুত্রের দায়াধিকার জন্মে।

৩। পিতা স্বেচ্ছায় পুত্রকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে পারেন, কিন্তু পিতার জীবনকালে 'স্বাধিকার'বলে পুত্রের তা প্রাপ্য নয়।

৪। দায়াধিকার দাবী করতে হ'লে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়া করা আবশ্যক। কেবল রক্তসম্বন্ধহেতু অধিকার জন্মে না।

দায়ভাগের এসব অনুশাসন মিতাক্ষরা মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু বাংলার হিন্দুসমাজ দায়ভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। উত্তরাধিকার আর স্ত্রীধন নির্ণয়ে দায়ভাগের নির্দেশ বাঙালীর পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ। এ বিষয়ে জীমূতবাহন বঙ্গদেশের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জীমূতবাহনের রচনা সবই স্মৃতিনিবদ্ধ। কিন্তু ভৌগোলিক তথ্য বা ঐতিহাসিক উপকরণও তাতে কম নেই।

জীমূতবাহনের নিবন্ধে ভৌগোলিক তথ্য

কালবিবেক গ্রন্থে বহু নদনদীর বর্ণনা আছে। কোন নদী সমুদ্রে পড়েছে, কোনটি বা মধ্যপথে অপর নদীর আশ্রয় নিয়েছে। ত্রিস্রোতা আর সন্ধ্যা নদী কৈলাস পর্বতের পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত লৌহিত্য হ্রদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গণ্ডকী, কৌশিকী আর তৃতীয়া হিমালয়ের পাদমূল থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ করেছে। সরযূ নদী কৈলাসের দক্ষিণস্থ মানস সরোবর থেকে নির্গত হয়ে হিমালয়ের নিম্নদেশ বেয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। কৈলাসের পূর্বোত্তর দিকে আছে অচ্ছোদ সরোবর। তার পূর্বদিক্ থেকে মন্দ মন্দ নিঃসৃত মন্দাকিনী, অলকনন্দা আর নন্দা পূর্বসাগরে এগিয়ে চলেছে। অচ্ছোদা পড়েছে পূর্বসাগরে, বৈলোদা পশ্চিম সাগরে। এসব নদীবিবরণ ভৌগোলিক অনুসন্ধানের বিষয়।

জীমূতবাহন প্রসঙ্গক্রমে যেসব পালপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনা করেছেন, তা থেকে বাংলাদেশের তাৎকালিক সমাজের গতি-প্রকৃতি, রুচি-প্রবৃত্তির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। তিনি যেসব বণ্টনযোগ্য সম্পত্তির বিবরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রাচীন বাঙালীর আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা, বিলাস-ব্যসনের খানিকটা সন্ধান মেলে। সে যুগে দাসদাসীদের বিভাজ্য সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করা হত। সামাজিকগণ একপ্রকার বিশিষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে সভায় উপস্থিত হতেন। সমর্থ ব্যক্তিরা গাড়ী-ঘোড়া রাখতেন, কেবল শিবিকারোহণে সন্তুষ্ট থাকতেন না।

কিন্তু এসব প্রাসঙ্গিক। মূলত মনন-চেষ্টাই জীমূতবাহনের বৈশিষ্ট্য।

এস মা আর্ত্তত্রাণকারিণী

শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশির সিক্ত শরৎ প্রভাতে—
এসো এসো ওমা শিবানি,
জগৎ-ধাত্রী, শঙ্কা-হারিণি
শঙ্কর প্রিয়া ভবানি।
এসোমা দুর্গে কল্যাণময়ি,
দুর্গতি-ঘন তারিণি,
বেদনা-অশ্রু মুছে দিয়ে যাও
আর্ত্তের ত্রাণ কারিণি।

মঙ্গল ঘট রাখিয়াছি ভরে'
'স্বাগতম্' মধু-হাসিনি,
এসো মা শুভদে, এসো ত্বরা করি
দুখ-শোক-ভয় নাশিনি।
বাজা'রে শঙ্খ প্রতি ঘরে ঘরে—
এইযে এসেছে জননী—।
মর্ত্তের ডাকে আসিলে যখন—
দাও মা চরণ দু'খানি।

বিশ্বলীলার ধারা

শ্রীমণিরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার যাত্রাপথ চিরদিনই সমস্যা সংকুল—সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকে বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগ পর্য্যন্ত। তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাসের পাতা। বরং আদিম মানুষের চেয়ে বর্ত্তমানের সভ্য মানুষ অধিকতর সমস্যা পীড়িত। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে সমস্যা দেখা দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে কখনও বা ধর্ম্মনীতিতে। এক সমস্যার যেই সমাধান হয়েছে, মাথা তুলে উঠেছে আর এক সমস্যা নবরূপে। প্রস্তর যুগ থেকে পরমাণু যুগ পর্য্যন্ত সমস্যার বেষ্টনী অলঙ্ঘ্যই হয়ে গেছে। এক একটী সমস্যাকে কেন্দ্র করে সমাজে কতই না রক্তপ্লাবন, বিক্ষোভ, অনাচার—অত্যাচার ঘটে গেছে, যুগের কালিমা সঞ্চিত হয়েছে ইতিহাসে। ফলে দেখা দিয়েছে নূতন চিন্তাধারা, প্রচার হয়েছে নূতন দর্শন। বার বার পড়েছে যুগান্তরের যবনিকা কিন্তু শেষ হয়নি অভিনয়। জাগে বিস্ময় দর্শকের আসন থেকে বিচার করলে। প্রতি ক্ষেত্রেই মনে করা হয়েছে এবার বুঝি পৌঁছান গেছে চরম সত্যে। এবার শান্তি ও সুখের সংসার প্রতিষ্ঠিত হবে ধূলার ধরণীতে। কিন্তু অচিরেই সে আশা হয়েছে ধূলিসাৎ।

পর্ব্বত গুহাবাসী আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল পাথরের অস্ত্র, তাদিয়ে যেমন খাদ্য আহরণ করেছিল তেমনই অপরের খাদ্যও হরণ করেছিল। অগ্নি ও লৌহের ব্যবহার আয়ত্তে এনে যেমন করেছিল কৃষির উন্নতি, তেমনি লৌহাস্ত্র তৈরী করে বিপন্ন করে তুলেছিল অপরের স্বাধীনতা। অশ্বকে বশ করে আর্য্যরা যেমন পথক্লেশ ও শ্রম বাঁচিয়েছিল তেমনি তড়িৎ গতিতে হিটলারের মত "ব্লিৎজক্রীগ্" আক্রমণ করে অনার্য্যদের বাস্তুহারা করে তুলেছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা লজ্জায় সীতার মত করেছিল পাতাল প্রবেশ। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কিছুটা সহায়তা করেছিল। অতীত যুগের মত আজও পরমাণু শক্তি আয়ত্তে আসায় স্বর্ণযুগের স্বপ্ন যেমন ভেসে উঠছে মনে, তেমনি দেখা দিচ্ছে জগৎ ধ্বংসের প্রলয়করী ছায়া। নীরবে মাথা নত করে মানব সভ্যতার কাছে দাঁড়িয়ে আছে হিরোসিমা ও নাগাসাকি। সমস্যা রাক্ষসী তার মায়াজাল বিস্তার করে মানব সভ্যতার পিছনে পিছনে চলে আসছে—আর ছুটে চলেছে সমস্যা জর্জ্জর মানুষ তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।

মানব সমাজের শান্তির জন্যে মহামানবেরা প্রচার করলেন—"মানুষের জন্য ধর্ম্ম", পরবর্ত্তী কালে মানব সমাজ জোর করেই চালাল "ধর্ম্মের জন্যই মানুষ"। তাতে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে মানুষকে নিক্ষেপ করতেও কুণ্ঠিত হল না। প্রজারা শান্তি ও সুখের আশায় সৃষ্টি করল নৃপতি —অর্থাৎ "প্রজার জন্যই রাজা", পরিণামে দাঁড়াল "রাজার জন্যই প্রজা"। প্রজারা দলে দলে রাজার খেয়াল খুসি চরিতার্থ করবার জন্যে ছুটল রণাঙ্গনে। রাজরোষে উৎপীড়িত হয়ে মানুষ উদ্ভাবন করল প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ "মানুষের জন্যই রাষ্ট্র", কিন্তু তারও ব্যতিক্রম হয়ে গেল—"রাষ্ট্রের জন্যই মানুষ"। যে মানুষ নিজের সুখ সুবিধার জন্য রাষ্ট্র গড়েছিল, সেই মানুষ নিজের সত্তা হারিয়ে হয়ে গেল রাষ্ট্রের দাস। ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রশ্নে ঠিক এই ভাবেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ব্যষ্টিকে যখনই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (এক নায়কত্ব) তখনই অত্যাচারে জর্জ্জরিত

হয়েছে সমষ্টি। আবার সমষ্টি যখন প্রাধান্য পেয়েছে, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে ব্যষ্টির।

বিজ্ঞান-জগতের ইতিবৃত্তে এমনিতর সমস্যার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রদীপের আলো, মোমের বাতী, কেরোসিন আলো, কয়লার গ্যাসের আলো, বিজলী বাতী যতটা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে, তার সঙ্গে ততটা জটীলতর হচ্ছে সমস্যা। তবু শেষ নেই মানুষের মননশীলতার। এক আবিষ্কারের পর আর এক আবিষ্কার। গবেষনাগার থেকে কারখানায়। অট্টালিকা থেকে পর্ণ কুটিরে, সস্তা আরো সস্তার সংস্করণে। আবিষ্কার হচ্ছে শ্রম-সংক্ষেপক যন্ত্রপাতি, তাও শ্রমিকদের প্রতিকূলেই চলেছে। একশত ঢেঁকির বদলে একটা ধানকল। হাজার হাজার তাঁতির বদলে একটা ম্যানচেষ্টার, দশটা কেরাণীর বদলে একটা টাইপরাইটার বা এ্যাডিং মেসিন। যে দিন প্রথম নবাবিষ্কৃত সেলাই কলটী দরজীর কারখানায় পৌঁছাল, ক্ষিপ্ত দরজীর দল কলটীকে ভেঙ্গে চুরমারই করে দিয়েছিল। সেকালে বহু দরজী ও মুচি কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়েছিল। যন্ত্রদানব একদিক দিয়ে যেমন ক্লেশ নিবারণ করে, অপর দিকে তেমনি অহরহ করে' নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। শুধু ব্যবসা নয়, নানা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয়ে যাচ্ছে বিপর্য্যস্ত এক এক আবিষ্কারের ফলে,—উড়ো জাহাজ আবিষ্কারে—ম্যাজিনো লাইন, বাষ্পপোত আবিষ্কারে অতীতের এসিয়ার নানা দেশ ও ভারতবর্ষ, পরমাণু শক্তির আবিষ্কারে সারা বিশ্ব। এইভাবে কেবল ধনে প্রাণে নয়, নৈতিক আদর্শেও আঘাত হেনে ছুটে চলেছে বিজ্ঞানের বিজয় রথ। এতদিন জন্মনিয়ন্ত্রণ (birth control) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবেই বিবেচিত হয়েছিল, এবং church ও ধর্ম্ম-বিরোধী হয়েও সমাজে কিছুটা স্থান করে নিয়েছিল, এখন তাঁর সঙ্গে দেখাদিয়েছে অপ্রাকৃতিক প্রজনন (artificial insemination),—পশু সমাজের মান উন্নয়নের জন্যে নয়- মানব সমাজের খেয়াল খুসি চরিতার্থে। এই পন্থার ব্যাপক প্রচলনে সুদূর প্রসারী কুফল ও জটীলতর সমস্যা বিভ্রান্ত করে তুলবে মানব সমাজকে একদিন। তবু ছেদ নেই বৈজ্ঞানিকের মননশীলতায়, আত্মঘাতী পরিকল্পনায়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই দৈত্যের উপাখ্যান। দৈত্যকে যে কাজই দেওয়া যায়, সে নিমেষে শেষ করে আবার চায় কাজ। কাজ না দিলে মনিবের প্রাণান্ত সুনিশ্চিত। তখন নিরুপায় মনিব তাকে সোজা করতে দিল একটী লাবণের—লাঙ্গুল। দৈত্য যেমনই লাঙ্গুলটী টেনে সোজা করে ছেড়ে দেয় সেটী আবার বক্র হয়ে যায়,—দৈত্যের কাজেরও পরিসমাপ্তি ঘটে না। মানব সমাজের সমস্যা ঠিক ঐ লাবণের—লাঙ্গুলবৎ। লাঙ্গুলের বার বার বক্র হওয়া হ'ল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—History repeats itself. মনে তাই প্রশ্ন জাগে এমনতর হয় কেন? অথচ পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলের মধ্যে কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এমন কি সুদূর অনাগত কালের সৌর জগতের হিসাব ও সঠিক বলা যায়, চারিদিকের নিয়মে গাণিতিক নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, সবকিছু সুসংযত, সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মানব সমাজের যাত্রাপথে এত অপ্রীতিকর বিপর্য্যয় ও ছন্দপতন কেন?

যোধহয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জগতের সৃষ্টি রহস্যের ধারা আলোচনা করলে

কিছুটা অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সূর্য্যের মাঝ থেকে বলকে বেরিয়ে আসা গলিত ধাতুর অগ্নিপিণ্ডটাই আমাদের পৃথিবী। উত্তপ্ত পিণ্ডটা ক্রমে শীতল হ'ল, জলে পরিব্যাপ্ত হ'ল তারপর চেতনার স্পন্দন দেখাদিল উদ্ভিদের জন্মকালে। তারপর আবির্ভাব হ'ল এককোষী এমিওবিয়ার এবং তারই ক্রমবিকাশে বিরাট বিরাট প্রাক্ ঐতিহাসিক জীবজন্তু থেকে বর্ত্তমান মানব সমাজের।

বৈজ্ঞানিকেরা এযাবৎ কাল সৃষ্টি রহস্যটিকে মেনে এসেছেন কিন্তু স্রষ্টাকে স্বীকার পান নি। বরং পদার্থ বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গকারে সমস্ত আপাতিক ব্যাপারের মূলতত্ত্ব, তার কারণ তার অর্থ বৈজ্ঞানিকদের কাছে আগের চেয়েও বেশী অন্ধকার ও রহস্যময় হয়ে গেছে। পৃথিবীর জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা হলেও তার মাঝে একটা ক্রমপরিণতির রহস্যময় ধারা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এর সৃষ্টিকর্ত্তাকে তাঁরা স্বীকার করেন নি। New York এর Academy of science এর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মরিসন সাহেব "Man does not stand alone" পুস্তকে বলেছেন, তিনি নিজে সাতটী কারণে বিশ্বাস করেন যে কোন দৈব-হস্তিপাকে এই জগৎটা সৃষ্ট হয়নি। বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনায়, অসীম বুদ্ধিমত্তায় ও নিপুণ ব্যবস্থাপনায় এই জগৎটা সৃষ্ট ও চালিত। এক স্থানে তিনি লিখেছেন—"The fact that man can conceive the idea of God is in itself an unique proof. The conception of god rises from a divine faculty of man—the faculty we cal Imagination. By its power man and man alone can find the evidence of things unseen."

বৈজ্ঞানিক মরিসন সাহেব আর্য্য ঋষিদেরই মত ভগবানের অস্তিত্ব ও তাঁর সুদূর প্রসারী ব্যবস্থাপনা স্বীকার করেছেন। আমেরিকার আর একজন মনীষী রা ফ ওয়ালডো ট্রাইন্ (স্বামী অভেদানন্দের ভক্ত) তাঁর "In Tune with the Infinite" পুস্তকে আরও সুস্পষ্টভাবেই লিখেছেন "একদিক দিয়ে দেখলে এই বিপুল বিশ্বে নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নেই। একথা সত্য হলে এসব নিয়মের পিছনে এমন একটী শক্তি নিশ্চয় আছে যা ইহাদের সৃষ্টি করেছে, যা এই সমস্ত নিয়ম হ'তে অধিক শক্তিমান। সকলের পিছনে এই যে অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত শক্তিময় আত্মা আছেন—একেই ঈশ্বর বলি"।

কিন্তু অতীতে এই জগৎ-যন্ত্রে ঈশ্বর নামে কোন অজ্ঞাত শক্তিকে একটী ক্ষুদ্র আসন পর্য্যন্ত দিতে বৈজ্ঞানিকেরা নারাজ ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ল-প্লাস (La-Place) স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন, "ঈশ্বর নামের পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার প্রয়োজন হয়নি"। উপরোক্ত বিবৃতিগুলি থেকে আমরা এইটুকু বেশ বুঝতে পারি, বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক জগৎ একটী অনন্ত শক্তিময় সত্তার আংশিক অনুভূতি লাভ করেছেন এবং এই বিশ্বজগৎ যে একটী সুনিপুণ নিয়ম শৃঙ্খলের অধীন ও অসীম বুদ্ধিমত্তায় পরিচালক, তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। আমরা তাহলে বলতে পারি যে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তার বুদ্ধিমত্তা ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা একবাক্যেই স্বীকার করে নিয়েছে। তবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এত অসঙ্গতি এত রক্তপ্লাবন, এত হিংসা-দ্বেষের অস্বস্তিকর সংশয় ও অনিশ্চয়তার নিদর্শন পাওয়া যায় কেন? অথচ সৌরজগৎ

বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে থেকে সুশৃঙ্খলভাবেই চলেছে দিনের পর দিন। ব্রহ্মাণ্ডময় একটা শান্ত সুসংযত কর্ম্মধারা চোখে পড়ে, তার মধ্যে ছন্দপতনের স্থান নেই।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। জড় বস্তুতে যে চৈতন্য সুপ্ত, উদ্ভিদে যে চৈতন্য অর্দ্ধসুপ্ত, মানবদেহে সেই চৈতন্যেরই পূর্ণ বিকাশ। পশুজগতে মেধা ও মননশীলতার প্রশ্ন নেই কিন্তু মানব সমাজে মেধা বুদ্ধি ও চিৎশক্তির বিকাশ আছে, বিচার বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের প্রশ্ন রয়েছে। তবু কেন মানুষের এত চিত্ত বিভ্রম। ধর্ম্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির যথেষ্ট গবেষণা করেও মানুষ এত অসহায়। অবশ্য প্রতিটী বিপর্য্যয়ের, পরাজয়ের, বিপ্লবের পরেও ঐতিহাসিক, দার্শনিক, যুদ্ধ বিশারদ প্রভৃতি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা পরাজয়ের বা পতনের একটা হেতু স্থির করেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীকালের বিপর্য্যয় রোধ করতে সমর্থ হয়নি। যেমন, প্রথম জার্ম্মান যুদ্ধের পরাজয়ের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় জার্ম্মানযুদ্ধে হিটলারকে রক্ষা করতে পারেনি। নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানও তাই।

মানব সভ্যতার দ্বন্দ্ব-চক্রগতির মধ্যে দুটী বিপরীতমুখী ও বিরুদ্ধনীতির সন্ধান পাওয়া যায়। পরস্পর বিরোধী গুণ দুটী এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে একটীকে ত্যাগ করে অপরটী গ্রহণ সম্ভব নয়। একটী সরল রেখার ঠিক যেন দুটি বিপরীত প্রান্ত। কল্যাণ-অকল্যাণ, ব্যবহার-অপব্যবহার, উত্থান-পতন, যুদ্ধ-শান্তি। ইরাণীয়দের জরথুষ্ট্র বলতেন পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার এই বিপরীত শক্তিগুলির মধ্যে চলেছে দ্বন্দ্ব। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ইলেকট্রোন ও প্রোটনের দ্বন্দ্বেই জড়বস্তুর সৃষ্টি। দার্শনিকেরা বলেন জগৎটা পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা। সাধারণ মানুষ বলে নারী ও পুরুষেই সমাজ। সুখে দুঃখেই সংসার। স্বামিজী বলতেন "ভাল ও মন্দ টাকার এদিক ওদিক"। ভাল থাকলে মন্দ থাকবেই। শ্রম না থাকলে বিশ্রাম মূল্যহীন, অসত্যই সত্যকে প্রচার করে, যুদ্ধই শান্তির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে। শুধু দেবতার লীলা জমে না, তাই অসুরও চাই। প্রাচীন নানা ধর্ম্মের রূপক কাহিনীর অন্তরালে পাওয়া যায় এই সত্যটী। যেমন পারসীকদের আহ্রিমান ও অরহমজাদ, ইহুদীদের যিহোবা ও শয়তান গ্রীকদের অলিম্পিয়ান ও টাইটান, আমাদের সুর ও অসুর—ঠিক যেন অদিতি ও দিতির রূপ, জ্যোতি ও তমিস্রার দ্বৈত ধারা। দ্বন্দ্ব-চক্রগতির ধাপে ধাপে তাই প্রহেলিকা। জীবাত্মা না পরমাত্মা, ক্ষর না অক্ষর, নিত্য না অনিত্য, ইহকাল না পরকাল, গার্হস্থ্য না সন্ন্যাস, প্রাদেশিকতা না সর্ব্বভারতীয়তা, স্বাদেশিকতা না বিশ্বমানবতা—কোনটীই একক চরম সত্য নয়। দুটী যুক্ত হলেই তবে বৃত্তটী সম্পূর্ণ হয়। কবিগুরু ভারতের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন—"সর্ব্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে, একঘরে স্বজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে, এমনি করিয়া দুই থাকার মধ্যে পড়িয়া মানবধানের সত্যপথটী আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইতেছে"। এই বিপরীতমুখী শক্তি দুটী একটী অপরের পরিপূরক।

একটী এলে অপরটী আসবেই। যীশুখৃষ্টের ক্ষমা ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই নীটশের দর্শন। মনস্তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যেমন কার্লমার্ক্সের দর্শন। মানবীয় হৃদয়াবেগকে রুদ্ধ করে যখন শঙ্করের জ্ঞানমার্গের সাধনা ছুটল তার অবশ্যম্ভাবী পরিনাম হ'ল শ্রীচৈতন্যে ভক্তি

মার্গের প্রবল বক্তা। ভণ্ডামী গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতার জন্যে চার্চকে, মার্টিন লুথার, ও কালা-পাহাড়কে দেখা গেছে। দুটী পরিপন্থী শক্তির দ্বন্দ্বে মধ্যকার সত্য পথটী দেখা দিয়েছে, যেমন কপিলদেব বলেছেন। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ধারাই এমনিতর, যেমন এক সিদ্ধান্তের (thesis) উপর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত (anti thesis) তার মাঝখানে সত্য (?) পথ— সমন্বয় (Synthesis). মূলতঃ দেবাসুরের যুদ্ধই প্রধান।

মানব সভ্যতার গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত শিল্পকলা, দর্শন, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি বাণিজ্যনীতি যা কিছু ঘটেছে সবই মানুষের চিন্তারাজ্যের বিকাশ। মননশীলতা, কার্য্যের উৎকর্ষতা ভগবানের সৃষ্ট জীবদের মধ্যে মানব সমাজেই আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন— "মানুষের মন সরষের পুঁটলী, একবার পুঁটলী ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়লে আর এক করা যায় না" সভ্যতার অগ্রগতিতে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে সরষের মতন। নানা খণ্ড খণ্ড চিন্তায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তার ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে আত্মঘাতী সমস্যা ও প্রহেলিকা। অনিবার্য্য দুঃখ দৈন্য, কলহ-যুদ্ধের হাত থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই। কারণ বিবর্ত্তনবাদের ধারাই এইরূপ। সৃষ্টিলীলায় বিবর্ত্তনবাদ নিছক নিরর্থক নয়, সুদূর প্রসারী পরিকল্পনারই অন্তর্গত। বিপ্লব, রক্তপাত, ধ্বংসাত্মক কাজের মাঝ দিয়েই ভাগবতী শক্তি টেনে নিয়ে চলেছে মানুষকে উচ্চতর চেতনায়। শুধু তাই নয়,—প্রতিশ্রুতিও আছে—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। বিপরীতধর্মী ভাগবত শক্তিই এক সময়ে এক আধারে বিরাজ করতে পারে। যে শক্তি ভয়ঙ্করী, মহারৌদ্রী, সেই শক্তিই শ্যামসুন্দর বংশীধারী। সেই শক্তিই—"ত্বং অপরা বিশ্বধারা"। মানব সমাজ অজ্ঞানের, দেহ-প্রাণ-মনের রাজ্য অপরা প্রকৃতির অধীন। পরা প্রকৃতি উচ্চধারা আর অপরা প্রকৃতি নিম্ন ধারা। নিম্নধারা অর্থে—মিশ্রিত ধারা বা দ্বৈতধারা ; সুখদুঃখ, ভালমন্দ ইত্যাদির সংমিশ্রণ। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ধারা বাহিক ইতিহাসের আলোচনায় আমরা যে অপরা প্রকৃতির গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছি তা বেশ বোঝা যায়। বর্ত্তমান মানব সমাজের পক্ষে বিশ্বলীলার এই অপরা প্রকৃতির ধারা অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে অনেক মহাপুরুষ আশা রাখেন, উচ্চতর চেতনা মানব সমাজে দেখা দেবে একদিন। আড়াই হাজার বছরের পুরাণ কথা পরমাণু যুগের মানুষ বুঝতে চেষ্টা করছে—বুদ্ধের "পঞ্চশীল"। One world,—এক জগৎ, বিশ্বমানবতা ইত্যাদি উচ্চ চেতনার বিকাশের সূচনা দেখা দিয়েছে—।

বিশ্বমানবতাবাদ মূলক চিন্তাধারার বিকাশ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকে। যেমন "লিগ্-অফ্-নেশনস্" সাম্যবাদ, দুনিয়ার মজুর এক ইত্যাদি। এই ধরণের চিন্তাগুলি সত্যই খণ্ড খণ্ড জাতীয়তাবাদের গণ্ডিকে অতিক্রম করেই প্রকাশ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঐ চিন্তাধারাগুলি আরও পুষ্ট হয়েছে ও সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে কিছুটা প্রভাবও বিস্তার করেছে। যেমন "ওয়ার্ল্ড-হেলথ্ অরগানিজেসন্" "ইউ-এন-ও" প্রভৃতি। এই সব দেখে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই আশা করেন, অপরা প্রকৃতি থেকে মানুষ পরা প্রকৃতিতে যেতে পারে প্রচণ্ড আঘাত খাওয়ার পর। যেমন কলিঙ্গযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড চণ্ডাশোককে ধর্ম্মাশোকে পরিণত করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে

পড়ে ভস্মাসুরের উপাখ্যান। অনেক অসুরের তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। অসুরের বাসনা যে, সে যাকেই স্পর্শ করবে, সেই যেন ভস্মে পরিণত হয়। মহাদেব বললেন "তথাস্তু"। অসুর তখন সেই বরের কার্যকারীতা পরীক্ষা করবার জন্যে মহাদেবেরই মাথায় হাত দিতে উদ্যত হ'ল। তারপর বহু ছোটাছুটীর পর মহাদেবকে রক্ষা করলেন ব্রহ্মা। তাঁর কথামত অসুর নিজের মাথায় হাত দিয়েই পরীক্ষা করল; মহাদেবের বরের আর নির্বুদ্ধিতার চরম দৃষ্টান্ত রেখে পরিণত হ'ল ভস্মে। তাই মনে হয়,—কে জানে, হয়ত একদিন বৈজ্ঞানিক 'ভস্মাসুর' (atomic weapons) নিজের মাথায় হাত দিয়েই পরীক্ষা চালাবে। সেদিন বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান দিয়েই রচনা হবে বিজ্ঞানের সমাধি। সেই আঘাতের পর সভ্যতার সর্পিল গতি দিক পরিবর্তন করে হয়তো উঠবে বৈত প্রকৃতির উর্দ্ধে পরা প্রকৃতিতে।

সংসার ও প্রকৃতি

শ্রীমতী সুষমা ঘোষ

কালের চক্র ঘুরিতেছে অনিবার—
দুঃখ ও সুখের আলোকে আঁধারে
আসা-যাওয়া বারে বার।
এখানে জীবন, মৃত্যুর সাথে
চলে হাতে হাত ধরি';
যৌবন জরা শৈশব দিয়ে
মরীচিকা ছড়াছড়ি।
উদয়-অস্তে সূর্য-চন্দ্র
একই নিয়মে ধরা,
তবুও কত-না ভাঙাগড়া নিয়ে
চলেছে, বসুন্ধরা।
উত্থান আর পতনে পূর্ণ
হাসি কান্নার সুর
যুগ-যুগান্ত আবর্ত রচি'
নিত্য সে ভরপুর।
আছে এর মাঝে হিংসা-দ্বেষ,
প্রীতি-প্রেম-সৌরভ,
অর্থ আর ধর্মেরে নিয়ে
মনের গৌরব।
মানুষ এখানে দেবতা হয়েছে।
পশুও হয়েছে কত—
দম্ভ অহঙ্কারের মাঝারে
অহেতু অসংযত।
মিথ্যা পুঁজিতে মূঢ়তা নিয়ে
নিজেরে বৃহৎ মানি'
মূর্খ ফকির জ্ঞান-বিত্তের
দেয় পরিচয় খানি।
চরিত্র যার হয়েছে মলিন
নীতিতে সে খুব দড়ো,
বুকের পাঁজরে দুর্বিনীতের
কালিমা হয়েছে জড়ো।
গুণী যারে গণি, চিত্তলাবণি
যে-জনে ধরেছে বুকে—
গোপন জীবন-সরণি ধরিয়া
চলে যায় মহাসুখে।
এ হেন জনের সন্ধানে কেহ
নহে অনুসন্ধানী
স্বার্থ সেখানে নিস্বার্থেরে
বলে যায় অজ্ঞানী।
হেথায় স্বর্গ-নরক সমান—
সব হেথা একাকার;
দুর্যোগময় দিবসরাত্রি
ঘিরে আছে সংসার।

দনুজদলনী মা

শ্রীব্রত মুখোপাধ্যায়

অত্যাচারীর তূর্যনাদে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা যুগে যুগে কেঁপে উঠেছে ; জীবকুল হয়েছে—ভীতি-চকিত ও বিহ্বল। ওদের অট্টহাস্যে ডুবে গেছে দিকে দিকে জীবের অস্ফুট আর্ত্ত-কলরোল। সম্যক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়—বসুন্ধরা কাঁদছে, কাঁদছে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা, কাঁদছে জগতের কীট হ'তে মানুষ। কিন্তু কাঁদাচ্ছে কে ? অত্যাচারী দানব। পৃথিবীকে মরুভূমি করবে বলে' পৈশাচিক উল্লাসে তার উদ্দাম নর্ত্তন। সতী—সতীত্বের, মানুষ—মনুষ্যত্বের সম্পদ রক্ষার জন্য জানায় আকুল আবেদন।

পাষানো মা নয় ; গর্ভধারিণী মায়েরও আদি মা, বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বপালিনী, বিশ্বনাশিনী —আদ্যাশক্তি। যেমন শান্ত মানুষের, তেমনি দুর্ব্বার দানবেরও মা। শরণাগত আর্ত্ত সন্তানের পালনে, আবার বিদ্রোহী দানবের শাসনে মা নেমে এলেন পৃথিবীর বুকে। ত্রিনয়নী দুর্গা। দুই নয়নে বরাভয় করুণা ; তৃতীয়ে রোষ-গর্ভ অনল-উদ্গার। যত বড় বাধা, প্রতিরোধের তত বড় আয়োজন। তাই মা দশভুজা, দশ প্রহরণসমন্বিতা। মা ভৈঃ, মায়ের মুখে অভয় বাণী,—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

মহারণের দামামা বেজে উঠলো, ক্ষিপ্তমহিষাসুররূপী দানব পৃথিবীকে তচ্‌নচ্‌ করে ফেল্‌লো। রণে দেবীর হাতে মহিষাসুরের পতন হলো। কিন্তু ও কি ! বিকট হুঙ্কারে আবার উঠে দাঁড়ালো অসুর। আবার আর্ত্তরব শুনতে পেলেন মা,—কানে এলো "রক্ষা কর মা, রক্ষা কর ; দানবের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।"

আবার মায়ের দশ হাতে ঝল্‌সে উঠলো নানা অস্ত্র। খল-খল হেসে রণরঙ্গিনী মা এগিয়ে এলেন অসুরের সামনে। বজ্রমুষ্টিতে ধরলেন তার শিখা, বুকে বিঁধিয়ে দিলেন—ত্রিশূল। শেষবারের মতো বিকট আর্ত্তনাদে এলিয়ে পড়লো মহিষাসুর। শেষ। মা শেষবারের মতো পাঠালেন তাকে মহাকাল-সাগরের পরপারে।

স্বর্গে শঙ্খ বেজে উঠলো। পৃথিবী ছেয়ে গেল পুষ্পবৃষ্টিতে ; শেষে কৃতজ্ঞতায় মর্ত্ত্যবাসী মাকে সসম্ভ্রমে জানালো প্রণতি। ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে—একতানে উচ্চারণ করলো,—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়ণি নমোস্তু তে॥"

"মা, এই নে তোর শাস্ত্রপুরাণ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দে—এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান—এই নে তোর ধর্ম্ম ; এই নে তোর অধর্ম্ম—এই নে তোর ভাল ; এই এই নে তোর মন্দ—এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য—এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ—আমায় তোর শ্রীচরণে শুদ্ধাভক্তি দে, দেখা দে"—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

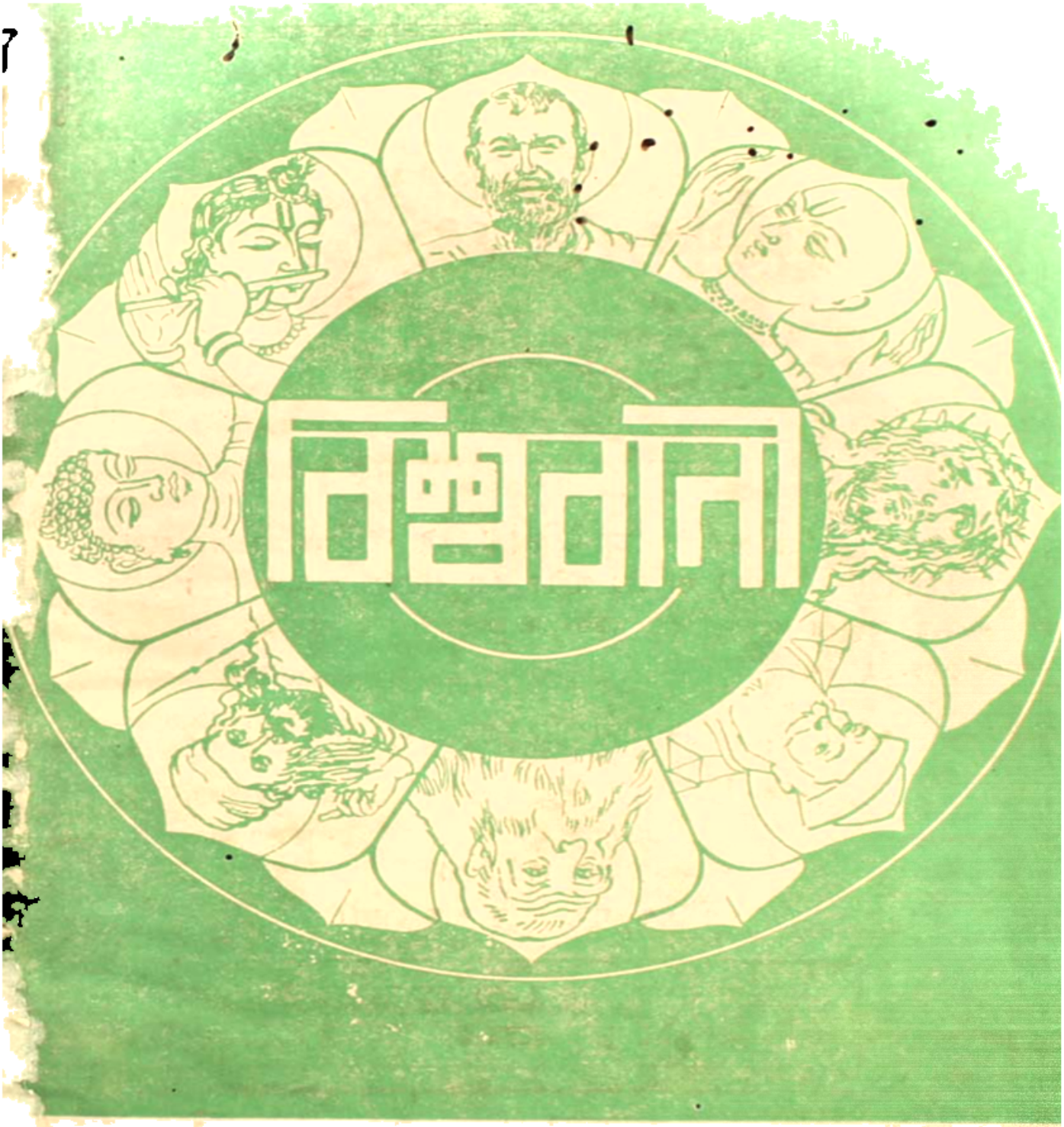

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

ত্রয়োদশ বর্ষ—নবম সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৫৩
বিক মূল্য চারি আনা
এ সংখ্যার মূল্য সাত আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট: কলিকাতা-৬ : ফোন—বড়বাজার ১৮৮২

নূতন বই বাহির হইল

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(উত্তর ভাগ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

॥ গবেষণামূলক 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো। উত্তরভাগে (দ্বিতীয় খণ্ড) ভারতীয় সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ॥

বাঙলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তক গৌরবের দাবী রাখে ॥

৫ খিমাই সাইজের চল্লিশ পৃষ্ঠা এবং আড়াই শতাধিক প্রাচীন
অপ্রকাশিত ভাস্কর্য-চিত্র ॥

মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

প্রথম খণ্ড—মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্য কিছু সংখ্যক বই এইরূপ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সম্পাদক স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৬৩

সূচীপত্র

১।	মা ও ছেলে		৪১৭
২।	শুষ্কজ্ঞান ও শুষ্কভক্তি এক	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৪১৮
৩।	ত্যাগ ও শান্তি	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২০
৪।	রামপ্রসাদের কবিত্ব	শ্রীঅনিল কুমার হালদার	৪২৩
৫।	রবীন্দ্র মানস ও সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায়	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য	৪২৬
৬।	বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিকতা ...	শ্রীমহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪২৯
৭।	গুরু-বিশ্বাস ...	শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	৪৩৩
৮।	অন্তিম কামনা (কবিতা)	শ্রীবিধুভূষণ সূর	৪৪০

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০১ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন আলানী দ্রব্যের দ্বারা কিম্বা তাপাধারে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

৯।	ধ্রুবচর্যা ...	স্বামী অগদীশ্বরানন্দ	৪৪১
১০।	শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি (কবিতা) ...	শ্রীযোগেশ মজুমদার	৪৭৫
১১।	প্রেমধর্ম্ম	ডাঃ শ্রীবৃপেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৭৬
১২।	তারকা (কবিতা)	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী	৪৫০
১৩।	বিজ্ঞানীর হাতে খনিজ তৈল	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর	৪৫১
১৪।	পরলোকে মহেন্দ্রনাথ		৪৫৩
১৫।	সংঘবার্ত্তা	...	৪৫৫

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, বাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা সেই মাসের মধ্যে না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বোস ডেকরেটরস্

২০৪ রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা-২৯

অষ্টাদশ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৬৩ | নবম সংখ্যা

মা ও ছেলে

মা!—কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্ব্বদা রক্ষা করছেন; আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার—মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, ঘুমায়, বেড়ায়; অত শত জানে না।

* * আমি কেবল মা বলে ডাকি। মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয় নাই বা জানাবেন। আমার বিড়াল-ছানার স্বভাব। বিড়াল-ছা কেবল মিউ-মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য্য, সে জানে না। জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে—আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর ছেলেও জানে, মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে—'আমি মাকে বলে দেব। আমার মা আছে।' আমারও সন্তান ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

সংসারে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মানুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, (১) গভীর চিন্তাশীল, (২) তরলচিত্ত পরায়ণ। শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ সংসারের সুখকেই জীবনের চরমকাম্য বলে মনে করেন এবং ঐ সুখ লাভ করার জন্য যাবতীয় কষ্ট বরণ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হন না। সংসারের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ যখন তাঁদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাঁরা উহা হ'তে তাঁদের দৃষ্টিকে সরিয়ে নেন এবং ইন্দ্রিয়জ সুখ লাভ করার জন্য অধিক পরিমাণ যত্নবান হন। জগদতীত সত্তা বা অনন্ত আনন্দস্বরূপ, তার চিন্তায় মনকে ব্যাপৃত রাখা, তাঁদের বিবেচনায় বৃথা সময় নষ্ট করা। যে সকল ব্যক্তি গভীর চিন্তাশীল তাঁরা সংসারের নশ্বরত্ব, স্বদেহের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং ইন্দ্রিয়জ সুখের প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য্য দুঃখ সহজেই উপলব্ধি করেন এবং কি উপায়ে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়, ও কি উপায়ে পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যায় তাহার চিন্তায় নিয়ত মগ্ন থাকেন। যদি আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করি ত দেখ্‌ব সেখানে দুটী মাত্র বাসনা রয়েছে,—একটী মৃত্যুহীন জীবন লাভ ও আর একটী অখণ্ড আনন্দ লাভ। এই দুটী বাস্তবিক লাভ করা যায় কিনা তা প্রথমে বলে নিতে ইচ্ছা করি। অনন্তবস্তু একটী মাত্রই হ'তে পারে, দুটী অনন্ত স্বীকার কর্‌লে একটীর অস্তিত্ব অপরটীর দ্বারা খণ্ডিত হয়। অতএব অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত আনন্দের ভোক্তা এক ব্যক্তির অনন্ত জীবন স্বীকার কর্‌লে দুটী অনন্ত স্বীকার কর্‌তে হয়,—যাহা বিচারের দৃষ্টিতে দেখ্‌লে সমর্থন করা যায় না। অনন্তজীবন বা অস্তিত্ব, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ একটীমাত্র বস্তুকেই বল্‌তে হয়, যে বস্তুটী আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্ম ব'লে উক্ত হ'য়েছে। অতএব অনন্তজীবন ও অনন্ত আনন্দ লাভ করার অর্থ নিজে অনন্ত হওয়া বা নিজের অনন্ত স্বরূপের উপর যে খণ্ডত্বের উপাধি আছে, তা' দূর ক'রে নিজ স্বরূপে স্থিতি লাভ করা। ইহারই নামান্তর মুক্তি।

এই মুক্তি লাভের ৪টী উপায় আছে। যথা :—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, ও কর্ম্মযোগ। এই ৪টী উপায়ের মধ্যে প্রথম দুটীর আলোচনাই এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু। প্রবন্ধের শিরোনামটী ভগবান রামকৃষ্ণদেবের কথিত একটী বাণী। সূত্ররূপে-উক্ত এই বাণীটীর বিস্তৃতি সাধনই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দুইটী যোগ, দুইটী পৃথক পথ; তবে চরমে উভয় মার্গই সাধককে একস্থানে পৌঁছে দেয়, এই জন্যই বলা হ'য়েছে যে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক; নচেৎ পথ দুটী যে এক তা নহে। জ্ঞানযোগের পথ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অধিকারীর জন্য, উহা সরলভাবে আত্মানুসন্ধানের পথ বা বিচারপথ। আমি দেহ, মন, ইন্দ্রিয়বর্গ নহি, আমি আত্মাস্বরূপ, এই জ্ঞানে স্থিতিলাভ বড় সহজ কথা নহে। এইজন্য ভাগবতে উক্ত হ'য়েছে যে কর্ম্মফলে বিরক্ত, কর্ম্মপরিত্যাগ কারিদের জন্য জ্ঞান-যোগ ও যিনি কর্ম্মে অবিরক্ত ও অনভিষাসক্ত, তাদের জন্য ভক্তিযোগ। আচার্য্যশঙ্করের মতে মোক্ষকারণসামগ্রীসমূহের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ এবং আত্মস্বরূপানুসন্ধানই ভক্তি ব'লে অভিহিত হয়। যথা :—

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্ব স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥

—বিবেক চূড়ামণি

জ্ঞান শব্দটী জ্ঞা ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন হ'য়েছে—উহার অর্থ জানা। যখন আমরা কোন বস্তুকে জানি, তখন সেই বস্তুটী আমার জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে,

উহা জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। আমাদের মনের যে জ্ঞানরূপাবৃত্তি উহা দ্বারা কিন্তু আমরা ব্রহ্মকে কখনও জান্‌তে পার্‌বো না,—তা যদি পারি, ত' ব্রহ্ম সসীম হ'য়ে পড়েন। অতএব জ্ঞানযোগের অর্থ নেতি-নেতি বিচারপথ অবলম্বন করে জ্ঞানস্বরূপ হওয়া। জ্ঞানস্বরূপ হওয়ার অর্থই চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ হওয়া। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ স্বরূপ। চিৎ বা চৈতন্য এবং জ্ঞান একই বস্তু। চিৎ বা জ্ঞান ভিন্ন সবই জড়। জ্ঞান ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা গুণ বলে যদি ব্রহ্ম হ'তে উহাকে পৃথক করা যায়, ত ব্রহ্মকেও জড় বল্‌তে হয়। চিন্ময় ব্রহ্মের চিন্ময় জ্ঞান ধর্ম্ম হ'তে পারে না। জ্ঞান উৎপত্তি ও বিনাশ-বিহীন, উহা স্বপ্রকাশ। সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ।

বেদান্তের বিচারে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ মতে জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। জীব যদি ব্রহ্মই হয় ত সে উহা বুঝে না কেন? ইহার কারণ বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। মেঘের উদয় হ'লে আমরা সূর্য্যকে দেখ্‌তে পাই না, অথবা রাত্রিতে পৃথিবীর ছায়াপাত বশতঃ সূর্য্যকে দেখ্‌তে পাই না। তাই বলে ভূতত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বো না যে সূর্য্য সদা প্রকাশমান আছেনই। আত্মা ও সেরূপ নিয়ত প্রকাশমান থাকলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ উহা অপ্রকাশ ব'লে বোধ হয়। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা কি? উহা ব্রহ্মেরই মায়াশক্তি। উহাকে অজ্ঞান বলা হয়, কারণ উহা দ্বারা আবৃত হ'য়ে জীবরূপী ব্রহ্ম স্ব স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন; এবং উহারই নাম 'অবিদ্যা'; কারণ উহা বিদ্যার উদয়ে নাশ প্রাপ্ত হয়। এই অজ্ঞান বা মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করেন কেন? এই 'কেন'র উত্তর কেহ দিতে পারেন না। ব্রহ্ম নিজেই নিজের মায়ায় আবৃত হ'য়ে জীব সাজেন, স্বরূপ বিস্মৃত হন এবং জীবোপযোগী পৃথিবীতে অহংবুদ্ধি বিশিষ্ট হ'য়ে সু ও কু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ও তার ফলে সুখ ও দুঃখ-ভোগ করেন। জন্ম-মৃত্যুচক্র এইভাবে অতিবাহিত হবার পর যখন কর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে ও আত্মজ্ঞান লাভে আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখন জীব সদ্‌গুরুর সন্ধান করেন এবং স্বীয় সাধনায় ও সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মা অজ, নিত্য, পূর্ণ, অনন্ত সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন ও আনন্দঘন; তিনিই একমাত্র সত্য আর সবই মিথ্যা। জ্ঞানযোগের সাধক যখন ব্রহ্ম-তন্ময়তা লাভ করেন, তখন কোথায় বা তাঁর দেহ আর কোথায় বা জগৎ? তখন তিনি পরিপূর্ণস্বরূপ। ইহাই অদ্বৈতজ্ঞান এবং জ্ঞানযোগের ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এইবার ভক্তিযোগ এবং ভক্তিদ্বারা কি ক'রে ঐ চরমলক্ষ্যে পৌঁছান যায় তার আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ বলা হয় ভক্তিপথ সহজপথ, কিন্তু ইহা যত সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নয়। কারণ ভক্তির পাত্র স্বরূপ ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন না কর্‌তে পার্‌লে ভক্তিযোগে সিদ্ধ হওয়া যায় না। জ্ঞানযোগের ন্যায় এই যোগেও সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্তি ও হৃদয়ের পবিত্রতার আবশ্যকতা আছে। ভক্তিযোগে দ্বৈতভাব নিয়ে আরম্ভ কর্‌তে হয়;—আমি ভক্ত উপাসক, ও সত্য-স্বরূপ ভগবান আমার উপাস্য। অন্তঃকরণের নিয়ত ভগবদ্ভাবে থাকাকে ভক্তি বলে। ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে ভাব হয় ও ভাব ঘনীভূত হ'য়ে মহাভাব বা প্রেম হয়। প্রেমের ঘনীভূত অবস্থায় প্রেমিক-ভক্ত প্রেমাস্পদ ভগবানের সত্তায় একীভূত হ'য়ে যান। প্রথমতঃ মানুষের মন ভক্তিহীন একটা যেন কঠিন পদার্থ বিশেষ থাকে। তারপর সুপ্রারব্ধকর্ম্ম বশে মানুষ যখন দেখে,—তাই ত সংসারের কিছুই ত স্থায়ী নয়, তাই ত এখানকার সুখ ও দুঃখেরই নামান্তর! তাই ত, কি ক'রে আসল সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়! তখন তার কঠিন মন দ্রব হ'তে থাকে, এবং ঐ দ্রব মনে একটু একটু ক'রে ভক্তির উদয় হয়। সৎকর্ম্ম করার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও

শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কোমল হৃদয়েভক্তির আবির্ভাব হয়। মানুষের দ্রব মনের সহিত মিশ্রিত ভক্তি কখনই নষ্ট হয় না। মানুষ দুষ্প্রারব্ধকর্মবশতঃ কিছু দিনের জন্য ভগবানকে ভুলে থাকে ও বিষয় সুখে মত্ত হ'য়ে থাকে। ভগবানও তার ভোগবাসনা যতদিন না কাটে, ততদিন একটু আড়ালে থাকেন ও তার সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলা করেন: তবে তিনি ভক্তপ্রিয়, ভক্ত না হ'লে তাঁর চলে না, তাই তাঁর চিরভক্তের ভোগবাসনার ঘোর যখন প্রায় কেটে এসেছে দেখেন, তখন ভক্ত যাতে তাঁকে লাভ করতে পারে, তার জন্য সদ্গুরুরূপে তাকে কৃপা করেন। এইবার এমনই মজা হয় যে, যখন ভক্ত তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে যান, তখন ভগবান ভক্তের দিকে দশ পা এগিয়ে আসেন।

ভক্তিলাভের কয়েকটী উপায় ও আছে। যথা:— ভক্তসঙ্গ ও ভক্তসেবা, সদ্গ্রন্থপাঠ, ভগবৎগুণ কীর্ত্তন, গুরুউপাসনা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও বিষয়ে অনাসক্তি, যমনিয়মাদি অভ্যাস, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ। এইগুলির অভ্যাসের ফলে, ভক্ত হৃদয়ে যে ভক্তি বীজাকারে থাকে তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পরিপক্ক হ'য়ে প্রেম ফলে সুশোভিত হয়। ভক্ত উন্নতির চরমস্তরে আরূঢ় হন। তখন ভগবান তাকে সাযুজ্য মুক্তি পর্য্যন্ত দিতে এলেও তিনি তাঁর সেবা ভিন্ন ঐ সমুদয় গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন না। ভক্ত এই অবস্থায় এলে বুঝা যায়, তিনি যোগের চরম সীমায় উঠে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেছেন। এইরূপ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে লীলা তাই মধুরতম। ভক্ত বলেন যে, তিনি ভগবান হ'তে পৃথক থেকে তাঁকে সম্ভোগ করবেন। যদিও তিনি তখন জেনেছেন যে, প্রেম, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক একই। এদিকে ভগবান বলেন যে, আহা, আমার কাছে থেকে, তুই-ও যা, আমি-ও তা। তখন আর উপায় কি? ভক্ত তখন ভগবানে এরূপ সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন হ'য়ে যান যে তখন আর তাঁর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তখন জলে লবণ খণ্ডের ন্যায় ভক্ত ভগবানে বিলীন হ'য়ে যান। ইহাই অদ্বৈত অবস্থা। দুধে ঘৃত মিশ্রণের ন্যায় তখন ভক্তজীবাত্মা ভগবান-পরমাত্মার একীভাব প্রাপ্ত হন। অতএব জ্ঞানপথে যে অবস্থা লাভ করা যায়, ভক্তি পথেও সেই অবস্থাই লাভ হয় এবং এইজন্যই বলা হ'য়েছে, শুদ্ধ-জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।

ত্যাগ ও শান্তি

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

একমাত্র ত্যাগেই শান্তি পাওয়া যায়। ত্যাগ অর্থে কামনা বা আসক্তিবিহীন হওয়া। এই সংসার মায়ার রাজত্ব; তাই অবিদ্যার রাজত্বে এসে জীব দেহাত্মবোধ বা কাঁচা আমিত্বের মোহে প'ড়ে স্বরূপ বিস্মৃত হয় ও মায়ার বশবর্তী হ'য়ে বিপথগামী হয়; কারণ আসক্তি জীবকে মোহগ্রস্ত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথায় বলতে গেলে বলা যায়: কণামাত্র আসক্তি বা বাসনা জীবের মনের কোণে থাকলে তাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দেয়; কারণ আসক্তি বা বাসনা থেকে আসে সংকল্প, এবং এই সংকল্প হ'তে আনুসঙ্গিক সংস্কারাদি জীবের অনুগমন করে। সুতরাং বাসনা বা আসক্তিই সকলের মূল।

বাসনাকে চরিতার্থ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনু ব'লেছেন: "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" —অর্থাৎ ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তা বাড়তে থাকে। সুতরাং সংকল্পবিহীন না হ'লে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, আর বাসনার নিবৃত্তি না হলে জীব প্রতিপদে বিপথগামী হয়।

এখন কামনা বা বাসনার উৎপত্তি কোথা থেকে? অজ্ঞান থেকে বাসনার উৎপত্তি হয়। অজ্ঞান জ্ঞানেরই অভাব, অথচ শূন্যবস্তু নয়—একরকম ভাব বা সত্তাবিশিষ্ট অনির্বচনীয় পদার্থ। অথচ তা একেবারে ভাব-পদার্থ নয় এজন্য যে, ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানের নাশ বা লোপ হয়, এবং অভাব-পদার্থও নয় এজন্য যে, সাংসারিক অবস্থায় অজ্ঞানের অনুভব হয়।

আচার্য সদানন্দ যতি বেদান্তসারে তাই উল্লেখ করেছেন—"অজ্ঞানন্তু—সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং, ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি,* ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।" অজ্ঞানের দুইপ্রকার শক্তি (১) আবরণশক্তি এবং (২) বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তির উদাহরণ হ'ল এক খণ্ড মেঘে সূর্য আবৃত হ'য়েছে বলা যেমন অজ্ঞান বালকের উক্তি; কারণ ঐ মেঘ খণ্ড দর্শকের নয়ন আচ্ছন্ন করে মাত্র, মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে নিজেকে বদ্ধ দেখাও তদ্রূপ অবিবেকী পুরুষের ধারণা। কারণ অজ্ঞানাবরণই তার দিব্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করাতে সে স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয়। বিক্ষেপশক্তি—এক বস্তু অন্যরূপে প্রতীয়মান হওয়া। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও আবৃত আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করে। বেদান্ত মতে তাই বলা হয়, সমস্ত দৃশ্য পদার্থই কল্পিত। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই, যা শিব, জীব ব'লে কথিত হয়। এই জীবই বদ্ধাবস্থায় মোহগ্রস্ত হ'য়ে আপেক্ষিকবশে সুখদুঃখ অভিভূত হয়। শ্রীঠাকুর বলতেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

* সত্ত্বরজোতমোগুণময়ী মায়ার তাই দুইটি শক্তি আছে,—একটি বিদ্যা ও অপরটি অবিদ্যা মায়া। বিদ্যাপক্ষে মায়া জ্ঞানময়ী, মোক্ষের কারণ ও অবিদ্যাপক্ষে সংসারের বন্ধন হেতু। বিদ্যার শক্তির দ্বারা অবিদ্যাশক্তিকে দূর করতে হয়। দূর অর্থে নাশ। কিন্তু বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ না হওয়া পর্যন্ত জীব নিজেকে বদ্ধ মনে করে। গীতায় ৩য় অধ্যায়ে ৩৯।৪০ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে এর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,—

"আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥" ৪০॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ কাম দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠান বলা হয়। এই কাম ইহাদিগের দ্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত করে বলে, দেহী (জীব) নানাপ্রকারে বিমোহিত হয়, অর্থাৎ তার মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকাশ হয় না।

তবে একটা কথা, জ্ঞানের জন্য পৃথক সাধনার প্রয়োজন নাই, জ্ঞান সাধ্য নহে, নিত্য; সুতরাং জ্ঞানের আবরণকে নষ্ট করলে তবে জ্ঞান নিজে নিজে প্রকাশিত হয়। এখানে ইন্দ্রিয়ের ওপর কর্তৃত্ব আনতে হবে—যাকে বলে ইন্দ্রিয়জয়। ইন্দ্রিয়জয় না হ'লে মন ও বুদ্ধিকে জয় করা অসম্ভব! সুতরাং প্রথমে ইন্দ্রিয়কে জয় ক'রতে হবে পরে মন ও বুদ্ধিকে নিয়মিত ক'রতে হবে, তবে কামের আশ্রয় হবে উচ্ছিন্ন! নিরাশ্রয় কাম তখন অতি সহজেই বিনষ্ট হবে অর্থাৎ বশে আসবে।

ইন্দ্রিয়মনিত যে বিষয়জ্ঞান তা আপেক্ষিক (relative)। এই জ্ঞান মায়ার অন্তর্ভুক্ত। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, বিষয় হ'তে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং এই

বুদ্ধির পারে সেই পরমতত্ত্ব। সুতরাং সাধককে বুদ্ধির পারে যেতে হবে; নইলে কামনার জগতে বাস ক'রে কাম জয় করা সম্ভব নয়। কাম জয় করতে গেলে একের বা ব্রহ্মের অনুভূতি হওয়া চাই। বহু বা বৈচিত্র্যের জ্ঞানে শান্তি হয় না, রামকৃষ্ণদেবের কথায় এসম্বন্ধে বলতে গেলে বলা যায়, "বহুজ্ঞান অজ্ঞান, একজ্ঞান—জ্ঞান।" একজ্ঞান অর্থে সেই পূর্ণজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, বা সাধকের পরমতত্ত্ব। শাস্ত্রেও আছে, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা:,"—নিবৃত্তি বা ত্যাগই মহাফল-প্রদ। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ: কস্যস্বিদ্ধনম্"—(ঈশ ১।১), "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু।"—(কেবল ১।২)। ত্যাগ বা সন্ন্যাসের দ্বারা আত্মার নির্বিকার ভাব রক্ষা করতে হয়। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করতে নেই। সকাম কর্ম, প্রজাসৃষ্টি বা বিপুল ঐশ্বর্যের দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না; সুতরাং ত্যাগই একমাত্র মুক্তির সহায়ক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাও তাই। তিনি বলতেন, "ছোট ছোট বাসনাগুলি ভোগ দ্বারা এবং বড় বড় কামনাসমূহকে নিত্যানিত্য বিচার করে ত্যাগ করতে চেষ্টা কর।" উপনিষদের কথাও তাই: "ত্যাগ: ত্যাগ: ত্যাগ: নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" সর্ব্বমস্তু: ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।" অর্থাৎ ত্যাগ ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। বৈরাগ্য ভিন্ন জগতে সকল বস্তুই ভয়ের অর্থাৎ বন্ধনের কারণ।

এখন ত্যাগের পরিণাম কি? ত্যাগ থেকেই দৃঢ়বিশ্বাস আসে, বিশ্বাস থেকে সকল সংশয় দূরীভূত হয় ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্যের দ্বারাই সাধক ভক্তি-বিশ্বাস অর্জন ক'রে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, মনন ও কীর্তন করে, তাতে তার অবিদ্যার নাশ হয় ও সে প্রাপ্তে শান্তি লাভ করে।

ত্যাগের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন: একটি চিল এক খণ্ড মাংস মুখে ক'রে শূন্যে উড়ে যাচ্ছে, এমন সময় কতক-গুলি বায়স ও অন্যান্য পক্ষী তার পশ্চাদনুসরণ করলো। সকলেই যখন তার মুখ থেকে মাংস খণ্ডটি ছোঁ মেরে নেবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো, চিলটি তখন অতিষ্ঠ হ'য়ে উহা ফেলে দিয়ে গাছের একটি ডালে ব'স্‌লো। বায়স ও অন্যান্য পক্ষীদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে চিলটি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গাছের ডালে অবস্থান ক'রতে লাগলো। এটি ত্যাগের একটি সুন্দর উপমা। চিল্‌টি বাসনা ত্যাগ করল বলেই শেষে শান্তি লাভ করল।

পরিশেষে বলা যায় যে, কামনা বা আসক্তিই মানুষের বন্ধনের কারণ। যেহেতু কামের আবরণে জ্ঞান আবৃত থাকায় সে ক্রমাগতই বিপথগামী হয়, শান্তির পথ খুঁজে পায় না। তাই সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়কে সুসংযত ক'রতে হয়, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ লাভ ক'রে। আর ইন্দ্রিয় সুসংযত হলে তবেই শুদ্ধ বুদ্ধির বিকাশ হয় ও শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা মানুষ মুক্তি লাভ করে। অবিদ্যার লীলাভূমিই এই জগৎ। জগতে মানুষকে থাকতেই হয়। তাই নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা অনিত্য বিষয়কে ত্যাগ ও শাশ্বত শান্তিকে গ্রহণ ক'রে মুক্তিলাভ করতে হয়। এটাই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য।

রামপ্রসাদের কবিত্ব

শ্রীঅনিল কুমার হালদার

বাংলার প্রাণপদ্মে যে আত্মভোলা কবিমৌটি যুগে যুগান্তরে প্রতিষ্ঠিত, সেই অম্লান-রসস্বরূপের যথোদ্ঘাটন ইতিপূর্ব্বে হলেও তার সম্যক্ মূল্যায়ণ, কাব্যকৃতির যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়। কাব্য অপেক্ষা কবির প্রতি সাহিত্যরস প্রণাতার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে, তারি ঐকান্তিক অভিচেতনায় রামপ্রসাদের সাধকত্ব, সেই নিরাড়ম্বর, পার্থিব ঔদাসীন্য, ধ্যানমুমুক্ষু জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু সেই ক্ষান্তগুঞ্জন-কবি মধুকর যে মধুচক্র রচনা করেছেন তার মূল্যও অত্যধিক: উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রহরে দুর্বিত ভয়ঙ্করী আদর্শের উত্তেজক বিলাস মত্ততাকে অতিক্রম করে কবি আপন মানসিক শক্তির সাহায্যে প্রাণারাম-বিদ্যা সাধন করেছিলেন। রামপ্রসাদের এই কঠোর মানসতপশ্চর্য্যা তাঁকে ভূমিস্তরের কলুষ-মুক্ত হবার শক্তিদান করেছিল, যদিও প্রথমজীবনে "বিদ্যাসুন্দরের" বিলাস-রসের স্পর্শ তাঁর দেহে আছে। পদাবলীর অর্থাৎ সঙ্গীতের রামপ্রসাদ আত্মিকরসসাধনায় নিমগ্ন, অনন্যমনা, একনিষ্ঠ; তাঁর সমস্ত গানের মধ্যে রূপউৎকণ্ঠার উৎসারই অত্যুৎকৃষ্ট, বাহ্যিক প্রসাধন পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি নেই বল্লেই হয়: তাই অতি সাধারণ উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত, অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কার-মাধ্যমে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর পদচারণা। তাঁর উপাস্য দেবতা কালীর মতই, ঐ কাব্যলক্ষ্মীর ভৈরবী বেশ, নিরাভরণা তবু অনুপম অর্থাৎ গভীরার্থবহ—

'মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা
এখন ক্ষুধার বেলা ভুলালে না।
এল পুত্র গেল কোথা।'

অথবা—'মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রী জারি।
• • •
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কি উপায় করি,
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥

আবার—'আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
তবে দেও দুঃখ মা আর কত ঠাই॥
• • •
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই।

ভাবকল্পনার এই অতলান্ত চেতনাই রামপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য, তাঁর কাব্যসাধনাও ব্যক্তিজীবনের ভাব-সাধনার নামান্তর। আত্মতন্ময় কবি অহর্নিশ মাতৃ-চিন্তায় বিভোর থাকেন, তাঁর গানগুলিও মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়, সে যেন গুহ্য তান্ত্রিকতার বাতাবরণে আবৃত, লেখনশিল্পের এই অন্তমনস্কতা ভাবগাম্ভীর্য্যের প্রসূতি; তাঁকে এজন্যই গুঞ্জনক্ষান্ত মধুকর বলেছি। তাঁর সমগ্র পদাবলীর মধ্য দিয়ে যে মানসমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে তা' হলো মধুপানরত ভক্তজনের ছবি, বাহ্যিকস্পর্শ থেকে তা বহুদূরে, দিগন্তের আনম্ররেখায় রেখায় তা বিলীন হয়ে যায়: তাই রামপ্রসাদের কাব্যপ্রবেশের উপায় হলো অন্তরদর্শী কবি মন।

বাংলার শ্যাম মৃত্তিকার কোমলতা তাঁর এই পদগুলিতে স্ত্রী ও শ্রী সংযোজন করেছে বলেই রামপ্রসাদ বাঙালীর মনে অক্ষয় আসনের অধিকারী—তিনিই বাংলার প্রকৃত চারণ কবি। তাঁর কাব্যের সুরটা বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে মনকে বড় উদাস করে তোলে, আঘাত দেয়; আর বাহ্যিক রূপোল্লাস অর্থাৎ কাব্যিক রূপচৈতন্যের কাঠিন্য নেই বলে অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ বনিতা—নির্বিশেষে তার রসগ্রহণে কোন অসুবিধা অনুভব করে না। রামপ্রসাদী সুরটাই একেবারে ভিন্ন, অন্য যে কোন কবির সঙ্গেই তার বৈসাদৃশ্য ও বিষমতা—তথাপি প্রাণের কোমলতন্ত্রীতে তার দীর্ঘছন্দের অনুরণন ম্লান নহে—কবি যখন ঈড়া, পিঙ্গলা, বামাবর্ত্ত, দক্ষিণাবর্ত্ত, মূলাধার, কুলকুণ্ডলিনী, সহস্রার ইত্যাদির অবতারণা করে আগমনিগমের অতীতলোকে অধিষ্ঠিত কালী-করালবদনার কথা বলেন তখন নয়, কিন্তু যখন শাক্ত উৎকেন্দ্রিক প্রাণ ও মনের আকুল উৎসার এবং অধীর ক্রন্দনময় বিলাপধ্বনিতে তাঁর কাব্য পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই আসল কবিত্ব ধরা পড়ে; যে কবিত্ব প্রচলিত অর্থে কবিত্ব নয় কারণ তিনি ত' কাব্যরচনা করতে বসেন নি, অর্থাৎ সে কাব্য প্রচেষ্টা সজ্ঞানশিল্পসাধনা নয়, কবির মন তখন সেই মাতৃপাদপদ্মে নিবদ্ধ। শিশুর সারল্য ও নির্মলতার সঙ্গে অনন্যনির্ভরতা যোগ দিলে যা' হয় রামপ্রসাদ তার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি। দুঃখের বেদনার ক্রন্দন ও দীপ্তিকাব্য মিলিয়ে গেছে—ফলশ্রুতি যদিও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি—

'দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা।
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এমি কাজের ধারা,
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
দুখের ভাগী কেবল তারা॥'

এবং 'মা মা বলে আর ডাকব না,
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না॥'

শুধু তাই নয় কবি যখন বলেন, 'এবার বাজী ভোর হলো'—তখন তাঁর হৃদপিণ্ডের আর্ত্তক্রন্দনটা একেবারে চক্ষুগোচর হয়ে ওঠে। এই দুঃখবোধ থেকেই তীব্র অভিমানের উৎপত্তি হলো তখনই—"এবার কালী তোমায় খাব"—মা ও শিশুর এই লুকোচুরি খেলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আর নেই। কালী জগন্মাতা',—তিনিই কবিকে ইহসংসারে এনেছেন, তিনিই দুঃখ, যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছেন আর কবি সেই বিষম যাতনায় উত্যক্ত হয়ে মাকে ডাকেন দুঃখ নিবারণের জন্য, কিন্তু ত্রাণকারিণীর চৈতন্য নেই—এর চেয়ে অনুশোচনার কারণ কি থাকতে পারে? তাই কবি বলেন, মা শুধু পাষাণীই নয়, মা আর বেঁচে নেই। রামপ্রসাদের এই কাব্যে ছন্দের ললিত ভঙ্গিমা নেই—স্বরবৃত্তের আঘাতেও তা নৃত্যশীল নয়, বারে বারে ছন্দপতন হয়েছে—অবশ্য প্রাচীন সমস্ত কবিতা অল্পবিস্তর এই দোষসম্পৃক্ত। তথাপি শাক্ত পদকর্ত্তা হিসাবে রামপ্রসাদ বাংলাসাহিত্যে যে পরিমণ্ডল সৃজন করেছেন সেখানে তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর কাব্যের কথা নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এত সহজ ভাষায় এতো কঠিন কথা বলেছেন। এই কথা বলার ভঙ্গিমায় কবি অপ্রতিরথ। প্রাণঢালা সুর ও সুরের উল্লাস দেহে, মনেই নয় প্রত্যেক শোণিত বিন্দুতে উন্মাদনা সঞ্চার করে; দ্বিতীয়তঃ, কাব্যকথা নিরাড়ম্বর ত' বটে, উপরন্তু তা প্রয়াসহীন, বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টার স্পর্শই যেন নেই, এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি উৎকৃষ্ট কাব্যের অন্যতম লক্ষণ, তৃতীয়তঃ আন্তরিকতা—যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংস্পর্শ; আপন জীবনমন্থের প্রাণ-প্রদীপের আলোকে তাঁর সমস্ত কাব্য আলোকিত, ঐ জ্যোতিঃবিচ্ছুরণ না হলে তা' পাঠকের মনে এত

সংক্রামক হতে পারতো না; চতুর্থতঃ সুরসৌষম্য—তাঁর কাব্য, কাব্য নয় সঙ্গীত এবং সে সঙ্গীত উচ্চাঙ্গের রাগরাগীর নয় হৃদয়ানুসারী, যন্ত্র নয় খাঁটি গলায় তার তড়িৎবেগ। বাংলাসাহিত্যে রামপ্রসাদের আর একটা দান 'আগমনী গান'—যেখানে বঙ্গজননীর চিরন্তন বেদনাকে, অন্তরনিরুদ্ধ ভাবউচ্ছ্বাসকে কবি মুক্ত-মন্দাকিনী করে তুলেছেন। রামপ্রসাদের চিৎ-প্রকর্ষ এই গানগুলিতে মুক্তার মতো দানা বেঁধেছে—

রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার।
নিকটে দেখে যারে সুধাইছে তারে
গৌরী কতদূরে আর।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ
নিরখি বদন উমার,
বলে 'মা এলে, মা এলে, মা কি ভুলে ছিলে'
মা বলে 'একি কথা মরি গো!'

এবং— "গিরি, এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।
যদি আসে মৃত্যুহর, উমা নেবার কথা কয়
এবার মারে ঝিয়ে করবো ঝগড়া
জামাই বলে মান্‌বো না।"

তাঁর প্রায় সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, যাঁর হাতে বঙ্গসরস্বতী পল্লীপ্রান্তের অমার্জ্জিত দুর্বলতা ত্যাগ করে নাগরী চাকল্য ও বাক্‌পটুতা শিখেছেন। ভারতচন্দ্র আর রামপ্রসাদ দুই বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান—এই দুই বিষয়ের মিলন হবার নয়। একজন অলঙ্কারের দোকান খুলে বসেছেন একেবারে সহরের মধ্যস্থলে। অন্ত দোকানের কি জৌলুষ, সোনা, মুক্তা, হীরে, জহরৎ, চুনি, পান্না, কত শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, ব্যাজস্তুতি. শুধু তাই নয় অন্তরকম গয়নার-ও আছে—তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, একাবলী. দীর্ঘত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ইত্যাদি। অন্তজনের মেরুবাবেশ, ছোট একটা প্রাচীন মন্দিরের সেবাইৎমাত্র, সারাদিন বনের ফুল তোলেন আর পাষাণ মূর্ত্তিটাকে পূজো করেন; সন্ধ্যেবেলা আকাশের প্রান্তে বনশীর্ষরেখা ভেদ করে যখন ক্ষীণ চন্দ্র দেখা দেয় তখন বহুকালের একটা একতারা নিয়ে আপন মনে গান করেন—

"ঢিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
মন ভরে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপৎকালে ব্রহ্মময়ী,
আসেন কিনা আসেন দেখি রে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে,
তার এতটা ভাবনা কিরে
তবে তারা-নামের কবচ মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখি রে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন খাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে॥
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা
জন্তে কি জানিতে পারে
যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কিরে॥"

—নিঃশব্দে ঝরে পড়ে নিশান্তের ম্লান মল্লিকা।

রবীন্দ্র মানস ও সনাতনী সম্প্রদায়

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য

হিন্দু সমাজে চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার নানা বৈচিত্র্যের এক-একটা বিশিষ্ট প্রতীক নানা দেবদেবীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নানা দেবদেবী আমাদের চিন্তার ব্যক্তিকরণস্বরূপে মানসে এমন একটা ভাব-সংস্কার ও চিন্তা-সংস্কারের উদ্ভব ক'রেছে যা যুগ যুগ ধ'রে সঞ্চিত হ'য়ে অতীত ঐতিহ্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দুর আধ্যাত্মিক চিন্তা থেকে এই দেবদেবী অপসারিত ক'রলে সে মনে করে যে তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্যকে নষ্ট করা হ'চ্ছে। এ সম্বন্ধে খুব গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয় এবং তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম ও কবিকৃতি সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজ এখনও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি, অথচ তারা রামপ্রসাদ রায়ের পাঁচালি থেকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতিকে বরণীয় ক'রেছে, এর কারণ কি? এখন তাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই আলোচনায় আমরা শুধু প্রতীকধর্ম ও তার প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করব।

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে একটা খুব বড় জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে, তা হ'চ্ছে বিস্ফারশীলতা। এই বিস্ফারশীলতা নূতন নূতন গভীর অনুভূতি ও ভাব সংকেতে সর্ব্বদাই গভীর জীবনরসকে অনুভব করে। এই অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবপ্রতীক আছে কিন্তু তা এক জায়গায় স্থির হ'তে পারেনা, সেইজন্যই তার ব্যক্তিকরণের সুদূর সম্ভাবনাও থাকেনা।

রামায়ণ, মহাভারত শুধু কাব্যের উৎস নয়, পরবর্তীযুগের ভারতীয় সামাজিক, নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারারও প্রায় উৎসস্বরূপ। এই চিন্তাধারায় মহাকাব্যীয় প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী ব'লে এর মধ্যে প্রতীক ধর্ম একটা বিশিষ্ট স্থান ক'রে নিয়েছে। এই প্রতীক ধর্মের মধ্যে পূর্ণতাপ্রবণতা আছে কিন্তু তার মধ্যে ঋগ্বেদ বা উপনিষদের ঋজুতা, বলিষ্ঠতা ও সর্ব্বোপরি নিগূঢ় সঙ্কেতশীলতা নেই। এই সঙ্কেতের মধ্যেই পরমতত্ত্ব রহস্যঘন। ইহা আমাদের প্রকাশশীল অন্তরে নিবিড় হয়ে আছে।

পরমাত্মার দিকে এই সঙ্কেত, মহাকাব্যে নানাবিধ হৃদয়বৃত্তিমূলক খণ্ড সুষমায় এবং ভক্তিবৃত্তিতে আমাদের চিত্তকে বিহ্বল ক'রে অনেক সময় এক প্রকার মাদকতার ভাবে আচ্ছন্ন করে। এই আচ্ছন্নতা আমাদের পূর্ণতাপ্রবণ চিত্তকে দেবব্যক্তিত্বের এক প্রকার ভক্তিবিহ্বল রসে ভরিয়ে রাখে। তার মধ্যে অনেক প্রকার সুষম কল্পনা ও ছলনাও থাকে। মহাকাব্যের এই সমস্ত কল্পনা এবং বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি পরবর্তীযুগের সমস্ত কবিদের সহজ প্রলোভনরূপে সহজেই প্রতিভাত হ'য়েছিল। যা কিছু কাব্য পরবর্তী যুগে রচিত হ'য়েছিল তার মধ্যে এই প্রতীকধর্মী খণ্ড বিশ্ব ও জীবন বোধই বর্ত্তমান।

মহাকাব্য যুগের নানা মিশ্র চিন্তাধারা ও প্রতীকধর্মী আধ্যাত্মিকতা পরবর্তী যুগের শুধু কবিত্বের উৎস নয়, নানাবিধ সামাজিক, নৈতিক বিধি-বিধানেরও প্রায় গ'ড়ে তুলেছিল। এঁর ফলে আর্ষ-অনোচিত বলিষ্ঠ সাধনা ও জ্ঞানবাদের স্থলে নানা রকম সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ মানসের প্রতীকধর্মী খণ্ড খণ্ড তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম অনুভূতিই স্থান গ্রহণ ক'রেছিল। এই প্রতীকধর্মী তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম অনু-

স্মৃতিই মহাকাব্য-পরবর্তী যুগ থেকে হিন্দু-মানসকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। মহাকাব্য ও পৌরাণিক নানা কাহিনীতে বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের নানা প্রকার বলিষ্ঠ সাধনা ও জ্ঞানের নানা ভগ্নাংশ প'ড়ে আছে এবং তাই পরবর্তী যুগের হিন্দুমানসে জ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধনার পরম নিদর্শন ব'লে গণ্য হ'য়েছিল। এই কারণেই হিন্দুমানস বৈদিক ও ঔপনিষদিক শুদ্ধ ও বলিষ্ঠ জ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ থেকে ক্রমে দূরে সরে পড়তে লাগল। এইভাবে তাদের অধ্যাত্ম মানস এমন এক জায়গায় এসে পড়ল যেখান থেকে বৈদিক ও ঔপনিষদিক জ্ঞান তাদের কাছে তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে অপরিচিত ও ভীতিপ্রদ এর মত ঠেকতে লাগল। এ প্রভাবটা ভারতবর্ষের পূর্ব দিগ্‌ভাগে বেশী করে টেকেছিল।

পরবর্তী যুগের কবিদের এই মহাকাব্যীয় ভাব-ধারাই অত্যন্ত প্রবল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে এসে এই মহাকাব্যীয় ভাবধারার ব্যতিক্রম দেখি। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে কাব্য সংকীর্ণ অর্থে শুধু বাক্য ও ছন্দ-বিলাস নয়, তা সমগ্র জীবনব্যাপী সুগভীর উপলব্ধি। জগত ও জীবনে, সীমা ও অসীমার একটা গহন, গভীর ও সৌষম্যিক নিদর্শন এবং এই নিদর্শনের সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণতা। সুতরাং রবীন্দ্র কবিমানস চিরাচরিত প্রকৃতি বর্ণনাত্মক সুন্দর সুন্দর বাক্যচয়নে সংকীর্ণ সৌষম্যিক বিলাস নয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জগত ও জীবন এবং সীমা ও অসীমা পরস্পর সুনিবিড় সহানুভূতি ও সামঞ্জস্যে বারে বারে পূর্ণতাকে ইঙ্গিত করেছে, সংকেত করেছে। রবীন্দ্রমানসে এই সুনিবিড় তত্ত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে চিরাচরিত প্রতীকধর্ম অবলম্বন ক'রে নয়। এই প্রতীকধর্ম পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রায় বার আনা ভাগ জুড়ে ব'সে আছে। এই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তার সমস্ত আধ্যাত্মিক কৃতকারিতাকে ও কাব্যে তার সামগ্রিক প্রভাবকে প্রতীকধর্ম অবলম্বন ক'রে বুঝতে চায়। মূঢ় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিমানসে চিন্তাধারার গহনতা, সূক্ষ্মতা ও অখণ্ডতা পদে পদে প্রতীকধর্ম অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পায়না। বলিষ্ঠ ব্যক্তিমানস পূর্ণতার জন্য যে সুগভীর আস্পৃহা ভিতরে ভিতরে পোষণ করে তা সর্বদাই সমগ্রভাবে গহন গম্ভীর বেদনায় নিজের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বেদনায় বের হ'তে চায়, কোনও প্রতীকের কথা তখন ব্যক্তিমানসের স্মরণে থাকে না। তখন প্রতীককেও তার দুর্বলতা ব'লে মনে হয়। রবীন্দ্রমানস হ'চ্ছে এই মূঢ় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিমানস।

এই ব্যক্তিমানসকে সনাতনীরা বুঝে উঠ্‌তে পারে না ব'লেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাদের এই অবজ্ঞা ও উদাসীনতা।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে ঋক্‌বেদের ও উপনিষদের ঋষি কবিদের এই রকম পূর্ণতাপ্রবণ চিন্তাধারা ছিল। এই গহনগম্ভীর পূর্ণতাপ্রবণ ভাবরাজি যে সুগভীর আনন্দ-বেদনায় প্রকাশ পেত, সেই আনন্দ-বেদনার সমগ্র জীবনব্যাপী রোমাঞ্চ ও পুলক ব্যক্তিমানসকে এমন মানসিক বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করত, এমন একটা প্রশান্ত, উদার ও সুগভীর ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করত যেখানে প্রতীকধর্মী সংকীর্ণতা কোন সাড়াই পেত না। ঋক্‌বেদ ও উপনিষদের ঋষি-কবিদের পূর্ণতাপ্রবণ আবেগ-ব্যাকুল পরিপূর্ণ মনের ধারণা আমরা করতেই পারি নে। ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্ত ও দেবীসূক্তের কবিত্বে এর আভাস আমরা পেয়ে থাকি।

ঋক্‌বেদের ঋষি যখন প্রলয়ের অবস্থার বর্ণন ক'রে বলছেন—

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীম্
নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরোযৎ
কিমাবরীব কুহকস্য শর্মন্
অম্ভঃ কিমাসীৎ গহনম্ গভীরম্।"

তখন এর অপূর্ব গহন-গভীর দার্শনিকতায় না মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'য়ে থাকা যায় না। এই গহন গভীর দার্শনিকতা পরের যুগের কবিত্বে যেন লুপ্ত। এই কবিতা যেন পূর্ণ মনের বাহিরের কথঞ্চিৎ প্রকাশ। এই পূর্ণ মনে জগত ও জীবনকে নিয়ে ও তাকে অতিক্রম করে পরমাত্মার গহনগভীর পূর্ণতা অখণ্ডভাবে বিরাজিত। এই পূর্ণতাই ঋষিদের স্রষ্টার আসন দিয়েছে।

প্রতীকধর্মী পৌরাণিক সাহিত্যকে (যার মূল উৎস রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়) এই পূর্ণতা-প্রবণ চিত্তের ভগ্নাংশ ব'লে মনে হয়। এই পূর্ণ মনের দিকে (ঋষি-মনের দিকে) চিরন্তন অভিসারেই রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য রবীন্দ্রকাব্যের মূল ভাব ভূমি হচ্ছে উপনিষদ—মহাকাব্য রামায়ণ বা মহাভারত নয়।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মহাকাব্যের পরবর্তী যুগের সমস্ত কবিদের কাব্যে ঋগ্বেদ ও উপনিষদের গহন গম্ভীর ও অপূর্ব মহিমাময় কবিত্বের অনুপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। মহাকবিদের কাব্যে কোথাও এই নিরালম্ব প্রতীকশূন্য শুদ্ধ অথচ বলিষ্ঠ প্রকাশধারা আমরা দেখতে পাইনে। ঋগ্বেদের ও উপনিষদের কবিত্ব সেই যুগের সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। মহাকাব্যের কবি ও পরবর্তী যুগের কবিদের (মহাকাব্যের কবি বলতে বেদব্যাস ও বাল্মীকি নন্, মহাকাব্য অবলম্বন করে যাঁরা কবিতা লিখেছেন) কবিদের কবিত্বের ভাব-সন্তান ব'লে অনেক সময় মনেই হয়না। তবে এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। ঋগ্বেদের কবিত্বে আছে গহনতার ও গভীরতার অতলস্পর্শী সুষমা। আর উপনিষদের কবিত্বে এই গহনতা ও গভীরতা যেন অনেকটা পিছনে থেকে তার একটানা প্রবাহকে ধ'রে রেখেছে, আর তার উপর রয়েছে সৌষম্যিক মনের একটা নিবিড় ব্যাকুলতা। কিন্তু কি ঋগ্বেদ, কি উপনিষদ উভয়েতেই প্রতীকধর্মী আপেক্ষিক সম্বন্ধশূন্যতা এবং শুদ্ধতা ও বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে।

এবার আমাদের মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্। এই মূল প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা চল্‌লে আমরা এটা বুঝতে পারি যে বর্তমান যুগের রবীন্দ্র-পূর্ব কবিমানস মহাকাব্যীয় ও হিন্দুধর্মীয় জটিল প্রতীক ধর্ম ও স্থূল আপেক্ষিক সম্বন্ধের মাধ্যমেই সৌষম্যিক বিলাস করত। বেদ ও উপনিষদের ঋষিদের কবিমানস পরবর্তী যুগে নানা খণ্ড ও সংকীর্ণ উপকথা, গল্প, গাথা ও উপদেশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্যই তার প্রকাশের ধারা এবং কবিমানসকে চরিতার্থ করবার ধারা বেদ ও উপনিষদের নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ ও গহন-গভীর ধারা হ'তে পৃথক।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিমানস ঐ মহা-কাব্যীয়, জটিল প্রতীকধর্মী ও খণ্ডিত সৌষম্যিক কবি-মানসের ঠিক বিপরীত।

তাঁর কবিমানস গ'ড়ে উঠেছে উপনিষদের বলিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও জ্ঞানতন্ত্রীয় ব্যাপক সুষমা বোধে। রবীন্দ্রকাব্য পারমার্থিক নয়, সৌষম্যিক কিন্তু তার ভাবভূমি মহাকাব্য নয়, উপনিষদ। এইজন্যই ঔপনিষদিকভাবে অপেক্ষাকৃত অনভ্যস্ত সাধারণ সনাতনী হিন্দু সমাজে রবীন্দ্রকাব্য অপরিচিতের মত ঠেকে।

বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিকতা

শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আণবিক ও পরমাণবিক অস্ত্রের উৎপত্তির পর হতেই সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আন্তরিক আকুলতার সঙ্গে যে দুর্লভ পরিবেশটি আজ কামনা করছে, তা হচ্ছে শান্তির পরিবেশ। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে আণবিক এবং পরমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের আগে কি সাধারণ মানুষ শান্তি চায় নি? চেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সাধারণ অধিবাসীদের অন্তর্দৃষ্টি যে ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং দেশ-জাতি নির্বিশেষে "বিশ্বশান্তি" যেমন বিভিন্ন মানুষকে চিন্তার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য সূত্রে গ্রথিত করেছে, আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের আগে ঠিক এমনটি হয়নি। তাছাড়া তখনকার দিনে সাধারণ মানুষের চিন্তা এবং অনুভূতি কেন্দ্রীভূত হওয়ার মত অনুকূল সুযোগও লাভ করেনি। কারণ পৃথিবীর একটি বিরাট অংশ সেদিন পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর কয়েকটি অংশ এখনও সাম্রাজ্যবাদীর রাহুগ্রাস হ'তে মুক্তি পায়নি এবং সেই কারণেই বিশ্বশান্তির রাজনৈতিক প্রচেষ্টা পদে পদে বাধা পাচ্ছে।

এখন দেখা যাক বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার কতখানি ভূমিকা আছে। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার আধ্যাত্মিকতা কা'কে বলে।

অধ্যাত্ম সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্মযোগে বলেছেন:

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে!"

অর্থাৎ জগতের মূলকারণ ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মেরই জীবরূপে যে আংশিক প্রকাশ তারই নাম অধ্যাত্ম। তাহলে সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে জীব-দেহে ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশের বিশ্লেষণ এবং উপলব্ধিই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা।

আধ্যাত্মিকতার এই সংজ্ঞা হ'তে সহজেই বোঝা যায় যে বিভিন্ন জীবের মধ্যে যে আত্মিক একত্ব আছে, আধ্যাত্মিকতা তারই সন্ধান দেয়।

এবার দেখা যাক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজন এবং আধ্যাত্মিকতা এ বিষয়ে কতটুকু সাহায্য করতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে কয়েকটি অনুকূল কারণের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, সম্বন্ধবোধ এবং স্বার্থ-সাম্য। প্রধানতঃ এই কারণগুলির উপস্থিতি হ'তেই শান্তি জন্মলাভ করে।

আধ্যাত্মিকতা যে কেবলমাত্র জীবের আত্মিক একত্বের কথাই ঘোষণা করে তা' নয়, ঐ আত্মিক-একত্ব উপলব্ধি করবার উপযুক্ত নৈতিক পর্যায়ে আধ্যাত্মিকতা মানুষকে উন্নীত করে।

শান্তির যে বিরুদ্ধভাবগুলি মানুষকে যুগে যুগে রক্ত-কলঙ্কিত সংগ্রামের মুখে ঠেলে দিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে বৈরভাবই তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব-ইতিহাসের যুদ্ধবিগ্রহগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হব। বিজয়ীর বিরুদ্ধে বিজিত অথবা বিজিতের বিরুদ্ধে বিজয়ী জাতি এই বৈরভাব পুরুষানুক্রমে পোষণ করে এসেছে এবং তার জের এই সুদূরতা (?) বিংশশতাব্দীকেও কলঙ্কিত করেছে। এই বৈরভাব বিলুপ্ত হ'তে পারে একমাত্র সৌহার্দ্যের সাহায্যে। অতীতের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে বিজয়ী ও বিজিত জাতি যদি

পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পারে তবেই এই বৈরভাবের অবসৃতি সম্ভব হ'বে।

সৌহার্দ্য স্থাপনের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং সৌহার্দ্যকে বিষাক্ত করে তোলার রাজনৈতিক অপচেষ্টা যুগপৎ পৃথিবীর এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এই সৌহার্দ্য স্থাপনে এবং রক্ষণে কতখানি সক্ষম? বিশ্বশান্তি-প্রচেষ্টার ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করে যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচেষ্টা শান্তির ক্ষেত্রে স্থায়ী এমন কি দীর্ঘস্থায়ী সৌহার্দ্যও সৃষ্টি করতে অক্ষম। বার বার আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিভিন্ন মিত্র-সংস্থারও সৃষ্টি হয়েছে এবং শান্তি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু দু'দিন পরেই সে চুক্তি পদদলিত বিশ্লেষিত করা হয়েছে। অনেক সময় এই প্রকার শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কেবল পরবর্তী সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতির অনুকূলে পর্যাপ্ত অবসর লাভের আশায়।

এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা যথেষ্ট কার্যকরী হ'তে পারে। কারণ সৌহার্দ্য সম্ভব হয় এবং স্থায়ীত্ব লাভ করে একমাত্র আত্মিক একত্ব-বোধ ও নৈতিক উন্নতির সাহায্যে। আত্মিক একত্ব-বোধ একমাত্র আধ্যাত্মিকতা হ'তেই আমরা পেতে পারি এবং এই পথেই আমাদের নৈতিক উন্নতিও সম্ভব। আত্মিক-একত্ব-বোধ মানুষের বৈরভাবকে বিনষ্ট করে মৈত্রী-বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলে। শতশত যুদ্ধ এবং সন্ধি অ্যাংলো স্যাকসন ও খৃষ্টানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও মৈত্রী স্থাপন করতে পারেনি। মহান আলফ্রেডের যুদ্ধ-জয়েও তা' সম্ভব হয়নি। এই মৈত্রী সম্ভব হয়েছে সলিসবেরীর প্রান্তরে। নৌবাহিনী সৃষ্টি করে আলফ্রেড "Father of the English Navy" বা "ইংলণ্ডীয় নৌ-বাহিনীর জনক" হয়েছেন। কিন্তু মহান হয়েছেন তিনি সলিসবেরীর ধর্মসভা অনুষ্ঠান করে। এই আত্মিক একত্ব-বোধের পর হ'তেই ইংলণ্ডে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং কালক্রমে সমগ্র ইংলণ্ড এক জাতিতে পরিণত হয়েছে।

অশোকের যুদ্ধ-বিজিত দেশগুলি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু "ধর্ম-বিজয়ের" মাধ্যমে তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, বহুকাল পর্যন্ত সেখানকার লোকে অশোকের ঐতিহ্যকে জীবিত রেখেছে এবং এখনও অশোকের নামে তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নত করে। সাময়িক ভীতি, পরাজয় প্রভৃতির ভিত্তিতে যা' গড়ে ওঠে তা'ও সাময়িকের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকে এবং আত্মিক একত্ব-বোধের ভিত্তিতে যা' গড়ে ওঠে কোন শক্তিই তা'কে লুপ্ত করতে পারে না।

যুদ্ধবিগ্রহের দ্বিতীয় কারণ সাম্রাজ্যলিপ্সা। সাম্রাজ্যলিপ্সার পেছনে যে সব সময় অর্থনৈতিক কারণই থাকে সে'কথা বলা ভুল। প্রাচীনকালে, মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সীমারেখা যখন এতখানি বিস্তৃত হয়নি তখনও মানুষ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে অভিযান করেছে। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পেছনে কোন অর্থনৈতিক কারণ ছিল না। প্রশ্ন উঠতে পারে, এর পেছনে সাম্রাজ্যলিপ্সা আদৌ ছিল কিনা? আমি বলব ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভেতর না থাকলেও গ্রীক সেনাপতিদের মধ্যে এই সাম্রাজ্যলিপ্সা ছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরই বিজিত দেশগুলির বখরা নিয়ে তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে যে কলহ দেখা দিয়েছিল তা' এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। এ ধরণের সাম্রাজ্যলিপ্সা জন্মগ্রহণ করে অকারণ-প্রভুত্ব-লিপ্সা হ'তে। কখনও কখনও রাজনৈতিক চাপে অথবা কৌশলে পড়ে এই প্রভুত্ব-লিপ্সা সংযত থাকে। কিন্তু চাপ আল্গা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা' মাথা তুলে দাঁড়ায়। শা'জাহানের দৌর্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ, এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের "আর্মাডা"-অভিযান, ও আর্মানীর সাম্রাজ্যলিপ্সা এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে।

সাম্রাজ্যলিপ্সার দ্বিতীয় কারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজন। বৃটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এরা সবাই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ ধরণের সাম্রাজ্যলিপ্সা হ'তে কখনও কখনও দু'রকমের সংঘর্ষ দেখা দিয়ে থাকে। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীর এবং দ্বিতীয়তঃ একই দেশে সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে একাধিক সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে সংঘর্ষ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইংরাজ ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের সংঘর্ষের কথা সহজেই আমাদের মনে পড়ে।

সাম্রাজ্যলিপ্সার এই দুটি কারণের বিলুপ্তি সাধন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা যে সম্পন্ন হতে পারেনা ইতিহাস সে সাক্ষ্য শোণিতাক্ষরে বহন করছে। প্রথমতঃ অকারণ প্রভুত্বের নেশা আদিম যুগ হতে মানুষের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। এর অবসানের জন্যে প্রয়োজন মানবিক মনোবৃত্তির বিবর্তন। রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এই মনোবৃত্তিকে সংযত করতে পারে—বিবর্তিত করতে পারে না। হাজার হাজার বছরের রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের ফলে মানুষের আদিম-প্রকৃতি কিছুটা সংযত হয়েছে মাত্র—বিবর্তিত হয়নি। নইলে এই আধুনিক যুগেও মানুষ, মানুষের রক্তে রঞ্জিত হতে চায় কেন?

দুর্বল মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে তার ওপর প্রভুত্ব-লিপ্সা চরিতার্থ করার মনোভাব যদি সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং সমানবোধের মনোভাবে পরিণত হয় তবেই এর অবসান হবে। আধ্যাত্মিকতা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। কারণ এ দুটি মনোবৃত্তিও জন্ম নেয় আত্মিক একত্ব-বোধ হতে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্বার্থ-সাম্য-প্রতিষ্ঠিত হলে, সাম্রাজ্যলিপ্সার দ্বিতীয় কারণটিকেও বিনষ্ট করা যায়। বিভিন্ন বাণিজ্য-চুক্তি বার বার স্বাক্ষরিত হয়েছে এই স্বার্থ-সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু এর অনুকূলে উপযুক্ত পরিমান উদারতা এবং সহানুভূতির অভাব থাকায় বার বার সে-সব চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিকতা কার্যকরী হতে পারে। কারণ উদারতা এবং সহানুভূতি আসতে পারে একমাত্র অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পথে। কারণ একত্ব-বোধ যেখানে রয়েছে স্বার্থের সংকীর্ণ দ্বন্দ্ব সেখানে থাকতে পারে না।

অনেকে মনে করেন ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বিপুল জনসংখ্যার স্থান সংকুলান না হওয়াও সাম্রাজ্য সৃষ্টির একটি কারণ। আমেরিকায় এই কারণেই উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই বিদেশীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য কয়েকটি দেশে এখনও এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাব পোষণ করা হয়। এক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিকতা সাহায্য করতে পারে। ভারতবর্ষ যে যুগে যুগে পৃথিবীর সকল জাতির মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে তার কারণ ভারতের রক্তে রক্তে আধ্যাত্মিকতার প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হয়ে তাকে জাতি-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছে।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচেষ্টা "বিশ্বশান্তি" প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না। রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে।

যদি বিশ্বের সকল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের মতবাদের বিভিন্নতার ঊর্ধ্বে থেকে বিশ্বশান্তির কাজে একযোগে সচেষ্ট হন তবেই বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে উঠবে। বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান যদি তাঁদের অনুগামীদের শান্তির জন্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক যোগ স্থাপনের সহায়তা করেন তবে আমার মনে হয়—এত বছরের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা যা করতে পারেনি সেই সর্বজনকাম্য বিশ্বশান্তি সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল

আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। এই সহযোগিতা যদি গড়ে ওঠে তবে ব্যাপক আধ্যাত্মিক আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বধর্ম (Universal Religion) এবং বহুআকাঙ্ক্ষিত বিশ্বরাষ্ট্র (One world) জন্মলাভ করে মানব সভ্যতাকে চরমবিকাশের স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান রাজনীতি আধ্যাত্মিকতাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অনেক রাজনীতিক মনে করেন যে আধ্যাত্মিকতা হতে বৈষম্য এবং বিভেদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটি বর্তমান রাজনীতিকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা। বৈষম্য এবং বিভেদ যথার্থ আধ্যাত্মিকতা হতে জন্মলাভ করে না—আধ্যাত্মিকতার বিকৃতি হতেই এদের জন্ম। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতির বিকৃতি হতে যে কোন মুহূর্তে একনায়কত্ব, স্বৈরতন্ত্র জন্মলাভ করতে পারে। তবে কি গণতন্ত্রকে দূরে সরিয়ে দোব? সমাজতন্ত্রকে নির্বাসিত করব?

আধ্যাত্মিকতার জনক ভারতবর্ষের রাজনীতিকরাও এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের এতকালকার নাড়ীর-বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বয়ের দূত হয়ে ভারত-গৌরব বিবেকানন্দ বিশ্বময় বিশ্বধর্মের যে বাণী প্রচার করেছিলেন এবং ভারতকে তাঁর অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে "ধর্মসাম্রাজ্য" স্থাপনের জন্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, বর্তমান ভারত মূঢ়ের মত সে কথা ভুলে গিয়ে গড্ডলিকা প্রবাহের অনুসরণ করে প্রগতির উন্মাদনায় পরম তৃপ্তির সঙ্গে বিপথে এগিয়ে চলেছে।

বিশ্বের যে কোন রাজনীতিক বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সফলতার কথা যত জোর গলাতেই ঘোষণা করুন না কেন, একথা ঠিক যে আধ্যাত্মিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে যন্ত্র-সর্বস্ব সভ্যতা সম্বল করে "ইজ্‌ম"—কণ্টকিত রাজনৈতিক প্রচেষ্টা কোনদিনই মানবিক মনোবৃত্তির বালুচরের উপর স্থায়ী শান্তি সৌধ নির্মাণ করতে পারবে না। সে শান্তি-সৌধ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিকতার দৃঢ় ভিত্তির উপর। কারণ যন্ত্রই মানুষের মধ্যে এনেছে শ্রেণী-বিদ্বেষ (এমন কি "শ্রেণী" কথাটিও সৃষ্টি করেছে যন্ত্র), আর "ইজ্‌ম" তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। "ইজ্‌ম" চায় শ্রেণীগত-মঙ্গল; বিশ্বমানবের মঙ্গল কামনা করবার মত বিরাট হৃদয় "ইজ্‌মের" নেই।

আজ তাই বহুধা বিভক্ত মানবসমাজকে একত্রিত করবার জন্যে আধ্যাত্মিকতাকে এগিয়ে আসতে হবে।

যদিও নৈরাশ্যের অন্ধকার আজ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘনীভূত হচ্ছে, তবুও আশাবাদী আমরা—মনুষ্যত্বের বিলুপ্তি আমরা বিশ্বাস করি না—আমরা বিশ্বাস করি যে এ শুধু মানুষের আত্মবিস্মৃতি।

চারিপাশের এই অন্ধকারের মধ্যে, আমাদের সামনে ধ্রুবতারকার জ্যোতি নিয়ে জ্বল জ্বল করছে স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী :—

"...Teach yourselves, teach everyone his real nature, call upon the sleeping soul to see how it awakes. Power will come, glory will come goodness will come, purity will come and everything that is excellent will come when the sleeping soul is roused to selfconscious activity."

"নিজেকে শিক্ষা দাও, সকলকে শিক্ষা দাও তাদের প্রকৃত-সত্তা সম্বন্ধে, নিদ্রিত আত্মাকে ডাক দিয়ে দেখ সে কেমন জেগে ওঠে। শক্তি আসবে, গৌরব আসবে, আসবে শুভ-চেতনা, আসবে পবিত্রতা এবং যা কিছু সুন্দর তা' সবই আসবে, নিদ্রিত আত্মা যখন আত্ম-চেতনার কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।"

গুরু-বিশ্বাস

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর,"—এই প্রচলিত বাণী আপামর সর্ব্বসাধারণের জানা আছে। কিন্তু এমনও মানব-চিত্ত আছে, যে চিত্তে 'বিশ্বাস' কিছুতেই স্থান পায় না; কারণ তাহাদের চিত্ত সদাই সন্দিগ্ধ ও সংশয়াপন্ন। যেমন, কতিপয় এমন ছাত্র আছে—যাহারা স্কুলে সারা বৎসর বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকে ও বাৎসরিক পরীক্ষায় বারংবার ফেল করিয়া শিক্ষকদের ও স্কুলের উপর দোষ দিয়া অন্যান্য স্কুলে ঘুরিয়া ফিরিয়াও কিছু করিতে না পারিয়া শেষে পড়া ছাড়িয়া দেয়; অথবা যেমন অগ্নিমান্দ্য ব্যক্তি নানাবিধ ব্যঞ্জন চাখে মাত্র, কিন্তু আহার করে না, পরে রন্ধনের দোষ দিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যায়, ঠিক সেইরূপ গুরু-চাখা এমন শিষ্য আছে—যাহারা গুরুমন্ত্রে আস্থা বা গুরুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া এ-গুরু ও-গুরুর দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে; তাহাতেও কিছু করিতে না পারিয়া অবশেষে সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া একেবারে নাস্তিক হইয়া পড়ে এবং গুরুদের প্রতি দোষারোপ করিতে পঞ্চমুখ হইয়া থাকে। এইরূপ চিত্তসমন্বিত ব্যক্তিদের গুরুকরণ না করাই শ্রেয়।

গুরুকরণ সখের ব্যাপার নহে; ইহাতে এমন বাধ্যবাধকতাও নাই যে না করিলে সামাজিক শাস্তি পাইতে হইবে বা রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হইবে। অভিভাবকগণ নিজ নিজ পুত্র-পৌত্রদের পাঁচ বৎসর বয়সে সচরাচর পাঠশালায় পাঠাইয়া দিয়া থাকেন; এখানে শিশুকুল বাধ্য হইয়াই পাঠশালায় যায় ও গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। গুরুকরণ কেহ অভিভাবকের তাড়নায় বা সামাজিক প্রয়োচনায় করে না; সে বিশেষভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া ও বিবেচনা করিয়াই তাহা করে। এ অবস্থায় তাহার গুরুর আদেশ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যদি তাহা না করে, তবে তাহাকে অনাচারী ও আগম-বিরোধী বলিতেই হইবে—ইহা আস্তিক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন।

গুরুকরণের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—অন্ধকার হইতে আলোকে পৌঁছান। 'গু' অর্থ অন্ধকার; 'রু' অর্থ আলোক। যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে পৌঁছাইয়া দেন, তিনিই গুরু। (ক) 'গু' শব্দস্তমঃ স্যাৎ 'রু' শব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকার নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ (খ) 'গু'কারো প্রথমোবর্ণশ্চান্ধকার প্রকাশকঃ। তন্নিরোধস্তু বিজ্ঞেয় 'রু'কার ইতি বর্ণকঃ। (গ) গুরু-প্রণামে মন্ত্র—"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য" ইত্যাদিতেও গুরুর তাৎপর্য্য উক্ত হইয়াছে।

এই গুরু দুই প্রকার। এক—শিক্ষাগুরু, অপর—দীক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু শিষ্য বা ছাত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া ছাড়িয়া দেন; কিন্তু দীক্ষাগুরু শিষ্যকে ইহকাল-পরকালের, ঈশ্বর-তত্ত্বের এবং মোক্ষলাভের বার্ত্তা ও পথ জানাইয়া দেন। পাঠশালায় হউক বা স্কুল কলেজেই হউক, শিক্ষাগুরু যেরূপ আদেশ করিবেন, ছাত্রকে তাহা করিতেই হইবে; সে যদি তাহা না করে, তবে তাহার শিক্ষাই হইবে না। সেইরূপ, দীক্ষাগুরু নিজ শিষ্যকে আদেশ করেন, সংযমপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে জপ, ধ্যান ও ধারণা করিতে। শিষ্য যদি তাহা না করে তাহা হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতেই পারিবে না। ইহার জন্য গুরুকে দায়ী করা চলে না; দায়ী—শিষ্য নিজে। ইহা সত্ত্বেও শিষ্যপ্রবর গুরুকেই নিন্দা করে, এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

রুগ্ন ব্যক্তিকে যেমন চিকিৎসকের নিকট,

ছাত্রকে যেমন অধ্যাপকের নিকট, সাপুড়েকে যেমন ওস্তাদের নিকট বিনীতভাবে থাকিতে হয়, কথা শুনিতেও আদেশ পালন করিতে হয়, তেমনি চৈতন্য-তত্ত্ব শিক্ষার জন্য শিষ্যকে গুরু-সমীপে নতশিরে ও আত্মসমর্পণে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকিতে হয় এবং তাঁহার আদেশানুযায়ী জপ-ধ্যান ও যোগাভ্যাস করিতে হয়, তবেই আত্মোন্নতি ও শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক সাধারণ গৃহী-শিষ্য চাহে, এক নিঃশ্বাসে যোগী, জ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞ হইতে বা সমাধিলাভ করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিতে—যাহা একেবারেই অসম্ভব। একটি লম্ফ প্রদানে অষ্টরলোনী মনুমেণ্টের শিখরে পৌঁছান যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু এক নিঃশ্বাসে সমাধিলাভ বা ঈশ্বর-দর্শন কখনও সম্ভব নয়। তাহারা বুঝিতে চাহে না, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় অপাপবিদ্ধ আধারকেও জগজ্জননীর দর্শনলাভের জন্য কিরূপ দুষ্কর তপস্যা ও অসাধ্য সাধন করিতে হইয়াছিল।

আধুনিক সাধারণ শিষ্যদের এইরূপ মনোভাব কেন হইল? উত্তরে—সরলভাবেই বলিতে হইবে যে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ইহার জন্য যথেষ্ট দায়ী। ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের নানা উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু অন্যদিকে এই শিক্ষার ফলে হিন্দু-ধর্ম্ম ও আচার বিষয়ে ক্ষতিও হইয়াছে বিস্তর। আমাদের সন্তানদের ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্কুলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা জাতীয় উন্নতির জন্য বিহিত শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা নাই। বাল্যকাল হইতে সুকোমল-মতি বালক-বালিকারা যদি নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহারাই যৌবনে সুনীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক হইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়—ঐ সব বালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পায় নাই। আর গৃহে অভিভাবকদের চিত্ত অনুধাবন করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাঁহারাও চাহেন ছেলেরা কোন গতিকে যতশীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটা ছাপ লইয়া যে কোন স্থানে একটা চাকুরী পাউক, তাহা হইলেই ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষরূপী পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ হইবে। ইহাই যখন বাহিরের ও গৃহের অবস্থা—তখন যুবকদের বা বিশেষ দোষ কি? তাহারা স্কুল কলেজে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা পাইল না এবং গৃহেও পাইল না,—পাইল শুধুমাত্র পাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের অনুজ্ঞা। সেই অনুজ্ঞানুযায়ী তাহারা নানা উপায়ে, কৌশলে অর্থোপার্জ্জনই করিতেছে। তাহাদের মধ্যে সুনীতি ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিবার আশা করা মরুভূমিতে জলের আশা করার ন্যায়। গুরু, পুরোহিত, শিক্ষক—এমনকি জনক-জননীর প্রতি ইহাদের ভক্তিহীনতা, অবজ্ঞা প্রভৃতি দেখিলে তাহা আশ্চার্য্যের বিষয় হইবে কি? তাহারা যৌবনাবস্থায় যেরূপ বৃহৎ পাঠ্যগ্রন্থ-সমূহ অধ্যয়নের ক্লেশ এড়াইয়া সংক্ষিপ্তসার (নোটবই) কণ্ঠস্থ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ সহজ উপায়ে ঈশ্বর প্রদর্শক বা সমাধিলাভ নির্দ্দেশক চটকদার গুরু খুঁজিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। মনুষ্য রীতিই হইতেছে,—অনায়াসে, কষ্টায়াসে বা আয়াসে যদি কার্য্য সমাধা করিতে পারে তবে সে বেশী আয়াসের মধ্যে যাইবে না। সেইজন্যই কেহ কেহ খুঁজিলে এমন গুরু খুঁজিবে, যিনি যথেচ্ছ আহার, বিহার, নিদ্রা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে শিষ্যকে কাম্য বস্তু লাভ করাইতে পারিবেন।

এইরূপ গুরুরও অভাব হইবে না। এই ঘোর কলিকালের বিংশশতাব্দীতে একটা মহাসুযোগ ঘটিয়াছে। হাটে, মাঠে, বাটে, ঘাটে বহু 'বাবা মণি' ও 'মা মণির' আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা মাত্রেই ভক্তদের সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য—এমন কি মহানির্ব্বাণও করামলকবৎ হইয়া থাকে।

এখানে একটি সত্য ঘটনা বিবৃত হইতেছে (এবং ইহাই আমাকে এই প্রবন্ধ লেখায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে): জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একদিন প্রাতে এক দণ্ডকমণ্ডলু ও গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী, বলিয়া হবে

তাঁহার এক শিষ্যসহ উপস্থিত হন। এক সন্ন্যাসীর শিষ্য ঐ ভদ্রলোক; তাই নিজ বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসীর আগমন দেখিয়া তাঁহাকে আসন-পাদ্যাদি দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি চা পান করিবেন কিনা। সম্মতি পাইয়া চা-বিস্কুট খাইতে দিয়া পাখা দ্বারা ব্যজন করিতে থাকিলেন। পাশেই খোলা আলমারীতে ভদ্রলোকের কতকগুলি বই ছিল। যথা: ন্যায় ও বেদান্ত দর্শন, পাতঞ্জল ও মীমাংসা, তীর্থরেণু, মনের বিচিত্র রূপ, Spritual unfoldment, Divine Horitage of man, স্বামী বিবেকানন্দের Complete works ৭ খণ্ড, Romain Rolland লিখিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর জীবনী প্রভৃতি। সাধুজী কোন কোন বই দেখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দীক্ষা হোয়েছে কি?" "৩০ বা ৩২ বৎসর আগে হোয়েছে।" "কার কাছে?" "বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীর কাছে।" "যোগ টোগ কিছু শিখিয়েছেন কি?" "না; জপ ধ্যান করতেই আদেশ করেছেন।" "ও'তে কিছু হবে-টবে না। তোমার গুরুকে বল'—তোমায় যোগ শেখাতে। যোগ না শিখলে দর্শন টর্শন হবে না।" "আমার গুরু দেহত্যাগ করেছেন" "বেশ ত, তাতে কি হয়েছে? তুমি যদি শিখতে চাও, আমি যোগ শেখাতে পারি।" মনে বিরক্ত হইলেও ভদ্রলোক হাসিমুখে বলিলেন, "আমার যেমন প্রয়োজন, গুরু তেমন নির্দ্দেশই দিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি মরতে চাই।"—আরো অনেক কথা হইয়াছিল। ভদ্রলোক সাধুজীর স্নান-আহার-বিশ্রামের ব্যবস্থা সাধ্যমত করিলেন। বৈকালে সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় সিগারেট টানিতে টানিতে একান্তে গৃহস্বামীকে বলিলেন, "দেখুন, আমি আগে পরপর দু'জন সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, তাঁদের কথামত কাজ করে কিছু লাভ না হওয়ায় দু'বছর আগে এঁর কাছে দীক্ষিত হই। এর মধ্যেই অনেক কিছু পেয়েছি। আপনি যদি শিষ্য হতে চান, তবে আমি এঁকে একবার জোর করে' ধরে' বলি।" ভদ্রলোক সবিনয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া সশিষ্য সাধুকে আর একদফা চা-সিগারেট এবং নগদ এক টাকা দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ও অযাচিত উৎপাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কোন কোন সরল বিশ্বাসী ব্যক্তি এই জাতীয় সাধুর বাগ্-বিভূতিতে বিভ্রান্ত হন, ইহা মিথ্যা নহে। প্রকৃত ধর্ম্মবোধ জনিত মনের দৃঢ়তা না থাকায় কোন কোন হতভাগ্য বা অতিচালাক ব্যক্তি পূর্ব্বে একবার কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ সত্ত্বেও সস্তায় বাজিমাতের আশায়—উক্তরূপ চালবাজ গুরুর নিকট পুনরায় দীক্ষিত হন। ইহা নাস্তিকতারই নামান্তর।

এই দিক দিয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যে-ত্রুটির জন্য দায়ী করিতে হয়, তাহার সূত্রপাত এদেশে বিচিত্র ইংরেজ জাতির প্রভাব বিস্তারের পর হইতে। তাহার পূর্ব্বে বহিরাগত ও ধর্ম্মে মুসলমান জাতি এদেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছে। উগ্র ধর্ম্মান্ধতা লইয়া ইহাদের অনেকে বিজাতীয় হিন্দু-ধর্ম্মের উপর অকথ্য আঘাত হানিয়াছে। কিন্তু তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের মূল নষ্ট হয় নাই। অত্যাচারী বিজেতার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে শ্লেচ্ছাচার আখ্যা দিয়া হিন্দুগণ তৎপ্রতি বিরূপ মনোভাবই পোষণ করিয়াছে; ভয়ে অশ্রদ্ধায় উহাদের ছায়াও এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছে; আপন ধর্ম্মের মনিমঞ্জুষা কূর্ম্মের হাত-পায়ের মত নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া উহা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ আমলে অন্যরূপ ঘটিয়াছে। তাহারা ছলেবলে কৌশলে পর পর রাজা মহারাজা, নবাব-বাদশা'দের রাজ্য দখল করিল কিন্তু হিন্দুদের মন্দির বা মুসলমানদের মস্‌জিদ্ ধ্বংস করিল না; মন্দিরে গো-হত্যা কিম্বা মস্‌জিদে শূকর হত্যা করিল না; রাণী-রাজকন্যাদের বা বেগম-সা'জাদিদের নির্য্যাতন করিল না; জোর করিয়া রাজা মহারাজাদের মুখে গোমাংস বা

মহারাজাদের মুখে শূকর মাংস পুরিয়া দিয়া তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিল না—যাহা মুসলমান রাজত্ব কালে প্রায়ই ঘটিত। ইংরাজদের অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকে একবাক্যে স্বীকার করিল যে ইহারা প্রকৃত ধার্মিক—কারণ অপরের ধর্মে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করে নাই এবং নারীদের মান-সম্ভ্রম ও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছোঁয়াচে সকলেই মুগ্ধ হইল। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে রাজানুকূল্যপুষ্ট পাদ্রীদের সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রচারের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে ইহাদের খৃষ্টানধর্ম বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। ইংরেজ আমলে এইভাবে হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে এবং বহুলোকের চিত্তে নানারূপ সংশয় বাসা বাঁধিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "Why are some our customs called evil? Because the Europeans say so." ইউরোপীয়দের কথাই যেন বেদবাক্য।

এইবার মানব-স্বভাবসিদ্ধ সংশয়ের কথা বলি। সংশয়কে একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শঙ্করভাষ্য বেদান্ত দর্শনের আলোচনায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন, "নিশ্চয় সংশয় সাপেক্ষ। সংশয় না থাকিলে নির্ণয়েচ্ছা অথবা বিচারপ্রবৃত্তি কিছুই হয় না।...সংশয় নাই, প্রয়োজন নাই, অথচ বিচার—এরূপ হয় না।" সংশয় হইতেই যত কিছু হিন্দুদর্শন ও শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিস্তার। ষড়দর্শনে, পুরাণে, গীতায় তাহার প্রমাণ পাই। ঋষিগণ নিজ নিজ মত শিষ্যদের মধ্যে জোর করিয়া প্রচার বা চালিত করেন নাই। তাঁহারা জিজ্ঞাসুকে তর্ক করিতে যথেষ্ট অবসর দিয়াছেন এবং কোথাও সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরসনের চেষ্টা যোগ্যতার সহিতই করিয়াছেন। সংশয় দার্শনিক আলোচনার মূল কিন্তু উহা ঐ আলোচনার চরম উদ্দেশ্য নহে। সংশয়েরও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে,—তাহা অতিক্রম করিলেই যত অনর্থ ঘটিয়া থাকে। যথা, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির জন্ম সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হয়, তাহা হইলে অনিবার্যরূপে ও বিধিমতেই বিপর্যয় দেখা দিবে। মাত্রাতিরিক্ত সংশয় বিনাশের হেতু। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—(গীতা)।

এখন বেশীরভাগ মূলকেই এই সর্বনাশা সংশয়ের কবলে পতিত হইয়া গুরু ও বেদবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়া এক গুরুর পর (তিনি সন্ন্যাসী গুরু বা গৃহীগুরু যাহাই হউন না কেন) আর এক স্তুই ছোড় গুরুর অথবা তৎসদৃশ একাধিক গুরুর সমীপে পর পর আনাগোনা করিয়া থাকে কিম্বা একেবারেই নাস্তিক হইয়া গুরু ও ধর্মাচারের প্রতি বিদ্রূপ ও কটাক্ষপাত করিয়া থাকে।

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ সত্যসত্যই অপূর্ব এবং পরম পবিত্র, যাহা পিতাপুত্রের সম্বন্ধেরও অধিক মহীয়ান ও গরীয়ান। পিতামাতাও গুরু, ইহা অবশ্য-স্বীকার্য; কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে তথায় কিঞ্চিৎ স্বার্থের গন্ধ আছে। শুকদেব যখন গৃহত্যাগ করেন তখন জ্ঞানের আকর ব্যাসদেবকেও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইয়াছিল; হিন্দুধর্মের মহান আচার্য শঙ্করাচার্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তাঁহার জননী কিরূপ বাধা দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই জানা আছে; বৈষ্ণব ধর্মের প্রতীক চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে শচীদেবীও কত কি বলিয়াছিলেন যাহা বৈষ্ণবমাত্রেরই জানা আছে। এই সবের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক বিন্দু স্বার্থের লেশও ছিল না, এই কথা কি কেহ সরলভাবে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন? কোন জনক-জননী পুত্রকে পরম-পদ বা মোক্ষ লাভের জন্য হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন কি? কেন যেন নাই? ঐ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও মায়ার জন্য। কিন্তু প্রকৃত স্থিত-প্রজ্ঞ গুরু তাহাতে বাধা ত দেনই না, বরং সানন্দে বৈরাগ্যপ্রবণ শিষ্যকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিয়া

P30406

পরমার্থ লাভের পথ দেখাইয়া দেন। এইখানেই পিতাগুরু বা শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর মধ্যে আছে বিরাট পার্থক্য।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলেই নিজ নিজ মোক্ষলাভের জন্য দায়ী। পিতা নিজ মোক্ষ লাভের জন্য দায়ী, মাতা নিজ মোক্ষ লাভের জন্য দায়ী, পুত্র নিজ মোক্ষ লাভের জন্য দায়ী, কিন্তু প্রকৃত গুরু শিষ্যের মোক্ষ লাভের জন্য দায়ী, সুতরাং গুরুর দায় জনক-জননীর দায়ের তুলনায় বহুগুণ অধিক, যাহা আমরা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি। তিনি ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, আভিজাত্যের ও অন্ত্যজের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই, সকলকেই সমানভাবেই কৃপা বিতরণ করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি "গুরু" সাজেন নাই, "বাবা" সাজেন নাই। তাঁর কথা ছিল "আমি কা'রো গুরু নই, আমি সবারই শিষ্য; আমি কা'রো বাবা নই, আমি সবলেরই সন্তান।" আমরা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগত্রয়ের কথা জানি না, তবে এটা জানি যে এই ঘোর কলিযুগে কোন গুরুর মুখে এইরূপ কথা শুনি নাই। আমরা জানাইতে চাহি যে গুরুর এইরূপ দায়িত্ব নির্ভর করে শুধুমাত্র শিষ্যের অটল ও ঐকান্তিক বিশ্বাসের উপরেই; ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত গিরীশ ঘোষ। গুরুকে বিশ্বাস না করিলে কস্মিনকালে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, নাই—নাই। গুরুই একমাত্র ইহ ও পরলোকের পথপ্রদর্শক, সুতরাং তাঁহাকে মানিতে হইবে, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে এবং তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতেও হইবে। ভাবের ঘরে চুরি চলে না। যে শিষ্য নিজ গুরুকে রক্ত, মাংস ও অস্থি সমন্বিত সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে দেখিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কার্য্য,—তাহা ইহলৌকিকই হউক আর পারলৌকিকই হউক, নষ্ট হইয়া যায়। কারণ শাস্ত্রে আছে—"গুরৌমনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রেচাক্ষরভাবনং। প্রতিমাসু শিলা-বুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ"—গুরুকে মানুষ, মন্ত্রকে অক্ষরমাত্র এবং প্রতিমাকে শিলা মনে করা ঘোর অকল্যাণকর।

গুরু এবং ঈশ্বরে অভেদজ্ঞান করাই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত অভিপ্রায়। "শিব এব গুরুঃ সাক্ষাদ্ গুরবে শিবরূপিণে। উভয়োরন্তরং কিঞ্চিন্ন দ্রষ্টব্যং মুমুক্ষুভিঃ।" গুরুর কার্য্য বা কথার বিচার করিতে নাই। বিদ্যাবুদ্ধিপ্রসূত যুক্তির বাহিরেও সত্য থাকিতে পারে; কারণ, যুক্তের মুখ হইতেও কথা বাহির হয়, অন্ধও দর্শন করিয়া থাকে, অন্ধকবিরও শুনিতে পায়। ইহা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও উক্তিতে আছে। তিনি একদা দেখাইয়াছিলেন, গরুর পায়ে সাদা জুতা হইয়াছিল।

আমরা চক্ষু থাকিতে প্রায় অন্ধ; শিক্ষাপ্রদীপের ব্যাপার চক্ষে দেখিয়াও দেখি না; আমরা যেন বধির —শতবার শঙ্খ নিনাদে তত্ত্বকথা শুনাইলেও শুনি না; এমনই বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছি যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আসিয়া বুঝাইলেও কিছু বুঝি না। তাহার উপর যদি একটু ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার জ্ঞান থাকে তাহা হইলে ভাষার রংমশালে ব্যাসবশিষ্ঠেরও শিক্ষাগুরু সাজিতে পারি; আবার তাহার উপর যদি কিছু অর্থ থাকে ত কথাই নাই, চটকদার উপন্যাস লিখিয়া ত্রয়স্ত্রিংশকোটী দেব-দেবীদেরও পরাস্ত করিতে পারি।—কিন্তু হায়, অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস— আমরা থাকিয়া যাই "যে তিমিরে সেই তিমিরে।" ইহার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে সরল ও সোজাভাবেই বলিতে হইবে যে, যে সব ভাব ধর্ম্মপথের প্রতিকূল, ধর্ম্মপথের আবর্জ্জনা ও ধর্ম্মপথের কণ্টক-স্বরূপ, তাহাকেই আমরা জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া স্থির করিয়াছি—সারবস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি এবং ইহ ও পরকালের জীবনকাঠি-মরণকাঠি বলিয়া ধ্রুব নিশ্চিত করিয়াছি,—কাজেই আমাদের অন্ধ, বধির ও উন্মাদ হইতে হইয়াছে। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য—ইহাদের মধ্যে

কামই অত্যন্ত প্রবল। এই কাম অর্থে কামনা, আর এই কামনার প্রধান বিষয় হইতেছে কামিনী আর কাঞ্চন। কামিনী আর কাঞ্চন সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটিবার উপক্রম হইলে দশদিক অন্ধকার দেখি এবং যদি যৎসামান্যও বিঘ্ন ঘটিয়া যায় তাহা হইলে আমরা মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ি। এই ভাব এতই প্রবলভাবে আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে যে প্রতিবেশী হউন, বন্ধু হউন, বান্ধব হউন, ভাইবন্ধু, শ্বশুরাত, মাতুল হউন, এমন কি পিতা, মাতা, গুরু বা ইষ্ট যাহাই হউন না কেন, যিনি আমাদের একান্ত বাঞ্ছিত কাম-কাঞ্চন-ভাবের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিবেন, তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিব ও সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিব। ইহাই আমাদের চিত্তের প্রকৃত অবস্থা, অতএব দীক্ষা গ্রহণের পর মুহূর্ত্তেই সমাধি লাভ করিয়া "ভুঁইফোড় বাবা" সাজিতে চাহি, সমাধিলাভ না হইলেই দুঃখে ও ক্রোধে গুরুর স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া মুখভারি করিয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকি আর মনে মনে সঙ্কল্প করি অন্তর্যামীকরণের জন্য, যিনি এক কথায় নির্ব্বিকল্প সমাধি ঘটাইয়া দিবেন।

যে শিষ্যের জপ করিবার ধৈর্য্য নাই, ধ্যানে বসিবার অবসর নাই, গুরুর প্রতি বিশ্বাস নাই, তাহার কি হইতে পারে? একেই ত চিত্ত কামকাঞ্চনের ভাবে কলুষিত, তাহার উপর যদি গুরুর প্রতি বিশ্বাস না থাকে ত তাহার দীক্ষাগ্রহণও হয় মিথ্যা আর জীবনও হয় ব্যর্থ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পয়সা খরচ হয় না। শুধু দরকার হয় মনের,—সেই মনেরই কার্য্য হইবে গুরুর প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন। দৃঢ় বিশ্বাসের যে কি অসাধারণ ক্ষমতা তাহা মুখে বলা যায় না, লিখিয়াও জানান যায় না। মহাবীর রামভক্ত হনুমান একটি লম্ফে সাগর পার হইয়াছিলেন, একলব্য দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ারি করিয়া ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কবীর অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, পদ্মপাদাচার্য্য গুরু-বিশ্বাসের বলেই পদব্রজে গভীর খরস্রোতা নদী পার হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে নির্ভিকতার একাধিক রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (১) আমিষা-গুমিষা ও হাঙ্গরকুম্ভীরপূর্ণ প্রণালী তে সাঁতরাইয়া তিনি "কন্যাকুমারী মাতার" মন্দির হইতে সমুদ্র মধ্যস্থ পাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন যাকে বলা হয়—Vivekananda rock. উৎসুক ব্যক্তি "The life of Swami Vivekananda" by his Eastern and Western Disciples এবং ফরাসী লেখক Romain Rolland লিখিত "Life and Gospel of Vivekananda" — গ্রন্থদ্বয়ে এবিষয়ে বর্ণনা পাইবেন। (২) প্রব্রজ্যাকালে রাজপুতনায় একদা ঘটনাক্রমে স্বামীজীকে এক গভীর জঙ্গলে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর অবসন্ন ছিল; তবু ধ্যান-রূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়া আসন পাতিয়া বসিলেন। হঠাৎ শুষ্ক পত্রের শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, দুইটি জ্বলন্ত চক্ষু তাঁহার দিকে নিবদ্ধ। বুঝিতে পারিলেন, উহা সিংহের চক্ষু। ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীর সন্ন্যাসী ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। ঐ ভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিল; প্রভাতে ধ্যান ভঙ্গে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও সিংহ নাই। (৩) আমেরিকাতে কোন হোটেলওয়ালা তাঁহাকে স্থান দেয় নাই, বরং বলিয়াছিল "Let the devil die of cold". রাত্রিতে বাহিরের প্রচণ্ড শীতে রক্ত জমিয়া মৃত্যু ঘটিবে বুঝিয়া তিনি ষ্টেশনে একটি প্যাকিং বাক্সে প্রবেশ করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। Romain Rolland লিখিয়াছেন,—"The devil neither died nor gave up".

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত কয়টিতে স্বামীজীর অসাধারণ বীর্য্যবত্তার এবং প্রায়-নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুর প্রতি তাঁহার

মুমেরু-অটল বিশ্বাস এবং তৎফলে তাঁহার প্রতি গুরুর কৃপাকেই এখানে কারণ বলিতে হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "Vivekananda was a very lion among men". রোঁমা রোঁলা অকুণ্ঠ লিখিয়াছেন, "……within him there was a Napoleon." নেপোলিয়োঁ পরীক্ষা প্রমাণ যাচাইয়ে যাইতেন না; স্বামিজীও তাই। আমরা বলিব, ফরাসীবীর অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, আর হিন্দুবীর ছিলেন গুরুবিশ্বাসের উপর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, যে গুরুকে বিশ্বাস করিতে পারিবে, সে বিনা সাধন-ভজনে, বিনা যোগে-তপশ্চরণে জীবন্মুক্ত হইয়া আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশ করিবে। গুরু-বিশ্বাস ছাড়া কল্যাণ নাই, গুরু বিশ্বাস ছাড়া কাহারও কামিনী কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই, গুরু-বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বর-দর্শনের অন্য পন্থা নাই। গুরু ও ইষ্ট এক'—এই বিশ্বাস যাহার হইয়াছে তাহার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে, মনের ক্লেদ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে,—তাহার জীবন ধন্য। অগ্রে গুরুর প্রতি বিশ্বাস, পরে আপনা হইতেই আসিবে ভক্তি। ভক্তি পাকা হইলে শ্রীভগবান শ্রীগুরু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইবেন। চিরকাল ইহা হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সত্যকাম, কৌৎস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অপূর্ব্ব শিষ্যত্বের সাধনা করিয়াছিলেন; এমন কি পরব্রহ্ম-সন্তান একলব্য ও কলিকালের ঘোলা-পুত্র কবীরও শিষ্যত্বের সাধনায় অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন। কালের দোষে আমরা শিষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে চাই না; কিন্তু গুরু-অর্জ্জন করিতে অনেক সময়ে প্রস্তুত।

শিষ্যত্ব অর্জ্জনই হইতেছে প্রধান কথা। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষার্থীকে স্বামিজী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "দীক্ষা নিবি তো, আমার কথায় অম্লান আননে ঝাঁপ দিতে পারবি? পর্ব্বতের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবি?" দীক্ষার্থী সবিনয়ে উত্তর দিয়াছিলেন, "মনে হয়, তা পারবো।" এই কথা কয়টির মধ্যে শিষ্যের যোগ্যতার মাপকাঠির ধারণা লাভ করিতে পারি। কথায় আছে, 'গুরু মিলে লাখ, শিষ্য না মিলে এক।'

আজকাল কৌষিক গুরু পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী-গুরুর শিষ্য হইয়া পূর্ব্ব গুরুর গুরুদের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ অনেকে করিয়া থাকেন। ইহা অতীব অন্যায়। গুরু-স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু অবথা গালাগালি দেওয়া ধর্ম্মের নির্দ্দেশ নহে। গৃহী-গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী-গুরুর শিষ্যকে উপহাস করাও তুল্যরূপ অন্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কারো ভাব নষ্ট কর্ত্তে নেই।" গীতাতেও অনুরূপ উপদেশ আছে। সকলেরই নিজ নিজ অভিরুচিমত সন্ন্যাসী বা গৃহী গুরু করার অধিকার আছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, ইহা যেন আদর্শ হিন্দু বিবাহের মতই 'An experiment once for all' হয়। সন্ন্যাসী আর গৃহী গুরুর নির্দ্দেশের মধ্যে প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজ নিজ গুরুর নির্দ্দেশিত পথ অকপটে অনুসরণ করিলে সকলেই পরম কল্যাণ লাভ করিবেন।

শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"অম্মানেক শতৈঃ সাধারণুষ্ঠা ভক্তা সমাধিতো।
তুষ্টে বৈদিক লক্ষণেন বিধিনা সন্তুষ্ট ঈশঃ স্বয়ম্।
সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরূপমেত্য কৃপয়া দুর্গ্গোচরঃ সন্
প্রভুঃ তত্ত্বং সাধু বিবোধ্য তারয়তি তান্ সংসার দুঃখার্ণবাৎ।
—সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ।

অদ্বৈত-বেদান্তবীর, সাক্ষাৎ শঙ্করূপী শঙ্করাচার্য্য —"ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা" তত্ত্বে যাঁর অপরোক্ষ উপলব্ধি, তিনিও 'গুরু' তত্ত্বকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। বলিয়াছেন—"গুরু চরণাম্বুজ নির্ভর ভক্ত: সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্ত:। ইন্দ্রিয় মানস

নিজমাদেবং ব্রহ্মাসি নিজ হৃদয়ং খেদম্।" অন্যত্র বলিয়াছেন :

ভাবাহৈতং সদাকুর্য্যাৎ ক্রিয়াহৈতং ন কহিচিৎ।
অহৈতং ত্রিষু লোকেষু নাহৈতং গুরুণাসহ ॥

বিশ্বাস চাই। গুরুই ভবপারাবারের কর্ণ-ধার; গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর। সেই গুরুকে কায়মনঃপ্রাণে বিশ্বাস করিতে হইবে; তাঁর মন্ত্রে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্যকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; তবে মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে অনায়াসলভ্য। সেই গুরুকে প্রণাম করি :

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরু কৃপাহি কেবলম্—গুরু বিশ্বাসোহি কেবলম্—জয় গুরু শ্রীগুরু। জয় জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের

অন্তিম কামনা

শ্রীবিদ্যুতভূষণ শূর

সুখ শান্তি আর স্বাস্থ্য ধনমান,
সকলি হরিলে ওহে ভগবান ॥
আশা নিয়ে কত পাতিনু সংসার,
সকলি ত প্রভু হ'ল ছারখার।
ভাই বন্ধু আর যত পরিজন,
সকলের কাছে যেন "হরিজন" ॥
ছিল শুধু বাকী মোর দুটি আঁখি,
তাও বুঝি তুমি রাখিবেনা বাকী।
নিতে হয় প্রভু নিও চক্ষুধন,
দিও শুধু মোরে তৃপ্তাত মন ॥
"অভেদ বিবেক" আদি সহচরে
আর "শ্রীশ্রীমাকে" এস সাথে করে'
অন্তিমে আসিয়ে দিয়ে দরশন
মায়া নাশি মুক্ত কর ভগবান।

ধ্রুবচর্যা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

"তারকা-খচিত নভোমণ্ডল অপেক্ষা তন্মধ্যস্থ ধ্রুবতারার সুদৃঢ় সংস্থিতি হিন্দু মনের উপর গভীরতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই ধ্রুবতারা অত্যদ্ভুত। অনন্ত আকাশে উহাই একমাত্র তারকা, যাহা অহোরাত্র অবিচলিত, অবিচ্যুত। অথচ উহার চারিদিকে শশব্যস্ত শতশত গ্রহোপগ্রহ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছে। আদিকাল হইতে এই সৌদার্ঢ্যই উহার বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। এই নিশ্চলতা ধ্রুবতারা কখনো কাহারো নিকট শিক্ষা করে নাই। অথবা উহা কালক্রমে উক্ত বিশেষত্বে বিভূষিত হয় নাই। বরং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই উহাকে অকম্পিত ও অচঞ্চল দেখা যায়। ইহা সুনিশ্চিত যে, সমগ্র নরলোকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার তুল্য অভ্রান্ত ও অটল বস্তু আর নাই। ইহা নিশ্চল হইয়াও সমস্ত সচল ভূতের শাশ্বত সাক্ষী। ফলতঃ আমরা কল্পনা করিতে বাধ্য হই যে, উক্ত ধ্রুবলোকের কোন শিশু তপোবলে ঈশ্বর দর্শনপূর্বক চিরকাল ধরিয়া, যুগ যুগ ব্যাপিয়া সুগভীর সমাধিতে নীরব, নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ রহিয়াছে।"

বিদেশিনী নিবেদিতা ধ্রুব-চরিত্রের মহিমা কীর্তন-প্রসঙ্গে উল্লিখিত সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন। ভারতে যে সকল চরিত্র অমরত্ব লাভ করিয়াছে তন্মধ্যে ধ্রুবচরিত্র নিঃসন্দেহে অন্যতম। শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়-পঞ্চকে এবং বিষ্ণুপুরাণের একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে ধ্রুব-চরিত্র বিবৃত। ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপার পতি। ভগবান্ বাসুদেবের অংশে মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাবীর ধর্মজ্ঞ দুই পুত্র জন্মে। উত্তানপাদ দুইটী বিবাহ করেন। তৎপত্নীযুগলের নাম সুনীতি ও সুরুচি। দ্বিতীয়া পত্নী সুরুচি পতির অত্যন্ত প্রেয়সী হন। প্রথমা পত্নী সুনীতির পুত্র ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া রাজাসনে বসিয়া আদর করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া সুনীতির পুত্র ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে উঠিতে আগ্রহান্বিত হইলেন; কিন্তু ধ্রুবকে কোলে লওয়া ত দূরের কথা, রাজা তাঁহাকে মিষ্ট বাক্য দ্বারাও সমাদর করিলেন না। আবার সুরুচি সপত্নী-তনয়কে কর্কশ দুর্বাক্য প্রয়োগ করিলেন। পরে, রাজা সুরুচির পুত্র উত্তমকে সিংহাসন দানার্থ সুনীতি ও ধ্রুবকে দূরবর্তী বন্য নদীর তীরস্থিত পর্ণকুটীরে নির্বাসিত করিলেন। নির্বাসিত পুত্র সাত বর্ষ পরে পিতৃদর্শনে আসিয়া বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া দণ্ডাহত ভুজঙ্গবৎ ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিগলিত বাষ্পে তাঁহার অধরৌষ্ঠ বারংবার প্রকম্পিত হইতেছিল। ইহা দেখিয়াও পিতা কোন কথা কহিতে পারিলেন না, পরন্তু মর্মাহত হইলেন। অনাদৃত তিরস্কৃত পুত্র পিতাকে ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট গেলেন। পুত্র ও পৌরজনের মুখে ইহার কারণ অবগত হইয়া সুনীতি অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয়ে শোকরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হইল। তিনি দাবাগ্নিদগ্ধা বনলতার ন্যায় পরিম্লান হইলেন এবং অধীরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রকে সান্ত্বনা দানার্থ তিনি বলিলেন, 'ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ।' ইহার অর্থ, যিনি অন্যকে যে দুঃখ দেন ভবিষ্যতে তিনি সেই দুঃখই পাইয়া থাকেন। হিতৈষিণী মাতা পুত্রকে পরামর্শ দিলেন—

'আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং
যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা।'

ইহার অর্থ, যদি তোমার ভ্রাতা উত্তমের ন্যায় রাজসিংহাসনে বসিবার তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরের পাদপদ্মই আরাধনা কর।

অর্থসাধক মাতৃবাক্যে রাজসিংহ ধ্রুব মনের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইলেন। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শুদ্ধ শিশু শ্রীহরিকে কাতর অন্তরে ডাকিতে লাগিলেন। তথায় ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। তখন তিনি সরল বিশ্বাসে বলিলেন, হে হরি, তুমিই আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ? ইহা শুনিয়া শ্বাপদগণ পলাইল। এই অপূর্ব সংবাদ ধ্যানযোগে অবগত হইয়া দেবর্ষি নারদ ধ্রুব সমীপে আসিলেন এবং তাঁহাকে দুষ্কর সাধন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বালককে বলিলেন, "বৎস, অদৃষ্টবশে সুখ আসিলে ভাবিবে, আমার পুণ্যক্ষয় হইতেছে। তদ্রূপ দুঃখ আসিলে মনে করিবে, আমার পাপক্ষয় হইতেছে। তাহা হইলে মনে শান্তি পাইবে।" ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের সুদৃঢ় সংকল্প ইহাতে টলিল না। তখন নারদ তাঁহাকে দ্বাদশাক্ষর সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষাদানান্তে সাধন-রহস্য উপদেশ করিলেন। শ্রীগুরুর নির্দেশে ধ্রুব যমুনা-পুলিনে পুণ্যতম মধুবনে যাইয়া সাধন-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। প্রতি তৃতীয় দিবসে একবার মাত্র ফলাহার করিয়া তাঁহার প্রথম মাস অতীত হইল। প্রতি পাঁচ দিন অন্তর শীর্ণ তৃণপত্রাদি আহার করিয়া তিনি দ্বিতীয় মাস কাটাইলেন। তৃতীয় মাসে তিনি প্রত্যেক নবম দিবসে জলমাত্র পান করিয়া হরিধ্যানে মগ্ন রহিলেন। চতুর্থ মাসে চতুর্দশ দিবস গত হইলে পঞ্চদশ দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া শ্বাসরোধ পূর্বক তিনি শ্রীহরির দর্শনার্থ তপস্যা করিলেন। পঞ্চম মাসে যোগী শিশু একপদে অনাহারে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মধ্যানে স্থাণুবৎ সমাহিত রহিলেন। যখন ধ্রুব এইরূপ কঠোর তপস্যা করিলেন তখন ত্রিভুবন বিকম্পিত হইল। গজরাজ ছোট নৌকায় উঠিলে উহার বাম বা ডান পদের ভরে যেমন সেই নৌকা নমিত হয় তদ্রূপ ধ্রুব যখন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর তপস্যা করিলেন তখন অবনী তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হইল। শিশু যখন শ্বাসরোধ পূর্বক বিশ্বমূর্তি ভগবানের সহিত স্বীয় আত্মার অভেদ দর্শন করিলেন তখন চরাচর সর্বপ্রাণীর শরীরে শ্বাসরোধ উপস্থিত হইল। দেবগণ সভয় হৃদয়ে ভগবানকে এই শ্বাসরোধের বিষয় নিবেদন করিলে শ্রীহরি ধ্রুবকে অচিরে দুরূহ তপস্যা হইতে নিবর্তিত করার আশ্বাস তাঁহাদিগকে দিলেন।

এদিকে নারদ ধ্রুবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উত্তানপাদের রাজপুরীতে গেলেন এবং সন্তপ্ত রাজাকে সান্ত্বনা দিলেন। নারদ-মুখে ধ্রুব-সংবাদ পাইয়া সংসারে ক্ষত্ররাজের ঔদাস্য আসিল। তিনি রাজলক্ষ্মী সুরুচিকে অনাদর করিয়া কেবল বনবাসী তপোনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুবকে সস্নেহে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের তপস্যায় ভগবান প্রসন্ন হইয়া গরুড়বাহনে মধুবনে আসিলেন। তখন যোগী শিশু বিদ্যুদ্দামতুল্য জ্যোতির্ময় ইষ্টরূপ সন্দর্শন করিতেছিলেন। ভগবান ধ্রুবের অন্তঃস্থল হইতে বাহিরে আসিলে ধ্যাতার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া শ্রীহরিকে পূর্ববৎ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আনন্দজনিত সম্ভ্রম জন্মিল। তিনি শ্রীহরিকে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। সিদ্ধ শিশু স্তব-স্তুতি জানিতেন না বলিয়া কেবল যুক্ত করে শ্রীহরির সম্মুখে ভক্তিভরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান বেদ-শঙ্খ দ্বারা তাঁহার কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। তখন ঋষি ধ্রুব কবিত্ব লাভ করিলেন ও ভগবানকে ভাবাবেগে স্তব করিলেন। ইহাতে উক্ত ঋষির ধ্রুবলোক প্রাপ্তি ঘটিল। আকাশস্থ ধ্রুব তারাই ধ্রুবলোকের সুনিশ্চিত নিদর্শন।

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ধ্রুব গৃহত্যাগ পূর্বক বাহ্যোপবনে যাইয়া মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু, পুলহ ও বশিষ্ঠ—এই সপ্তঋষিকে দেখিতে

পাইলেন। এই সপ্ত সিদ্ধ মুনি শিশুকে শ্রীহরির আরাধনা করিতে পরামর্শ দিলেন। ধ্রুব তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য করিয়া তপোমগ্ন হইলেন এবং শ্রীহরির সুদর্শন সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তখন সিদ্ধ শিশু শ্রীহরিকে যে স্তব করেন তাহার দুই শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ব্রহ্মাদ্যৈর্বেদবেদ্যৈ র্জ্ঞায়তে যস্য নো গতিঃ।
তং ত্বাং কথমিহ দেব স্তোতুং শক্যামি বালকঃ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্বব্যাপী ভূমঃস্পর্শাৎ অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্॥

অনুবাদ—হে দেব, বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদিও যাঁহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়া তাদৃশ তোমার কিরূপে স্তব করিতে পারি? তুমি সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ বিরাট পুরুষ। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও তোমার অখণ্ড ব্যাপিত্ব বিরাজিত।

ধ্রুবকৃত হরিস্তোত্রের আরও দুইটী সুন্দর শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শ্রীহরি হইতে কিরূপে বিশ্ব সৃষ্ট হইল তাহার ইঙ্গিত :

"অক্ষ্ণোঃ সূর্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাৎ চন্দ্রমা মনসস্তব।
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত॥
প্রাণো নঃ হৃদয়াৎ জাতো মুখাৎ অগ্নিরজায়ত।
দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ সর্বমভূৎ ইদম্॥"

অনুবাদ—তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল, মন হইতে চন্দ্রমা, নাভি হইতে গগন ও শিরোদেশ হইতে স্বর্গ উদ্ভূত হইয়াছে। তোমার হৃদয় হইতে আমাদের প্রাণবায়ু জাত। মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, দিক্ সকল শ্রোত্র হইতে এবং পদদ্বয় হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন। এই সমস্তই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। হে প্রভো! তুমিই জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, ধ্রুব পূর্বজন্মে সত্যসন্ধ ছিলেন এবং ভগবানকে আরাধনা করিয়া তোষিত করেন। গত জন্মে কোন ভোগাচ্য সুদর্শন রাজকুমার তাঁহার মিত্র হন। তৎসঙ্গহেতু তাঁহার সেই দুর্লভ ঋদ্ধি দেখিয়া পরজন্মে রাজপুত্রত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তাই তিনি উত্তানপাদের পুত্ররূপে জাত হন এবং তপোবলে ইহলোকে পিতৃরাজ্য ও পরলোকে ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা ভাগবতোক্ত বিবরণ বিশদ ও সুন্দর। ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া ধ্রুবকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু ধ্রুব কোন বর লইতে সাগ্রহ অসম্মতি নিবেদন করিলেন। এই সম্বন্ধে 'ভক্তিসুধোদয়' গ্রন্থে আছে :

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্ অপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

অনুবাদ—হে প্রভো, আমি রাজ্যাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিতেছিলাম। মুনীন্দ্র যাঁহাকে পান না, সেই আপনার দর্শনলাভ করিলাম। কাচের অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি দুষ্প্রাপ্য দিব্যরত্ন পাইলাম। হে দেব, আমি কৃতার্থ হইয়াছি এবং অন্য বর চাহি না।

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে আছে, ধ্রুব ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে স্তব করেন। উক্ত স্তবের মধ্যে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় সুললিত ও ভাবপূর্ণ :

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জন কথা শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণ কথামৃত পানমত্তঃ॥"

অনুবাদ—আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা তদ্গত ভক্ত কথাশ্রবণে যে সুখলাভ হয় আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সেই সুখলাভ হয় না। দেব লাভ করিয়া আমি অধিক কি সুখ পাইব? কালরূপ খড়্গ দ্বারা বিমান কর্তিত হইলে দেবগণও পতিত

হন। হে অনন্ত! আমার এই প্রার্থনা, যে সকল শুদ্ধচিত্ত ভক্তজন আপনার প্রতি সতত ভক্তি করেন, আপনার কথা শ্রবণার্থ তাঁহাদের সাহচর্য যেন আমি লাভ করিতে পারি। তখন আমি সৎসঙ্গে থাকিয়া আপনার গুণগানে মত্ত হইব এবং এই দুঃখময় দুস্তর ভয়ংকর ভবসাগর অতিক্রম করিব।

ধীমান্ ধ্রুব এইরূপ স্তব করিলে ভক্তানুরক্ত ভগবান কহিলেন, "হে ক্ষত্রিয় বালক, তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে ধ্রুব স্থান প্রদান করিলাম। সেই স্থান সততই সমুজ্জ্বল এবং তথায় নিত্য নির্বাণ বিদ্যমান। তুমি পিতৃরাজ্য ভোগানন্তর উক্ত স্থান প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি তোমার পিতা রাজধর্ম অবলম্বনপূর্বক তোমাকে রাজ্য শাসনের ভার দিয়া বনে গমন করিবেন। তুমি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবে। তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় যাইয়া নিরুদ্দেশ হইবে। তোমার বিমাতা সুরুচি তনয়া হইয়া বনে বনে তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে।" ভগবান সপ্তম ঋষি শিশু ধ্রুবকে ব্রহ্মপদ প্রদানকরিলেন এবং তৎসমক্ষেই গরুড়োপরি আরোহন করিয়া স্বধামে প্রস্থিত হইলেন।

ধ্রুব স্বীয় মনোরথ লাভ করিয়া প্রীতচিত্তে পিতৃগৃহে ফিরিলেন। বিমাতার বাক্যবাণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় তিনি শ্রীহরির নিকট মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই। সেইজন্য তৎপশ্চাৎ তাঁহার মনস্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল। সরলতা ও ব্যাকুলতা সহায়ে তিনি ছয় মাসের মধ্যেই শ্রীহরির সন্দর্শনলাভে ধন্য হইলেন।

দূতমুখে পুত্র ধ্রুবের প্রত্যাগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া রাজা উত্তানপাদ সুপ্রসন্ন হইলেন। দেবর্ষি নারদও তাঁহাকে এই সংবাদ পূর্বেই দিয়াছিলেন। সুসন্তান সন্দর্শনার্থ পিতা উৎসুক হইলেন। তিনি সুসজ্জিত স্যন্দনে চড়িয়া পুত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। চারিদিকে মঙ্গলার্থ শংখধ্বনি, বংশীবাদ্য ও বেদপাঠ হইতে লাগিল। সুনীতি ও সুরুচি এক শিবিকায় আরোহনপূর্বক উত্তমকে সঙ্গে লইয়া নরপতির সহিত গমন করিলেন। রাজা পুত্রকে দর্শন করিয়াই রথ হইতে নামিলেন এবং স্নেহবিহ্বল হইয়া দুইবাহু প্রসারণপূর্বক পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি বারংবার পূর্ণমনোরথ সন্তানের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং নয়নজল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। তখন ধ্রুব পিতার চরণযুগল বন্দনা করিলেন এবং তৎপরে মাতা ও বিমাতাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাইলেন। সুরুচি পদানত বালককে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্বক বাষ্পগদ্গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, চিরজীবী হইয়া থাক। জল যেমন স্বভাবতঃ নিম্নদেশে গমন করে, তেমনি শ্রীহরি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন সর্বলোক তৎপ্রতি স্বতঃই প্রসন্ন হইয়া থাকে।" অনন্তর উত্তম ও ধ্রুব উভয় ভ্রাতা পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া পুলকিত হইলেন। অবশেষে ধ্রুব ও উত্তমকে গজোপরি আরোহণ করাইয়া পিতা রাজপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজপুরে অভূতপূর্ব আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে উত্তানপাদ পুত্রকে সিংহাসন দানান্তে বনে গমন করিলেন। পুরাকালে রাজারাও চতুরাশ্রমধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধ্রুব শিশুমার-তনয়া ভ্রমিকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামক দুই পুত্র জন্মিল। ভ্রমি ব্যতীত রাজ্ঞী ইলাও মহারাজ ধ্রুবরাজের আর এক মহিষী ছিলেন। ইলার গর্ভে একপুত্র ও এক কন্যা জাত হয়। উত্তম বিবাহ করেন নাই। একদা মৃগয়ায় যাইয়া তিনি বনমধ্যে এক বলবান যক্ষ কর্তৃক নিহত হন। উত্তমের মাতা সুরুচিও পুত্রসন্ধানে যাইয়া উক্ত দশা প্রাপ্ত হন। ইহা শুনিয়া ধ্রুব অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং উক্ত যক্ষ বধার্থ বহু সৈন্য লইয়া যক্ষালয়ে যাত্রা করেন। তিনি যক্ষগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিলেন। ধ্রুব অসংখ্য যক্ষকে বিনাশ

করিলে পিতামহ মনুর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তাঁহার তত্ত্বোপদেশে ধ্রুব সেই রণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। রাজর্ষি ধ্রুব যক্ষবধ হইতে ক্ষান্ত হইলে কুবের তৎসমীপে যাইয়া তাঁহাকে বর দিতে ইচ্ছা করেন। তখন ধ্রুব কহিলেন, "হে দেব, আমাকে এই বর দান করুন, যেন শ্রীহরির প্রতি আমার ধ্রুবাস্মৃতি থাকে, কারণ হরিস্মৃতির দ্বারাই অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়"। ধ্রুবের প্রার্থনা শুনিয়া কুবের প্রীত মনে 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তৎসমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর ধ্রুব যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনায় পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে ধ্রুব ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া দীর্ঘকাল ত্রিবর্গ সাধনান্তে মোক্ষকামী হইলেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই বর্গত্রয়ের সর্ববাসনা পূর্ণ না হইলে মোক্ষকামনা জন্মে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'সর্বপ্রকারে মানবীয় অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণ না হইলে মুমুক্ষুত্ব জন্মে না। যাহারা পূর্বজন্মে সম্রাট ছিলেন তাঁহারাই পরজন্মে সন্ন্যাসী হন।' ধ্রুব স্বীয় পুত্রকে রাজসিংহাসন দান করিয়া মোক্ষসাধনে ব্রতী হইলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাইয়া যোগসাধনা আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং মুক্তিলাভ করিলেন। তখন এক উজ্জ্বল বিমান তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। তিনি সশরীরে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে বাদশ অধ্যায়ের শেষে ধ্রুব-চরিত্রের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত: "ধ্রুব পরম ভাগবত ও তপস্বী। ধ্রুব-চরিত্র যশোবর্ধক, আয়ুবর্ধক ও ধনপ্রদ। যিনি ধ্রুবচরিত্র শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন তাঁহার ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শ্রীপ্রাদি গুণ জন্মে। পবিত্র হৃদয়ে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ধ্রুব চরিত্র কীর্তন করিলে সর্বকাম সিদ্ধ হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতি তিথিতে এবং রবিবারেও ইহা পাঠ করা আবশ্যক।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "হাতে তেল মাখিয়া পাকা কাঁঠাল ভাঙ্গিলে যেমন হাতে আঠা লাগে না তেমনি ভক্তিলাভ করিয়া সংসার করিলে মায়া পাশে বদ্ধ হইতে হয় না।" রাজর্ষি ধ্রুবের জীবনেও এই আদর্শ রূপায়িত। প্রাচীন ভারতে রাজন্যবৃন্দও ঋষিত্ব লাভ করিতেন। সশরীরে ধ্রুবের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি সশরীরে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমনবৎ অলৌকিক। বাইবেলে আছে, যিশুখ্রীষ্টও কবর হইতে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইয়া স্বর্গীয় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন, ধ্রুব যে সমাধি লাভ করেন তাহাতে ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যানরূপ ত্রিপুটী ভেদ হইয়াছিল এবং তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। টীকাকার চতুর্থ স্কন্ধের পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত ধ্রুবচরিতকে ধ্রুবচর্যা নাম দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার

তোমার ছিলনা গুরু, তুমি কারে মন্ত্র নাহি দিলে,
আপন সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ আপনি করিলে।
এ বিশ্বে বাসিলে ভালো; একসাথে পশ্চিম-পূরব
তোমারে প্রণাম করি' মহোল্লাসে লভিল গৌরব॥

প্রেমধর্ম্ম

॥ ঐতিহাসিক সংবাদ ॥

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতের বৈদিক আর্য্য সন্তানদের ধর্ম্মসাধনার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত আছে। শাস্ত্রকারেরা এই সাধনাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন —জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ ও ভক্তিমার্গ। এই বিভিন্নাবস্থার মধ্যে বিতর্কও হয়েছে এবং অবশেষে গীতাতে তাহার সমন্বয় প্রদর্শন করা হয়েছে। এ সব ঐতিহাসিক ব্যাপার। তবে, সংখ্যাশায়ানুযায়ী ভক্তিমার্গী সাধকই ভারতে প্রবল। বাংলাপ্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাধিক্য বলে পরিগণিত হন।

এই ভক্তিমার্গেরও ভারতে একটা বিবর্ত্তন আছে এবং তাহার প্রচুর নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বর্ত্তমান ভাষাসমূহ মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ লোকের হয়ত ধারণা আছে যে ভক্তিপন্থা কেবল ভারতেই আবদ্ধ। তৎপর, ভক্তিমার্গ বলতে তাঁদের এক অদ্ভুত ধারণা আছে। ভক্তিযোগ বলতে তাঁরা অলৌকিক গল্প, নৃত্য, কীর্ত্তন বুঝেন। অলৌকিক ব্যাপারকে তাঁরা ভক্তিপ্রসূত কর্ম্ম বলে গণনা করেন। হিন্দীভাষাতে নাভাজী রচিত "ভক্তমাল" গ্রন্থ অতি উপাদেয় পুস্তক; কিন্তু এতে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে। বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পুস্তকসমূহেও এই প্রকারের ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। এসব গল্পের দ্বারা আমরা এই বুঝি যে ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তা স্বাভাবিক নিয়মেই হোক বা অপ্রাকৃত নিয়মেই হোক।

কিন্তু এ সব গল্পদ্বারা আমরা এর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি। এদেশে "ভক্ত" মানে অলৌকিক ও অদ্ভুতবিধায়ী ব্যক্তি, আর "ভক্তিমার্গীয়" অর্থে একটা বিশিষ্ট ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য এই যে, তা সঠিক সংবাদ নয়। ভক্তিমার্গ ভারতে এবং তার বাইরের দেশসমূহে অতি প্রাচীন ধর্ম্মপন্থা।

লোকে সাধারণতঃ "ধর্ম্মসাধনা" অর্থে রাজা বা পুরোহিততন্ত্রের বাঁধাধরা ছকে নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালীকে গ্রহণ করেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ছক যা কালে বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় তদ্দ্বারা লোকের মনের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃপ্ত হয় না। তৎপর, সর্ব্বকালেই এবং সর্ব্বদেশেই বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলি রাষ্ট্রীয় শাসন যন্ত্রের অন্তর্গত ব্যাপার হয়। এইসব ক্রিয়ার পরিচালকেরা রাজশাসনাধীন থেকে এসব ব্যাপারকে রাষ্ট্রশাসনের আভ্যন্তরীণ করে তোলে। এই প্রকারে ধর্ম্ম রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী চলে। এ জন্যই কথা আছে, Religion follows the flag অর্থাৎ রাজনীতি অনুযায়ী ধর্ম্মও চলে। বহুকালের পরাধীন ভারত এ তত্ত্ব ভুলে গেছে বলেই আমাদের এত অজ্ঞতা ও বিসম্বাদ।

প্রাচীন মিশরে ধর্ম্ম পুরোহিতের হাতে ছিল, সব প্রাচীন দেশেই তা ছিল। যে রাজা, সে-ই পুরোহিত এবং সে-ই বিচারক ছিল। এ অনুষ্ঠান মিশর, গ্রীস ও ভারতে প্রাচীনকালে সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। কালে রাজবংশ হতে বা রাজানুগ্রহে পুরোহিত শ্রেণী উদ্ভূত হয়ে ধর্ম্মের ক্রিয়াসমূহ একচেটিয়া করে তোলে। তখন লাগে বিবাদ।

মিশরের অতি প্রাচীনকালের অসিরিস ও তার ভগ্নী ও পত্নী আইসিসের গল্পে প্রেমধর্ম্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যারাও আখনাতন

একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর সূর্য্যদেবতা বা তাঁর কাছে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভগবান্, তৎপ্রতি স্তবগুলি বর্ত্তমানের একেশ্বরবাদীর ভজন ও স্তোত্রের সহিত মিলে। এ সব স্তবেতে তাঁর ভক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। যে দেশেই হউক, ভগবৎ উপাসনা ভক্তিদ্বারাই প্রকাশ পায়।

তৎপর, সেমেটিক জাতিদের ধর্ম্মসাধনা বিষয়ে বিশেষ সংবাদ আমরা পাই না; যা পাই তা কেবল ইহুদীদের বাইবেল মধ্য হতেই সংগৃহীত হয়। একদিকে আমরা মোলখ, আসটারটে প্রভৃতি দেব-দেবীর নিকট নরবলির সংবাদ পাই, অন্যদিকে থামুজ দেবতার প্রেমলীলার বিষয় শুনি। এতদ্বারা আমরা রাষ্ট্রীয় বা সরকারী ধর্ম্ম ও জনসাধারণের ধর্ম্ম বা প্রেমের কথা বলে উল্লিখিত হয়েছে, তার কথা শুনি।

প্রাচীন এশিয়া মাইনরে অরফিউসের ধর্ম্মের এবং অব্যক্ততার (mysteries) বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক গল্পে শুনি। এই দলের গুপ্ত ধর্ম্মক্রিয়া, গান, বংশী-বাদন প্রভৃতি গল্পে উল্লিখিত হয়। তারপর গ্রীসে ঈলিউসিনিয়ান্ অব্যক্ত ব্যাপার (Eleusinian mysteries) নামক ধর্ম্মসাধনার কথা আমরা গ্রীক ইতিহাসে পাই। কথিত হয়, সুরার দেবতা ডিয়নি-সিয়স এই ধর্ম্ম স্থাপিত করেন। কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে এথেন্সের মেয়েরা ঈলিউসিস নামক স্থানে গিয়া মদ্য-পান এবং নৃত্যগীত করত, ইত্যাদি। অবশ্য অভিজাতেরা এটা পছন্দ করত না। তারা সরকারী আথেনা দেবীর পূজা করত। সর্ব্বত্রই অভিজাতেরা এই নৃত্যগীতের ধর্ম্মে বিরূপ ছিল। এজন্যই আমরা এসব ভক্তিমার্গীয় ধর্ম্মের সংবাদ বড় কম পাই।

আসল কথা এই যে, যখন সরকারী ধর্ম্ম রাষ্ট্রোদ্দেশে পরিচালিত হয়, যখন তা অসার ক্রিয়া-কাণ্ডে পরিণত হয়, তখন বঞ্চিত গণশ্রেণীর দল কি করবে? যখন মিশরের, বাবিলনের ও গ্রীসের সরকারী দেবতারা গণশ্রেণীর দুঃখজনিত ক্রন্দনে বিমুখ, যখন কোন নামদাদা রাজা মারা গেলেই তিনি দেবতা পদে উন্নীত হয়ে পূজা পেতে থাকেন, তখন নিপীড়িত শোষিত গণশ্রেণীসমূহ কি করবে? যখন শাসকদের অত্যাচার প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়, তখন লোকে হাহুতাস করে জগতের নিয়ন্তাকে ডাকবে। আর এই ডাক বা ক্রন্দন, নৃত্য ও হুল্লোড়ে পরিণত হতে বাধ্য। ইহা মনস্তত্ত্বের কথা। যুক্ত দেব-পিতামহ জিউস (দ্যুপিতর) সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ, আর আথেনাদেবী বা আপল্লোদেব বা পসিডনদেব নিজের প্রিয়পাত্রকে সাহায্য প্রদান করছেন, ("ইলিয়ড" মহাকাব্য দ্রষ্টব্য) তখন নির্ব্বাক্ "ইণ্ড্য" বা ইতরেরা কি করবে? তারা নির্জ্জনে বা বাসুমহলের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে হা-হুতাশ করবে ও বুক চাপড়াবে না ত' কি! ("পরিব যোগিনী বেশ, যাইব যথায় নিঠুর হরি"—চণ্ডীদাস দ্রষ্টব্য)

ক্লাসিকাল জগতের এই সংবাদ। একজন আমেরিকান গবেষক বলেছেন, যে, প্রাচীনকালের সাম্যতন্ত্রের অবসানের পর চীন হতে গ্রীস পর্য্যন্ত একটা ধর্ম্মবিপ্লব হয়। এই ঘটনা ভারতে নিশ্চয়ই বুদ্ধের পূর্ব্বের ঘটনা। এতদ্বারা আমরা তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ থেকে বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্মরাজ্য এবং আর্থিক ক্ষেত্রে একটা অশান্তির ভাব দেখতে পাই। এই ঘটনার দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে মহাবীর বর্দ্ধমান ও বুদ্ধের আগে কেন এত উলঙ্গ আজীবক সাধুর প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব-ভারতে হয়। এঁরা বেশীর ভাগই গণশ্রেণীর লোক, বৈদিক-পুরোহিত-তন্ত্রীয় কর্ম্মের বিরোধী। আবার, বুদ্ধের জীবনীতে পাঠ করা যায় যে তাঁর কাছে "গো-ব্রতী", "কুকুর-ব্রতী" প্রভৃতি অদ্ভুত সাধনাকারী লোক এসেছিল। পুনঃ, "বুদ্ধ-বচন" বলে প্রথিত "কূট-নির্দ্দেশ" গ্রন্থে বাসুদেব-ধর্ম্ম, বলভদ্র ধর্ম্ম, পুন্যভদ্র-ধর্ম্ম, মণিভদ্র-ধর্ম্ম, মহারাজ-ধর্ম্ম, গো-পূজা-ধর্ম্ম, নাগ-পূজা ধর্ম্ম প্রভৃতির সংবাদ আমরা পাই। এ পুস্তকের তারিখ ঐতিহাসিকেরা বলেন

২০০ খৃঃ। এই তালিকাতে আমরা আর্য্য ও আদিবাসীদের ধর্ম্মের সংবাদ পাই। এদ্বারা আমরা এই বুঝি যে অতি প্রাচীন কালেই বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সমূহ গণশ্রেণীর মধ্যে বিবর্ত্তিত হয়েছিল; গণ্য শ্রেণীদের ধর্ম্ম অন্যপথে যাচ্ছিল।

কিন্তু মৌর্য্যযুগের ভারহুত স্তূপে অনেক নামোল্লেখ আছে সেগুলি পণ্ডিতদের মতে হয় বৈষ্ণবধর্ম্মীয় অথবা নাগ-ধর্ম্মীয় লোকের নাম। তাঁরা বলেন, এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম খৃঃ পূঃ মৌর্য্য-যুগেও প্রচলিত ছিল। এজন্যই আমরা পাণিনিতে "বাসুদেব অর্জ্জুনাভ্যাং বুন্" সূত্র পাই। অর্থ, বাসুদেব যিনি অর্জ্জুনের উপাস্য। কিন্তু এটা মৌর্য্য-যুগের আগের কথা। এতদ্বারা আমরা "বাসুদেব ধর্ম্ম" নন্দযুগে সুনিশ্চিতভাবে পাই; হয়ত এর বহুপূর্ব্বেই এ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেবকী পুত্র কৃষ্ণের নাম পাই। যিনি ঘোর আঙ্গিরসের কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভ করেছিলেন। এই উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদকে সর্ব্বপ্রাচীন বলে গণ্য করা হয়। শেষোক্ত পুস্তকের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারা এর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। এ দুই পুস্তকের তারিখ অনুমিত হয় খৃঃ পূঃ ৭০০। যদি এই নামটি ছান্দোগ্যতে প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহলে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বৈদিকযুগের পরবর্ত্তীকালের ঐতিহাসিক লোক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

মহাভারতে যদুকুলের সাত্যকী, সুভদ্রা এবং শ্রীকৃষ্ণকে "ভাগবত" ধর্ম্মীয় বলে উল্লিখিত করা হয়েছে। পুনঃ, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ পুস্তকে ভাগবত ধর্ম্মের উল্লেখ আছে (ভাণ্ডারকারের Vaishnavism দ্রষ্টব্য)। এই ভাগবতেরা বেদবিরোধী বা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিরোধী এবং পুরোহিত তন্ত্রের বিপক্ষে ছিল। জৈমিনির "পূর্ব্ব-মীমাংসা" গ্রন্থে (খৃঃ ২০০—৪০০) বেদের সহিত এই ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলে স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সমসাময়িক "ব্রহ্মসূত্র" পুস্তকে বৌদ্ধ ও জৈনদের ন্যায় ভাগবতদেরও অবৈদিক বলা হয়েছে। আবার কূর্ম্মপুরাণে বৈষ্ণবদের মুখদর্শন মানা করা হয়েছে। "ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংস" কথার অর্থ এস্থলে প্রণিধান।

এ হ'ল ভারতের পুঁথিগত ঐতিহাসিক যুগের প্রাক্কালের কথা। সাধারণের ধারণা, বৈদিক আর্য্যেরা ভারতে শুভাগমন করে' ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, নাসত্যদ্বয় প্রভৃতির পূজা প্রচলিত করলেন। তারপর উপনিষদ রচিত হয়ে ক্রিয়াকাণ্ডের বিপক্ষে জ্ঞানমার্গের প্রচলন হয়। এরপর বুদ্ধ, তীর্থঙ্কর, মহাবীর প্রভৃতি উত্থিত হয়ে বেদ-বিরোধী ধর্ম্মসমূহ প্রচার করেছেন। কিন্তু এ ছক হ'ল ইউরোপীয় পণ্ডিতদের করা এবং আমাদের দ্বারা গৃহীত হয়ে তা Idol of the market অর্থাৎ বাজারের ঠাকুর অর্থাৎ 'প্রচলিত জাতীয় বিশ্বাস' হয়েছে। অন্যদিকে, সংস্কৃত পুস্তক-সমূহ নিরপেক্ষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করলে আমরা বেদেই লিঙ্গোপাসকদের (Phallic-worshippers) প্রতি অভিসম্পাত পাই। পুনঃ অন্যধর্ম্মীয়দের অসুর বলা হয়েছে (কুরুক্ষেত্রের কাছে অসুর মানে শূদ্র)। আবার বশিষ্টের এক সূক্তে কথিত হয়েছে, "কে আমার এই 'ইন্দ্র'কে একশত ধেনু দিয়ে ক্রয় করবে?" কেউ কেউ আজকাল এর অর্থ করছেন যে মৃত্তিকার ইন্দ্রমূর্ত্তি তখন অজ্ঞাত ছিল না (মৌর্য্যসম্রাটেরা বৈদিক দেবতাদের মূর্ত্তি বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করতেন—পতঞ্জলী)। পুনঃ বিভিন্ন ব্রাহ্মণে "গোসবা" এবং নানাপ্রকারের অশ্লীল ধর্ম্মাচারের উল্লেখ আছে। পরের যুগে, ছান্দোগ্য উপনিষদের "বামদেব্য" অংশে এক অশ্লীল ক্রিয়ার উল্লেখ আছে যাহা মধ্যযুগের ভৈরবীচক্রের পূর্ব্বরূপ বলে কেউ কেউ আজকাল অনুমান করেন। শেষে, আমরা বৌদ্ধ পুস্তকসমূহে নানাপ্রকারের অদ্ভুত ধর্ম্মাচরণ ও বিশ্বাসের সংবাদ পাই।

এতদ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে বেদপ্রসূত ধর্ম্ম ছিল অভিজাতদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট। প্রাচীনকালে রাজা ছিল শাসক, পুরোহিত এবং বিচারক।

(লেখকের "ভারতীয় সমাজপদ্ধতি" ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। বেদের রচয়িতারা বেশীরভাগই ছিল হয় রাজা, না হয় রাজকুমার বা রাজবংশীয় পুরোহিতকুল (Dialectic of Hindu Ritualism Pt. 1 দ্রষ্টব্য)। রাজ-পুরোহিতের পদ ছিল অতি সম্মানজনক, গ্রীস ও রোমের ন্যায় পুরোহিতের পদ অভিজাতবংশ দ্বারা গৃহীত হত। যথা, বিশ্বামিত্র, দেবাপী (ঋঃ ১০ম মণ্ডল)। আঙ্গীরস, কৌশিক, ভারদ্বাজ, গৌতম, মৌদ্গল প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগোত্র আসলে ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিল (অগ্নিপুরাণ দ্রষ্টব্য)।

কাজেই বেদপ্রসূত ধর্ম্ম ও সামাজিক শাসন অভিজাতদের জন্যই বিবর্ত্তিত হয়েছিল ; গণ শ্রেণী যাদের সম্ভবতঃ বেদে "অসুর", "দাস" "দস্যু" বলে অভিসম্পাত করা হয়েছে তাদের কি ধর্ম্ম ও আবার ছিল ? ভারতের সকল লোকই বৈদিক জাতিসম্ভূত নয় বলে নরতত্ত্ববিদেরা বলছেন। সেইজন্য বৈদিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ থেকে অন্ত্যজকে এক ধর্ম্ম ও সামাজিক আচারে আবদ্ধ বলে মনে করাই বরাবর অজ্ঞ পুরোহিত তন্ত্রের ভুল হয়েছে। এইজন্যই সমাজে এত গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুর আইনসমূহ পাঠেই এ সত্য ধরা পড়ে যে কুলাচার ও জাতিগত আচার স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট আচার হতে পৃথক। সকলকার ঘাড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আচার চাপাবার জন্যই সমাজে এত বিড়ম্বনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের সর্ব্বত্রই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতিদের বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং তালাক (divorce) প্রচলিত আছে। কেবল ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি অভিভূত উচ্চশ্রেণীর শূদ্রদের মধ্যে তাহা উপস্থিত বন্ধ হয়েছে। তবে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাংলার ব্রাহ্মণেরা কেন প্রতিকূলতা করেছিলেন ? বাংলাতেও মুসলমানযুগের গোড়ায় হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ ("সাঙ্গা") ভদ্রজাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, নারায়ণদেবের "পদ্মাপুরাণ"ই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। উচ্চ শ্রেণীর শূদ্রেরা সরকারী ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণ করেছেন বলেই আজ প্রাচীন তথ্যসমূহ অজ্ঞাত রয়েছে। পুনঃ কেন "সহবাস-সম্মতি বিল" পাশকালে বাংলার তার প্রতিকূলে এত আন্দোলন করা হয়েছিল, যখন স্মৃতিতে এবং বাংলার বাইরে সর্ব্বজাতির মধ্যে এই বিলের মর্ম্ম প্রতিপালিত হয় ? এর অর্থ, পুরোহিত তন্ত্রের অজ্ঞতা এবং শ্রেণী-স্বার্থ।

এস্থলে উপরোক্ত ঐতিহাসিক ব্যাপার সমূহ বিবৃত হ'ল, যেহেতু আমাদের মধ্যে সরকারী ধর্ম্ম ও গণ-সাধারণের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক (S. Roy-র "Customary Law of India" দ্রষ্টব্য)। ধর্ম্ম বললেই আমরা বেদপ্রসূত ধর্ম্ম বুঝি, স্মৃতি সমূহ ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, কিন্তু তা সর্ব্বজাতির প্রতি প্রাধান্য বলে ঘোষ করাতেই ধর্ম্ম ও সমাজে বিসম্বাদ হয়।

এক্ষণে ভারতে ভক্তিমার্গ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। সরকারী ধর্ম্মপুস্তকসমূহে আমরা এর কোন সংবাদ পাই না, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে। কিন্তু ভাকাটাকা ও ভারশিব রাজাদের (বিষ্ণুপুরাণের নবনাগ এবং বিন্ধশক্তি বংশ -৪০০ খৃঃ) শৈব ধর্ম্মাবলম্বী বলে খোদিত লিপিসমূহে উল্লিখিত হতে দেখি। এরপর গুপ্তসম্রাট বংশের অভ্যুদয় হয়। পশ্চিমবাংলার খানিকটা এবং মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশ এদের পৈত্রিক রাজ্য ছিল (আল্টেকার দ্রষ্টব্য) কিন্তু লেখক অনুমান করেন, উত্তর বাংলা এঁদের হস্তে ছিল। এঁদেরই সর্ব্বপ্রথম "বৈষ্ণব" বলে পরিচয় প্রদান করতে দেখি। রাজারা নিজেদের "পরম-ভাগবত" বলছেন, এ যুগে বিষ্ণু, শ্রী, লক্ষ্মী ও মহালক্ষ্মী দেবদেবীর পূজার প্রচলন হয় (Fleet, Gupta Inscriptions দ্রষ্টব্য)। অবশ্য এইসঙ্গে সৌর উপাসনাও প্রচলিত ছিল বলে দৃষ্ট হয়। এ যুগে কালিদাস প্রভৃতির উদয় হয়। বর্ত্তমানের গবেষকেরা বলেন, এ যুগেই পুরাণাদি নূতন সঙ্কলন প্রাপ্ত হয়, রামায়ণ ও মহাভারত সেই ভাবে সঙ্কলিত হয়। এর অর্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুরোহিত তন্ত্রের হাতে নূতনাকার ধারণ করে। পুরোহিততন্ত্রীয় ধর্ম্ম সরকারী ধর্ম্ম হয়। তাই আজ "সনাতনীয় হিন্দুধর্ম্ম" বলে বাজারে চলছে। —ক্রমশঃ

তারকা

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, কাব্যতীর্থ

কবিতায় কবিতায় আকাশের তারা'রা কী কহে ?
পিয়াসী অনাস্ত হিয়া আজি তাই হোলো কি উন্মুখ ?
রক্তরাঙা গোধূলির স্পন্দমান সোনালী চুমুক
তারা'রা কি ভিড় করি' নিতে এল জীবনের দহে ?
এখানে সরসীনীরে ঝিলিমিলি আলোছায়া-খেলা
তারা'রা হেরিছে হেথা আপনার ছবি বারবার
কালো জল ছল ছল—ঘিরে আসে ধীরে আঁধিয়ার—
স্বপ্নালসা ধরণীতে মৃদুপদে নামে সন্ধ্যাবেলা।
আকাশে কাজল-রেখা টানি' দেয় আষাঢ় সর্ব্বরী
তারা'রা মেঘের ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে কী আনে বারতা
হৃদয়ের ভাষা নাই, তারা'রাও বলেনাতো কথা,—
শুধু চেয়ে চেয়ে থাকা নিরুপায় যুগ যুগ ধরি'।
হে আকাশ, হে ধরণী, যবনিকা কর উত্তোলন।
ঘনকৃষ্ণ আঁধারের তারকিত মিটিমিটি আঁখি
কভু দেখাবেনা পথ, শত জিজ্ঞাসারে আনে ডাকি'—
আলেয়ার ছলনার অগ্নিদাহে জীবন-জ্বলন।
হেরিব নিশার ভালে বিদ্যুতের অলে বহ্নিলীকা,
ধরার পাষাণ হিয়া অলি' অলি' গলে ধারাজলে,
হা-হা-শ্বাসে ঝটিকার অনুভব করিব, বিরলে
জীর্ণবক্ষ জীবনের নিভে যায় শেষ বহ্নিশিখা !
হে তারকা, তোমারে ঢাকিয়া দিল ঘন কালো মেঘে
বাহিরে দুরন্ত ঝড়, হৃদয়েও প্রলয়-নাচন,
পলকে উপজে ভবে লক্ষ কোটি মরণ বাঁচন,
তুমি শুধু অচপল শান্তজ্যোতি চেয়ে আছ জেগে !
কোথায় মঙ্গলগ্রহে জীবলীলা লভে বিবর্ত্তন,
কোন নীহারিকাবাসী প্রেয়সীরে বাহুডোরে বাঁধে,
কোথা স্থিতি, কোথা গতি, কেবা হাসে, কেবা আর কাঁদে,—
কী হেরিছে, হে তারকা, যুগে যুগে তোমার নয়ন ?
যেদিন অনন্ত ব্যোমে রূপ হ'তে নব নব রূপে
অনাদি পরম ক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ কবি
এঁকেছিল পঞ্চভূতে জলজ্যোতি অগ্নিয়াঙা ছবি
সেদিন কি নীলাকাশে জেগেছিলে তুমি চুপে চুপে ?
জেগেছিলে হে তারকা, সাথে নিয়ে সপ্তর্ষির দল,
উষায় উষায় বেজে উঠেছিল আগমনী তব,
বজ্রের টঙ্কারে নভে যাত্রা সুরু হোলো অভিনব,
আজো কি বিরামহীন ধ্রুবচক্র চলে অবিরল ?
স্বপ্ন হের নীল নভে শুধু তুমি বিশ্বকবিতার !
এখানে ধ্বংসের লীলা তাহে তুমি হেরিছ সৃজন,
গ্রহে গ্রহান্তরে রচি' তুলিতেছ নব আলিম্পন,
নিখিলের চিত্ততারে বাজাবে কী নবীন ঝঙ্কার ?

বিজ্ঞানীর হাতে খনিজ তৈল

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর, বি. এস্-সি

পেট্রোল, কেরোসিন, ডিসেল, লুব্রিকেটিং এসব খনিজ তৈল। ঘনত্ব অনুসারে খনিজ তৈলের শ্রেণী-বিভাগ: বিমানের জন্য উচ্চশ্রেণীর পেট্রোল, সাধারণ পেট্রোল, কেরোসিন—সাদা ও লাল, ডিসেল, লুব্রিকেটিং তৈল ইত্যাদি। ভূগর্ভে নানা প্রাকৃতিক নিয়মে এ সবের উৎপত্তি। কোন নির্দিষ্ট খনিজ তৈল বিশুদ্ধভাবে কোন খনিতে দেখা যায় না। মিশ্রিত ও অবিশুদ্ধ অবস্থায় যে তৈল প্রকৃতি আমাদের দিয়াছেন তাহা হইতে বিভিন্ন ক্ষেপে উত্তাপ সংযোগে ও অন্যরূপে পরিস্রুত করার পর আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এই খনিজ তৈলগুলি পৃথক করিয়া লই। কখন কখন দেখা যায় যে এক খনি হইতে প্রতিনিয়ত তৈলের বাষ্প নির্গত হইতেছে; তাহা আবার সর্বক্ষেত্রে এক ধরণের নয়। কোথায় তাহাতে পেট্রোলের অংশ বেশী, কোথাও বা অন্য তৈলের আতিশয্য। তৃতীয় আর একভাবে ভূপৃষ্ঠে তৈলের অবস্থান দৃষ্ট হয়—বিটুমিনাসতেল যেখানে পাওয়া যায়, তাহা হইতেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনিজ তৈল উৎপাদন করা হইয়া থাকে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে এই তিন রকম ভাবে খনিজতৈল বর্তমান।

অনুসন্ধিৎসু মানব যে কোন অঞ্চলে মাটির নীচে তৈলখনির অবস্থান নির্ণয় করিতেছে। সন্ধানী যন্ত্র-বিশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া গিয়াছে। পূর্বে মৃত্তিকা পরীক্ষা, স্থানীয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, গভীর কূপ খনন ইত্যাকার শ্রম, ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ উপায়ে একটা খনি আবিষ্কৃত হইয়া পড়িত। অধুনা বিমানে সন্ধানী-যন্ত্র ঝুলাইয়া বিজ্ঞানী নানাস্থলে ঘুরিয়া বেড়ান। যন্ত্রে কাঁটার গতিবিধি হইতে অদূর খনির উপস্থিতি ধরা পড়ে। তাহার পরে বিশদভাবে খননকার্য দ্বারা সবিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হয়। আমাদের দেশেও সম্প্রতি বিদেশীয় অভিজ্ঞদের নিযুক্ত করিয়া এইরূপে বিভিন্ন প্রদেশে তল্লাস করা হইতেছে। পাঞ্জাবে এটক ও আসাম প্রদেশে ডিগ্‌বয় অঞ্চলের খনি সমূহের পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধি আছে। এ ভিন্ন, অল্প স্বল্প তৈলের সন্ধান আছে কচ্ছ, কাথিওয়াড় ও ত্রিপুরায়।

আমেরিকার ষ্টাণ্ডার্ড ভাকুয়াম অয়েল কোম্পানী নামক তৈল-প্রতিষ্ঠানের উপর ভারত-সরকার ১৯৫০ খ্রী: অব্দে বঙ্গদেশে খনিজতৈল কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধানের ভার দিয়াছেন। এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন এদেশে এবং ইহাতে কাজে লাগাইবার মতন পূর্বে সংগৃহীত কোন তথ্যই বিদ্যমান নহে। এই কারণে কাজটির জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে সংগৃহীত কোন উপাদান পাওয়া গেলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া চলিত। অতএব এখন অর্থ ও সময় সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই প্রচেষ্টা। যাহা হউক যতদূর জানা যায় উক্ত প্রতিষ্ঠান চুক্তির সর্তমত কার্য সুরু করিয়া ১৯৫৪ খ্রী: অব্দের ডিসেম্বরে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। এদেশের প্রয়োজনমত যন্ত্রাদিও নির্মিত হইতেছে। নীম্ন নির্দিষ্ট স্থানে মৃত্তিকা খনন করার জন্য এইসব কলকব্জা আমেরিকা থেকে আসিয়া পড়িবে। এযাবৎ অন্যূন ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ও অদূর ভবিষ্যতে আরও বহু লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ইন্দো-ষ্টান্-ভ্যাকু-পেট্রোলিয়াম প্রজেক্ট নাম দিয়া এই পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতেছে। ব্যবস্থা হইয়াছে যে কম-বেশী দশ হাজার বর্গমাইল

পরিমিত এলাকায় এ কার্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা ব্যতীত ভারতের অন্যপ্রদেশেও অনুরূপ কার্য হইতেছে। আসামদীর দাহ গ্যাস পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে—সেই গ্যাস তৈল উৎপাদনে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের যুগে মানুষ বহু অসাধ্য সাধন করিতেছে। বিশ্বের নিয়মে ভূগর্ভে ঘন তৈল চাপ, তাপ ইত্যাদির প্রভাবে কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া লঘুতর তৈলের আকার ধারণ করে। পেট্রোলাদি হাল্কা তৈল এই ক্রমবিবর্তনের অন্তিম অবস্থা। যুগ যুগ ধরিয়া এই অবস্থান্তর সংঘটিত হইতে থাকে। বিজ্ঞানী কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে এই রূপান্তর ঘটাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। কি করিলে খনিজ ঘন তৈলকে দরকারমত লঘু পেট্রোল, কেরোসিন, ডিসেল, এইসব আকারে আনা যায় তাহা লইয়া চিন্তা সুরু হইল। প্রকৃতির ধীর মন্থর প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে বিজ্ঞানের বলে। নানা প্রক্রিয়া ও জটিল যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। খরচের আধিক্যহেতু প্রথম প্রথম এ প্রচেষ্টা শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই। নানা বিপর্যয়ের পর যে সব প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘন তৈলের সূক্ষ্ম কণিকাগুলিকে চূর্ণ করিয়া তৈলটির অবস্থান্তর ঘটান হয়। এইসঙ্গে তাহার গুণাবলী বা সহজধর্মও বদলাইয়া যায় তাহা বলাই বাহুল্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ঘন লুব্রিকেটিং তৈল-কণিকা চূর্ণ করিয়া পেট্রোলের উৎপত্তি হইল। এই বিভাজন প্রক্রিয়া ক্রাকিং প্রক্রিয়া নামে বিদিত।

ক্রাকিং প্রক্রিয়ার জন্য নানারকমের যন্ত্র ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। মূল উপাদানরূপে যে রকম তৈল ব্যবহৃত হইবে তাহার উপর প্রণালী বিশেষ নির্ভর করে। যদি মূল তৈল অত্যন্ত ঘন রকমের হয়, সে ক্ষেত্রে যে যন্ত্র ও প্রণালী কার্যকরী হইবে, পাতলা ধরণের তৈলের বেলায় তাহা প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ উৎপাদন হইবে না। মোট কথা, সকল যন্ত্রের উদ্দেশ্য একই—ঘন তৈলকে হাল্কা অবস্থায় লইয়া আসা। উল্লেখযোগ্য কতকগুলি পদ্ধতির নাম :

(১) টিউব ও ট্যাঙ্ক ক্রাকিং যন্ত্র—ইহা অধিক মাত্রায় ঘন উপাদান ক্রাকিং করার উপযোগী। ইহাতে দরকার ৭৫০—১,০০০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগের ;

(২) ডব্‌স ক্রাকিং প্রসেস—তৈল-শিল্পে বিশেষ প্রচলিত ;

(৩) ডি ফ্লোরেজ ক্রাকিং প্রসেসে ৪৮২° সেন্টিগ্রেড্ পর্যন্ত তাপ ও প্রতি বর্গইঞ্চে ২০০ পাউণ্ড বা তদুপরি চাপ প্রযুক্ত হয়। ইহাদ্বারা উত্তম গ্যাসোলিন প্রস্তুত হয়। তাহা ব্যবহার করিলে ইঞ্জিনে মোটেই শব্দ উঠে না। এই শব্দ বা ব্যাক্ ফায়ারে ইঞ্জিনে বকল পড়ে; বস্তুতঃ বিমান ইঞ্জিনে ইহা হওয়া অতি বিপদজনক; সেই কারণে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লঘু তৈল বিমানে দেওয়ার রীতি। এই ধরণের তৈলকে হাই অক্টেন গ্যাসোলিন বলে ;

(৪) জাইরো ক্রাকিং প্রসেস—নিম্নতর তাপ কিন্তু অধিকতর চাপ প্রয়োগ এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট। ইহার সুবিধা (ক) উৎপন্ন গ্যাসোলিন অন্যউপায়ে তৈয়ারী তৈল অপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগ লঘুতর। অতএব খনিতে প্রাপ্ত আসল পেট্রোল ইহাতে আর মিশ্রিত করার দরকার হয় না। (খ) ইহা ব্যবহারে ব্যাক্ ফায়ার হয় না। (গ) যে ঘন তৈল অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে এবং যাহা আর ক্রাকিং করা চলেনা সেইটিও কাজে লাগে। জাহাজে জ্বালানী তৈল হিসাবে ভাল চলে। (ঘ) আনুষঙ্গিকভাবে এই পদ্ধতিতে যে গ্যাস উৎপন্ন হইয়া পড়ে তাহারও চাহিদা রহিয়াছে। রসায়ন শিল্পে ইহা এক প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

ক্রাকিং পদ্ধতির প্রয়োগে কোথাও কোথাও ঘন তৈলকে নির্দিষ্ট ঘনত্বায় পরিবর্তিত করিয়া বিশেষ

বিশেষ প্রয়োজনের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয়। এইরূপ করিলে তৈলটি পূর্বের মত সহজে জমিয়া যায় না—এই সুবিধার জন্য ইহার ব্যবহার-ক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়া যায়।

ভারতে পর্যাপ্ত খনি তৈলের সন্ধান হইলে এইসব বৈজ্ঞানিক উপায়ে সকল রকম খনিজ তৈল করিয়া লওয়া চলিবে। কালে এ ক্ষেত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। উপস্থিত কোন কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান তৈল-শিল্প হাতে লইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলে কাজ চলিয়াছে। প্রথম প্রথম জাহাজ ভর্তি বিদেশজাত খনি তৈল আনাইয়া কাজ আরম্ভ হইতেছে। ভবিষ্যতে মূল তৈল এদেশেই সংগৃহীত হইতে পারে। সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীমত ভারতে এই এই শিল্পের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্বের অনুপাতে ভারতে অবিশুদ্ধ তৈল উৎপাদনের হিসাব (১০,০০০ টনের সংখ্যায়):

	১৯৪৮	১৯৪৭	১৯৪৬
ভারত	৩০০	৩০০	২৮৪
জগৎ	৪,৭১,৭৬০	৪,১৪,০৭৬	৩,৭৭,০৯৫

শক্তি উৎপাদকরূপে খনিজ তৈল বর্তমান যুগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূল্য ও পরিমাণে ইহা অন্যতম প্রধান পণ্য। এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এই কাজে দশ লক্ষের বেশী লোক নিযুক্ত আর দেড় শত কোটি ডলার তথায় মূলধন। সে তুলনায় আমাদের শিল্পের শিশু অবস্থা মাত্র। ভারতে বার্ষিক তৈল খরচ গড়ে প্রায় সত্তর কোটি গ্যালন আর এইখানে উৎপন্ন হইতেছে কেবল ছয় কোটি, আশী লক্ষ গ্যালন—শতকরা দশ ভাগও উৎপন্ন হইতেছে না। ফলে বিদেশী তৈলের উপর নির্ভর করিয়া বৎসরে আমরা প্রায় ৬৫ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতেছি। ভারত সরকার অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতিবিধানের জন্যই তিন-বিদেশী কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহাদের একটির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্মাশেল ও ক্যাল্টেক্স অপর দুইটি প্রতিষ্ঠান। তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি আনাইয়া এ দেশে উত্তমরূপে কাজ আরম্ভ করিবেন। নিয়োজিত মূলধন হইবে মোট প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা। তাহারা সুবিধাজনক সর্তে বিদেশ থেকে কাঁচা মাল আনাইতে পারিবেন যতদিন ভারতে এরূপ উপাদান সংগৃহীত না হয়। আমাদের সর্বরূপে এ শিল্পে অভিজ্ঞ হইতে হইবে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইতে পারি। প্রথম পঁচিশ বৎসর এ শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে না, ইহাও একটি সর্ত করা হইয়াছে। তৈল পরিষ্কৃতি কার্যের কালে যে সব দ্রব্য আনুসঙ্গিকভাবে উৎপন্ন হয় সেগুলিকেও ভারতের বাজারে ছাড়িতে তাহারা চুক্তিবদ্ধ। এই উপায়ে এ দেশে মোম, কিনাইল জাতীয় দ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, নানাবিধ পালিশ, জমির সার, প্লাষ্টিক ও বহুবিধ রসায়ন শিল্পের জিনিষের উৎপাদন ও বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্ণ উদ্যমে প্রতিষ্ঠানত্রয়ের কর্ম যখন চলিতে থাকিবে তখন দিনে অনুমান ৮৫,০০০ ব্যারেল তৈল পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের হিসাবে দেখা যায় যে আমাদের দৈনিক খরচ প্রায় ৭০,০০০ ব্যারেল—বৎসরে গিয়ে দাঁড়ায় মোট ২৫, ৭০০,০০০ ব্যারেল। নানা শিল্পোন্নতি ও অন্যভাবে দেশের অগ্রগতির সঙ্গে এই চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং দৈনিক খরচ উঠিবে ১০০,০০০ ব্যারেলে। তখন দেশেই উৎপন্ন হইবে ৮৫,০০০ ব্যারেল। ইহা স্বয়ং সম্পূর্ণতার সূচনা করে। জগতে তৈল শিল্পে অগ্রণী কুড়িটি দেশের অন্যতম বলিয়া তখন ভারত পরিগণিত হইবে।

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ

মানুষের সমাজে এমন বরেণ্য পুরুষের আবির্ভাবও দেখা যায়, যাঁর কথা বলিবার জন্য অন্তর অনিবার্য্য-ভাবে মুখর হইয়া ওঠে, অথচ বলিতে গেলে চিত্তে দ্বিধা আসে; প্রচুর লিখিবার থাকিলেও লেখনী বারবার থামিয়া পড়ে। ভয় হয়, যদি বড় বলিতে যাইয়া ছোট করিয়া ফেলি; যদি শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসি! মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদেরই একজন যাঁরা তাঁদের বিষয়ের বক্তা বা লেখককে—এমনই শঙ্কটে ফেলেন।

কলিকাতার এক অবিস্মরণীয় পরিবারে এক পুণ্য-শ্লোক দম্পতি—বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরীর ঘরে—এক, আরো এক,—আরো এক—ক্রমে ক্রমে তিনটি দুর্লভ রত্নের অনির্ব্বাণ জ্যোতিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল;—মহেন্দ্রনাথ সেই অপরূপ ত্রিরত্নের অন্যতম। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সমাজে পরিবার গোষ্ঠির ইতিহাসে এই পরিবার এবিষয়ে বোধহয় অনন্য। এমন ঘটনা যেন সৃষ্টি কর্ত্তার এক গূঢ় অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত বহন করে। নইলে, যুগপৎ তিন দিক্‌পাল সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া কোন্ কুল এমন পবিত্র: স্তন্য দান করিয়া কোন্ জননী এমন কৃতার্থা?

তিনজনই মহাবীর্য্যের সিদ্ধ সাধক; কিন্তু আমরা জানি, তিনের গতি পথ দৃষ্টতঃ সর্ব্বাংশে এক নয়। উল্লেখযোগ্য ঐক্যটি লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই,—তিনজনই অকৃতদার। আরও,—তিনজনই নির্ভীক; তিনজনেই ঐহিক ভোগ সুখ-বিরাগ, তপস্বী সুলভ একাগ্র চিত্ততা,—ধ্যান তন্ময়তা। প্রধান অনৈক্য—নরেন্দ্র দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ রূপে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পতাকাবাহী, বিশ্বআলোড়নকারী আধ্যাত্মিক মহাযোদ্ধা। মায়ার নির্ম্মোকমুক্ত স্বমহিম আত্মা বিবেকানন্দের রক্তমাংসের দেহ-পিঞ্জরে বেশীদিন আবদ্ধ থাকেন নাই; আমাদের দৃষ্টিতে অতি অকালেই—মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথের দেহত্যাগ। মহেন্দ্রনাথ হৈ-হল্লোড়হীন, অনলস জ্ঞানমধুব্রতী; দীর্ঘ ৮৮ বৎসর কাল দেহ ধারণের পর মহাপ্রয়াণ। আর,—যাঁদের হাতের যোষা-বিস্ফোরণ প্রবল প্রতাপ ইংরাজের শ্রীহা চমকাইয়াছিল আর মেষবালীর অসাড় নিদ্রার অবসান ঘটাইয়াছিল,—দেশের স্বাধীনতা সাগর সেই দুরন্ত যুবক দলের অন্যতমরূপে ভূপেন্দ্র দত্তের প্রথম পরিচয়। ত্যাগপূত দুঃসাহসিক-কর্ম্মজীবনের পরিশেষে মহামনীষীরূপে ইনি এখনো জীবিত।

নরেন্দ্রানুজ মহেন্দ্রনাথ। তাঁর আবির্ভাব ১২৭৪ সালের ২৯ শ্রাবণ, কৃষ্ণা নবমীতে। ১৩৬৩ সালের ২৬শে আশ্বিন শারদীয়া মহাষ্টমীর দিন অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন; ২৮শে আশ্বিন রবিবার অধিক রাত্রে—নশ্বর দেহত্যাগ।

প্রতিভা, উদ্যম, সংযম, ভোগ, নিস্পৃহা, ত্যাগ,—আবার—সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ববোধ, মৌলিকতা, মনস্বীতা, জ্ঞান-তপস্যা, অনহঙ্কার, অমায়িকতার দৃষ্টান্তে তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস মহিমান্বিত। জ্ঞানীতে কি ভক্তি থাকে?—কেহ বলেন, 'থাকেনা'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।" 'শুদ্ধ' অর্থ—যথার্থ, অনাড়ম্বর, উদার। জ্ঞানবৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথে ভক্তির অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ধারণা অমূলক নহে। তাঁর মৌলিক রচনা বলীর সুদীর্ঘ তালিকার একদিকে আছে—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি, স্থাপত্য, কলা ইত্যাদি নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ; অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অন্যান্য সাধু মহাপুরুষের জীবনী অনুধ্যান, আলোচনা এবং নানাতীর্থ পর্য্যটন কাহিনী মূলক গ্রন্থরাজী—যেখানে

ভক্তির পরিচয় সুপ্রকট। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—উচ্চ-আয়ত জ্ঞান-হিমাদ্রির, আর তারই অঙ্গে ভক্তি-গঙ্গার উদ্ভব-গোমুখী—মহেন্দ্র নাথের ইহাই যেন পরিচয়।

বিবেকানন্দের মত অত নিবিড় ভাবে না হইলেও মহেন্দ্রনাথও রামকৃষ্ণদেবের দর্শন, স্পর্শ, সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু রামকৃষ্ণ পথ পরিক্রমায় তিনি সর্বতোভাবে জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করেন নাই। বিবেকানন্দ গৈরিক চিহ্নাদিসহ আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; মহেন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই,—হয়ত, বাহ্য সন্ন্যাস চিহ্ন বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য্য মনে করেন নাই। এখানে, অপরিণত বয়সেই তাঁর চিন্তার স্বকীয়তার প্রাধান্য দেখি। নরেন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ দত্ত পরিবারের উপর অযাচিত কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন; কিন্তু কাহারও ব্যক্তিত্বে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মহেন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের প্রণালীতে না হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মানিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন, ভক্তি করিয়াছেন। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা—"রামকৃষ্ণ অনুধ্যান" এ ইহার প্রমাণ পাই। অপরিণত প্রথম জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পাশ্চাত্যে বিশেষতঃ আমেরিকা-ইংলণ্ডে সুধী সমাজে সিংহপ্রায় ভারতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রচুর খ্যাতি ও প্রভাব দেখা দিয়াছে; তাঁর যে কোন অভিপ্রায় বা নির্দেশ—সাগ্রহে প্রতিপালন করিবেন এমন অনুরাগী ব্যক্তি-বিশেষ তখন দুর্লভ নহে। এমন দিনে লণ্ডনে মহেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠকে ধরিলেন—তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবেন; কোন গণ্যমান্য ভক্তের দ্বারা পড়ার খরচের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। স্বামিজী অনুজকে নিবৃত্ত করিলেন; শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রায় এবং পরিবারের প্রতি তাঁর কৃপার কথা স্মরণ করাইলেন।

স্বামিজী অনুমোদন না করিলেও মহেন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় তাঁর পড়িবার পথ করিয়া লইতে পারিতেন না, ইহা মনে করিতে পারি না। কিন্তু তিনি নিরস্ত হইলেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর পায়ে নিবেদিত প্রাণ—স্বামিজীর অভিপ্রায়ের অমর্য্যাদা করেন নাই। এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভাব-কর্ম বিগ্রহ বিবেকানন্দের প্রতি এই যে বশ্যতা, ইহা ভক্তিরই নামান্তর, বলিতে হয়।

দৃশ্যতঃ রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হইলেও—যখন দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা বলিতে বা লিখিতে বসিয়া তন্ময়ত, তন্ময় হইয়া যান, তখন তাঁকে ভক্ত আখ্যা না দিব কেন? শুধু ভক্ত নন,—বলিতে ইচ্ছা হয়—নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া মহেন্দ্রনাথও রামকৃষ্ণ ভাব-উদ্যানেরই একটি অবিস্মরণীয় মহীরুহ।

সংঘ বার্তা

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব: ১২ই আশ্বিন ১৩৬৩, (২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬) শুক্রবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর ৯১তম জন্ম-তিথিউৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত মঙ্গলারাতি, বিশেষ পূজা, সাধারণ সভা ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা হয় এবং সঙ্গীত বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ভজন ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত করেন। মধ্যাহ্নে সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কথক-শিরোমণি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবন ও বাণী সঙ্গীত সহযোগে কথকতা করিয়া সকলকে বিমল আনন্দ দান করেন। তৎপরে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত

নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় সাধারণ সভায় অধিবেশন হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের পৌরহিত্য করার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ একটি জরুরী ব্যাপারে তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে হয় বলিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হয়। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী উদ্বোধন সঙ্গীত ও স্বামী দুর্গানন্দ মহারাজ শান্তি পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীদমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী জ্ঞানাত্মজী প্রভৃতি বক্তাগণ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মনীষা পূর্ণ, অধ্যাত্ম ও কর্মময় জীবনের আলোচনা করেন। সভাপতির অভিভাষনে শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমুদবন্ধু সেন মহাশয় মানুষ অভেদানন্দের ক্রমোন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠার অবদান ও দেশহিতকরে কৃতকর্ম ধারার আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'দেবতা অভেদানন্দের অনুধ্যান অপেক্ষা আমাদের মত মানুষের কর্তব্য প্রথমে অভেদানন্দ কি ভাবে নিজের অধ্যবসায়, সাধনা ও প্রাণপাত পরিশ্রম ও প্রচারের দ্বারা জগতের জ্ঞানলিপ্সু সাধারণকে আলোকের ও শান্তির পথ দেখাইয়াছিলেন ;—তিনি মানুষ হইয়াই অতি মানুষী চেতনা লাভ করিয়াছিলেন ; একথা চিন্তা করা আমাদের কতো মানুষের পক্ষে শ্রেয়। তাহাতে তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সহজ ও সরল হয়।' পরিশেষে তিনি বলেন যে—'আজিকার এই জন্মোৎসব অনুষ্ঠান প্রতিপালন করা সার্থক হইবে যদি স্বামী অভেদানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভা, বিশ্বজোড়া প্রাণের বেদনাকে আমাদের জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারি।' পরে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সভাপতি ও বক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। বিখ্যাত বংশীবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল ও তাঁর সম্প্রদায় এবং বেতারশিল্পী শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও তাঁর সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা : দেবীপক্ষে গত ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে আশ্বিন, শুক্লা ৭মী ৮মী ও নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর শারদীয়া পূজা যথারীতি নিষ্ঠা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মহানবমীর দিন অগণিত ভক্ত নর-নারীর মধ্যে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য দিন সাধারণ ভাবে দেবীর প্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিল্পী ও তাঁদের সম্প্রদায় কর্তৃক সৎ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন, বংশীবাদন ইত্যাদি আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ-সঞ্চার এবং কম-বেশী বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও উক্ত তিন দিনই সকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত দলে দলে নর নারীর আনন্দ কলরোলে মঠের পূজা-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ২৮শে আশ্বিন, রবিবার প্রতিমা-বিসর্জন ও বিজয়া কৃত্যাদিতে মহাপূজার উপসংহার হয়।

২রা কার্তিক শুক্রবার, কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে প্রতিমাতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এই উৎসবে বংশীবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল ও তাঁর সম্প্রদায় গীত-বাদ্য দ্বারা সমবেত ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করেন।

এই মহাপূজার আনন্দোৎসবের মধ্যে গভীর মনোবেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে সেই সব দুর্ভাগা বন্যা-দুর্গত মা-ভাই-বোনদের কথা বারবার মনে হইয়াছে, যাদের মুখে এবার একটুও পূজার হাসি ফুটিয়া উঠে নাই।

ধর্মালোচনা : প্রতি সপ্তাহে সোমবার হইতে শুক্রবার পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরিয়া পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য মহাশয় মঠে নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন।

কথকতা : প্রতি রবিবার সন্ধ্যারতির পর সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত কথকতা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন :—প্রতি শনিবার বেলা ৩টার সময় সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর পরিচালনায় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন ও অন্যান্য ভজন গান হইয়া থাকে।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—দশম সংখ্যা
বার্ষিক মূল্য চারি টাকা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩
প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬ : ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

MEMOIRS OF RAMAKRISHNA

by SWAMI ABHEDANANDA

(Third Edition)

- His Life Divine.
- Dialogues of the Master in 'Excellent English'
- Personality of the supermystic has become living in these sweet incidents

A learned introduction by the Swami reveals a new light to understand the Life and Teachings of Sri Ramakrishna. This book has been translated into Spanish, Portuguese, Danish, Scandinavian, Szechoslovak etc. A critical and sincere reader will find this international book the best in the field and is sure to be blessed with serene peace and enlightenment by a deep study of it.

Demy 8vo. XVI+355. Pages. 9 pictures Price : Rs. 7/8.

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH : 19B Raja Rajkrishna St. Calcutta 6

SREE RAMAKRISHNA AND WORLD CULTURE

by TAMASHRANJAN ROY

(Second Edition)

A novel and scientific study of the life and philosophy of Sree Ramakrishna. The approach is completely new and amply suited to the need of the new age

Get a copy for your library. Price : Rs. 3/12

Published by **Ramakrishna Vedanta Ashram, Darjeeling.**

Also to be had at :

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH : 19B. Raja Rajkrishna St. Calcutta-6

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

পুনর্জ্জন্মবাদ

সকল প্রাণীই ক্রমবিকাশের পথে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। অনাদিকাল হইতে মানুষের এই পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস। এ ছাড়া জগতের এত বৈষম্য—বিকাশের এই বিপুল স্তরভেদ সম্ভব নয়। যুক্তির চাইতে অবতারবাদ করিয়াই খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় এই মতবাদকে স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্বামীজী মহারাজ অপূর্ব যুক্তি বিচার দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া এই পুনর্জ্জন্মবাদকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নূতন সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সম্পাদক স্বামী সমাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	নিত্যস্মরণ (শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী)		৫৫৭
২।	বিপ্লবী রামকৃষ্ণ	শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়	৫৫৮
৩।	ছিন্ন কর সংশয়ের জাল (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাস	৫৫৯
৪।	কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীমমতা মিত্র	৫৬০
৫।	ভগিনী নিবেদিতা (কবিতা)	শ্রীশান্তিময় ঘোষ	৫৬৪
৬।	স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ	শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী	৫৬৫
৭।	বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ বিভাগ ...	শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী	৫৬৮
৮।	প্রেমধর্ম ...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৭০

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৪ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্, ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট, লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৯।	প্রবচন ব্রত কথা ...	শ্রীহরদেব রায়	৪৮২
১০।	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	স্বামী বেদানন্দ	৪৮৫
১১।	কামাখ্যা তীর্থ যাত্রী (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৪৯৩
১২।	জৈনধর্ম্ম ও সংস্কৃতি	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৪৯৪
১৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ গীতিকা (কবিতা)	৺গণীপ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৫০১
১৪।	অভিপ্রায় প্রাপ্ত এক	শ্রীকালীপদ কোঙার	৫০১
১৫।	গ্রন্থসমালোচনা		৫০২
১৬।	সংঘবার্ত্তা	...	৫০৪

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

আগামী ফাল্গুন মাসে (১৩৬৩), বিশ্ববাণীর ঊনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। দুই একটী বিশেষ কারণ বশতঃ আমাদিগকে ঐ বর্ষ হইতে বার্ষিক বিশ্ববাণীর মূল্য চারি আনা বৃদ্ধি অর্থাৎ সডাক চারি টাকা, চারি আনা করিতে হইল। আমাদিগের সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কথা স্মরণ রাখিয়া আগামী মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে ১৯শ বর্ষের মূল্য আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বিশ্ববাণীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার সহায়তা করিবেন আশা করি।

নিবেদক

ম্যানেজার—বিশ্ববাণী

K.C.GANGULY
& CO.

Dealers in:-

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বোস ডেকরেটরস্

২০৪ রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা-২৯

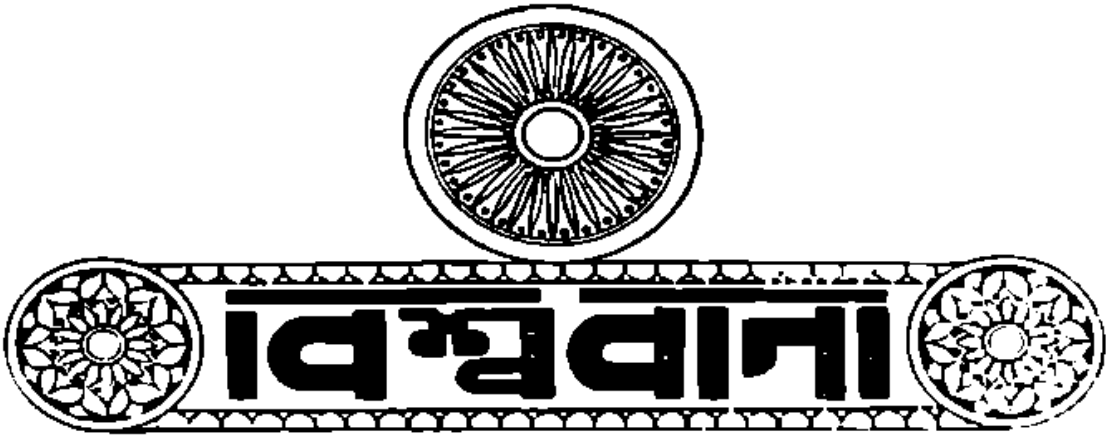

অষ্টাদশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৬৩ | দশম সংখ্যা

॥ নিত্য-স্মরণ ॥

"সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ী, কলিকাতায় গিয়ে কর্ম করে। কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ্গ, সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে—সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়্ছিল। তারপর তামাক খাবে।

খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটী ভেদ করে। মাটী ফেটে যায়।

ঠিক ঠিক ত্যাগী সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে। তারা মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে মধুপান করে। সংসারে কামিনী কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে; আবার কখন কখন কামিনীকাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে, আর পচা ঘায়েও বসে; বিষ্ঠাতেও বসে।

ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখ্বে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর পেন্সান্ ভোগ করবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

বিপ্লবী-রামকৃষ্ণ

শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়

আজ আমি যদি বলি আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একজন বিরাট বিপ্লবী ছিলেন—তবে পাঠকপাঠিকাগণের অধিকাংশই আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দীহান হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আমি নিঃসন্দেহ আছি। তথাপি আমি আমার অন্তরের কতকগুলি কথা বলিতে চাই তাহা আপনাদের ভাল লাগিতেও পারে, নাও লাগিতে পারে।

কিন্তু আসল বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে আমাদিগকে 'বিপ্লবী' শব্দটীর প্রকৃত অর্থ জানিতে হইবে। বিপ্লবীর অর্থ এক্ষেত্রে বিদ্রোহী, কিন্তু এই বিদ্রোহের পিছনে থাকিবে সদুদ্দেশ্য। বিপ্লবীগণ সাধারণতঃ দুই প্রকারে বিপ্লব করিয়া থাকেন। কতক বিপ্লবী হাতে-কলমে বিপ্লব করিয়া থাকেন। যেমন ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, ইত্যাদি। আবার কতক বিপ্লবী (যদিও তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম) তাঁহাদের ছন্দে, গল্পে, গানে জ্বালাইয়া তোলেন বিপ্লবের দাবানল। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল, এই জাতীয় বিপ্লবী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিপ্লব করিয়াছিলেন সম্পূর্ণ অভিনবোপায়ে—তিনি বিপ্লবের বীণায় ধ্বনিয়াছিলেন নূতন রাগিনীর অমর ঝঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন এক অবিস্মরণীয় সময়ে। ভারত তখন তার প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, কুশিক্ষা, পরধর্মানুকরণ ইত্যাদি তাহার উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় স্বরূপ ছিল। তারও পর চলিয়াছিল বৃটীশের শাসন বনাম শোষণ নীতি। ভারত তখন তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও সেই অবনতির সুচিভেদ্য অন্ধকারের মাঝে পাইতেছিলনা একটু উন্নতির আলো। তখন তার চিরাচরিত প্রয়োজনের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই বিধানানুসারে শ্রীভগবান এবার আবির্ভূত হইলেন ভারতের বুকে এক সদ্ ব্রাহ্মণবংশে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম লইয়া। আমরা যদি উপরোক্ত শ্লোক বিশ্বাস করি, তবে আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিপ্লবী। কারণ যে মহামানবগণ উপরোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে আসিয়াছেন, তাহাদিগকে বিপ্লব করিতেই হইয়াছে। তবে তাহা অসির দ্বারাও হইতে পারে অথবা বিনা অসিতেও হইতে পারে। আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখিতে পাই কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি অবতারগণের বিপ্লবের ইতিহাস।

কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ কল্পনাকে বিশ্বাস করেনা—সে প্রত্যক্ষ করিতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ জীবনে উদাহরণের অন্ত নাই।

প্রথমে আসে অস্পৃশ্যতার কথা। অস্পৃশ্যতা ভারতবাসীকে দুরারোগ্য ব্যাধির মত দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল—আজও তাহা সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই। আজ যে চতুর্দ্দিকে 'হরিজনদের' লইয়া বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি অতি সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শুনাইয়াছিলেন—'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'। কেবল মুখেই বলিলেন না, মানবের তৃপ্তির

জন্ত সকলের সমক্ষে খাইলেন কাঙ্গালের উচ্ছিষ্ট অন্ন, নিজ-চুল দ্বারা পরিষ্কার করিলেন পায়খানা। তিনি সেদিন বুঝিয়াছিলেন যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ভিন্ন ভারতের উন্নতির কথা উত্থাপন করা অরণ্যে রোদন-তুল্য।

তারপর সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইল তাঁহার বাণীতে, 'জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা।' কারণ দানের সময়ে দাতার হৃদয়ে সৃষ্ট হয় অভিমান এবং দান পরিগ্রাহীর হৃদয়ে আবির্ভাব হয় হীনতার। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এ যুক্তি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে থাকিবে পার্থক্য! সেই জন্ত সেদিন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন—'না না দয়া নয়। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব একে অপরকে দয়া করিবার শক্তি কোথা হইতে লাভ করিবে!' তখন দূর হইয়া গেল পার্থক্য, রচিত হইল মিলনবাণী।

এরপর আসে ধর্মের কথা। ধর্মও বিপ্লবের অঙ্গীভূত। কারণ ধর্মের অর্থ, যাহা আমাদিগকে ধারণ করে,—অর্থাৎ সর্ববিষয়ের পরিচালক। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন অধিকাংশ কুশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকগণ স্বীয় ধর্মকে হেয় মনে করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিতেছিলেন—ইহা জাতীয় ধর্মের করুণতম ইতিহাস, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরে বসিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করিলেন—যত মত, তত পথ। সকলরূপ ধর্মের দ্বারা তিনি সেই একই মা ভবতারিণীর দর্শন পাইলেন। তখন বেদের কর্ণধার ভ্রান্ত যুবকগণ সচেতন হইয়া উঠিল—স্পর্শমনির পরশে পাথর হইল সোনা। পরধর্মানুকরণ-অগ্নিতে তিনি জলাহুতি দিলেন। সেদিন তিনি সেখানে বসিয়া সকলের অজ্ঞাতে একটী বৃহৎ সৌধের ভিত্তিও স্থাপন করিলেন, বহুবছর পরে আজ সে সৌধ গড়িয়া উঠিল —তার নাম হইল সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব; আজ চতুর্দ্দিক হইতে শোনা যায় Co-operation, Brother hood ইত্যাদি। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী ভারতের পদতলে আশ্রয় লইয়াছে একটু শান্তির আশায়।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন বিরাট বিপ্লবী। তাঁহার সর্বমুখী দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল দেশের সমস্ত সমস্যার প্রতি।

ছিন্ন কর সংশয়ের জাল

শান্তশীল দাস

তুমি মোর সাথে আছ, কেন ভুলে যাই,
কেন মনে হয়, আমি বড় অসহায়।
সম্মুখে চলার পথে কেন ভয় পাই;
কেন বারে বারে মন ভরে নিরাশায়।

তুমি মোরে ভালবেসে ভরেছ জীবন,
দিয়েছ কত না আলো অজস্র ধারায়;
সে-দানে সমৃদ্ধ ক'রে আমার ভুবন
গড়িনি, তাইতো মন ভরে বেদনায়।

আমার জীবন-পথ আলোকিত করে
দিয়েছ যে, তবু কেন আঁধারের ভয়;
অকারণ হতাশার আঁখিবারি ঝরে,
মেনে নিই বারে বারে মিথ্যা পরাজয়।

ছিন্ন করে দাও তুমি সংশয়ের জাল,
তোমার আমার মাঝে ঘুচুক আড়াল।

কালীপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমীরা মিত্র

(১৩৬২, ভাদ্রের পর)

নীলকণ্ঠের যাত্রা হ'চ্ছে কলকাতায় লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো সে খবর। খ্যাতিতে পঞ্চমুখ বহুজন। প্রেমিক ও সাধক নীলকণ্ঠের প্রাণঢালা অভিনয় শত শত লোককে অভিভূত করেছে। বৃন্দাদূতীর ভূমিকায় তার সুমধুর গান ও ভাবসমৃদ্ধ ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের মুখ থেকে কথাটা শ্রীরামকৃষ্ণের কানেও পৌঁছালো। হাটখোলার বারোয়ারীতলার আসরের উচ্ছ্বাস উজান বেয়ে গিয়ে পৌঁছালো দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গনে। ভক্তিরসের মাতাল শ্রীরামকৃষ্ণ উতলা হ'য়ে উঠলেন নেশার টানে। শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা না দেখে আর থাকতে পারছেন না। ভোরবেলা ঘোড়ার গাড়ী একটা ভাড়া করে আনা হোল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে রওনা হলেন কলকাতা। সঙ্গে চললেন লাটু ও কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদ তখন দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন হাটখোলায় পৌঁছালেন তখন প্রভাত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আগের দিন রাত্রেই যাত্রা আরম্ভ হ'য়েছে, সেদিন তখন বেশ জমে গেছে। বারোয়ারীতলায় তিল ধারণের জায়গা নেই। কালীপ্রসাদ দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে সেই জন-সমুদ্র পার হ'য়ে আসরে স্থান নেওয়া দুরূহ। তিনি সোজাসুজি নীলকণ্ঠকে খবর পাঠালেন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন যাত্রা শুনতে। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম তখন মুখে মুখে। নীলকণ্ঠেরও অজানা ছিলনা; সসম্ভ্রমে ছুটে এলেন তিনি হাত ধরে নিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। লোকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিস্মিত হ'য়ে দেখতে লাগলো কে! একেবারে সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন নীলকণ্ঠ তাঁকে। পাশে বসলেন লাটু আর কালীপ্রসাদ। যাত্রা চলতে লাগলো, সবাই উপভোগ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর। —এবার বৃন্দাদূতী সেজে বার হ'লেন স্বয়ং নীলকণ্ঠ। গান ধরলেন "পীরিতি এতিন আখর কে সৃজিল রে"। অমৃতবর্ষী কণ্ঠ তাঁর সুধা-ধারা ঢালতে লাগলো শ্রোতার কানে। কেঁপে উঠছে তাঁর ঠোঁট, শ্রীরাধার অন্তর্দাহ ঝরে পড়লো তার 'পীরিতি' তিনটী অক্ষরের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে, হৃদয় নিঙড়ানো ব্যথায় ভারি হ'য়ে এলো তাঁর কণ্ঠ। শুধরে উঠলো শ্রোতার প্রাণ কি এক অব্যক্ত বেদনায়। দাঁড়িয়ে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে গেল আসর। সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি-গতি মোড় ঘুরে স্থির হ'য়ে নিবদ্ধ হোল সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির উপর। আনন্দে আত্মহারা শ্রীকণ্ঠ দুহাত দিয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় দিতে লাগলেন তারপর দ্বিগুণ উল্লাসে গাইতে লাগলেন, দুচোখ বেয়ে তাঁর ঝরে চলেছে জলের ধারা। বিমুগ্ধ কালীপ্রসাদ নির্বাক। মনের মধ্যে কে বলে চলেছে এমন দেখিনি, দেখবোনা। একি শুধু চোখের দেখা? এযে প্রাণের নিবিড় উপলব্ধিতে চিরদিনের জন্য গাঁথা হ'য়ে থাকা। এ দেখা শেষ হবার নয়, ফুরিয়ে যাবার নয় —মিলিয়ে যাবার নয়। সুবর্ণের রেখা—সে তো মুছে যাবার নয়, ম্লান হবারও নয়। মন বলে সার্থক চোখ —ছিল তাই না দেখলুম। লক্ষ্য করলেন কালীপ্রসাদ ধীরে ধীরে ফিরে আসছে শ্রীরামকৃষ্ণের সংজ্ঞা। ফিরে আসছে তাঁর স্বাভাবিক ভাব। হাসি মুখে আবার বসে পড়লেন তিনি মন দিয়ে শুনতে লাগলেন গান। তিলে তিলে পলে পলে এ কি অপরূপ দর্শন

কি আশ্চর্য দিব্য শিক্ষা—কোথায় কোন্ রাজ্যে টেনে নিয়ে চলেছেন তাঁদের, এই অদ্ভুত গুরু। কি অনির্বচনীয় অনুভূতি, জগতের প্রতিস্তরে প্রতি ভাবে ভাবে লুকানো আছে—নিত্য নতুন। অমৃত-স্বাদ মাখা।

যাত্রা শেষ হোল, সকলে উচ্ছ্বাসে উদ্বেল, আহা কি অপূর্ব! প্রসন্ন চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ লাটু ও কালীপ্রসাদের সাথে আবার চড়ে বসলেন ভাড়া গাড়ীতে। সকলে তাঁরা উপস্থিত হ'লেন বলরাম বাবুর বাড়ীতে। মধ্যাহ্নের ভোজন সেখানেই সম্পন্ন হোল। বিশ্রামের পর বিকাল হ'তে না হতেই সুরু হোল জনসমাগম। দলে দলে ভক্তরা উপস্থিত তাঁর মুখ নিঃসৃত ভগবদ্ কথা শোনার লোভে।

সারা বিকাল চললো আলোচনা। নানা তথ্য, ঈশ্বর প্রসঙ্গে কত কথার সূত্রপাত। জ্ঞানের ভাণ্ডারের অফুরন্ত সঞ্চয়। কত সহজ কত সরল কিন্তু কি গূঢ় গভীর তাদের মর্ম। কালীপ্রসাদ কান দিয়ে শোনেন মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন। কত লোকের দুর্বোধ্য সমস্যা তাঁর দুচারটি সরল কথায় জলের মত স্বচ্ছ হ'য়ে উঠছে। সন্ধ্যা নাগাদ কিছু জলযোগের পর একটি ভাড়া গাড়ী করে আবার সকলে দক্ষিণেশ্বর ফিরে গেলেন।

এমনি ভাবেই চলতে লাগলো শিক্ষার পালা। প্রতিদিন প্রতি ছোট খাটো কত ঘটনার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চললো সেই শিক্ষা পরিণতির পানে। এক এক টুকরো ছোট ছোট কথা ছোট ছোট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর গুরুর অসীম জ্ঞানের জোয়ার এসে স্পর্শ করে কালীপ্রসাদকে, তিনি বিস্মিত হ'ন। যত দিন যায় ভক্তি, নিষ্ঠা, আস্থা তাঁর জমে উঠতে থাকে গাঢ় হ'য়ে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিজের বিছানায় বসে শ্রীরামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে "হরিবোল হরিবোল" বলতেন। ভাবের ঘোরে আবৃত্তি করে যেতেন "হরি গুরু," "গুরু হরি," "হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ", "প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবনং" "নাহং নাহং" "তুঁহু-তুঁহু" "আমি যন্ত্র", "তুমি যন্ত্রী" এমনি কত কি। ধীরে ধীরে সমস্ত বাহ্যজ্ঞান তাঁর লোপ পেত। বালকের মত তিনি আব্দার করতেন মা কালীর কাছে। তিনি প্রশ্ন করতেন তার উত্তরও পেতেন। সে উত্তর কালীপ্রসাদরা শুনতে পেতেননা কিন্তু অবাক হ'য়ে দেখতেন তাঁর সে অবস্থা। সন্দেহ থাকতোনা যে তাঁর ব্রহ্মময়ী মা বিশ্ব-মায়ের স্নেহমাখা মূর্তিতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ান, তাঁর আদর আব্দারের দাবী মেনে নেন, মিটিয়ে দেন তাঁর সমস্ত। নয়তো অত স্বাভাবিক নির্ভরতা আসে কোথা থেকে? অত সহজ ব্যবহার করতে পারেন কেমন করে! কার ওপর অমন নিশ্চিন্ত নির্ভর করে তিনি আপন ভুলে ভাবে ভোর হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। কৌতূহল ও আগ্রহে উদ্বেল হ'য়ে উঠতেন কালীপ্রসাদ আমারও কি কোন দিন অমনি সুযোগ আসবে।' "আহা যদি একবার দেখা পাই।" সারা জীবনও যদি তার জন্য খরচ করে ফেলতে হয় তাও তিনি করবেন। যত কঠিন সাধনাই হোক তিনি পিছিয়ে যাবেননা। দিনের পর দিন কালীপ্রসাদ লক্ষ্য করতেন। সর্বদাই উদ্গ্রীব হ'য়ে থাকতেন কোন্ কথায় কোন্ রত্ন ছড়িয়ে যেন তাঁর রত্ন-সাগর আচার্য।

"হাত তালি দিয়ে হরিনাম কর্‌বি"। হাততালি দিলে যেমন পাখীরা পালিয়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে, সেইরূপ বৃক্ষ হ'তে পাপরূপ পাখী উড়ে পালায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালীপ্রসাদ ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে ও সন্ধ্যায় জপধ্যান করতে শিখলেন। প্রত্যহ জপধ্যান করার কথায় হোতাপুরীর কথা তুলে বলতেন "ভাংটা বলতো যেমন রোজ লোটা না মাজলে ময়লা ধরে তেমন রোজ ধ্যানের দ্বারা মনকে পরিষ্কার না করলে মনেও ময়লা জমে থাকে।" ধ্যান ও সাধনার শিক্ষা দিতে দিতে নিজের কথা বলতেন কখনো কখনো উদাহরণ দিয়ে। বলতেন "আমি

যখন ধ্যান করতুম তখন পাথরের মূর্তির মতন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে অচল অটল হ'য়ে বসে থাকতুম। মাথায় পাখী এসে বসলেও টের পেতুম না। গভীর ধ্যানে যখন মন লক্ষ্যহীন স্থির হয়ে যায় তখন গায়ে মশা মাছি বসলেও টের পাওয়া যায়না, এগুলো চিত্তস্থির হওয়ার লক্ষণ জানবি।" এমনি করে তিনি নিয়ে চললেন তাঁর সন্তানদের পথ দেখিয়ে।

ব্রহ্ম ও মায়া সকল জগতের অধিষ্ঠান বিকাশের প্রেরণা। জগত রহস্যের উৎস। সেই ব্রহ্ম ও মায়াতত্ত্ব পণ্ডিতেরও দুর্বোধ্য; দার্শনিকদের দৃষ্টি-বহির্গত সেই মায়া আজও চির রহস্যের অন্তরালে। সেই চির জটিল প্রশ্নের কত সহজ উত্তরই না দিতে পারেন কালীপ্রসাদের সিদ্ধ আচার্য। সে সমস্যার সমাধান করতে পণ্ডিতদের সকল পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার খর্ব হয়। যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে জ্ঞানীর জ্ঞানের গর্ব চূর্ণ হয় সেই গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা তিনি কত সরল দু-চার কথায় বুঝিয়ে দেন। "ব্রহ্ম নির্গুণ আর সগুণও"। "নির্গুণ ব্রহ্ম কেমন জানিস? সাপ যেমন স্থির হ'য়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আবার সেই সাপ যখন জেগে উঠে এঁকে বেঁকে চলে তখন 'সগুণ ব্রহ্ম।" অপরিসীম আগ্রহ, অদম্য জ্ঞান-পিপাসা তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে, সমস্ত শাস্ত্র তিনি তোলপাড় করে তোলেন। জানতে হ'বে এই রহস্যের গোড়া কোথায়। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে অমৃতরাশির সন্ধানে মত্ত কালীপ্রসাদ; নানা বাণী, নানা নির্দেশ, তার মধ্যে তিনি কখনো আশা, কখনো উদ্বেগ আবার কখনো গভীর সংশয়ের মাঝে দিন কাটান। তবু নানা তথ্য, নানা জ্ঞান স্থান ও সময় অনুযায়ী মিলিয়ে নিচ্ছেন বাজিয়ে যাচাই করে নিচ্ছেন। সেই অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক ধীরে ধীরে যতটুকু দরকার যুগিয়ে চলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একটি ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ তাই জ্বলে উঠে উজ্জ্বল হ'য়ে কালীপ্রসাদের শাস্ত্রজ্ঞানের ইন্ধন পেয়ে। তিনি যেন 'না' বেঁধে বসে বসে আছেন আর তাঁর সাথে মিলিয়ে কালীপ্রসাদ বাঁধছেন তাঁর নানান সুরের তারগুলি। তার শুষ্ক শাস্ত্রবাণি সেই দিব্য আচার্যের অমৃত বাণীর স্পর্শে সরস শ্যামল হ'য়ে ওঠে, স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তার অর্থ। তাঁর এক একটি কথা যেন কালীপ্রসাদকে জাগিয়ে তোলে। তেমনি ছোট্ট এই সাপের উপমাটি কালীপ্রসাদকে অনেক কিছু জানিয়ে দেয়। তার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে তার শাস্ত্রজ্ঞান। তারা যেন জীবন্ত হ'য়ে জেগে ওঠে তার চোখের সামনে। মনের মধ্য থেকে কে যেন ঠিক সুর মিলিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথার রেশ ধরে বলে' চলে প্রমাণ-বাক্য। শঙ্কর ও বেদান্তের বহু বিচার তাঁর মনে পড়ে—নির্গুণ ব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দের স্থির সমুদ্র। তাতে তরঙ্গ অথবা কোন ক্রিয়া নাই অচল অটল সুমেরুবৎ। মায়াশক্তি যেন সেই ব্রহ্মে সুপ্তাবস্থায় লীন হ'য়ে রয়েছে। এই অবস্থায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, জীব জগৎ মহাপ্রলয়ে লীন হ'য়ে থাকে, মায়াশক্তি জাগ্রতা হ'য়ে উঠলে সেই সচ্চিদানন্দসমুদ্রে তরঙ্গ উঠতে থাকে। সেই অবস্থাকে বেদান্তে শাস্ত্রে সগুণ-ব্রহ্ম বলে। তখন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে গুণ-ক্ষোভ হ'য়ে সৃষ্টি-কাজ আরম্ভ হয়। এই সগুণ ব্রহ্মই "অর্ধনারীশ্বর" বা হরগৌরী নামে শাস্ত্রে অভিহিত হয়েছেন।

ব্রহ্ম মায়াশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর রূপে প্রতীয়মান হন। সগুণ ব্রহ্মে "একোহং বহু স্যাম্"—'আমি এক, বহু হ'বো-এই সঙ্কল্প ওঠা-মাত্র শক্তির বিকাশ ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আরম্ভ। মায়া-শক্তি সমন্বিত সগুণ ব্রহ্মই নিজ মায়া বা প্রকৃতি থেকে জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। শাস্ত্রবচন তার স্পষ্ট মনে পড়ে—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ।" এই বাহ্য জগৎ ত্রিগুণময়ী মায়ার বিকার। প্রকৃতির পরিণাম আছে কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামী।

কোন দিন কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন "এক

জানই সত্য,—বহুজ্ঞান অজ্ঞান—মিথ্যা"। কালী-প্রসাদের মনে পড়ে শাস্ত্রে আছে নির্গুণ ব্রহ্মে মায়ার গুণত্রয় অধ্যস্ত হ'লে সেই এক অখণ্ড সত্তাকেই পণ্ড রূপে প্রতীয়মান হ'য়। "অদ্বৈতজ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর"—গুরুর এই উপদেশ উপলব্ধি করতে কালীপ্রসাদের দেরী হ'য়না। বোঝেন, অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করলেও ঐ জ্ঞান অবিদ্যা-প্রসূত অজ্ঞানতা ও মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে বলে, জীবের মুক্তি পথে বিঘ্ন ঘটেনা। "জ্ঞাত্বিবন্ধো ভবেজ্জীব স্যাত্তি মুক্ত সদাশিবঃ।" রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মতন ব্রহ্মেতে সংসার ভ্রম হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে তখনই অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়ার নাশ হয়, যেমন রজ্জু জ্ঞান হ'লে সর্প ভ্রম দূর হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছে— ইন্দ্রো মায়া ভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে (বৃহ-উপ)।

পরমেশ্বর মায়াশক্তি দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হয়েছিলেন। তিনি মায়াকে বশে রেখে জগৎরূপে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেন। তিনি মায়াময় নামরূপ জনিত মিথ্যা অভিমান দ্বারা অথবা স্বগত বহুবিধ শক্তি প্রভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হ'ন। মায়াবদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও আত্মবিস্মৃত হ'য়ে বদ্ধ জীবের রূপ ধারণ করেন। সুতরাং বদ্ধজীব যদি আত্মস্বরূপকে জানতে পারেন, তবে অজ্ঞানের ক্রিয়া নষ্ট হ'য় ও জীব নিজেকে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হ'তে অভিন্ন জেনে মোক্ষ লাভ করে। এই জন্যই শ্রুতি বলেছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

মায়ার ফাঁদ বড় কঠিন ফাঁদ, পঞ্চভূতের বাঁধন বড় শক্ত—শুকদেব ব্রহ্মকেও তা কেমন ভাবে আচ্ছন্ন করে তাই বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। ছ্যাঁটা অতবড় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যখন রক্ত আমাশয়ে ভুগছিল, যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে গঙ্গায় ডুবে মরতে গেছলো।

"তবে সত্যি জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়।" তিনি মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন রামপ্রসাদী :

"এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে,
ব্রহ্ম বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তাহা জানতে পারে।'

মায়ার ঘোরে নিজেকে ব্রহ্ম হ'তে ভিন্ন ও পঞ্চ-ভৌতিক দেহের সঙ্গে এক মনে করে জীব, রোগ, শোক, মৃত্যু, দুঃখ, কষ্ট, ভোগ করে—এ কথা কালী-প্রসাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

কথায় কথায় একজন জিজ্ঞেস করে—"মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞান কি?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন "ব্রহ্মজ্ঞান কি তা মুখে বলা যায় না। বোবার স্বপ্ন দেখার মতন। শাস্ত্রজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কখনো উচ্ছিষ্ট হয়নি।" ছোট্ট একটি কথা—তাতেই কালী-প্রসাদের মনের দুর্বোধ্যতা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রের শ্লোকটি—মনে পড়লো। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করলেন :

উচ্ছিষ্টং সর্ব্ব শাস্ত্রানি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানং অব্যক্তং চেতনাময়ং।"

শ্লোকটির গভীর অর্থ আজ তাঁর হৃদয়ঙ্গম করতে একটু দেরী হোলনা। ব্রহ্ম কি বস্তু তা কেউ কখনো মুখে বলতে পারেনি, সেই জন্যই কখনো উচ্ছিষ্ট হ'তে পারেনি। যা উচ্চারণ করা যায় তাই উচ্ছিষ্ট হয়। বেদের বাক্য তাঁর মনে পড়ে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" বাক্য ও মন যেখানে পৌঁছাতে পারেনা, ফিরে আসে (অবাঙ্মনসো গোচরম্) উপলব্ধ সেই আনন্দস্বরূপই ব্রহ্ম।

তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু বলা যায়, ততটুকুই মাত্র বেদউপনিষদে বলা হ'য়েছে। সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্ম দর্শন অর্থাৎ বোধে বোধ হয়। তখন বিচার থাকেনা। বাক্য মন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যায়, ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়ার মত অবস্থা ঘটে। সব গলে একাকার, ভিন্ন সত্তা না থাকলে বর্ণনা করবে কে?

নির্বিকল্প সমাধিতে মানুষ বেশীক্ষণ থাকতে পারেনা, লোকশিক্ষা দেবার জন্য নীচে নেমে আসতে

হয়। তখন আবার কথা কইতে হয়। নির্বিকল্প অবস্থায় একুশদিন থাকলে শরীর নাশ হয়।

ভ্যাটার উপদেশের কথা বলেন তাঁর গুরু "মন বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবেই স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি ঘটবে।" গীতা উপনিষদের উপদেশ, জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্ব-স্বরূপ আত্মাকে জানা। আমি আর পরম ব্রহ্ম এক।

মিলিয়ে নেন্ কালীপ্রসাদ, সমস্ত শাস্ত্রের সার এই আলাভোলা পুণারীর মুখ থেকে কেমন ক'রে বেরিয়ে আসে। কত সহজ, কত অল্প অথচ কত স্পষ্ট কথায় এই মানুষটি বেদ বেদান্তের অগম্য রহস্যগুলির দ্বার খুলে দেন। দিনের পর দিন নানা ব্যাখ্যা টীকা টিপ্পনী নিয়ে সময় পাত করেও শাস্ত্রের যে দুর্বোধ্য অংশগুলির অর্থ উপলব্ধি করা যায়না, এই মানুষটীর মুখের দুচার কথায় তা কেমন সহজ-বোধ্য হ'য়ে ওঠে—হ'য়ে ওঠে স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ। বিশ্বত কালীপ্রসাদ যুক্তি তর্ক হারিয়ে ফেলেন কেমন করে সকল শাস্ত্রের সার এই পঠনপাঠন বিরত সাদা-সিদা লোকটির মুখ থেকে দিনের দিন শুনতে পাওয়া যায়। তাঁরই ব্যাখ্যায় তার শাস্ত্রজ্ঞান মূর্ত হ'য়ে ওঠে। ব্রহ্মবিৎ তার চোখের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। শাস্ত্রের যেখানে গতাগতি নেই, বেদবেদান্ত না পায় অন্ত—সেই দুর্গম অনুভূতির রাজ্যের অধিবাসীর সাহচর্য সত্যই তার ভাগ্যে জুটেছে। সেই জগতের খবর এঁর কাছেই পাওয়া যাবে।

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীশান্তিময় ঘোষ

সর্ব্ব-নিবেদিতা
নিষ্ঠার নির্ম্মাল্য তুমি, শুদ্ধ শুচিস্মিতা।
ভগ্নি নিবেদিতা !!
নলিনী-নিন্দিত কান্তি মূর্ত্ত পবিত্রতা,
নীলাজ নয়নে দৃষ্টি, সূর্য্যের শুভ্রতা,
তেজোদৃপ্ত তনুদেহ, নলিন নম্রতা,
তুমি আনন্দিতা !
ভগ্নি নিবেদিতা !!
বুদ্ধির বিজলী আভে, হাস্য-হিল্লোলিতা,
ধীমতী, শ্রীমতী ; চিত্ত করুণা-গলিতা,
প্রতিভা প্রদীপ্ত প্রভা, লাবণ্য-ললিতা,
বসুধা-বন্দিতা।
তুমি নিবেদিতা !!
নরেন্দ্র-নন্দিতা—
ভক্তির ভৈরবী তুমি—শ্রদ্ধার হসিতা
অগ্নি নিবেদিতা !
বিদ্যার বারিধি-বক্ষে—অমৃতভাষিনী !
নারীর কল্যাণে সদা অক্লান্তা নাশিনী
সেই বিদ্যা দিয়ে গেলে, জীবন-তোষিনী ;
মাধুরী-মণ্ডিতা !
ভগ্নী নিবেদিতা !!

বিশ্বের বরেণ্য বীর বিবেকানন্দের
সত্যের শাশ্বত সৃষ্টি,—সচ্চিদানন্দের
কল্যাণ-কল্পনা তুমি—পদারবিন্দের
পরম-আশ্রিতা—
তুমি নিবেদিতা !!
সর্ব্ব সমর্পিতা—
মর্ত্ত্যের মঙ্গল লাগি—অমর্ত্ত্য কবিতা—
তুমি নিবেদিতা !
ত্যাগের তুষার শুভ্র তরল চন্দ্রিকা
ও হৃদয় হিরণ্ময় ;—প্রীতি আহ্বিকা
অন্তর অলকানন্দা—প্রেম-প্রস্ফুটিতা
তুমি বিশ্ব-মিত্র !
ভগ্নি নিবেদিতা !!
স্নেহ-স্বর্গ সরস্বতী—চির সত্যাশ্রিতা,
মহিমা-মন্দারমালা-ভোগবিবর্জিতা,
রামকৃষ্ণ-পদলীনা ;—স্বামিজী-সংহিতা
শম—দম—জিতা।
নমি—নিবেদিতা !!

স্বামী নির্ম্মলানন্দ মহারাজ

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী

স্বামী নির্ম্মলানন্দ মহারাজ (তুলসী মহারাজ) স্বনাম প্রসিদ্ধ। যাঁহাদের কর্ম্ম-প্রতিভা, ধর্ম্ম-প্রাণতা, বাক-বিভূতি ও ত্যাগবলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রসার লাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র দক্ষিণ ভারত হইলেও তিনি স্বীয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও অল্প পরিচিত নহেন এবং তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যাও কম নহে। বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও আদর্শই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সর্ব্বাধিক। তিনি স্বামিজীর আদেশে আমেরিকায় প্রচারকার্য্যে গমন করেন। তিনি তথায় তিন বৎসর অবস্থান করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এখানেই তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। এখানে তিনি ২০টী মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। পরে স্বামিজীর উপদেশ ও নির্দ্দেশেই তাঁহার জীবন পরিচালিত হয়। তুলসী মহারাজ কয়েকবার ময়মনসিংহে গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ও তেজপূর্ণ বক্তৃতায় শিক্ষিতমণ্ডলী মুগ্ধ হন। তাঁহার অনুরাগী ব্যক্তিগণ ময়মনসিংহে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচার করিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পরেও এই প্রতিষ্ঠান অবলুপ্ত হয় নাই। তবে পূর্ব্বের সেই কর্ম্মপ্রবাহ আর নাই। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় একটী ধর্ম্মসমন্বয় সভার আয়োজন হইত। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর ধর্ম্মভাবের উদারতার বিভিন্ন দিক দেখাইয়া ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিতেন। ফলে ইহা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিদূরণে এবং সমাজে একটা সামাভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করিত। স্বামী নির্ম্মলানন্দই ছিলেন ইহার উৎসমূলে।

তুলসী মহারাজ ১৯৩২ সনের ২৪শে ডিসেম্বর একবার ময়মনসিংহ সহরে গমন করিয়া প্রায় পক্ষ-কাল সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী আমবাড়িয়ার জমিদার-গৃহে তাঁহার আবাস-স্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ময়মনসিংহ হইতে তিনি নেত্রকোণা, আগরতলা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তৎপর কামাখ্যা তীর্থ-দর্শন করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ময়মনসিংহে অবস্থানকালে অগণিত ভক্ত ও অনুরাগীকে শুধু তিনি উপদেশ ও প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট করেন নাই, তিনি প্রকাণ্ড জনসভায় বক্তৃতা দ্বারাও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তুলসী মহারাজ সহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুরোধে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ তৎস্থানীয় টাউন হলে আহূত সভায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ৭২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর এই বক্তৃতা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমরা তাহার এই বক্তৃতা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং বাংলা ভাষায় ইহার মর্ম্মানুবাদও করিয়াছিলাম। দেড় ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ সহজসাধ্য নহে। বাংলাভাষায় তাঁহার অননুকরণীয় প্রকাশ ভঙ্গিমা অব্যাহত রাখিয়া তাহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন। তবুও ভয়ে ভয়ে বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ মূলানুগত হইয়াছে

কিনা তাহা জানিবার জন্য স্বামিজীকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি কিন্তু এই অনুবাদ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার জীবনে ইহা একটা শুভ আশীর্বাদ বলিয়াই আমি মনে করি।

আমার সম্পাদিত "চারুমিহিরে" (ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত) ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অনুবাদ আমার নোটবুকেই দীর্ঘদিন প্রসুপ্ত ছিল। তুলসী মহারাজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনীও ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বাংলায় তাঁহার কার্য্যাবলীর অতি সামান্যই লিখিত হইয়াছে। যদি কোন শক্তিধর লেখক কোনদিন স্বামিজীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখেন, তবে আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা তাঁহার সাহায্য করিতে পারে বলিয়াই দীর্ঘকাল পরে তুলসী মহারাজের প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাঁহার জীবন সম্পর্কে আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ

"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোন নূতন ধর্ম্মপ্রচারে অবতীর্ণ হন নাই। প্রাচীন মুনি ঋষিগণ শাস্ত্রে যে সনাতন ধর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার পরে কোন নূতন কথা বলিবার নাই। কিন্তু এই যুগে আমাদের চিন্তা-প্রণালী, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয় এমন একটা অবস্থা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে সংঘটিত হইয়াছিল যে সেই সনাতন ধর্ম্ম যুগোপযোগী আকারে আচরণ (Demonstrate) করিয়া দেখান প্রয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমরা সেই প্রাচীন শাস্ত্রের ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, মানবীয় আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। হিন্দু-ধর্ম্মেও আমাদের বিশ্বাস ছিল না; খৃষ্টান ধর্ম্মও আমরা গ্রহণ করি নাই, ধর্ম্মের যে প্রয়োজন আছে এই ধারণাটাই ক্রমশঃ হারাইতেছিলাম। এই যুগে রামকৃষ্ণদেব অসাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন যে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম কেবল শাস্ত্রের কথা নয়, কোন কল্পনার জিনিষ নয়—পরন্তু জীবনে সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়।

"কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার বিদ্যাবত্তার প্রভাবে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনীয়তা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেন, তবে আমরা তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিলাস বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম। যদি কেহ যোগশক্তি (Miracle) দেখাইয়া উহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে তাহাও বুজরুকি বলিয়াই অগ্রাহ্য হইত। এই হিসাবে রামকৃষ্ণদেবের জীবনটী এই যুগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। তিনি জন্মিয়াছিলেন পাড়াগাঁয়ে, যেখানে বর্ত্তমান সভ্যতার কৃত্রিমতা বিন্দুমাত্র প্রবেশ করে নাই। লেখাপড়া সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। তিনি ছিলেন এমন একটী সহজ মানুষ যাহার ভিতর বাহির সম্পূর্ণরূপেই এক। তিনি যেন খনি হইতে উত্তোলিত অসংস্কৃত মণি, এইরূপ একজন নিরক্ষর ও স্বভাব-সন্তান কোনরূপ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ না করিয়া নিজের সাধনা ও উপদেশ দ্বারা সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে ভাবিত বিদ্বান্ ব্যক্তিদের চিন্তাধারা ও ভাবধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শাস্ত্রোক্ত সনাতন ধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

"এই রামকৃষ্ণদেবের যুগোচিত বাণী তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজী তাঁহার যৌবনে আধুনিকভাবে ভাবিত বিশ্বাস-বিহীন শিক্ষিত যুবকদের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত তিনি কিছুই বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত ছিলেন না। তিনি অনেক গণ্যমান্য খ্যাতনামা সাধুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কিনা। প্রায় সকলেই উত্তর করিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে ভক্তি বিশ্বাসের সহিত উপাসনা করিতে হয়, কিন্তু এই স্থূল দেহে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। উপাসনার ফল পরকালে পাওয়া যায়।

পরিশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের এই পাড়াগেঁয়ে লোকটীর নিকট উপস্থিত হন। তাঁহাকেও স্বামিজী এই প্রশ্নই করেন। পরমহংসদেব উত্তর করিলেন—"হাঁ, ঈশ্বরকে দেখিয়াছি।" প্রথমতঃ সেকথা শুনিয়া স্বামিজীর তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরমহংসদেব বলিলেন—কেবলমাত্র তিনি দেখেন নাই, সকলেই যথোচিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক প্রযত্ন করিলে ঈশ্বরকে দেখিতে পারেন এবং তাঁহাকে তিনি (পরমহংসদেব) ঈশ্বর দর্শন লাভ করাইতে পারেন। স্বামিজী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তৎপর অন্য একদিন তিনি উপস্থিত হইলে পরমহংসদেব তাঁহার বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের অনুভূতি করাইয়া দিলেন—ইহারই নাম Demonstration.

"স্বামিজীকে তিনি আরও বলিয়াছিলেন এই জগতে যত ধর্ম্মমত আছে সকলই ঈশ্বরলাভের এক একটী পথ—প্রত্যেক পথই সত্য এবং প্রত্যেক পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। স্বামিজীর মনে হইল যে এই পাগল সাধু নিরক্ষর লোক, সকল ধর্ম্মমতের তুলনা-মূলক সমালোচনা অবশ্যই তিনি করেন নাই, তবে তাঁহার এই কথা গ্রহণীয় হয় কিরূপে? তাঁহার সংশয় বুঝিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন যে তিনি প্রচলিত সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পথই মানুষকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায় ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করায়। এই কথা শুনিয়া স্বামিজী আরও অবাক হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে লোকে অজ্ঞতাবশতঃ মত ও পথ লইয়া ঝগড়া বিবাদ করে, বস্তুতঃ যদি ঐকান্তিকতার সহিত কোন এক পথ ধরিয়া যথার্থ সাধন ভজন করে, তবে বুঝিতে পারে যে ঝগড়া বিবাদের কোন অবকাশ নাই। সকলেরই মূল লক্ষ্য এক। প্রত্যেকটী পথ যেন এক একটী ব্যাসার্দ্ধ (Radius) এবং সকলই একই কেন্দ্রে যাইয়া মিলিত হইয়াছে।

"এইভাবে প্রত্যেকটী সত্য তিনি নিজের জীবন দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব অনুভব করাইয়া দিয়াছেন। পরমহংসদেবের সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সার সংকলনপূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার নহে। পরন্তু আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক মতের সত্যতার উপলব্ধি। "যত মত তত পথ" তাঁহার সাধনাপ্রসূত প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত। একান্তভাবে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ ও জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া হিন্দু আরও ভাল হিন্দু হইতে পারে, মুসলমান আরও ভাল মুসলমান হইতে পারে, খৃষ্টান আরও ভাল খৃষ্টান হইতে পারে। জগতে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীই তাহার নিজ নিজ ধর্ম্মে দৃঢ় থাকিয়া সাধন-জগতে চরম স্থান অধিকার করিতে পারে।

"আর একটী মহাসত্য তিনি প্রচার করিয়াছেন ইহা সনাতন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ইহার প্রতিপাদন আবশ্যক ছিল। তিনি তাঁহার উপদেশ ও আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভগবান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত কোন প্রদেশে বা স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে নাই, তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বর্ত্তমান। তিনি প্রত্যেক জীবকে নারায়ণ জ্ঞান করিতেন। পাপী-পুণ্যবান্, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলের ভিতর তিনি নারায়ণ দর্শন করিতেন এবং নারায়ণ জ্ঞানে তাহাদের সেবা করিতেন।

'বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।'

গীতার এই মহাবাক্য কেবল যে বুদ্ধির-কল্পনার বিষয় নহে, জীবনে উপলব্ধির বিষয়, পরমহংসদেব এই যুগে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমহংসদেবের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্যতা বলিয়া কোন জিনিষ ত থাকতেই পারে না; অস্পৃশ্যদিগকে টানিয়া আনিয়া সমান আসনে বসাইয়া কিম্বা নিজেদের সমান করতগুলি

অধিকার প্রদান করিয়া অনেকে যে তাহাদের উপর বিশেষ কৃপা করিতেছেন বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন এইরূপ কৃপা ও তজ্জনিত গর্ব্বের ভাবও কোনক্রমে তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না। কেবলমাত্র তথাকথিত অস্পৃশ্যগণ কেন, পশুপক্ষীদিগকে পর্য্যন্ত তিনি নারায়ণবোধে প্রণাম ও সেবা করিতেন। তিনি যেমন মা কালীর মুখে অন্ন প্রদান করিয়া বলিতেন —"মা, তুমি খাও।" নিজের মুখে দিয়াও বলিতেন—"মা, তুমি খাও।" আবার বিড়াল শিশুর মুখে দিয়াও বলিতেন—"মা, তুমি খাও।" এইরূপে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি নিজের লম্বা চুল দ্বারা "পারিয়ার" পায়খানা পরিষ্কার করিয়া আচরণেও মেথরদের সমকক্ষ হইয়া দেখাইয়াছেন কোন কাজই হেয় ও ঘৃণ্য নহে। ভিতরে বাহিরে এইরূপ নারায়ণ-দর্শন করিয়াই সকলকে পূজা করিতে হইবে এবং সকলকে দেবতার আসন দান করিতে হইবে। অধিকন্তু যাহারা যত দীন, দরিদ্র ও সমাজে উপেক্ষিত তাহাদিগকে নারায়ণ-জ্ঞানে বিশেষ সেবা করিতে হইবে। দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা এই কারণেই রামকৃষ্ণ-ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহা একদিন 'দরিদ্র ভোজন' ও 'কাঙালী বিদায়' নামে অভিহিত হইত, তাহা রামকৃষ্ণ-ভক্ত সম্প্রদায়ের চেষ্টায় "দরিদ্র নারায়ণ সেবা" নামে আজ দেশের সর্ব্বত্র আখ্যাত হইতেছে। পরমহংসদেবের সর্ব্বজীবে নারায়ণ দর্শন ও পূজার আদর্শ হইতেই দেশে এই শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছে।"

বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ বিভাগ

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, এম. এ., পুরাতত্ত্বরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

বৈশাখী পূর্ণিমারজনীর শেষযামে ভগবান্ তথাগত মল্লগণের রাজধানী কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, এই সংবাদ দাবাগ্নির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকল্পের বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ এবং পাবা গ্রামের মল্লগণ—সকলেই এইরূপ পত্র লিখিয়া স্ব স্ব দূতকে কুশীনগরে পাঠাইলেন: "ভগবাপি খত্তিয়ো ময়ম্পি খত্তিয়া। ময়ম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, ময়ম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি।" (মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ৬)।

অনুবাদ—ভগবান্ বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়। অতএব আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরাও ঐ দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিব।

এদিকে বেঠদ্বীপের একজন ব্রাহ্মণও বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের অংশ দাবী করিয়া কুশীনগরের মল্লপ্রধানদের নিকট দূত পাঠাইলেন। এমতাবস্থায় কুশীনগরের মল্লপ্রধানগণ তাঁহাদের সমিতি আহ্বান পূর্ব্বক সন্থাগারে' (যজ্ঞাগৃহে) মিলিত হইয়া আলোচনাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং আগত দূতদের নিকট এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন: "ভগবা অম্হাকং গামক্ষেত্তে পরিনিব্বুতো, ন ময়ং দস্সাম ভগবতো সরীরানং ভাগন্তি।"

অনুবাদ—ভগবান্ তথাগত আমাদের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার দেহাবশেষের ভাগ কাহাকেও দিবনা।

কুশীনগরের মল্লদের এই প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া মগধ, বৈশালী, কপিলবাস্তু প্রভৃতি স্থানের ক্ষত্রিয়গণ কুশীনগরের মল্লদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং

স্বস্ব সৈন্যসামন্ত লইয়া কুশীনগরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধের ভাবীপরিণাম চিন্তা করিয়া দ্রোণ নামক এক মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন; বিশেষতঃ যেই বুদ্ধ ছিলেন শান্তিবাদী এবং অহিংসা ধর্ম্মের প্রচারক তাঁহারই দেহাবশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া এক বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শিত হইবে, ইহা দ্রোণব্রাহ্মণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধার্থ সমবেত রাজন্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:

"সুণন্তু ভোন্তো মম এক বাক্যং
অম্হাকং বুদ্ধো অহু খন্তিবাদো।
নহি সাধুং উত্তম পুগ্গলস্স
সরীরভাগে নিয়া সম্পহারো।"

অনুবাদ—হে রাজন্যবৃন্দ! আপনারা আমার একটি কথা শ্রবণ করুন। আমাদের বুদ্ধ সতত শান্তিবাদীই ছিলেন। এইরূপ মহাপুরুষের দেহাবশেষ বিভাগকে উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ হওয়া কখনও উচিত নহে।

"সব্বেব ভোন্তু সহিত সমগ্গা
সম্মোদমানা করোমটঠভাগে।
বিত্থারিতা হোন্তু দিসাসু থূপা
বহুজনা চক্খুমতো পসন্নাতি।

অনুবাদ—আপনারা সকলে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে একমত হইয়া সম্মিলিত হউন এবং ভগবান্ বুদ্ধের দেহাবশেষ সমান আটভাগ করিয়া লউন। সকল দিকে ভগবানের স্তূপ বিস্তারিত হউক যাহা দর্শন করিয়া বহুলোক প্রজ্ঞাচক্ষু বুদ্ধদেবের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইবে।

দ্রোণব্রাহ্মণের এই প্রস্তাবগুলি শুনিয়া রাজন্যবৃন্দ শান্ত হইলেন এবং তাঁহাকেই বুদ্ধদেবের অস্থিধাতু-সমূহকে সমান আটভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইলেন। দ্রোণ আটটি সমান ভাগ করিয়া (১) কুশীনগরের মল্ল, (২) পাবার মল্ল, (৩) বৈশালীর লিচ্ছবি, (৪) মগধরাজ অজাতশত্রু, (৫) কপিলবাস্তুর শাক্য, (৬) রামগ্রামের কোলিয়, (৭) অল্লকল্পের বুলি এবং (৮) বেঠদীপের ব্রাহ্মণ—ইহাদের প্রত্যেককে এক এক ভাগ প্রদান করিলেন। অস্থি-ধাতু বণ্টনের পর দ্রোণ-ব্রাহ্মণ রাজন্যবৃন্দকে অনুরোধ করিলেন, 'ভগবান্ তথাগতের পূতাস্থিধারণকারী এই কুম্ভটি আপনারা আমাকে প্রদান করুন। আমি ইহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিব।' তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে দ্রোণব্রাহ্মণকে কুম্ভটি প্রদান করিলেন।

এইভাবে বুদ্ধদেবের অস্থিধাতু-বণ্টনক্রিয়া সমাপ্ত হইলে পিপ্পলীবনের মৌর্য্যগণ তথাগতের পরিনির্ব্বাণলাভ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার দেহাবশেষের ভাগদাবী করিয়া কুশীনগরের মল্লদের নিকট দূত পাঠাইলেন। তখন মল্লপ্রধানগণ ঐ দূতকে বুঝাইলেন,—'ভগবান তথাগতের দেহাবশেষ আর নাই, তাঁহার পূতাস্থিসমূহ বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন রাজন্যবৃন্দ কর্ত্তৃক নীত হইয়া গিয়াছে। আপনারা শ্মশান হইতে অঙ্গার লইয়া যাইতে পারেন।' অগত্যা পিপ্পলীবনের মৌর্য্যদূত শ্মশান হইতে অঙ্গার আহরণ করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহে ভগবান্ তথাগতের অস্থিধাতুর উপর স্তূপনির্ম্মাণপূর্ব্বক মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। এইভাবে বৈশালী, কপিলবাস্তু, অল্লকল্প, রামগ্রাম, বেঠদীপ, পাবা এবং কুশীনগরেও পূতাস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মিত ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। দ্রোণব্রাহ্মণ কুম্ভের উপর স্তূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক উৎসব করিলেন। পিপ্পলীবনের মৌর্য্যগণ অঙ্গারসমূহের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বিরাট উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। অতএব মোট দশটি স্তূপ নির্ম্মিত হইল: ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটিকে বলা হয় 'শারীরস্তূপ' (সরীর থূপা), নবমটিকে বলা হয় 'কুম্ভস্তূপ' এবং দশমটিকে বলা হয় 'অঙ্গারস্তূপ'। "থূপবংস" নামক পালিগ্রন্থে স্তূপসমূহের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধগণ নিত্য এই দশ স্তূপের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন। এই সকল স্তূপের দর্শন বা স্মরণ দ্বারা ভগবান্ তথাগতের পুণ্যস্মৃতি জাগরূক হয়। দশ স্তূপ-বন্দনা-মন্ত্র :

(১) একো থূপো রাজগহে, একো বেসালিয়া পুরে।
একো কপিলবত্থুস্মিং, একো চ অল্লকপ্পকে॥
একোসি রামগামস্মিং, একো চ বেঠদীপকে।
একো পাবেয্যকে মল্লে, একোচ কুসীনারকে॥
এতে অট্ঠ মহাথূপা জম্বুদীপে পতিট্ঠিতা।
পূজিতা নরদেবেহি তেপি বন্দামি সব্বদা॥

অনুবাদ—রাজগৃহে একটি স্তূপ, বৈশালীতে একটি, কপিলবাস্তুতে একটি, অল্লকপ্পকে একটি, রামগ্রামে একটি, বেঠদ্বীপে একটি, পাবা ও কুশীনারার মল্লগণ কর্তৃক এক একটি স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। এই অষ্ট মহাস্তূপ জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত এবং দেবতা ও মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত। আমিও সর্ব্বদা সেই অষ্টমহাস্তূপকে বন্দনা করি।

(২) কুম্ভথূপং চ কারেসি ব্রাহ্মণো দোণবহ্বো।
অঙ্গারথূপং কারেসুং মোরিয়া তুট্ঠমানসা॥
অট্ঠ সারিরীকা থূপা, নবমো কুম্ভচেতিয়ো।
দসমং অঙ্গারথূপো চ, বন্দেতে সব্ব চেতিয়ে॥

অনুবাদ—দ্রোণনামক ব্রাহ্মণ কুম্ভস্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মৌর্য্যগণ আনন্দিত মনে চিতার অঙ্গারের উপর অঙ্গারস্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আটটি শারীরিক ধাতুর উপর নির্মিত স্তূপ, নবমটি কুম্ভ চৈত্য, দশমটি অঙ্গারস্তূপ, আমি এই সকল চৈত্যকে বন্দনা করিতেছি।

('চিতা' শব্দ হইতে 'চৈত্য' শব্দ উৎপন্ন। দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ চৈত্য নামে অভিহিত।)

(৩) দসাপি থূপা পুরিসবরুত্তমস্স যে,
যথানুরূপং নররাজ পূজিতা।
সব্বেব লোকেন সদেবকেন তে,
নমস্সনেয্যা সিরসা নমামি॥

অনুবাদ—সর্ব্বোত্তম পুরুষের যেই দশটি স্তূপ নররাজগণ কর্তৃক পূজিত, সর্ব্বলোক ও সর্ব্বদেবগণ-কর্তৃক পূজিত, সেই নমস্য দশ স্তূপকে আমি মস্তক দ্বারা বন্দনা করিতেছি।

তথাগতের দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ এবং ঐ স্তূপপূজার ফল সম্বন্ধে স্বয়ং বুদ্ধদেব এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন,—"চতুমহাপথে তথাগতস্স থূপো কাতব্বো। তত্থ যে মালং বা গন্ধং বা বিলেপনং বা আরোপেস্সন্তি অভিবাদেস্সন্তি বা, বিত্তং বা পসাদেস্সন্তি তেসন্তং ভবিস্সতি দীঘরত্তং হিতায় সুখায়াতি।" (মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ৫)

অর্থাৎ চারিমহাপথের মিলনস্থানে তথাগতের স্তূপ রচনা করা বিধেয়। যাহারা সেই স্তূপে মাল্য, সুগন্ধি বা সুগন্ধিচূর্ণ অর্পণ করিবে বা অভিবাদন করিবে বা তদ্দর্শনে চিত্তপ্রসন্ন করিবে সেই কার্য্য তাহাদিগের বহুকালের জন্য হিতকর ও সুখকর হইবে।

"নিষ্কাসক্ত হ'য়ে কর্ম করার নামই যোগ বা কৌশল। কর্ম মানে জগতে যত কিছু কর্ম সবই। জপ-ধ্যানও কর্ম। খাওয়া-পরাও কর্ম। বাসনমাজা, ঘরঝাঁটদেওয়াও কর্ম। আবার শাস্ত্র পাঠও কর্ম। কর্ম করবো, কিন্তু ফল তার চাইব না—এভাবে কর্ম করার নামই কর্মযোগ।"

—অভেদানন্দ

প্রেমধর্ম্ম

॥ ঐতিহাসিক সংবাদ ॥

ডাঃ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"এই যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। এর পূর্ব্বেই যে অন্ধকার যুগ ভারতের ইতিহাসকে সমাচ্ছাদিত করেছিল, সেই কালের কটাহে গ্রীক (ওটরহাস যবন) ইন্দ্রোগ্নিদত্ত পরম বুদ্ধভক্ত হলেন, শক উষবদাত (উষবদত্ত ?) ও তাহার স্ত্রী দক্ষমিত্তা (দক্ষমিত্রা ?) পরম ব্রাহ্মণ-বাধীন সনাতনী হিন্দু হলেন এবং প্রয়াগে ও পুষ্করে তীর্থস্নান করে ব্রাহ্মণ-ভোজন করান ও ব্রাহ্মণীদের দান করেন, ইত্যাদি। আবার কি করে অবৈদিক ও অসনাতনীয় পাশুপত-ধর্ম্ম ও বাসুদেব-ধর্ম্ম সনাতনীত্ব প্রাপ্ত হয়, তার রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখি, ভাকাটাকা ও ভারশিব রাজারা শিবভক্ত ছিলেন। শিবের ভার বহন করতেন বলে তাঁদের উক্ত পদবী হয়েছিল। তাঁরা বলেন, মধ্যভারত হতে বহির্গত হয়ে তাঁরা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত জয় করেছিলেন, দশ-অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ৺কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের অনুমান, কাশীর "দশাশ্বমেধ ঘাট" স্থানের নাম এই ঘটনা হতেই উদ্ভূত হয়। এঁরা ব্রহ্মক্ষত্রীয় বলে পরিচয় প্রদান করতেন এবং অব্রাহ্মণবংশীয় গুপ্ত সম্রাটদের সহিত বিবাহ করতেন।

এই সব ঐতিহাসিক তথ্য যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তদ্দ্বারা আমরা এই অনুমান করি যে মধ্যযুগের অন্ধকারকালের কটাহ মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যেমন নানা বিজাতীয় লোকেরা (যবন, শক, হূণ, কিলকিলা যবন, পারদ—বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য) আর্য্য-ধর্ম্মীয় ও আর্য্য-সন্তান বলে পরিচয় প্রদান করতে থাকে, সেইসঙ্গে তাদের ভাষাগত অনেক শব্দ (গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "Hellenism in India") দিল (আরবী), নেম, সিক (ফার্সী) এবং আচার, ভারতীয় ভাষায় ও আচারে অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল—(পূর্ব্ব মীমাংসা এবং তার টিকা তন্ত্র-বার্ত্তিক দ্রষ্টব্য)। সেই অন্ধকার সময়েই পাশুপত ও বাসুদেব সম্প্রদায়ও সনাতনীত্ব লাভ করে জাতে ওঠে। এইসময়ে আমরা বাসুদেব সম্প্রদায়কে "ভাগবৎ" নামে পরিচিত হতে দেখি। বোধ হয় এই সময়েই মহাভারতের "খিলপর্ব্ব" বলে "হরিবংশ" রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করি।

লেখক একবার মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আজকাল গোঁড়া হিন্দু বললে তো কেবল শৈব ও বৈষ্ণবকে বুঝায়? তিনিও বললেন, হাঁ তাই! কালের আশ্চর্য্য গতি, ঐতিহাসিক, বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্বনীতির ফলে অবৈদিক, অব্রাহ্মণ্যবাধীয় ধর্ম্মসমূহ সনাতনীত্ব লাভ করে। পণ্ডিত সংকৃত্যায়ন বলেন, মনুতে শক, যবন, পারদদের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা বৃষল বলা হয়েছে, যেহেতু তারা সাবিত্রী-ভ্রষ্ট। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে তাদের বাস করার পর, ব্রাহ্মণ দর্শন লাভ ঘটে, তাদের ব্রাত্যত্ব দূরীভূত হয়। তারা ক্ষত্রীয়ত্ব প্রাপ্ত হ'ল। পুনঃ জৈন ও বৌদ্ধদের বিপক্ষে লাগাবার জন্য শৈব ও বৈষ্ণবদের জাতে তোলা হ'ল ('দর্শন ও দিগ্‌দর্শন' দ্রষ্টব্য)।

যাই হোক্, ভাগবত-সম্প্রদায় বলে বৈষ্ণবরা তখন খ্যাত হতে লাগলেন। এক্ষণে আমরা দেখি, সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগে অসংখ্য পুরাণ ও ধর্ম্মগ্রন্থ

সংস্কৃতে লিখিত হয়—যা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এইসব পুস্তকে বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে, আর আছে ভক্তিমার্গের কথা। এই সময়েই "নারদ-ভক্তি-সূত্র", "শাণ্ডিল্য-সূত্র" নামক বৈষ্ণব-ধর্মপুস্তকসমূহ রচিত হয় এবং বৈষ্ণব-পুরাণসমূহে বিষ্ণুর অবতারত্বের কথাও বর্ণিত হয়। এই বৈষ্ণবেরাই অবতারবাদ" হিন্দুধর্মে প্রচলন করেন।

এক্ষণে আমরা দেখি নারদভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে : "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" তৎপর, হরিভক্তদের জাত নেই একথাও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই স্থলেই পুরোহিত-তন্ত্রের আপত্তি। এক সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রেরা বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত হয়েছিল। বোধ হয় মধ্যযুগ হতে পণ্ডিতেরা এবং বর্ণাশ্রমের কঠোরতায় প্রপীড়িত হয়ে গণশ্রেণীর লোকেরাও এই ধর্মে আকৃষ্ট হয়। তৎপর, ভক্তিমার্গে শারীরিক কঠোরতা সাধনের ব্যবস্থা নেই যা জৈন এবং বৌদ্ধরা করতেন। প্রেমধর্মে শারীরিক কঠোরতা, যোগাভ্যাস প্রভৃতির হাঙ্গামা নেই। এই সব কারণবশতঃই গণশ্রেণীসমূহ পরে বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হতে লাগল। এই সময়ে তাদের "পাঞ্চরাত্রের দল" নামকরণ হল। এদের একটা দর্শনশাস্ত্রও রচিত হয়, যার খানিকটা মত মধ্যযুগীয় খৃষ্টানধর্মের সঙ্গে মেলে (ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের "Narada's visit to Swetadwipa" দ্রষ্টব্য)।

এই নব বৈষ্ণবধর্ম ঐতিহাসিক স্বভাব দ্বারা চালিত হয়ে নূতন কলেবর ধারণ করে, এবং সাধন-ভজন পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হয়। ভজন, কীর্ত্তন, নৃত্য, ভাগবতপাঠ দ্বারা সাধন করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়। অস্পৃশ্য চণ্ডালও এতে উচ্চস্থান পায়, মহাভারতেই এ' উল্লিখিত হয়েছে।

যখন রামমোহন রায় ব্রহ্ম-সভা স্থাপন করে সঙ্গীত প্রার্থনা ও গীত দ্বারা সাধন করা প্রচলন করেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এটা অশাস্ত্রীয় বলে আপত্তি তোলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্র হতে উপরোক্ত তথ্যসমূহ উদ্ধৃত করে তাদের আপত্তি খণ্ডন করেন। সাধারণ গণশ্রেণী সরকারী ছক কাটা নীরস ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করে না। তা'রা মনের খোরাক চায়। মনের ভাবগুলো নানা উপায়ে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। কম্পন, পুলক, স্বেদাগম প্রভৃতির লক্ষণ যা বৈষ্ণব সাধকের চরমাবস্থা বলে বর্ণিত হয় তা' সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। মনের অবিদিত পর্দ্দায় যেসব ভাব চাপা থাকে, তা' নানাপ্রকারে প্রকাশ পায়। উপরোক্ত লক্ষণসমূহ তারই বাহ্য প্রকাশ। কথিত হয়, নৃত্যকালে চৈতন্যদেবের চক্ষু হতে পিচকারীর ধারার ন্যায় অশ্রু নির্গত হ'ত। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, এ' কৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ। কিন্তু এটা কি অবিদিত মনের কার্য্য নয়? জেনে, শুনে, বুঝে কে ক্রন্দন করে! ভাবসমূহ (Emotions) শরীরে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়, এটা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের কথা। এই তথ্যে অলৌকিক বা অনৈসর্গিক কিছু নেই।

আমরা এই ঐতিহাসিক তথ্য পাচ্ছি যে, সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব সময়েই গণশ্রেণীর লোকেরা এমন ধর্ম্ম-সাধনা গ্রহণ করে যার মধ্যে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ বা বর্ণভেদজনিত কোনও পার্থক্য নেই, আর সরকারী কাঠামোর সাধন-প্রণালী তাদের মনঃপূত হয় না। সরকারী কাঠামোটি কি? মিশরে, খিবস্ নগরীর দেবদেবীদের বড় ভোগ লাগাও, এবং তাদের পুরোহিতদের তুষ্ট কর। সেমেটিক জাতীয় দেবতাদের পশু-বলি আর প্রয়োজনমতে নর-বলি দাও। গ্রীসেও তদ্রূপ। সর্ব্বত্রই সরকারী পুরোহিতদের সন্তুষ্ট কর। এদের সন্তুষ্ট না রাখলে রাষ্ট্রেরই বিপদ! খিবেসের পুরোহিতেরা এত শক্তিশালী ছিল যে তারা কারাও আখনাতুনের ব্যবস্থা তাঁর মৃত্যুর পর উল্টে দিয়েছিল; শেষে দক্ষিণ মিশরে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছিল। সমসাময়িক যুগের ইয়াসে পুরোহিত-তন্ত্র এমন প্রতাপশালী হয়েছিল যে, "সা-ইন-সা" সম্রাটেরও তাদেরকে ভয়

করে চলতে হত। এরা অন্যান্য সম্প্রদায়কে দাবিয়ে যথেচ্ছাচারীভাবে সমাজ শাসন করত। এর ফলেই ইরাণ এত শীঘ্র সাম্যবাদীয় ইসলাম গ্রহণ করে।

ভারতে প্রথম যুগে সরকারী ধর্ম্ম ছিল বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া। ঋগ্বেদে বলেছে, যজ্ঞ-ক্রিয়া দ্বারাই স্বর্গলাভ হবে। ক্রমে একজন যাজ্ঞিক পুরোহিত হতে চল্লিশ জনে পরিবর্দ্ধিত হয়। আর এই সঙ্গে তাদের দাবীও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষে পুরোহিত-দের দাবী ও শোষণ-নীতির জ্বালায় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ (Civil war) ঘটে। আসলে এটা শ্রেণী-সংগ্রাম (Class war)। অনুমান হয়, বুদ্ধদেব ও মহাবীর বর্দ্ধমান এই যুদ্ধ-যুগের পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ক্ষত্রিয় প্রথম বর্ণ বলে দাবী করতেন; কোশলের রাজা চিকের আড়াল দিয়ে মন্ত্রীর সহিত কথা বলতেন, শাক্যেরা তাদের সংস্থাগারে এক ব্রাহ্মণকে বসতে দেয় নি ইত্যাদি (Fick: North-East India at the time of Buddha দ্রষ্টব্য)।

এই সব কারণবশতঃ গণশ্রেণী সরকারী ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে নি। তারা প্রেমধর্ম্মে অনুরক্ত হয়েছিল। আমরা প্রচুর সাহিত্যে এই প্রেম-ধর্ম্মীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে প্রাচীন প্রমাণ বিশেষ পাইনে। কিন্তু অন্তঃসলিলারূপে তা প্রবাহিত হচ্ছিল, কারণ মধ্যযুগে এই সম্প্রদায় এত প্রবল হয়েছিল যে মহাভারত, গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি তারা নূতন ভাবে সংকলন করেছিল। পুরাণসমূহের একাংশ তাদের; কতকগুলি স্মৃতিও তারা হস্তগত করে রূপান্তরিত করেছিল যথা—বিষ্ণু, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি। গুপ্ত সম্রাটেরা, 'পরম ভাগবত' বলে নিজেদের অভিহিত করতেন। গুপ্তযুগের পর "পাঞ্চরাত্রে"র দল একটা অভিজাত সম্প্রদায়। আমরা বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে "পরম বৈষ্ণব" বলে নিজেকে পরিচিত করতে দেখি। এই সময়েই জয়দেবের "গীত গোবিন্দম্" রাজসভায় রচিত ও গীত হত। এস্থলে উল্লেখ্য যে, পাল শাসন বাংলাদেশে ভেঙে গেলে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান বাংলায় হয়, তখন হরিহর দুর্গদেবের কর্ম্মচারী (ভুবনেশ্বরের শাসনকর্ত্তা) ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন জন্য যেসব বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করেন, তাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোন উল্লেখ নেই। তিনি সরকারী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জন্যই বৌদ্ধদের বিপক্ষে লড়েছিলেন।

এই সময়ের অর্থাৎ মধ্যযুগীয় হিন্দু শাসনকালের বিষ্ণু ও তাঁর ধর্ম্ম, বর্ত্তমানের বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে আমরা নারদের শ্বেত দ্বীপে গিয়ে বিষ্ণুর সহিত কথোপকথনে পাঞ্চরাত্র মতের ব্যাখ্যা পাই; আর সংবাদ পাই রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু মহাভারতের অন্য কোথাও শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের কথা নেই। এই সব প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখি বৈষ্ণবধর্ম্ম পতিতদের ধর্ম্ম থেকে উন্নীত হয়ে রাজারাজড়ার ধর্ম্ম হয়ে আভিজাত্য লাভ করেছে।

বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মের এত প্রভাব মধ্যযুগে ছিল যে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানীয় শাখাও প্রেমমার্গকে নিজ সাধনার অঙ্গীভূত করে নেয়। তৎকালে উভয়ধর্ম্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তির উল্টো মহাযানীরা "ত্রিকায়া" বাদ সৃষ্টি করলেন: ইরাণী জারতুস্ত্রীয় ধর্ম্মের "ফিরিস্তা" মহাযানের "দেবদূত" হলেন। ইনি সম্প্রদায়বিশেষে বিষ্ণুদূত ও শিবদূত হন। বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে "পুরুষোত্তম" বলে অভিহিত করলেন, মহাযানীরাও বুদ্ধদেবকে ঐ পদবী প্রদান করলেন।

এইসব মেষামেষির সংবাদে গণশ্রেণীর প্রেম-ধর্ম্মের সংবাদ পাই না। কিন্তু উত্তরে হিন্দুশাসনের অবসানের আগে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি শাখা—'সহজযান' পন্থার সংবাদ পাই। এরা "সন্ধ্যা ভাষায়" কবিতা লিখত, নৃত্য-গীত দ্বারা সাধনা করত, গুরু ভজত ইত্যাদি। পতিতদের মধ্যে যে সাধনাপ্রণালী বরাবর আমরা দেখে আসছি নবম-দশম শতাব্দীতে এদের মধ্যে তাই দৃষ্ট হয়।

অতীন্দ্রিয়বাদ বা রহস্যবাদ, হেঁয়ালী ভাষায় উপদেশ, প্রেমকে বাস্তবজীবনে কার্য্যে পরিণত করা, নাচা-কোঁদা প্রভৃতি এদের মধ্যে ছিল। "নেড়া-নেড়ীর দল" এরাই সৃষ্টি করেছিল।

তারপর তুর্কী আক্রমণ হয় এবং ক্রমে উত্তর ভারত তাদের দ্বারা বিজিত হয়। এই সময়ের কাছাকাছি কালে উত্তর বাংলায় "কৃষ্ণযামালী" নামে আদি রস মিশ্রিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানসমূহ গীত হতে দেখা যায়। সরকারী বৈষ্ণবধর্ম্ম হতে পৃথক ধর্ম্মপন্থা দ্বারা সাধারণ গ্রাম্যলোকদের মধ্যে এগান গীত হত। এতে "রাধা" নামে কৃষ্ণের এক প্রণয়িনীর সংবাদ পাওয়া যায়। রাধা শ্রীমদ্ভাগবতে অজ্ঞাত; কবি ভাসের "রাসলীলা" নাটকেও অজ্ঞাত। হরিবংশেও সেই নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু রাধাকে আমরা পাই "ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ" গ্রন্থে। দক্ষিণ হতে যে গ্রন্থে রাধার নাম দেখান হয় তা বল্লভাচারীদের জাল বলে গণ্য হয় (ভাণ্ডারকারের "Vaishnavism" দ্রষ্টব্য)। কথিত হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অন্ততঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়; কারণ এতে বর্ত্তমানের বাংলার অনেক জাতির উৎপত্তির উল্লেখ আছে। এই পুরাণে ব্রহ্মা দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রথম বৈদিকমতে বিবাহের কথার উল্লেখ আছে (কৃষ্ণখণ্ড)। তারপর আয়ান ঘোষ, চন্দ্রাবলী, বৃন্দাবৃতি প্রভৃতির কথা আছে। এইসব গল্পের অবতারণা এবং রাধাকৃষ্ণের কামকেলীর কথা বাংলাতেই সৃষ্ট হয়। রাধা অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের কাছে অজ্ঞাত। তাঁরা গুপ্তযুগের "শ্রী" বা "লক্ষ্মীদেবী" কে বিষ্ণুর এবং তাঁর অবতার কৃষ্ণের স্ত্রী বলে পূজা করেন।

অবশ্য জয়দেবের পুস্তকে রাধা সর্ব্বপ্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে "মেঘৈ মেদুরং অম্বরম্ ……রাধে গৃহং প্রাপয়।" নন্দ গোপ বলছেন, অন্ধকার রাত্রে এই ভীরু কৃষ্ণকে, হে রাধে, বাড়ী পৌঁছে দাও। শ্রীগীতগোবিন্দে কান্না ও হাহুতাশের কথা নেই; তাতে আনন্দ ও সঙ্গলাভের কথাই আছে।

কিন্তু আমরা তার দু'শ বৎসর বাদে, যখন বাংলা পরাধীনতার বিষে জর্জ্জরিত, যখন বাংলার হিন্দুর ঐশ্বর্য্য আজ-আছে কাল-নেই, যখন চারদিকে হাহাকার, যখন উত্তর ভারতে হিন্দুর হয় গোলামী না হয় হত্যা ঘটছে, যখন তার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ভদ্রভাবে জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল, তখনই ধর্ম্মে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। এই ক্রন্দনধ্বনি উত্তর ভারতেই উত্থিত হয়। রাজপুতের বীর-গাথার পরিবর্ত্তে পরাধীনতার কালে ভক্তি-গাথার উদ্ভব হ'ল। বাংলায় চণ্ডীদাস, মিথিলায় বিদ্যাপতি, ব্রজভূমিতে সুরদাসের উদয় হয়। এঁরা ভক্তিমার্গের কবি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাঁর বিচ্ছেদে ক্রন্দনধ্বনি এঁরা তুললেন। বাংলায় ভক্তিগাথাতে 'মাথুর' (বিচ্ছেদ) গীত হতে লাগল। যখন মাতৃভূমি স্বাধীনতা হারিয়েছে, যখন দেশের লোক নিষ্পীড়িত হচ্ছে, তখন বিজিত জাতির মনে নৈরাশ্য ও সান্ত্বনার জন্য অতীন্দ্রিয়তা ভাবই উঠ্‌বে। রাজা শিবসিংহ পরাজিত হয়ে কয়েদ হলেন, তাঁর কবিও গাইলেন, "হরি কি মথুরাপুর গেল, আজ গোকুল শূন্য ভেল, রোদিতি পিঞ্জরে শুকে, যেন ধাওত মাথুর মুখে।" চণ্ডীদাস নিরাশ হয়ে গাইলেন, "সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।" আর হতসর্ব্বস্ব, নষ্টিকা মাতৃভূমির অবস্থা তাঁর অবিদিত মন থেকে ধর্ম্মকথার আকারে ফেটে বার হয়। রাধার অবস্থা তখন "বিরতি আহারে, রাঙাবাস পরে, যেমন যোগিনীপারা।"

অবিদিত মনের এই হাহাকারের রোল শ্রীচৈতন্যে বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। রাধা বা ভক্তের কৃষ্ণ-বিরহের পশ্চাতে মনের অবিদিত পর্দ্দার সুরই ধ্বনিত হতে থাকে। পরে, সাকর মল্লিক ওরফে সনাতন গোস্বামী এসে এই ক্রন্দনের রোলকে বৃন্দাবনলীলায় সংযত ও সংঘবদ্ধ করেন। তাঁর বৃন্দাবনলীলার ব্যাখ্যা ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টিতে বাংলার এক অপূর্ব্ব দান। 'আসক' ও 'মাসুকের' লীলা এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ এবং প্রেমিকা রাধা এবং

তাঁর সখীরা যূথবদ্ধ হয়ে নৃত্য করছেন, "কামগন্ধ নাহি তায়।" এ কেবল উভয়ের attraction (আকর্ষণ) ও repulsion (পশ্চাৎগমন), শরীর স্পর্শ এতে হচ্ছে না। আশ্চর্য্যের কথা ১৯১৪ খৃঃ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Cosmopolitan club-এর নানা-জাতির নৃত্যগীতের আসরে ফিলিপিনোদের জাতীয় নৃত্যে এই ভাবকে মূর্ত্তিমান করতে দেখা গিয়েছিল। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আড়াআড়িভাবে আসছে, শরীরে কামেচ্ছার অঙ্গভঙ্গী দেখাতে দেখাতে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু সম্মুখে এসে মিলনের পরিবর্ত্তে আস্তে আস্তে পশ্চাৎগমন করছে। ফিলিপিনোরা, পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, তা স্পানীশ ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন।

বাংলার হিন্দুর বিজিত অবস্থাতে গণশ্রেণীসমূহ মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মের প্রসার হয়। সরকারী গোস্বামী অনুগত উচ্চশ্রেণীদের প্রেমধর্ম্ম, যা' উপস্থিত পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদীর খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তদ্ব্যতীত, নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে সহজিয়া, আউল, বাউল, সাঁই, গোঁসাই, দরবেশ, জাতি বৈষ্ণব, কর্ত্তাভজা, শচীমা, সাহেবধনী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় বাংলায় বিদ্যমান। এঁরা ভক্তি বা প্রেম দ্বারা উপাসনা করেন এবং বহুস্তবাদী। পুনঃ এঁরা নিরাকারবাদী (ক্ষিতিমোহন সেন—"বাংলার বাউল")। গণশ্রেণীসমূহ মধ্যে এঁরাই ধর্ম্মভাব জাগিয়ে রাখেন। সরকারী ধর্ম্মের সঙ্গে এঁদের কোন সম্বন্ধ নেই, তাই বাবুমহলে তাঁদের তথ্য অজ্ঞাত।

পুনঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে নবজাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। তুর্কী আক্রমণের ফলে হিন্দু নিজের সমাজকে নূতন পরিবেশানুযায়ী নূতন সংস্করণের চেষ্টায় নিমগ্ন হয়। তখন দক্ষিণ হতে নবজাগরণ আরম্ভ হয়, তথায় "আলোয়ার" নামক সাধুরা গণশ্রেণীদের মধ্যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে অস্পৃশ্য জাতীয় "নাম" আলোয়ার এবং স্ত্রীলোকও ছিলেন। এতদ্বারা দেখা যায় অস্পৃশ্যও বড় ধর্ম্মোপদেষ্টা হন। আবার পণ্ডিতদের মধ্যে যমুনাচার্য্য ও তাঁর আত্মীয় রামানুজ ধর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ব্যবধান কমাবার চেষ্টা করেন। রামানুজ প্রথমে শাতাকোপ নামক অস্পৃশ্য জাতীয় এক সাধুর কাছে মন্ত্র নিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরই পরামর্শে পরে উচ্চজাতীয় লোকের নিকট দীক্ষা নেন। রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম্মের পাঞ্চরাত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে তার প্রচলন করতে চেষ্টা করেন।

এই ধারা উত্তরে আসে; রামানন্দ তার বাহন হন। তাঁরই শিষ্য হলেন কবীর। এই সময় হতে সন্ত আন্দোলনের প্রবাহ উত্তর ভারতে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের ফলে পঞ্জাবে গুরু নানক, পূর্ব্বে চৈতন্যদেব, রাজপুতানায় মীরাবাঈ, দক্ষিণে নামদেব প্রভৃতির উদয় হয়। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সগুণ ভগবান—যিনি ভক্তের প্রার্থনা শোনেন, তাঁর উপাসনা করা। ভক্তি বা বিশ্বাসই এর সাধনার মূল। অহিংসাবাদ, জাতিভেদ অস্বীকার, ধর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে একীকরণ প্রভৃতি এর কর্ম্মপদ্ধতি। এজন্যই এঁকে "নব বৈষ্ণব ধর্ম্ম" বলে ঐতিহাসিকেরা অভিহিত করেন। এ ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; পাঁঠা-মোষ-খেকো (হরিবংশ: "বিষ্ণু পূজায় কৃত জীব শাস্ত্রের বিধান"—নূলা পঞ্চানন: "সমস্ত নির্ণয়" দ্রষ্টব্য), ও মদ-খেকো (মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব) দ্বারকা ও মহাভারতের কৃষ্ণকে এ ধর্ম্ম জানে না। এধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের-অনুযায়ী "বালগোপাল" (বল্লভাচারীয়) বা "কিশোর গোপাল" (গৌড়ীয়) নামে বৃন্দাবনের ননীচোরা কৃষ্ণের উপাসক। ইহা কৃষ্ণ ও শ্রীমতী এবং গোপিনীদের প্রেমের উপাসক।

ইতিমধ্যে ইসলাম মধ্যে ভক্তিমার্গীয় সুফীরা ভারতে কার্য্যকরী হয়ে উভয় সম্প্রদায়ের নৈকট্য স্থাপনে তৎপর হন। মৈমীর "পদ্মাবৎ নাটক" আলাউদ্দীন ও চিতোরের রাণার লড়াই আধ্যাত্মিক-ভাবে বর্ণনা করেছেন। লেখকের অনুমান সনাতন

গোস্বামীর বৃন্দাবন-লীলার ব্যাখ্যায় * সুফীপ্রভাব বিদ্যমান। পুনঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বাহু তুলে নৃত্য করা এবং দশায় পড়া, কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের নৃত্যশীল দরবেশদের (Dancing Darvishes) বাহু তুলে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা এবং দশায় পড়ার সমতুল্য। (লেখক ও তাঁর অগ্রজ দুই ভাই এই নৃত্য দেখে বিস্ময়ান্বিত হয়েছেন যে এটা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ন্যায়)। এতদ্বারা সুফী-সাধক রুমী স্থাপিত মেলভী দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রভাবই পরবর্তী যুগের বাংলার বৈষ্ণবগণের উপর বিস্তার লাভ করেছে বলে ধরা যায়।

তৎপর আমরা খৃষ্টীয়ধর্মে ভক্তিমার্গের অনুসরণ করব। খৃষ্টের ধর্ম ক্রীতদাস ও পতিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। ইহা সাম্যবাদী এবং প্রেম ধর্মের উপর স্থাপিত হয়। বিশ্বাসই এর মূল। অন্ত এবং পতিতদের হা-হুতাশ এতে ব্যক্ত হওয়ায় এ ধর্মে অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism) বিশেষভাবে স্থান পায়। এ লক্ষণ আজও বিদ্যমান [ভারতেই ইংরেজ-শাসন কালীন Church of England এর Metropolitan of India অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজার ধর্মের ভারতীয় শাখার প্রধান পুরোহিত যাকে কলকাতায় Lord Bishop বলা হ'ত, তাঁর একলক্ষ টাকা, যা তৎকালীন বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের বেতনের সমতুল, সেই বেতনভোগী পুরোহিতকে দেখে ভারতে কেউ যেন মনে না করেন খৃষ্টধর্ম ধনীরই ধর্ম। এই বেতনের বিপক্ষে একসময়ে জাতীয় কংগ্রেস ও তার বাইরে আন্দোলন হয়েছিল (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)। পুনঃ পোপ-রাজার ইতিহাস পাঠ করে কেহ যেন তদ্রূপ মনে না করেন। এরই বিরুদ্ধে মধ্যযুগে এবং তৎপরে সাম্যবাদীর খৃষ্টীয় আন্দোলন হয়েছিল। ইতিহাসে একে Heretical movements বলে আখ্যাপ্রদান করা হয়েছে। [ইংলণ্ডের ইতিহাসে জনার্ডদের বচন : when Adam delved and Eve Span, who was then the gentleman স্মরণ করুন]।

খৃষ্টানধর্ম প্রাকাল হতেই ভক্তিমার্গী ও প্রেম-ধর্মাশ্রয়ী। প্রথমে মিশর ও অন্যান্যস্থানে কঠোরব্রতী সন্ন্যাসীদের দ্বারা এর পরিপুষ্টি হয়। Fathorদের অর্থাৎ খৃষ্টীয়ধর্মের প্রথম হোতাদের অনেকেই সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁদের কঠোর সাধনা জগতে অতুলনীয়। মিশরের মরুভূমিতে Father Origen এক স্তম্ভের উপর বসে সতর বৎসর জপতপ করেছিলেন; কামজয় জন্য তিনি স্বীয় লিঙ্গোচ্ছেদ করেছিলেন (Lewis : History of Philosophy, Gibbon, Draper দ্রষ্টব্য) রুষের ডুখোবার (Dukhobar) সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য নিজেদের নপুংসক করে দেয়। কানাডাতে এদের উপনিবেশ আছে। এই কঠোরতার মূলে আছে অতীন্দ্রিয়বাদীর বিশ্বাস।

পরে যখন খৃষ্টীয় সাধনা রোমের পোপের অধীনে সংঘবদ্ধ হয় এবং খৃষ্টীয়ধর্ম রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে ইউরোপীয় আকার ধরে, তখন লাটিন ভাষাতে নানা ধর্মসংক্রান্ত সঙ্গীত রচিত হয়। এসব সঙ্গীতের বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রেমের কথাই পাই। ভক্ত তার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ভগবানকে অর্পণ করছে। সাধিকা বা সন্ন্যাসিনী তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ভগবানকে ঢেলে দিচ্ছে ("যত ছিল অভিমান, সতীকুল বধূমান সব হরি নিল শ্যামরায়" —চণ্ডীদাস)। এমন একটি গানের নাম হচ্ছে— Magnificat; এসম্বন্ধে ফরাসী-লেখক বালজ্যাক একটি গল্পে সুন্দরভাবে তা প্রদর্শন করেছেন। বিপ্লবের পর এক সামাজিক স্থলে এক যুবক একটি যুবতীর দর্শনলাভ করে। পরে, উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ পায়; কিন্তু যুবতীর মামা তাতে অরাজী হয় এবং ভাগিনেয়ীকে এক মেয়ে-মঠে সন্ন্যাসিনী করে ঢুকিয়ে দেয়। যুবতী হঠাৎ প্রেমিকের চক্ষুর অন্তরাল হলে প্রেমিক যুবক তার প্রেমাস্পদকে পুনরাবিষ্কার করার জন্য নেপোলিয়নের পল্টনে অফিসাররূপে চাকরী নেয় এবং সমস্ত ইউরোপে তাকে খুঁজে বেড়ায়। পরে,

নেপোলিয়ন যখন স্পেন আক্রমণ করে তখন এই ব্যক্তি সেই সেনাদলে থাকে। একদিন একস্থানে যাবার সময় সে হঠাৎ মেষে-মঠ থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের সঙ্গীত শোনে। স্ত্রীলোকটি Magnificat গাইছে, তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা, তার অবিদিত মনের পর্দার আড়ালের সমস্ত আকাঙ্খা সেই সন্ন্যাসিনী ভগবানকে অর্পণ করছে এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। যুবক অফিসার থমকে দাঁড়িয়ে শুনল, এযে তার প্রেমিকারই স্বর! সে আজ তার প্রেমাস্পদ নয়, স্বয়ং ভগবানই সেইস্থান গ্রহণ করেছেন। অফিসারটি নাম ধরে ডাকতে সেই পূর্ব্বেপরিচিতা যুবতি জানালার পর্দা খুলে দাঁড়াল। যুবক তখন তার সহিত কথায় বলল, তুমি আমার সঙ্গে চলে এস; যুবতী রাজী নয়। তখন সেই যুবক বলল, তুমি বলত আমি এই মঠ ভেঙ্গে তোমায় বার করে নিই। তখন যুবতী মঠের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসিনীকে বলল, 'Mother, I have lied, he is my lover' (মা, আমি মিথ্যা কথা বলেছি, এ লোকটি আমার প্রণয়ী)। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধা পর্দা টেনে দিলেন, যুবতী সন্ন্যাসিনী আবার অদৃশ্য হলো।

তৎপর, খৃষ্টীয় ধর্মসংস্কারের আন্দোলন আবির্ভূত হয়। তাতে ধর্ম্মের কঠোরতা ও বাহ্যিক ত্যাগ স্বীকারের অনুষ্ঠানসমূহ বাদ দিলেও, ধর্ম্ম সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে খৃষ্টীয় প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ বার হতে থাকে। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের একটি গান বলছে: Love divine, Love excelling joy to Earth come down (প্রেম স্বর্গীয় বস্তু, আনন্দাপেক্ষা প্রেম জগতে এস)। ভগবানকে প্রেম করাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম, যদি চ নাচা, কোঁদা প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে স্থান পায়নি।

অন্যদিকে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাষ্ট্রে Shakers নামক একটি সম্প্রদায় নেচে গেয়ে সাধন ভজন করে। এরা একজনের পিছনে আরেক জন দাঁড়ায় এবং হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে ঘুরে বেড়িয়ে প্রার্থনা করে। এক মহিলা এই দলের স্থাপয়িত্রী। তিনি নাকি স্বর্গ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন যে এবম্প্রকারে ভজন সাধন কর আর আদেশ পেয়েছিলেন যে, বিবাহ ক'র না। কিন্তু তিনি তাঁর বেশী বয়সে ক্ষেপে ওঠেন যে বিয়ে করব। শিষ্যবর্গ তা হতে দেয়নি।

তৎপরে, আমরা ইসলামে প্রেমমার্গের অনুসন্ধান করব। ইসলামও দুভাগে বিভক্ত—সরকারী ও মরমী সাধকের। সরকারী ধর্ম্ম খলিফা ও মোল্লাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু রহস্যবাদী বা মরমী কবি হেঁয়ালী ছন্দে এবং অন্য ভাবের আকারে মরমের কথা কন। কালে এদের "সুফী" এই নাম প্রদান করা হয়। সর্ব্বপ্রথম সুফী কবি স্পেনে এবং তৎপর সিরিয়াতে (আল আরাবী) আবির্ভূত হন। কেউ কেউ এঁদের প্রাচীন গ্রীক কৃষ্টির প্রভাবে উৎপন্ন বলতে চান; তাঁরা ভারতের প্রভাব স্বীকার করতে চান না (Browne দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে ভারতীয় কৃষ্টির প্রভাব সুফী মতবাদের উপর যথেষ্ট পড়েছে।

সুফীরা তিন মতে বিভক্ত: (১) একদল অদ্বৈত-বাদী (তৌহিদ), (২) একদল পূর্ব্বজন্ম বাদী (তনাসুখ), (৩) একদল যোগ-অভ্যাসী (ফিকর)। এঁরা সকলেই তসবুফে (mysticism) বিশ্বাসী। এঁরা বৌদ্ধ সহজযানীদের ন্যায় সন্ধ্যাভাষায় বিশ্বাসী, —যেমন 'মদ' মানে ঈশ্বর প্রেম, 'সাকী' মানে ঈশ্বর, 'পীরমঘান' (শুঁড়িখানা) মানে ধর্ম্মগুরু ইত্যাদি। এই সুফীধর্ম্ম ইরানেই বিশেষ ভাবে প্রকট হয়। অতি বড় সুফী সাধক ছিলেন—মৌলনা রুমী। তাঁহার মসনবীতে ভারত এবং বেদান্তের উল্লেখ আছে। তিনি তুর্কির কোনিয়ে নগরে বাস করতেন বলে 'রুমী' আখ্যা পান। আবার হাফেজের "দেওয়ান" সুফীমতে শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে গণ্য হয়।

এটা দৃষ্ট হয় যে, আরব-মুসলমানদের দ্বারা পরাজিত দেশ সমূহেই সুফী ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। বিজিতেরা 'জিম্মি' বলে নানা ভাবে উৎপীড়িত হত। যারা জীবন বাঁচাতে লাগল, তারা

বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মনে মনে পূর্ব্বজাতীয় স্মৃতি ঘুমরাতে থাকে। ক্রমে বিজিতদের মনে উমিয়াদ খলিফাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হয়। এর আগে প্রকাশ্যভাবে সাহিত্যিক "শুবিবয়া" আন্দোলন হয় (Gold Ziehor দ্রষ্টব্য)। এঁরা বলেন, আমরা মরুভূমির আরবদের চেয়ে কিসে ছোট, আমরা সিজার এবং মহারাজাদের বংশধর। আমরা কেন এদের সঙ্গে অসাম্যে থাকব, বিশেষতঃ যখন ইসলাম সাম্যবাদীয় ধর্ম্ম! তৎপর সুফীমতবাদের উদয় হয়।

সর্ব্বপ্রথমে সুফীবাদ বিদর্শীয় এবং ইসলাম বিরুদ্ধ বলে গণ্য হত। কিন্তু পণ্ডিত আল গজ্জালী নিজে গোঁড়া এবং সুফী উভয় বলে সুফীবাদকে জাতে তুলেন। সুফী সাধকেরা আর কাফের বলে গণ্য হন না। এস্থলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে বাধ্য যা ভারতে সুবিখ্যাত।

নবম শতাব্দীতে 'জুনেইদ' বলে একজন কুর্দজাতীয় সাধক ভারতে আসেন এবং সিন্ধু দেশের আবু আলি নামক একজন সাধকের কাছ থেকে হঠযোগ শিখে দেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ইরানে অতি প্রথম সুফী বলে খ্যাত। শিষ্য পরম্পরায় আসেন বায়াজিদ বিস্তামী ; ইনিও একজন সুফী। এঁর শিষ্য হন মনসুর আল হাল্লাজ। ইনি Carder অর্থাৎ পশম ঝাড়া কার্য্যের লোক ছিলেন। ইনি ভারতে আসেন, বলেন—Rope trick (দড়িবাজী) দেখব। দেশে ফিরে ইনি শিষ্যদের বলতেন, "আমি ঘর জোড়া শরীর ফোলাতে পারি। উর্দ্ধে উঠতে পারি, আর মলে আবার জন্ম নেব (Browne : A Literary History of Persia) তিনি বলেন, "আন-অল-হক" অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তাঁর প্রাণ নাশের সময় রোজমান শিষ্যদের বললেন, "ভেবোনা, আমি একমাস বাদেই আবার জন্মাব।" ইতিহাসে উক্ত হয়েছে, যখন রাজাদেশে তাঁকে কয়েদখানায় পাঠানো হয়, তথাকার জেলকর্ত্তা একজন ইরাণী দাখিন (ভূত্বামী) বংশীয় ছিল। তা শুনে তিনি বললেন,"আমি শুনী হলাম যে একজন ইরাণী ভূস্বামীর হস্তে মরব (Browne, His.)

এস্থলে এগুলি উদ্ধৃত হল কেবল বুঝাবার জন্য যে, সুফী প্রেমধর্ম্মের পশ্চাতে বিজেতা আরব জাতির ওপর উদার সুফীরও কি রাগ। প্রেম ধর্ম্ম যে নামেই যে দেশে প্রচলিত থাক্ না কেন, এরারা নিপীড়িত জনের মরমের বেদনাই ব্যক্ত হয়। আল-হাল্লাজের নিষ্ঠুর হত্যা ফার্সী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। অবশ্য মৃত্যুকালে "আন-অল-হক" শব্দ উচ্চারণের দুটো রূপ প্রচলিত আছে। (১) কাটা মুণ্ড থেকে উক্ত কথা বের হয়। (২) মুণ্ড থেকে রক্ত ধারায় ঐ শব্দ ভূমিতে লিখিত হয়। বহুপরের ইরাণের শ্রেষ্ঠ সুফী কবি হাফেজ এক কবিতায় প্রিয়তম আত্মার দর্শন কালে বলছেন,—"কসিদ নখদ আনা অলহক বর জমিন খুন। চু মনসুর আয় কসি বর দারম ইম সর।" এর অর্থ,—যদি আজ রাত্রে আমায় মারে, তা হলে রক্তে ভূমিতে মনসুরের মত আনাল হক লিখব – (দেওয়ান)।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জঙ্গিস খাঁর ভীষণ নরহত্যার প্লাবন ইরাণকে ডুবিয়ে দেয়। ঐ প্লাবন মধ্য এসিয়া থেকে পালেষ্টাইন পর্য্যন্ত ভাসায়। আরব শাসন কালে, মুসলমান হয়ে ইরাণীরা যা হোক গোলেমালে খলিফার শিষ্য সেজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিল। কিন্তু জাঙ্গিস খাঁর হত্যার কল থেকে মুসলমান-জগত আজও উদ্ধার পায় নি। মধ্য ও পশ্চিম এসিয়া আজও অন্ধকারাবৃত হয়ে আছে। হোলাকু বাদ করে সতর লক্ষ লোক হত্যা করে। কারণ, মঙ্গোলেরা "সহরের সভ্যতা" মানব জাতির ক্ষতিকর মনে করত।

ইরাণ আবার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হলো। তারপর তথায় সুফী মতবাদ প্রবল হয়ে উঠে। যখন জাগতিক শক্তি দ্বারা উন্নতি অসম্ভব, তখন 'হায় ভগবান' বলা ছাড়া উপায় কি ? সেই জন্য অনেক মরমী কবির উদয় তখন হয়। সন্ধ্যা ভাষার মরমের কথা তাঁরা

ব্যক্ত করতে লাগলেন। এই সুফীদের মধ্যে হাফেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হাফেজের সঙ্গে বাংলার পরিচয় অনেক দিনের। তাঁরা সুখ্যাতি শুনে বাংলার রাজা সুলতান গিয়াসউদ্দিন অর্থ পাঠিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু জাহাজে চড়বার আগে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তাঁর আর্য্যজাতিসুলভ সামুদ্রিক জলাতঙ্ক উপস্থিত। একখানি চিঠি গিয়াসুদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে তিনি পশ্চাদ্‌গমন করেন।

এক সময়ে পারস্য সাহিত্য বাংলায় আদৃত হত। সুফীমতবাদ এদেশে অজ্ঞাত ছিল না। ইরাণী মরমী কবিদের সাহিত্য নিশ্চয়ই এদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে পঠিত হত। বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না। চৈতন্যচরিতামৃত পুস্তকে অদ্বৈত গোস্বামী এক সাংকেত বাক্য দ্বারা চৈতন্য দেবকে পুরীতে বলে পাঠাচ্ছেন :

বাউলকে বলো বলেছে আউল।
বাজারে না বিকায় চাউল।
বাউলকে বোলো বলেছে আউল॥

এই শ্লোকে আমরা 'বাজার' এবং 'আউল' দুটি বিদেশী শব্দ প্রাপ্ত হই। দুটীই আসলে আরবী শব্দোদ্ভব। আরবীতে আউলা এবং ফারসীতে আউলী অর্থে উপযুক্ততর। আর আউলিয়া অর্থে ঈশ্বরের বন্ধু, সাধুগণ (Saints)। আউলিয়া বলে' সুফীদের একটি সম্প্রদায় আছে। দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা এই সম্প্রদায়ের সাধুর কবর। দশম শতাব্দী হতে ইরাণ হতে দলে দলে ফকিরের দল ভারতে প্রচারার্থ আসেন। পৃথ্বীরাজের আমলীরে মৈনুদ্দিন চিস্তি আসেন। তাঁর আলৌকিক ক্ষমতা দেখে রাজার পুরোহিত এবং তাঁর দুজন শিষ্য মুসলমান হন। একজন শিষ্যই মুসলমান নাম—জয়নাল ফকীর। বাংলার বল্লাল সেনের সভায় পীর আদম (বল্লাল চরিত দ্রষ্টব্য) এবং লক্ষণ সেনের সভায় জেলালুদ্দিন তাব্রিজি (লেখ সুভোদয়া দ্রষ্টব্য) আসেন। এঁদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে লোকে মুসলমান হত। কাজেই ইরাণী কৃষ্টির সহিত শিক্ষিত হিন্দুর অপরিচয় ছিল না, বিশেষতঃ যখন 'ফার্সী' রাষ্ট্রভাষা রূপে সেদিন পর্য্যন্ত ছিল।

যাই হোক, শিক্ষিতদের কাছে হাফেজ এককালে অপরিচিত ছিলেন না। একণে তাঁরা দু'একটি গজল থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করে' তাঁর মরমী ভাব বুঝতে চেষ্টা করবো। এক জায়গায় সাকীকে (মদ্যবাহক) সম্বোধন করে বলছেন :

"বমি সাজ্জাদা রঙ্গিন্ কুন্ গরত্ পীর মঘান গোইদ। কহ্ সালেক বেখবর নবুদ্ যরাহ্ ওয়া রসম মঞ্জল হা॥" ইহার অর্থ : নেমাজের আসন মদ দিয়ে লাল করো, যদি শুঁড়ির বাড়ীর পীর (গুরু) বলে। কারণ পথিক তাহার গন্তব্য স্থানের রাস্তা ও রেওয়াজ বিষয়ে জানে।—এই শ্লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি বলে' কোন পুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে। এরই প্রতিধ্বনি করে' বাংলার বৈষ্ণবদের কথা প্রচলিত আছে : যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ির বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

হাফেজ পুনঃ একস্থলে সাকীকে বলছেন :

"বরহা নিই মরা অজ সর হস্তি।
চুঁ পইমুদি পিয়াপি আম মইরা।"

এর অর্থ :—মুক্ত করলে আমার মাথা থেকে আমার অহংভাব। যখন মাপ করে একবার পর আর একবার পাত্রে মদ দিলে॥

পুনঃ এক গজলে বলছেন :

গরজ ব মসজিদ ওয়া মৈখানআম্ ওয়াসিল সোয়া অস্ত।
যুজইন্ খেয়াল নদারম খোদা গাওয়া মন অস্ত।
মরা মদাই তু বুদন ব সলতানাত্ খুসতর।
কজল জোর ওয়া অফই তুই ওয়া আহ মন অস্ত।

এর অর্থ :—"আমার ইচ্ছা যে মসজিদে ও শুঁড়িখানায় তোমায় মিলন দেখি। খোদা সাক্ষী আছেন, এই খেয়াল ছাড়া আমার অন্য কিছু নাই॥

তোমার ফকিরি করা আমার রাজত্ব ভোগ করা অপেক্ষা বেশী পছন্দ। তোমার কাছ থেকে মোর জুদুম পাওয়া আমার ইজ্জৎ ও সম্মানের স্থল।

আর এক গজলে বলছেন :

"দর আশক খানকাহ্, ওয়া খরাবত ফরক নিস্তা
হরজা কহ্ হস্ত পরতু রুই হবিব হস্ত।"

এর অর্থ : প্রেমের ঘাবে ফকিরের আশ্রম ও মদখানার পার্থক্য নাই। প্রত্যেক স্থানেই তোমার প্রিয় মুখের অস্তিত্ব দেখি।

পুনঃ একটি গজলে বলছেন :

"অসকত নহ্ সরসরি অস্ত কহ্,
অজ সরবেহর সুদ।
মহরত নহ্ আরজী অস্ত কহ্ জাই দিগরস্থদ॥
অসক তু দর ওয়াজুবম্ ওয়া মহর দর দিলম্।
বাদীর দর হরদম সুদ ওয়া বা জান বেদর সুদ।
দরদি অস্ত দরদ অসক কি অন্দর এলাজ উ॥

এর অর্থ : তোমার প্রেম পাগলামী নয় যে তোমার মাথা থেকে বের হবে। তোমার সখ্যতা আকস্মিক নয় যে অন্য স্থানে রূপ পরিবর্ত্তন করিবে। তোমার সর্ব্বশরীর থেকে প্রেম উৎপন্ন, তোমার দিল্ থেকে সখ্যতা। (প্রেম) অন্তরের হুমদম আসে, প্রাণ বের হলে বের হয়। দরদের দরদ হচ্ছে প্রেম, একে অন্তর মধ্যে চিকিৎসা করতে হয়।

আবার সরকারী ধর্ম্মের প্রতিনিধিকে উপলক্ষ করে' বলছেন :

"চু তিফ্লান তা কি আয় ওয়াজ্ ফরেবী।
বসেব বোস্তান ওয়া জুই সীরম্।"

এর অর্থ : হে ধর্ম্মোপদেষ্টক, কতদিন ছেলে-মানুষের মতন ঠকাবে। স্বর্গের আপেলের বাগান ও দুধের নদীর গল্প করে।

সাধক হাফেজকে লোকে নাস্তিক বা অসুসলমান বলত। এজন্য তিনি ব্যঙ্গ করে একটি কবিতা লেখেন : "বরিখ মা হার অজ আনাজা হাফিজ। গরচে গরকে গুনাহাৎ মিরোদ বেহেস্ত॥"

এর অর্থ : যাও, হাফেজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যোগদান কর্ত্তে চেষ্টা করো না। যদিও সে পাপে ডুবে আছে, তথাপি সে স্বর্গে যাবে॥"

হাফেজের "দেওয়ান" ইরাণের অনেকের কাছে ধর্ম্ম পুস্তকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। কেহ কোন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ চাইলে, এ পুস্তক খুলে যে শ্লোক সম্মুখে পাবে, তাই আদেশ বলে' গ্রহণ করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি কৌতুকপ্রদ সত্য ঘটনা এ স্থলে বিবৃত করা হল—এটা ইরাণী-নেতা শ্রীসৈয়দ টাকেজাদে লেখককে বার্লিনে বলেছিলেন। ১৯১১-১২ খৃঃ যখন আমেরিকান জাত ইরাণী অর্থ সচিব মুস্তার প্রবর্ত্তন ব্যবস্থায় রুষ-আর গভর্ণমেণ্ট আপত্তি করে' সৈন্যদল পাঠায়, তখন ইরাণী গভর্ণমেণ্ট সেনাপতি ঈস্রেইম্ খাঁকে তার প্রতিরোধ করতে হুকুম দেয়। ইনি জাতিতে আরমানী। ইনি প্রতিরোধে অশক্ত বলে ভয় পান। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে' প্রাণদণ্ড দেয়। অন্য দিকে ঈস্রেইম খাঁ, তাঁর বিভিন্ন দেশ-হিতৈষিক কার্য্যের জন্য বড় জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড পালিত হওয়া দেখ্‌তে লোকে যেতে লাগল। নবাব আলীকুলী খাঁর (ইনি প্রথম যুদ্ধের সময় বার্লিনে। ইরাণীদূত ছিলেন) সেনাপতির "জানাজা"তে যেতে বড় ইচ্ছা হল (মুসলমানদের এটা—ধর্ম্ম পদ্ধতি) কিন্তু রাজ রোষের ভয়ে যেতেও সাহস করেন না। অবশেষে হাফেজের "দেওয়ান" খুলিলে উপরোক্ত শ্লোক তাঁর চোখে পড়ে "যাও যাও হাফেজের জানাজায় যাও।" এতদ্বারা তিনি হৃদয়ে সাহস পান এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন।

নবাব আলীকুলী খাঁ সম্বন্ধে এইস্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হল, যার ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। লোকমুখে লেখকও শুনেছিলেন যে নবাব ভারত-জাত, তজ্জন্য ইরাণে নাগরিক অধিকার পেতে অসুবিধা হয়। একথা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তর দেন যে তা' সত্য নয়। কিন্তু তাঁর পূর্ব্বপুরুষ অন্যান্য মোগলের ন্যায় বাবরের সঙ্গে ভারতে যান এবং পরে "সরকার" প্রদেশের (মাদ্রাজউপকূলে)

গভর্ণর হন। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর, তাঁর বংশ ইরাণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বোম্বাইতে তাঁর আত্মীয়েরা এখনও আছেন।

একথা এ স্থলে উক্ত হল, কারণ আবে হায়াৎ (উর্দ্দু সাহিত্যের ইতিহাস) প্রণেতা ডাঃ আজাদ তাঁর পুস্তকে বলেছেন, ইরানী, তুর্কী, আরব ওমরাহ্‌রা ভারতকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে স্বীকার করে নেয়। অন্য দিকে জনশ্রুতি যে দিল্লীর পতনের পর অনেক মোগলবংশীয়েরা স্বদেশ ইরাণে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই পরগাছারা যতদিন ভারত শোষণ কর্ত্তে পেরেছিল, ততদিন করে, পরে পিতৃভূমিতে ফিরে যায়। এর প্রতিবাদে কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজে একজন মুসলমান লেখক এ জনশ্রুতির প্রতিবাদ করে ইহা মিথ্যা বলেন। এজন্যই একজন ভারতীয় মোগল ওমরাহ্‌জাত নবাব আলকুলী খাঁর স্বীকৃতি এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হল।

শেষে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। মুসলমান-যুগের মধ্যকাল হতে যখন কবীর, নানক, চৈতন্যদেব প্রভৃতির উদয় হয়, তখন থেকেই ভারতীয় প্রেমধর্ম্ম, যাকে "নারদীয় প্রেম ভক্তি" বলা হয়, তার সঙ্গে ইসলামীয় সুফী ধর্ম্মের মিলন হয়। ভারত চিরদিনই নানা কৃষ্টির একটা সঙ্গমস্থল। ভারতীয় প্রেমধর্ম্মে সুফী মতের প্রভাব পড়ে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। আবার ভারতের বাইরে সুফী ধর্ম্মের উপর ভারতের অদ্বৈতবাদের প্রভাব পড়ে। এস্থলে লিপিবদ্ধ করতে হয় যে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তথাকথিত "আরব সভ্যতা"তে গ্রীক-প্রভাব পড়েছে বলে আনন্দে মশগুল হন, কিন্তু ভারতের প্রভাব বিষয়ে বিশেষ বলেন না। অবশ্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব ভাষা ও কৃষ্টির অধ্যাপক ৺ অধ্যাপক হার্টমান লেখকের কাছে ভারতের প্রভাব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কতটা? ইংরাজ লেখকেরা বিশেষতঃ এ বিষয়ে স্বীকার করতে নারাজ। কেউ স্বীকার করেন নি যে শায়খ আবু হানিফা, যাঁর মত দ্বারা এসিয়ার মুসলমানেরা পরিচালিত হন, তিনি জাট-বংশীয়-এবং তাঁর পিতামহের নাম ছিল—ওয়ানন্দ (আনন্দ)।

লেখক তথাকথিত আরব বা সারাসেন-কৃষ্টির বিষয় যতদূর ইউরোপীয় পুস্তকসমূহ মধ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন, তাতে তাঁর অনুমান, আরবদ্যতাতে ভারতীয় কৃষ্টির প্রভাব, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে হোক, অর্দ্ধেক পরিমান। এর অর্থ আরব সভ্যতার একার্দ্ধ যদি ইউরোপীয়-জাত হয়, অপরার্দ্ধ ভারতীয়-জাত। প্রাচীনকালে আরবে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। উভয় দেশের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন; প্রাচীন ফ্যারাওদের সময় থেকে এ সম্বন্ধ। লেখক সাতজন লোকের নাম আরবীয় ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন যাঁরা হিন্দুবংশজাত হয়ে আরব-সাম্রাজ্যে বিশিষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এ সব বিষয়ে এক্ষণে ভারতে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হতে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী করে শিক্ষা প্রদান করার ফলে, হিন্দুর কাছে ফার্শী সাহিত্য অপরিচিত হয়। সেজন্য এই মিলন ব্যাপার অনুসন্ধানের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রেমধর্ম্মের অবস্থার বিষয় বলে' এ অনুসন্ধান বন্ধ করব। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-সংস্কারক দলসমূহ ভারতে উত্থিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ, কর্ত্তাভজা, প্রার্থনা-সমাজ, রাধাস্বামীসম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন দল ও উপদল সকলেই প্রেমধর্ম্মীয়। ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞানমার্গকে আশ্রয় করলেও সগুণ ভগবানের উপাসক বলে ভক্তিমার্গী—সেজন্য প্রেমধর্ম্মীয় সম্প্রদায়। কীর্ত্তন, নর্ত্তন, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি দ্বারা এঁরাও উপাসনা করেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন, "ভক্তিদ্বারাই মুক্তি হবে" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪।৪।১।২২৯); এক স্থলে এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের প্রশ্ন—কি উপায়ে ভগবান

পাওয়া যায়? এর উত্তরে তিনি বলেন, "তাঁর উপর ভালবাসা"—(ঐ ।৪০ ২২)। পুনঃ এক স্থলে তিনি বলেছেন: "পাশী হইতে (হাফেজ) অধ্যছ ·· সকলের ভিতর প্রেম। ···প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। ····শুদ্ধাভক্তি সার, আর সব মিথ্যা"—(ঐ, ৪। পৃঃ ১৪৪)।

শেষ বক্তব্য যে, জাপানেও একদল আছেন, যাঁরা কীর্ত্তন, নর্ত্তন দ্বারা ভগবৎ ভক্তির সাধনা করেন। জাপানীরা মহাযানী বৌদ্ধ এবং ভগবানে বিশ্বাসী বলে কথিত হয়।

শেষ কথা, ভক্তিমার্গ এবং তার বাহন প্রেমধর্ম। নিপীড়িত ও জাগতিক অসাধনস্যে জর্জ্জরিত শ্রেণীদের মধ্যেই ধর্ম্মের প্রেমমার্গের উদয় হয়। আর তারাই আজ এর প্রধান সাধক। নীরস সরকারী ধর্ম্মপ্রণালীর প্রতিবাদেই প্রেমধর্ম্মের উদয়। এখানেই তার কৃতকার্য্যতা; ভারতের বেশীরভাগ হিন্দুই প্রেম-মার্গীয়। অন্যান্য ধর্ম্মের গোড়ার কথাই তাই।

প্রবচন ও ব্রতকথা

শ্রীজয়দেব রায়

সুরে গ্রথিত গান ছাড়া বাঙলা দেশের প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ব্রতকথা, কুলজী, কথকতা, হেঁয়ালী ও ধাঁধা প্রভৃতির মধ্যেও একটি সুরেলা ঢঙ্ আছে। সঙ্গীতের আয়ত্তের মধ্যে না পড়িলেও এগুলিকে তাহার অঙ্গীভূত করা হইতেছে।

ডাক ও খনার নামে প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ-প্রবচন গুলির মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। এগুলির মধ্যে পল্লীর বহুদর্শী বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশ নিগূঢ় আছে। যেমন:

সূত কলসী শুকনা যা। শুকনা চাল্লে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকুন্দ ফোলা। এক পা না বেরিও বাপা।
ডাক বলে এরেও ঠেলি। যদি না দেখি সমুখে চেলি।

অনুমান করা যায় ব্রাহ্মণ্য শাসিত বঙ্গদেশে এই সকল প্রবাদের সৃষ্টি হইত। এসকল প্রবচনের মধ্যে কোন কোনটায় বেশ কতকটা আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ আছে। যেমন:

ভাল দ্রব্য যখন পাব। কালিকারে তুলিয়া না খোব।
যদি মুড় করিয়া ভোগ। ঈশ্বর দিয়া খণ্ডাব রোগ।
বলে ডাক এই সংসার। আপনা বলে কিসের আর।

আদর্শ সতী নারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ডাকার্ণব বলিতেছেন:

রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে। তবু তার পুজায় সাজে।
হলীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি। মিঠা বোল স্বামীকে ভকতি।
রৌদ্রে বাঁচায় কুটায় রাঁধে। ঘর কাট বর্ষাকে বাঁধে।
কাঁখে কলসী পানিকে যায়। হেট মুণ্ডে কাকেও না চায়।
যেন যায় তেন আইসে। বলে ডাক গৃহিণী সেই সে।

ডাকের বচন গুলির ভাষা এত প্রাচীন যে, অনেক শব্দের অর্থসঙ্গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

খনার বচন গুলিতে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় জ্যোতিষের নানা সূত্র আছে। কৃষিকার্য্যের নানা নির্দেশ, তাঁহার বচনগুলি হইতে চিরদিনই কৃষকেরা সাগ্রহে সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। কোন্ মাসে চন্দ্রগ্রহণ হইবে তাহার নির্দেশ:

যেই মাসে যেই রাশি। তার সপ্তমে থাকে শশী।
যদি পায় পূর্ণিমাসী। অবশ্য রাহু চাঁদ গ্রাসি।

শুভঙ্করীর আর্য্যা বা নামতার সূত্র বঙ্গবাসীর এক-পারিভাষিক সঙ্গীত; এই সকল ছড়ার সাহায্যেই দেশবাসী প্রাথমিক গণিতের পাঠ লইয়া আসিয়াছে:

কুড়ুনী কুড়ুনী কুড়ুনী নিবাস। কাহার কুড়ুনী কাহার নিবাস
কাহার কাহার ধন পরিমাণ। কতদিন পতা কাহার প্রমাণ।

এই সব নামতার সঙ্গে কবি শুভঙ্কর দাশের নামের ভনিতাও দেওয়া আছে :

কাক চক্ষুর্দে বটক জানি। তিন ক্রোশে বট বাখানি।
নবগুণ করিয়া সার। সাতাশ ঘরে বট বিচার।
আশি তিলে বটক কয়। দেখায় শুভ শুভঙ্কর॥

বংশ-পত্রিকা, কুলজী বা কুলপঞ্জী ঘটক ও ভাট-কবিরা বিশেষ একটি ভঙ্গীতে আবৃত্তি করিত। তাহাদের এই শ্রেণীর কুলজী-গ্রন্থের নাম ছিল 'ঢাকুর'। পূর্বে বোধ হয় ঢাকের বাজনা বাজাইয়া স্তুতিবাদ করা হইত, সেই হইতে এই শ্রেণীর ছড়ার নাম ঢাকুর হইয়াছে। যেমন :

গঙ্গাপারের মৈত্র মহাশয় গলায় ফুলের মালা।
পরিচয়ের মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা॥
জাতির কর্তা রাজীব রায় মুদুকের সুবা।
তাঁর হুকুম তুচ্ছ ক'রে সত্য হলেন বোবা।

জমিদার রাজীব রায়ের নির্দেশে উচ্চজাত হীনজাতে পরিণত হইতেছে অর্থাৎ এই শ্রেণীর জমিদারেরাই ছিল সমাজের শাসক। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এই শ্রেণীর কুলজী গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া জাতির মহা উপকার করিয়াছিলেন।

মেয়েলী ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতির সঙ্গেও সুর জড়িত আছে। ঠাকুরমা-দিদিমাদের কাছ হইতে পাওয়া এই ব্রতকথার সুরটি বাঙ্গালীর একান্তই আপনার।

পাকাচুলে পরব সিঁদুর, ধন্য কর ধন্যি, ঠাকুর।
পুণ্য দিয়ে স্বামীর কোলে, মরণ হয় যেন এক পলা গঙ্গাজলে॥

ব্রতকথার মধ্যে পল্লী-সংস্কৃতির চারটি অঙ্গের একত্র সমাবেশ হইয়াছে—ছড়া, উপকথা, লোকশিল্প লোকাচার। ব্রতকথাই ললনা-বঙ্গের প্রতিচিত্র। বারো মাসে তেরো পার্বণের ন্যায় সারা বর্ষ ধরিয়া অসংখ্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, গৃহস্থ-গৃহ উৎসবমণ্ডিত হইয়া থাকে; দরিদ্র, ভিক্ষুক ও ব্রাহ্মণদের দান করা হয়, শিশুদের মুখে উৎসবের বাণীর সুরে হাসি ফুটিয়া উঠে, পল্লীললনাদের সামাজিক সম্মেলনের সুযোগ হয়।

এই ব্রতকথা উপলক্ষেই অন্তঃপুরিকারা রচনা করে গীতিকবিতা ও ছড়াগান; বর্ষীয়সীরা সৃষ্টি করেন প্রাচীন-স্মৃতি রোমন্থন করিয়া তদুপযোগী উপকথা। ব্রতকথার আনুসঙ্গিক এই কথা ও ছড়ার মধ্যেই আশ্রয় করিয়া আছে প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়।

ব্রতকথাকে উপলক্ষ্য করিয়া কতকগুলি অলৌকিক আচারানুষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেগুলির উৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন :

"নিজের কথা মিষ্টি হবে এবং শাশুড়ী ননদের বাক্য-যন্ত্রণা সইতে হবে না, এই কামনা ক'রে মেয়েরা যেমনি নিজেদের মধ্যে ব্রত করেছে, অমনি মধু আর মিষ্টান্নের চারিদিকে ব্রাহ্মণ-মাছি আস্তে আস্তে এসেছে দেখি 'ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত সহ লাড্ডুক দান করো' বলে।"

ব্রতকথাগুলি ছিল লোকশিক্ষার অন্যতম অবলম্বন। পল্লীর ভক্তিমতী গৃহিণীরা বালিকা ও তরুণীদের কাছে ব্রতকথার উপাখ্যানগুলি বিবৃত করিতেন। বাঙলার হিন্দুনারীদের সংস্কৃতির একটি অঙ্গই ছিল এই ব্রতকথাগুলি। এগুলির মাধ্যমে তাহারা শিক্ষা পাইত দেবভক্তি, পতিভক্তি, আতিথ্য-ধর্ম, আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে সুব্যবহার, রীতিনীতি, ক্ষমাধর্ম, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি। বিলাতী শিক্ষা-সভ্যতা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হওয়ায় এই ব্রতকথার দিন ক্রমশঃ গত হইয়াছে।

প্রায় সকল ব্রতেরই আচারানুষ্ঠান ও রীতিনীতি প্রায় অভিন্ন। আলপনামণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে নবাঙ্কুর সম্প্রাপ্তে উজল উষাকালে শুচিস্নাতা কিশোরীরা সারাবর্ষ ধরিয়া একটির পর একটি ব্রত করিয়া চলে, তাহাদের কামনাযোগ্য বর, কুমারী-জীবনের চরম সার্থকতা :

ধাতাকাতা বিধাতা তুমি দাও বর
আমার যেন ভীমী হয় রাজরাজেশ্বর ॥

কুমারী-জীবনের ব্রতের পর আছে সধবার ব্রত। এই ধারার ব্রতের উদ্দেশ্য, স্বামী-পুত্রের নিরন্তর মঙ্গল-কামনা, গৃহসংসারের শান্তি প্রার্থনা। এ সকলের উপর ছিল সতীনের জ্বালা :

যমনা মরো যমনা সতীন যেন হয় না।
হাতা হাতা হাতা যা সতীনের মাথা।
পাখী পাখী পাখী সতীন আমার হবা'
এই কামনা দেখি॥

ব্রতকথার বৈচিত্র্য অল্পই, অধিকাংশ কৃষিবলেরই উপযোগী। যেমন— বনদুর্গা, অরণ্যষষ্ঠী, বুড়াঠাকুরাণী, পাঁচুঠাকুর, ভাদুনী, চম্পক, সন্ধ্যামণি, ইতু, গোকুল, হলপর্ব প্রভৃতি। সকল ব্রতই গৃহবধূদের কৃষিলক্ষ্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত পূজা :

ওই আসছে ধানের ডালা, তাই বাসতে ফেলা বেলা।
ওই আসছে ফলের ঝুড়ি, তাই শুকতে হলেম বুড়ি।
চন্দ্রসূর্য পূজন, সোনার থালে ভোজন।

ব্রতের উপকরণ অতি সামান্য—ফুল, বেলপাতা, ধান, চাল, সুপারি, গঙ্গাজল, আখ, দূর্বা ও তুলসী প্রভৃতি। অল্পে তুষ্ট দেবতারই তাই পূজা হয় :

আকন্দ বিল্বপত্র তোলা গঙ্গাজল।
এই পেয়ে তুষ্ট হন ভোলা মহেশ্বর।

আলপনা ও ঘটসাজানোর মধ্যে কিন্তু ব্রতচারিণীরা সাধ্যমত বৈচিত্র্যের সমাবেশ করে। সারা আঙিনা জুড়িয়া আঁকা হয়— লক্ষ্মী, মহিষমর্দিনী, শঙ্খলতা, পদ্মপাতা, ধাতাকাতা, আল্পনী পুতুল প্রভৃতি।

ব্রতের উদ্‌যাপন-গীতির মধ্যেই সেই ব্রতের উদ্দেশ্য ও তাহার সিদ্ধির সঙ্কেত থাকে, এগুলি ব্রত-চারিণীরা সমবেত স্বরে সাধারণতঃ গাহিয়া থাকে। তারা-ব্রতের গানটি :

ষোল ষোল তারা তোমরা হইও সাক্ষী,
ব্রত দিয়ে করি আমরা শঙ্করালী।
ষোলায় আসি ষোড়ায় যাই,
বাপের বাড়ী এসে বেশ বিশ্রাম পাই।
—তারা পূজে তারাকালী
তারা পূজে কি বর পেলি?
শঙ্কর যেন স্বামী পাইলাম,
কার্তিক গণেশ পুত্র পাইলাম,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পাইলাম,
জয়া বিজয়া দাসী পাইলাম,
নন্দী-ভৃঙ্গী নফর পাইলাম।
(তারপর) ষোল ব্রতীর হাতে ষোল সরা দিয়া
আমি যাব ইন্দ্রপুরের দেবী হইয়া।
চন্দ্রসূর্যে দিয়া ফুল, ওরে বিলাব তিন কুল॥

ব্রতকথার আর একটি অঙ্গ আছে, এগুলিতে কথকতার ন্যায় সুরবহুল গদ্যে এক একটি উপকথা বলা হয়; প্রকৃতপক্ষে এই কথাই ব্রতের প্রধান অঙ্গ; 'অশথ নারাণ'-এর ব্রতের কথা :

"শিব বলে গৌরীরে, এত লোক গঙ্গার ঘাটে কি ব্রত করে? গৌরী বলে, মেয়েরা সব অশথ নারায়ণের ব্রত করে। শিব তখন বলে, ঐ ব্রত করলে কি হয় গো? গৌরী বলে, জানো না? ঐ ব্রতের শেষে 'পাকাপাতাটি' মাথায় দিলে পাকা চুলে সিন্দুর পরে; 'কাঁচা পাতাটি' মাথায় দিলে কাঁচা সোণার বর্ণ পায়; (আর) 'শুকনো পাতাটি' মাথায় দিলে হীরে মুক্তার কুরি পায়, (কিন্তু) 'কচি পাতাটি' মাথায় দিলে কোলে কোমল পুত্র পায়।

শিব তখন বলে—এ ব্রত করলে আর কি হয়? গৌরী হেসে বলে, এ ব্রত করলে মহাদেবের মত স্বামী পায়, গৌরীর মত শাশুড়ী পায়, রামের মত স্বামী পায়, লক্ষ্মণের মত দেওর পায় আর সীতার মত সতী হয়।

কেবল ব্রতকথাই নয়, উপকথার সঙ্গেও এই সুর জড়িত। রূপকথার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে কথক-ঠাকুরাণীর কণ্ঠে গুন্‌গুনিয়া উঠে সুর, আর কখনও গল্পের শেষে শোনা যাইবে সেই চিরন্তনী ছড়া, যাহার জন্য শিশু-শ্রোতারা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। এ যেন 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' :

আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়োল,
কেন রে নটে মুড়োলি? গোরু কেন খায়?
কেন রে গোরু খাস? দুধ কেন হয় না?
কেন রে দুধ দোস্ না? বাছুর কেন খায় না?
কেন রে বাছুর খাস না? বউ কেন ভাত দেয় না?
কেন রে বউ ভাত দিস্ না? গোপাল কেন কাঁদে?
কেন রে গোপাল কাঁদিল?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

স্বামী বেদানন্দ

আধুনিক যুগে জগতের মনীষীর সমাজে ভারতবর্ষকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব মহত্ত্ব বহুমুখীপ্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি ও অভিনব চিন্তাসম্পদে যাঁহারা গৌরবের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সেই সমস্ত অসাধারণ পুরুষদের মধ্যে অন্যতম।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার এবং নানা বিস্ময়কর ঘটনায় পূর্ণ ও মহান কর্ম্মরাশি-সমন্বিত জীবন ভারতবর্ষের যুবকদের মনে আত্ম-বিশ্বাস ও জ্ঞানসাধনার অন্যতম প্রেরণার উৎসস্বরূপ। (১)

আচার্য্য বসুমহাশয়ের জীবনের সম্বন্ধে 'প্রবাসী' ও Modern Review ছাড়াও আরও অনেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় অনেক প্রামাণ্য তথ্য ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। ইহা ছাড়া লণ্ডনে, নিউইয়র্কে, ফ্রান্সে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনেক পত্রিকায় তাঁহার বক্তৃতা ও কথোপকথন সম্বন্ধে অনেক বিবরণ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরেরও আগে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজীতে প্যাট্রিক গেডেস আচার্য্য বসু মহাশয়ের একটি জীবন-চরিত আজ প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইল লিখিয়াছেন। আচার্য্য বসু মহাশয়ের সহকর্ম্মী, শিষ্য ও ছাত্ররূপে অনেক বৈজ্ঞানিক সুধী কোন কোন পত্রিকায় তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অথবা আবিষ্কারের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য্য বসুর বিশেষ প্রিয় ও আযৌবন সুহৃদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত (ক) 'বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে' (খ) 'ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি' (গ) 'বন্ধু, যেদিন ধরণী ছিল ধ্বনিহীন বাণীহীন মরু'—এই তিনটি বিখ্যাত কবিতা—বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৮ খৃঃ অঃ আচার্য্য বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে এগুলি রচিত হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর—কলিকাতায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র-নাথের রচিত 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে"—কবিতাটিও স্মরণীয়।

প্রবাসী পত্রিকায় (১৩০২ হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্রের অনেকগুলি পত্র, আচার্য্য বসু মহাশয়ের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া অবলা বসুর লিখিত প্রবন্ধ 'বাঙালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ' (প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩২, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৮) আচার্য্য বসুর জীবনচরিত রচনায় বিশেষ প্রামাণ্য উপাদান। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে আচার্য্য বসুর দেহত্যাগের কয়েকদিন পরে প্রবাসীতে সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (প্রবাসী পৌষ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা ৪৩১-৪৩৭) আচার্য্য বসুর জীবনের অনেক অপ্রকাশিত তথ্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য বসুর বিভিন্ন আবিষ্কার সম্বন্ধে স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয়ের একটি পুস্তক এবং অধ্যাপক শিশিরকুমার

---

(১) এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি আচার্য্য প্রিয়রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু" নামক পুস্তিকা হইতে প্রয়োজনমত তথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুমতি দান করিয়াছেন। বসু মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছাত্র জ্ঞানপ্রবীণ অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ

মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ, (বেতার বার্ত্তা : বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪ পৃষ্ঠা ১১৬-১২৫), ইংরাজীতে লিখিত ইহা ছাড়া দুই খণ্ড প্রকাশিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত (দ্বাদশ অধ্যায় ১৫৯ পৃষ্ঠা), এই সমস্ত রচনা ছাড়াও আচার্য্য বসু মহাশয়ের নিজের লিখিত প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায় তাঁহার বিভিন্ন আবিষ্কার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কয়েকটি প্রকাশিত প্রবন্ধ আছে। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া কোনও বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের দ্বারা আচার্য্য বসু মহাশয়ের একটি বৃহদাকার জীবনচরিত রচনা হইতে পারে।

আচার্য্য বসুর পিতৃপুরুষের আদিবাসস্থান—বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে। এই বিক্রমপুরে অনেক শতবৎসর ধরিয়া ন্যায়, বেদান্ত, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু মনীষীর জন্মস্থান। বিক্রমপুর অনেক কাল ধরিয়া প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে বিভিন্নদিক দিয়া সংস্কৃতি ও বিদ্যার একটি বহু প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তিব্বতে সর্ব্বত্র মহাজ্ঞানী ধর্ম্মগুরুরূপে পূজিত সুবিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য অতীশের (অন্য নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জন্মভূমি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। বর্ত্তমানযুগে ভারতবাসীদের মধ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রথম ডি-এস-সি উপাধিপ্রাপ্ত স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডু, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতৃপুরুষের আদিবাসস্থান এই বিক্রমপুরে তেলিরবাগ গ্রামে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় একজন স্বদেশপ্রাণ, মহানচরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের মাতাও নানাগুণসম্পন্না একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। ভগবানচন্দ্র বসু তখন ইংরাজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া অফিসার মহলে প্রতিষ্ঠি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি এসিষ্ট্যাণ্ট ডিভিসনাল কমিশনারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অবশ্যই হাকিম বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইলেও আসলে তিনি অমায়িক, দরিদ্রবৎসল ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। এমন অনেক ব্যাপার দেখা গিয়াছে যে, হাকিমীপদের প্রতিপত্তি অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব, চরিত্রমাধুর্য্য ও মহানুভবতার প্রভাবে তিনি অনেক দুর্দ্দান্ত চোর-ডাকাতের জীবনকে সৎপথে ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জগদীশচন্দ্র শৈশবে যাহার কোলে চড়িয়া বেড়াইতেন সে লোকটি আগে একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাত ছিল। ভগবানচন্দ্রের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া সে সদ্ভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে।

বাল্যকাল হইতেই কোনও নূতন বিষয় দেখিলেই তাহা জানিবার জন্য জগদীশচন্দ্রের মন উৎসুক হইয়া উঠিত। তাহার সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষক অথবা গুরুজনেরা সক্ষম হইতেন না। কিন্তু পিতা এবিষয়ে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া পুত্রকে বলিতেন, 'বড় হয়ে তুমি এসব ক্রমেই জানতে পারবে।' কখনও ধমক দিয়া বালকের জ্ঞানের পিপাসা ও সত্যান্বেষণের আকাঙ্ক্ষার স্রোতকে তিনি রুদ্ধ করিয়া দেন নাই। বয়স বৃদ্ধি হইতে হইতে কলেজের মেধাবী ছাত্ররূপে জগদীশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন—'বিশ্বপ্রকৃতির সুবিশাল লীলাক্ষেত্রে জানিবার জন্য অসংখ্য ও বিপুল পরিমাণ বিষয় ও ব্যাপার লুকাইয়া আছে।' তখন হইতে প্রত্যেক প্রাণী ও পদার্থের উৎপত্তি ও তত্ত্বনির্ণয়ের স্পৃহা তাঁহার অন্তরে উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সেণ্টজেভিয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাস করিয়া জগদীশচন্দ্র ঐ কলেজেই বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। তখন ঐ কলেজে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁ (Rev. E Lafont S,T.) পদার্থবিজ্ঞান (Physics) বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার দিনে অনেক বিখ্যাত মেধাবী বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁর ছাত্র

হইয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র ফাদার লাফোঁর একজন বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

চার বৎসর অধ্যয়নের পরে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এ পাস করিলেন। বিজ্ঞানে উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষালাভের জন্য জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডে যাইবার জন্য এই সময় চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে বিলাতে পড়াইবার মতন আর্থিক সঙ্গতি তাঁহার পিতার ছিল না। ভগবান চন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে বিভাগীয় য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনাররূপে প্রকৃত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু স্বদেশপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া দেশীয় শিল্প কৃষি ও কারুকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য বারেবারে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিনি নিজের অর্থরাশিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। এজন্য ইচ্ছা থাকিলেও ভগবানচন্দ্র নিজের পুত্রকে বিলাতে পাঠাইবার ব্যাপারে উদ্যোগী হইতে পারেন নাই। জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে এইরূপ বাধায় জগদীশচন্দ্র ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই নিরাশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আশার আলোক দেখা দিল। জগদীশচন্দ্রের স্নেহময়ী জননীর কাছে কয়েক হাজার টাকা ও কিছু গহনা-পত্র ছিল। পুত্রের ভবিষ্যত উন্নতির দিকে চাহিয়া স্নেহময়ী জননী সেই সমস্ত দিয়া পুত্রের বিদেশে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

জগদীশচন্দ্র বিলাতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার শরীর প্রায়ই খারাপ হইত। কালান্তরে তাঁহার শরীর এমন দুর্ব্বল ও অবসন্ন করিয়া দিল যে ইংলণ্ডে তাঁহার ছাত্রজীবনের একটী বৎসর বৃথাই নষ্ট হইল। অনেক দিন চেষ্টার ফলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর আবার তিনি যথারীতি ক্লাসে যোগ দিতে লাগিলেন। লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী ত্যাগ করিয়া জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটীতে এই সময় পড়িতেছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যই তিনি শিক্ষাদান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথাসময়ে কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজ হইতে তিনি একটী স্কলারশিপ পাইলেন। দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে তিন বৎসর থাকিয়া বিজ্ঞানে ট্রাইপোস পাস করিলেন এবং তাহার পরে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী হইতে যথাসময়ে বি-এস্‌সি উপাধি পাইলেন। পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রিলাভের পর জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইসময় হইতে (১৮৮৪) বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও গবেষণাকারীরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূচনা হইল।

কর্ম্মজীবনে জগদীশচন্দ্রকে প্রথমদিকে নানারূপ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সে সময় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসনকাল। ভারতবাসীরা যোগ্যতা ও দক্ষতা সত্ত্বেও নিজেদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার অনেক সময়েই পাইতেন না। শিক্ষাবিভাগের শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃপক্ষরা তখন ভারতবাসী কোনও অধ্যাপকের গুণ, যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে অনেক সময়েই সুবিচার করিতেন না। একজন সাধারণ-ইংরাজ অধ্যাপক বলিয়া যে পরিমান মর্য্যাদা ও মাহিনা পাইতেন, সেই পদে একজন বিশিষ্ট গুণী ও সুদক্ষ ভারতীয় অধ্যাপককে সেই পদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে মর্য্যাদা অধিকার ও মাহিনা অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হইত না। জগদীশচন্দ্রের জীবনে এই অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব আরও দারুণ হইয়া দেখা দিয়াছিল। প্রথমে তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিস এর (I. E. S.) পর্য্যায় অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও সে প্রতিশ্রুতি তখনকার দিনে শিক্ষাবিভাগের শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃপক্ষরা পালন করেন নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কার্য্যে অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ সত্ত্বেও তাঁহাকে ঐ পদের প্রাপ্য মাহিনার সম্পূর্ণ পরিমান অর্থ শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ দিতে রাজী হন নাই। তাহারা

ঐহ্য অনুহাত দেখাইলেন—জগদীশচন্দ্র এই পদে স্থায়ীভাবে (Permanent) নিযুক্ত হন নাই। সেজন্য তিনি ঐ পদের জন্য পুরা মাহিনা পাইতে পারেন না। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন কর্তৃপক্ষের এই অসঙ্গত নির্দ্দেশ মানিলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। সেইজন্য বিনাবেতনেই তিনি প্রায় তিন বছর ঐ গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অবিশ্রান্তভাবে কাজ করিয়া গেলেন। সেই সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কিন্তু আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্বের সাধকরূপে তথাপি জগদীশচন্দ্র সেই সময়ে সমস্ত অভাব অনটনকে বরণ করিয়া ধীরভাবে অধ্যাপকের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার বহুগুণবতী সুযোগ্য সহধর্ম্মিনী (শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু) স্বামীর সুদৃঢ় মনোবল ও আদর্শ নিষ্ঠায় গৌরবান্বিতা হইয়া সকল দিক দিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে সংসার-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

এই মহীয়সী মহিলা নানাগুণে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পতির জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সুযোগ্যা সহায়িকা ও সঙ্গিনী ছিলেন। নারীজাতির সমস্ত সদ্‌গুণ ও মহত্ত্ব বসুজায়ার চরিত্রে সমাবেশলাভ করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অবশেষে জগদীশচন্দ্রের আদর্শনিষ্ঠা ও দৃঢ়-সঙ্কল্পের জয় হইল। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ঐ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিলেন এবং সেইসঙ্গে তাঁহার প্রাপ্য তিন বৎসরের মাহিনার টাকা সম্পূর্ণপরিমানেই তাঁহাকে দিয়াদিলেন। ইহারপর আরো কিছুকাল জগদীশচন্দ্রকে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। কারণ, এইসময়ে একদল লোক ঈর্ষার বশে জগদীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ দিতে লাগিলেন—অধ্যাপক বসু নিজের গবেষণা কার্য্য লইয়াই এত অধিক ব্যস্ত থাকেন যে, তিনি নিয়মিতভাবে ও ঠিকসময়মত কলেজে তাঁহার অধ্যাপনার কাজ করেন না। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ হইল—অধ্যাপক বসু কলেজে ঠিকভাবে দক্ষতার সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সংখানি পদার্থ বিভাগের অধ্যাপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কলেজে ছাত্রদের নিকট তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় ও ভক্তিভাজন অধ্যাপক এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অল্প সংখ্যকই আছেন।

জার্ম্মান অধ্যাপক হার্জের ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুৎ তরঙ্গ (Horizon waves of Wireless)আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে একটি নূতন রাজ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ম্যাক্সওয়েলের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনেই হার্জ এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

সেই সময় হইতে দেশবিদেশে বৈজ্ঞানিক মহলের এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতি-বিধি ও প্রকৃতির সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা, পরীক্ষণ ও আলোচনার সূত্রপাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র তাঁহার ছাত্রদের সম্বন্ধে এই বিষয়ের পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক (practical) দিক দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকয়েকদিন বাদেই জগদীশ চন্দ্র লক্ষ্য করিলেন এবিষয়ে হার্জার-এর আবিষ্কৃত যন্ত্রের কার্য্যকারিতার দিক দিয়া অনেক ত্রুটি আছে। জ্ঞাতব্য বিষয় ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাইবার জন্য আচার্য্য বসু নিজেই উন্নত শ্রেণীর একটি যন্ত্র নির্ম্মানের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অচোর্য্য বসুর এই নূতন শ্রেণীর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইল। ইহার দ্বারা তিনি বেতার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও আমেরিকার অনেক পত্রিকায় জগদীশ চন্দ্রের এই নূতন যন্ত্র নির্ম্মান ও 'অভিনব তথ্য' প্রকাশনার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক মহলে বিস্ময়ের একটি সাড়া পড়িয়া গেল। জগদীশচন্দ্র লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির একজন বিখ্যাত প্রাক্তন ছাত্র ও সেখান হইতে ডি-এস্-সি উপাধি-প্রাপ্ত। এজন্য লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী জগদীশচন্দ্রের এই

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে ডি-এস্ সি উপাধি দান করিলেন।

সুদূর বিদেশ হইতে যশ ও সম্মান লাভ করিলেও তখনও এদেশে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনার ক্ষেত্র অনুকূল হয় নাই। তখনও পর্য্যন্ত শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে অনেক সময়ে উপেক্ষা ভোগ করিতে হইত। জগদীশচন্দ্রের এই বাধা-কণ্টকিত সাধনার সময়ে তাঁহার চিরবন্ধু কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অবিশ্রান্তভাবে উৎসাহ ও ভরসা দিয়াছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ জানিতেন—জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আত্মসমাহিত নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা কিছুতেই কোন বল বা ব্যক্তি রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। শীঘ্রই জগদীশচন্দ্র সাফল্যের বরমাল্যে বিভূষিত হইবেন—বিজয়লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ তাঁহার জীবনে অনিবার্য্য।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই দূরদৃষ্টি সত্যই সফল হইল। ক্রমেই ইংরাজ সরকার ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার বিচিত্রতা ও অসাধারণত্ব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি বৈজ্ঞানিকরূপে তিনি অনুমতি, আর্থিক-সাহায্য ও বিদেশে অবস্থানের জন্য ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

ইংলণ্ডে আসিবার পরে জগদীশচন্দ্রের পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রশংসা লাভ করিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলাভিন স্বয়ং আসিয়া বসু মহাশয়ের পত্নীকে তাঁহার স্বামীর প্রতিভার মৌলিক চিন্তারাশির জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাইয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে রয়্যাল ইনিষ্টিটিউটে বক্তৃতা দিবার দুর্লভ সম্মান ও অধিকার আচার্য্য বসু পাইলেন। রয়্যাল সোসাইটিতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ভিন্ন আর কোন অধ্যাপক বক্তৃতা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন না। জগদীশচন্দ্রের এই অধিকারলাভে ভারত-বাসী বিশেষতঃ বাঙালী জাতি গৌরবান্বিত হইলেন। ইংলণ্ড হইতে জগদীশচন্দ্র অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই এই সমস্ত বক্তৃতার প্রশংসা Spectator Times প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হইল। লর্ড কেলাভিন, লর্ড লিষ্টার, লর্ড স্যার উইলিয়ম র‍্যামসে প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা জগদীশচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট-এর কাছে নিজেরাই আবেদন করিয়া জানাইলেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার যেন শীঘ্রই স্থাপিত হয়। বিদেশে জগদীশচন্দ্রের এই সাফল্য ও বিজয়লাভের সংবাদে তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথ নিম্ন-লিখিত কবিতা রচনার দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন :

"বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
সুদূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়াছ তুমি জয়মাল্যখানি
সেথা হ'তে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত
পণ্ডিত সভায়
বহু সাধুবাদ ধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার
আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী,
আশীর্ব্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবি-কণ্ঠে, ভ্রাতঃ
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।"

আর একবার কলিকাতায় দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে একদিন তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সেদিন গ্রীষ্মের প্রখর তাপে কলিকাতাবাসী সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীষ্মের

তাঁদের নরনারীমাত্রই সব কাজ ফেলিয়া ঘরের মধ্যে ছটফট করিতেছিল। সেইদিন ঘটনাক্রমে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। দারুণ গ্রীষ্মে সকল ব্যক্তিকে অস্থির ও কাতর দেখিয়া জগদীশচন্দ্র এসময়ে কি করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ উৎসুক হইয়া বন্ধুর অন্বেষণে এঘর ওঘর দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত হইল। রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন —সেই অসহনীয় প্রখর গ্রীষ্মে জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ভাবন প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট। চিন্তাশীলতার গভীর আবেশে জগদীশচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন— তাহার আশেপাশের সমস্ত কিছু। এমন কি নিজের দেহের চেতনাও তাহার নাই। দৃষ্টি একেবারে স্থির অন্তর্মুখী; রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে আত্মসমাহিত জগদীশচন্দ্রের এই অবস্থিতি গভীর ভাব মূর্ত্তিত করিল। তিনি দেখিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতের কোন এক প্রবীণ ঋষির শুভ্রকেশ জ্ঞানগম্ভীর মূর্ত্তি লুকাইত। এই দৃশ্যের স্মৃতিরূপে রবীন্দ্রনাথ 'সমর্পণ ও স্বদেশ' কাব্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ ?"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এখন হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে অবসরকালে তিনি নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তবে এই সময় হইতে তাঁহার গবেষণা-কার্য্য নূতন একটি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এখন হইতে তিনি জড় ও চেতনার সাড়া সম্বন্ধে অনুসন্ধানে রত হইলেন। এই অনুসন্ধানের পরিণতিস্বরূপে তাঁহার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা কয়েক বৎসর পরে তিনি তাঁহার রচিত **Response in Living and Non-living** গ্রন্থে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক বিরাট প্রদর্শনী হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি বড় বড় সভা পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশ-বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ধর্ম্মবেত্তা এই সুবিখ্যাত প্রদর্শনীর বিভিন্ন সভায় নিজেদের ভাব ও আদর্শের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে দুইজন দিকপাল প্রতিভাশালী পুরুষ উপস্থিত হইয়া নিজেদের দেশ ও জাতির গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—আর একজন বৈজ্ঞানিক প্রবর জগদীশচন্দ্র। স্বামিজী এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (Congressdela Histoi Re·do·le Religion) হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠের দ্বারা সুবিদ্বান শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বদেশপ্রাণ স্বামিজী প্যারিসের সেই প্রদর্শনীতে দেশবিদেশের বিখ্যাত মনীষীদের সমাবেশ দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছিলেন—বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় তাঁহার মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে এখানে গৌরবান্বিত করিতে পারেন—তাঁহার স্বদেশবাসী এমন কোন প্রতিভাশালী যদি থাকিতেন তাহা বড়ই আনন্দের বিষয় হইত। বিস্ময় ও উল্লাসের সহিত স্বামিজী কয়েকদিন বাদেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছে। সত্যই নানা দেশে মনীষীদের এই আন্তর্জাতিক সম্মিলনে বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের প্রতিভা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য একজন শান্ত সৌম্য গম্ভীরমূর্ত্তি ভারতবাসী যুবক বাঙালী বৈজ্ঞানিক সগৌরবে সেখানে উপস্থিত। তাঁহার মুখের মধ্যে অসামান্য প্রতিভার দীপ্তি, দুই চক্ষে বিরাট

মননশীলতার প্রাখর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অদ্ভুত প্রতিভাশালী বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক আর কেহই নহেন তিনি ভারতমাতার সুযোগ্য পুত্র জগদীশচন্দ্র বসু। আর বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী কল্যাণময়ীমূর্ত্তি অবলা বসু।

প্যারিসে আচার্য্য বসুর বিরাট সাফল্যলাভ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ উৎসাহ ও গর্ব্বের সহিত তাঁহার 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের (১২২-১২৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্য-জগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি ভূমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, লহ বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না লেডি যে দেশে যান সেখানেই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী।"

আচার্য্য বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিশালতা ও গভীরতা সম্বন্ধে স্বামিজী (বিবেকানন্দ) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই এমন নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, বিদেশে তাঁহার পরিচিত বৈজ্ঞানিকদের সমক্ষে সগৌরবে ও অসঙ্কোচে জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেন। এই প্যারিস প্রদর্শনীতে একবার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষক একজন ইংরাজ ছাত্র কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজীকে বলিতেছিলেন—তাঁহার অধ্যাপক একজন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, তিনি একটি লিলি গাছের সজীবতা ও চেতনা সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামিজী অমনি তেজের সঙ্গে সেই ইংরেজ ছাত্রটিকে উত্তর দিলেন: "ও আর এমন কি ব্যাপার! আমাদের ডক্টর বোস দেখিয়ে দেবেন, যে-টবটায় (tub) ঐ লিলি গাছটা আছে—সেই টবটাতেও প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। "O that's nothing! Dr. Bose will make the very pot, in which the Lily grows respond"!

স্বামিজীর এই উক্তি শুধু তাঁহার এই বরেণ্য স্বদেশবাসীর প্রতি মমতাবশে নির্ব্বাক গর্ব্বের বিষয় মোটেই নয়। কারণ সত্যই কয়েক বৎসর পরে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ দিলেন—গাছপালার মধ্যে প্রাণ ও নানারকম সাড়া সুখদুঃখবোধ ত আছেই —এমন কি একখণ্ড টিন কিম্বা অন্যকোন ধাতুখণ্ডের মধ্যে এই প্রাণচিহ্ন ও সুখদুঃখবোধের জন্য সঙ্কোচন প্রসারণ দেখা ও দেখানো যায়। তাঁহার এই তথ্য প্রথমে পাশ্চাত্যদেশের বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করিতে চান নাই। কিন্তু যখন চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন তখন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই তথ্যকে স্বীকার করিলেও নিজের আবিষ্কৃত তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য জগদীশচন্দ্র অতঃপর অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও মেসিন স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এমন সব যন্ত্র ও মেসিন তৈয়ারী করিলেন যাহাতে জড়পদার্থ, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদের সাড়ালিপি আপনা হইতে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। "তিনি দেখিলেন, এক টুকরা টিন, একটি গাছের ডগা এবং ব্যাঙের

একটি পেশী (muscle) বাহিরের উত্তেজনায় অবিকল একই ভাবে সাড়া দেয়।" বিলাতে এই বিষয়ে বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সামনে যন্ত্র সহায়ে পরীক্ষা-মূলক বক্তৃতা দিয়া তিনি নিজের এই আবিষ্কৃত তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করিলেন। ঐ সব যন্ত্র হইতে জড়পদার্থ গাছপালা ও ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীর যে সব সাড়া ও অনুভবক্রিয়ার আপনা হইতেই প্রমাণলিপি মুদ্রিত হইয়াছিল সেগুলির অনেক ফটোগ্রাফও তিনি সমবেত বৈজ্ঞানিক মনীষীদের অভিমত জানিবার জন্য তাঁহাদের হাতে দিলেন। অনেক প্রবীণ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকও সেদিন ঐ লিপিগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, ঐ লিপিগুলির কোন্‌টি জড় পদার্থের কোন্‌টি গাছপালার কিম্বা কোন্‌টি জীবন্ত প্রাণীর। কিন্তু জগদীশচন্দ্র আবার তাহাদিগকে ব্যাখ্যান করাতে সেগুলি তাহারা বুঝিতে পারিলেন। শ্রোতারা সকলে আনন্দের সঙ্গে আচার্য্য বসুকে সম্মান ও সুখ্যাতি জানাইলেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ (Crookes) চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন : "আমার জীবনে এত বড় তত্ত্ব কখনও শুনি নাই। জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারে তখনকার ধাতুবিজ্ঞানবিদ্ স্যার রবার্ট অষ্টেন আচার্য্য বসুকে জানাইলেন—"আপনার এই আবিষ্কারের ফলে এখন আমি ধাতুপদার্থের সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত সকলের নিকট অসঙ্কোচে জানাইবার জন্য সুনিশ্চিত একটি সমর্থন পাইয়াছি।"

ইহার পরে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া বিজ্ঞানের এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িল যে তাহা বহুবিধ বিজ্ঞানের সমন্বয়ভূমি। (এ সম্বন্ধে 'প্রবাসী' মাঘ ১৩৩৮ সংখ্যায় ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় লিখিত 'আচার্য্য শীলের প্রত্নোত্তর' প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্রের শেষজীবনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের অভিনবত্ব সম্বন্ধে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের অভিমত দেখুন। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, বিশ্বপ্রকৃতির রাজ্যে অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে অসংখ্য প্রকারের প্রাণন-ক্রিয়া চলিতেছে। পদার্থ-বিজ্ঞান অথবা রাসায়ণ বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মের মধ্যে তাহাদের অনেকগুলির কারণ ধরা পড়ে না। এজন্য বহু বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক প্রাণীর দেহে জীবনব্যাপার নিয়ন্ত্রণকারিণী বলিয়া কোনও একটি শক্তির বিদ্যমানতার বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। জীবজীবনের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব অনেক সময়ে বোধগম্য হয় না দেখিয়া তাঁহারা নিজেদের কল্পিত এই শক্তির বর্ণনা দিয়া সেইসব অমীমাংসিত ব্যাপারের মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাদের অনেকেই মনে করিলেন জগতে শক্তি বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন ভাবেই তাহারা আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা আর্য্যঋষিদের বংশধর হিন্দু বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মন পাশ্চাত্য দেশীয় ঐ সব বৈজ্ঞানিকদের এইরূপ মতে সাড়া দিতে পারিল না। গভীরভাবে অনেক দিন চিন্তার পরে তিনি স্থির করিলেন—শক্তির ক্রিয়া অথবা প্রকাশের তারতম্য থাকিলেও শক্তি স্বরূপতঃ কখনও বিভিন্ন ও বহু নয়। মূলতঃ শক্তি এক ও অভিন্ন কিন্তু অভিব্যক্তির ব্যাপারে তাহা বৈচিত্র্যময়ী। সেই একই শক্তির প্রভাবে ঝড় বন্যা ভূমিকম্প হইতেছে, আবার সেই একই শক্তির ক্রিয়াতেই বৃক্ষলতাদির উৎপত্তি বৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটিতেছে, সেই একই শক্তির প্রভাবে যাবতীয় প্রাণীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। সেই একই শক্তি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র রহিয়াছে তবে আধার (medium) অনুযায়ী তাহার প্রকাশ ও ক্রিয়াশীলতার তারতম্য দেখা যায় মাত্র। সাড় (Sensitive) এবং অসাড় (insentient) বলিয়া বিশ্বজগতের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থের মধ্যে শ্রেণীনির্ণয় করা অতএব ভুল। কোনও গাছপালা—যেমন লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল সহজেই সাড়া দেয়। আবার নারিকেল আমগাছ প্রভৃতি গাছের বাহির হইতে স্পর্শ অথবা আঘাত-জনিত সাড়া স্পষ্ট না দেখা গেলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

কামাখ্যা তীর্থযাত্রী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গারো পাহাড়ের মাথার উপরে বিমান দু'বার দুলে
এলো ব্রহ্মপুত্র কূলে।
নামিলাম ধীরে গগন ত্যজিয়া ধরণীর সমতলে
উদয়-তোরণ পার হ'য়ে এসে দুপুরের পথে চলে
সূর্য্যদেব—তার পরিমণ্ডলের মাঝে
ছিনু আমি পাঁচেরও।
প্রাগ্‌জ্যোতিষের মেয়ে! দেখালে নির্ঘণ্ট
কখন্ কোথায় আমারে থাকিতে হবে,
সজল কাজল মেঘ দেখা দিল নভে।

বিমান ঘাঁটির পরিবহনের' পরে ঠাঁই নিয়ে আমি,
এসে গৌহাটি সহরে
তারপরে
বাস হোতে নামি
বিমান অফিস-ঘরে কহিলাম মোর ফিরিবার দিন।
তোমার আনন কেন হেরিনু মলিন!
আটপাঁও চলা সুরু
কত কথা করে গেলে প্রাগ্‌ জ্যোতিষের মেয়ে
বাঁকাইয়া ভুরু,
আমারে প্রথম পেয়ে!
বরিষণ ধারা গায়ে এসে লাগে, মেঘ ডাকে গুরু গুরু।

আমাদিকে মোর নানা মানুষের সাথে চলে আলাপন,
ভারতীয় আরাধন
ছাত্রছাত্রী সনে।
ওরা বলে—'কবি! থেকে যাও হেথা নাই বা ফিরিলে দেশে,
জানো কি! তোমারে চায় প্রবাসী বাঙালী জনে?
কহিনু—'বন্ধী করোনা শেষে!'

ব্রহ্মপুত্র নদ
উমানন্দ ভৈরবের দ্বীপকূলে দুরন্ত দুর্ম্মদ,
শত কামানের সম গরজন করি স্রোত ধায় বেগে
পাগলের মত হয়ে।
চারিদিকে শোভে বিচিত্র পাহাড় ব্রহ্মপুত্র বক্ষোপরি
উমানন্দ ভৈরবের শান্তি বহি
প্রাগ্‌জ্যোতিষের মেয়ে! হাতখানি মোর ধরি
কানে কানে মোর গেলে কত কথা কহি
দু'জনে চলেছি প্রভাত বেলায় কামাখ্যা পাহাড়ে ধীরে
আরোহন করি ঊর্দ্ধে আর, ভাসিয়া নয়ননীরে।

জৈনধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি-এল, বিদ্যাবিনোদ

ভারতে জৈনধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মহাবীর, জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন। অহিংসা, মৈত্রী, সাধুতা প্রভৃতি জৈনধর্ম্মের নীতিগুলি বহুজন-সমাদৃত। এই ধর্ম্মের লক্ষণসমূহ সুবিবেচিত ও সকলের পূর্ণসন্তোষকতা লাভ করিয়াছে। জগতের পুরাতন ধর্ম্ম মধ্যে ইহা অন্যতম। জীব-হিংসা নিবারণে, ধর্ম্ম ও দর্শন আলোচনায় ইহার সাধকগণ সম্মান ও যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। শিল্পানুরাগ ইহাদের যেন মজ্জাগত। জৈনগণ নিষ্ঠাচারী, সদালাপী, কর্ম্মঠ ও সরলতা-প্রিয়।

ঋষভদেব নামে একজন হিন্দুরাজা ছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিবার হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। শুনা যায়, তিনি তের বার অবতার রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাতন ধর্ম্মমত সমূহের মধ্যে ভারতীয় জৈনধর্ম্ম এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কি দার্শনিক তত্ত্বে কি সাংস্কৃতিক নীতিশাস্ত্রে, কি ধর্ম্মপ্রণালীতে জৈনধর্ম্ম ভারতীয় কৃষ্টি সাধনার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। সাহিত্য, শিল্পকলা, চিত্রকলা, মন্দির-নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিদ্যায় জৈনদিগের কৃতিত্ব বৌদ্ধ কৃষ্টির সহিত অনন্যসাধারণ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আসিতেছে। আচার্য্যগণ, শিল্পীগণ যে সকল মহৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা মানবমাত্রেরই আগ্রহচিত্তে পুণ্যের স্পর্শ দিয়া যায়, আকুল প্রেরণা জাগায়। লোকে অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, সেজন্য পুণ্যকীর্ত্তি স্বল্পকাল মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায় না। এই কারণে অপূর্ব্ব শোভার আকর জৈনমন্দির জন-গণ-মন আকৃষ্ট করিয়া শত শত যুগ ধরিয়া জীবন্ত হইয়া আছে।

ধর্ম্মমত

জৈনধর্ম্ম ভারতের একটি প্রাচীন ধর্ম্ম। ইহা যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। হিন্দু ধর্ম্মমত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শের অধিকাংশ জৈন ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত। জৈনগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের সাধু বা তীর্থঙ্করগণ পরমা গতি লাভ করেন, তাঁহারা চরম শান্তি (supreme bliss) প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দেবতা-পদবাচ্য। চব্বিশজন তীর্থঙ্কর ভুবন শাসন করিতেছেন। যুগে যুগে পৃথিবী ধ্বংস হয় ও নিয়মিতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান জগৎ দ্বিতীয় যুগে এখন চলিতেছে বলিয়া জৈনগণের মতে পূর্ব্বতন যে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর ছিলেন, বর্ত্তমান যুগে এবং ভবিষ্যৎকালেও সেই চব্বিশ-জন তীর্থঙ্কর আসিবেন। জৈনধর্ম্মের আদর্শগুলি অতি প্রাচীন। এইগুলি নৈতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্মের নামকরণ হইয়াছে "জৈন" হইতে—ইহার অর্থ 'জয় করা'। যাঁহারা অষ্ট প্রকার মহা পাপ জয় করিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত জৈন। রাত্রিকালে আহার, জীবহত্যা, যে বৃক্ষ দুগ্ধ প্রদান করে তাহার ফলভক্ষণ, মধুপান, মাংসাহার, পরদার গমন, পুষ্প ভক্ষণ, মাখন বা ঘনীর আহার, চৌর্য্য বৃত্তি ও অপর দেব-দেবীর পূজা—এই কয়টি মহাপাপ নামে খ্যাত। ধর্ম্মসংক্রান্ত কতিপয় বিশ্বাস ও প্রণালী ভেদে এই পুরাতন জৈন ধর্ম্ম বর্ত্তমানে দুইভাগে বিভক্ত: দিগম্বর অর্থাৎ নগ্ন সম্প্রদায় ও শ্বেতাম্বর অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্রাবৃত।

রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্র জৈন ধর্ম্মের জন্মভূমি। রাজস্থানের মধ্যে অর্ব্বুদ পর্ব্বত বা মাউন্ট আবু প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-

নিকেতনের মধ্যে নিহিত এই পবিত্র স্থান নানা তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি পরিশোভিত ও অনন্যসুলভ অপূর্ব্ব শোভা-সমৃদ্ধিদ্বারা বিমণ্ডিত। সৌরাষ্ট্রে গীর্ণার ও পালিটানা চিরপ্রসিদ্ধ; পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যে এই তিনটি সর্ব্বজনপ্রিয় ও আদরণীয়। কাথিয়াবারের অন্তর্গত পালিটানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালিটানার শত্রুঞ্জয় মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতুল সম্পদে বিভূষিত। মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যতম। গীর্ণার পর্ব্বতের প্রসিদ্ধ জৈন মন্দির প্রাচীনতম এবং শোভার আধার। আবু পর্ব্বতের দীলওয়ারা মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রমনীয় এবং শিল্পকার্য্য ও সৌন্দর্য্যবিকাশে অতুলনীয়। ভারতে ইহার তুলনা কোথাও মিলে না।

বস্ত্রিদাস

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পরেশনাথ পার্শ্বনাথ বা শীতলনাথজীর মন্দির সৌন্দর্য্য সুষমায় বিকশিত। ইহা শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত রায় বস্ত্রিদাস বাহাদুর কর্ত্তৃক বিরচিত। তিনি উত্তর ভারতের খ্যাতনামা জৈন বংশসম্ভূত। ব্যবসা, দানশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি বহু সৎকর্ম্মের জন্য ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বাল্যাবস্থা হইতে ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। সাধারণ হিতকর কর্ম্মে ইহার আগ্রহ বহুকাল হইতে দেখা গিয়াছিল। ধর্ম্মশালা স্থাপন, মন্দির প্রতিষ্ঠা, কূপ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু পুণ্যের কার্য্যে এই মহাপ্রাণ ছিলেন মুক্তহস্ত। লক্ষ্ণৌ নগরীর প্রসিদ্ধ অযোধ্যার নবাববংশের ইনি সভা-জহুরী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সতত প্রযত্নশীলতা ও ব্যবসা বুদ্ধির জন্য সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। নবাবগণের মধ্যে কেহ কেহ বন্দী হইয়া ইংরাজগণ কর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত হইলে, সুচতুর বস্ত্রিদাস কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক জহরতের ব্যবসা খুলিয়া কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে স্বীয় গুণে চমৎকৃত করেন। সাধুতা ও দক্ষতার গুণে অচিরে তিনি লাভবান হন। কলিকাতার ব্যবসা বৃদ্ধির সহিত তাঁহারও শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইতে দেখা যায়। শীঘ্রই তিনি স্বকীয় ব্যবসায় প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করেন। তাঁহার ব্যবসা বৃদ্ধি আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতির ভরণপোষণের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য ব্যবসায় মনোযোগ দিবার ফলে তিনি অভাবনীয় সম্পত্তির মালিক হইয়া উঠিলেন। তখনই বহুসংখ্যক বাটি নির্ম্মাণ, ধর্ম্মার্থ চিকিৎসালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র, জলসত্র প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্য্যে মুক্তহস্ত হইয়া উঠেন। বিভিন্ন তীর্থস্থানে ধর্ম্মশালা স্থাপন তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। সাধারণের উপযোগী বাসস্থান নির্ম্মাণ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে তিনি রত্নাভিজ্ঞ নামে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী যখন ১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় উদ্বোধন করা হয়, তখন তিনি স্বকীয় ধনরত্ন প্রদর্শনীতে দেখাইয়াছিলেন। ঐগুলির নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে ও শিল্পকলার চাতুর্য্যে তৎকালীন বহু ধনবান রাজা মহারাজা তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বহুরত্ন ক্রয় করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দেও কলিকাতার আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি বহু মূল্যবান ধনরত্ন বিক্রয় করিয়া প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েন। ভারতের বড়লাট লর্ড মেও তাঁহাকে মুকিম বা বংশানুক্রমিক সভা-জহুরী নাম ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহার পর লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে মুকিম বা রাজ-জহুরী নামের সম্মানে বিভূষিত করেন। পরবর্ত্তী রাজ-প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃকও তিনি এই উপাধি পাইয়া আসিয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লীটন তাঁহাকে দিল্লীতে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করেন। তিনি যে সকল লোকহিতকর কার্য্যে যশস্বী হইয়াছেন তন্মধ্যে পিঁজরাপোল স্থাপন অন্যতম। কলিকাতায় পিঁজরাপোল-প্রতিষ্ঠা তাঁহার অক্ষয়

কীর্ত্তি। রুগ্ন, দুঃস্থ, অন্নাগ্রস্ত, পীড়িত ও বৃদ্ধ প্রাণীগণের জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা সাতিশয় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিত।

কলিকাতার শীতলনাথ মন্দির

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মহামনা ধর্ম্মপ্রাণ বদ্রীদাস হালসিবাগানে একটি জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে সপ্তম তীর্থঙ্কর খ্যাতনামা শীতলনাথের নামে ইহা উৎসর্গ করিলেন। শোভা সৌন্দর্য্যে এই প্রসিদ্ধ মন্দিরটি বিমণ্ডিত বলিয়া কলিকাতার বহু দর্শনীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহা অন্যতম ও আদরণীয়। মন্দির-নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে সুপ্রসিদ্ধ বদ্রীদাস মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তিত হইলেন। গুরুজীর আদেশ পাইলেন শীতলনাথের মূর্ত্তি বসাইবার। তিনি তখন ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া আগ্রায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, একটি সুন্দর মনোমত শীতলনাথের মূর্ত্তি পাইলে কলিকাতার হালসিবাগানে সদ্যনির্ম্মিত মন্দিরে উহা সযত্নে প্রতিষ্ঠা করেন। শীতলনাথের মূর্ত্তি যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা ইতিমধ্যে স্থির হইয়া গিয়াছে। আগ্রায় বাস করিবার কালে একদিন দেখিলেন, সহরে একটি শোভাযাত্রা সমারোহের সহিত চলিয়াছে—উদ্দেশ্য জানিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে মূর্ত্তি লইয়া যাওয়া হইতেছে—ঐ দেবমূর্ত্তির সহিত বহু লোক সঙ্গে চলিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ ফকিরকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। ফকির সজ্জন ছিলেন, তিনি সাগ্রহে বদ্রীদাসকে যেস্থানে শীতলনাথের মূর্ত্তি পাওয়া যাইবে এমন একটি স্থানের নির্দ্দেশ দেন। হৃষ্টচিত্তে পুণ্যাত্মা বদ্রীদাস উক্ত নির্দ্দেশমত সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক উহা খনন করিতে আদেশ দিলেন। ভাগ্যবান পুরুষ মৃত্তিকার নিম্নে একটি পরম সুন্দর শীতলনাথের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। উহা ছিল সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল, দেবত্বে নিরুপম। কেবল তাহাই নহে, সদ্যপূজার নিদর্শনও নিকটে দেখা গেল। তিনি দেখিলেন, প্রজ্বলিত আলোক শিখার পরিচয় —নিকটে তৈলনিষিক্ত প্রদীপ। তিনি পুলকিত অন্তরে শীতলনাথের মূর্ত্তি কলিকাতায় আনয়নপূর্ব্বক হালসিবাগান মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শীতলনাথের মন্দির রূপশ্রীতে চিত্তগ্রাহী, ইহা আবু পর্ব্বতের জৈন মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। শোভায়, সজ্জায়, মনোহারিত্বে, সমতা সম্পাদনে ইহা বিশিষ্টতা প্রকাশ করিতেছে। শিল্পচাতুর্য্যে ইহা যেমন মনোহারী, সৌন্দর্য্যবিকাশে ইহা তেমনই লালিত্যপূর্ণ। ইহার মধ্যস্থলের চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। ছাদের ক্ষুদ্র স্তম্ভের (balustrade) উপর অলঙ্কৃত পতাকা শোভা পাইতেছে। প্রধান মন্দিরে দুই হয় বিভিন্ন রঙীন কাঁচ, বিচিত্র রূপের মর্ম্মর ও আয়না।

জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বিভিন্ন দৃশ্যে চিত্রিত প্যানেল-গুলি অতুলনীয় শোভার আকর। ইহারা কার্ণিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। মন্দির মধ্যে অসংখ্য সাজসজ্জার আসবাব আছে, গৃহছাদ হইতে বহু ঝাড়লণ্ঠন শোভা পাইতেছে; এতদ্ভিন্ন বহু স্থাপত্য-শিল্প, পোরসিলেন ও শিল্পকার্য্য নিদর্শন, শোভা সমৃদ্ধির উপকরণ বিদ্যমান। দেব-বিগ্রহ শীতলনাথ নির্ম্মল শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা ধোলপুরের বিশুদ্ধ মর্ম্মর প্রস্তরে প্রস্তুত, পবিত্র ও দ্যুতিমান। বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষ্যে মূল্যবান রত্নখচিত স্বর্ণহার ইহার গলদেশে শোভা পায়। কারুখচিত রৌপ্য বেদীতে মূর্ত্তি স্থাপিত। দুইটি প্যানেলের একটিতে তিনটি বৃক্ষ লক্ষিত হয় যাহা হীরক, চুনী, পান্না বিড়ালাক্ষি, মুক্তা, প্রবাল, নীলা প্রভৃতি দ্বারা খচিত। দুই পার্শ্বের গ্যালারীর মধ্যে একটিতে লক্ষিত হইবে একটি প্রদীপ, যাহা প্রতিষ্ঠা-দিবস হইতে জ্বলিতেছে। এই আলোক জ্বলিতেছে ঘৃতের দ্বারা। ইহার উপর একটি আবরণী আছে—যাহা মন্দির অপবিত্র হইলে কালি দ্বারা বিমলিন হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত বহু জৈন ধর্ম্ম গ্রন্থ, পুরাতন পাণ্ডুলিপি গ্যালারীতে

সংরক্ষিত। মর্মরমণ্ডিত বিশাল দালানে মূল্যবান কার্পেট পাতা থাকে, সেখানে বসিয়া সকলে পূজা-আরাধনা করিয়া থাকেন। রায় বাহাদুর মন্ত্রীদাসের মর্মরপ্রস্তরনির্মিত মূর্তি মন্দিরের সম্মুখে বিরাজিত।

নিকটের 'হনুমান' মন্দির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হনুমানজীর বিরাট মূর্তিও শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত। কিছুদূরে সিদ্ধিনাথ (নবম তীর্থঙ্কর) ও মহাবীর শেষ তীর্থঙ্করের মন্দির শোভা পাইতেছে। পূর্বদিকে বিরাজিত প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী অসংখ্য বৃহৎ মৎস্যে পরিপূর্ণ; আহ্বান করিলে ইহারা নিকটে আসিয়া থাকে। দক্ষিণ প্রান্তে একটি সুপ্রশস্ত দরবার-গৃহ। ইহার তলদেশ কাচের টালি নির্মিত, প্রাচীরগুলি ছত্রিশটি মনোহর রাগ-রাগিনীর চিত্র দ্বারা চিত্রিত। ভারতীয় সঙ্গীতকলায় এই মূর্তিগুলি অপূর্ব। ইহা ভিন্ন বহু সুন্দর সুন্দর দ্রব্যেইহা পরিপূর্ণ। যথা, প্রতিষ্ঠাতার সুন্দর প্রতিকৃতি, প্রাচীন পিতলের ফলক বা থালা ইতালীয় মর্মর নির্মিত মূর্তি-আধার (pedestal), ও বর্মী রাজত্বপ্রদত্ত একটি মনুষ্যাসন। ধর্মপ্রবণ মন্ত্রীদাস পশ্চিম বৎসর ধরিয়া এই সৌন্দর্য বিমণ্ডিত উদ্যান ও রমণীয় মন্দিরটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন।

এই অনিন্দিত উদ্যানে পথগুলিতে পোরসিলেনের অংশ বহুলপরিমাণ ব্যবহৃত; বসিবার রমণীয় চৌকি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরমূর্তি সকলকেই আনন্দ ও আরাম প্রদান করিয়া থাকে। ধর্মোজ্জ্বল-হৃদয় মাত্রই এই প্রসিদ্ধ মন্দিরে শান্তি লাভ করে, শিল্পবিলাসী বা কলামোদী এই মন্দির প্রাঙ্গণে বা গৃহতলে পাইয়া থাকেন অবিরাম অজস্র আনন্দ। এই সুপ্রশস্ত ও কলানিপুণ কানন-তোরণে আছে অতিথি-শালা তিন-তলার উপরে, ইহার কাচের টালি খচিত প্রাচীরগুলি মনোমুগ্ধকর এবং তোরণশীর্ষে তিনটি কাষ্ঠনির্মিত চূড়া বা শিখর জৈনধর্মের যেন প্রতীক। মন্দিরের উত্তরভাগে একটি সুরম্য মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহার শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত অপরূপ সৌন্দর্য-বিভূষিত বাণী-বাগ্দেবীর মূর্তি দর্শকমাত্রেরই হৃদয় বিগলিত করিয়া থাকে। জৈনসংস্কৃতির এরূপ বিস্ময়কর ও সৌন্দর্য-মহান নিদর্শন বঙ্গদেশে প্রকৃতই বিরল। জৈনদের ধন-মান, দাক্ষিণ্য-মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের পূর্ণমূর্তিই এইস্থানে।

জৈনধর্মাবলম্বী মনস্বীগণের স্থাপত্যশিল্পের অবদানগুলি অপূর্ব ও অসাধারণ। আবু পর্বতের দিলওয়ারা মন্দিরকে 'বিশ্বের বিস্ময়' নামে অভিহিত করা যায়। বখতগীরের শান্তিনাথ মন্দিরও এই পর্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই দুর্গম পথে অবস্থিত রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তসংলগ্ন বখতগীর একদালে ছিল শিক্ষা, জ্ঞান, সংস্কৃতি ও বিবিধ-বিদ্যার কেন্দ্রস্থল। জ্ঞানে, ধর্মে, ধর্ম-প্রচারে, চিত্র-শিল্পে ইহার ঐশ্বর্য ছিল অপরিসীম। পুঁথি-সংগ্রহ, জ্ঞানভাণ্ডার স্থাপন ও প্রকাশ, শিক্ষা বিস্তার-কল্পে শিল্পবিস্তারে বখতগীরের গৌরব ছিল অনবদ্য। ইতিহাসে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সৌধ্য-বীর্য, শোভা-সম্পদে ইহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কোন কোন বিষয়ে বখতগীরের দুর্ভেদ্য দুর্গ, কলা-নৈপুণ্য, পুঁথি-পুস্তক ও বীরত্ব-তেজস্বীতার অতুলনীয়।

শান্তিনাথ মন্দির

গৌরবোজ্জ্বল বখতগীরের শান্তিনাথ মন্দির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহা অভিনবত্বে মনোরম, রূপাকৃতি; ইহাতে দৃশ্যমান—বিমান-উপরে অতিকায় আমলক-শিলা; ইহার বৈশিষ্ট্য—ইহা ক্ষুদ্র পদ্মকোরকপ্রতিম বহু সংখ্যক কলস-সহ—শত করী-সিংহ; গজ ও সিংহের মূর্তিগুলি চতুর্দিকে শক্তি ও বিক্রম প্রকাশ করে। শান্তিনাথ মন্দির সমগ্র ভারতের জৈন-মন্দিরগুলিমধ্যে অভিনবত্ব বিকাশ করিয়া আছে চারুতায়, অসংখ্য মূর্তি শ্রী পরিস্ফুরণে, ভাস্কর্যের নৈপুণ্যে, বিশালতায় এবং গুহা-মন্দির পরিকল্পনায়। বলাবাহুল্য, ঈষৎ হরিদ্রাভ ধনকী প্রস্তরে ইহা প্রস্তুত। জৈনগণ এই চুনা-পাথরে মন্দির নির্মাণ পূর্বক অসাধারণ কৃতিত্ব ও অদ্ভুতপূর্ব স্থাপত্য-

শিল্পবোধের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার উচ্চতা ও বিশালতার অনুপম শোভা খৃঃ দ্বাদশ শতকের গৌরব। বহুদূর বিস্তৃত খর মরুভূমির দূরবর্তী স্থান হইতেও ইহা দৃষ্ট হয়, বিশেষ করিয়া ইহার স্বর্ণমণ্ডিত কলসটি। যশঃ-প্রণীপ্ত ধনশ্রীরা জয়ধানীর প্রান্তভাগে ঐশ্বর্য্যময়ী শোভা-সম্পদের মধ্যে অনুচ্চ শৈল-শিখরে এই মন্দির-শ্রী দীপ্যমান। ইহার সান্নিধ্যে দুই হইবে মহারাওয়ালের সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাসাদ।

জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে আবু পর্ব্বতের দিলওয়ারা দেবায়তন অপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর। ইহার গর্ভগৃহ কেবলমাত্র যে শিল্পৈশ্বর্য্যমণ্ডিত তাহা নহে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বক্ষে ইহা যেন লুকাইত। ইহার মধ্যে আমরা পাইয়াছি গিরিগুহার উপভোগ্য শীতলতা; চতুষ্পার্শ্বের শান্ত পরিবেশটি রমনীয় ও হৃদয়গ্রাহী।

কমলমীরের বিষ্ণুস্ত মন্দির সৌন্দর্য্য-বিভা ও স্থাপত্য-শিল্পের চারুতায় অদ্বিতীয়। কুম্ভলগড়-কমলমীরের দুর্গ-প্রাসাদ ও মন্দির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। উজ্জয়িনীর প্রাচীন মন্দিরে শিল্প-চাতুর্য্য ও গিরি-গুহার আভাস পাওয়া যাইত।

বিমলসাহের মন্দির—আবু পর্ব্বত

পার্ব্বত্য সুষমায় বিভূষিত, রমনীয়ের অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া অর্ব্বুদ পর্ব্বত বা বর্ত্তমান আবু পাহাড় দণ্ডায়মান। ইহার বৈশিষ্ট্য, ইহা ক্রমোচ্চ ভূ-খণ্ড নহে। চতুর্দ্দিকে দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি প্রসারিত। রাজস্থানের যেন মুকুট-মণি, রাজোদ্যানের দিলওয়ারা স্থাপত্য-সম্পদে বিশ্বের যে কোন বৈভব-সম্পন্ন শিল্প-সমন্বিত প্রাসাদকে পরাজিত করিতে পারে, কলা-নৈপুণ্যে, বৈচিত্র-বিন্যাসে, সৌন্দর্য্য পরিবেশনে ইহা যেন অভাবনীয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও বটেই। এই জগতের বিস্ময়-ভূমি দেবলওয়ারা বা 'মন্দির স্থান' যেদিন দর্শন করি, সেদিন মনে হইল যেন নয়ন সার্থক হইল, জীবন ধন্য হইল, ভারতভূমি কত ঐশ্বর্য্য খনি, কত সম্পদের জন্মস্থান; বিস্ময়কর বৈভব-কলা, শিল্প, স্থাপত্য, সংস্কৃতির লীলা নিকেতন। যেদিন ইহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটে, সেদিন আমি ছিলাম সঙ্গীহীন তথাপি একক মনে শিল্পৈশ্বর্য্য-সমাবেশ ও সৌন্দর্য্য-পরিবেশ আনিয়াছিল নূতন রাজ্যের সমারোহ, রাজৈশ্বর্য্য ও সঙ্গীব জনতার পূত স্পর্শ; সে দৃশ্য, সে কলা-বৈচিত্র্য, সৃষ্টি-চাতুর্য্য ভুলিবার নহে, চির জীবন উজ্জ্বল বর্ণে, সম্পদে-প্রাচুর্য্যে, লাবণ্য সৌষ্ঠবে প্রতিভাত হইয়া থাকিবে।

দিলওয়ারা মন্দির

দিলওয়ারা মন্দির সর্ব্বসমেত পাঁচটি সুদৃশ্য ও রমনীয় মন্দিরের সমষ্টিমাত্র। তন্মধ্যে দুইটি অপূর্ব্ব ও অসাধারণ সৌন্দর্য্য-বিলাসে উচ্ছ্বসিত—একটি বিমল সাহের মন্দির, অপরটি বাস্তু পাল ও তেজ পালের মন্দির। মন্দিরগুলির বিশেষত্ব যে ইহাদের বহির্ভাগ অতি সাধারণ; অভ্যন্তরে যে অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই; বোধ হয় পর্ব্বতোপরি প্রকৃতির কঠোরতা ও শত্রুদলের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণস্পৃহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ প্রণালীতে রচিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, নিকটে কোথাও শ্বেত প্রস্তরের পাহাড় নাই অথচ সমগ্র দিলওয়ারার পঞ্চ-মন্দির মধ্যে দুইটি বিপুল শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তরের উজ্জ্বল জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত এবং শিল্প-বিচারের শ্রেষ্ঠ অবদানে সমাকীর্ণ।

বিমল সাহের মন্দির প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদি-নাথের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। আদিনাথ ছিলেন পুণ্যাত্মা সাধুপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ, দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় ও ধর্ম্মসাধনায় নিসিক্ত থাকিত; পরোপকার ও সেবাব্রত তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম, আদর্শ ও পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। জীবে দয়া এবং অহিংসা পালন জৈন ধর্ম্মের মূল মন্ত্র, জৈন সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। সৌন্দর্য্য-বিন্যাস, শিল্পানুশীলন ও মন্দিরনির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা মানসিক পবিত্রতা রক্ষা জৈন সম্প্রদায়ের উদার নীতির অন্তর্গত। জৈন দর্শন, পুঁথি, গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত

হইতে এই সকল মন্দিরে গুহাভ্যন্তরে—নির্য্যাতন, নিপীড়ন, ধ্বংসাবস্থা হইতে রক্ষা লাভের পুণ্য প্রয়াসে।

বিমল সাহের পরিচয় দেওয়া এস্থলে প্রয়োজন মনে করি। তাঁহার আদিনিবাস সৌরাষ্ট্রের (গুজরাটের) অন্তর্গত পাটন সহরে। ইহা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন সহর। যে বৎসর এই পুণ্যভূমি দর্শন করিতে যাই, সে বৎসর বিপুল উৎসাহে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। ইহার প্রাচীন নাম পত্তন। সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান-চর্চ্চার কেন্দ্র ছিল বলিয়া পুরাকালে ইহার খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী। পুস্তক সংগ্রহের কেন্দ্ররূপে ইহার মর্য্যাদা বিগত বর্দ্ধিত হয়। সেই আকর্ষণে আমরা বরোদা হইতে ইহা দর্শন করিতে যাই। আমেদাবাদে যাইবার পথে মেহসানা জংসনে গাড়ী বদল করিয়া পাটন যাইতে হইয়াছিল। সেই সুযোগে মেহসানা প্রভৃতি স্থানের প্রত্নাগার, মন্দির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হইয়া গেল। পাটনে ছিল "ভাণ্ডার" গৃহ—প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার। ইহা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। বৃহৎ বাটির একতল কক্ষে মাটির নিম্নে সযত্নে রক্ষিত বহু প্রাচীন পুঁথি, গ্রন্থ, চিত্র-সংগ্রহ প্রভৃতি। জৈন সংস্কৃতির অপর সম্পদ চিত্রবিদ্যা। নানা বর্ণসম্পদে এইগুলি সমুজ্জ্বলিত, স্বর্ণফলকে চিত্রিত সুগভীর বর্ণ-বৈভবে সমুজ্জ্বল। দেবদেবীর চিত্র, তীর্থঙ্করগণের কাহিনী-চিত্র, পৌরাণিক বর্ণনা প্রভৃতি শিল্পায়নের বিষয়ীভূত। ইহা ভিন্ন নানা সামাজিক চিত্র এবং সর্ব্বোপরি গ্রন্থাবরণে শিল্পচাতুর্য্য জৈন-সংস্কৃতির গৌরববিশেষ। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য যথাসম্ভব দেখিয়া প্রাচীন পত্তন ভূমি পরিত্যাগ করিলাম। মনের মধ্যে লাগিয়া রহিল তিনটি বিষয়—(ক) প্রাচীন সহরের পুরাতন রূপটি সযত্নে ধারণ করিয়া আছে বহুকালের গৌরব-চিহ্নিত গৃহ, অলিন্দ, নক্সাযুক্ত বাতায়নদ্বার এমনকি পথ-সংযুক্ত ধূলি-মাটি পর্য্যন্ত। (খ) 'ভাণ্ডার' অর্থাৎ পুঁথি সংরক্ষণ গৃহ—রৌদ্র গ্রীষ্ম হইতে দূরে অবস্থিত, শীতাতপবর্জ্জিত, অনলকণা অমিশ্রিত বায়ু-বেষ্টিত স্থানে সযত্নে সংরক্ষিত, কীটদষ্ট হইবার ভয়ে লৌহ-সিন্দুক মধ্যে নিবদ্ধ গ্রন্থগুলি, প্রাচীন পুঁথিসমূহ ও চিত্রগুলির বর্ণবিকৃতির ভাবনা বিরহিত। (গ) জৈন মন্দির অতুলনীয় শোভার আকর, ক্ষুদ্রায়তন হইলেও কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য্য সম্পাদনে নিপুণতা ও মনোহারিত্ব যে কোন দর্শককে অভিভূত করিতে পারিবে। মর্ম্মর প্রস্তরের বিশুদ্ধ শুভ্রতা যেন জৈন সম্প্রদায়ের সৌন্দর্য্য প্রিয়তা ও সুষমা বিস্তারের আধার।

এই সর্ব্ব-গৌরবময় পাটন নগরের আর একটি সম্পদ ইহার বয়নশিল্পের প্রতিভা। 'পটোলা' পাটন গৌরব, নানাবিধ উন্নত আদর্শের চিত্রসংবলিত স্বর্ণতারের দ্বারা বয়ন করা হইয়াছে গাত্রাবরণের বস্ত্রখণ্ড। শুনিলাম পঁচাত্তর টাকা গজ হিসাবে ন্যূন মূল্যে উৎকৃষ্ট সামগ্রী বিক্রয় হয়, সাধারণ গুলির মূল্য পঁচিশ টাকা গজ।

এই সম্পদভরা প্রাচুর্য্যপূর্ণ পাটনে বণিকশ্রেষ্ঠ বিমল সাহের আবাস ছিল। তিনি ব্যবসায়ী, শিল্পী ও বিচক্ষণতায় সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এই বিমল সাহের অন্তর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। শুনা যায়, ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বহুমুদ্রা ব্যয় করিয়া তিনি দিলওয়ারার এই শ্রেষ্ঠ মন্দির রচনা করেন। অমর সাধক শ্রেষ্ঠী বিমল সাহ অন্যূন আঠার কোটি টাকা ইহার জন্য ব্যয় করেন এবং শুনিলাম ইহার রচনা সম্পূর্ণ করিতে চৌদ্দ বৎসর কাল সময় লাগিয়াছিল।

খ্যাতনামা চালুক্য নরপতি প্রথম ভীমদেবের মন্ত্রী হিসাবে বিমল সাহের প্রসিদ্ধি; তবে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভাবে এবং নানা সদ্গুণের অধিকারী বলিয়া রাজ্যশাসনভার তাহার হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল। এই মন্দির-নির্ম্মাণের পুণ্য প্রচেষ্টায় বুঝাযায়

লোকবল এবং অর্থবল কোনটিই এই সম্ভ্রান্ত মন্ত্রীর অপ্রচুর ছিল না।

এই মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য অতীব বিস্ময়কর। অনিন্দ্য সুন্দর কারুশিল্প সকলের মন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-শিক্ষানির্ব্বিশেষে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠটি শুভ্রোজ্জ্বল মর্ম্মর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। শিল্প চাতুর্য্য এক প্রস্ফুটিত কুসুম উদ্যানের শোভার উদ্ভব করিয়াছে, স্তরে স্তরে যেন পুষ্পস্তবক বিরচিত। সমগ্র স্থানটি দৈর্ঘ্যে একশত আটাইশ হস্ত এবং প্রস্থে প্রায় বাহাত্তর হস্ত পরিমিত হইবে। ভিতরের অংশে দৈর্ঘ্যের দিকে সতেরটি কক্ষ বা কুঠরি এবং প্রস্থের দিকে দশটি অনুরূপ ক্ষুদ্রায়তনের কুঠরি সজ্জিত। প্রতি উক্ত কুঠরিতে একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপরে ধ্যানমগ্ন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক। কুঠরিগুলির সম্মুখে বৃত্ত স্তম্ভশ্রেণী সুশোভিত অলিন্দসারি। প্রতি চারিটি স্তম্ভের অন্তরালে উপরের ছাদ; কোথাও এগুলি সমতল কোথাও খিলানের উপর রক্ষিত। প্রতিটি ছাদের খিলান ও বেদীর প্রাকার বৈচিত্র্যপূর্ণ ও 'শিল্প-শোভার-সার', চারুকলার নিপুণতায় ও প্রাচুর্য্যে যেন বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। নক্সা বা 'নকাশীর' কার্য্য বহুবিস্তৃত, যেন ধারণার অতীত। মনে হয় যেন ছাঁচে ঢালিয়া সূক্ষ্ম শিল্পের রূপগুলি ফুটান হইয়াছে। উৎকৃষ্ট শ্বেত মর্ম্মর ভিন্ন কথা নাই, সে কুহকের সাদৃশ্য লাভ দুষ্কর, উক্ত স্তম্ভগুলি অপরিমিত শোভায় ও চারুশিল্পবৈভবে যে সৃষ্টি রচনা করিয়া রাখিয়াছে তাহা এবং পারিপার্শ্বিক কল্পনামূলক নক্সা সমূহ এক অভিনব স্বপ্নরাজ্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে সন্দেহ নাই।

তেজপাল ও বাস্তুপাল মন্দির

দ্বিতীয় মন্দিরটি তেজপাল ও বাস্তুপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের শিল্পপ্রতিভার অলৌকিক কীর্ত্তি-সমাবেশ। এই সৌন্দর্য্য-দীপ্ত কারুকার্য্যখচিত মন্দিরটি দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই উৎকৃষ্ট শিল্পসম্পদ ও ভাবরাজ্যের প্রকৃষ্ট অবদানের—রচনা কাল ১২৩১ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত বিমল সাহ নির্ম্মিত মন্দিরের প্রায় দুইশত বৎসর পরে রচিত। ইহার বিশেষত্ব—পূজ্যপাদ নেমিনাথের মূর্ত্তি মূল্যবান রত্নাভরণে সজ্জিত, ইহাও মধ্যস্থলে স্থাপিত, বিমল সাহের মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্ত্তির অনুরূপ।

ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে এক বৃদ্ধ দর্শক-বন্ধু গাইড (Guide) আমাদের বুঝাইলেন যে নির্ম্মাতা ভ্রাতৃদ্বয় বাস্তু পাল ও তেজ পাল চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় ভীমদেবের সমসাময়িক কালের লোক ছিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, চালুক্য রাজ্য 'বাঘেলা'রা দখল করিলে ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনে সুখ-শান্তির উদয় হয়, তখন তাঁহারা রাজা বীরধবলের অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুযোগ্য ভ্রাতৃদ্বয় প্রচুর অর্থ ব্যয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অপরূপ শিল্প শোভা-মণ্ডিত দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। এই সুনিপুণ কারুকার্য্যখচিত মন্দিরটিও দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বিমল সাহের মন্দিরের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। তখনও ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প-সম্পদ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই—পূর্ব্ব গৌরবে অম্লানই ছিল। এই মন্দিরের চতুঃশালী অলিন্দ, মণ্ডপ প্রভৃতি অপরূপ দিব্যকান্তি প্রকাশ করিতেছে। সৌন্দর্য্য-বিকাশের ভঙ্গী অপূর্ব্ব, শিল্পীর সুসংযত ও বলিষ্ঠ মনোভাব শিল্প-সৃষ্টিতে রূপায়িত, লাবণ্য ও সুষমা পরিবেষণে শিল্পী-মানস সদা-সচেষ্ট, তাহার সাক্ষ্য যেন চতুর্দ্দিকে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, মন্দিরের মুখে উভয় পার্শ্বে দুইটি তাক দৃষ্ট হইবে, কথিত আছে উহা বাস্তুপাল ও তেজপালের সহধর্ম্মিণীর নামে নির্ম্মিত; শুনিলাম শুধু শিল্পকর্ম্মের জন্য দুইটিতে প্রায় লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে।

সুবিখ্যাত দিলওয়ারার অপর তিনটি মন্দির চৌমুখীজীর মন্দির, শান্তিনাথ ও বাচ্চা সার মন্দির। প্রথমটি তিনতলা চতুর্ম্মুখী; এগুলি মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত না হইলেও, কিয়দংশে শ্বেতপ্রস্তর পরিদৃষ্ট হইবে। সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত দুইটি মন্দিরের তুলনায় শেষোক্ত তিনটি অতি সাধারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতিকা

স্বর্গীয় মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

ওরে কার নামে আজ জগত জুড়ে
ডাকলো প্রেমের বান।
সপ্ত সাগর উতাল হোয়ে, আপনা হতে এলো বেয়ে
সারা জগৎ দিল ছেয়ে আনন্দ তুফান!
ওরে বাঙলার কোন একদেশে পাতার কুটীরে,
জন্মিল এক দুঃখী বালক দুঃখীরই ঘরে।
ভক্তিমান ক্ষুদিরাম পিতা হয় যার—
দরিদ্র ছিল তবু ভক্তিবলে পূজ্য সবাকার
গয়াধামে যাত্রা করি, গদাধরে স্বপ্নে হেরি
গদাই নাম দিল যারি—জানি স্বয়ং ভগবান।
ওসে হেরে যার চন্দ্রঘন, চন্দ্রমণির ঝরলো নয়ন,
পেয়ে সেই গুপ্ত আনন্দধারা সুপ্তধরা এতদিনে কি পায় প্রাণ?
ও ভাই মিছি কি এ এতো বাঙলার মাটী সৃষ্টি সংসারে
তাই আপনি আসেন সৃষ্টিপতি হেথায় বারে বারে।
চারিশত বৎসর না হতে গত, নদীয়ার চাঁদ অস্তমিত
নিমাই পুনঃ গদাই হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদে প্রকাশমান।
ওরে শুনেছি তাঁর শ্রীমুখবাণী, পূর্ণিমার চাঁদ গৌরমণি,
দ্বিতীয়ার চাঁদ স্বয়ং তিনি, হবেন কলায় কলায় বর্দ্ধমান।
সে বাণী আজ পূর্ণ হয়, দিনে দিনে তাঁর উদয়
তাই আপন হোতে ভুবনময়, বাজলো তাঁর নাম গান॥

স্বর্গীয় ভক্তপ্রবর মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ শিষ্যদের মধ্যে বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময়ে কিশোর বয়সে ইনি রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

স. বি.

অভিশপ্ত প্রাণ এক

শ্রীকালীপদ কোঙার

অভিশপ্ত প্রাণ এক এ বিশ্বের সকল দুয়ারে
কাঁদিয়া ফিরিনু, হায়, অতীতের কোথায় উদ্দেশ?
সকল সুনীল স্বপ্ন এইক্ষণে হয়ে গেল শেষ,
সূর্য্যালোক নিভে গেল, ত্যক্ত হল মন অন্ধকারে।
আলো কই, কই আলো, পূর্ণতার পরিতৃপ্তি কোথা?
ব্যর্থতার গ্লানিভরা এ জীবনে শুধু হাহাকার;
পার্থিব জগত হতে দৃষ্টি তুলে নিয়ে তাই ডাকি অনিবার,
—তুমি কি দিবেনা সাড়া, তুমিও কি ফিরাবে এবার?

গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতএব গ্রন্থকার অথবা পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। ইতি—সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী

বাজারে আজকাল ভাল প্রবন্ধের বই, ভাল চিন্তাশীল লেখক—দুই-ই দুর্লভ। রম্য-রচনার নামে বর্তমানে যে লঘু ও তরল সাহিত্য পরিবেশিত হচ্ছে, তা সাহিত্যের বাজারে সাময়িক একটা উত্তেজনা এনেছে, যেমন তুবড়ীর আলো। বস্তুতঃ এরই মধ্যে রম্য-রচনার ছাকামি বিদগ্ধ-পাঠক আর বরদাস্ত করছেন না। এমন অবস্থায় সুপরিচিত মননশীল লেখক, শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর একখা বিখ্যাত বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাই। সুদীর্ঘ উনত্রিশ বৎসর-কাল পরে "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী" বইখানির এই নূতন শোভন সংস্করণ দেখে মনে হলো বাংলাদেশে এখনও যথার্থ চিন্তাশীল পাঠকের অভাব ঘটেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে যে কয়জন মননশীল ও সমাজ-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত লেখক আছেন, তাঁদের সংখ্যা বড় বেশী নয় এবং তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম ও বিজ্ঞতম হলেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মহাশয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে এবং এই শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কারকদের জীবন-চরিত নিয়ে তিনি যেভাবে আলোচনা করেছেন, সেইরকম পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুগভীর আলোচনা বড় একটা কেউ করেন নি। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গিরিজাবাবুই পথিকৃৎ। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বই আজ পর্যন্ত অসংখ্য লেখা হয়েছে বলা চলে এবং অনেক বিশিষ্ট লেখক ওঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন সত্য, তবু মনে হয় সেসব আলোচনা এক হিসাবে অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর পরিচয় নিতে হয়, পরিচয় নিতে হয় বিশেষ করে রাজা রামমোহনের ও তাঁর অনুবর্তী সমাজ-সংস্কারকদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস। গিরিজাবাবুর বইখানির বৈশিষ্ট্য ও সম্পূর্ণতা এইখানেই।

উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রান্তে রামমোহন, অন্য প্রান্তে বিবেকানন্দ এবং ইঁহাদের মাঝখানে আছেন দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, ঈশ্বরচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, ও বিজয়কৃষ্ণ এবং আরো অনেকে। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রাজা রামমোহন—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। রামমোহনই উনবিংশ শতকের বাংলার প্রথম ও প্রধান যুগ-পুরুষ। রামমোহনকে বাদ দিয়ে বিগত শতাব্দীর বাংলার জাগরণের ইতিহাস আমরা ভাবতেই পারি না। রামমোহনের মনুষ্যত্ব ও মুক্তি-সাধনার মাহাত্ম্য কত তা বিবেকানন্দ বুঝতেন বলেই তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে "রামমোহনই নব্য-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" রামমোহনের বিরাট চিত্ত বাঙালি আজো সম্পূর্ণ-রূপে অনুধাবন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না; এই শত বৎসরেও ওঁর আংশিক পরিচয়ই আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে জাগরণের সূচনা হলো তাকে য়ুরোপীয় সংস্রবের ফল বলে, দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মত প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ১৮৮৫ সালের ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপনা পর্যন্ত, এই জাগরণ নানা ধারায় নানা ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সংস্কার-চেষ্টার আদিপুরুষ রামমোহনের চিন্তাধারা সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা পরিষ্কার না হয়, তা হলে বিবেকানন্দকে আমরা ঠিকমতো

বুঝতে পারব কিনা সন্দেহ। বিশ্বমানবের একাত্ম-বোধ রামকৃষ্ণের বহু আগে রামমোহনের মধ্যে বাঙালি দেখতে পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন: "রামমোহন জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্মোদ্ঘাটক; রাম-মোহনই প্রথম অনুভব করলেন যে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা হচ্ছে বিশ্ব-জননীতার এক একটি রূপ, এর কোনটি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সর্বোচ্চ পরিণতির দিকে। রামমোহন সেই সর্বোচ্চ পরিণতির পথ সুগম করতে চেষ্টা করেছেন।" এই চিন্তাধারার গতিপথেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব। "রামমোহন থেকে দেশে যে নব চেতনা এলো, সেই চেতনারই সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। রামমোহনের সমন্বয়পূর্ণ পরিণতি পেলো বিবেকানন্দের কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে। মানব-সভ্যতার নব সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরে রামমোহন তাঁর দেশবাসীকে অতীত ও বর্তমান-প্রীতির পরিবর্তে লোকশ্রেয়ঃ ও বিচার-বুদ্ধির যে মন্ত্র দান করেছিলেন, সেই মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে বিবেকানন্দের কণ্ঠে। রামমোহন ও বিবেকানন্দের জীবনে একটি বিষয়ের বড় চমৎকার মিল দেখতে পাওয়া যায়। অল্পবয়সেই এই দুই যুগমানবের চিত্তের আকর্ষ বিকাশ-সাধন হয়েছিল, আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

পারলৌকিক মোক্ষমার্গের মহিমা প্রচার করবার জন্যে জন্ম-বিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব নয়। রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নতুন কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর ইষ্ট পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রকাশ্য প্রেরণায় বিবেকানন্দ অদ্বৈত-বেদান্তের দৃঢ়ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে বেদান্তের তত্ত্বগুলি কর্মজীবনে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী প্রাচ্যের শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও আদর্শের তুলনামূলক বিচার করে বুঝে-ছিলেন যে, ভারতের স্থবিরত্বের অচলায়তন ভাঙবার জন্যে দরকার য়ুরোপের চিন্তা, কর্মকুশলতা ও বুদ্ধির অনমনীয়তা। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন যে, "বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বাম দিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবারও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।" নবীনভারতকে বিবেকানন্দ প্রধানত তিনদিক দিয়ে স্বদেশসেবার দীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রথমত কর্মযোগ; দ্বিতীয়তঃ—ত্যাগ ও সেবার সাধনা। তৃতীয়—দুঃস্মার্গ পরিহার। স্বামীজীর এই আহ্বানে ঘুমন্ত জাতি কিভাবে সাড়া দিয়েছিল, এবং কিভাবে উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ও বিংশ শতকের আরম্ভে বিবেকানন্দ জাতিকে নবজীবনের পথ দেখিয়েছিলেন, সুপণ্ডিত লেখক তা নিপুণভাবে এবং প্রাঞ্জল যুক্তির সাহায্যে আলোচনা করে দেখিয়েছেন এই বইখানির প্রত্যেকটি অধ্যায়ে। কিভাবে পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন ভারতের নূতন দিগ্বিজয় বিবেকানন্দের জীবন দর্শনকে চিরদিনের মতো চিহ্নিত করে দিয়েছে তা বুঝতে গেলে আলোচ্য গ্রন্থখানি গভীরভাবে পাঠ করা দরকার। বেদান্তের বাণী প্রচার করে এই বিপ্লবী সন্ন্যাসী কিভাবে আত্মার অবমাননা, কাপুরুষতা এবং নেতি ও নৈরাশ্যমূলক চিন্তার ধারাকে চূর্ণ করে দিয়েছেন তা সঠিক উপলব্ধি করবার পক্ষে এই গ্রন্থখানি যে অপরিহার্য, তা বলাবাহুল্য। যে বিবেকানন্দকে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং যেভাবে তুলে ধরেছেন, সেই বিবেকানন্দকে তাঁর অন্য কোন জীবনচরিতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এবং বইখানির প্রকৃত মূল্য ও সার্থকতা এইখানেই। এযুগের প্রত্যেক বাঙালি সন্তানের এই বইখানি পাঠ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকায় এর স্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী (২য় সংস্করণ)। পৃঃ ২১।২১৭; মূল্য চার টাকা।

প্রকাশক—নবভারত পাবলিশার্স,

৭২, হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা-৯

সংঘ বার্তা

শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা : বিগত ১৫ই কার্তিক, ১৩৬৩, বৃহস্পতিবার এতদুপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। ইহাতে সঙ্গীত বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীসুনীল কুমার দত্ত প্রভৃতি গায়কবৃন্দ ভজন সঙ্গীত গাহিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

রাত্রি ১১॥ টায় মায়ের পূজা আরম্ভ হয়। পূজক ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজী। পূজা শেষ হইতে ভোর ৪টা বাজিয়াছিল। বহু নরনারী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পূজা দেখিয়াছিলেন ও কীর্তন শুনিয়াছিলেন।

বাগবাজার বিশ্বনাথ কালীকীর্তন সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক রাত্রি ১২॥ টা হইতে চারঘণ্টা ধরিয়া নাটমন্দিরে কালীকীর্তন হইয়াছিল। কীর্তনান্তে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয় এবং বেলা ১২ টা পর্যন্ত ইহা চলে। শুক্রবার অধিক রাত্রি পর্যন্ত অমাবস্যা থাকায় এই দিন সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন না দিয়া শনিবার সন্ধ্যায় বিসর্জন অনুষ্ঠান শোভন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

দার্জিলিং বেদান্ত আশ্রমেও শ্রীশ্রীকালীপূজাদি যথাবিধি হইয়া গিয়াছে।

রামায়ণ গান : বিষ্ণুপুর নিবাসী সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় ২৪ শে কার্তিক শনিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর রামায়ণের "কাহের তরি কাকন" পালাগান করেন। ইহা শেষ হয় রাত্রি প্রায় ৯টায়। বহু নরনারী এই গান শুনিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাস যাত্রা : ২রা অগ্রহায়ণ, শনিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কথকতা : প্রতি রবিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারাত্রিকের পর সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘণ্টাধিক কাল শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত কথকতা করিয়া বহু ভক্ত নরনারীকে আনন্দ দান করেন। কথকতা শুনিয়া বহু ব্যক্তি ন্যায় ও ধর্মপথে চলিবার উদ্দীপনা লাভ করিতেছেন। কথকতার শেষে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে শ্রোতৃবর্গের প্রশ্ন আহ্বান করা হয় এবং কথকশিরোমণি মহাশয় সযত্নে ঐগুলির উত্তর দিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।

শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্তন : প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ ৩টা হইতে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্তন হয় এবং তাহার উপসংহার হয় কয়েক খানি ভজন গানে।

ধর্মালোচনা : প্রতি সপ্তাহে সোমবার হইতে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণবদর্শনাচার্য মহাশয় শ্রীমদ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যান করিতেছেন। তাঁহার পাঠ ও বাচন গুণে শ্রোতৃসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব (বিজ্ঞপ্তি) :

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ (৮ই পৌষ, ১৩৬৩) রবিবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৪-তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠান, কথকতা, কীর্তন ও বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে। দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমেও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব হইবে।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা

পৌষ, ১৩৬৩

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ : ফোন—৫৫—১৮০৫

MEMOIRS OF RAMAKRISHNA

by SWAMI ABHEDANANDA

(Third Edition)

- His Life Divine.
- Dialogues of the Master in 'Excellent English'
- Personality of the supermystic has become living in these sweet incidents

A learned introduction by the Swami reveals a new light to understand the Life and Teachings of Sri Ramakrishna. This book has been translated into Spanish, Portuguese, Danish, Scandinavian, Szechoslovak etc. A critical and sincere reader will find this international book the best in the field and is sure to be blessed with serene peace and enlightenment by a deep study of it.

Demy 8vo, XVI+355. Pages. 9 pictures. Price : Rs. 7/8.

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

পুনর্জ্জন্মবাদ

সকল প্রাণীই ক্রমবিকাশের পথে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। অনাদিকাল হইতে মানুষের এই পুনর্জন্মে বিশ্বাস। এ ছাড়া জগতের এত বৈষম্য—বিকাশের এই বিপুল স্তরভেদ সম্ভব নয়। যুক্তির চাইতে অন্ধভক্তি করিয়াই খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় এই মতবাদকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্বামীজী মহারাজ অপূর্ব যুক্তি বিচার দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া এই পুনর্জন্মবাদকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নূতন সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য ২৲ টাকা।

SREE RAMAKRISHNA AND WORLD CULTURE

by TAMASHRANJAN ROY

(Second Edition)

A novel and scientific study of the life and philosophy of Sree Ramakrishna. The approach is completely new and amply suited to the need of the new age

Get a copy for your library. Price : Rs. 2/12

Published by **Ramakrishna Vedanta Ashram, Darjeeling.**

Also to be had at :

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH : 19B, Raja Rajkrishna St. Calcutta-6

সম্পাদক স্বামী সদাত্মানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—পৌষ, ১৩৬৩

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	প্রেমাভক্তি (শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী)		৫০৫
২।	নব আগমনী (কবিতা)	স্বামী বেদানন্দ	৫০৬
৩।	শ্রীমা সারদাদেবী	শ্রীনলিনী বালা দত্ত	৫০৮
৪।	শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার তথ্য ও তত্ত্ব	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৫১০
৫।	মুক্তি দাও (কবিতা)	শ্রীসচ্চিদানন্দ মজুমদার	৫১১
৬।	শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্তন	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৫১৫
৭।	সুন্দর (কবিতা) ...	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫১৮
৮।	যীশুখৃষ্ট (কবিতা) ...	শ্রীশান্তিময় ঘোষ	৫১৯

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—হাওড়া মোটর বিল্ডিংস্,
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১
ফোন—২৩-১৮০৫ (৫ লাইন)

শাখা :—
বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ,
কটক, গৌহাটী ও শিলিগুড়ি।

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান) ● বেলঘোরিয়া (ভারত)

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম্, এ, এম্. ডি, বি, এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন আলানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার প্রাইভেট, লিমিটেড, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৯।	মানুষ-দেবতা কালীনাথ	শ্রীবিজয়গোপাল বসু ...	৫২০
১০।	বিচার ও বিবেক	শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫২১
১১।	অস্তিত্ব (কবিতা)	শ্রীকালীপদ কোঙার	৫২৩
১২।	মহাকবি হুইটম্যান	শ্রীমৎ পুরাণ পরমপন্থী	৫২৪
১৩।	বলিদান (কবিতা)	রামেন্দু দত্ত	৫২৭
১৪।	রাজা রামমোহন রায়	শ্যামাপ্রসাদ আচার্য	৫২৯
১৫।	গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' ...	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৫৩১
১৬।	একটি স্মরণীয় ঘটনা	শ্রীভজন গোপাল সান্যাল	৫৩৬
১৭।	শাস্ত্র ও সভ্যতা ...	শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য	৫৩৯
১৮।	নিয়গামীর প্রণাম (কবিতা)	শ্রীঅজনকুমার দত্ত	৫৪০
১৯।	তারাশঙ্করের ছোট গল্প	শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত	৫৪১
২০।	মাতৃবন্দনা (কবিতা) ...	শান্তশীল দাশ	৫৪৬
২১।	তীর্থ ...	শ্রীবরুণ প্রকাশ মিত্র	৫৪৭
২২।	নির্দেশ (কবিতা) ...	শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী	৫৪৮
২৩।	মিত্রপূজা	শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ	৫৪৯
২৪।	গ্রন্থসমালোচনা ...		৫৫০
২৫।	বেদানন্দ স্বামিজীর মহাপ্রয়াণে (কবিতা) ...	শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র	৫৫১
২৬।	স্বামী বেদানন্দ স্মরণে ...	...	৫৫২

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

আগামী ফাল্গুন মাসে (১৩৬৩), বিশ্ববাণীর উনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। দুই একটী বিশেষ কারণ বশতঃ আমাদিগকে ঐ বর্ষ হইতে বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য চারি আনা বৃদ্ধি (অর্থাৎ সডাক চারি টাকা, চারি আনা) করিতে হইল। আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্বক এই কথা স্মরণ রাখিয়া আগামী মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে ১৯শ বর্ষের বিশ্ববাণীর সডাক বার্ষিকমূল্য চারিটাকা চারি আনা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বিশ্ববাণীর কার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার সহায়তা করিবেন আশা করি।

নিবেদক
ম্যানেজার—বিশ্ববাণী

K.C.GANGULY & CO.

Dealers in:-

WEST END - FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

বিবাহে বা যে কোন উৎসবে—মনের মতন ক'রে সাজাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বোস ডেকরেটর্স্

২০৪ রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা-২৯

অষ্টাদশ বর্ষ | পৌষ—১৩৬৩ | একাদশ সংখ্যা

॥ প্রেমাভক্তি ॥

"গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি; নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জানো? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু ও-জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বল্লে, 'সীতারাম দেখ্‌বো।' ঠাকুর রুক্মিণীকে বল্লেন, 'তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই।' পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগ্‌লো। বিভীষণ বল্লেন, 'আমি এক নারায়ণকে প্রণাম ক'র্বো, আর কারুকে ক'র্বো না।' তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করতে লাগ্‌লেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটযুক্ত মাটাস হ'য়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে!

"কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ। দেওর, ভাসুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গে অন্য রকম সম্বন্ধ।

গোপীদের কি নিষ্ঠা। মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে সভায় ঢুক্‌লো। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বল্‌তে লাগ্‌ল, 'এ পাগড়ীবাঁধা আবার কে। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'ল্লে আমরা কি শেষে ব্যভিচারিণী হবো। আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়?' দেখছ, এদের কি নিষ্ঠা। বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজা করেন। তারা রাধা চায় না।"

— শ্রীরামকৃষ্ণ

নব আগমনী

স্বামী বেদানন্দ

জননী এসেছে, জননী এসেছে,
এসেছে বিশ্বজননী।
আধার উঠিছে অগণিত স্বরে
আজি কোন্ আগমনী?
এই আশ্বিনে এইত সেদিনে
ধন্য করিয়া সকল সন্তানে
এসেছিল মাতা বিশ্বজননী
দশভুজা-রূপ ধ'রে
অপরূপ রূপে হয়ে বিরাজিতা
সবার চিত্ত হ'রে।

সেদিনে আশ্বিনে সন্তান সবে,
বিশ্বজননীর পূজা-উৎসবে
কত-না উল্লাসে কতনা হরষে
আসিয়াছে দলে দলে,
দিয়েছে ভক্তি অর্ঘ্য অঞ্জলি
মায়ের চরণ তলে।

জননীর সেই পূজা-উৎসব
হয়ে গেলে সমাপন,
সব সন্তান কাতর বিষাদ-
ক্ষুণ্ণ উদাস মন।
তাদের আকুল অন্তর ব্যথা,
শুনেছেন আজ জগতের মাতা,
তাইত আবার নূতন রূপেতে
মধুর মূরতি ধ'রে,
এসেছে জননী, সকল রিক্ত
হৃদয়ে পূর্ণ কোরে।

এবারে জননী সহজ-সরলা
স্নেহকমনীয় কায়
অশেষ করুণা কল্যাণ রাশি
মায়ের মুখেতে ভায়
কী মধুর দিঠি কমল-নয়নে
কী হাসি অমল সে চারুবয়ানে,
কী বাণী অভয় প্রকাশে নীরবে
জননি সবার প্রতি,
সব সন্তানে করিতে মুক্ত
তিনি যে ব্যাকুলা অতি।

জননী বিরাজে অপরূপ রূপে
মহিমা উজল কান্তি;
তাঁহার দরশে জীবনে বরষে
সুনিবিড় মহাশান্তি।
পূজামণ্ডপে কুসুম আসনে,
সমাসীনা মাতা আজি শুভক্ষণে,
আসে দলে দলে কত নরনারী
জাতি, কুল, ভেদ নাই,
মায়ের চরণে মায়ের শরণে
সবার সমান ঠাঁই।

জানিনা কী জ্যোতি, জানিনা কী আলো,
জননীর মাঝে প্রকাশিত হলো,
সে আলোকে গেল মনের আঁধার,
গেলো যে বাসনা তমঃ,
বিকশিল প্রাণ শোভায় সরস
অমল কমল সম।

জানিনা জননী তব পূজা স্তুতি
ধ্যান জ্ঞানহীন আমি দীন অতি
নাহিক সাধনা নাহিক ভজনা
যোগতপ নাহি জানি
জানি শুধু মাগো চরাচর-গতি
তোমার শরণ খানি।

শুনেছি তোমার কৃপায় পলকে
লভিয়াছে ত্রাণ শতশতলোকে;
যার কেহ নাই, সেও পায় ঠাঁই
তোমার অভয় ক্রোড়ে
তাই জানি মাগো শত অপরাধে
কোলে তুলে লবে মোরে।

নমি নমি নমি বিশ্ব-জননী,
কতবার কত মূরতি ধারিণী;
নমি গো সারদে অভয়-বরদে
মুক্তি-শান্তিদায়িনি!
নমি নমি তব চরণ কমলে
ভকত হৃদয়-নন্দিনি!

তুমি মা দুর্গা, তুমি মা ভবানী
তুমি মা কমলা, কালী কপালিনী
তুমি মা রাধিকা, তুমি রুক্মিণী
তুমি মা অন্নপূর্ণা,
সিংহ-বাহিনী দানবদলনী
অমলা অতসী-বর্ণা।*

মায়ের কথা

১। বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) ত' আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি একঘোরা হ'লে চলে?

২। মনে করবে এটি ঠাকুরের সংসার, তুমিও ঠাকুরের; ঠাকুরের সংসারে কাজ করছ।

৩। ঠিক ঠিক ভক্তি নিয়ে একমনে একবার ভগবানের নামেই যা ফল পাওয়া যায়, অন্যমনস্ক হয়ে লক্ষ লক্ষ বার নাম জপে তা হয় না।

৪। ভগবানই মানুষের গতি। তিনি বিপদে বন্ধু, অকূলে কাণ্ডারী।

৫। কারুর দোষ দেখবেনা, কারুর নিন্দে করবে না। কারুর মনে কষ্ট দিও না। খুব ভোর থাকতে রোজ উঠবে। সকাল বেলায় ভগবানের নাম করবে।...ভগবানকে কাতর হ'য়ে ডাকলে উপায় হবেই।

---

* প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের রোগ-শয্যায় ১৩ই কার্তিক ১৩৬৩, বুধবার প্রভাতে লিখিত এই কবিতাটি বাণিজ্যীর শেষ রচনা। তাঁহার তিরোধানের পর এটি মুদ্রিত করিতে হইবে বলিয়া তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। আমরা উহা অবিকল ছাপিলাম। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কবিতাটি পৌষ সংখ্যায় 'মায়ের জন্মোৎসব' সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। স. বি.

শ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীনলিনীবালা বসু

যদিও সে অনেক দিনের কথা, একশত তিন বৎসরেরও পূর্বেকার কথা—তবুও মনে হয় এই সেদিনের কথামাত্র। সেদিন কিন্তু ছিল আজকেরই তিথি। এই পুণ্যতিথিকে ধন্য ক'রে এসেছিলেন মাতা সারদাদেবী এক ধর্মনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতির কন্যারূপে। পল্লীগ্রামে সামান্য পর্ণকুটিরে ক্ষুদ্র শিশুকন্যারূপে শ্রীমা হলেন আবির্ভূতা।

বাপ মা গরীব কিন্তু মন ছিল খুব সরল আর উদার, কমনীয় লাবণ্যে ভরা শ্যামবর্ণা মেয়েটির সুন্দর মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।

দরিদ্র পরিবারের ঘরে লালিত-পালিত হয়েও মায়ের মনের প্রশস্ততা, নির্ভরতা ছিল অপরিসীম। পাঁচ বছর বয়সের সময় যখন কামারপুকুরে সাধক গদাধর ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ হলো—তখন কৌলিক নিয়মানুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে ক'নে সাজিয়ে আনা হলো, কিন্তু সে অলঙ্কারগুলি সাময়িকভাবে অন্য বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল। যখন ঐ অলঙ্কারগুলি ফেরৎ দিবার সময় হলো—গদাইয়ের মা বললো জলভরা চোখে ছেলের দিকে চেয়ে—"কি করে ওই কচি গা থেকে গয়না খুলবো আমি?"—ছেলে বুঝলো মায়ের ব্যথা—একটু থেমে বললেন, "ভেবো না মা, রাত্তিরে ও' ঘুমিয়ে পড়লে আমিই গয়না খুলে দেবো।" রাত্রে নববধূ নিদ্রিতা হলে মা ও ছেলে গহনা খুলতে এলেন কিন্তু দু-একটা খুলতেই বধূর ঘুম ভেঙে গেল—সুন্দর দুটী আশ্চর্যান্বিত চোখ খুলে মধুর সুরে বললো, "গয়না কেন খুলছো?"

বাগুড়ী সান্ত্বনার সুরে বললো "গদাই ওর চেয়েও ভাল গয়না তোমায় দেবে মা—" নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভরশীলা বালিকা ঘুমিয়ে পড়লো—এই আশ্বাসে। এই একটা ঘটনাতেই মা যে অনন্ত বিশ্বাসবতী তার প্রথম উদাহরণ পাওয়া যায়—, মাত্র পাঁচ বছরের মেয়ে, কিন্তু কই প্রশ্ন তো কিছুই করলেন না অন্যান্য ছোট মেয়েদের মতো। সেই যে মহান বিশ্বাসই পরবর্তীকালে তাঁকে এমন ধন-রত্নে বিভূষিতা করেছিল যে জগতের স্বর্ণভার তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে।

বিবাহের পরে যখন তিনি কিশোরী—পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন, তখন তাঁর স্বামী পাগল এ বার্তা রটনা হলো; ক্রমে তাঁর কাছেও পৌঁছল। ব্যাকুল হয়ে গ্রাম্য মেয়েটি পদব্রজেই চলতে আরম্ভ করলেন স্বামী-তীর্থে—পথিমধ্যে কত রকম বিঘ্ন-বিপদ—অসুস্থতা এলো, সলজ্জা মেয়েটী কিন্তু সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে সে সব অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বরে,—দেখলেন তাঁর পরম দেবতা ভগবৎ প্রেমের দক্ষিণা-মূর্তি হয়ে অবস্থান করছেন! দেখে পরম শান্তিতে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং মগ্ন হয়ে গেলেন স্বামীর নির্দেশে নীরব তপস্যায়।

ঠাকুরের মত মায়ের তপস্যা সর্বজন-প্রকাশ্য নহে; নীরবে নিঃসীমার মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে দেবার অপরূপ সাধনা ছিল তাঁর; বেশবাস কিছু নয়, অবগুণ্ঠিতা শুভ্র পবিত্র ছবি—এবারে যে রূপ ঢেকে আসা।

শুধু তপস্যার নয়, অসীম কর্মক্ষমতাও ছিল তাঁর। ছোট্ট নহবৎ ঘরের সমুদয় গৃহস্থালীর কাজগুলি—যেমন অনেক ভক্তদের খাবার তৈরী,

ঠাকুরের পথ্যাদি প্রস্তুত, মেয়ে ভক্তদের শোবার জায়গা করা, সকলকে খাবার পরিবেশন করা প্রভৃতি সকল রকম কাজ পরম নৈপুণ্যে সম্পন্ন করতো হাত দু'খানি, আর মনের নিভৃত কন্দরে চলতো অবিরাম নাম সাধনা।

এইরূপে নিরন্তর কর্ম ও সাধনার মধ্য দিয়ে দুস্তর তপস্যাসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে মা একেবারে সিদ্ধি দায়িনী জগন্মাতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন,—বাইরের রূপ তাঁর রইলো আগের মতোই নম্র ব্রীড়াবনতা গৃহস্থ বধূটীর; কিন্তু অন্তরের অন্তরে চাপা রইলো অনন্ত শক্তি! যে শক্তির পদতলে স্বয়ং যুগাবতারেরও ষোড়শী পূজার অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শী পূজাই বিশ্বজন সমক্ষে প্রমাণ করেছিল যে শ্রীমা মহা-শক্তির অধিকারিণী।

তারপর মা স্নেহ ও করুণাময়ীরূপে অসংখ্য সন্তানগণের সেবা দিয়ে, শান্তি দিয়ে ধন্য ও পূর্ণ করে রেখেছিলেন; তাঁর স্নেহ-বাহু প্রসারিত হয়েছিল সবার জন্যেই; চিত্তের শান্তি ও আত্মার উন্নতি দিবার জন্যই তাঁর এবারকার আসা—মহিষমর্দিনীরূপে নয়, জীবপালিনী জীবধাত্রী আনন্দদায়িনী রূপে।—

একবার ত্রিগুণাতীত মহারাজ দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মায়ের কাছে পাঠালেন, বললেন—"অনন্ত রাধার গুণ কহনে না যায়"।

পঞ্চবটী বনে ধ্যানাবস্থায় দর্শন হয়েছিল বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতার শুভ্র কোমল করযুগলে স্বর্ণবলয়। সেইরূপ স্বর্ণাভরণ তিনি মাকে দিয়ে-ছিলেন বলেছিলেন—"ওর সাথে আমার যে ওই সম্বন্ধ-ই গো।" অতি পবিত্র মাধুর্যময়!

জীবনের অপরূপ লীলা! আত্মায় আত্মায় অনন্ত মিলন এঁদের; এই মধুক্ষরা অবস্থাকে বৈষ্ণব মহাজন বলেছেন—

"সে সো পুরুখ সখি, ন হাম রমণা।"

—জননী যোগমায়াকে অবলম্বন করেই পুরুষোত্তমের আবির্ভাব ঘটে থাকে;—তাই মা ছিলেন যোগমায়া-শক্তি বা প্রকৃতি আর শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন স্বয়ং পরম পুরুষ! দৈবী-লীলায় এঁদের মর্ত্যধামে আগমন ঘটেছিল ব'লে পৃথিবী ধন্য হয়েছে. —মানব-সাধারণ ধন্য হয়েছে। এই অপরূপ দেব যুগলের চরণরেণু-স্পর্শে ধুয়ে গিয়েছে নিখিলের পুঞ্জিত গ্লানি—তমোময়ী রজনীর শেষে দিবা অরুণ লেখায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে নিখিল জনগণের ভাগ্য আকাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে বিরহ কাতর সন্তানদের শূন্য হৃদয় স্নেহ-অমৃত রসে পূর্ণ করে—ক্ষমা-দাক্ষিণ্যে বাৎসল্যে পূর্ণ পবিত্রতার স্নিগ্ধ মাতৃ-মূর্তিতে মাটীর পৃথিবীতে মা যতদিন বাস করে রেখে গেছেন আদর্শের মহান্ মহিমা—আর মাতৃত্বের নিরুপম মাধুর্য।

শতবর্ষ অতীত হয়ে গেছে, সেই স্নেহকরুণ কল্যাণরূপিনী অয়ি সবায় ভরে উঠেছে, উঠ্‌ছে সকলের মন, অন্তরের অন্তরে জেগে উঠ্‌ছে তাঁর অভয় আশ্বাস—"ওরে আমি তোদের পাতানো মা নই, তোদের সত্যকারের মা আমি। শরৎ-ও যেমন আমার ছেলে, আমজাদ-ও তেমন আমার ছেলে—তোরা যে আমার সন্তান।—"

—বিশ্ব-জননীর এই বাণী সম্বল কোরেই চলবে তাঁর অগণিত দীন সন্তান—যুগ থেকে যুগান্তরে, —আজ বাস্তব চক্ষুতে তাঁর কল্যাণী মূর্তি দেখা যায় না সত্য—কিন্তু হৃদয় উপলব্ধি করে অচিন্ত্য শক্তি—যে শক্তি অনন্ত কল্যাণের পথে জীবকে আকর্ষণ করে অনমুভূত আনন্দে পৌঁছে দেয়! আজ সেই জগৎব্যাপ্ত, নিত্য, নিরুপমা শক্তিকে প্রণাম করে বলি—

"কাল স্রোতে ভেসে যায় সব
দু'দিনের মিথ্যা কলরব—
কালাতীত—স্থির অবস্থান—
তোমাতেই চির-বিদ্যমান।
তুমি আছো ব্যাপি' সর্বধাম
হে অরূপা! তোমারে প্রণাম!"

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার তথ্য ও তত্ত্ব

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকা পুরাণ ও দেবী পুরাণ অনুসারে বাংলা দেশে তিন প্রকার দুর্গাপূজা-পদ্ধতি প্রচলিত। এই তিন পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও অতিশয় প্রশংসিত। দেবীপুরাণেই জগদ্ধাত্রী দেবীর ধ্যান ও পূজা লিখিত রহিয়াছে। উক্ত পুরাণে জগদ্ধাত্রীর নিম্নোক্ত ধ্যান প্রদত্ত।—

সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং জগদ্ধাত্রীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শংখশার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঙ্কজবাণাংশ্চ দধতীং দক্ষিণে করে॥
রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্ক সদৃশী-তনুম্।
নারদাদ্যৈঃ মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলী বলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীম্।
রত্ন দ্বিপময় দ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে॥
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েৎ তাং ভবগেহিনীম্॥

অনুবাদ: মহাদেবী জগদ্ধাত্রী সিংহস্কন্ধে অধিষ্ঠিতা, নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, চতুর্ভুজা সর্পময় যজ্ঞসূত্রধারিণী। তাঁহার দুই বাম হস্তে শংখ ও শার্ঙ্গ সুশোভিত এবং দুই ডান করে সুদর্শন চক্র ও পঙ্কজবাণ বিরাজিত। তিনি রক্ত-বস্ত্রপরিহিতা, তাঁহার দেহ প্রাতঃ সূর্যবৎ রক্তবর্ণ। তিনি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা। তাঁহার উদরস্থ নাভিপদ্মের মৃণালস্বরূপ রোমাবলী বলয়াকৃতি ত্রিবলির (কুঞ্চিত মাংসের তিনটী রেখার) সহিত সংযুক্ত। তিনি হৃদয় কমলে কল্পিত সুধাসমুদ্রে রত্নহস্তীরূপ দ্বীপে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপর উপবিষ্টা। সেই পরমেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহাদেবীকে ভক্তিভরে ধ্যান করিবে।

দুর্গা-প্রতিমায় দেবীর বামদিকে সিংহের মুখ থাকে; কিন্তু জগদ্ধাত্রী-প্রতিমায় সিংহের মুখ থাকে দেবীর ডান দিকে। জগদ্ধাত্রী সিংহোপরি ডান পদ ঝুলাইয়া ও বাম পদ ভাঁজ করিয়া উপবিষ্টা। নদীয়ার মহারাজা দেবীভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক স্বপ্নদৃষ্ট জগদ্ধাত্রী দেবী শংখ-চক্র ধনুর্বাণ ধারিণী এবং 'ঘোড়া দাবা' হইয়া সিংহের উপর আরূঢ়া। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে গত দুই শত বর্ষ ধরিয়া উক্তরূপ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সুপূজিতা হইয়া আসিতেছেন। এই মূর্তির একটী হস্তীদন্তে নির্মিত মডেল কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর বিষ্ণু মহলে অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত আছে। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে প্রচলিত জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সিংহ শ্বেতবর্ণ ও অশ্বতুল্য; কিন্তু অন্যত্র সিংহ হনুদবর্ণপ্রায় ও কেশর সংযুক্ত। কোথাও কোথাও দেখা যায়, একটী শুণ্ডযুক্ত হস্তীমুণ্ডকে দেবীবাহন সিংহ থাবা দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত 'নিত্যপূজা পদ্ধতি'তে যে জগদ্ধাত্রীধ্যান পাওয়া যায় তাহা পূর্বোক্ত ধ্যান হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্।

দেবী পুরাণে জগদ্ধাত্রী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। একদা দেবগণের মধ্যে অহংকার ও তমোভাব প্রবল হওয়ায় প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। ইহা অবগত হইয়া মহামায়া দেবগণের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য অগণিত মায়াস্ত্র ছাড়িলেন। ইহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া দেবগণ আত্মরক্ষার্থ ভক্তিভরে জগদম্বার স্তবস্তুতি করিলেন। দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেবী স্তবকারীদের সম্মুখে ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, সিংহারূঢ়া, রক্তবসনা, মহামূল্য অলঙ্কারে

সুশোভিতা, জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। 'কেন' উপনিষদোক্ত উমা হৈমবতীর উপাখ্যানের অনুরূপ উল্লিখিত আখ্যায়িকা নহেকি? জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সম্মুখে কোন কোন স্থলে যে ছিন্ন হস্তীমুণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহা কি দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতের মুণ্ড দেবী-শস্ত্রে সংছিন্ন? অথবা উহা কি ধ্যানোক্ত রক্তহস্তীর প্রতীক?

শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনস্থানে জগদ্ধাত্রী শব্দ অন্ততঃ তিন বার উল্লিখিত দেখা যায়। ইহাতে প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম মন্ত্রে যোগনিদ্রাকে বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী বলা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ঊনত্রিংশ মন্ত্রে মহালক্ষ্মী জগতের ধাত্রীরূপে সম্বোধিতা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ মন্ত্রে আছে, সুরথ ও সমাধি কর্তৃক মহীময়ী মহামূর্তিতে সুপূজিতা জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবী প্রত্যক্ষীকৃতা হইলেন। হংসারূঢ়া ব্রহ্মাণীও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিতা। সুতরাং ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবীই জগদ্ধাত্রী। শ্রীশ্রীচণ্ডী মহাপুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত এবং দেবী পুরাণের পূর্ববর্তী। সুতরাং জগদ্ধাত্রী নাম জগদ্ধাত্রীর পূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর। মায়াতন্ত্রে আছে—

পূজয়েৎ জগতাং ধাত্রীং কার্ত্তিকে শুক্ল পক্ষকে।
দিনোদয়ে চ মধ্যাহ্নে তথা সায়াহ্নকেঽহনি॥

অনুবাদ—কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে প্রাতঃ কালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে জগদ্ধাত্রীদুর্গার পূজা করিবে।

পূর্বদিন ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী নবমী হইয়াও যদি পরদিন মুহূর্ত কাল নবমী থাকে তবে পরদিনই জগদ্ধাত্রী পূজা হইবে। ইহাতে অষ্টমীর যুগ্মাদর বা সন্ধিপূজা বা নবপত্রিকাপূজা নাই। অধিকন্তু উল্লিখিত স্থলে দশমীতে বলিদানেও দোষ হয় না। জগদ্ধাত্রীপূজায় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-বিহিত-পূজা যথাক্রমে সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় করিতে হয়। দশমীবিহিত পূজাবিধি দুর্গাপূজার মতই হইয়া থাকে। ঘটস্থাপন, প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা, দুর্গাহোম, সিংহপূজা, বলিদান, মহাস্নান, কুমারীপূজা, জয়া-বিজয়া পূজা প্রভৃতি পূজাক্রম দুর্গাপূজার ন্যায়ই হয়। সপ্তমীপূজা বা অষ্টমী পূজার পর কুমারীপূজা এবং নবমী পূজার পর হোম বিহিত। জগদ্ধাত্রীকল্পে একটী জগদ্ধাত্রী স্তব পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে নবমীতে হোমান্তে বিসর্জন করা হয়। এই সকল স্থলে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী—চার তিথির চার পূজা এক দিনেই হইয়া থাকে। দুর্গাপূজার ন্যায় জগদ্ধাত্রীপূজার সময় নিম্নোক্ত নবদুর্গার পূজাও করিতে হয়—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও কাত্যায়নী।

দুর্গাপূজার সময় দুর্গাঘটের নিম্নে যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত হয় উহার প্রতিদলে আটটি করিয়া চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিতে হয়। পূর্বোক্ত চতুঃষষ্টী যোগিনীর নাম যথা—ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, ভৈরবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শঙ্করী ছন্দৌ, সর্বমঙ্গলা, কালী করালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অর্পণা, মহোদোরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, বলবিকারিণী, বলপ্রমথিনী, মনোন্মথিনী, সর্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুত্রী, চণ্ডিকা, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি ও মহাগৌরী। জগদ্ধাত্রী পূজাকালে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজাও কর্তব্য।

পূর্বোক্ত জগদ্ধাত্রীকল্পে যে জগদ্ধাত্রীস্তব আছে তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ ১
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তুতে ॥ ২
জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥৩
পরমাণুস্বরূপে চ ত্বাণুকাদি স্বরূপিণি।
স্থূলাতিস্থূলরূপে ব জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥৪
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদি-রূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥৫
কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্বস্বরূপে সর্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥৬
মহাবিদ্যে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥৭

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীপূজার মূলমন্ত্র 'ওঁ হ্রীং জগদ্ধাত্রৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।' এই মন্ত্রে মহাদেবীকে ষোড়শ উপচার প্রদানপূর্বক পূজা করিতে হয়।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক জগদ্ধাত্রীপূজা প্রবর্তিত হয়। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে প্রতিমায় জগদ্ধাত্রী-পূজা প্রথম সম্পন্ন হয়। ক্রমশঃ এই পূজা কৃষ্ণনগরের বহুস্থানে প্রচলিত হয়। পরে ইহা চন্দননগর, শান্তিপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত হয়। তখন হইতে এখন পর্যন্ত প্রায় দুই শত বর্ষের মধ্যে বাংলার বহুস্থানে জগদ্ধাত্রী মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু কৃষ্ণনগরে এই পূজার জাঁকজমক সর্বাধিক এবং তথায় দুর্গাপূজা অপেক্ষা জগদ্ধাত্রী পূজার সমারোহ অধিকতর দেখা যায়। উক্ত শহরে জগদ্ধাত্রীপূজা পূর্বে প্রায় প্রতিঘরে সম্পন্ন হইত। তথায় জগদ্ধাত্রীপূজা এত সুখ্যাত যে দূর দূর স্থান হইতে শত শত নরনারী পূজোৎসব দর্শনার্থ উপনীত হন। বিশেষতঃ বিজয়া দশমী দিবসে জাঁকজমকপূর্ণ বিসর্জন ও শোভাযাত্রা দেখিতে হাজার হাজার দর্শক তথায় সমবেত হন। প্রায় সারারাত্রি ধরিয়াই শোভাযাত্রীর আনন্দোৎসব চলিতে থাকে। কলিকাতায় দুর্গাপূজার বিসর্জনোৎসব তুল্য উহা অসাধারণ ও দর্শনযোগ্য। কৃষ্ণনগরের পরেই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার আড়ম্বর অধিক দৃষ্ট হয়। তথায় দোতলা বাড়ীর সমান বা ২০। ৫ ফুট উচ্চ ও তদনুযায়ী চওড়া জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মিত হয় এবং কোথাও কোথাও নবমীর দিন তিন পূজা না হইয়া কার্তিকের শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিত্রয়ে দুর্গাপূজার ন্যায় তিন দিন ধরিয়া জগদ্ধাত্রীপূজা হইয়া থাকে।

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক জগদ্ধাত্রী-পূজা কিরূপে প্রথম আরম্ভ হয় সেই সম্বন্ধে যে দুইটি ব্যাপক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। এই জনশ্রুতিকে অবিসংবাদিত সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার নামান্তর বলাই সঙ্গত। বার্ষিক খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় নবাব মীরকাশিম, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র শিবচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া মুঙ্গের কারাগারে বন্দীরূপে রাখেন। তখন শারদীয় দুর্গোৎসব সমাসন্ন। ইহার কিছুদিন পরেই কৃষ্ণনগর হইতে উক্ত নবাবের নিকট প্রাপ্য কর প্রেরিত হয় এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজকুমার শিবচন্দ্র মুক্তি পান। অনন্তর পিতা-পুত্র আঠার দাঁড়ের পান্সীতে চড়িয়া গঙ্গা নদী দিয়া কৃষ্ণনগরে ফিরিতে ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ধর্মপ্রাণ ও দুর্গাভক্ত ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আগ্রহ ছিল দুর্গাপূজার পূর্বেই কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্তন পূর্বক যথারীতি দুর্গোৎসব করেন। কারণ প্রতিবর্ষ তিনি দুর্গাপূজার সময় মাতৃপদে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন, কদাপি অন্যথা করিতেন না। বহু চেষ্টা করিয়াও দৈবক্রমে তিনি মহাষষ্ঠীর দিন শত ক্রোশের কথা, বিজয়া দশমীর দিবসেও ফিরিতে পারিলেন না

এই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আহত অন্তরে বিজয়া দশমী দিবসে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ১৯৫১ সালে ৭ই নভেম্বর বুধবার কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় শ্রীনির্মলদত্ত লিখিত 'জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ও কৃষ্ণনগরে পূজার বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি মহাদেবীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট দুর্গাদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "কি করবি বল্? আমার পূজা হলো না বলে দুঃখ করার কি আছে? বাড়ীতে ফিরেই তপস্যায় বস্‌বি এবং তপস্যার দ্বিতীয় দিবসে বহু বাধা বিঘ্ন দেখতে পাবি তাহা সত্ত্বেও পশ্চাৎ দিকে তাকাবি না। তাহলে সন্ধ্যার সময় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করবি।" এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রাজবাড়ীর বিষ্ণু-মহলে বাক্‌সিদ্ধ হইবার জন্য মহারাজা পূর্ব হইতেই কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। দুর্গাদেবী প্রিয় ভক্তকে আরও বলিলেন, "অনন্তর সম্মুখে আমার যে মূর্তি দেখবি সেই মূর্তিরই পূজা করবি। এই শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে এই পূজা হবে এবং এক দিনেই সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিত্রয়ের তিনপূজা হবে। এই মূর্তিতে আমার যে পূজা হবে তা তুই প্রচার করবি।" মহারাজ কর্তৃক স্বপ্নাদেশ আক্ষরিকভাবে পালিত হয়।

একাদশী দিবসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ফিরিলেন এবং স্বপ্নাদেশ অনুসারে পূর্ববৎ বিষ্ণু মহলে তপস্যায় বসিলেন। তপস্যার দ্বিতীয় দিবসে তাঁহার পিছনে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি এমন বিকট চিৎকার ও উৎপাত করিতে লাগিল যে, তিনি পশ্চাতে তাকাইতে বাধ্য হইলেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট বিভীষিকায় ভীত হইয়া তিনি সম্মুখে তাকাইয়া দেবীপুরাণোক্ত উল্লিখিত জগদ্ধাত্রী দেবীমূর্তি দেখিয়া ধন্য হইলেন। তিনি পূর্বদৃষ্ট দেবীমূর্তি গড়াইয়া শুক্ল নবমীতে জগদ্ধাত্রী দুর্গার পূজা করিলেন। এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে উক্ত মূর্তি প্রতিবর্ষে যথোচিত সমারোহে পূজিতা হইয়া থাকেন। সুতরাং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম প্রবর্তক। তৎপূর্বে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত ছিল কিনা তাহা এখনও অজ্ঞাত।

এই সম্বন্ধে মতান্তরে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত আছে। এক বৎসর শরৎকালে নবাব মীরকাশিম মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র শিবচন্দ্রকে ধরিয়া মুঙ্গের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ষড়-যন্ত্রকারী রাজদ্রোহী বলিয়া রাজা রাজবল্লভ উক্ত নবাব কর্তৃক তৎপূর্বেই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত ও নিহত হইয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও যুবরাজ শিবচন্দ্রকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পাষণ্ড নবাব তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি বরং মৃত্যুবরণ করিবেন তথাপি কারাগারে জল গ্রহণ করিবেন না। উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি মাতৃ-ধ্যানে মগ্ন হইলেন, তৎপরে দুঃখিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, "এখন শারদীয়া দুর্গাপূজা আরম্ভ হইয়াছে। আর আমি এত হতভাগ্য যে, দুর্গাপূজার সময় বাড়ীতে থাকিয়া মহাদেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিলাম না। যদি বা এখন মুক্তিও পাই তথাপি এমন কোন শাস্ত্রবিধি নাই, যাহাতে ৺মায়ের তিন পূজা একদিনেই করিতে পারি।" ধ্যানান্তে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং স্বপ্নে দেখিলেন, মহাদেবী তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন, "কৃষ্ণচন্দ্র, কাল প্রাতে তোমার মুক্তি হবে এবং তোমার দ্বারা জগদ্ধাত্রী মূর্তিপূজা প্রচলিত হবে। উক্ত মূর্তির ধ্যান দেবী পুরাণে পাবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে চারিদিকে কোলাহলের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস মুঙ্গের অবরোধ করিলেন। কারাগারস্থ বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে যাইয়া বন্দীদ্বয়কে মৃতপ্রায় দেখিয়া মুক্তিদাতারা হেষ্টিংসকে

সংবাদ দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হেষ্টিংস স্বয়ং বন্দীদ্বয়ের কাছে গেলেন এবং তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া সুস্থ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের মৃতদেহ ফেলার ডুলিতে তুলিয়া গঙ্গাতীরে পাঠাইলেন। গঙ্গাতীরে মুক্তবায়ু সেবনে তাঁহারা সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং গঙ্গাজলপানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। তখন হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে নৌকা-যোগে কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন। কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়-গণকে ডাকিয়া শুক্লা-নবমীতে প্রতিমায় জগদ্ধাত্রী মহাপূজার প্রবর্তন করিলেন।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ-জননী সারদাদেবীর পিতৃগৃহে জগদ্ধাত্রীপূজা বহুবর্ষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিজয়া-দশমীতে শুভ লগ্ন না থাকিলে সারদাদেবী প্রতিমা বিসর্জন দুই এক দিন পরে করিতে নির্দেশ দিতেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রতিমায় দুর্গাপূজা অপেক্ষা প্রতিমায় জগদ্ধাত্রী পূজা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তবে অথও চণ্ডীপাঠ উভয় পূজার অঙ্গীভূত। জগদ্ধাত্রী পূজা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক। সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে জগদ্ধাত্রী দেবীর তিন-পূজা হইতে প্রতীত হয়, ত্রিসন্ধ্যায় হংসারূঢ়া কুমারী ব্রহ্মাণী, গরুড়বাহনা যুবতী বৈষ্ণবী ও বৃষভ-সনা বৃদ্ধামাহেশ্বরী—এই তিন গায়ত্রী মূর্তির ঔপচা-রিক পূজা। কালক্রমে বৈদিক যজ্ঞ যেমন তান্ত্রিক হোমে পরিণত হইয়াছে তদ্রূপ বৈদিক গায়ত্রী উপাসনা কি জগদ্ধাত্রীপূজায় আকারিত? জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রাচ্য নব সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ইন্দ্র জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তির দর্শন-ফলে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন।

মুক্তি দাও

শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার

প্রভু, অনেক দিয়েছো, দেখেছো কেবলই মোরে
অনেক দিনের অনেক ঋণের ভোরে।

সাধ মিটে গেছে : ভিক্ষুক দুটি-হাত
মাথায় ঠেকাই, জানাই গো প্রণিপাত।
আর নয় প্রভু, নয় জঞ্জাল জমা,
সব কিরে নিয়ে দাও চূড়ান্ত ক্ষমা।
তুমি দাতা, তুমি দয়াল, তাইতো ডাকি,
ক্ষমামুক্তির মন্ত্রটি দেবে নাকি?

ক্ষিতি অপ্, তেজ মহাব্যোম মহাবায়ু,
তুমি ঋণ দিলে, তাই দেহ পরমায়ু।
তোমারই প্রদীপ তোমারই জ্বালানো শিখা,
ভুলে যাই,—একি নির্বোধ অহমিকা!

ইন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবী আস্বাদন,
কতো হ'লো হায় তবু ভরে না ত' মন।
ভেঙে চুরমার করে দাও সব কিছু,
আর ছোটা নয় আশেপাশে পিছু পিছু।

খ্রীষ্টবাণী-লক্ষয়ন

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

গীতায় লিখিত অবতারবাদ অনুসারে যীশু-খৃষ্টকে ধর্ম সংস্থাপক অবতারপুরুষ বলা যায়। যুগপ্রয়োজন অনুসারে যে কোন দেশে যে কোন কালে অবতারের আবির্ভাব হ'তে পারে। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় এ পর্যন্ত যত অবতার পৃথিবীতে আগমন ক'রেছেন, এশিয়া মহাদেশই তাঁদের সকলের জন্মস্থান। যীশু-খৃষ্টের জন্মকাহিনী অনন্যসাধারণ, এ বিষয় ল'য়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত না হ'য়ে বাইবেলে তাঁর যে সুমহান বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ আছে তার সার-সংগ্রহে যত্নবান হব। দেখা যায় তাঁর বাণীর সহিত হিন্দুধর্মের স্থলবিশেষে সাদৃশ্য আছে; বাণীগুলির উল্লেখপ্রসঙ্গে—উভয় ধর্মের সাদৃশ্য দেখানর চেষ্টাও প্রবন্ধ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রীযীশুর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি এইরূপ :

(১) "নিরহঙ্কার ব্যক্তিগণই ধন্য, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই।" হিন্দুধর্মও অহঙ্কারকে হেয় বলেছে। জ্ঞানী ব্যক্তির অহঙ্কার থাকতে পারে না, জ্ঞানের অভাবই অহঙ্কারের মূল। অহঙ্কার সুরাপান তুল্য ঘৃণ্য।

অহঙ্কারং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবং।
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥

(২) "দয়ার্দ্র ব্যক্তিগণই ধন্য, কারণ তারাই করুণা লাভ করবে।" হিন্দুধর্মে দয়াকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হ'য়েছে। 'দয়া ধরমকা মূল হ্যায়।' বৈষ্ণবধর্মে উল্লিখিত হ'য়েছে 'জীবে দয়া, নামে রুচি' নাম-সংকীর্ত্তন ইহাই ধর্মের সার। বাস্তবিকই দয়াহীন ব্যক্তির হৃদয়ে পশু-সংস্কার খুবই বলবান।

(৩) "পবিত্রহৃদয় ব্যক্তিগণই ধন্য, কারণ তারাই ঈশ্বরের দর্শন পাবে।" পবিত্রতা হিন্দু ধর্মের মূল মন্ত্র। কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা কেবল ধর্মাচরণ নহে, সংসারজীবনেও উহা অত্যাবশ্যক।

(৪) "যদি কোন ব্যক্তি তোমার দক্ষিণগণ্ডে আঘাত করে, ত তার প্রতি বাম গণ্ড ফিরিয়ে দেবে।" ইহা অহিংসাবাদের শ্রেষ্ঠতম উপদেশ। হিন্দুধর্মে প্রাথমিক স্তরে যে যমনিয়মাদির অভ্যাস করতে হয় 'অহিংসা' উহাদের অন্যতম। 'অহিংসা সত্যমস্তেয় অপরিগ্রহাঃ যমাঃ।' তবে দুঃখের বিষয়, যারা যীশুখৃষ্টের প্রবর্তিত খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন ক'রেছেন তাঁদের অনেকেই তাঁর এই মহান উপদেশের ঠিক বিপরীত অনুষ্ঠান করেন।

(৫) "তোমার শত্রুকেও ভালবাস; যে তোমাকে অভিসম্পাত দেয়, তাহাকে আশীর্বাদ কর; যে তোমাকে ঘৃণা করে, তার হিতসাধন কর; যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর। এইরূপ করলে তুমি তোমার স্বর্গীয় পিতার উপযুক্ত হ'তে পারবে, কারণ তিনি সৎ ও অসৎ উভয়ের জন্যই সূর্যের উদয় ঘটান এবং ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায় আচরণ-কারী সকলের জন্যই বৃষ্টি দান করেন।" হিন্দু-ধর্ম, ইহা বাদেও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আত্মাকে দর্শন করতে শিক্ষা দেয়। গীতা বলেন :

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

(৬) "তোমার পিতা যেমন পূর্ণ, তুমিও সেইরূপ পূর্ণ হও।" হিন্দু বলেন পূর্ণ হ'তে হ'লে আত্মজ্ঞ হ'তে হবে। পাশদ্বারা বদ্ধ হ'লে ব্রহ্ম জীব হন এবং পাশ মুক্ত হ'লেই ব্রহ্ম শিব হন। অতএব এই উপদেশটী অদ্বৈত-বেদান্ত-মূলক।

(৭) "ভিক্ষাদানকালে তোমার দক্ষিণ হাতের

কাজ যেন তোমার বাম হাত না জান্‌তে পারে।" হিন্দুধর্মও দানাদি কার্য গোপনে নিষ্পন্ন করারই উপদেশ দেয়। নাম ও খ্যাতিলাভ করা কখনও দানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

(৮) "প্রার্থনাকালে নির্জন কক্ষে প্রবেশ করবে ও গোপনে পিতার নিকট প্রার্থনা করবে; কারণ তিনি গুপ্তভাবেই অবস্থান করেন। তোমার পিতা গোপনে সমুদয় দর্শন ক'রে প্রকাশ্যে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।" হিন্দুধর্মে নির্জন স্থানে সাধনার উপদেশের সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়।

(৯) "অন্ন, পানীয় ও বস্ত্র আমি কোথায় পাব, এরূপ চিন্তা করবে না। কারণ পরম পিতা জানেন যে এ সকলের আবশ্যকতা আমাদের আছে। প্রথমে ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা কর, দেখবে তোমার সমুদয় অভাবই দূর হ'য়ে যাবে। অতএব আগামী কল্যের চিন্তা করো না।" এটী ঈশ্বর-নির্ভরতার কি সুন্দর উপদেশ। গীতাতেও আছে:

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

(১০) "প্রেরিত-পুরুষ নামধারী মিথ্যাচারী ব্যক্তিগণ হ'তে সাবধান। তাঁরা বস্তুতঃই ভিতরে নেকড়ে বাঘ, কিন্তু বাহিরে মেষের পোষাকে বা ছদ্মবেশে বাহির হয়। তারা অনেককে প্রতারিত করে।" বর্তমানে আমাদের দেশে ঐরূপ অবতার-পুরুষের ছড়াছড়ি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এঁরা কে প্রকৃত ঈশ্বর-অবতার এবং কে নকল অবতার সরলমতি লোকগণের পক্ষে তা বুঝে লওয়া ভার। যদি কোন অকপট ধর্মপিপাসু ব্যক্তি ঐরূপ কপটাচারীর সংস্রবে আসে ত সে জীবনে কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে সক্ষম হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতাররূপে জগতে যো হওয়ার পর হ'তে বহু বহু অবতারের আবির্ভাব হচ্ছে; হয়ত একটু যোগ বিভূতির অধিকারী হয়েই কোন কোন সাধক নিজেকে অবতার বলে প্রচার করেন। বৎসরে বৎসরে ভগবানের একাধিক অবতার হওয়া সম্ভব হয় কি?

(১১) "যতক্ষণ বর সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণ বরযাত্রীদের কি দুঃখের কোন কারণ থাকে?" অর্থাৎ যতক্ষণ বররূপী যীশু সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ বর-যাত্রীরূপী তাঁর আশ্রিত সন্তানগণের কোন দুঃখ থাকতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর সন্তানগণকে অনুরূপ একটি বাণী বলেছিলেন। স্বয়ং ভগবান যখন অবতার রূপ ধারণ ক'রে আসেন এবং যেহেতু তিনি আনন্দস্বরূপ, এইজন্য তাঁর আশ্রিত ও কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানগণের কোন দুঃখই থাকতে পারেনা।

(১২) "পুরাতন পোষাকে কেহ নতুন বস্ত্রের তালি দেয় না অথবা পুরাতন বোতলে নতুন মদ্য রাখে না। নতুন বোতলে নতুন মদ্য রাখ্‌লে উভয়েই সুরক্ষিত হয়।" ইহার অর্থ—উন্নত ও পবিত্র আধারে জ্ঞান-উপদেশ কার্যকরী হয়, অপবিত্র আধারে সদুপদেশ কোন কার্যকরী হয় না। ভারতীয় আচার্যগণ আধার অনুসারেই উপদেশ দান করেন।

(১৩) "যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে; যার নাই, তার নিকট যে সামান্যটুকু আছে, তাহাও কেড়ে লওয়া হবে।" অর্থাৎ পুরুষকার-পরায়ণ ব্যক্তিই কৃপালাভ করবে। যে ব্যক্তি চেষ্টাপরায়ণ নয়, তাকে যে কৃপাটুকু দেখান হ'য়েছিল, সেটুকুও আর তাকে দেখান হবে না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পুরুষকার সম্বন্ধে সুন্দর বিচার আছে।

(১৪) যদি তোমার একটি সরিষার মত বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থাকে, তবে এই পর্বতকেও এখান হ'তে সরে যেতে বললে, সে সরে যাবে। তোমার নিকট কিছুই আর অসম্ভব থাকবে না।"

ভগবদ্বিশ্বাস সম্বন্ধে এই উপদেশটী বাস্তবিকই অতি মহান। বিশ্বাস হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ।

(১৫) "যদি তুমি শিশুসন্তানে পরিণত না হও, ত তুমি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রে জগৎকারণকে মাতৃভাবে উপাসনায় সাধককে হ'তে হয় মায়ের কোলের শিশু—সরলতা ও পবিত্রতার প্রতীক স্বরূপ। মাতৃভাবে উপাসনা সাধকের হৃদয়কে এরূপ করে দেয় যে ঐ সাধকের শুদ্ধ অন্তঃকরণ বা আত্মা শুদ্ধ স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যায়। প্রভু যীশুর এই উপদেশটি অতি মধুর।

(১৬) "যখন দুইজন কি তিনজন ভক্ত আমার নামে একত্রিত হয়, তখন আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি।" এ যেন ঠিক হিন্দুশাস্ত্রের 'মদ্ভক্তঃ যত্র গায়ন্তে তত্র তিষ্ঠামি, নারদ।' এই বাণীটীর মত।

(১৭) "এক ভিন্ন সৎ আর কিছুই নাই এবং তাহাই ভগবান।" এটী হিন্দুদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর ন্যায়—যেন একটি বেদবাক্য।

(১৮) "তোমার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা কর এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস।" হিন্দুমতে এই ভালবাসার কারণটিও বিশ্লেষিত হ'য়েছে, সেটী এই যে মানুষকে মানুষবুদ্ধিতে না দেখে তাকে আত্মবুদ্ধিতে দেখলে তাকে ভাল না বেসে থাকার উপায় নেই। কারণ আত্মা ভিন্ন মানুষ আর কিছুই ভালবাসে না। প্রতিবেশীর মধ্যে প্রেমস্বরূপ সেই আত্মা, তাই তাঁকে ভালবাসতে হবে। শুধু মানবতার দিক দিয়ে ভালবাসা প্রকৃত প্রেম নয়। 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

(১৯) "সমুদয় বিক্রয় ক'রে যা পাও তা গরীবকে দান কর এবং আমার অনুকরণ কর।" এই ত্যাগের উপদেশ হিন্দুধর্মে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। দুঃখের বিষয় যারা খৃষ্টের ভক্ত তাঁরা এই উপদেশে কর্ণপাত করেন না।

(২০) "আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় ক'রে বলছি ধনীলোকের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ দুর্লভ। একটী উটের পক্ষে সূচের ছিদ্র-মধ্য দিয়া যাওয়াও সম্ভব তবু ধনীর পক্ষে ঈশ্বর পাওয়া সম্ভব নয়।" বাস্তবিকই ধনমদে গর্বিত ব্যক্তি ত বিষয়ের আনন্দেই ভরপুর, সে কি প্রকারে ঈশ্বর লাভ করতে পারে?

(২১) "তুমি, কেবলমাত্র তোমার প্রভু সেই একমাত্র যিনি ঈশ্বর, তাঁকেই পূজা করবে, অপর কাহাকে নয়। কেবল ঈশ্বরকেই ভালবাসবে।" এই সুন্দর উপদেশটীর মর্ম এই যে ঈশ্বর ভিন্ন বিষয়ে যেন তোমার আসক্তি না জন্মায়।

(২২) হিন্দুধর্মেও এই কথাই বলেন। যে শেষ পর্য্যন্ত সব সহ্য করে যাবে, সেই ব্যক্তিই উদ্ধার লাভ করবে।" অর্থাৎ সংসারের প্রতিকূল অবস্থায় চিত্তকে চঞ্চল করলে চলবে না। গীতাকার বলেন—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে॥

(২৩) "এখন তুমি যে অশ্রু বিসর্জ্জন করছ, তুমিই ধন্য; কারণ তুমিই হাসবে। যে এখন হাসে, সে-ই দুর্ভাগ্য, কারণ তাকে ক্রন্দন করতে হবে।" অর্থাৎ যে ভগবৎ-প্রেমে অভিভূত হ'য়ে চোখের জল ফেলে, সে অনন্ত আনন্দের অধিকারী হবে এবং যে বিষয় সুখে মজ্‌গুল হ'য়ে হাসতে থাকে, তাকে অনন্ত আনন্দের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে থাকতে হবে ও বিষয় সুখলাভের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপ দুঃখ ভোগ জন্য ক্রন্দন তার পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহাও যেন হিন্দুধর্মের শিক্ষারই অনুরূপ।

"প্রারম্ভে শব্দমাত্র ছিল এবং ঐ শব্দ ঈশ্বরের সহিত ছিল এবং ঐ শব্দই ঈশ্বর।" এখানে

ঈশ্বর ও শব্দ বা মায়াশক্তির সমষ্টিরূপ—সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হ'চ্ছে—একমাত্র যিনি কল্পারম্ভের পূর্ব্বে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন।

(২৬) "দ্বিজত্ব লাভ বা দীক্ষিত না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না।" অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট হ'তে শিষ্যে যতদিন না শক্তি সঞ্চারিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঈশ্বর লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ও আধিকারিক পুরুষকে গুরুরূপে গ্রহণ করবে—ইহা হিন্দুধর্ম্মের মত।

"রক্ত মাংস হ'তে রক্ত মাংস উৎপন্ন হয়, আত্মা হ'তে আত্মা উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরকে আত্মা-রূপে উপাসনা করবে।" জড় ও চেতনের এই বিভাগটী হিন্দুধর্ম্মানুগত।

(২৭) "যে পুত্রকে সম্মান করে না, সে পিতাকেও সম্মান করে না। যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়। আমি জগতের আলোক স্বরূপ। যে আমার অনুসরণ করে তাকে অন্ধকারে বিচরণ করতে হয় না। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা আমার মেষ নও। আমার মেষ আমার স্বর শ্রবণ করে এবং আমি তাদিগকে চিনি। যে আমার আশ্রিত, তাকে আমি অনন্ত জীবন দান করি। আমি এবং আমার পিতা এক। পিতা আমাতেই আছেন ও আমি তাঁতেই আছি। আমাকে আশ্রয় গ্রহণ না করলে কেহই পিতার নিকট যেতে পারেন না। যে আমাকে দর্শন করেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে। যে আমাকে ভালবাসে, আমার পিতাও তাকে ভালবাসবেন। তোমরা ভৃত্য—ইহা আমি বলি না, কারণ ভৃত্য প্রভুর কার্য্যাবলী জেনে পায় না, কিন্তু—আমি তোমাদিগকে বন্ধু বলে আহ্বান করছি, কারণ আমি আমার পিতা সম্বন্ধে—যাহা শুনেছি, তার সবই তোমাদিগকে বলেছি। আমিই তিনি।"

প্রভু যীশু তাঁর স্ব-স্বরূপ সম্বন্ধে এই বাক্যগুলি বলেছেন। আমরা পরম পিতাকে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মকে জানতে পারি না কেবল মাত্র তাঁর পুত্রকে জানতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অভেদ তাঁর যে শক্তি সেই শক্তির এক বিকাশ যীশুখৃষ্ট। যীশু তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে জীব উদ্ধার জন্য তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। অধিকারী হিসাবে তিনি কাহাকেও দ্বৈতবাদাত্মক উপদেশ দিয়েছেন, আবার উচ্চ অধিকারীর নিকট—অদ্বৈত তত্ত্ব-ও প্রকাশ করেছেন। তিনি যে—'আমিই তিনি' বলেছেন ইহা বেদান্তের চরম বাক্য 'সোঽহং' সদৃশ বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-সদৃশ। অতএব ইহা নিঃসংকোচে বলা যায় যে প্রভু যীশু পৃথিবীতে আবির্ভূত নরত্রাতাগণের অন্যতম।

সুন্দর

বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

মনে ছিল আশ তোমারে শোনা'ব—
আমার হৃদয় গীতি
বহু নিশীথের সঞ্চিত গান
বহুদিবসের প্রীতি।

সমুখে তোমার দাঁড়ায়ে আজিকে—
নির্ব্বাক কবি আমি,
বিমুগ্ধ প্রাণ কহে বার বার—
'এতো সুন্দর-তুমি'?

যীশুখ্রীষ্ট

শ্রীশান্তিময় ঘোষ

ধন্য ছিল যার শোণিতে, শোণিতে,
প্রতিধমনীতে ইষ্ট
দীন দুনিয়ার সবার লাগিয়া,
সে তুমি মহান্ খ্রীষ্ট।
জগদীশ্বর—তুমি ভগবান
পাপী, তাপী জনে করিবারে ত্রাণ
এলে মরলোকে—অমর মহান্
নারায়ণ, নরেশ্রেষ্ট।
প্রেমের প্রভাত-ছিল তব দেহ
পাতকীর লাগি অযাচিত স্নেহ,
সহজিয়া প্রীতি—দেবতার গেহ
ও হৃদয় প্রেমাবিষ্ট।

ত্যাগের তড়াগ তরুণ কান্তি,
তহুসে তপ্ত সোণা
মধুর মু'খানি মন্দার জিনি,
ওষ্ঠে হাসিটি বোনা।
চক্ষে নীরব নিবিড় মমতা
বক্ষে শান্তি, সখা-সমতা,
ধর্ম-সর্ব, কর্মে ক্ষমতা,
ভাষা, মণিকা-কণা।
সদগুরু তুমি—সচ্চিদানন্দ,
বিশ্বপ্রেমের প্রণব ছন্দ,
নিখিল-মানব-মানস-বন্ধ
ঘুচাইলে মহামনা।

অন্ধ আতুরে, ভিখারী, ফতুরে
সম্মুখে সাদরে আনি
ত্যাগের মন্ত্র দিতে কানে কানে,
ভোগের যন্ত্রে হানি।
কহিতে সরল শিশুর ভাষায়
"যে আঘাত করে, হেনো না'ক তায়,
প্রেমপাশে বাঁধি দাও স্নেহ-ছায়
প্রীতির পরশখানি,
ভালবাসা দিয়ে জিন' ফণিনীরে
ভালবাসা দিয়ে কিন' ধরণীরে
ভালবাসা দিয়ে ভাসো অবিনীরে
—নাশি পরাজয় গ্লানি।"

• •

হায়! মোহান্ধ, বিবেক-বন্ধ,
নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রমনা.—
নিখিলানন্দ তোমারে মন্দ
কহিল কয়েক জনা;
টানিয়া আনিল বধ্যভূমিতে
লৌহ শলাকা লাগিল চুমিতে
ঐ বরাঙ্গ; হাসিয়া কহিলে,
"ভগবন্ কোরো ক্ষমা!
"ক্ষমিও তাদের অজ্ঞান তা'রা
ঈর্ষায় আজি হ'ল দিশেহারা;
আমার মৃত্যু আনুক অমৃত,
প্রেম প্রীতি অনুপমা!"

মানুষ-দেবতা কালীনাথ

শ্রীবিজয় গোপাল বসু

যে কাজ করলে দশজনের উপকার হয়, দশজনে আনন্দ পায় সেই কাজই ভাল কাজ। সেই রকম কাজ করতে করতে মানুষ আর মানুষ থাকেনা—দেবতা হয়ে যায়।

স্বর্গের দেবতার দেখা পাওয়া যায় না, অনেক সাধা-সাধনা করলে তবে তাঁর কৃপা লাভ করা যায়। মানুষ-দেবতাকে দেখা যায়; দেখতেও হয়ত বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না। চোখোচোখি একবার দেখা হ'লেই পাপ দূরে চলে যায়। যা ভাল, তা না চাইতেই লাভ হয়।

প্রায় দু'শ বছর হ'তে চললো, টাকির জমিদার কালীনাথ রায় বেঁচে ছিলেন। সৎ কাজের জন্য লোকে তাঁকে দেবতা বলে জানত। তখনকার দিনে সাধারণ লোকেরা ভুলক্রমে 'টাকি'কে 'কালী' বলত', 'কালী'কে 'টাকি' বলত। যেমন "কালী টাকিনাথ বাবুর বাড়ি গেল।"

একবার নিধে হালদার নামে একটি চাষি রাগের ভরে তার বউএর কান-পিঠে এমন এক ধাবড়া মারে যে তাতেই তার মরণ হ'য়ে যায়। নিধে তখন হ'য়ে পড়ল খুনি মামলার আসামী। হাকিমের বিচারে হ'ল তার ফাঁসির হুকুম!

যে সমস্ত আসামীর ফাঁসির হুকুম হয় তাদের ওপর সরকারের ব্যবহার খুবই মোলায়েম হয়ে পড়ে। তাদের ভাল খাওয়ান হয়, ভাল পরান হয়। আপনার জনদের সহিত দেখা করান হয়। তাদের ইচ্ছেমত কাজ করতে দেওয়া হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুনা যায় মহারাজ নন্দকুমার জেলখানায় ফাঁসির দিন পর্য্যন্তও নারায়ণ পূজা করতে পেরেছিলেন আর কানাইলাল দত্ত 'শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা' পড়তে পেরে ছিলেন।

মরণ কালে পুণ্যকাজ করলে পরকালের পথ পরিষ্কার হয়, স্বর্গে যেতে কষ্ট হয় না। তাই যখন আর বাঁচবার আশা থাকেনা, তখন যার মরণ হবে তাকে গঙ্গাতীরে আনা হয়, সে সুবিধা না থাকলে তার কাছে ব'সে নানা রকম ধর্ম্মবই পড়া হয়, হরিকীর্ত্তন করা হয়। নিধে হালদার পূজো করতে জানতনা, পড়তেও জানত না। জেলের মধ্যে কেই বা তাকে রামনাম শোনায়। তাই সে অনেক ভেবে চিন্তে মানুষ-দেবতা কালী নাথকে দেখতে চাইলে। কালীনাথ একজন মস্তবড় লোক। তাঁকে ত আর জেলখানায় ডেকে আনা যায় না। তাই আসামীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁর বাড়িতে। তিনি তখন তেল মাখছিলেন নাইবার জন্য। চাকর গিয়ে যখন বললো যে একটি ফাঁসির আসামী তাঁকে দেখতে এসেছে, তখন তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো। তিনি উঠে পড়লেন এবং বাইরে এসে আসামীকে দেখা দিয়ে তার পরিচয়াদি নিলেন। ফাঁসি হবার তখনও তিন দিন বাকি ছিল।

সে যুগে রেল গাড়ি হয়নি। কালীনাথ পাল্কী চড়ে চ'লে এলেন কলকাতায় বড় লাট বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তাঁর নাম লাটবাহাদুর আগেই শুনেছিলেন। তাঁকে তিনি খুব খাতির যত্ন ক'রে বসতে বললেন আর কালীনাথের মত লোক টাকি থেকে তাঁর কাছে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

কালীনাথ তখন তাঁর কাছে একটা জীবনের দাম কত জানতে চাইলেন। লাট বাহাদুর যখন বললেন একটা জীবনের দাম লাখ টাকা! তখন সেই সুযোগ নিয়ে কালীনাথ বাবু লাখ টাকা দিয়ে

ফাঁসির আসামী নিয়ে হালদারকে কিনতে চাইলেন।

বড়লাট বাহাদুর যা করেন তার ওপর কথা বলবার কেউ নেই। একথা কালীনাথ জানতেন।

বড়লাট বাহাদুর তাঁর দরবার মঞ্জুর করলেন। কালীনাথের কাছে লাখ টাকা একটা খুব বড় কথা নয়। তাঁর নজর যেমন বড় ছিল, হাতও তেমনি দরাজ ছিল, টাকার থলিও তাঁর তেমনি বড় ছিল। তিনি লাখ টাকা আমানত করলেন। নিমে হালদার জেলখানা থেকে ছাড়া পেলো। সে এতটা কিন্তু ভাবতে পারে নি।

মরণ সময় মানুষ-দেবতার মুখ দেখলে মরণ দূর হয়, পরমায়ু বেড়ে যায়।

বিচার ও বিবেক

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচার সহ "সৎ" বস্তু প্রতীতির দ্বারা "অসৎ" বস্তুর অনিত্যত্ব প্রমাণকেই নিত্য-নিত্য বস্তুবিবেক বলে। 'সৎ' বস্তু ব'লতে শুদ্ধ চৈতন্য ও অসৎ ব'লতে জড় বা অজ্ঞান। একমাত্র চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। ভারতীয় দার্শনিকগণ চৈতন্যকে তাই সচ্চিদানন্দ, কূটস্থ, নিত্য, পরব্রহ্ম বা পুরুষ আখ্যা দিয়েছেন। সৎ বা জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, কিন্তু অসৎ বা জড় পরপ্রকাশ। উভয়ে পরস্পর বিরোধী হলেও, অন্ধকার থাকার জন্য যেমন আলোকের সমাদর হয়, জড় বস্তু থাকার জন্য সেরূপ জ্ঞানের মহিমা আদরণীয়। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র দেখা যায়। যে বস্তু যার অজ্ঞানবশতঃ প্রতীত হয়, উহা তারই জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয়। রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান, অজ্ঞানতাই তার মূলে; জ্ঞানদ্বারা সেই 'সর্প' প্রতীতির নাশ হয়। ভগবান বাদরায়ণ বলেছেন, "জগতের সকল বস্তুতেই 'ভাব' অর্থাৎ চেতনস্বরূপ একটি সৎ-বস্তু আছে; চেতনে ভাব বা সত্তা পরিস্ফুট, জড়ে তা স্ফুট নয়।" জ্ঞানের অভাবের জন্যই অনিত্য জগতকে নিত্য ব'লে জ্ঞান হয়, আর তার নিবৃত্তির উপায় জ্ঞানের তথা বিবেক বা বিচারের অভ্যাস। জগৎ প্রকৃতপক্ষে আমাতে নাই, আমি ব্রহ্ম, আর এই জ্ঞানই অজ্ঞান নাশক। চৈতন্য ও জ্ঞানের তিনকালে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে) বাধ হয় না; কারণ চৈতন্য বা জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয় না। চৈতন্যকে তাই অবাধিত বলা হয়। আর যার তিনকালে প্রকৃত সত্তা নাই তা অসৎ, যেমন শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ইত্যাদি। অসৎ বা অজ্ঞানের নাম মায়া। মায়া জ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়; সুতরাং তা সৎ থেকে বিলক্ষণ, অর্থাৎ সৎও নয়, অসৎও নয়, আবার সদসৎও নয়, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মায়া ও তৎকার্য্যগুলি প্রতীত হয়। মায়া ও তার কার্য্য-সমূহ তাই অনিত্য। যেরূপ আত্মাকেও যদি কেউ জ্ঞানস্বরূপ না ব'লে জড়বস্তু বলে, তাহলে তাও ঘটাদির ন্যায় অনিত্য প্রতিপন্ন হবে, এবং আত্মা অনিত্য হ'লে জীবের মোক্ষ-লাভেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। অতএব বুঝা গেল, জ্ঞানই একমাত্র সত্তাদির কারণ, জ্ঞানকে জড় বা অনিত্য বলা অসঙ্গত। মোটকথা চৈতন্যব্যতিরিক্ত সব কিছুই অনাত্ম। অনাত্ম

বস্তুগুলি সমস্তই অনিত্য, সুতরাং মিথ্যা। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ, সুতরাং জড় থেকে তা বিলক্ষণ ও চিৎ। আত্মা আনন্দস্বরূপও, তারই জন্য বিষয়ানন্দে আনন্দের ভান হয়। পুনরায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নয়,—একই বস্তু; কেননা প্রকাশ বা চিৎস্বরূপ ছাড়া কোন বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয় না, এবং সত্তা থাকে বলেই তা অনুভূতির বিষয় হিসাবে আনন্দের বস্তুরূপে প্রতিভাত হন। তাই সতেরই চিৎ, চিতেরই আনন্দ, তিনটি একই বস্তু। তারা আত্মার গুণ নয়, কেননা যদি আত্মার গুণ হ'ত তাহলে একটি আর একটি থেকে ভিন্ন হ'ত, কিন্তু তারা আত্মসত্তা থেকে অভিন্ন হওয়ায় পরস্পর ভিন্ন নয়। আবার ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু; কারণ ব্রহ্ম যদি আত্মা থেকে ভিন্ন হ'ত, তাহলে তা ঘটাদির মতো অনাত্মা, জড় ব'লে গণ্য হ'ত। ব্রহ্ম আত্মা থেকে অভিন্ন হওয়ায় আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ। 'বৃহত্বাৎ ব্রহ্মেতি', অর্থাৎ যাঁর চেয়ে বড় কিছুই নাই, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে; ব্রহ্মকে জ্যোতির্ময় বলে' আবার কল্পনা করা হয়েছে। কেননা উপনিষৎ বলে, ব্রহ্মের প্রকাশেই সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাদি সেই ব্রহ্মজ্যোতির কাছে নগণ্য। যেমন কঠোপনিষদে ২।২।১৫, আমরা এর প্রমাণ পাই,

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতিচ শ্রুতেঃ।'

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশ করতে পারে না, এবং চন্দ্র, তারকা ও বিদ্যুৎ সমূহও প্রকাশ করতে পারে না, অগ্নির তো কথাই নাই। সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আছেন ব'লে সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান হয় এবং তার প্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়।

এখন আত্মাকে উপলব্ধির উপায় কি? শ্রুতিতে আত্মোপলব্ধির তিনটি উপায় আছে। উপলব্ধির অপর নাম 'দর্শন'। তাই আত্মদর্শনকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি, যথা শ্রবণ-দর্শন, মনন-দর্শন ও নিদিধ্যাসন-দর্শন। বৃহদা: ২।৪।৫-আমরা পাই, —

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। মৈত্রেয়ি, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" অর্থাৎ ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করবে, শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ মত আত্মার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করবে, তর্কের সাহায্যে উহার বিচার করবে এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে ধ্যান করবে। আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে সমস্ত জড়জগৎও জ্ঞাত হওয়া যায়। এখানে জড়জগতের জ্ঞান বলতে, যিনি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞান। বিচার দৃষ্টির সহায়ে আত্মদর্শন ও তার উপায় বর্ণনা করাই দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রবণের ফলে প্রমাণবিষয়ক (অসম্ভাবনা) দোষ দূর হয়, এবং মননের দ্বারা প্রমেয়ের (জ্ঞাতব্য বস্তু ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয়ক) সন্দেহ দূর হয়, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সত্য, কিংবা ভেদই সত্য—এরূপ যে সন্দেহ তাই প্রমেয়বিষয়ক সন্দেহ (বা প্রমেয়বিষয়ক অসম্ভাবনা দোষ), তা মননের দ্বারা দূর হয়। নিদিধ্যাসনের সহায়ে বিপর্য্যয় বা বিপরীত ভাবনা দূর হয়। দেহাদি সত্য এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য, এই প্রকার জ্ঞানই বিপরীত ভাবনা নামে খ্যাত। বিপর্য্যয়, এরই নামান্তর এবং অসম্ভাবনা বলতে সংশয় বা সন্দেহ বুঝায়। সুতরাং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনটিই অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার নাশক। এই অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। অতএব জ্ঞানের যে প্রতিবন্ধক তার নাশ দ্বারা শ্রবণাদিকেই

জ্ঞানের হেতু বলা হয়। এখানে জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞানই লক্ষিত হয়।

আসলে জীবের স্বরূপ কি? জীব বল্‌তে বুঝায় দেহী, দেহ নয়। দেহ উৎপন্ন বস্তু ব'লে জড় বা অনিত্য, কিন্তু দেহী নিত্যবস্তু, যা চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যই ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং জীব বা দেহী ব্রহ্মস্বরূপ। মলিনসত্ত্বগুণবিশিষ্ট অজ্ঞান ও সেই অজ্ঞানে পতিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব এবং উহার অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য এই তিনটির মিলিত অবস্থাকে জীব বলে। এই জীবই কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করে। মানুষ যখন ভেদভাব ত্যাগ ক'রে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। উপনিষদের ঋষি তাই উদাত্ত কণ্ঠে ব'লেছেন:

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

অর্থাৎ তুমি অমৃতের সন্তান। সুতরাং একথা সত্য যে জীবই স্বরূপে ব্রহ্ম।

পরিশেষে বক্তব্য যে, সূক্ষ্ম বিবেক ও বিচারের দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক। নিত্যানিত্য বিচারের সাহায্যে সত্য-শিব-সুন্দরের উপলব্ধি হয় ও মানবজীবনের তা'ই কাম্য। আত্মা অবিনাশী এবং অচল, সুতরাং নিত্য; জগৎ তার প্রতিকূল স্বভাবাপন্ন অর্থাৎ বিনাশী, চঞ্চলস্বভাব, সুতরাং অনিত্য—এরূপ যে জ্ঞান, তা'কে বিবেক বলে। এই বিবেকই সকল সাধনার মূল। নিত্য 'সৎ' পদার্থই আত্মা বা শরীরী। সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অবিনাশী বিভু, যা পরমতত্ত্ব তা আত্মা, এবং যা বিনাশশীল তা দেহ। এই দেহ বল্‌তে শুধু স্থূলদেহকে বোঝায় না, মৃত্যুর পর যা সূক্ষ্মদেহ তাকেও বোঝায়; কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই দুই দেহই নাশপ্রাপ্ত হয়। এমন কি সূক্ষ্মদেহের মূলীভূত কারণদেহেরও নাশ অবশ্যম্ভাবী। কেবল নাশ নাই পরমতত্ত্ব আত্মার। আত্মার নিত্যতা পারমার্থিক; কারণ ইহা সর্ব্বপ্রকারে অপরিচ্ছিন্ন, অবিদ্যা ও অজ্ঞানের জন্য আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য ব'লে মনে হয়। আত্মানন্দ উপলব্ধি হ'লে বিষয়ানন্দ তুচ্ছ বোধ হয়। এই আনন্দ কি তা মুখে প্রকাশ করা যায় না, তা অব্যক্ত ও নিত্য। আচার্য্য শঙ্কর সেই আনন্দের পরিচয় দিয়ে ব'লেছেন,—

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

অস্তিত্ব

শ্রীকালীপদ কোঙার

আকাশের আধখানা মেঘের মধ্যেও
তুমি নাকি আছো,
আছো তুমি বৃক্ষলতা, পর্ব্বতে—
সকল স্থানে আছো
তুমি সর্ব্বভূতাশ্রয়স্থিত পরম পুরুষ।

আমাদের সন্দেহ সঙ্কুল মনে প্রশ্ন জাগে:
তোমাকে তো দেখিনি কোনদিন,
উপস্থিতি তোমার কেমনে স্বীকার করি?
'অবাঙ্‌মনসোগোচর' কোন বস্তু
থাকতে কি কখনো পারে?

জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি কেমন করে হবে জানিনে,
যদি তুমি থাকো
তবে এর উত্তর তুমিই দিও, ওগো ভগবান,
শুধু বলো, বলো: আমি আছি।

মহাকবি হুইটম্যান্

শ্রীমৎ পুরাণ পরমপন্থী

আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত মরমী কবি ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান্, লংআইল্যাণ্ডের হান্টিংটন্ নামক স্থানের নিকট একটি খামারে ৩১শে মে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কয়েক বৎসর পরে তাঁর মাতাপিতা ব্রুকলিনে চলে আসেন। তাঁর পিতা কাঠের মিস্ত্রী ছিলেন। হুইটম্যানের সাধারণ শিক্ষা-প্রাপ্তি বার বৎসর বয়সেই শেষ হয়; তাই তাঁকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল প্রেসের ও পত্রিকার কাজ ক'রে ও ব্যক্তিগতভাবে পুস্তকাদি অধ্যয়ন ক'রে। তাঁর সাহিত্য-চর্চা তাই সংবাদপত্রের সম্পাদনার মাধ্যমেই সম্ভব হয়—স্কুল বা কলেজের মাধ্যমে নয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিউ-অরলিন্সে যান ও তথায় কিছুকাল এক সংবাদপত্রের অফিসে কাজ করেন। এই ভ্রমণ ও কাজে তাঁর যথেষ্ট উপকার ও নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জগৎ-বিখ্যাত ক্ষুদ্র কবিতার পুস্তক Leaves of Grass এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথমে এই পুস্তকের কোন গ্রাহক হয়নি এবং প্রশংসাও প্রকাশিত হয়নি। তিনি নিজে বহু লেখকের মধ্যে পুস্তকটি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কিন্তু বিদ্বৎসমাজের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার নিন্দা করেন। একমাত্র তখনকার বিখ্যাত ও লোকপ্রিয় দার্শনিক এমার্সন এই গ্রন্থটি প'ড়ে কবিকে এক পত্রে লেখেন "I find it the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed ...I greet you at the beginning of a great career." কবি এমর্সনের এই বিখ্যাত পত্রটি হুইট্ম্যান্ সব সময়ে বুকে ঝুলিয়ে রাখতেন ও সকলকে দেখাতেন। ধীরে ধীরে Leaves of Grass এর সুনাম চারিদিকে প্রচারিত হয়ে যায় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ও বেশ ভাল বিক্রী হতে আরম্ভ করে—গৃহযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত।

হুইটম্যান্ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হন ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে Drum-Taps নামক দ্বিতীয় কবিতার পুস্তক প্রকাশ করেন। এই কাব্য রচিত হয় আমেরিকার গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে। গৃহযুদ্ধের শেষের দিকে কবি ওয়াশিংটনে গমন করেন ও উভয় পক্ষের আহত সৈনিকগণের হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। একটি চাকরীও পান কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে পুনরায় বন্ধুগণের সাহায্যে অন্য একটি চাকরী পান। ইতোমধ্যে Leaves of Grass এর আরো দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ গদ্য-গ্রন্থ Democratic Vistas প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্বে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি আংশিক-রূপে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'ন। তাঁর শেষ জীবন অত্যন্ত গরীব অবস্থায় ও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটে, নিউ-জার্সিতে অতিবাহিত হয়। এমন কি শেষে পথে পথে বসে তাঁকে নিজের গ্রন্থগুলি বিক্রী ক'রে জীবিকানির্বাহ করতে হয়েছিল। তিনি কিন্তু সর্বদা হাসিমুখে সকল দুঃখ-কষ্ট, অভাব-বেদনা সহ্য ক'রে যান। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হুইট্ম্যানের শেষ রচনা Complete Prose প্রকাশিত হয় এবং এই বৎসরই তিনি পরলোক

গমন করেন। তাঁহাকে কামডেনের হ্যারলিজ্ সমাধি-স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন।

হুইটম্যান ব্যক্তিগত জীবনে কেমন ছিলেন সে কথা লিখতে গিয়ে ডাঃ আর. এম্ বাক্ (Dr. R. M. Bucke) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Cosmic Consciousness-এ লিখেছেন "তাঁর প্রিয় স্বভাব ছিল বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আনন্দে ভ্রমণ করে বেড়ানো এবং গাছ, ফুল, ফল, আলোক, শোভা, আকাশ বাতাস, বিচিত্র বর্ণের ও আকারের পশুপক্ষী অবলোকন ক'রে আনন্দ লাভ করা। তিনি একান্তে কাণ পেতে শুনতেন পাখীর বিচিত্র কূজন ও প্রকৃতির অপূর্ব সঙ্গীত ও তা'তে পবিত্র আনন্দ লাভ করতেন। ফুল তাঁর অতি প্রিয় ছিল—সমস্ত রকমের ফুল।

"তিনি জীবনে কারও নিন্দা করতেন না। সকলকে সমভাবে শ্রদ্ধা, স্নেহ, দয়া করতেন। তিনি তাঁর নিন্দাকারীর বিরুদ্ধ সমালোচনার পক্ষ সমর্থন করতেন। তিনি কখনও মিথ্যা বলতেন না বা শপথ করতেন না। অনুযোগ বা উপরোধ বা অর্থের প্রতি লোভ করতে তাঁকে কোনদিন কেউ দেখিনি। তাঁর ভয় বা বিরক্তি বা ক্রোধ ছিলনা।"

বর্তমানে আবার আমেরিকা ও অন্য অন্য স্থানে নূতন ক'রে হুইটম্যানের জীবন, সাহিত্য, দর্শন, মরমীবাদের চর্চা-গবেষণা ও আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। ইহা পরম আনন্দের কথা। যাঁরা বিশেষরূপে হুইটম্যান সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী তাঁদের আমি Leaves of Grass পড়তে অনুরোধ করি। কিন্তু এই প্রতিভাবান কবি যদি জীবিতকালে জনসাধারণের ও কাব্যরসিক ধনীদের অনুরূপ স্নেহ শ্রদ্ধা দৃষ্টি লাভ করতেন তবে হয়ত আমরা তাঁর কাছে আরো অনেক কাব্য উপহার পেতাম ও এই সব স্মৃতিপূজা সার্থক হ'ত। কিন্তু বহু কবির এরূপ ভাগ্য যে গোবিন্দ দাসের মত অনাহারে শীর্ণ হয়ে বলতে হয় "আজকে আমি পিদের জ্বালায় করছি ছট্‌ফট ; মরলে পরে চিতায় আমায় পড়িয়ে দেবে মঠ!"

হুইটম্যানের কাব্যের মূল সুর এক বিরাট ঐক্যময় বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের অনুগান। বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত সত্তানিচয় তাঁর একান্ত প্রিয়। তাঁর অনুভূতি কেবল বুদ্ধি-বৃত্তি-চালিত ছিলনা ; কারণ তিনি অধ্যাত্ম ও আত্মিক উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি কেবল কবি বা দার্শনিকরূপে খ্যাত ছিলেন না, বিখ্যাত মরমী রূপেও সাধক-জগতে তাঁর স্থান ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বে একাধারে বাস্তবধর্ম ও আদর্শধর্ম, জড় ও আত্মিক উপলব্ধি, ক্ষুদ্র ও বিরাটরূপের অপূর্ব অভিব্যক্তি ও সমাবেশ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর কাব্যে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে অপূর্ব যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

পশুপক্ষী, অরণ্য, তৃণদূর্বাদল, ফুলফল, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ-তারা, ধনী-দরিদ্র, সবই তাঁর কাব্যের অফুরন্ত উৎস-ধারা, নিত্য নূতন সুরের ও কল্পনা-প্রেরণার আবাসভূমি। এমন কোন বিষয় নেই যার ওপর তিনি কবিতা রচনা করেননি। এঞ্জিন, কলকারখানা, গণতন্ত্র, বারবণিতা, মানবদেহ, কৃষক-মজুর, মাতাল, প্রেমিক, নারী, ঈশ্বর, আত্মা ও আরো বহু বিচিত্র বিষয়ে তিনি অমর কাব্য রচনা করেছেন।

সর্বোপরি তাঁর কাব্যে আমেরিকার মৌলিক জীবনবাদের প্রথম সঙ্গীত ও প্রকাশের প্রতীক ও অভিব্যক্তির আমরা সন্ধান পাই। তাই তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয় আমেরিকার দুর্বার শক্তির প্রাচুর্যের গান, তার নব নব সৃজনী-শক্তির কথা,

তার বিরাট দিগন্ত-প্রসারী ভৌগলিক বিশালত্বের কথা, তাঁর নব সৃষ্টি, নব ভাষা ও নব রচনার আভাস। তাই হুইটম্যানকে বলা হয় আমেরিকার গণতন্ত্রের কবি ও উদ্গাতা।

সেই সময়ে আমেরিকা নব জাগ্রত আদর্শবাদের প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। তখন সে নূতন দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সৃজনীযুগের দ্বারে দণ্ডায়মান। তখন সে নব আশা, উন্মাদনা, নবীন ভবিষ্যৎ, সমাজের মূলান্তকারী স্বপ্নে সমাহিত। কবি হুইটম্যান্ আমেরিকার এই মূক আদর্শবাদকে, গণতন্ত্রের স্বপ্ন কল্পনাকে, বিরাট সৃজনী শক্তির ব্যাপকতা ও অব্যক্ত গভীরতাকে ভাষায়, কবিতায়, রূপে, রসে অভিব্যক্ত করেন। কেবল তাই নয়—তিনি আমেরিকার দেশাত্ম-বোধকে ও সমন্বয় এবং ঐক্য-বোধকে সমগ্র আমেরিকার ভিত্তিতে জাগ্রত করেছিলেন।

হুইটম্যান্-কাব্যে কোন বন্ধনের ক্ষুদ্রতা নেই, চিরাচরিত প্রথার, লৌকিক বা সঙ্কীর্ণ আচার ব্যবহারের ভীরুতার, বৃথা সমাজনীতির বা পুরাতনের পুনরাবৃত্তির কোন সন্ধান নেই কাব্যকে পরিম্লান করেনি। তিনি ছিলেন বিরাটত্বের কবি, স্বাধীন জীবন-সংগ্রাম ও প্রাণ-প্রাচুর্য্যের কবি। তাই তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় ভয়হীন, বন্ধনহীন, সৃজনী শক্তির উদ্যম ও বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও দর্শন। হুইটম্যান-কাব্যের ভাষা, ছন্দ, রীতি-নীতি সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি অহংকে ও সমগ্র দেশের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করার জন্য মৌলিক উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, ভাষায় ও ছন্দের।

তিনি "অহং"কে কেন্দ্র করে বহু কবিতা রচনা ক'রেছেন। এই "অহং" কিন্তু স্বার্থ প্রণোদিত "অহং" নয়। ইহা সমগ্র মানব জাতির প্রতীক—তিনি সমগ্র মানবতার কল্যাণ, এবং অনন্ত সম্ভাবনাকে অবলোকন করেছেন এই বিরাট "অহং" এর মাধ্যমে। তাই তাঁর কাব্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের সঙ্গীত অনুরণিত। আলোক ও আশা, সুখ ও শান্তি, জীবন ও প্রেম, শক্তি ও সৃষ্টি সেই কাব্যের অফুরন্ত উৎস ও কেন্দ্র। তিনি অশিব, দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু - অন্ধকার, নিরাশাকে অবহেলা করেছেন।

হুইটম্যানের বিরাট ঐক্যবাদে আমরা স্পিনোজা-দর্শনের চিহ্ন পাই—তাঁর প্রকৃতিবাদে paganism এর আভাসও সুস্পষ্ট। তাই তাঁ'কে কেহ কেহ প্রাকৃতিক ধর্মের (naturalistic religion) উদ্গাতা বলেন। তাঁর রচনায় অধ্যাত্ম মরমীবাদের প্রভাব অধিক। তাঁর অনুভূতিকে বিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ (William James) the religion of healthy mindedness বলেছেন। কারণ তাঁর ধর্মে বা দর্শনে বা অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে নিরাশা, দুঃখ, বেদনা, শোকের আভাস নেই। তিনি সর্বত্র ভগবৎ-মহিমা দর্শন ও অনুভব করতেন—সর্বত্র ভগবানের উজ্জ্বলতা, পবিত্রতা, প্রেম তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নিকট তাই এই বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতি ভগবৎ শক্তি ও মহিমা,প্রেম ও সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত ছিল। আমি এই প্রবন্ধ শেষ করি হুইটম্যানের একটি জগৎ-বিখ্যাত কবিতা উল্লেখ ক'রে। এই কবিতায় তাঁর দর্শনের ও উপলব্ধির মূল সুর ধ্বনিত। বাংলায় অনুবাদটি আমার, ইংরাজী হ'তে :

"হে আত্মা মম!
তোরে আমি করেছি বিশ্বাস……
মোর সাথে করগো বিহার
শ্যাম তৃণ পরে……মোর অতি প্রিয়
তব মধুর সঙ্গীত।

স্মরণে আছে গো মোর কেমনে
এক শুভ নিদাঘ প্রভাতে,
সহসা উদয় হল মম অন্ধ ধিষি
মর-যুক্তি-তর্ক-উর্ধ্বে
মহাশান্তি, প্রজ্ঞান গভীর !
আমি জানি
ঈশ্বরের শুভহস্ত আমার কল্যাণ স্বরূপ,
আমি জানি
ঈশ্বরের শুভ শক্তি মম সহোদর সম,
আমি জানি
জগতের সকল মানব, রমণী,
মোর প্রিয়, ভ্রাতা ভগ্নী —
আমি জানি,
মহা প্রেম রচিয়াছে সৃষ্টির বেদিকা।"

বলিদান

রাজেন্দ্র দত্ত

বন্ধুহারা এ বসুন্ধরায়, অন্ধ এ আঁখি দুটি হারায়
উপরে তাকাই, মম শ্যামরায় ! আটকোশোরের প্রিয় হে !
বিত্ত আজিকে স্বর্গে, রূপায়, সঞ্চিত নাই, নাইকো "উপায়"--
চিত্ত মানে না, কি করি উপায় তুমিই বুঝায়ে দিয়ো হে !

গরীব, দুঃখী, আর্ত, আতুর, এ কবিরে লোকে বলিবে ফতুর,
কিন্তু কী দায় ! মন পরিপূর—ধন সম্পদ পুলকে !
আমি হাসি, খেলি, বেড়াই বাজারে ; মজুরী না পাই মনে ত' রাজা রে !
গ্রাহ্য করি না একে বা হাজারে ; শুনি না যা বলে কু-লোকে !

জানি, আমি নই বন্ধু-বিহীন, নহিলে কি ক'রে চলে মোর দিন,
সকল হারায়ে তোমাতে বিলীন, এই লাভে মরি নাচিয়া !
সবারে সরালে, বুঝালে সকলি ; ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে, গেল চলি
চিনিনু স্বরূপ যা'রে সখা বলি, তথাপি রয়েছি বাঁচিয়া !

বাঁচিয়া রয়েছি, বাঁচিয়া রহিব ; কর্মের ফল আপনি বহিব
যা দিবে মাধব, সকলি সহিব ; তোমারে পেয়েছি, হারায়ে !
দিবসে তপ্ত রৌদ্রে, ক্ষুধায়—কেহ না ডাকিয়া বারেক শুধায়,
নিশীথ শয়নে আঁখি মুদা যায় ; তুমি যে শিয়রে দাঁড়ায়ে !

হয়ত দিনের অগণিত ভীড়ে, তোমায় সময় হয় না করিতে
স্মরিবার, তাই আসো ভাঙা নীড়ে, রাতের গভীরে বুঝি বা
সেই ভরসায়, ভয়ে ও আশায়, ঘুমানো আমার হয়ে ওঠে দায়
রাত্রি আঁধার—আঁখিতারা চায়, হয় ত বৃথাই খুঁজি বা !

ভক্ত চাতক তব আগমন, গভীর রাত্রে নিদ্রা মগন —
সেই অবকাশে সারা প্রাণমন ভরিয়া তোমায় ডাকি গো—
ক্ষীণ এ কণ্ঠ কল-কোলাহলে, দিনের বেলায় যদি নাহি চলে,
তব নিশীথে হয় ত বিরলে পঁহুছিবে দিয়ে ফাঁকি গো !

সব গেছে মোর পূর্ব বিভব, গ্রামোফোন আর রেডিও নীরব,
দাস-দাসী নাহি করে কলরব ; মোটর-গ্যারেজও শূন্য—
"সিলিং"-এর পাখা ঘোরে নাকো আর ; টেলিফোন্ রিং করে না আমায় ;
'ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স' লাগে নাকো আর, এমনি আমার পুণ্য !

"গান্-লিটল্" লাইসেন্স্‌গুলো, কাড়ে নাকো কেহ, জমে গেছে ধূলো।
শেয়ার-বাজার হোক্ যত ফুলো, ছুটিনে কেতার পিছুতে—
এ "আব" তোমার "বলি" হয়ে আজ, পথের ধূলায় রাজ-অধিরাজ !
তুচ্ছ মানুষ, তুচ্ছ সমাজ, সব হেরি আজ নীচুতে !

উর্ধ্বে উঠেছি এ সংসারের ; ছেলে মেয়ে বৌ টানে নাকো ফের—
সকলে বুঝেছে কিছু নাই এর,—মুক্তি বিশাল, শ্রী হরি !
'বন্ধুর' কথা ছেড়ে দিনু, স্বামি !—অরাতিরও কাছে কাণাকড়ি আমি !
কি বিপুল মজা হওয়া অধোগামী—বিভবে, বিত্তে, আ-নরি !

জয় জয় জয় ! হে চির-কিশোর ! নন্দ-দুলাল, মম চিত্ত-চোর !
মিনতি আমার রেখো সখা মোর ! যুপেরই কাষ্ঠে রাখিয়ো—
নির্দয় তব আঘাত হানিয়া, কোরো 'বলিদান' খড়্গ হানিয়া,
রুধির-লিপ্ত এদেহ টানিয়া, পদরজে শুধু মাখিয়ো !

আর ত কিছুই নাহিক দেবার, মানুষ অথবা দেবতা সেবার,
প্রাণটাতে টান পড়েছে এবার, তা-ও দিতে চাই বলি গো !
দেহ ও রক্ত মিলায়ে দু'দশ—তাই দিয়ে হোক্ হারা জীবন—
'তালিয়ানা' কত করিব সীবন, ফেলিয়া সকলি চলি গো !

রাজা রামমোহন রায়

শ্যামাপ্রসাদ আচার্য

ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী নিয়মে প্রত্যেক জাতির জীবনেই এক এক সময় জোয়ার আসে। সে জোয়ারে নদী, নালা, খাল, বিল সব ডুবে যায়। দু-কূল ছাপিয়ে উদ্দাম স্রোত পৌঁছায় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায়। এই জোয়ারের স্থায়িত্ব উন্নত করে সংস্কৃতিকে আর সভ্যতার ইতিহাসে মহিমান্বিত করে সেই জাতিকে। তারপর একদিন প্রাকৃতিক নিয়মে জোয়ারের উদ্দামতা থিতিয়ে পড়ে। জাতির জীবনে এই বন্ধ্যাত্বের দিনে স্মৃতির রোমন্থনই একমাত্র সাধনা। অতীত ঐতিহ্যের এই রোমন্থন বর্তমানকে ভুলে যাবার বা বর্তমানের স্খলন-পতন-ত্রুটিকে ঢেকে আত্ম প্রতারণার কৌশল নয়। এর প্রয়োজনীয়তা আছে। অতীত-দিনের স্মৃতির মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা ও পর্যালোচনার দিন আজ এসেছে। উনবিংশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ বিরাট বিস্তীর্ণ তটে আঘাত ক'রে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আজকের বাংলাদেশ একটি বিশেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। গৌরবময় অতীত এখানে মৃত, কিন্তু প্রবলবেগে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করার ভবিষ্যতও এর নেই। ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাষায় "Between two ages, one dead, the other powerless to be born." তাই আজ আত্মসমালোচনার দিন। এইদিনে বিশেষ করে মনে পড়ছে উনবিংশ শতাব্দির বাঙালী নবজাগরণের ইতিহাসের প্রাণ-পুরুষ রাজা রামমোহনের কথা।

বাংলা দেশ, তথা ভারতবর্ষের, তখন এক ঘোর দুর্দিন। মুঘল বাদশাদের তখন চরম দুরবস্থা। সারা দেশ বিদ্রোহ, অরাজকতা, অশিক্ষা, কুসংস্কারে ভরে গেছে। এমন সময় ইংরেজ বণিকেরা এল এদেশে বাণিজ্য করতে, এবং দেশীয় লোকদের সকল রকম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করল। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে আগামী যুগের আলোক-বর্তিকা হাতে জন্মগ্রহণ করলেন রাজা রামমোহন রায়।

একশো বিরাশী বছর আগে, পলাশীর যুদ্ধের মাত্র সতেরো বছর পরে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তখন ইংরেজেরা এদেশে এলেও ইংরেজী ভাষা দেশের মধ্যে বিশেষ প্রবেশলাভ করেনি। উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ও ফারসী। তাছাড়া বাংলা ভাষা ব'লে যাকে আজ আমরা চিনি, তার এই রূপ সেদিন ছিল না; বাংলা নামে বঙ্গদেশের একটা ঘরোয়া কথ্য ভাষা ছিল মাত্র। এজন্য রামমোহন অতি অল্প বয়সে মাতৃ ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও ফারসী শিখতে আরম্ভ করেন। এর পর তাঁকে পাঠান হয় কাশীতে। কাশী অনেক দিন ধরেই সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। এখানে রামমোহন সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। এবার তিনি বাড়ী ফিরে এলেন। বয়স তখন তাঁর ষোল বছরেরও কম।

উপরের কথাগুলোর মধ্যে তথ্যের দিক থেকে নতুন কিছু নেই একথা ঠিক। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে পরবর্তীকালে রামমোহনের উদারতা, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-

মর্যাদাবোধ, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর এই সময়-কার সম্যক পরিচয়েরই ফল। এইজন্যেই ধর্মের নামে পিতার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হন্ নি। এইজন্যই আত্মান্বেষী রামমোহন, মাত্র ষোল বছর বয়সে গৃহত্যাগী হয়ে দুর্গমনীয় সাহসে ভর করে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতে এসে পৌঁছলেন বৌদ্ধ সংস্কৃতির খোঁজে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সংস্কৃতি রাম-মোহনকে পূর্ব-দেশীয় অধ্যাত্ম-আত্মার পরিপূর্ণ পরিচয় দিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি নব-জাগরণের পুরোধা নন্। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দির বাঙালী-নবজাগরণ পূর্ব ও পশ্চিমের একটা synthesis. এজন্য রামমোহনকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হোল। তিনি ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতি এবং খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র জানতে আরম্ভ করলেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হোল যে জগতের সমস্ত ধর্মের মূল বক্তব্য এক। ভগবান এক এবং অভিন্ন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সারা জীবনের এই শিক্ষা ও বিশ্বাসকে সাধারণ লোকের বোধগম্য করার জন্য তিনি পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এবার পূর্বের আধ্যাত্মিকতা ও পশ্চিমের বস্তু-তান্ত্রিকতার মধ্যে এক অপূর্ব সম্মেলন ঘটল।

বাঙালী সমাজ সেদিন অধঃপতনের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। ধর্মের নামে সমাজে যে নারকীয় বীভৎসতা রামমোহন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা তাঁকে পাগল করে দিল। এই কূপমণ্ডুকতা, অশিক্ষা, সংস্কারের হীনতা থেকে দেশবাসীকে তিনি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজের আগমন এ দেশবাসীদের নতুন জ্ঞান, বিজ্ঞানের আলো দান ক'রে তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে। তাই পলাশীর ভাগ্য-বিজয়ের পর ইংরেজের এদেশে অধিকার ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে বাঙালীর রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানি থাকলেও সংস্কৃতিগত সার্থকতা আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই বিপ্লব (Revolution)-কে বাদ দিয়ে তিনি সংস্কার (Reform)-কে তাঁর কর্মপথ বলে বেছে নিয়েছিলেন। একটা অধঃপতিত জাতিকে হাত ধরে টেনে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাকে শোনাতে চেয়ে-ছিলেন নবজীবনের অভয় মন্ত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দির বাঙালী নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন, রাজার আসনে আসীন। কথাটা একেবারে ভুলে না গেলেও অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই। তা না হলে চারিদিক থেকে একটা সামগ্রিক আত্মবিস্মৃতি আমাদের পেয়ে বসেছে কেন? রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এ সমস্যার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা আত্ম-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। সমষ্টিগত ধ্যান-ধারণার চাপে আমরা ব্যক্তিগত দায়িত্ব ভুলতে বসেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ যে কোন জাতির উন্নতির প্রথম সোপান। রাজা রামমোহনের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে আবার স্বাভাবিক জীবনদৃষ্টি ফিরিয়ে আনুক—এই আমরা চাই।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'

শ্রীঅনিল কুমার হালদার

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যে ঘটনা ও কাহিনী এবং ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্ত রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে, সর্বদেহে মনে শিহরণ সঞ্চার করে, তার মধ্যে নাটকীয় উপাদান স্বভাবতঃই প্রচুর পরিমাণে থাকে, বিশেষতঃ সিরাজদ্দৌলার কাহিনী সেই নাট্যরসে পরিপূর্ণ। সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণের মত—একদিকে ক্ষীয়মাণ মোগল সাম্রাজ্য, আর একদিকে নবাগত বণিক সম্প্রদায়, রাজ্যাকাঙ্ক্ষার ওপরে বাণিজ্যের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে।

অস্থিরমতি, কামাতুর, বিলাসী, অপরিণামদর্শী, বয়ঃকনিষ্ঠ সিরাজদ্দৌলা নবাব হিসাবে ব্যর্থ এবং বিড়ম্বিত, এবং পরিণতিতে মর্মান্তিকরূপে শোচনীয়। গিরিশচন্দ্র কাহিনী নির্বাচনে যুগধর্মকে স্বীকার করেও শিল্পকলাকে তদভিমুখী করেছেন। কিন্তু তার চাইতে সেক্সপীয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এই কথা বল্‌লেই ঠিক হয়। আঙ্গিক বিন্যাস অথবা রূপ সংযোজনই শুধু নয়, গোটা ভাববস্তুটাই অনুকরণাত্মক। সবটাই প্রায় ধার ক'রে,—ধার ক'রে, স্বকীয় ক'রে ;—প্রথমটাতে গিরিশচন্দ্র দক্ষহস্ত কিন্তু দ্বিতীয়টাতে অনিপুণ। সিরাজের পতন এবং সেই পতনে পাঠকের তথা দর্শকের সহানুভূতি ও সমবেদনা উদ্রিক্ত করাই নাট্যকারের একমাত্র উদ্দেশ্য, অথচ লম্পট দুরাচারের প্রতি পাঠকের কোনও আকর্ষণ থাকে না বলে সিরাজদ্দৌলার দোষক্ষালন ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে, আর তার ভিত্তিভূমি তিনি নবলব্ধ ইতিহাস-তথ্য থেকে আহরণ করেছেন—"সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন ক'রে রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ-চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হ'ন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী। অথচ মজা এই যে, মহাকবির কল্পনা ক্ষণে ক্ষণে বন্যাহারা হয়ে ঐ সমস্ত লেখকগণকে পিঠে করেই মেঘলোকে প্রয়াণ করে,—নাটকের ভেতরে প্রবেশ করলেই তা' টের পাওয়া যায়। ঝরিমচাচা আর জহরা তার দুই মূর্তিমন্ত প্রমাণ।

নাটকের মধ্যে আমরা জীবনকে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করে থাকি: তাই উপন্যাস ও গল্প আখ্যায়িকার চাইতে নাটকের সংক্রামকতা অনেক বেশী। সিরাজদ্দৌলার কাহিনীটাই এমন নাট্যগুণসম্পন্ন যে অতি সাধারণ পাঠকেরও চিত্তে হ্লাদজনকতা সহজেই সৃজন করতে পারে, পরন্তু নাট্যকার যদি প্রথম শ্রেণীর হ'ন তবে সোনায় সোহাগা। দ্বিতীয়তঃ গিরিশচন্দ্র যখন সিরাজদ্দৌলা লিখছেন তখন শুধু নাটক নয় তার আগে ঐতিহাসিক পটভূমিও তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই ঐতিহাসিকতাকে পরিস্ফুট করতে হলে পটভূমিকা প্রয়োজন—সুতরাং দীর্ঘবিস্তৃতি অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। "সিরাজ-চরিত্র নিয়ে দু'খণ্ড নাটক লিখলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হতে পারত"—নাট্যকারের এই উক্তি বাস্তবিকই যুক্তিসহ। কিন্তু

দুঃখের বিষয়, যে কারণেই হোক তিনি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়েছেন; একপণ্ডেই লিখেছেন। তাই নবাব সিরাজদ্দৌলা থেকেই 'সিরাজদ্দৌলা'র আরম্ভ ও শেষ। এই আরম্ভ ও শেষের মধ্যে সিরাজের যে জীবন, তাতে তিনি একজন স্বদেশ বৎসল, হঠকারী, অনুতপ্ত ও পত্নীপ্রেমিক নবাব।—অবশ্য স্বদেশানুরাগটাই সর্বাপেক্ষা প্রবল, সেজন্য কিছু কিছু বক্তৃতাও তাঁকে দিতে হয়েছে। তথাপি এ' নাটকের মূল রস ইতিহাসের নয়, রোমান্সের—ইতিহাসের কড়া গন্ধ আছে বটে।

সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যাকাশে ঘনঘটা দেখা দিচ্ছে, তাঁর জীবন-বৃত্ত স্বেচ্ছাচারের ঐকান্তিতায় দিগন্ত স্পর্শ করেছে—সুতরাং পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অঙ্কে ঘসেটি বেগমের মুখে যে বক্তৃতা যোজনা করা হয়েছে তাতে এই ভাবী পতনেরই সূচনা—

"নবাব বাহাদুর, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী, ভাগ্যমুণ্ডের কর্ত্তা! পতিহীনা, অসহায়া রমণীকে বাসচ্যুত করা তোমার প্রথম নবাবী পরিচয়। তোমার কুল-নারীর সম্পত্তি অপহরণ, তোমার প্রথম রাজকার্য। তোমার প্রথম কার্যে তোমার কুলনারীর অশ্রু বিসর্জন; —এই আরম্ভ কিন্তু শেষ নয়। তোমার কুলনারীর অশ্রু, বারিধারার ন্যায় এই বাঙ্গালায় পতিত হবে, কিন্তু সে অশ্রু-বিসর্জনে বঙ্গভূমি শীতল হবে না। সে অগ্নিময় অশ্রুধারায় নগর দগ্ধ হবে, রাজ্য ভস্মীভূত হবে, হাহাকার ধ্বনিতে দিগ্বলয় পরিপূর্ণ হবে। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হওয়া এই প্রথম, শেষ নয়। তোমার কুলনারী আবাসহীনা হবে, পথে পথে ভ্রমণ করবে, ভিক্ষা-অন্নের জন্য ব্যাকুলা হবে, আকাশ ব্যতীত অপর আচ্ছাদন থাকবে না।"

সেক্সপীয়ারের King Richard II-এ Gaunt -ও ঠিক এই ধরণের কথা রাজাকে বলে অভিশাপ দিচ্ছে—এবং Gaunt রাজার আত্মীয়, ঘসেটিও নবাবের পরিবারভুক্ত:

"Now He that made me knows I see
thee ill:
Ill in myself to see, and in thee seeing ill.
Thy death-bed is no lesser than thy land
Wherein thou liest in reputation sick;
And thou, too careless patient as thou art,
Commit'st thy anointed body to the cure
Of those physicians that first wounded
thee:
A thousand flatterers sit within thy crown,
Whose compass is no bigger than thy
head:
And yet, incaged in so small a verge,
The waste is no whit lesser than thy
land,
• • • •
Why, cousin, wert thou regent of the
world,
It were a shame to let this land by lease:
But for thy world enjoying but this land,
Is it not more than shame to shame it so?
Landlord of England art thou now,
not King:
Thy state of law is bondslave to the law:
And thou—

(King Richard II. Act II. Sc. i)

সেক্সপীয়ার যে রূপকটা গভীরার্থবহ করেছেন, গিরিশচন্দ্র তাকেই অবিকল গ্রহণ করেও গাম্ভীর্য ও সমুন্নতি রক্ষা করতে পারেন নি।—যেমন,

লুৎফা। .....মাসীমা দেখুন—এই উপবন রাজ্যের আদর্শ স্বরূপ। এই দেখুন, এই কণ্টক-পূর্ণ বৃক্ষ, সকতঙ্কের অনুরূপ—তার উপর নবাবের যশোপুষ্প বিকশিত, সৌরভে দেশ আমোদিত কচ্ছে। এই দেখুন, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল কুসুমভারে অবনত, বিনীতভাবে নবাবকে রাজভক্তি প্রদান

করবে। এই দেখুন, শেফালিকাবয় ধারণাদের ন্যায় দণ্ডায়মান—ভক্তি-কুসুম উপহার দিয়ে রাজ দর্শকবৃন্দকে শিক্ষা প্রদান করবে। এই দেখুন, উদ্যান-কণ্টক সকল স্বহস্তে নির্মূল করে লতা-বন্ধন করে রেখেছি। নবাবের কণ্টক, নবাবের শত্রু, এইরূপ বন্ধনদশায় উচ্ছেদ হ'য়ে রাজ্যের এক পার্শ্বে পতিত থাকবে। যে সকল তরুলতা অনিয়মে শাখা প্রসারণ করেছিল, সে সকল শাখা ছেদন করেছি;—দেখুন বিনয়ীর ন্যায় তারা অবস্থান করছে—।"

ওদিকে Gardener বলছে—

"Go bind thou up yon dangling apricots,
Which, like unruly children, make their sire
Stoop with oppression of their prodigal weight:
Give some supportance to the bending twigs.
Go thou, and like an executioner,
Cut off the heads of too fast growing sprays,
That look too lofty in our commonwealth:
All must be even in our government.
You, thus employed, I will go root away
The noisome weeds, which without profit suck
The soil's fertility from wholesome flowers."

একই রূপক-বিন্যাস-কৌশল একস্থানে স্বাভাবিক, অন্যস্থানে আরোপিত। লুৎফা যেন কতকটা কবিত্ব করছেন: তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার বেগম হয়েও 'এই দেখুন,' উদ্যান-কণ্টক স্বহস্তে নির্মূল করে লতাবন্ধন করে রেখেছি'—বলতে আপত্তি করেন না। তাঁর চাঁপার কলির মত আঙুল (তিনি অনিন্দ্যসুন্দরী, ইতিহাস এই কথা বলে) থেকে রক্ত পড়েছিল অনেক, নিঃসন্দেহ। কিন্তু Gardener যখন 'I will go root away the noisome weeds' —বলে, তখন এইজন্যই তা' স্বাভাবিক প্রতীত হয় যে তার কাজই হলো ঐ; সে উদ্যানরক্ষী মাত্র।

সিরাজ এবং রিচার্ড দু'জনেই পরস্পরকে গিয়ে কারাগারে আবদ্ধ। সেই কঠিন অবরুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে কারাপ্রাচীর দু'জনেরই অসহ্য বোধ হয়—তাই দু'জনেই কারাগারের মধ্যে আত্মবীক্ষণ ও মানসউন্মীলনের চেষ্টায় ব্যাপৃত। সিরাজ বলছে—"একদিন আজ্ঞা দিয়েছি, আজ আজ্ঞা প্রতীক্ষায় কারাগারে আবদ্ধ!"

রিচার্ড বলছে—

"I wasted time, and now doth
time waste me;

তারপর হত্যাকাণ্ড: দুজনেই তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী।

রিচার্ড-এর হত্যার অব্যবহিত পরেই King Richard II নাটকটা শেষ হয়েছে—; সিরাজের হত্যার পরেও সিরাজদ্দৌলা প্রলম্বিত: তৃতীয় গর্ভাঙ্কে হত্যা। নাটক শেষ, সপ্তম গর্ভাঙ্কে এবং কাহিনীও দ্রুত পরিবর্তনের সুরে-তালে এগিয়ে গেছে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিমচাচা; পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মুর্শিদাবাদের সুসজ্জিত রাজপথ; ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে—মুর্শিদাবাদ—নবাব দরবার; এবং সপ্তম গর্ভাঙ্কে—খোসবাগ, দীপমালা শোভিত সিরাজের সমাধি-মন্দির; সর্বশেষে লুৎফউন্নিসার প্রেম-বিচ্ছেদের করুণ গীত।

ট্র্যাজেডির প্রচণ্ডতা সহ্য করা অর্থাৎ তাকে মুখোমুখী রেখে নিরীক্ষণ করা আমাদের আদর্শের প্রতিকূল—তাই সমাধিমন্দিরের শান্তরসের মধ্যে সিরাজদ্দৌলার সমাধি। এই সমাধি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? বৃহত্তর কিছু নিশ্চিতই—কিন্তু সে 'বৃহত্তর' নাটকসম্পৃক্ত নয়—জীবনরস সম্পৃক্ত। যেমন মহাভারতের সর্বশেষে পাওঃ-

গণের মহাপ্রস্থান—ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামান্তে একটা চমৎকার প্রশান্তি ও নির্বেদ। জীবন-দ্বন্দ্বের এই হৃদি:-শেষ নিষ্ফল ক্রন্দনের হা-হা সুরটাকেই প্রতিধ্বনিত করে সর্বাধিক।

King Richard তার দারুণ দুঃখের সময় সুন্দর কবিত্বে মনোভাব প্রকাশ করে, তার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত তা'প্রতিরোধের ক্ষমতা রাজার নেই। ঠিক তেমনিটি সিরাজেরও, অতএব সিরাজও গৈরিশ ছন্দে বলে ওঠে—

"প্রিয়ে ফুরায়েছে—রাজ অভিনয়।
কল্পনায় না হয় উদয়,
করতল বিদেশী বণিক,
কাড়ি নিল সিংহাসন।
ধূমকেতু উদি অকস্মাৎ শুষিল সাগর-নীর।
বঙ্গ সিংহাসন, না জানি কি কুহকে গঠন,
অধিকারী বর্জন তাহার কুহক প্রভাবে যেন।"

শুধু তাই নয় আলিবর্দী বেগমেরও ঐ ছন্দজ্ঞান আছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই বলেছি সিরাজ স্বদেশ বৎসল: নাট্যকার সেই কথা প্রমাণ করার জন্যে স্থানে স্থানে কালানৌচিত্যকেও অতিক্রম করেছেন। সিরাজ বলছে—

"হল্‌ওয়েল, তোমরা উচ্চ জাতি, তার আর সন্দেহ নাই। তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। দ্বেষের সম্পূর্ণ দোষে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েও বন্দী অবস্থায় তার নিন্দার প্রতিবাদ কচ্ছ; তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা বাঙ্গালার কর্তব্য।"—(প্রথম অঙ্ক, দশম গর্ভাঙ্ক)

স্বদেশী আন্দোলনের ধূমোদ্গিরণ তখন আকাশে বাতাসে, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিকী মন সহসা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে তারই ফল তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক—সিরাজদ্দৌলা (১৩১২), মীরকাসিম (১৩১৩) আর ছত্রপতি শিবাজী (১৩১৪); কিন্তু যে মন পুরাণ-রসপুষ্ট তার বিকেন্দ্রীকরণ সহজ নয়—নয় বলেই প্রত্যেক খানিতে কিছু না কিছু অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ অবাস্তব রস আছে। আমাদের আলোচ্য নাটকে এই অতীন্দ্রিয়ের অবতারণা করা হয়েছে করিম-চাচা ও জহরার দ্বারা। করিমচাচা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের সহোদর। তার মধ্যে কল্পনা-রসাবেশ চরম, যা' নাট্যসমুন্নতিকে ব্যাহত করেছে পদে পদে; তথাপি তার সৃষ্টিতে মাত্রাধিক্য সত্ত্বেও দ্রুতসঞ্চারী জীব-স্পন্দন আছে। কিন্তু জহরা কল্পনার তুরীয় অবস্থার সৃষ্টি—তার প্রগল্‌ভ সংলাপ ও ততোধিক বিস্ময়-জনক গতিচাঞ্চল্য এবং মুহুর্মুহুঃ পাদচারণ, ভীতি সঞ্চার করে। সিরাজ তার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছে—"বিভীষিকা মূর্তি—বিভীষিকা মূর্তি—দানবী, মানবী নয়। শোণিত-লোলুপা প্রেতিনী নির্ঝরে সৈন্যশ্রেণীতে বিচরণ কচ্ছে।"

জহরা নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে—

"তুমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক-সহচরী, আমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক-সহচরী! নারকীয় সয়তানী শক্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ।"

এবং—"আমি নানা বেশধারিণী।• • আমি তোমার পাপ সহচরী।• ৯ আমি নারকীয় শক্তিসম্পন্না, সয়তানকে আত্ম-বিক্রয় করেছি।"

আবার—"হাঁ! সত্য সয়তানী—প্রতিহিংসা উদ্দীপ্তা রমণী! কালফণিনী—সন্তাপিনী—পতি-বিরহিণী!"

সিরাজদ্দৌলা নাটকটাই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের খেলা; কঠিনতম বিদ্বেষ ও লালসা বহ্নির প্রজ্বলনই এর চমৎকৃতি—সেই ক্রূর-কুটিল সয়তানী মনোবৃত্তিকে পরিস্ফুট, একেবারে চাক্ষুষ করার জন্য জহরা পরিকল্পিত হয়ে থাকবে,—সে হিসাবে বিশিষ্ট প্রবৃত্তি অর্থাৎ লোভ, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি নির্ব্যূঢ় ভাবকে মূর্তি দেবার যে

চেষ্টা। এককালে বাংলা যাত্রা-নাটকে দেখা গিয়েছিল তারি কিঞ্চিৎ অনুপান এখানে পাওয়া যায়। অবশ্য গিরিশচন্দ্র অহরার দ্বারাই প্রত্যেককে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেছেন, ঘসেটি থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভ পর্যন্ত তার কথায় সচেতন হয়ে উঠেছে—সুতরাং Macbeth-এর Witch দের সঙ্গেও তার সৌসাদৃশ্য,—অর্থাৎ সেই "All hail, Macbeth, thou shalt be King hereafter"—এই মন্ত্রণাও অনেকাংশে সঙ্কেতিত।

অথচ তার এই রস-উৎকেন্দ্রিকতা সম্বন্ধে নাট্যকার যে অচেতন তাও নয়। করিমচাচা বলছে—

"ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে। তোমার অতটা না করলেও চল্‌তো। এই রাজা-রাজড়া আমির-ওমরাও আর ঘসেটি বেগম হতেই কাজ রফা হতো। এত করেও ইতিহাসে স্থান পেলেনা চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা পাবে। বেইমানীর কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে যাবে, তোমার জায়গা হবে না।"

করিম চাচার মধ্যে গভীর উচ্চাঙ্গের মনন-শীলতার পরিচয় পাই কিন্তু নাটকের অগ্রগতিতে, নাট্যকাহিনীতে, নাট্যরসে, নাট্যকৌশলে করিমচাচার প্রয়োজন আদৌ অপরিহার্য নয়। মানব ভাগ্যচক্রের দুর্বার পরিবর্তনের সে সাক্ষী, ভাবুক এবং কথঞ্চিৎ উদাসীন এবং বিজ্ঞ। শিল্পের দিক দিয়ে বিচার করলে করিমচাচার বাগ্‌বিস্তার রসোৎকর্ষের পরিপন্থী; তবে বাঙালী পাঠক ও দর্শকের এক বিশেষ স্থানে সে আঘাত করেছে। ঘটনার ঘনঘটাচ্ছন্ন অবস্থায়ও সিরাজদ্দৌলা পাঠকমনকে দূর রসলোকে উত্তীত করতে খুব কমই সক্ষম হয়। নিদারুণ পরিণতির জন্য পাঠক পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত থাকে—প্রথম অঙ্কেই তার গভীর ছায়াপাত হয়েছে; কিন্তু নিবিষ্ট সংবেদনায় রসভাস্তি আসে অতি ধীরে ধীরে। তবে যুগগত পরিপ্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্র পাঠকের রসরুচিকে চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছেন; তাঁর নিজেরই স্বীকৃতিতে—"আমার 'সিরাজদ্দৌলা' যে জনপ্রিয় হইয়াছে শুনিতে পাই, তাহা আমার সৌভাগ্য।" এই দেশের মৃত্তিকা প্রভাবে যে অধ্যাত্ম চেতনা দেশবাসীর মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়েছে গিরিশ-চন্দ্র তাকে শ্রদ্ধা করেছেন সর্বাধিক, তিনিই প্রথম পাঠক ও দর্শকের মন জানতে চেষ্টা করেন ও কৃতকার্য হন। নাটকের কোনও সার্বভৌম মানদণ্ড, রসদক্ষতা তিনি স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন, কারণ, তাঁর মতে, দেশের রসরুচি সেই দেশের বিশিষ্ট ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল; সিরাজদ্দৌলার যে ত্রুটি ও রসাভাস সে সম্বন্ধে তিনি সবৈব সচেতন; কিন্তু উপভোক্তার মন ততখানি সচেতন হয়নি বলেই রসবৃত্তির প্রলেপ দিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করেছেন—বস্তুতঃ বাঙলার তাবৎ নাট্যকারের রচনা মধ্যে একমাত্র গিরিশ-প্রতিভাই সোনার কাঠির সন্ধান পেয়েছিল।

একটি স্মরণীয় ঘটনা

শ্রীভজগোপাল সান্যাল

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে। সেদিন বেলা সাড়ে এগারটায় কলকাতার হাইকোর্টে লোক আর ধরে না। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বেলা সাড়ে দশটায় তাঁর কৌঁসুলী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে হাইকোর্টে প্রবেশ করলেন। "কন্‌টেম্‌প্ট্‌ কেস্‌" বা আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত তিনি—সেই মামলারই শুনানী আজ হবে।

• • •

১৮৮০ সালের ২রা এপ্রিলে সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদিত "বেঙ্গলী" পত্রিকায়—হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি নরিসের একটি কার্যের প্রতিবাদে একটি কড়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বের হয়েছিল। প্রত্যেক সভ্যজগতের আইনই—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতকে সম্মান দেয়। তদানীন্তন বিচারপতি নরিস—কোন একটি মামলার সত্যতা পরীক্ষার জন্য—হিন্দুদের গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলাকে—আদালতে টেনে এনে, তা "একশত বছরের পুরানো নয়" এই প্রকার রায়দান করেন। সেদিনের হিন্দু-চিত্তের ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ অমার্জনীয় অপরাধ করেছিলেন—সুরেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দোষ হয়েছিল যে উদ্বেল ও বিক্ষুব্ধ ভারতীয় চিত্তের সেই চাপা গুঞ্জনের রূপ তিনি ভাষায় প্রকাশিত করেছিলেন, তাঁহার "বেঙ্গলী" সংবাদ-পত্রে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতা ভুবনমোহন দাস ছিলেন—"ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন্‌" পত্রিকাটির সম্পাদক। এই পত্রিকাটিতেই প্রথমে বের হয়েছিল বিচারপতি নরিসের সেই কু-কাজটির বৃত্তান্ত। সুরেন্দ্রনাথ ভুবনমোহনবাবুর সততায় বিশ্বাস ক'রে ১৮৮০ সালে ২রা এপ্রিলে বেঙ্গলীতে প্রথমে "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের" সংবাদটুকু নিম্নলিখিতভাবে পরিবেষন করেন :

"Mr. Justice Norris is determined to set the Hooghly on fire. The last act of 'Zubberduti' on his lord-ship's part was the bringing of a "Salagram" a Stone idol, into court for identification. There have been very many cases both in the late Supreme Court and the present High Court of Calcutta regarding the custody of Hindu idols – but the Presiding Deity of a Hindu household had never before this the honour of being dragged into Court. Our Calcutta Daniel looked at the idol and said, "It cannot be a hundred years old." So Mr. Justice Norris is not only versed in Law and Medicine, but is also a Connoisseur of Hindu idols. It is difficult to say what he is not. Whether the Orthodox Hindus of Calcutta will tamely—submit to their family idols – being dragged into court is a matter for them to decide, but it does seem to us that some public steps should be taken to put a quietus to the wild eccentricities of this young and raw Dispenser of Justice".

মিষ্টার জাষ্টিস্‌ নরিস্‌ হুগ্‌লী নদীতে আগুন লাগাইতে বদ্ধপরিকর। তাঁর 'জবরদস্তির' শেষ কীর্তি হইতেছে 'শালগ্রাম শিলা'কে তাহার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য আদালতে আনয়ন। সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টে ইতঃপূর্বে হিন্দু দেবদেবীদের বিগ্রহের সত্ব লইয়া বহু মামলা হইয়া গিয়াছে কিন্তু গৃহদেবতাকে কোর্টে টানিয়া আনার সম্মান দান এই প্রথম। আমাদের কলিকাতার 'ড্যানিয়াল্‌'

শিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই রায় দিলেন "ইহা একশত বৎসরের পুরাতন হইতে পারেনা।"—অতএব আমরা দেখিতেছি যে মিষ্টার জাষ্টিস্ নরিস্ যে কেবল আইন ও ভেষজ শাস্ত্রে বিজ্ঞ তাহাই নহে, তিনি হিন্দু বিগ্রহ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ। তিনি যে কি ন'ন তাহা বলা শক্ত। কলিকাতার গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাদের গৃহদেবতাকে আদালতে টানিয়া আনার ব্যাপারটা নির্বিবাদে হজম করিবেন কিনা, সে কথা তাঁহারাই স্থির করিবেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় জনসাধারণের তরফ্ হইতে এমন কোনো প্রতিকার আসা উচিত যাহাতে এই নবীন এবং কাঁচা বিচার-বটনকারীর এরূপ উৎকট হঠকারিতা চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়।" (অনুবাদক—রামেন্দু দত্ত)

"ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের" উদ্ধৃত সংবাদ-টুকুর ওপর ভিত্তি ক'রে সুরেন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় জোরালো যুক্তিতে সম্পাদকীয় মন্তব্য করলেন:

"We have now however amongst us a judge, who, if he does not actually recall to mind the days of Jeffrey and Scroggs, has certainly done enough within the short time that he has filled the High Court Bench to show how unworthy he is of his high office, and how by nature he is unfit to maintain those traditions of dignity which are inseparable from the office of the judge of the highest court in the land."

(যাহা হউক, এখন আমাদের মধ্যে একজন জজ্ আসিয়াছেন, যিনি 'জিওফ্রে ও স্ক্রগ্স্' এর যুগের কথা মনে করিতে না পারিলেও এই অল্প সময় হাইকোর্টের অজীর্ণতা করিয়া কার্যতঃ যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন যে তিনি ঐ উচ্চপদের, এবং এদেশের উচ্চতম আদালতের সহিত যে গরিমা স্বভাবতঃ অবিচ্ছেদ্য, তাহা বজায় রাখিবার পক্ষে, কত অনুপযুক্ত।)

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপাবার ঠিক একমাস পরে ২রা তারিখে সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্ট থেকে একটি 'সমন' পান। "কন্‌টেম্‌প্ট্ কেসের" অভিযোগে কেন তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে না, তার কারণ দর্শাবার জন্য শুনানীর দিন ধার্য হয়েছে ৫ই মে।

সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু স্বনামধন্য ব্যবহার-জীবী মনমোহন ঘোষ তখন রোগশয্যায় শায়িত। অতঃপর ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মামলা পরিচালনা করবার জন্য স্বীকৃত হলেন এই সর্তে যে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করবেন যা সাময়িক ঘৃণা বা উত্তেজনার বশে তিনি লিখেছেন।

বাংলার জনচিত্ত সেদিন আশঙ্কা করেছিল যে সুরেন্দ্রনাথের জেল হবে। কলকাতার স্কুল-কলেজের ছেলেরা সবাই পাঁচ তারিখে ভীড় করে-ছিলেন হাইকোর্টের সামনে। সুরেন্দ্রনাথের একদল উগ্র সমর্থক ছাত্র সেদিন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন নি। এই ছাত্রদলের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী বাংলা ও বাঙালীর রত্ন, তার আশুতোষ—যিনি সেদিন পুলিশের দিকে ঢিল ও পাথর ছুঁড়েছিলেন।.....

৫ই মে এলো। ভীড় ঠেলে সুরেন্দ্রনাথ সাড়ে দশটায় আদালত কক্ষে প্রবেশ করলেন। বিচার-পতিরা তখনও কেহ আসেন নি। জানা গেল—তাঁরা কক্ষান্তর কক্ষে পরস্পর আলাপ আলোচনা করছেন —একমত হয়ে সুরেন্দ্রনাথকে জেলে পাঠাবার জন্যে। কিন্তু বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে জেলে দেবার ঘোর বিরুদ্ধে। রমেশবাবুর মত, সুরেন্দ্রনাথ যদি মন্তব্য প্রত্যাহার ক'রে আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে কেবল তাঁকে জরিমানা করা হোক। একই প্রকার অভিযোগে "Tailor's Case" এ তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি Sir Barnes Peacock কেবল জরিমানা করেছিলেন; বিচারপতি মিত্রের যুক্তি ছিল—টেইলারের মামলায় যেটা সম্ভব হয়েছিল অনুরূপ ব্যাপারে—সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে কেন সেটা প্রযোজ্য হবে না?

পরে এটাও প্রকাশ পেয়েছিল যে প্রধান বিচারপতি স্বয়ং মামলার আগের দিন (৪ঠা মে) রমেশবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে স্বপক্ষে টানবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন।...

বেলা সাড়ে এগারটায় বিচারপতিগণ কক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রধান বিচারপতি—অন্যান্য বিচারকগণের পক্ষ হয়ে রায় দিলেন—"আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনাশ্রম একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোল।" বিচারপতি মিত্র তখন বিরুদ্ধ রায় দিলেন—Dissenting judgment-এ তিনি সুপারিশ করলেন সুরেন্দ্রনাথকে জরিমানা করবার জন্য। "Infliction of a fine—sufficient."

বিদ্যুতের মতন সংবাদটুকু সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। সুরেন্দ্রনাথকে জেলে পাঠাবার প্রতিবাদে সেদিন লাহোর, অমৃতসর, এলাহাবাদ, পুণা এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে প্রতিবাদ সভার আয়োজন হয়েছিল। বাঙালী ছাড়াও সেদিন সমগ্র ভারতবাসী আর্তনাদ করে উঠেছিল "What have they done with our dearest brother? Our Surendranath is in jail"!!

আর সুরেন্দ্রনাথের বাংলা? সেদিন উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছিলেন—বাংলার প্রতিটি মানুষ। একমাত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছাড়া এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হরতাল, প্রতিবাদ-সভা, আর অনুষ্ঠিত হয় নি। কলকাতার ছাত্রেরা—"গণতন্ত্রের শোক-সভার" সেদিন আয়োজন করেছিলেন—খালি পায়ে বেরিয়ে এসেছিলেন স্কুল কলেজ ছেড়ে, গৃহে গৃহে হয়েছিল অরন্ধন ব্রত উদ্‌যাপিত—তরুণ বাংলার প্রিয় গুরু সুরেন্দ্রনাথকে জেলে পাঠাবার জন্য।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয় কলকাতার তদানীন্তন বিচারপতিগণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশে সুরেন্দ্রনাথকে জেলে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁদের সেই মসীলিপ্ত ঘটনাটুকু সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনকে আরও মহনীয় ও শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে—ইতিহাসের পাতায়। যেদিন তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন সেদিন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় পুণ্যদিন—আমেরিকার স্বাধীনতা বার্ষিকী দিবস—৪ঠা জুলাইয়ের সকালবেলা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম রাজনৈতিক কারাবন্দী। রাজনৈতিক বন্দীর কথা বলতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্ম-জীবনী—"A nation in making" গ্রন্থে লিখলেন: "I claim the honour (for such I deem it) of being the first Indian of my generation who suffered imprisonment for discharge of a public duty." "জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে গিয়া জেলে যাইবার গৌরবের (বস্তুতঃ আমি ইহাকে গৌরবই মনে করি) অধিকারী, আমার যুগে আমিই প্রথম ভারতীয়।"

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনে আজ থেকে ৭৩ বছর আগেকার বাংলার তথা ভারতের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

শাস্ত্র ও সভ্যতা

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য

হিন্দু শাস্ত্রে জ্ঞানের বিষয় সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। প্রভু-সম্মিত, সুহৃৎ-সম্মিত ও কান্তা-সম্মিত। জ্ঞানের বিষয় সমূহকে এই তিন ভাগে ভাগ করার মধ্যে মানুষের সভ্যতার মানস-বিবর্ত্তনের একটা সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত আছে।

আদিম মানুষ ছিল দুর্দাম; তার প্রকৃতি ছিল বন্য। সর্বদা নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাকে লড়তে হ'ত, তার ফলে তার চিত্ত ছিল রুক্ষ। সব কিছুর বন্যতা ও দুর্দামতা দিয়ে তার চিত্ত গঠিত ছিল। কোনো জায়গায় কোনো মৃদুতা বা কোমলতার চিহ্ন ছিলনা। আদিম মানুষের চিত্তের মধ্যে দুটো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একটা হ'চ্ছে তার চিত্তের রুক্ষতা ও একটা আদিমতা। ধর্মের ভিতর দিয়ে মানুষের সভ্যতার প্রথম উদ্বোধনে এই আদিমতার ভাবটা চলে গেল, রইল রুক্ষতা। ধর্মের মধ্য দিয়ে সভ্যতার প্রথম উদ্বোধন হ'ল ব'লে ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে এই রুক্ষতা সূচক প্রভুত্বের ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম-শাস্ত্র নানা রকম নৈতিক বিধি-বিধান ও অনু-শাসনের মধ্য দিয়ে মানুষকে শাসন করে এবং এই ভাবে মানুষের সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে। এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে যে ইহা মানুষের ওপর চাপানো থাকে। নানারকম বিধি-বিধান, নিয়ম প্রভৃতি চাপিয়ে মানুষকে আদিমতার স্তর থেকে তোলা হয় ও সভ্যতার পথে চল্‌বার উপযোগী করা হয়।

এই সভ্যতার পথে চল্‌তে চল্‌তে মানুষের ঐ রুক্ষতা যখন নানা রকম বিচিত্র মানসিক অনুশীলনায় সামঞ্জস্য শক্তিকে বেশী ক'রে আয়ত্ত করে, তখন মানুষের সভ্যতা, সভ্যতার পথে চল্‌বার স্বচ্ছন্দ শক্তিকে লাভ করে। এই খানে সভ্যতার চালকশক্তি মানুষের ওপরে না থেকে মানুষের সঙ্গে এক সাথে চল্‌বার বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে আসে। এইখানে যে জ্ঞানশাস্ত্র মানুষের মানসে উপজীব্য হয়, তা' হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্র কোন রকম অনুশাসন বা বিধি-বিধানের দ্বারা মানুষকে মুখ্যতঃ পরিচালনা করেনা।

যুক্তি, বিচার প্রভৃতি দ্বারা মানুষের উপর বোঝা না চাপিয়ে তা'র বুদ্ধির অনুগামী ক'রে মানুষকে সভ্যতার পথে পরিচালিত করে। ধর্মের নীরন্ধ্র অনুশাসন মানুষের উপর যে প্রভুশক্তি চালিত করেছিল, মানুষের বুদ্ধি ও মন ক্রমে ক্রমে সভ্যতার পুষ্টিকারক সামঞ্জস্য-প্রিয়তার দিকে আরও অগ্রসর হ'লে সেই পরিচালক শক্তিই মানুষকে পরিচালন করবার ব্যাপারে আর অনুশাসনের দরকার বোধ করলোনা। তখন সে মানুষের বুদ্ধির সমস্তরে নেমে এসে বন্ধুর মত যুক্তি ও বিচারের দ্বারা, পরামর্শ দিয়ে মানুষকে চালিত করলো। এখানে মানুষের সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। মানুষ তার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুশক্তিকে বন্ধুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে আস্‌তে পেরেছে। এখানে মানুষ নিজের পায়ে সভ্যতার পথে চল্‌বার ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছন্দ শক্তিকে অর্জন ক'রছে বলা চলে।

এর পর হচ্ছে কান্তা-সম্মিত বিধি। এই স্তরে পরিচালক শক্তি হ'য়েছে মানুষের আনন্দদায়িনী প্রেয়সী। রসের পথে, আনন্দের পথে মানুষের সুন্দরী ও প্রেয়সী বধূর মত পরিচালক শক্তি মানুষকে চালিত করে। এখানে মানুষ জ্ঞান ও

চিন্তার বিধিকে বুদ্ধির আয়ত্ত ক'রে একেবারে অধীন ক'রে ফেলেছে। এখানে যেন মানুষ মুক্ত। এই মুক্তি হ'চ্ছে জ্ঞান ও চিন্তার বিধি আয়ত্ত করবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধির ব্যায়াম থেকে মুক্তি। এই বুদ্ধির ব্যায়াম হ'য়েছে বুদ্ধির ও মনের অলঙ্কার ও শোভা। এই খানেই এসেছে মানুষের মধ্যে সুষমাবোধ।

এই সুষমাবোধে মানুষ এমন একটা জগতের সন্ধান পেয়েছে যেখানে মানুষের উপর সভ্যতার দায় নেই, আছে দাবী। দায়টা বাইরের জিনিস, মানুষ সেটাকে নিজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব'লে অনুভব করে। সভ্যতায়, প্রভু-সম্মিত থেকে সুহৃৎ-সম্মিত পর্যন্ত এই দায়টা মানুষ উচ্চ থেকে ক্রমে ক্রমে নিম্নতম মানসতার মধ্যে অনুভব করে কিন্তু তথাপি এই দায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়না, কিন্তু এই কান্ত-সম্মিত স্তরে সভ্যতা এই দায়-বোধ থেকে মুক্ত। এখানে সভ্যতা দায় থেকে দাবিত্বে উন্নীত হয়েছে।

এখানে মানুষ তার নিজের গরজে সভ্যতার শরণাপন্ন হয়না, সভ্যতার আকর্ষণেই সে তার শরণাপন্ন হয়। নিজের গরজটা অহেতুক নয়। কিন্তু সভ্যতার আকর্ষণটা মানুষের নিজের পক্ষে অহেতুক। মানুষের মধ্যে এই অহেতুকতার উদ্বোধন হয় সুষমাবোধে। এই সুষমাবোধে, মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়ামে নয়, রস-বোধের আস্বাদে সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। এই আস্বাদের মধ্যে মানুষ সভ্যতার দায় বা ভার নিজেদের উপর অনুভব করেনা।

এই কান্তা-সম্মিত পথেই মানুষ সুচিরকাল ধ'রে সভ্যতার পথে চলিতে ক্লান্ত হয়না বা নিজেদের শক্তি-দৈন্যও অনুভব করেনা।

নিম্নগামীর প্রণাম

(শ্রীশ্রীমাকে)

শ্রীঅঞ্জন কুমার দত্ত

তোমার মাঝারে
স্বপনের মধুরিমা,
আমার মাঝারে
কলঙ্কের কালিমা ;
দুইএর মাঝে—
গড়েছে বিভেদ-সীমা।
একধারে অন্যায় ,অন্যধারে ক্ষমা।

তাইতো হোলে তুমি
স্বর্গের নায়িকা,
নরকের কীট আমি
প্রলয়াগ্নি শিখা ;
দম্ভাই বা কিছু সুন্দরে,
দর্পিতের অট্টহাসে,
বেতালে ত্রিকাল ছন্দিত,
অখিল কম্পিত ত্রাসে।

শুধু তুমি পূত সন্ন্যাসিনী
বিলাও মুক্তি-সংহিতা,
বিমল পরশে তার ধন্য
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা।
আর, মোর মত শঠ
পিশাচেরে করি' ক্ষমা,
তুমি হোলে চির পূজ্যা
হে শরণ্য নিরুপমা।
হে সুখ-ত্যাগী সুহাসিনি,
অমর-লোক-বাসিনি।
দেখ নরকের কীট
আজ স্মরে তব নাম ;
স্বর্গলোক থেকে লহ দেবি।
এ নিম্নগামীর প্রণাম।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প

শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত

একযুগের সমাপ্তি আর এক যুগের সূচনায়—এ দু'য়ের মাঝখানে যে অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থি, তাকেই আমরা বলি যুগসন্ধিক্ষণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ। তাঁর পশ্চাতে উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যাস্ত, সম্মুখে বিংশ শতাব্দীর অরুণোদয়। তাই একহাতে গত যুগের এবং অন্যহাতে বর্তমানকালের সুচিন্তিত ভূমিকা নিয়ে বাংলাসাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাব। সাহিত্যের মধ্যে যুগসমন্বয়ের এই রূপ-প্রকাশে দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে সেই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী।

শতবর্ষের বাংলা গদ্যসাহিত্যে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। ভাবের বর্ণসুষমায় এবং ভাষার মাধুর্যদানে এই সাহিত্য আজ অনেকখানি চড়া সুরে বাঁধা। এর পেছনে যাঁদের ত্যাগ ও সাধনা আছে—তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রধান। অবশ্য গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহন রায়ের স্থান কোথায়, সেকথা এস্থলে অপ্রয়োজ্য। গদ্য-সাহিত্যের শিল্পকলার উন্নতিসাধনে উপরি-উক্ত তিনজনই উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের অমোঘ প্রভাব এর ওপর আছে। এই একশ' বছরের গদ্যসাহিত্যের পেছনে দুটি বিশ্বযুদ্ধ রয়েছে। বাংলাসাহিত্যে এই প্রভাব কমবেশী বিদ্যমান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, বাংলাসাহিত্যেও তার ঢেউ এসে লাগে। তারই ফলে কল্লোলযুগের সূচনা, যা বাংলাসাহিত্যে চিহ্নিতব্য। যুদ্ধপূর্বের বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত, তথা ধনী সম্প্রদায়ের পদচারণাই উল্লেখের বিষয়। জীবনের ব্যাপক ও গভীর রূপ তখনও সাহিত্যে অনুপস্থিত। কল্লোলযুগের আর যত কিছু ত্রুটী থাক, একদিক থেকে এর দান অবিস্মরণীয়। সাহিত্যের বিস্তৃত ও গভীররূপ এখানে আমরা দেখতে পাই। পল্লীপ্রধান বাংলার অবহেলিত মাটী ও মানুষ নতুন ক'রে এখানে জন্মগ্রহণ করেছে। কল্লোলযুগের সাহিত্যিকরা যেন 'কৃষাণের জীবনের শরিক' হয়েই দেখা দিয়েছিলেন। অবহেলিত, নিঃস্ব, নির্বোধ জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে তাঁদের আবির্ভাব বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তারাশঙ্কর এই কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম। পল্লী-বাংলার মাটী এবং সেই মাটীর কাছাকাছি মানুষের বুকের ভাষাই তাঁর রচনায় প্রকট হয়ে উঠেছে। সেই আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের ভূমিকা।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যের অগ্রগতি অতি সামান্য। এমন কি একাধিক সমালোচকের মত, এই একশ' বছরে দশখানি উপন্যাস লেখা হয়েছে কি না সন্দেহ। উপন্যাসের যে সংখ্যা তাঁরা দিয়েছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। সুতরাং উপন্যাস রচনার নামে সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে আজকাল যা প্রকাশিত হচ্ছে, তার অধিকাংশই নিঃসন্দেহে বড় গল্প বলা যায়। তবে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন, তা বাদ দিয়ে ছোটগল্পে তাঁর দান কতখানি, জীবন ও সাহিত্যের যে

নিবিড় সংযোগ তিনি দেখিয়েছেন, তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

পল্লীবাংলার মাটী ও মানুষের অন্তরঙ্গ তারাশঙ্কর-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। তিনি জানতেন যে চাষী মাঠে ধান বোনে, যে শ্রমিক রক্ত জল ক'রে কারখানায় পরিশ্রম করে, যে নারী সমাজে অপাংক্তেয় অথচ প্রাণপ্রাচুর্যসম্পন্না,—তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীকে যদি সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা না যায়, তাহলে সমগ্র দেশের বিপুলাংশকে বাদ দিয়ে সাহিত্যসেবা অশিক্ষিতা গ্রাম্যবিধবার শুচিবাতিকের মতই দেখাবে। তাই চাষী, শ্রমিক, পতিতা—এমনকি যাযাবর সম্প্রদায়ও এই সাহিত্যের মহীরুহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাঁর ছোট গল্পগুলিকে একএকটি দিগ্‌দর্শন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ "বেদেনী" গল্পটিকে ধরা যাক। রাধিকার উদ্দাম যৌবনলীলা যাযাবরীসুলভ মনোবৃত্তি শুধু নয়—এই প্রাণলীলা প্রতিটি নারীর স্বভাবের মধ্যে নিহিত একথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। শুধু বংশগত সংস্কার এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে এই প্রাণকল্লোল কিছুটা স্তিমিত হতে পারে—এইমাত্র। কিষ্টোর প্রতি রাধিকার বিরাগ পরে ক্রমবর্ধমান অনুরাগে পরিণত হওয়ার যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, তাতে নারী-মনের এই উন্মেষে শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য লাগে। কিন্তু মোহিতলালের শিল্প তারাশঙ্কর বেদেনীর যথার্থ রূপ আবিষ্কার করেছেন। 'বেদেনী' গল্পটী যাযাবর সম্প্রদায়ের অপূর্ব জীবনালেখ্য।

আর একটি গল্প "মেলা"। গল্পটির তাৎপর্য আছে। এই গল্পটি সাময়িক পত্রিকায় প'ড়ে মোহিতলাল তারাশঙ্করের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। পতিতা নারী লোকচক্ষে এবং সমাজে হেয়, তারা কেবল দেহ-পসারিণী এই-ই আমরা জানি। কিন্তু তারাশঙ্করের রূপসন্ধানী দৃষ্টি পতিতার মধ্যেও অপরূপ নারীকে আবিষ্কার করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পতিতা' কবিতায় পতিতা—নারীর প্রেমোন্মেষ দেখিয়েছেন এবং সেই প্রেমের স্পর্শে তার জীবনের গতি কেমন ক'রে নতুন পথে চালিত হয়, তার বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন প্রেমিকারূপ, তারাশঙ্কর আবিষ্কার করলেন মাতৃত্ব। পতিতা নারী স্নেহমমতায় সতী জননীর অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয় এবং বাৎসল্য রসে অন্তর একবার নিষিক্ত হলে তার চলার পথের পরিবর্তন হয়—এই-ই "মেলা" গল্পের উপজীব্য। নারীর বিভিন্ন রূপচিত্রণে তারাশঙ্কর শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী।

নারীর মত পুরুষও অন্তরে-বাহিরে দুই রূপেই সংসারে আবির্ভূত। সে একদিকে পিতা, অন্যদিকে প্রণয়ী। একদিকে দেবতা, অপরদিকে দানব। "দেবতার ব্যাধি" গল্পটি মানুষের এই দ্বৈতরূপের আলোছায়া। মানুষ প্রবৃত্তির দাস। ডাক্তার গয়গরি তার ব্যতিক্রম নন। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি জীবনের সুখ শান্তি হারিয়ে ফেলেন। জীবে প্রেমই ঈশ্বরপ্রেম, এই একদিন যাঁর আদর্শ ছিল, প্রবৃত্তির বশে তিনিই আবার চরিত্রভ্রষ্ট হন। কিন্তু গল্পের মুন্সিয়ানা সেখানেই, যেখানে এই চারিত্রিক দুর্বলতাকে আয়ত্বে আনবার জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ডাক্তারের নীরব সংগ্রাম। সেইজন্যই বাইরে তিনি নিষ্ঠুর—হৃদয়হীন, কিন্তু অন্তরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত। এই-ই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। একদিকে সহজাত প্রবৃত্তি, অপরদিকে জাগ্রত বিবেক। এ দু'য়ের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত বিবেকের জয়লাভে ডাক্তার গয়গরি মানুষের পর্যায়ে উন্নীত। দেবতার পাপের সংশোধন নাই কারণ দণ্ড নাই, কিন্তু মানুষের পাপের দণ্ড আছে—তাই সংশোধনের প্রয়াস আছে। স্বর্গভূমি

'সুখহীন হৃদিহীন।' তাই "অশ্বত্থ শাখার প্রান্ত হ'তে খ'সি' গেলে জীর্ণতম পাতা যতটুকু লাগে ব্যথা" ততটুকু বেদনাবোধ দেবতার নাই। তাই হেডমাষ্টারকে লেখা চিঠিতে ডাক্তারের অনুরোধ —"ছেলেদের দেবতা হ'বার উপদেশ দেবেন না। মানুষ—শুধু মানুষ হবার উপদেশ দেবেন।" পাপের বিরুদ্ধে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং সেবাব্রতের মধ্য দিয়ে আত্মার আনন্দলীলার অনুভূতি ডাক্তারকে দেবতার থেকে মহনীয় ক'রে তুলেছে। তাই 'হৃদিহীন' স্বর্গভূমির থেকে মানুষের পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ অধিক কাম্য মনে করেছিলেন। এবং তারাশঙ্কর সেই পৃথিবীর মানুষেরই জয়গান করেছেন। একটি নমস্কারে এই গল্পের সমাপ্তি বড় সুন্দর। এ নমস্কার শুধু হেডমাষ্টারের নয়,—সাহিত্যের উপজীব্য মানুষের প্রতি সাহিত্য-রচয়িতার গভীর শ্রদ্ধা।

কিন্তু মানুষের পৃথিবী পাপ-পুণ্যে, সুখ-দুঃখে, ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। এখানে মিলন-বিরহ, কর্ম ও কর্মফল, ক্ষমা ও নিষ্ঠুরতা পাশাপাশি চলেছে। এমনি এক নিষ্ঠুরতা এবং তার কর্মফলের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—"আখড়াইয়ের দীঘি" গল্পের কালীচরণ বাগ্‌দী। রাত্রে কুলীর ঘাঁটিতে নরহত্যা এবং সেই লাশ আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভে প্রোথিত করা জীবিকার্জনের নৃশংস পন্থা শুধু নয়, বংশানুক্রমিক জীবনধারার সঙ্গে প্রবৃত্তির সংযোগে একটি ট্র্যাজেডী। আদালতে কালীচরণবাগ্‌দী যখন স্বেচ্ছায় নিজ হাতে পুত্রহত্যার কথা স্বীকার করে, তখন, তা যে কী করুণ ও মর্মস্পর্শী তা তার জবানী থেকেই পাওয়া যায়: "পেয়েছিলাম আনা-ছয়েক পয়সা আর তার কাপড়খানা।" নিয়তির হাতের অদৃশ্য দণ্ড কী গভীর বেদনার সঙ্গে নেমে এসেছে। শুধু তাই নয়,—

"সেদিনের ভুল তারাচরণের, আমার ভুল নয়। তবে সে আমার ভাগ্যের দোষ। আর নয় তো যাদের খুন করেছি, তাদের অভিসম্পাতের ফল। তবে এ যে হবে এ আমি জানতাম—আমার বাবা বলেছিল, আমাদের বংশ থাকবে না—নিপাত হতেই হবে।"

সমস্ত জেনেও জীবিকার্জনের এই পথ গ্রহণ করার মধ্যে চিত্তের অসহায়তাই প্রকাশ পায়। মানুষ যত বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতিবান হোক না কেন, প্রবৃত্তির হাতে সে খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। এই গল্পটির আলোচনা-প্রসঙ্গে "পথের পাঁচালীর" ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের কথা মনে পড়ে। সেখানেও নিয়তির দণ্ড নেমে এসেছে। কুমীরের হাতে পুত্রের মৃত্যুর পর বীরু রায়ও বুঝেছিলেন—"অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি-পুকুরের জামাঘাসের নামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।" দুটি ঘটনার মূল সুর একই—কর্ম ও কর্মফল। সেখানে ঠাকুরঝি-পুকুর, এখানে আখড়াইয়ের দীঘি। সেখানে আগে হত্যা পরে অনুসন্ধান, এখানেও অনুরূপ, শুধু তাই নয়—উভয় ক্ষেত্রেই আপন কর্মের জন্য অনুশোচনা। সেখানে বীরু রায়, এখানে কালীচরণ বাগ্‌দী। পার্থক্য শুধু—বীরু রায়ের পুত্র গেল কুমীরের হাতে, আর—কালীচরণ বাগ্‌দীর নিজের হাতে পুত্র-হত্যা। নৃশংসতার বর্ণনায় বিভূতিভূষণের চেয়েও তারাশঙ্কর অধিক সাফল্য অর্জন করেছেন; নতুবা কর্মফলকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার সনাতনী মনোবৃত্তির পরিচয় উভয় রচনাতেই দৃষ্ট হয়। "আখড়াইয়ের দীঘি" গল্পটি বিভিন্ন জীবনের রসোপলব্ধির এক নতুন রূপ।

তারাশঙ্করের জীবনের গতি বিভিন্ন বর্ণ-বৈচিত্র্যের মাঝখান দিয়ে চলেছে। তাই তাঁর রচনায় জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। আপন জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সঞ্চয়ই তাঁর মূলধন। কঠোর বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে নয়—

পরন্তু তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে "জীবনযাত্রায় তিনি এগিয়ে চলেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বোধ করি শ্রেষ্ঠ জীবন-শিল্পী। জীবন ও সাহিত্যের এমনি একটি সংযোগের দৃষ্টান্ত "প্রতিধ্বনি" গল্পটি। রসরাজ পাগলের কাহিনী। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—"রসিক পাগল আমাকে এমনি প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে, তাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছি সে সময়। গল্পটির নাম 'প্রতিধ্বনি'।" জীবন ও সাহিত্যের এ একটি অপূর্ব সম্মেলন। মস্তিষ্ক বিকৃতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে হয়ত একাধিক গল্প আছে কিন্তু এমন উদাহরণ বিরল। পাগল—যারা লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ কিংবা উপেক্ষিত—বড় জোর করুণার পাত্র। কিন্তু এই গল্পের রসরাজ একেবারে মানুষের মর্মমূলে বাসা বেঁধেছেন। তাই তারাশঙ্কর "আমার সাহিত্য জীবন"-এ বলেছেন—"এ সংসারে দুনিয়ার মঙ্গল করতে যারা বদ্ধপরিকর হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্যাতন করে, যুদ্ধ বাধায়, ধ্বংস করে দুনিয়া, তাদের চেয়ে এ পাগল অনেক শ্রদ্ধার মানুষ আমার কাছে।" সেই জন্যই এই উন্মাদ লোকচক্ষে হেয় নয়, হাস্যাস্পদ নয়—বরং শ্রদ্ধাকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পাগল" প্রবন্ধে বলেছেন: "নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া করিয়া তুলিতেছেন।" রবীন্দ্রনাথের পাগলে আর তারাশঙ্করের রসরাজে মূলগত পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। সংসারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মধ্যে মৃত্যুর আবির্ভাবে মানুষ "বাসাংসি জীর্ণানি" বলে চিরাচরিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শোক দমনের প্রয়াস পায়, তখন এই পাগলের উক্তি মানুষকে হতচকিত ক'রে দেয়; সংসারের চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রমে অথচ ধরা-ছোঁওয়ার বাহিরে একটি পথের ইঙ্গিত আনে। তাই ইটের থামকে নিউটন কল্পনা ক'রে রসরাজের সেই প্রশ্ন:

"গাছ থেকে ফল পড়ল আর তা থেকে তুমি আবিষ্কার করলে যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে ফলটা পড়ল। কিন্তু তাতে হ'ল কি? বুকের ভেতর থেকে প্রাণ কার আকর্ষণে কোথায় যায় বলতে পার তুমি?"

একথা যখনই শুনি, তখন মনে হয়—একি সত্যই উন্মাদ, না উন্মাদের অভিনয়কারী কোন প্রতিভাবান,—যে প্রতিভাবান আর পাগলে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই!

"মৃত্যু কি, কি তার রূপ, কোথায় তার বাস" —এই চিন্তায় রসরাজ উন্মাদ। জগতের সর্বত্র মৃত্যু বিরাজ করছে—এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে কেবল ফুঁ দিয়ে তাকে উড়িয়ে দেবার প্রয়াস যখন চোখে পড়ে, তখন শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় এই ভেবে যে বুদ্ধদেব আর রসরাজের চিন্তার সৌসাদৃশ্য কতখানি। পার্থক্য শুধু—মৃত্যু থেকে পরিত্রাণের উপায় আবিষ্কারের জন্য বুদ্ধদেব লোকপূজ্য, আর রসরাজ মৃত্যু রোধের উপায় উদ্ভাবনে অক্ষম—তাই লোকচক্ষে পাগল। হাসির প্রতিধ্বনি যদি কান্না হয়; তবে জগতের সমস্ত আনন্দ একদিকে, অপরদিকে মৃত্যু অনুসন্ধানকারী রসরাজের অশ্রুসজল দৃষ্টি। এ বিষয়ে তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

এই অদ্বিতীয়তা আসে আপন সাধনায়। দশ জনের মাঝখানে একক হবার ঐকান্তিকতা যার, তাঁকে জীবনে তপস্যা করতে হয় অনেক। সংসারে সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখানে থেকেও অবিচল যোগীর মত আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে তারাশঙ্করের জীবন-সাধনা। পূর্বেই বলেছি যুগসমন্বয়ের

প্রচেষ্টায় তিনি সার্থকনামা। "জলসাঘর" গল্পটী তারই নিদর্শন।

উনবিংশ শতাব্দীর অস্তোন্মুখ সামন্ত-তান্ত্রিকতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর উদীয়মান ধনপতির আশ্চর্য প্রতিযোগিতা। একদিকে ঐশ্বর্য, অপরদিকে অর্থ। একদিকে উদারতা, অন্যদিকে বুদ্ধিদীপ্তি। এদিকে বিশ্বম্ভর রায়, ওদিকে মহিম গাঙ্গুলী। এদিকে ভারতীয় বিশিষ্টতা, ওদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান। তাই মহিম গাঙ্গুলীর পুত্রের অন্নপ্রাশনে রায়বাড়ীর হস্তিনীর ওপর ব'সে নায়েব তারাপ্রসন্ন যান লৌকিকতা করতে, আর নতুন মোটরে চড়ে মহিম গাঙ্গুলী নিজে রায়বাড়ী আসেন বাইজী-নাচের নিমন্ত্রণবার্তা নিয়ে। গাঙ্গুলীবাড়ীর নাচের আসর 'ভাপনামো'র ইলেক্‌ট্রিক আলোয় উজ্জ্বল, আর রায়বাড়ীর জলসাঘরের প্রকাণ্ড হলে নাচগানের বৈঠকে বেলোয়ারী ঝাড় এবং দেওয়ালগিরির বাতিতে আড়ামর। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় তো কী! এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্বম্ভর রায়ের পরাভব এই গল্পের ট্র্যাজেডী। এ পরাভব তিনদিক থেকে নেমে এসেছে। প্রথম—, জলসাঘরের নাচের আসরে মহিম গাঙ্গুলীর প্রথম ইনাম দেওয়া, দ্বিতীয়—, হারানো লাট কীর্তিহাটের সম্মুখে এসে যুগ-পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দর্শন; তৃতীয় এবং শেষ—, জলসাঘরের মধ্যে সাতপুকুরের সঞ্চিত মোহ সম্বন্ধে বিস্মৃত বিশ্বম্ভর রায়ের প্রথম আত্মচেতনা। এই মোহের কুহকেই রায়বংশের সর্বনাশ। কিন্তু সমস্ত জেনেও এ মোহ থেকে পরিত্রাণের অক্ষমতাবোধই বিশ্বম্ভর রায়ের জীবনের ট্র্যাজেডী।

"রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন: অনন্ত—অনন্ত।

অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর কখনও শোনে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর জলসাঘরের—

আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।"

জলসাঘরের মোহের অন্তরালে রায়-রাজত্বের সমাধি। শুধু তাই নয়, সেই মোহিনীসুন্দরীর নূপুর নিক্কণের ইঙ্গিতে এখনও রয়েছে সর্বত্যাগী উন্মাদনা—এ সত্য যখনই বিশ্বম্ভর রায় উপলব্ধি করলেন, তখনই আতঙ্কে—ঘৃণায়—ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন।

এ শুধু কণ্ঠের চীৎকার নয়—অবমানিত আত্মার মর্মন্তুদ হাহাকার। সম্ভোষিত বিংশ শতাব্দীর নিকট অস্তাচলগামী উনবিংশ শতাব্দীর নতি স্বীকার। দুই যুগের প্রতিনিধি দু'জন—মহিম গাঙ্গুলী ও বিশ্বম্ভর রায়।

তারাশঙ্করের সমস্ত গল্পের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর দান কতখানি, এবং সেই পথরেখা ধ'রে সার্থকতার কোন্ তীর্থে তিনি উপনীত হয়েছেন—তাই আমার বলার কথা। এই কর্মব্যস্ততার যুগে ছোটগল্প অত্যন্ত ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে যাঁদের অভিমত, তাঁদের নিকট বিনীতভাবে এই কথাটি বলতে চাই;—ছোটগল্পের ছোটত্ব তার পরিসরের অল্পতায় নয়—ঘটনার সংক্ষিপ্ততায়। দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনাও সার্থক-লেখকের দ্বারা মানুষের মনে প্রাত্যহিকতার অতীতলোকের সন্ধান দেয়। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে সেই প্রত্যহকে কেন্দ্র ক'রে প্রাত্যহিকতার অতীত-লোকের আরাধনা। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি "গল্প লিখতে বসে যারা গল্প না লেখার ভান করে"—সে দলের বাইরে। ছোটগল্পে প্লট অপেক্ষা। টাইল-সচেতনতা তারাশঙ্করের প্রকৃতি

নয়। যে ভারতীয় বিশিষ্টতায় তাঁর জন্ম এবং শাক্ত মনোবৃত্তির পরিবেশে তাঁর বিচরণক্ষেত্র, তাতে শুধু মনোবিশ্লেষণ নয়—প্রাণ-প্রাচুর্যের অজস্র সন্ধান তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে দেখতে পাই। উল্লিখিত গল্পগুলি ছাড়াও "তারিণী মাঝি" গল্পের তারিণী, "না" গল্পের ব্রজরাণী, "তমসা" গল্পের পদ্মী, "রাজপুত্র" গল্পের বিশু, "সন্ধ্যামণি" গল্পের কুসুমের মধ্যে যে প্রাণৈশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তা অনন্যসাধারণ।

উপসংহারে মোহিতলালের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার সমাপ্তি। তারাশঙ্করের ছোট গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে মোহিতলালের কথা বারবার বলা হয়েছে, তার কারণ "আমার সাহিত্য জীবন" এ তারাশঙ্করের সেই স্বীকৃতি—"মোহিতলালের কথা অনেক। তিনি আমার গুরু। আমার জীবন-সাধনায় তাঁর কাছ থেকে অহরহ অভয়বাণী পেয়েছি।" এর মূল্য অনেকখানি। তাঁর ছোট গল্প সম্বন্ধে মোহিতলালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য, মোহিতলালের নির্ভিকতা বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। আপনার প্রিয়জন বলে নয়, সত্যিকারের সমালোচকের দৃষ্টিতেই তিনি লিখেছিলেন :—"গল্পলেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কে, এই প্রশ্ন উত্থাপন ও তার সমাধান করিতে হইলে তারাশঙ্করের কৃতির যেরূপ উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দুঃসাহস আমি করিতেছি।.....তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহাই উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টি—বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রূপরস আবিষ্কার করিবার যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিকভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কবি-মানসের সেই সবল ও সুস্থ অপক্ষপাত যাহা জীবনের বিচিত্রতম অভিব্যক্তিকে একটি কেন্দ্রস্থির রসকল্পনার অধীন করিতে পারে; পশু ও মানুষ, যন্ত্র ও সভ্য, সুরূপ ও কুরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এবং রুক্ষ ও কোমল, মেধ্য ও অমেধ্য, আদিম দুর্নীতি ও শিক্ষিত দুর্নীতি এই সকলের মধ্যেই তিনি জীবনের সেই একই রস-রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন।.....ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে মানবজীবন—কাব্যের এমন রসঘন চিত্র যিনি অঙ্কিত করিতে পারেন তাঁহার প্রতিভার নিকট বাংলা সাহিত্য আজিকার এই দুর্দিনে অনেক কিছু আশা করিয়া থাকিবে।" ১৩৪৬ সালের বৈশাখ সংখ্যার "প্রবাসীতে" মোহিতলালের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে কিনা সে বিচারের ভার পণ্ডিতদের ওপর, তবে সেই সাফল্যলাভে যদি এতটুকু বাকি থাকে, তাহলে বলবো—তারাশঙ্করের জীবনে এখনও রয়েছে সুন্দর-তীর্থের জন্যে আমরণ-সাধনা।

মাতৃ-বন্দনা

শান্তশীল দাশ

জননী সারদামণি !
তোমার চরণ পরশে তীর্থ
হ'ল মাগো এ ধরণী।
এসেছিলে মাগো মাটির এ ধরায়,
বহু সাধ করে গুচ্ছ সাধনায় ;
মমতায় ভরা অন্তর খানি
অশেষ করুণা-খনি।
সংসার-তাপে তাপিত মানবে
দিয়েছিলে বরাভয় ;
তোমার ও দু'টি রাতুল চরণ
অসীম শান্তিময়।
চলে গেছ মাগো, মূরতি তোমার
অন্তর মাঝে জাগে বারেবার ;
সকল বেদনা নিমেষে ভুলায়,
আঁধারে আলোক গণি।

তীর্থ

শ্রীবরুণ প্রকাশ মিত্র

ছোট্ট একটি নদী, পার্বত্য দুর্গম পথের সহস্র বাধা অতিক্রম করে ছুটে আসে বিরাটের আকর্ষণে। নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে অসীমের পায়ে। এমনি করেই গোটা বিশ্বটা চলেছে বৃহতের সন্ধানে। আর এই চলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রহস্য।

মানুষের আদিম কালটা কাটল বস্তুর সন্ধানে। জড়দেহটার অস্তিত্ব বজায় রাখতে রাখতে ক্লান্ত মানুষের অবসর ছিলনা মোটেই মনের সন্ধান রাখবার। কিন্তু খুঁজে বের করবার জন্মগত স্বভাব নিয়ে জন্মেছে মানুষ, তারই জোরে তার বস্তুর আপাত অভাব মিটিয়ে নিয়ে দেখ্‌তে পেল মাত্র দেহের সুখেই জীবনের সার্থকতা নেই, আরও কিছু আছে যা না পেলে শেষ হবে না পাওয়ার; এই ব্যাকুলতায় মনের সন্ধান পেল মানুষ, 'নেতি নেতি' ক'রে এগিয়ে চল্‌ল মানুষ, সৃষ্ট হ'ল কাব্য, দর্শন, সাংখ্য, বেদান্ত, বেদ, উপনিষদ।

বিরাটের পায়ে আত্মসমর্পণ—শান্তি লাভের একমাত্র পথ। একথা ভারতই প্রথম উপলব্ধি করেছিল যুগ যুগ ধরে তার আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে। তারা দেখেছিল মানুষের জীবন যখন অনিবার্য ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত, দিশেহারা, তখন এই একটি মাত্র আলোই তাদের পথ দেখাতে পারে—যে পথের সীমান্তে আছে অমৃত-সাগরের সন্ধান; যে সাগর-সলিলে অবগাহন তার বেদনার্ত প্রাণে এনে দিতে পারে গঙ্গার ধারার মত প্রশান্ত শান্তির প্রবাহ। তাঁরা বুঝেছিল "যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে"। একটি একটি ক'রে জ্ঞানের গুড়ি সরিয়ে তারা দেখেছিল যে জীবনকে সার্থক করে তুল্‌তে হলে প্রথমেই প্রয়োজন এই মনটাকে আয়ত্ত করা—তাই পিছন ফিরে তাকালে দেখ্‌তে পাই ভারতীয় তীর্থের সব কয়টি মন্দির চূড়াই গড়ে উঠেছে সেই সব জায়গায় যেখানে অতি সহজেই মন আয়ত্ত হতে পারে। যেখানে সৌন্দর্য আর শান্ত পরিবেশ নীরব প্রার্থনার মত প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে, সেখানেই স্থাপিত হয়েছে তীর্থের দেবালয়গুলি।

হিমালয় তার চির-তুষার আর ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি নিয়ে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে সৃষ্টির গোড়া থেকেই। ভারতের ধর্মজীবনের প্রতিটি পাতায় তাই লেখা রয়েছে উত্তরাখণ্ডের নাম। হিমালয় থেকে আরম্ভ করে সুদূর কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত যেখানে যত গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি রয়েছে—আমরা, আর্য, দ্রাবিড় ও অনার্য-সম্ভূত ভারতবাসী তার প্রায় সব কয়টিকেই দেবতার পীঠস্থান কল্পনা ক'রে, গ'ড়ে তুলেছি সেই সব জায়গায়, মঠ, স্তূপ, বিহার;—নাম দিয়েছি "তীর্থ"। সেই বেলাভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা অসীম মহাসমুদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যে জেনেছি—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্! সুন্দরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সত্য ও শিবের রহস্য। মহাশিবের উপর নৃত্যমত্তা মহাপ্রকৃতির ছন্দ-বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে একের পর এক তারই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাইত ভারতের মর্মী সিষ্টার নিবেদিতার কণ্ঠে শুন্‌তে পেয়েছি"……Quite Different would have been the valuation of NIAGRA if it had been situated on the Ganges. Instead of fashionable Pionics and railway pleasure trips, there would have been an unceasing

onrush of worshipping crowds from the different parts of India ; magnificient sanctuaries would have adorned the place and commanded the homage of millions of Pilgrims."

(যদি গঙ্গাতীরে অবস্থিত হ'তো তবে 'নায়গ্রা'র মর্যাদা সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'তো। সঙ্ঘের 'চড়ুই-ভাতি' বা খুসীর রেস ভ্রমণের বদলে ভারতের বিভিন্ন অংশ হ'তে সমাগত পূজার্থী জনতার নিরবচ্ছিন্ন ভীড় সেখানে লেগে থাকতো, স্থানটি চমৎকার ভাব-গম্ভীর মঠ-মন্দিরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হ'তো এবং লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো)।

আর সেই জন্যই আমাদের বুদ্ধ, আমাদের পার্শ্বনাথ, সত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরেরও পূজা করেছিলেন—গড়ে তুলেছিলেন মঠ, বিহার, স্তূপ—শিল্পী-ভারতের স্বর্ণ যুগ। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে আমাদের মনকেই প্রয়োজন বেশী। সাধনপথের প্রদর্শক, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তির একমাত্র উৎস এই মন—এই পরম সত্যটা আমাদের ঋষিরা জেনেছিলেন বলেই আমাদের সাধনপথের প্রথম সোপান আত্মসংযম। মানবদরদী ভারতীয় ঋষিরা আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে মনকে আয়ত্ত করতে গিয়ে তাঁরা যা জানলেন, বুঝলেন সব লিখে রেখে গেলেন তীর্থ দেবালয়গুলির স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও কারুশিল্পে।

তীর্থযাত্রী হওয়ার প্রেরণা কবে থেকে যে ভারতের সাধারণ মানুষ পেয়েছিল, সে কথা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থই বলতে পারে না। কেউ বা বলেন যে বুদ্ধ শ্রমণরাই ভারতকে দিয়েছিল তীর্থ পর্যটনের উপদেশ এবং দেখিয়েছিল এর প্রয়োজনীয়তা। আবার 'আত্রেয়ী ব্রাহ্মণ' গ্রন্থেও এর নির্দেশ খুঁজে পাওয়া যায়—

"পৃথিবীতে তার জন্যে কোন সুখই নেই যে ভ্রমণে বিরত—সমাজে বাস করলে সাধু ব্যক্তিও অসাধু হয়ে যায়। ইন্দ্র পথচারিরই বন্ধু হয়ে থাকেন। অতএব ভ্রমণ কর।" আবার মহাভারতের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যুধিষ্ঠিরের তীর্থ পর্যটনের কাহিনী।

কিন্তু শুধু শাস্ত্রবাক্যই কি মানুষকে ঘর থেকে টেনে বার করেছে তীর্থের পথে? ঘরের কোণের হৃদয়টিকে নিয়ে এসেছে আকাশতলে? মনের সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে মুছে নির্মল হ'য়ে উদারতায় ভরে উঠেছে প্রাণ? না, বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান পেয়েছে মানুষ তীর্থের পথে। সমষ্টির মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় নিজেকে। জ্ঞানী-মূর্খ উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ত্যাগী-ভোগী সব একাকার হয়ে যায় এই মহাসমুদ্রের তীরে এসে। ব্যষ্টি ক্ষুদ্রতা হারিয়ে ফেলে সমষ্টির বিরাট রূপে; মুক্ত হয়ে যায় মানুষ। ভুলে যায় তার ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা।

নির্দেশ

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্তী, এম্-এ, কাব্যতীর্থ

তোমার নির্দেশে, প্রভু, এ জীবনময়
ঘুরিয়া বেড়াই একা রিক্ত নত-আঁখি—
অন্তরে তোমারে জেনে রয়েছি নির্ভয়,
কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ, নাহি মোর বাকি।
আকাশে উঠুক ঝড়, তুমি মোর স্নেহ,
প্লাবনে ভাসুক ধরা, তুমি মোর ভেলা,
সর্ব্ব অঙ্গে জানি প্রিয় আছে তব স্নেহ,
দৈন্যে পঙ্কে মগ্ন-মোরে করনিক হেলা।
পথহারা হব যবে গহন আঁধারে
জানি জানি তুমি তাহে জ্বালি' দিবে আলো।
টলমল তরী যবে বিশ্বপারাবারে
শুকতারা ভাতি তুমি মোর চিতে জ্বালো—
তোমারি জ্যোতিতে তাই আমি জ্যোতিষ্মান্
হে সুন্দর, গাহি যেন তব জয়গান।

মিত্রপূজা

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি, এল, বিদ্যাবিনোদ

বেদের দেবতা তুমি উজ্জ্বল সুহাস
ক্লান্ত মনে ধ্বান্ত, দেব, করিছ বিনাশ ;
অনাদিকালের সাক্ষ্য জগতের প্রাণ,
তোমা হতে জীব সৃষ্টি, প্রাণীর সম্মান।
দিবসে সবার নেত্র, আঁধারের অরি,
ঘুচে যায় পাপ-খেদ তব পদ স্মরি।
আঁধার বাড়ায় বোঝা—শোক-দুঃখ রাশি
প্রত্যয়ে দৃঢ়তা আনে তোমাতে প্রকাশি।
তোমার আলোকশিখা যতনে পুড়ায়
ক্লেদ-গ্লানি অবিরাম, আধারে উড়ায়।
সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ তোমার অন্তরে
জন্ম লয় তরু-গুল্ম পল্লীতে-প্রান্তরে ;
জন্ম লভি' নীর-গর্ভে, সূর্য-বীর্য ধরি'
দিয়াছ ধরাতে ফল পুষ্পরাশি ভরি'।
গুরু রূপে পূজা লহ, গ্রহরাজ তুমি,
সর্ব পাপ নাশ করি' রক্ষ মর্ত্যভূমি !
বরুণের জন্ম দিলে নিখিল তুমাতে
শান্তি-সুখ, স্বাস্থ্য-ভাতি নিয়ত তোমাতে ;
বীর্য শৌর্য উৎসরস তোমা' হ'তে ঝরে—
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব ত্রিভুবন ভরে।
নারী-মিত্র, জগন্মিত্র,—বিশ্বমিত্র তুমি,
ধরণী পবিত্র হয় তব কর চুমি।
ধরিত্রীর নেত্র তুমি, আদিম প্রভাতে—
দেখাও রূপের আলো জগৎ সভাতে।
বিষ্ণু-অক্ষি-জাত—বিষ্ণু পুরাণেতে কয়
বিশ্বরূপে নেত্ররূপ গীতা-পরিচয়।
সৃষ্টি হ'ল বারি বিন্দু অভ্র-গর্ভ মাঝে
সাগরে শিশিরে নিত্য তব শক্তি রাজে।
সরসী সলিলে চুমি তোমার কিরণ
সঞ্জীবিত মেঘরূপে—মধুর মিলন !
রবি-কর খরতাপে রোগ বীজ নাশি
লয়ে আসে প্রাণ নব উজলি প্রকাশি।
নব তেজ, দেহ নব, নবীন উৎসাহ,
ঘটাইছে রূপে-রসে আনন্দ উষাহ।
জটিলতা ছিন্ন করি এনেছ সরল
দিতেছ অমৃত, দেব যা ছিল গরল।
দিবাকর-কর স্পর্শে সুনির্মল বাট,
পূত বায়ু, পূত পত্র, জলাশয় ঘাট।
রবি-করে রূপায়িত পর্জন্য সরস,
আনন্দে আবাদ তুমি, বিকাশে হরষ।
অজানা জানাও তুমি, আলোক পরশে
নূতন জীবন আন নূতন বরষে।
আশা তুমি, আকাঙ্ক্ষার দীপ্তি তোমা হ'তে,
সপ্ত-অশ্ব নিয়োজিত তব ক্ষিপ্ররথে।
অন্তরীক্ষ হয়ে ওঠে উজল রঙ্গীন,
বর্ষার্দ্র বিতস্ত হয়, নদী বহে ক্ষীণ।
বর্ষালি ধাবিত হয় রশ্মিরজ্জু সাথে,
তমিস্রার তিরোধান বালার্কে শোভাতে।
পাপীরে সতর্ক কর, নিশায় যে জন
লোভ-মোহমত্ত হ'য়ে খুঁজেছিল ধন।
কুহক কল্পনা জাল মায়া-মরীচিকা
সরায়ে আনিছ নিত্য শক্তি সর্বাত্মিকা।
শক্তি দাতা, পুণ্য-দাতা তুমি অন্তর্যামী
শোষণ শাসনে দৃঢ়, তোমা' প্রণমামি।

গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইলে সেগুলি সাধারণ বিভাগ। অতএব গ্রন্থকার অথবা পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। ইতি—সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

১॥ **পাথর কাঁকর :** লেখক রঘুনাথ ঘোষ, মূল্য বার আনা, পৃষ্ঠা বত্রিশ, ঝিনুকপুর প্রেস, মালঞ্চ রোড। খরিদা, ঝিনুকপুর হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

'পাথর কাঁকর' কবিতার বইটিতে কুড়িটি ক্ষুদ্র কবিতা আছে—সবকটিতেই আধুনিকতার সুর ধ্বনিত। কবি হিসাবে রঘুনাথ ঘোষের ক্ষমতা কোন অংশে ন্যূন নয়। চেতনাকে জাগ্রত ও দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ রেখে কবি, রসসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং আঙ্গিক পারিপাট্যেও প্রায়শঃ দোষমুক্ত থাকতে সমর্থ হয়েছেন—আন্তরিকতার ত্রুটিও নেই। প্রচ্ছদপটটি চমৎকার, এঁকেছেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী।

অ ক, হ,

২॥ **ভক্তিপ্রসঙ্গ :** লেখক স্বামী বেদান্তানন্দ, পৃষ্ঠা ১৪৭, মূল্য একটাকা চারিআনা, প্রাপ্তিস্থান-মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।

'ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী'—তিনকালের যাহা সত্য তাহার মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থখানিতে এইকথাই চমৎকার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ অবলম্বনে দেবর্ষি নারদ বিরচিত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যাই—"ভক্তিপ্রসঙ্গের" বিষয় বস্তু ; কিন্তু সেই ব্যাখ্যার অন্তরালে লেখকের যে মানস-অভিব্যক্তি ও ধীশক্তির সমুন্নতি পরিলক্ষিত হয় তাহা যুগপৎ শিল্পীজনোচিত এবং ভক্তজনোচিত—যাহা একালে শুধুই দুর্লভ নয়, অপ্রাপ্য। হৃদয়বৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া চিৎ প্রকর্ষের রূপোৎসারঃ অর্থাৎ টলষ্টয় যাহাকে আন্তরিকতা বলিয়াছেন—সেই, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নিবিড়সম্পর্ক পাঠশেষে পাঠকচিত্তকে আর্দ্র করিয়া তোলে—তাহাই গ্রন্থটির মৌলিকতা ও অনন্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ। পরন্তু, ভাবের গাম্ভীর্য্য হইতে কুত্রাপি বিচ্যুত না হইয়াও গ্রন্থটিকে সাধারণ সংবেদ্য তথা উপাদেয় করিয়া তুলিতে লেখক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, এই হিসাবে শুধু ভক্তমণ্ডলী নয় জ্ঞানী-গুণী অর্থাৎ সাহিত্য রসিক সমাজে ইহা নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থ হিসাবে পরিগৃহীত হইবে। নারদীয় ভক্তি-সূত্র যতখানি কঠিন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা-উপদেশ ঠিক ততখানি সহজ—তাই ভক্তির শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া দুই বিষয়কে একইসঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখনীর বিরামহীনতা কামনা করি।

৩॥ **সুরলিপি :** লেখক স্বামী সত্যানন্দ, প্রাপ্তিস্থান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ি, বীরভূম, মূল্য ১৷৷০, পৃষ্ঠা ৪০

গ্রন্থখানি যে সঙ্গীতের তা এর নামকরণেই বোঝা যায়, কিন্তু সাধারণ গানের বইএর সঙ্গে এর একটা প্রধান পার্থক্যই হলো প্রাণের অনুভূতি ও আকুতিকে লেখক একেবারে মূর্ত করে তুলেছেন এবং সে অনুভূতিও সাধকজনোচিত। ভক্তি-মন্দাকিনীর তটদেশে প্রাণের উৎকণ্ঠা যখন মূর্ছনা সৃষ্টি করে তখন সঙ্গীত সত্যই অনির্বচনীয় রূপ হয়ে ওঠে অর্থাৎ সুর ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হয়। স্বামী সত্যানন্দের ভাবকল্পনার সমুন্নতি (Sublimity) দিব্য আবেশে শ্রোতাকে মুগ্ধ ক'রে তোলে, বিশেষতঃ যাঁরা সঙ্গীত সাধনা করেন তাঁদের নিকট "সুরলিপি" একখানি উপাদেয় 'জাগ্রত' গ্রন্থ, কারণ প্রত্যেকটা গানের সুবিস্তৃত স্বরলিপিও প্রদত্ত হয়েছে। গানগুলির মূল কথাটি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন, লেখক নিজেই বলেছেন—"প্রভু তেরে লিয়ে গায় এ গান, তেরে লিয়ে তব গয়ে প্রাণ।"

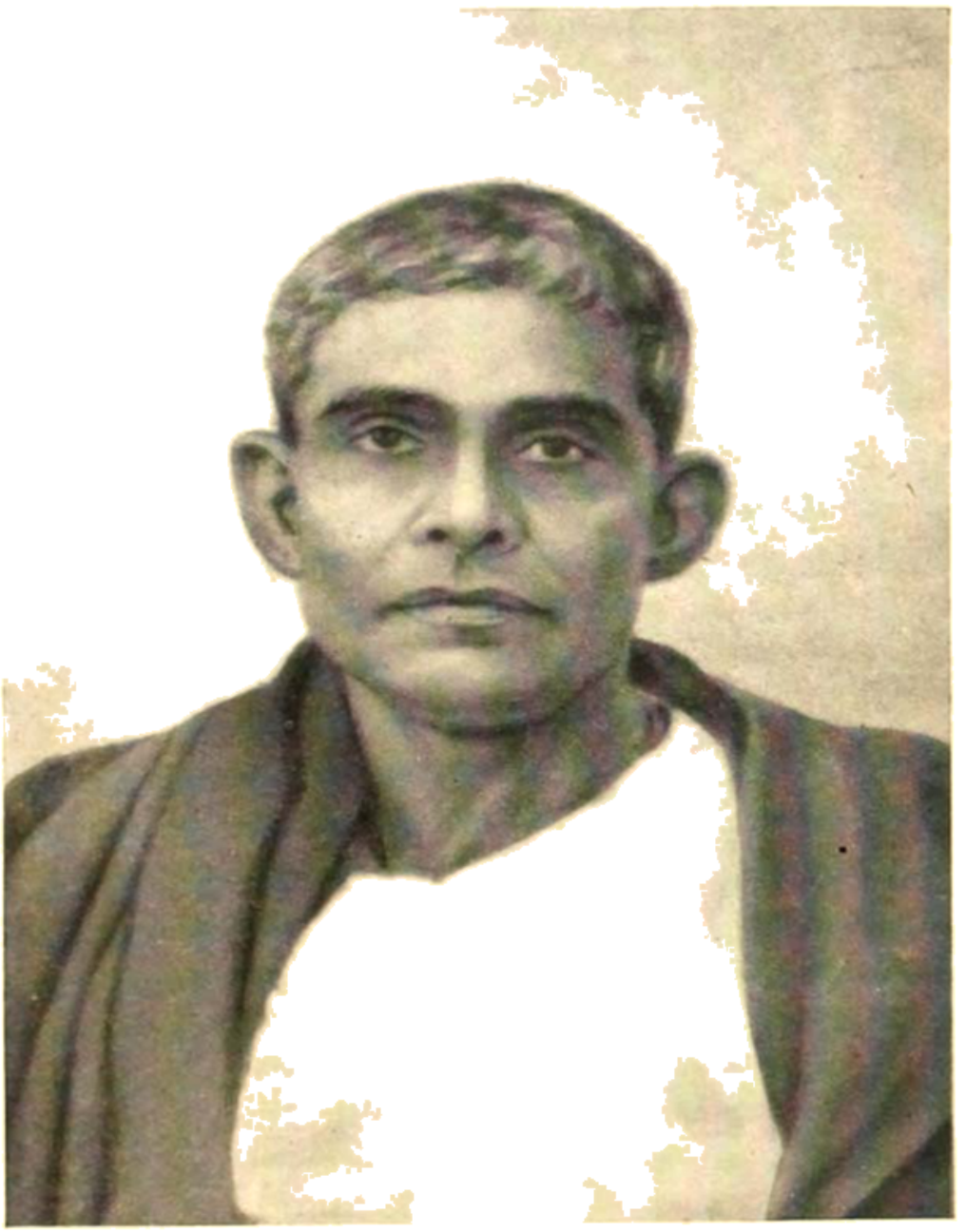

স্বামী বেদানন্দ

জন্ম : ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০১ দেহত্যাগ ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

বেদানন্দ স্বামিজীর মহাপ্রয়াণে

শ্রীযতীশ চন্দ্র মিত্র

বৈদগ্ধে বিরাট ছিলে, বেদানন্দ, কর্ম্মে ক্লান্তিহীন,
কর্ম্ম অন্তে ইষ্ট রামকৃষ্ণপদে হইলে বিলীন।
পুণ্যজ্ঞান মধুব্রতী, জীবনের যত আহরণ—
লেখায়, ভাষণে, গানে অবিরাম করেছ ক্ষরণ।

'বিশ্ববাণী' সাধনায় তন্দ্রাহীন দীর্ঘ দিন রাত—
মগ্ন রহি' করিয়াছ তিলে তিলে মর-দেহপাত।
মনোদৈন্য, নীচতার গ্লানিহীন অম্লান মানস,
তোমাতে দেখেছি সুধি, বলীয়ান সাধুর সাহস।

চিত্ত ছিল জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের ত্রিবেণী সঙ্গম,
ভাবাতীত নভশ্চারী কভু যেন মুক্ত বিহঙ্গম।
ঋজু আর অনাবৃত, অমায়িক লোক-ব্যবহার,
সহজেই ভাবা যেতো সকলেরি তুমি আপনার।

একদা যৌবনে শুনে' কার বাণী গৃহছাড়া হ'লে,
লিখাইলে নিজ নাম সমভাগ্য যুবকের দলে।
গুরুকৃপা জাহ্নবীতে পুণ্যদিনে তীর্থ স্নান করি'—
সুদূর পারের লাগি' ভাসাইলে জীবনের তরি।

কোথা হতে এসেছিলে, কোন্ দেশে করিলে প্রয়াণ
জানি না তা', জানি শুধু অই দেহে ছিল মহাপ্রাণ।
গুরুদেব বলেছেন, "দিতে পারো একটি জীবন?"
হে স্বামিজী, তাই তুমি দিয়ে গেলে, এ নহে মরণ।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মোৎসব

আগামী ২৪ মাঘ, ১৩৬৩ (ইং ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫৭) মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৪তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠান, কথকতা ও বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে।

স্বামী বেদানন্দ স্মরণে

যতদূর মনে পড়ে স্বামী বেদানন্দ ইংরাজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে (ডিসেম্বরের শেষের দিকে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান হুগলীজেলার অন্তর্গত জনাই-গ্রামে, প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে। চন্দননগরে তাঁর শৈশব ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। তিনি স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও দীক্ষিত সন্ন্যাসী ছিলেন। আজ আর নশ্বর শরীরে তিনি এজগতে নাই। প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে গত ১০ই ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৫·৪০ মিনিটে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণধামে গমন করেন।

স্বামী বেদানন্দজী আমাদের কাছে 'দেবেন দা' ও সর্বসাধারণের কাছে 'দেবেন মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন, কেননা তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'স্বামী বেদানন্দ' তাঁর গুরুপ্রদত্ত সন্ন্যাস নাম। তাঁর ব্রহ্মচারী-নাম ছিল 'দেবচৈতন্য'। স্বামী বেদানন্দ বা দেবেন দা' একাধারে সুবক্তা, সুলেখক, শিল্পী ও কবি ছিলেন। তাঁর অসংখ্য সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতা বাঙ্গলার বিভিন্ন পত্রিকায় বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। লেখক, ভক্ত ও অধ্যাপক মহলে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। যে কথা বা যে বক্তৃতা তিনি একবার শুনতেন, তার পরক্ষণেই হুবহু তা অনর্গল বলে যেতে পারতেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও কাব্যেই তাঁর নিবিড় অনুরাগ থাকলেও ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। ছবি-আঁকাতেও তাঁর পারদর্শিতা কম ছিল না। মোটকথা এমন বিষয় ছিল না যা দেবেন মহারাজের অধিগত ছিল না, বা এক কথায় তাঁকে living Encyclopaedia—জীবন্ত মহাকোষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। দেবেন মহারাজের বাগ্মীতা-শক্তিও ছিল অসাধারণ। ওজস্বিনী ভাষায় অবিশ্রান্ত গতিতে তিনি বক্তৃতা ক'রে যেতেন, এতটুকু ও ক্লান্তিবোধ করতেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন রসিকতায় অদ্বিতীয়, কথার রাজা ও বিরাট মজলিসী। কত গুণে গুণী ছিলেন যে দেবেন মহারাজ, তা' সত্যিই লিখে বা বলে বোঝানো যায় না। সবল ছিল তাঁর শরীর। সতেজ ছিল তাঁর মন ও সচল ছিল তাঁর লেখনী। সঙ্গীত রচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কণ্ঠও ছিল সুমিষ্ট, সতেজ ও মার্জিত। ভক্তিমূলক গান তাঁর অমৃতস্রাবী কণ্ঠে যেন মূর্ত হয়ে উঠত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও তিনি ছিলেন অতি প্রিয়। রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেছিলেন ও কত কথাই না তাঁর সম্বন্ধে ওজস্বিনী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি সকলকে শোনাতেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে গুণমুগ্ধ আমরা ও তাঁর অনুরাগীরা আজ মর্মাহত। স্মৃতির দর্পণে তিনি জাগরূক থাকলেও চাক্ষুষ দেখার জগতে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না বলে সকলেই অনুতপ্ত। তাঁর আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দের কতকগুলি ইংরাজী বইও তিনি অনুবাদ করে গেছেন। তাদের মধ্যে **India and Her People** বইয়ের অনুবাদ 'ভারতীয় সংস্কৃতি' 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম', 'যোগ-শিক্ষা', 'আত্মবিকাশ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'বাঙ্গালাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বইখানি তাঁর মৌলিক রচনা। এ'ছাড়া 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় তাঁর অজস্র প্রবন্ধ ও কবিতা তাঁর রচনা-প্রতিভার জলন্ত সাক্ষ্যই প্রদান করে। দেবেন মহারাজের অসংখ্য রচনা এখনো অপ্রকাশিত আছে। অপূর্ব মনীষার তিনি ছিলেন অধিকারী। ইষ্ট ও শ্রীগুরুর প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাঁর অমর আত্মা অবশ্যই চিরশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর ত্যাগ-তপস্যা দীপ্ত পার্থিব জীবনের স্মৃতিকে সার্থক ক'রে তুলবে।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

অষ্টাদশ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা
বার্ষিক মূল্য চারি টাকা.

মাঘ, ১৩৬৩
প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ : ফোন—৫৫—১৮০৫

JUST OUT !

MEMOIRS OF RAMAKRISHNA

by SWAMI ABHEDANANDA

(Third Edition)

- His Life Divine.
- Dialogues of the Master in 'Excellent English'
- Personality of the supermystic has become living in these sweet incidents

A learned introduction by the Swami throws a new light to understand the Life and Teachings of Sri Ramakrishna. This book has been translated into Spanish, Portuguese, Danish, Scandinavian, Szechoslovak etc. A critical and sincere reader will find this international book the best in the field and is sure to be blessed with serene peace and enlightenment by a deep study of it.

Demy 8vo, XVI+355. Pages 9 pictures Price : Rs. 7/-

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

পুনর্জ্জন্মবাদ

সকল প্রাণীই ক্রমবিকাশের পথে বার বার অগ্রসর হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। অনাদিকাল হইতে মানুষের এই পুনর্জন্মে বিশ্বাস। এ ছাড়া জগতের এত বৈষম্য—বিকাশের এই বিপুল তারতম্য সম্ভব নয়। যুক্তির চাইতে অনুভূতি করিয়াই ইহাকে, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় এই মতবাদকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্বামীজী মহারাজ অপূর্ব যুক্তি বিচার দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া এই পুনর্জন্মবাদকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নূতন সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য ২৲ টাকা।

SREE RAMAKRISHNA AND WORLD CULTURE

by TAMASHIRANJAN ROY

(Second Edition)

A novel and scientific study of the life and philosophy of Sree Ramakrishna. The approach is completely new and amply suited to the mood of the new age

Get a copy for your library. Price : Rs. 3/12

Published by Ramakrishna Vedanta Ashram, Darjeeling

Also to be had at :

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH 19B. Raja Rajkrishna St. Calcutta 6

প্রকাশক স্বামী সত্যজ্ঞানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বলভদ্রকুমার কর্তৃক প্রকাশিত

এবং ৪, বাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, বাসন্তী প্রেস হইতে শ্রীসন্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বিশ্ববাণী—মাঘ, ১৩৬৩

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	গুরুকৃপা (শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী)	(সংকলিতা)	৫১০
২।	শ্রীশ্রীমা	শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়	৫১৪
৩।	আমাদের মা ও স্বামী অভেদানন্দ	শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত	৫১৬
৪।	গুরু-তত্ত্ব	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৫১৮
৫।	যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্তী	৫২২
৬।	স্বামী বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীভোলানাথ গুপ্ত	৫২৯
৭।	বিবেকানন্দ-স্মরণোৎসবে (কবিতা)	শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার	৫৭০
৮।	অন্তিম শয়নে বুদ্ধদেব ...	শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ...	৫৭০

সদ্য প্রকাশিত !

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তি

শঙ্করনাথ রায়ের—

ভারতের সাধিক

১ম খণ্ড মূল্য—৫৲ ২য় খণ্ড মূল্য—৫৲

ব্রহ্মপুরুষ ও সাধুসন্তদের চরিত সঙ্কলন গ্রন্থ। যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, মরমিয়া প্রভৃতি মহাপুরুষদের লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের রসমধুর কাহিনীতে ভরপুর। একাধারে এতে রয়েছে প্রামাণ্য জীবনতথ্য, অধ্যাত্মরসের প্রস্রবণ, অলৌকিক আখ্যান ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

- প্রতি খণ্ড স্বয়ংপূর্ণ। প্রত্যেকটিতে সাত-আটটি করে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত জীবনচরিত রয়েছে, আর রয়েছে সাধুমহাত্মাদের অপরূপ চিত্রাবলী।
- পড়বার, বারবার পড়ে সঞ্চয় করে রাখবার ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত বই। রঙীন সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে মোড়ানো, ছাপা বাঁধাই অনবদ্য।
- সাধারণ পাঠাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারের পক্ষে অপরিহার্য চরিত-কোষ গ্রন্থ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর—

অনাদৃত মনীষী ও আচার্যের—

'মেন্ আই হাভ সীন'-এর সার্থক অনুবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রেখাচিত্র অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৯।	বঙ্গমাতা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রণীলা বর্মণার	৫৭৩
১০।	মুক্তিদাত্রী দেবী সরস্বতী	স্বামী বেদানন্দ	৫৭৭
১১।	দেবতার মন্দির (কবিতা)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য	৫৭৯
১২।	শেষ-সপ্তকে সহস্রবাহু	ধীরানন্দ ঠাকুর	৫৭৭
১৩।	ভারতীয় দর্শন	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৫৮৩
১৪।	অভেদানন্দ স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী	৫৮৯
১৫।	সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন ইতিবৃত্ত	অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য	৫৯০
১৬।	স্বামী বেদানন্দ ---	শ্রীঅনিলকুমার হালদার	৫৯৭
১৭।	কর্মযোগে রূপ আগে তারি (কবিতা) ...	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫৯৬
১৮।	জীবন সমস্যায় বিবেকানন্দ	স্বামী দুর্গানন্দ	৫৯৭
১৯।	পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ রায়		৫৯৮
২০।	সংঘবার্তা ...	...	৬০০

বিশ্ববাণীর গ্রাহকগণের প্রতি

নিবেদন

আগামী ফাল্গুন মাসে (১৩৬৩), বিশ্ববাণীর ঊনত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। দুই একটী বিশেষ কারণ বশতঃ আমাদিগকে ঐ বর্ষ হইতে বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য চারি আনা বৃদ্ধি (অর্থাৎ সডাক চারি টাকা, চারি আনা) করিতে হইল। আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্বক এই কথা স্মরণ রাখিয়া আগামী মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে ১৯শ বর্ষের বিশ্ববাণীর সডাক বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চারি আনা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বিশ্ববাণীর কার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার সহায়তা করিবেন আশা করি।

নিবেদক

ম্যানেজার—বিশ্ববাণী

'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম বা সপ্তম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

২। ফাল্গুন ১৩৬০, বিশ্ববাণীর ১৯শ বর্ষ আরম্ভ। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা চারি আনা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক দুই টাকা চারি আনা এবং ভাদ্র হইতে মাঘ—এই ছয় মাসেরই জন্য গ্রাহক হইতে হইলে সডাক তিন টাকা লাগিবে। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে তাহা নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে উহা জানাইতে হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের বিশ্ববাণী সেই মাসের ২৪ তারিখের মধ্যে না পাইলে গ্রাহকগণ সেই মাসের ২৫ তারিখ হইতে পরের মাসের তিন তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন। নচেৎ ঐ পত্রিকা সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

৫। 'বিশ্ববাণী'-র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম-ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না। প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, যথাসম্ভব **চার পাতার মধ্যে**, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে (গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া) সর্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত পূর্ণ নাম-ঠিকানা পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

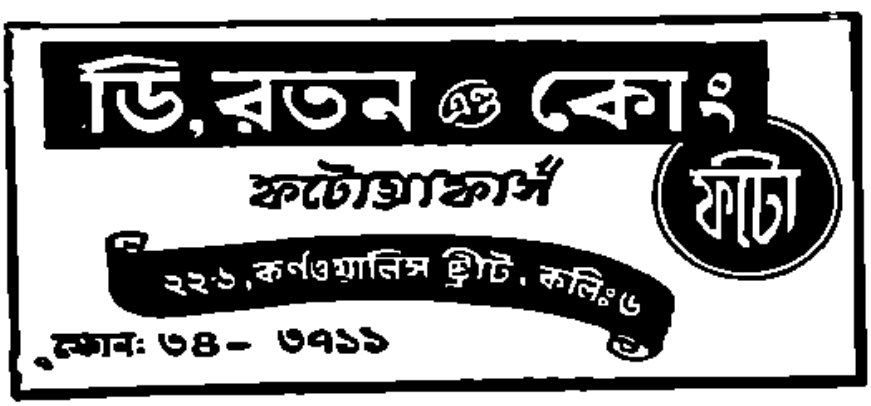

অষ্টাদশ বর্ষ | মাঘ—১৩৬৩ | দ্বাদশ সংখ্যা

॥ গুরুকৃপা ॥

"কি জান? মানুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর। যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে একরকম। ঈশ্বর জানবার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমাভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।

কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞান-ভক্তি হবেনা, আমি বুঝি বদ্ধ জীব। গুরুর কৃপা হ'লে কিছুই ভয় নেই। একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হ'য়ে ছানা হ'য়ে গেল। বাঘটা ম'রে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগল। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও 'ভ্যা-ভ্যা' করে, সেও 'ভ্যা-ভ্যা' করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হলো। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্। তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে। সেটাও 'ভ্যা-ভ্যা' করতে লাগলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বল্লে, দেখ্, 'জলের ভিতর তোর মুখ দেখ্—ঠিক আমার মত দেখ্। আর এই নে খানিকটা মাংস—এইটে খা।' এই ব'লে তাকে জোর ক'রে খাওয়াতে লাগ্‌ল। সে কোন মতে খাবে না—'ভ্যা-ভ্যা' করছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নূতন বাঘটা বল্লে, 'এখন বুঝেচিস, আমিও যা, তুইও তা; এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'—তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নেই! তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।

একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য, এ সংসার অনিত্য।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীমা

ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখবে।...আমাকে যে জগন্মাতা ভাববে তার পূর্ণজ্ঞান।

মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য (ঠাকুর) আমাকে এবারে রেখে গেছেন।

(শ্রীশ্রীমা)

ও সারদা, সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ)

শ্রীশ্রীমার উপরে শান্তভাব, ভিতরে ভয়ঙ্করী সংহার মূর্তি; তিনি দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা বগলা দেবীর অবতার। সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।

প্রথমে শ্রীশ্রীমা ও তাঁর কন্যাগণ, তারপর পিতা ও তাঁর পুত্রগণ। আমার কাছে শ্রীশ্রীমার কৃপাই প্রধান সম্বল।

শ্রীশ্রীমার জীবনের অদ্ভুত রহস্য তোমরা কেহই এখনও বুঝতে পারনি। শক্তির কৃপা ভিন্ন কিছুই যে হবার নয়।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

যার কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি, মা কৃপা ক'রে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই। তাই আগে শক্তির পূজা। ঠাকুরের কৃপা পেতে হলে প্রথমে মাকে প্রসন্না করতে হবে।

মাকে চেনা বড় শক্ত। মা সাক্ষাৎ জগদম্বা।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

শ্রীশ্রীমাকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হবে।...শ্রীশ্রীমা ছিলেন দশমহাবিদ্যার একজন। শ্রীশ্রীমা মহামায়াও বটে, মায়া মোচন করেনও বটে।

ঠাকুরের ছবির পাশেই শ্রীশ্রীমার ছবি রাখবে। শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকার ধ্যানে মার পূজা করবে।

ঠাকুর আমায় একদিন বলেছিলেন, 'ঐ মন্দিরের মা, আর এই নহবতের মা এক, অভেদ।' মা-সম্বন্ধ বড়ই মধুর ও খুব পবিত্র।

আমাদের মা যে-সে মেয়ে নয়। জগতের কল্যাণের জন্য, জীবকে মুক্তি দেবার জন্য স্বয়ং জগজ্জননী, লীলাদেহ ধারণ করে এসেছিলেন। আমাদের মায়ের নাম সারদা, মা-ই স্বয়ং সরস্বতী।

(স্বামী শিবানন্দ)

শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর অভেদ। শ্রীশ্রীমাকে দেখাও যা, ঠাকুরকে দেখাও তাই।

শ্রীশ্রীমার অপ্রাকৃত ভাগবতী-তনু, যদিও তিনি মনুষ্যদেহধারিণী।

শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি ঠাকুরের চেয়েও আমার বড়। মার ভাব, সমাধি হচ্ছে; কিন্তু কাহাকেও কি জানতে দেন? বুড়ো হলেও মার কাছে আমরা সব কচি, ছেলে মানুষ।

(স্বামী প্রেমানন্দ)

অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির ন্যায় মা ও ঠাকুর অভেদ।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)

শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা অভেদ। আমাদের মা সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি সব।

সকলই শ্রীশ্রীমার ইচ্ছায় হচ্ছে জেনে কায়-মনোবাক্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে পড়ে থাকার অপেক্ষা শান্তি আর কিছুতেই নেই।

(স্বামী সারদানন্দ)

আমার মা চিন্ময়ী, আমি সর্বদা তাঁর দর্শন

পাই। কৃপা করে মা অহরহ আমায় সূক্ষ্মভাবে দর্শন দিচ্ছেন। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী।

(অদ্ভুতানন্দ)

শ্রীশ্রীমা হ'লেন সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী। আবার মুক্তিদায়িনী মহামায়া।

(স্বামী অভেদানন্দ)

ঠাকুর ও মাকে অভেদভাবে দেখবে। ঠাকুরের কৃপা না হ'লে মাকে পাওয়া যায় না, মার কৃপা না হলে ঠাকুরকে পাওয়া যায় না।...ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মার কাছে শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হ'লে কোন কাজই হয় না।...ঠাকুর হলেন রাম ও কৃষ্ণ, মা হলেন সীতা ও যোগমায়া।

ঠাকুরের নামের চাইতে আমি মায়ের নামে বেশী জোর পাই। মাকে ডাকবে। ঠাকুর বড় দুষ্টু, একেবারে ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল। ঠাকুর মাকে দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'ওঁকে ডাকবি', তবেই আমার সব হয়ে গেল।

(স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)

মাতাঠাকুরাণী আর ঠাকুর কি আলাদা? এক ও অভেদ। (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ)

মাকে দর্শন করা আর ঠাকুরকে দর্শন করা এক কথা। (স্বামী অখণ্ডানন্দ)

ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী, স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সংসার যেন পরিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।

শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ জানকীমায়ী। (গৌরীমা)

বাপের চেয়ে মা বড় দয়াল। (নাগ মহাশয়)

ঠাকুরের চেয়ে মা দয়াবতী। ঠাকুর আমার গুরু এবং মা কিছু নয়, কিন্তু মার এত স্নেহ যে ঠাকুরকে যদি দিনে হাজারবার স্মরণ করি তো মাকে লক্ষবার মনে পড়ে। মা আর বাপ একই। তথাপি কাহারও কাহারও একটির উপর একটা বিশেষ টান থাকে। উভয়ে অভেদাত্মা। মায়ের উপর আমারও ঠাকুরের চেয়ে একটা বেশী টান এসেছে। আমি এখন মা, মা-ই সর্বদা করছি। আবদার, প্রার্থনা সব মায়ের কাছে। মাকে মনে করলেই ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। উভয়েই যেন একদেহ, এক দেহেই দুই বর্তমান।

ঠাকুর যেন প্রচণ্ড মার্তণ্ড, আর মা যেন স্নিগ্ধ চন্দ্রমা।

ঠাকুরের ও মায়ের দর্শনের ও কৃপার সমান ফল।

মায়ে ও ঠাকুরে অভেদাত্মা; দেহমাত্র দুই।

আরে পাগল, মা যে—সে-ই অন্যরূপে রামকৃষ্ণজী, সৃষ্টির স্বামী। তিনি ইচ্ছাময়ী ও আমাদের ঈশ্বরী। মা চৈতন্যময়ী ও চৈতন্যদায়িনী, লীলায় চৈতন্যঘনরূপিণী ব্রাহ্মণকন্যা।

(অক্ষয়কুমার সেন)

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করা হইল। (মনোমোহন মিত্র)

ঠাকুর এসেছিলেন ঐশ্বর্যবিহীন মানুষ নিয়ে, আর মা এসেছেন বাৎসল্য মাধুর্যের পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে; অপূর্ব স্নেহময়ী, করুণারূপিণী জগজ্জননী রূপে। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

আমাদের মা ও স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত

শক্তিকে বুঝিতে হইলে শিব হইতে হয়। এমন বিরাট শক্তিময়ী মাকে কে বুঝিয়াছিলেন? শ্রীঠাকুরই বুঝিয়াছিলেন। নতেৎ সমস্ত শক্তি সংহত, বাহ্যতঃ একটী গ্রাম্য গৃহস্থ-বধূ, তাঁহাকে কে চিনিত। শ্রীঠাকুর মাকে নিজের গর্ভধারিণী জননী ও মা কালীর সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। তাইত এই মহামায়া স্বরূপিণী মাকে পূজা করিয়া নিজের দীর্ঘকালব্যাপি অলৌকিক সাধনার অর্জিত ফল মায়ের পায়ে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই মহাশক্তিরূপিণী মার সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর বলিতেন:

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায়, রয়॥

মা'র অভ্যাস ছিল ফল মিষ্টি যাহা কিছু থাকিত তিনি সমস্ত ভক্তদের বিলাইয়া দিতেন। এক এক সময় কিছুই থাকিত না, এজন্য ঠাকুর একদিন মাকে অনুযোগ করিলেন: "এত খরচ করলে কি করে চলবে?" মা উহা শুনিয়া কোন জবাব না দিয়া নহবতে চলিয়া যান। তখন শ্রীঠাকুর ব্যস্ত হইয়া তাঁহার ভাইপো রামলালকে বলিলেন, 'ওরে রামলাল! যা তোর খুড়ীকে শান্ত করগে। ও রাগ করলে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।" একবার নিজের সেবক হৃদয় মুখুজ্যেকে বলিয়াছিলেন, "দেখ হৃদে, ও যদি রাগে তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও তোকে রক্ষা করতে পারবেন না।"

১৮৮৫ সালে শ্রীঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হয়। চিকিৎসার সুবিধার জন্য শ্রীঠাকুরকে ৫৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আনা হয়। প্রথমতঃ শুধু স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সন্তানগণই তাঁহার সেবার জন্য নিয়োজিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ শ্রীঠাকুরের সেবার জন্য এখানে আসিবার পর আর কখনও বাড়ী ফিরিয়া যান নাই। মা তখন দক্ষিণেশ্বরে মহাসমাধিবার দিন কাটাইতেছিলেন। সেই অবস্থায় একদিন শুনিলেন যে গোলাপ-মা নাকি বলিয়াছেন 'ঠাকুর মার উপর রাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়াছেন।' এ সংবাদ মায়ের কোমল প্রাণে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিল। তিনি গাড়ি করিয়া কলিকাতায় আসিয়া কাঁদিয়া সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া শ্রীঠাকুর রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "হ্যা, গোলাপ এমন কথা বলে' তোমায় কাঁদিয়েছে? সে জানেনা তুমি কে? গোলাপ কোথায়? আসুক না।" মা এ অপবাদ চিত্তহীন বলিয়া শান্তমনে দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া গেলেন।

পরে গোলাপ-মা শ্রীঠাকুরের কাছে গেলে তিনি বলিলেন, তুমি ওকে কি বলে কাঁদিয়েছ? জান না ও কে? এক্ষুণি গিয়ে ক্ষমা চাও গে।" শ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া গোলাপ-মা সেখান হইতে লোজা হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মার কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিলেন। মা তাঁকে আগেই ক্ষমা করিয়াছিলেন। মা যে কে, ঠাকুরের মত তাহা কে বুঝিত?

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘেরও অনেকে মাকে প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। লাটু মহারাজ যখন যানে তখন, তখন শ্রীঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: 'ওরে লেটো, তুই যার যান করছিস্, সে দেখ্‌গে ময়দা ঠাসছে।' এই বলিয়া তাঁহাকে আমাদের মায়ের কাজে সাহায্য করিতে নিয়োগ করিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কিন্তু প্রথম হইতেই মাকে পরমাপ্রকৃতিরূপে এবং নিজের 'মা' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সকলে যাঁহাকে শ্রীশ্রীমা বলেন, শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামিজী তাঁহাকে শুধু 'মা' বলিতেন এবং বড় মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ স্বামিজী) 'মা

ঠাকুরণ' বলিতেন। সাধারণতঃ যাহা 'উদ্বোধন' নামে পরিচিত, স্বামিজী মহারাজ সেটিকে মায়ের মন্দির বলিতেন।

তিনি প্রথম দিকেই "প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাং" স্তোত্র রচনা ক'রে মাকে শুনাইলেন। মা সন্তুষ্ট হইয়া, "তোমার মুখে সরস্বতী বসুক" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু বলিয়াছিলেন, "শঙ্করাচার্যের পর এমন সুললিত ছন্দে স্তোত্র শুনিনাই।"

অভেদানন্দ মহারাজ, ঠাকুরের মহাসমাধির পর মায়ের সহিত শ্রীবৃন্দাবন যান। সেখানে চুরাশি ক্রোশ পরিক্রমা করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। পরে মায়ের আদেশে মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী নিকুঞ্জদেবীকে লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। তখন তীব্র বৈরাগ্য, কোন মেয়েকে সঙ্গে আনিতে তাঁর অনিচ্ছা; কিন্তু মায়ের আশীর্বাদে শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবী সারাটা রাস্তা বিহ্বল ভাবে বসিয়া রহিলেন। স্বামিজী মহারাজের কোনরূপ অসুবিধাই হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে অভেদানন্দ মহারাজ ১৮৯৬ সনে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য বিলাত রওনা হইয়া যান এবং পরে স্বামিজী তাঁহার উপর রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রচার কার্যের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি এই কার্য অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে ২৫ বৎসর পরিচালনা করেন। এখানে স্বামিজী মহারাজ নিরামিষ আহার করিতেন কিন্তু শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় ডাক্তার মাছ মাংস খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্বামিজী মহারাজ মাকে ইহা লিখিলে—মা তাঁহাকে মৎস্য মাংস খাইতে আদেশ করিলেন। তিনি মাতৃগত-প্রাণ ছিলেন। মহাসমাধির পরই মা স্ব-স্বরূপে আমেরিকায় স্বামিজী মহারাজকে দেখা দেন। তাঁহার দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, মা দেহরক্ষা করিয়াছেন।

অভেদানন্দ মহারাজ মাকে শ্রীঠাকুরের সহিত অভেদজ্ঞান করিতেন। ঠাকুর যেমন পরমপুরুষ মা'ও তেমন পরমা প্রকৃতি। অন্যান্য অবতারের বিবাহ না করিবার এবং স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজন হইলেও মায়ের সহিত শ্রীঠাকুর একসঙ্গে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন দেহাতীত অবস্থায় থাকিত। আত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, অথচ স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীবের বীজ উহাতে নিহিত আছে। এইরূপে একসঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মে সমাহিত মনের পরীক্ষা শেষ হইল।

শ্রীঠাকুরের সহিত মার সম্বন্ধ অদ্ভুত। শ্রীঠাকুর মাকে 'মা' বলিয়া জানিতেন, আবার মা'ও শ্রীঠাকুরকে 'মা' বলিয়া জানিতেন। স্বামী অভেদানন্দের বয়স অল্প থাকায় মা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন। শ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর সকালের দিকে স্বামিজী মহারাজ মাকে এই নিদারুণ সংবাদ ব্যক্ত করিলেন। তখন মা "মা তুই কেন্দা গেলি গো" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অভেদানন্দ মহারাজ বলিতেন, "এরূপ অদ্ভুত সম্বন্ধ জগতের আর কোথাও দেখা যায় না।"

"পৃথিবীর মত সহ্যগুণ থাকা চাই। পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত উৎপাত কত উপদ্রব হ'য়ে যাচ্ছে, পৃথিবী কিন্তু সব একভাবে সহ্য করে যাচ্ছে। এই রকম সহ্যগুণ মানুষের হওয়া চাই।

"যদি শান্তি চাও কারু দোষ দেখবে না, দোষ দেখবে নিজের; জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।

"দুঃখপূর্ণই জগৎ। কেবল সুখ একটী—তাঁর নামে। তাঁর (ভগবানের) কৃপা যার ওপর হয়েছে সেই কেবল তাঁকে জানতে পেরেছে, আর সেইটুকুই তার সুখ।"

—শ্রীমা

গুরু-তত্ত্ব

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

হিন্দুধর্মে গুরুবাদ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বৈদিক যুগেও গুরু-করণের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ব্রহ্মবিদ্যার ফল্গুধারা প্রবাহিত হইত। মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১২) আছে, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' ইহার অর্থ, বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য মুমুক্ষু বেদজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ গুরুর সমীপে যাইবেন। তখন সদ্‌গুরু মুমুক্ষুকে যথাবিধি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।১১।২) আছে, "আচার্যদেবো ভব।" ইহার অর্থ, আচার্য বা গুরু তোমার আরাধ্য দেবতা হউন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।২৩) আছে, "যথা দেবে তথা গুরৌ।" ইহার অর্থ, ইষ্টদেবে যেমন পরাভক্তি, গুরুদেবে তদ্রূপ পরাভক্তি থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এখানে গুরুভক্তিকে ইষ্টভক্তির সমতুল্য বলা হইয়াছে। অন্য উপনিষদে আছে, "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ।" ইহার অর্থ, যাঁহার সিদ্ধগুরুলাভ হইয়াছে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১-১০-৫) শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।" অর্থাৎ মদভিজ্ঞ শান্তচিত্ত মদ্রূপ সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইবে, নচেৎ আমাকে পাইবে না। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আচার্যোপাসনা বা গুরুসেবা আত্মজ্ঞানের সাধনরূপে উপদিষ্ট। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন ধর্মমূঢ় হইয়া প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" ইহার অর্থ, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। আমি আপনার শিষ্য। আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করুন। শিষ্য-ভাব শ্রেয়স্কর মনোভাব। ইহা ব্যতীত পরমার্থ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। ইহা প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-দ্বার উন্মুক্ত হয়। গুরুভক্ত একলব্য দ্রোণাচার্যের সাক্ষাৎ শিক্ষা না পাইলেও সুশিষ্যত্বের বলে প্রার্থিত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। এইজন্য নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে, "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" সদ্‌গুরুর অভাব নাই, সুশিষ্যই বিরল। শিষ্যভাবে অধিরূঢ় হইলে গুরু স্বতঃই আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবনে দেখা যায়, তিনি কদাপি সদ্‌গুরুর সন্ধান করেন নাই; তোতাপুরী ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি সিদ্ধগুরুগণ তৎসমীপে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হন। ঈশ্বরই যোগ্য শিষ্যের যোগ্য গুরু জুটিয়ে দেন।

অবতার পুরুষগণও গুরুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। রামের গুরু বশিষ্ঠ ও কৃষ্ণের গুরু সন্দীপনী। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা-গুরু ঈশ্বর পুরী ও সন্ন্যাস-গুরু কেশব ভারতী। যীশুখ্রীষ্টও জন দি ব্যাপ্টিস্টের নিকট পুণ্যতোয়া জর্ডন নদীতে দাঁড়াইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। কবীরের গুরু রামানন্দ ও মীরাবাইয়ের গুরু রবিদাস। শোনা যায়, আধুনিক দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রমণ মহর্ষি গুরুকরণ করেন নাই। নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে তাঁহার গুরুলাভ হইয়াছিল, নচেৎ বাল্যকাল হইতে তিনি তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন কিরূপে? অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য বলেন, "নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।" ইহার অর্থ, গুরুর সহিত কদাপি অভেদবুদ্ধি করিবে না।

শংকরাচার্য তৎপ্রণীত 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে বলেন:

"শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো,
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনান্
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥"

অনুবাদ—এই জগতে শান্তচিত্ত মহাপুরুষগণ বসন্ত ঋতুর মলয়ানিলবৎ লোকহিত সাধনার্থ দেহ ধারণ করেন। তাঁহারা নিজেরা এই ভয়ঙ্কর ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং অহৈতুকী কৃপাবশে অন্য অন্য শোককেও সংসার সাগর পার করাইয়া দেন।

প্রচলিত 'গুরুগীতা' স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত। ইহাতে গুরুর সংজ্ঞা ও গুণাদি এবং শিষ্যলক্ষণ বিশদভাবে বর্ণিত। গুরুগীতায় ধর্মপথকে গুরুমার্গ বলা হইয়াছে। ইহাতে আছে, "জ্ঞানং নাস্তি গুরুং বিনা।" গুরু ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। সন্ত কবীর বলেন, "গুরু বিনা কোন্ বাতাওয়ে বাত্।" (গুরু ব্যতীত আর কে তত্ত্বোপদেশ দিতে পারেন?) এই বিষয়ে কবীরের এক দোঁহা এখানে উদ্ধৃত হইল :

"গুরু গোবিন্দ দোনো খড়ে কাকে লাগু পায়।
বলিহারি গুরু আপনে জিন গোবিন্দ দিয়ো বতায়॥"

অনুবাদ—গুরু ও গোবিন্দ দুইজন সম্মুখে দণ্ডায়মান। কাকে আগে প্রণাম করি? হে গুরুদেব, আপনার জয় হউক। আপনাকেই আগে প্রণাম করি; কারণ আপনিই আমার ইষ্টদেব গোবিন্দকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

উল্লিখিত গুরুগীতাতে (৫৮২) এই শ্লোকে পাওয়া যায় :

ভবারণ্যপ্রবিষ্টস্য দিঙ্মোহভ্রান্তচেতসঃ।
যেন সম্প্রাপ্যতে পন্থা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অনুবাদ—সংসার অরণ্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তির দিক্‌ভ্রম হইয়া থাকে। সেই পথভ্রান্তকে যিনি মুক্তিলাভের সুমার্গ প্রদর্শন করেন তিনিই গুরু। সেই গুরুকে নমস্কার।

সন্ত তুলসীদাস তৎপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ হিন্দিগ্রন্থ 'রামচরিত মানস'এ বলেন :

বন্দউঁ গুরুপদপদ্ম কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।
মহামোহ তমপুঞ্জ জাসু বচন রবিকর নিকর॥
সদ্‌গুরু পাবে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কমলাকে মমলা ছুটে যব আগ করে পরবেশ॥

অনুবাদ—কৃপাসিন্ধু নররূপী ভগবান্ গুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি। রবিকর যেমন অন্ধকার দূর করে তদ্রূপ তাঁহার উপদেশ অজ্ঞান নাশ করে। সদ্‌গুরু আসিয়া জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রভেদ নির্দেশ-পূর্বক শিষ্যকে জ্ঞান দান করেন। কাল কমলাতে অগ্নি প্রবেশ করিলে যেমন উহার কাল রঙ দূর হইয়া যায় ও লাল রঙ হয় তদ্রূপ সদ্‌গুরুর জ্ঞানালোকে শিষ্য-চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার চিরতরে বিদূরিত হয়।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠা সাধিকা মীরাবাই চামার জাতীয় রইদাসকে গুরুপদে বরণ করেন বলিয়া চিতোরগড়ে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। মীরাবাই বলেন :

সহজ কারজ জগতকে গুরুবিন পুরে নাহি।
হরিত গুরুবিন ক্যা মিলে সমঝ্ দেখ মন মাঁহি॥
সদ্‌গুরু ব্যাসা বৈদ ন কোই, পুছো বেদ পুরাণা।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর অমর লোক মে রহনা॥
খড়ি খড়ি যে পন্থ নেহারু মরম ন কোই জানা।
সদ্‌গুরু ব্যাসা ঔষধ দীনী রোম রোম ভয়ো চৈনা॥
নহি মে পিহর শাসরে রে নহি পিয়াজীরে পাস।
মীরা নে গোবিন্দ মিলিয়ারে গুরু মিলিয়া রইদাস॥
সদ্‌গুরু মিলিয়া মুজ পিছানি ব্যাসা ব্রহ্ম ব্যাস পাতি।
সতগুরু মুরা অমৃত পিয়ে নিওরা প্যাসা জাতি॥

অনুবাদ—জগতের সহজ কার্য গুরু বিনা পূর্ণ হয় না। তবে ভাবিয়া দেখ, সর্বাপেক্ষা কঠিন কর্ম যে হরিলাভ, গুরু ভিন্ন তাহা কিরূপে সম্ভব? বেদপুরাণাদি শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিবে, সদ্‌গুরু ভিন্ন ভবরোগের বৈদ্য আর কেহ নাই। মীরার প্রভু গিরিধারীলাল অমর লোকে

বাস করেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধর্মপথ নিরীক্ষণ পূর্বক দেখিতেছি, ধর্মের মর্ম কেহই জানে না। সদ্‌গুরু ভবরোগের এমন ঔষধ আমাকে দিলেন যে, আমার সর্বগাত্রে রোমাঞ্চ হইল। আমি পিতা, শ্বশুর বা পতির পার্শ্বে থাকি না। সৌভাগ্যক্রমে মীরা সদ্‌গুরু পাইয়াছে এবং তৎকৃপায় তাহার গোবিন্দ দর্শন হইয়াছে। সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া আমাকে ধর্মতত্ত্ব এমন সরলভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি অনায়াসে ব্রহ্মলাভ করিলাম। গুরুবান্ সাধকই প্রেমামৃত পান করেন, আর গুরুহীনের ধর্মপিপাসা কদাপি মিটে না।

গোরখপুরের মহাপুরুষ পওহারী বাবা বলিয়াছিলেন, 'গুরুকা দ্বারমে কুত্তাকা মাফিক পড়া রহো।' যেমন কুকুর স্বীয় প্রভুর গৃহদ্বারে উদরপূর্তির জন্য প্রাণপণ করিয়া পড়িয়া থাকে তদ্রূপ গুরুদ্বারে পড়িয়া থাকিলে তৎকৃপা বর্ষিত হয়। কবীরের শিষ্য কমাল ছিলেন সন্তদাদুর গুরুদেব। তের বর্ষ বয়সে সন্তদাদু গুরুকৃপা ও মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। সন্তদাদুর নিম্নোক্ত দোঁহাবলী গুরুতত্ত্বের গূঢ়রহস্য প্রকাশ করে :

গৈব মাহি গুরুদেব মিল্যা পায়া হম পরসাদ।
মস্তকে মেরে কর ধরা হৃদয়া অগম অগাধ ॥১
সদ্‌গুরু অংজন বাহি করি নয়ন পটল সব খোলে।
বহরে কানৌ সুনবে লাগে তাঁগে মুখসোঁ বোলে ॥২
সদ্‌গুরু কিয়া ফেরি করি মনকা ঔরৈ রূপ।
দাদু পহলে পলট করি কৈসে ভয়ে অনূপ ॥৩
বাহরি সারা দেখিয়ে ভিতরি কিয়া ছুয়।
সদ্‌গুরু শবদৌ মারিয়া জানন পাবৈ দূয় ॥৪

অনুবাদ—গুরুদেব আমার সহিত ইন্দ্রিয়াতীত স্থানে মিলিত হইয়াছেন। আমি তৎপ্রসাদলাভে ধন্য হইলাম। আমার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি আমাকে অযাচিত আশীর্বাদ করিলেন এবং আমি অসীম দীক্ষায় দীক্ষিত হইলাম। সদ্‌গুরু সমস্ত অঞ্জন মুছিয়া ফেলিয়া আমার নয়নের পটলগুলি খুলিয়া দিলেন। তখন বধির কাণে শুনিতে পাইল এবং বোবা মুখে কথা বলিল। হে দাদু, সদ্‌গুরু মনের পূর্বরূপ পরিবর্তিত করিয়া নবরূপ দিলেন। ইহার ফলে বহির্মুখ পঞ্চেন্দ্রিয় অন্তর্মুখ ও অনুপম হইল। বাহিরে আমাকে সারা (আস্ত) দেখিতেছ বটে, কিন্তু ভিতরে আমি চূর্ণ হইয়া গিয়াছি। সদ্‌গুরু যখন সেই অনাহত সঙ্গীত শোনান তখন বাহিরে কেহ জানিতে পারে না।

গুরুতত্ত্বের গভীরতা সুস্পষ্ট। সাধন পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই গুরুতত্ত্বের সুগভীর উপলব্ধি ঘটে। মধ্যযুগে ভারতীয় হিন্দুধর্মে গুরুবাদের অপূর্ব প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ভগবানকে ত ধরা-ছোঁয়া বা দেখা-শোনা যায় না। তাই তখন সিদ্ধ গুরুকে ইষ্টপদে অভিষিক্ত করা হইল। পশ্চিম অঞ্চলে সাধু অদ্যাপি গুরুজী বা ভগবান বলিয়া সম্বোধিত হন। সন্ত দাদু গুরুবাদ সম্বন্ধে যে সকল অর্থপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে তিনটী দোঁহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

দাদু কাঢ়ে কালমুখি অরু লোচন দেই।
দাদু ঐসা গুরুমিলা জীব ব্রহ্ম করি লেই ॥
সদ্‌গুরু মালা-মন দিয়া পবন সুরতি সোঁ পোই।
বিনা হাথ নিশিদিন জপই সরম জাপনু হোই ॥
ঘট ঘট রামরতন হ্যায় দাদু লখৈ ন কোই।
জবহি গুরু দীপক দিয়া তবহি সুঝন হোই ॥

অনুবাদ—হে দাদু, গুরুদেব কালের করাল কবল হইতে আমাকে কাড়িয়া আনিলেন ও অন্ধকে লোচন দিলেন। হে দাদু, এমন গুরু মিলিয়াছেন, যিনি কৃপা-কটাক্ষে জীবকে ব্রহ্ম করিয়া দেন। সদ্‌গুরু আমাকে যে মন-মালা দিয়াছেন তাহার গুটিকা শ্বাস। প্রেম-সূত্রে এই অদৃশ্য মালা গ্রথিত। বিনামালায় বা বিনা করে শ্বাসে শ্বাসে দিবানিশি এই অজপা জপ চলিতেছে। হে দাদু, রামরত্ন ঘটে ঘটে বিরাজিত; কিন্তু কেহ উহা দেখিতে পায় না। যখন শ্রীগুরু সাধনার প্রদীপ জ্বালিয়া দেন তখন সেই দিব্যালোকে হৃদয়স্থ ইষ্টদেব শ্রীরামকে দেখা যায়।

পূর্বোক্ত গুরুগীতার ৪৪ শ্লোকে গুরুর সংজ্ঞা এইরূপ :

গুকারশ্চান্ধকারস্তু রুকার স্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার বিনাশিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

(গুরু শব্দ গু+রু বর্ণদ্বয়ে গঠিত। গুকারের অর্থ অজ্ঞানান্ধকার ও রুকারার্থ উহার নিরোধক। অন্ধকার বিনাশক বলিয়া তাঁহার নাম গুরু।)

গুরু গীতার ৪৬ ও ৪৭ শ্লোকদ্বয়ে আছে :

গুকারশ্চ গুণাতীতো রূপাতীতো রুকারকঃ।
গুণরূপবিহীনত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥
গু কারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদি গুণভাসকঃ।
রুকারোঽস্তি পরং ব্রহ্ম মায়া-ভ্রান্তিবিমোচকম্॥

অনুবাদ—গু-বর্ণের অর্থে গুণাতীতত্ব ও রু-বর্ণের অর্থ অরূপত্ব। স্বরূপতঃ গুরু গুণত্রয় ও সর্বরূপের অতীত বলিয়া তিনি উক্ত নামে অভিহিত। প্রথম বর্ণ গু মায়াজাত ত্রিগুণের প্রকাশক এবং দ্বিতীয় বর্ণ রু মায়া-ভ্রম বিমোচক পরব্রহ্ম।

কলিযুগে সমর্থ সদ্‌গুরু অত্যন্ত দুর্লভ। তাঁহার আচরণ ভাগবত অনুসারে দুর্বিগাহ্য ও অলক্ষ্যধাম। তাঁহার জীবন আকাশবৎ সুবিশাল ও সমুদ্রবৎ সুগভীর। তিনি কখনও জড়বৎ, কখনও পিশাচবৎ কখনও বা উন্মাদবৎ আচরণ করেন। পরম সুকৃতিবলে সিদ্ধগুরু লাভ হয়। তদ্রূপ সাধকের পক্ষে সিদ্ধি লাভ অনায়াসে সম্ভব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, জাত সাপ কামড়ালে ভেকের আলা তিন ডাকে ছুটে হয় এবং সে গর্তে গিয়ে ঘরে পড়ে থাকে। আর যদি সিদ্ধগুরু পাওয়া না যায় উন্নত সাধককেও গুরু করা চলে। অধুনা অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞ সাধক গুরু-পদে বরণীয়। শেষে শুদ্ধ মনই গুরু হয়। তখন বাহ্য গুরু নিষ্প্রয়োজন। 'মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কাণে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে। এজন্যই গুরুকরণ কাহারো কাহারো পক্ষে আবশ্যক হয়। ভাগবতোক্ত দত্তাত্রেয় অবধূতের চব্বিশ গুরু ছিল। বিভিন্ন সাধনে সিদ্ধ হইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সদ্‌গুরু গ্রহণ করেন। নারীর পক্ষে নারী গুরু এবং পুরুষের পক্ষে পুরুষ গুরুই সর্বথা প্রশস্ত। অবশ্য উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দোষণীয় নহে। দীক্ষালাভের পূর্বে 'রাত্রে দেখা ও দিনে দেখা' উচিত; কিন্তু দীক্ষা-লাভের পরে গুরুবাক্যে ষোল-আনা বিশ্বাস দরকার। সিদ্ধ গুরু ভবসাগরের কর্ণধার। শিষ্যের মুক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। সুতরাং এই আত্মিক সম্বন্ধ বহুজন্ম ধরিয়া স্থায়ী হয়।

গুরুগীতা অনুসারে গুরু সাত প্রকার—সূচক, বাচক, বোধক, নিষিদ্ধ, বিহিত, কারণ ও পরম। সূচক গুরু সাধারণ বা প্রাথমিক ধর্মবিধি শিক্ষা দেন। বাচক গুরু ধর্মনীতি ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেন। বোধক গুরু ভিন্ন ভিন্ন কাম্য ফল লাভার্থ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা দেন। নিষিদ্ধ গুরু মারণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, আকর্ষণাদি অসৎকর্মে সাফল্য লাভের জন্য মন্ত্র ও ক্রিয়া শিক্ষা দেন। শত্রুকে মারণ, প্রিয়া নারীকে বশীকরণ অথবা ভূতপ্রেতাদিকে অনুগত করা যায় মন্ত্রবলে বা ক্রিয়াবলে। ১৯৩৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন বেলুড় গ্রামে লালবাবা আশ্রমে ছিলাম তখন বনগাঁও হইতে অপরিচিত দুই ব্যক্তি আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন দীক্ষিত ও ব্যবসায়ী দর্জি ছিলেন। তিনি কলিকাতার কোন গুরুর নিকট কয়েক বৎসর পূর্বে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। যখন তাঁহার গুরু মৃত হইয়াছিলেন তখন বনগাঁওতে এক সন্ধ্যায় গুরুদত্ত মন্ত্রজপকালে তিনি এক ভয়ঙ্কর নর-কঙ্কাল দেখিয়া মূর্ছিত হন এবং মূর্ছা ভঙ্গের পর দেখেন, এক বালক ভূত তাঁহার সমীপে সহাস্যবদনে উপবিষ্ট। সেই বালক প্রেতাত্মা দুইবর্ষ যাবৎ তাঁহার নিকটে সর্বদা ছিল। ভূতপ্রেত বা ব্রহ্মদৈত্য দ্বারা কেহ আক্রান্ত হইলে মন্ত্রবলে তাঁহাকে রক্ষা করা যায়। এই সকল মন্ত্রবলে ভূতসিদ্ধ বা প্রেতসিদ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু

ঈশ্বর-দ্রষ্টা হওয়া যায় না। বিহিত গুরু-সংসারাসক্তি বিনাশপূর্বক শিষ্যকে বিবেক-বৈরাগ্য লাভে প্রবল প্রেরণা দেন। আর কারণ-গুরু শিষ্যকে উপনিষদোক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়ের মর্মার্থ গ্রহণে সাহায্য করেন। সন্ন্যাস-গুরুর ইহাই মুখ্য কর্তব্য। যে গুরু ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন তিনি বেদোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের ভাবার্থ বুঝাইয়া দেন এবং দীক্ষাগুরু বীজযুক্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরম গুরুই মোক্ষগুরু। পূর্বোক্ত সপ্তবিধ গুরুর মধ্যে ইনিই উত্তম। ইনি মহাবাক্যের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে শিষ্যকে সাহায্য করেন। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সুশিষ্যকে করামলকবৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানে সমর্থ। সিদ্ধগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বা গোবিন্দপাদ যথাক্রমে, বিবেকানন্দ ও শংকরাচার্যকে স্পর্শমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। (ক্রমশঃ)

যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্তী

ভগবান বলিয়াছেন যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় অর্থাৎ অধর্ম প্রবল হয়, তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া অধর্মের বিনাশ করিয়া থাকেন। এরূপ আশ্বাস-বাণী পৃথিবীর আর কোথাও শ্রুত হয় নাই। ইহাতে বিশ্বাসীর আশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। যাহারা ইহাতে বিশ্বাসী, তাহারা অসত্য ও অনাচারের বীভৎস মূর্তি দেখিয়াও ভীত হইবে না—দমিবে না। অসত্য ও অধর্মের উত্থান-পতন অনিবার্য বটে, কিন্তু পরিণামে যে ধর্মেরই জয় হইবে, অসত্য নষ্ট হইয়া সত্যই প্রাধান্য লাভ করিবে ইহাই ঘোষণা করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্মে ঈশ্বরপুত্র ঈশার পুনরাবির্ভাবের ও স্বর্গরাজ্য স্থাপনের বিষয় উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহা অস্পষ্ট। ইসলাম ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন যে, হজরত মহম্মদ শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ; ইহার পর আর কোন প্রেরিত পুরুষ আসিবেন না। এই উভয় ধর্মেই অবতারবাদ পরোক্ষে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে ইহাতে একেবারে নিরাশ হইতে হয়; কোন আশ্বাসই পাওয়া যায় না। এ অবস্থা পরবর্তীদের পক্ষে আত্মরক্ষার অনুকূল নহে। বহুবার এরূপ মহাপুরুষ ও অবতারগণ, বিভিন্ন নামে এবং সময়োপযোগী প্রণালীতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই পর্যায়ে পড়েন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ব্যভিচারে সমগ্র ভারত যখন অধঃপাতের চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে পবিত্র ভারতবর্ষের ধর্মভিত্তি যখন বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন অবতার শ্রীশঙ্কর আবির্ভূত হইয়া তৎকালীন অনাচার দূর করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃস্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের কয়েক শতাব্দী পরে দেশ পুনরায় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া এক পূতিগন্ধময়, আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই দুর্দিনে কতগুলি অদূরদর্শী ও হৃদয়হীন লোক, বিধবা নারীর সম্পত্তি পাইবার জন্য এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার করিল। জীবন্ত নারীকে বলপূর্বক জলন্ত অনলে পোড়াইবার ও ঐরূপ অপরাপর অনেক

নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে দ্বিধা-বোধ করিল না।

দেশের এই দুর্দশার দিনে রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হইয়া সামাজিক দুর্নীতি ও পাপাচারের মোহোদ্বেগ মন্দীভূত করেন এবং প্রতিকূল কর্মশক্তির প্রেরণা দ্বারা ভাবী কর্মক্ষেত্র রচনা করিয়া যান। কিন্তু দেশবাসী তথাপি সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারে জর্জরিত হইয়া নিয়তই তাহাদের মুক্তিদাতা কোন অবতারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেশের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আবির্ভূত হন। অপরাপর প্রেরিত পুরুষদের ন্যায় তাঁহার জন্মগ্রহণ ব্যাপারেও অলৌকিকত্ব রহিয়াছে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন অবতার মহাপুরুষ তাঁহাদের অভীষ্ট সত্যধর্ম প্রচার একাকী করেন নাই। তাঁহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা সামান্য পূর্ব-পরে তাঁহাদের লীলা-সহচরগণ আবির্ভূত হইয়া যুগবাণী প্রচার করিয়াছেন এবং সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টপার আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ভক্ত "পল"কে দেখিয়া তদ্দেশীয় জনগণ মোহিত হইয়াছিল। ভক্ত "পল"ই প্রভু যীশুর আগমন ঘোষণা করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধ রাজা অশোকের যোগে পৃথিবীকে তাঁহার সত্যধর্ম প্রচার দ্বারা পবিত্র করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহকর্মী ছিলেন ভক্ত অর্জুন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার লীলাসহচর নরেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমুলিয়া দত্ত পরিবারে আবির্ভূত হইলেন। শিশু নরেন্দ্র দত্ত পিতামাতার স্নেহে অপরাপর বালকদের ন্যায় দিন দিন বর্ধিত হইয়া ক্রমে বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথ বি, এ পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতিভা ও কর্মশক্তি বিকাশ পাইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা, আর্তের প্রতি সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত একটী মন্তব্য তৎকালীন অদ্বিতীয় দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেন। মহামতি স্পেন্সার ইহা পাঠ করিয়া যুবক নরেন্দ্রের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হন এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। ছাত্রজীবনে পাশ্চাত্য দার্শনিকের নিকট এরূপ উৎসাহলাভে অপর কেহ সমর্থ হন নাই। সত্যান্বেষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। তিনি যে কোন ফকির, সন্ন্যাসী ও পাদ্রী দেখিলেই ধর্ম সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রশ্নে ও তর্কে তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধির লোক অতি বিরল। নরেন্দ্রের নিকট গোঁজামিল, সন্দেহ অথবা অন্ধবিশ্বাসের স্থান ছিল না। অনুভূতি-বিহীন, মাত্র গ্রন্থ-বিশেষে লিখিত মতবাদে তাঁহার উৎসুক হৃদয় শান্ত হইত না।

নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থাদি পাঠে ও ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে নাস্তিক্যবুদ্ধি অঙ্কুরিত হইতেছিল। ইহার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়নের ফলে নরেন্দ্রনাথ পূর্ণ নাস্তিক্য বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি নাস্তিকবাদ যুক্তি-তর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেন। শুধু তাহাই নয়, যাহার সঙ্গে আলোচনা করিতেন তাহাকেই তাঁহার যুক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার নিজ হৃদয় তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না।

সে সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব দেশব্যাপী এক নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যান্বেষী নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই

নূতন ধর্মপ্রণালীর ভিতর তাঁহার হৃদয়ের অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিবার আশায় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্মীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। নরেন্দ্রনাথের গান গাহিবার কণ্ঠ অতিশয় মধুর ছিল। কলেজে পড়িবার সময়েই তিনি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ প্রতিভা দেখাইতে থাকেন। সুদক্ষ ও সুকণ্ঠ গায়করূপে যুবক নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে ভজন-মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বীণানিন্দিত সুমধুর সঙ্গীতে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান নেতারা মোহিত হইয়া পড়িতেন। তিনি হিন্দু হইলেও তাঁহার মতের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মূল নীতির ও ব্যবহারের কোন প্রভেদ ছিল বলিয়া বুঝা যায় নাই। ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে কিছুদিন থাকার পর যুবক নরেন্দ্রনাথের নাস্তিক্য বুদ্ধি শিথিল হইয়া পড়ে। সে সময় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের গোস্বামী মহাশয়ের ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী উপাসনায় শ্রোতৃমণ্ডলী তন্ময় হইয়া যাইতেন। একদিকে নরেন্দ্রনাথের সুমধুর সঙ্গীত, অপরদিকে আচার্যদের প্রাণবন্ত উপাসনা দেশবাসীর হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের ও এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। এভাবে দিন কাটিতে লাগিল; নরেন্দ্র-নাথ বি, এ পাশ করিয়া আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সর্বপ্রথম তাঁহার "মেসেঞ্জার" নামক কাগজে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করার ফলে ঠাকুরের নাম শিক্ষিত ও ছাত্রমহলে প্রচারিত হইয়াছিল। একদিন নরেন্দ্রনাথের সহপাঠিগণ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে নরেন্দ্রনাথ তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতাবশতঃ তখন যাওয়া নিরর্থক মনে করিলেন কিন্তু তাঁহার সহপাঠিগণ ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক শুনিতে কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ সঙ্গী সমভিব্যাহারে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবের সকাশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সাধারণ বেশধারী অতি সাদাসিদে গোছের সরল ভাবাপন্ন একটী লোক। মনে হয় যেন হৃদয় আনন্দে ভরপুর। সঙ্গিগণ নরেনের পরিচয় করাইয়া দিয়া এক অভিনব দেখিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। পরিচয়কালে, নরেন ভাল গান গাহিতে পারেন বলায় ঠাকুর তাঁহাকে গান গাহিতে বলেন। নরেন্দ্রনাথ গান ধরিলেন। স্বামিজীর কোমল কণ্ঠের বীণা-বিনিন্দিত সুরে মোহিত না হয় এমন লোক বড় ছিল না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং তথায় পুনরায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সত্যান্বেষী ও তার্কিক যুবক নরেন্দ্রনাথ তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। "ঈশ্বর কি দেখা যায়?" ঠাকুর বলিলেন "নিশ্চয় দেখা যায়।" প্রশ্ন হইল "আপনি দেখিয়াছেন?" উত্তর: "দেখিয়াছি, তোকে যেমন দেখিতেছি, এ ভাবেই দেখা যায়।" পুনরায় প্রশ্ন হইল "আমাকে দেখাতে পারেন?" উত্তর: "অবশ্য পারি," "তাঁহাকে ইহা যায় ছোঁয়া যায়।" স্বামিজী উত্তর শুনিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, বলিলেন "এই আজ সর্বপ্রথম এরূপ উত্তর শুনিলাম। এ-যাবৎ কেহই ত এত পরিষ্কারভাবে ও এত দৃঢ়তার সহিত এরূপ উত্তর দিতে পারে নাই।" স্বামিজী আরও একটু পরীক্ষা করার জন্য বলিলেন "আমাকে দেখান ত।" ঠাকুর বলিলেন, "আমার নির্দেশমত চলিলে তাঁহার দর্শন পাইবে" এবং স্বামিজীকে স্পর্শ করিলেন। স্বামিজী সমাধিস্থ হইয়া এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেইসঙ্গে উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে আধ্যাত্মিক জগতের কি আদান প্রদান ও ভাব বিনিময় হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু সেদিন হইতে নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ যেন বদলাইয়া গেলেন। ঐ দিনটি তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ দিন। এ দিন হইতে তিনি অবসর পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে

লাগিলেন। সেই তার্কিক নিরীশ্বরবাদী নরেন্দ্রনাথ যেন আর পূর্বের নরেন রহিলেন না। একেবারে আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সেই সাধের ওকালতি ও পার্থিব পরিকল্পনা সব যেন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল। বাটীস্থ সকলে নরেনের এই হঠাৎ পরিবর্তন দেখিয়া, তাঁহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। একবার যে অমৃতরসের সন্ধান পাইয়াছে তাহাকে কি আর শুড়ের প্রলোভনে আবদ্ধ করা সম্ভব? নরেন্দ্রনাথ এখন ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি এখন মুক্ত পুরুষ। ঠাকুরের কথায় বলিতে হয় নরেন্দ্রনাথ "বুড়ি ছুঁইয়া রহিয়াছেন।" ইহার অত্যল্পকাল পরেই নরেন্দ্রনাথ বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমেই দুই একটী করিয়া ঠাকুরের ভক্ত ও লীলা-সহচরগণ আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। যাঁহারা আন্তরিকতার সঙ্গে আসিতেন তাহাদের মধ্য হইতে এগার জন ভক্তকে ঠাকুর এক শুভ মুহূর্তে "গৈরিক" দিয়া দীক্ষিত করেন। ইহাদের মধ্যে নরেন দত্ত অর্থাৎ পরবর্তী বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বপ্রধান। এগার জন ভক্তের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল:

১।	নরেন্দ্রনাথ দত্ত	স্বামী বিবেকানন্দ
২।	রাখালচন্দ্র ঘোষ	" ব্রহ্মানন্দ
৩।	কালীপ্রসাদ চন্দ্র	" অভেদানন্দ
৪।	বাবুরাম ঘোষ	" প্রেমানন্দ
৫।	শশিভূষণ চক্রবর্তী	" রামকৃষ্ণানন্দ
৬।	তারকনাথ ঘোষাল	" শিবানন্দ
৭।	শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী	" সারদানন্দ
৮।	যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	" যোগানন্দ
৯।	লাটু	" অদ্ভুতানন্দ
১০।	নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ	" নিরঞ্জনানন্দ
১১।	বুড়োগোপাল (গোপালচন্দ্র ঘোষ)	" অদ্বৈতানন্দ।

ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে বলিতেন 'নরেন আমার খাতার ঘর'। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট (৩১ শ্রাবণ ১২৯৩) ঠাকুর পরমহংসদেবের দেহ রক্ষা করেন। ইহার পর স্বামিজী উত্তরাখণ্ডে ও হিমালয়ে ছয় বৎসর কাল পরিভ্রমণ করিয়া তিব্বত যান এবং তথায় বৌদ্ধধর্ম আলোচনান্তে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেত্রীর মহারাজা অজিৎ সিংকে দীক্ষিত করেন। ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন শেষ করিয়া মাদ্রাজ গমন করেন এবং তথায় রামনাদের রাজার সঙ্গে স্বামিজী পরিচিত হন। রাজা স্বামিজীর জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হন; ১৮৯০ খৃঃ উক্ত গুণগ্রাহী মহানুভব রাজার সহায়তায় ও মাদ্রাজবাসী বন্ধু ও ভক্তদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বামিজী সুদূর আমেরিকা গমন করেন। যথেষ্ট অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে তাঁহাকে সর্বপ্রথম নিউ ইয়র্কে দিন কাটাইতে হইল। অতীব শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া একদিন এক রাস্তার পাশে একটী বেঞ্চের উপর বিশ্রাম করিতেছিলেন, সে সময় নিকটস্থ একটী বাটী হইতে জনৈকা মহিলা, এক অপরূপ পোষাক পরিহিত সুন্দর যুবককে দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হন এবং নিকটে আসিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। স্বামিজীর অবিরাম বিশুদ্ধ ইংরেজী শুনিয়া মহিলাটী অধিকতর কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে তাহার নিকটস্থ বাড়ীতে নিয়া যান এবং স্বামিজী অভুক্ত আছেন জানিয়া তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করেন। আহার-কালীন অত্যল্প সময়ের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হইল তাহাতে স্বামিজীর প্রতি মহিলাটীর শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইয়া উঠিল। উক্ত মহিলাটী সম্ভ্রান্ত বংশের এবং তৎকালীন পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নের (Parliament of Religion) সভাপতির বিশেষ পরিচিতা। এই মহিয়সী মহিলাটীর চেষ্টায় স্বামিজী ঐ বিশ্বধর্মসভায় মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য বক্তৃতা করিবার অনুমতি পাইলেন। স্বামিজী পূর্বে কখনও এরূপ বৃহৎ সভায় বলিবার সুযোগ পান নাই। নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে স্বামিজী তাঁহার ভারতীয় গৈরিক আলখাল্লা ও উন্নত পাগড়ী পরিহিত হইয়া

বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইলেন। বক্তৃতারম্ভে "হে আমার প্রিয় আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাবৃন্দ!" বলিয়া সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলী এ উদার সম্বোধনে আত্মহারা হইয়া দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘন ঘন করতালি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করেন। এরূপ উদার ও প্রিয় সম্বোধন তাঁহারা ইতিপূর্বে আর শোনেন নাই। ইহার ভিতর তাঁহারা ঈশার বাণী ধ্বনিত হইতে শুনিলেন। ঈশা ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাহার মর্যাদা খৃষ্টানদিগের মধ্যে খুব কম লোকই রক্ষা করিতেন।

পরদিবস বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য তুমুল বাকযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন কিন্তু কেহই কোন নিশ্চিত ও সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। অবশেষে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য স্বামিজীর বক্তব্য উপস্থাপন করিবার নির্দেশ আসিল। স্বামিজী উক্ত ধর্মমহাসভায় উপস্থিত অগণিত মনীষী ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকদিগের নিকট তাঁহার সুললিত ও ওজঃস্বিনী ভাষায় সংক্ষেপে কূপমণ্ডুকের গল্পটী বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম গণ্ডীবদ্ধ সুতরাং সার্বভৌমিক নহে। এ সব বিভিন্ন গণ্ডীবদ্ধ সম্প্রদায়ের তুলনা দ্বারা প্রকৃত সত্যে পৌঁছান সম্ভব নহে। একমাত্র ভারতীয় বৈদান্তিক ধর্মই সার্বভৌমিক এবং প্রত্যেক ধর্মই সেই সার্বভৌমিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামিজীর এই বক্তৃতার পর সকলের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেদিন হইতে স্বামিজীর প্রত্যেক বক্তৃতাতে সভাগৃহে আর লোক ধরিত না।

স্বামিজী ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এ ভাবে পাশ্চাত্যজগতে বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। বড়ই পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় এই যে যখন স্বামিজী বিশ্ব-ধর্ম সভাতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তথায় নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন, সে সময় ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের কতিপয় সংকীর্ণ হৃদয় লোক স্বামিজীর বিরুদ্ধে 'স্বামিজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি নন' বলিয়া প্রচার করিয়া স্বামিজীকে একটু অসুবিধায় ফেলিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনাচক্রে ইহাই স্বামিজীর কাজে পরে সহায়তা করিয়াছিল; তাঁহার গৌরব খর্ব করিতে পারে নাই। যাহা হউক স্বামিজী তাঁহার গুরু-ভাই স্বামী অভেদানন্দজীকে (কালী তপস্বী) পাশ্চাত্য জগতে ডাকিয়া লন এবং তাঁহার অপূর্ণ কাজের ভার তাঁহার উপর অর্পণপূর্বক নিজে স্বদেশে আসিয়া সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণ মঠ এবং দেশে দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও জনহিতকর কাজ করিবার কেন্দ্র স্থাপন করিলেন।

স্বামিজীর অমায়িক ও সহৃদয় ব্যবহারেও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে পাশ্চাত্য জাতি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিল। চিকাগোর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া "নিউইয়র্ক হেরল্ড" (New York Herald) পত্রিকার সম্পাদক পরদিন লিখিয়াছিলেন:—"হিন্দুজাতির ন্যায় পণ্ডিত জাতির মধ্যে খৃষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে অতিশয় নির্বুদ্ধিতার কার্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পর তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" আমেরিকায় বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করিয়া স্বামিজী ইংলণ্ডে আসেন এবং তথায় সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া অতিশয় শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এই সময় প্রফেসর মেক্সমূলারের (Max muller) সহিত তাঁহার দেখা ও আলোচনা হয়। তিনি Miss Margaret Noble নাম্নী মহিলাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেন। ইনিই পরে সিষ্টার নিবেদিতা (Sister Nivedita) নামে পরিচিতা হন।

১৮৯৭ সনে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় স্বামিজী পুনরায়

ইউরোপে গমন করেন। সে সময় প্যারীস নগরীর Congress of Religion এর সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় তিনি ফরাসী ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসর জাপান দেশে ধর্ম সম্বন্ধে অপর একটি Congress বসে এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তথায় নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

ত্যাগ ও সেবাই স্বামিজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। জনসেবার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনই প্রধান এই বেলুড় মঠেই ১৯০২ খৃঃ অব্দে ৪ঠা জুলাই স্বামিজী দেহ রক্ষা করেন।

বিশ্বজনীন ধর্ম স্থাপন উদ্দেশ্যেই স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বেদান্ত প্রচার দ্বারা পৃথিবীর সর্বধর্ম ও সর্বজাতি সমন্বয় সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কঠিন বেদান্ত ও রাজযোগ অতি সরলভাবে ইংরেজিতে প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আচার্যস্থানীয় ভারতীয় পণ্ডিতগণ ধর্ম-গ্রন্থগুলির ভাষ্য ও টীকা লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু বহু ভাষ্য ও টীকা অধিকতর দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সর্বসাধারণ ইহাতে আকৃষ্ট ও উপকৃত হইতে পারিতেছিল না। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ, তথা কঠিন বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্যের নিকট ভারতীয় নিজস্ব ভাবধারাকে পরিচিত করিতে স্বামিজী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং পরে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য স্বামিজীরা এ বিষয়ে বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া ভারতবর্ষকে জগৎ সভায় ধর্মের উচ্চাসন দানে খুব সাহায্য করিয়াছেন। আজ বেদান্ত প্রভৃতি কঠিন বিষয় অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে দেশবাসী রামকৃষ্ণ মিশনের নিকট বিশেষ ঋণী।

স্বামিজীর বক্তৃতা-শক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহু ভাষাজ্ঞান, ধর্মপ্রাণতা, দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতি ও গুরুভক্তি তাঁহাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

এ যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনের যে সব মহাজন, প্রচার উদ্দেশ্যে মার্কিন রাজ্যে গিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটই সভ্যতাভিমানী মার্কিনবাসীদের গর্বিত ও উন্নত মস্তক নত হইয়াছে ও হইতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে আদর্শজ্ঞানী, আদর্শ-ভক্ত, আদর্শকর্মী ও আদর্শসাধক। মানুষ যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার সব কয়টিরই তিনি জন্ম হইতে অধিকারী ছিলেন। শারীরিক সৌন্দর্য, বিদ্যা, যশ, মান-সম্ভ্রম সকলই তাঁহার বিদ্যমান ছিল। তিনি একাধারে সুগায়ক, সুবক্তা, বহুভাষাবিৎ ছিলেন। এত বড় প্রাণ লইয়া খুব কম লোকই, ভারতে কেন, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র সমুদ্র হইতেও গভীর, আকাশ হইতেও নির্মল ও উদার। তিনি একাধারে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, তাঁহার হৃদয় পুষ্পের ন্যায় কোমল আবার বজ্রের ন্যায় কঠোর। স্বামিজী একবার একটি লোকের প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেন যে "এই জীবনটা যদি পাগলা বামুনের পায়ে দিয়ে ভুলই করে থাকি, তবে জীবনে আর এ ভুল শোধরাইতে চাই না।"

এই দাস মনোবৃত্তিসম্পন্ন দুর্ভাগা জাতির দেহে ও মনে স্বামী বিবেকানন্দের দান এক অপূর্ব বস্তু, তাহাই আজ স্মরণ করিতেছি। বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ বিধানে ভারতের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে স্বামিজী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কর্মযোগী তাই দেশবাসীকে—দেশ-জননীর নির্যাতিত, পদদলিত জনগণের (তাঁহার ভাষায় 'নরনারায়ণের') সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বর্তমানের অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলনের জনক—স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই সর্বপ্রথম সেই গোড়ামির দিনে নির্ভয়ে দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে মুচি, মেথর প্রভৃতি অস্পৃশ্যগণ সকলেই দেশের ভাই, দেশের রক্ত, দেশের শক্তি ;তাহাদিগকে বর্জন করিলে মুক্তি নাই"। তাঁহার মত কেহ এ পর্যন্ত বলিতে পারেন নাই যে "একটী কুকুরকেও বাদ দিয়া আমি নিজে মুক্তি চাই না।"

স্বামিজী দেশের সর্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলে আঘাত করিয়া দেশের যুবশক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সমুদ্র-যাত্রার ভ্রান্ত অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া সুদূর ম্লেচ্ছ দেশে গমনপূর্বক বিশ্বের দরবারে ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার সর্বপ্রথম উন্মোচিত করিয়া এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। দেশে নিঃস্বার্থ কর্মী ও আদর্শ সন্ন্যাসী গড়িবার অভিপ্রায়ে স্বামিজী বেলুড় মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

অহিন্দুদিগকে দীক্ষা দ্বারা আধুনিক ভাষায় "শুদ্ধি করিয়া" হিন্দু ধর্মে স্থান দেওয়া যে শাস্ত্র-সম্মত তাহাও স্বামিজী নিজে স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজে দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের বর্তমান শুদ্ধি আন্দোলনের গোড়ায় যে স্বামিজীর কর্মজীবনের প্রভাব রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। স্বামিজী ইউরোপের এরূপ জনগণকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়া কঠোর সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন, যাহারা চিরকাল সুখের দোলায় দোল খাইতে অভ্যস্ত এবং যাহারা লোকের মুখের কথায় ও বক্তৃতায় ভুলিবার নয়; যাঁহারা চক্ষুর সম্মুখে কোন বস্তু দেখিতে না পাইলে শুধু কল্পনা রাজ্য বিচরণ করিয়া বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত নন। এইরূপ জন-সমাজে বেদান্তের বাণী কি ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যক্ষ করাইতে পারিলে তাঁহারা তাহা মানিয়া মাথা নত করিতে পারেন তাহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কষ্টকর। কি অসীম কর্মশক্তি যে স্বামিজীর ভিতর ক্রীড়া করিতেছিল তাহার সামান্য একটু আভাষ ইহাতে পাওয়া যায় মাত্র।

আচার্য শঙ্কর—শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য পরস্পর বিবদমান হিন্দুজাতীর নবজীবন দান করিয়াছিলেন কিন্তু ভবিষ্যতে হিন্দুজাতিকে বিশ্বের সঙ্গে সর্বধর্ম সমন্বিত করিয়া এক অসীম শক্তিশালী মানবজাতি সৃষ্টির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এক শুভ মুহূর্তে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জগৎগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে বসিয়া স্বামিজী যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিখিল বিশ্বে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তিনি তাহা প্রচার করিয়াছেন। এ দেশের অদ্বৈতবাদীরা তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিল "যত্র জীব তত্র শিব" ও "দরিদ্র নারায়ণের সেবা মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম"—"লোক সেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।" দেশের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সকল ভাই-ভগ্নী একত্র মিলিত হইয়া হিংসা, দ্বেষ, অবিশ্বাস, সংশয় চিরতরে পরিহার করিয়া মানুষ হউক এবং মানুষ হইয়া জগতে শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানবজীবনের মহান উদ্দেশ্যকে সফল করিতে সমর্থ হউক এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই ছিল স্বামিজীর ঐকান্তিক কামনা। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে সেই পথই দেখাইয়া গিয়াছেন।

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি কিম্বা যোগ যে কোন উপায়ে নিজের এই ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করো।"

—বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীভোলানাথ গুপ্ত

প্রণাম তোমায় নবভারতের স্রষ্টা।
মানুষের কল্যাণে
সেবাব্রতের নবীন মন্ত্র সৃজিলে তোমার ধ্যানে ;
সত্যের পথ দেখালে ধরারে
যে ছিল সত্য-ভ্রষ্টা।

এখনও ভারত, নিঃসংশয়ে জানি,
বোঝেনি তোমার অগ্নিগর্ভ বাণী।
এই যেন হয়, ভেঙে ভুল ক্ষণিকের
সার্থক হয়ে ওঠে তব স্বপনের
নতুন পৃথিবী
হে মন্ত্রসত্য-স্রষ্টা।

"বিবেকানন্দ—কোনও বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ? না, তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব কোন জাতির গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। সাংসারিক ও পার্থিব সম্বন্ধের বন্ধন তাঁর বাহ্যিক পরিচয়। পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে সব কিছু ত্যাগ ক'রে তিনি নবজন্ম লাভ করেন অধ্যাত্ম-জীবনে। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন তাঁর এই সত্তার জনয়িতা। কখনো তিনি তাঁর সামাজিক সম্বন্ধের পরিচয় দিতেন না। গুরুর দিব্যস্পর্শে তাঁর অন্তরতম মহিমার হয়েছিল জাগরণ। গুরুর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন তিনি। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে অন্যান্য, পতিতের চেয়েও নিজেকে তিনি নীচু মনে করিতেন। চির-কৌমার্যের জীবন নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ ; শিশুর মত নিষ্পাপ ও সরল ছিল তাঁর মন। নারীদের তিনি ভাবতেন বিশ্বজননীর প্রতিরূপে। অকিঞ্চনতা, ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও নিঃস্বার্থ মানবতা-প্রীতি তাঁর চরিত্রের প্রকৃতি ছিল।

"• • স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতে, ইংলণ্ডে ও এই দেশে (আমেরিকায়) থাকবার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমার এই গুরুভাইয়ের সঙ্গে থেকেছি ও ঘুরেছি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাঁর চরিত্র আমি লক্ষ্য করেছি ; তাতে আমার এনিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, এই তিন মহাদেশের কোথাও তাঁর মত আর একজন লোক মিলবে না, কেউই এই অলোকসামান্য ব্যক্তিটির শূন্য স্থান পূরণ করতে পারবে না। মানুষ হিসাবে তাঁর চরিত্র ছিল পূত, নিষ্কলুষ ; দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন সকল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকদের পুরোধাতী। তাঁর মধ্যে আমি দেখেছিলাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের আদর্শ। বেদান্তের সকল জ্ঞানের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি।"

—অদ্বৈতানন্দ

বিবেকানন্দ-স্মরণোৎসবে

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার

ক্লীব, নির্জীব, বিবেক-বিহীন
স্বার্থের মোহে অন্ধ
বীর্যে, আলোকে, তাদের জাগাতে
আসিলে বিবেকানন্দ !
পরিচয়, রামকৃষ্ণ-শিষ্য—
আপন করিলে নিখিল বিশ্ব,
ধরায় দেখালে দ্যুলোক-দৃশ্য
পুণ্য নয়নানন্দ।
সনাতন কথা অভিনব সুরে
ছড়ালে জগতময়
"জড়বাদ আর ভোগৈশ্বর্যে
জীবনের শেষ নয়।
"সবার মাঝারে এক নারায়ণ,
প্রতি জীবে তাঁরে কর দরশন,
সবার সেবায় সঁপ প্রাণ মন
মোহ-জ্বালা হবে বন্ধ।"
দিয়েছ দীক্ষা আগুসি রবে
করিতে মহান কর্ম,
সহজ জ্ঞানের আলোকে সবারে
চিনালে পরম ধর্ম।
মরদেহ আর নাহিক তোমার
বেঁচে আছ, র'বে চিত্তে সবার,
র'বে আহ্বান নব সাধনায়
অভী'র অমর ছন্দ।

অন্তিম শয়নে বুদ্ধদেব

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, এম. এ., পুরাণরত্ন বিদ্যাবিনোদ

বুদ্ধদেবের বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। পরিনির্ব্বাণকাল আসন্ন জানিয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে হিরণ্যবতী নদী অতিক্রম করিয়া কুশীনগরের বহিঃস্থিত শালবনে উপস্থিত হইলেন; তখন অপরাহ্ণ কাল। তথায় উপস্থিত হইয়াই তিনি অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং বিশ্রামের ব্যবস্থার জন্য প্রিয় শিষ্য আনন্দকে এইরূপ আদেশ করিলেন :

"ইঙ্ঘ মে ত্বং আনন্দ, অন্তরেন যমক-সালানং উত্তরসীসকং মঞ্চকং পঞ্ঞপেহি. কিলন্তোস্মি আনন্দ, নিপজ্জিস্সামীতি।" (মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ৫।৩)

আনন্দ! তুমি আমার জন্য যুগ্ম শালবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্তর শীর্ষ করিয়া মঞ্চ স্থাপন কর। আনন্দ। আমি ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব।

"সাধু ভন্তে !" বলিয়া আনন্দ যথানির্দ্দেশ শয্যা প্রস্তুত করিলেন।

"অথ খো ভগবা দক্খিণেন পস্সেন সীহ সেয্যং কপ্পেসি পাদে পাদং অচ্চাধায় সতো সম্পজানো।"

অনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ স্মৃতিমান্ ও জ্ঞানযুক্ত হইয়া দক্ষিণ পদের উপর বামপদ ঈষৎ ব্যতিক্রম ভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণপার্শ্ব হইয়া "সিংহশয্যায়" শয়ন করিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ শয্যায় শয়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে যথা (১) 'কামভোগী শয্যা'—

কামভোগে আসক্ত জীবগণ অচেতন অবস্থায় বামপার্শ্ব হইয়া শয়ন করে। (২) 'প্রেতশয্যা'—প্রেতগণ অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলিয়া এক পার্শ্বে শয়ন করিতে কষ্ট পায়, তাহারা এইজন্য চিৎ হইয়া শয়ন করে। এই প্রকারে শয়ন করাকে 'প্রেতশয্যায় শয়ন' বলা হয়। (৩) 'সিংহ শয্যা'—পশুরাজ সিংহ রাজোচিত গাম্ভীর্য্য সংযম ও শৃঙ্খলা সহকারে শয়ন করে। নিদ্রাতেও তাহার আভিজাত্য ও মর্য্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। সিংহ সম্মুখের পদদ্বয় একস্থানে, পশ্চাতের পদদ্বয় একস্থানে এবং পুচ্ছ ও সশৃঙ্গ যথাস্থানে স্থাপন করতঃ স্মৃতির সহিত দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে। সিংহ অত্রস্তভাবে জাগ্রত হইয়া প্রথমেই মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক দেখে যে পুচ্ছ এবং পদ চতুষ্টয় যথাস্থানে রহিয়াছে কিনা। যদি কিঞ্চিন্মাত্রও ইহাদের স্থান চ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে মনে করে তাহার মর্য্যাদার উপযুক্ত নিদ্রা হয় নাই। তখন আবার সতর্কতার সহিত পুচ্ছ, পদ প্রভৃতি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে। আবার উঠিয়া ইহারা যথাস্থানে আছে দেখিতে পাইলে সিংহ সানন্দে বিজৃম্ভণ করতঃ কেশররাশি কম্পিত করিয়া তিনবার গর্জ্জন করে এবং তৎপর আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। এইভাবে বুদ্ধদেবও পরিনির্ব্বাণকালে 'সিংহ শয্যা'য় শয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ হস্ত মস্তকের নীচে এবং বাম হস্ত দেহের সমমান ভাবে রক্ষিত ছিল; তিনি স্মৃতি ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ ঈষৎ বক্রভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ-পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন।

(৪) চতুর্থ প্রকারের শয়ন 'তথাগত-শয্যা' নামে অভিহিত। বাহ্যদৃষ্টিতে শায়িত ও নিদ্রিত মনে হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে গভীর ধ্যান-মগ্ন অবস্থা, ইহা যোগনিদ্রা নামেও কথিত হয়।

বুদ্ধদেব যখন পরিনির্ব্বাণমঞ্চে আরোহণ করিয়া 'সিংহ শয্যা'য় শয়ন করিলেন, অমনি যমক শালতরুর সর্ব্বাঙ্গে অকালে পুষ্পোদ্গম হইল। সেই কুসুমরাশি তথাগতের পূজার জন্য তাঁহার দেহোপরি পতিত হইতে লাগিল। এই সময় অন্তরীক্ষ হইতেও রাশি রাশি দিব্য মন্দার পুষ্প ও চন্দন চূর্ণাদি তথাগতের পূজার জন্য তাঁহার দেহোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে তথাগতের সম্মানার্থ দিব্য বাদ্য যন্ত্রসমূহ বাদিত ও দিব্য সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল।

"দিব্বানিপি মন্দার পুপ্ফানি অন্তলিক্খা পপতন্তি তথাগতস্স পূজায়।.....দিব্বানিপি সঙ্গীতানি অন্তলিক্খে বত্তন্তি তথাগতস্স পূজায়।"

সেই সময়ে উপবাণ নামক এক প্রবীণ ভিক্ষু বুদ্ধদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব তাহাকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন:

"অপেহি ভিক্খু, মা মে পুরতো অট্ঠাসীতি।" হে ভিক্ষু! সরিয়া দাঁড়াও; আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিও না।

এইরূপ আদেশ শ্রবণে আনন্দের মনে সংশয় উপস্থিত হইল,—এই উপবাণ ভিক্ষু দীর্ঘকাল যাবৎ ভগবানের আজ্ঞাকারী সেবক, অথচ অন্তিম সময়ে তিনি উপবাণকে সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া এইভাবে সরাইয়া দিলেন কেন? আনন্দ অত্যন্ত সংশয়াকুল চিত্তে বুদ্ধদেবকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তরে বলিলেন,—'হে আনন্দ! তথাগতকে পরিনির্ব্বাণকালে দর্শন করিবার জন্য দেবতাগণ সমাগত হইয়াছেন। আমি শুনিতে পাইলাম যে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর এই বলাবলি করিতেছেন:

"কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উপজ্জন্তি অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা।"

"বহুকালের পর কদাচিৎ জগতে তথাগত অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। আমরা বহুদূর হইতে তথাগতকে দর্শন করিতে আসিলাম; অদ্যই রাত্রির শেষ যামে তথাগতের পরিনির্ব্বাণলাভ হইবে। কিন্তু মহাশক্তিশালী উপবাণ ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে

তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া দণ্ডায়মান থাকাতে আমরা অন্তিম সময়ে তথাগতকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম।" দেবতার দৃষ্টিশক্তি পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়াও অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু উপবাসের তপঃশক্তি এত প্রচণ্ড যে দেবতাদের দৃষ্টি-শক্তি তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। হে আনন্দ! এইজন্য উপবাসকে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছি, যাহাতে দেবতাগণ তথাগতের অন্তিম দর্শন লাভ করিতে পারেন।

ভিক্ষু উপবাস বুদ্ধদেবের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে দেবতাগণ অব্যাহতভাবে তথাগতের দর্শনলাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভগবানের পরিনির্ব্বাণকাল আসন্ন জানিয়া এই বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন :

"অতিখিপ্পং ভগবা পরিনিব্বায়িস্সতি, অতিখিপ্পং সুগতো পরিনিব্বায়িস্সতি, অতিখি-প্পং চক্খুমা লোকে অন্তরধায়িস্সতি।"

অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি শীঘ্র সুগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি সত্বর ত্রিলোক হইতে প্রজ্ঞাচক্ষুর অন্তর্দ্ধান হইবে।

দেবতাদের মধ্যে যাঁহারা বীতরাগ তাঁহারা জ্ঞানবলে শোকদমন করতঃ অপর দেবতাগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন :

"অনিচ্চা সঙ্খারা, তং কুতেত্থ লব্ভাতি?" সংস্কারমাত্রই অনিত্য, তাহার অন্যথা কিরূপে হইবে? অর্থাৎ দেহাদি উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রই নশ্বর, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে।

দেবতাগণ ভগবান্ তথাগতকে প্রণাম নিবেদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন : "ভগবন্! এই ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ শাখানগর কুশীনারায় পরিনির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত (অযোধ্যা), কৌশাম্বী, বারাণসী প্রভৃতি বহু মহানগর রহিয়াছে—ইহাদের মধ্যে যে কোন একস্থানে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন্। এই সকল স্থানে ভগবান্ তথাগতের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন বহু ক্ষত্রিয় মহাশাল, ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং গৃহপতি মহাশাল (ধনকুবের গৃহস্থ) আছেন যাহারা যথোপযুক্তরূপে তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।"

বুদ্ধদেব তদুত্তরে কহিলেন,—"আনন্দ! এই-স্থানকে ক্ষুদ্র, জঙ্গলাকীর্ণ, শাখানগর বলিয়া অবহেলা করিও না। এইস্থান অতি পবিত্র, প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন মহানগর। পূর্ব্বকালে এইস্থানে মহাসুদর্শন নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজচক্রবর্ত্তী নরপতি রাজত্ব করিতেন। তখন এই কুশীনগর (কুশীনারা) কুশাবতী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কুশাবতী পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে সপ্তযোজন বিস্তৃত ছিল। বহুজনাকীর্ণ, মহাসমৃদ্ধিশালী ঐ কুশাবতী নিরন্তর দশবিধ শব্দে মুখরিত থাকিত যথা (১) হস্তীশব্দ, (২) অশ্বশব্দ, (৩) রথশব্দ, (৪) ভেরীশব্দ, (৫) মৃদঙ্গশব্দ, (৬) বীণাশব্দ, (৭) গীতশব্দ, (৮) শঙ্খশব্দ, (৯) "সোথ্য সোথ্য" ইত্যাদি প্রিয় আলাপ শব্দ এবং (১০) খানকর, আহার কর, পান কর ইত্যাদি অভ্যর্থনাসূচক শব্দ। (দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত "মহাসুদর্শন সূত্রে" এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

কুশীনগরের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বুদ্ধদেব আনন্দকে আদেশ করিলেন, "আনন্দ! তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আস যে, অদ্য রাত্রির শেষপ্রহরে তথাগত পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।" আনন্দ তদনুসারে কুশীনগরে প্রস্থান করিলেন। তখন অপরাহ্ণকাল; ঐ সময় মল্লপুরুষ ও মহিলাগণ কোনও আবশ্যক কার্য্যোপলক্ষে মন্ত্রাগারে (মন্ত্রণাগৃহে) সম্মিলিত হইয়াছিল। আনন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন :

"অজ্জ খো বাসেট্ঠা রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে তথা-গতস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি। অভিক্কমথ

বাসেট্ঠা, অভিক্কমথ বাসেট্ঠা! মা পচ্ছা বিপ্পটিসারিনো অহুবত্থ, অম্হাকঞ্চ নো গামক্ষেত্তে তথাগতস্স পরিনিব্বানং অহোসি, ন মযং লভিম্হা পচ্ছিমে কালে তথাগতং দস্সনায়াতি।" (৫।৪৪)

হে বাশিষ্ঠগণ (মল্লক্ষত্রিয়গণ বশিষ্ঠ গোত্রীয়), অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে। হে বাশিষ্ঠগণ! সত্বর আগমন করুন, যেন পশ্চাৎ আপনাদিগকে অনুতাপ করিয়া এইরূপ বলিতে না হয় যে, আমাদেরই গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইল, অথচ আমরা অন্তিমসময়ে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে পারিলাম না।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র মল্লপ্রধানগণ, মল্লযুবকগণ, মল্লবধূ ও কন্যাগণ অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত ও শোকাভিভূত হইলেন। তাহারা সকলে বুদ্ধদেবকে অন্তিম দর্শন ও বন্দনার জন্য শালবনে যাত্রা করিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল: আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভাবিতে লাগিলেন, যদি ইহাদিগকে এক এক করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন ও বন্দনা করাই তবে সারা রাত্রিতেও এই কার্য্য-সমাপ্ত হইবে না। অতএব ইহাদিগকে এক এক কুল হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক একটি কুলকে একসঙ্গে দর্শন ও বন্দনা করাইব। তদনুসারে আনন্দ মল্লদের এক একটি কুলের লোকদিগকে পরিনির্ব্বাণ মঞ্চে 'সিংহশয্যা'য় শায়িত বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত করিয়া এই বলিয়া বন্দনা করাইতে লাগিলেন:

"ইত্থন্নামো ভন্তে মল্লো সপুত্তো সভরিয়ো সপরিসো সামচ্চো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতীতি।"

(মহাপরিনিব্বানসুত্তং, ৫।৪৮)

হে ভন্তে! অমুক নামক মল্ল তাহার পুত্র, ভার্য্যা, সহচর ও অমাত্যগণের সহিত ভগবানের পদে মস্তক স্থাপন করতঃ প্রণাম করিতেছেন।

বুদ্ধদেব তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইভাবে রাত্রির প্রথম যামের মধ্যেই আনন্দ কুশীনগরবাসী মল্লদের বন্দনা কার্য্য সমাপ্ত করাইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

বঙ্গমাতা

শ্রীমতী প্রমীলা কর্ম্মকার

পরাধীনতার শৃঙ্খল টুটি' মুক্ত ভারত ভূমি,
মুক্তি শুধুই পেয়েছে ভারত, মুক্ত হওনি তুমি।
আঘাতের পর আঘাত হানিয়া কত মানুষের দল,
খণ্ড তোমায় করিয়াছে সবে নামেনি অশ্রু জল।
তোমার বুকেতে ব'য়ে গেছে মাতঃ রক্ত নদীর ধারা
সেই ক্ষু-ক্ষণে কত জন হায় হয়েছে আপন হারা।
দিকে দিকে হায় শুধু শোনা যায় তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস,
আপন হারায়ে গৃহহীন হ'য়ে করিতেছে উপবাস।
দুই কোলে দুই সন্তান তব, হিন্দু-মুসলমান
তারাই তোমারে করিতেছে মাতঃ প্রত্যহ অপমান।
গর্বে ইহারা মত্ত হইয়া আঘাত হানিছে যত,
অশ্রু তোমার মরম নিঙাড়ি ঝরিতেছে অবিরত।
কবির মানস-হৃদয়ে তোমার অপরূপ ছিল সাজ
কেহ তো বোঝেনা তোমার বেদনা, কেন তুমি কাঁদো আজ।
একদা কবির কবিতা ছন্দে মণ্ডিত ছিলে তুমি,
অদূরে দাঁড়ায়ে দেখিতেছি আজ দুখিনী বঙ্গ-ভূমি।

মুক্তিদাত্রী দেবী সরস্বতী

স্বামী বেদানন্দ

মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি দেবী সরস্বতীর পূজার পুণ্যদিবস। এইদিন ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র। এই দিনে দেবী সরস্বতীর ভক্তবৃন্দ তাঁহার বিশেষ পূজার উৎসবে ভক্তিনিষ্ঠার উচ্ছ্বসিত অন্তরে পূজামণ্ডপে একত্রে সমাগত হন ও তাঁহার অর্চনা করেন।

দেবী সরস্বতী ব্রহ্মস্বরূপিনী; তিনি সর্বশক্তির আধারস্বরূপা। সর্ববিধ বিদ্যা ও জ্ঞানের তিনি একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সমস্ত শাস্ত্র পরম-প্রজ্ঞারূপিনী দেবী বিশ্বভারতী সরস্বতীর চরণপদ্ম হইতে উৎসারিত হইয়াছে। সমস্ত লৌকিক বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার একমাত্র ও শাশ্বত কারণস্বরূপ-দেবী সরস্বতী। তিনি বেদবেদান্তের সারভূতা, অধ্যাত্ম প্রণবাকারা। দেবী সরস্বতী সমস্ত অনুরক্ত নরনারীর মুক্তিদাত্রী, তিনি সকলের অবিদ্যা অজ্ঞান-তিমির নাশিনী। সেই দেবী সরস্বতীর ঐকান্তিক ও অবিশ্রান্ত উপাসনায় মানুষের সমস্ত দুর্গতি দুর্বলতা দুঃখ অশান্তি ও অজ্ঞানতা দূর হয়। বিশ্বজননী ব্রহ্মস্বরূপিনী সরস্বতীর প্রসন্নতায় মানুষ মুক্তি জ্ঞান শক্তি পবিত্রতা ও মহত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়। যাঁহারা সত্যান্বেষী জ্ঞানব্রতী শুদ্ধচিত্ত নির্মল-অন্তর ধীরশান্ত সমাহিত ও অন্তর্মুখী—সেই সুযোগ্য ভক্তসাধকবৃন্দই দেবী সরস্বতীর করুণা ও প্রসন্নতা লাভে একমাত্র অধিকারী।

জ্ঞান শক্তি ও পবিত্রতা লাভের জন্য অবিশ্রান্ত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে একনিষ্ঠ সাধকের প্রতি সর্বকল্যাণরূপিনী ও সর্বাভীষ্টদায়িনী দেবী সরস্বতী প্রসন্না হন। সাধনসিদ্ধ সন্তানকে তখন পরমারাধ্যা জননী পরমজ্ঞানে ও পরম কল্যাণে ও মহাশক্তিতে মহিমান্বিত করেন। সেই সর্বজনজননীর পরম প্রসাদে সিদ্ধসাধকের সমস্ত জীবন সর্বাঙ্গীন সাফল্যের অমিত গৌরবে চিরউজ্জ্বল ও চিরসুন্দর হইয়া উঠে।

দেবী সরস্বতী ব্রহ্মস্বরূপিনী। তাই তিনি অনাদি অনন্ত নিরাকারা ও সর্বব্যাপিনী। তিনি পরমপরিপূর্ণ সত্যস্বরূপা শুদ্ধসত্ত্বা ও সারাৎসারা। সমস্ত অক্ষরে, সমস্ত মন্ত্রে, সমস্ত শাস্ত্রে, সকলের অন্তরে বিশ্বব্যাপিনী ব্রহ্মময়ী নিত্য বিরাজিতা। সেই অনন্তজ্ঞান স্বরূপিনী সমস্ত জীব বিশেষতঃ সমস্ত নরনারীর অন্তরবাসিনী সকলের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি আমাদের অন্তরে সর্বদা সমাসীনা থাকিয়া আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রেরণা দিতেছেন। বিচিত্র তাঁহার লীলা। তাঁহার অসীম ইচ্ছাশক্তিই সমস্ত বিশ্বচরাচর ও সমস্ত জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আমাদের যাবতীয় শুভাশুভ উন্নতি অবনতি একমাত্র তাঁহার সেই অসীম ইচ্ছাশক্তিরই অধীন।

এই পরাৎপরা ও সারাৎসারা জননী স্বরূপতঃ নিরাকারা সর্বব্যাপিনী হইলেও, তিনি আবার সাকারা সরূপা এবং অপরূপ সৌন্দর্যাকারা নিখিল-মাধুর্যময়ী মনোহর মূর্তিধারিণী। যুগে যুগে কঠোর তপস্যায় ও সুনিবিড় ভক্তির আতিশয্যে শত শত সুযোগ্য সাধকের ধ্যানের গভীরতায় দেবী সরস্বতী অনুপম অপরূপ শুভ্রশোভায় জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। শুদ্ধাত্মা ভক্তসাধকের প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত অন্তরের নিভৃত মন্দিরে অনিন্দ্যমূর্তিতে দেবী সরস্বতী সর্বদা সমাসীনা। সাধনসিদ্ধ ভক্তসাধকের ধ্যাননেত্রে দেবী সরস্বতীর যে অবর্ণনীয় চিরসৌন্দর্যময়ী মূর্তির আবির্ভাব হয়—সিদ্ধসাধকবৃন্দ এইভাবে সেই ধ্যানমূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন:

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা স্তুত্যা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা।
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা সুরদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা।

বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে নানাস্থানে প্রতি বৎসরে মাঘী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য গৃহে ও প্রতিষ্ঠানে দেবীসরস্বতীর প্রতিমা পূজা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি এখন বাঙলা দেশে পরমজ্ঞানপ্রদায়িনী সর্ব্বতত্ত্বকরী দেবী সরস্বতীর করুণা ও প্রসন্নতা বর্ষিত হয় না কেন? যে বাঙলা দেশ একদিন অগণিত উচ্চশ্রেণীর যোগীঋষি সিদ্ধতপস্বী মনীষী শাস্ত্রকার শিল্পী ও কবিদের আবাসভূমি বলিয়া এক অতুলনীয় গৌরবে উজ্জ্বলা ও ভারতবরেণ্যা হইয়াছিল—আজ সেই বঙ্গদেশ অবিদ্যা অজ্ঞানতা অবনতি ও অক্ষমতার নারকীয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে কেন? ইহার কারণ—দেবী সরস্বতীর সাক্ষাৎ করুণা ও প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য সাধনার আন্তরিকতা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, অনুরাগ ও আকুলতা আজ আমাদের বাঙালী জাতির মধ্যে আদৌ নাই। তপস্যার নিষ্ঠা অনুরাগ ও অধ্যবসায় না থাকিলে কখনও বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ করা যায় না। বিদ্যা ও জ্ঞানের সাধনায় যাহারা বাল্যকাল হইতে আজীবন অবিভ্রান্তভাবে সমগ্র অন্তরে একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত নিরত, তাঁহারাই শুধু দেবী সরস্বতীর করুণা ও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রবিগর্হিত এবং শ্রদ্ধাহীন নিষ্ঠাহীন আচার-অনুষ্ঠানে কিম্বা বাহ্য আড়ম্বরে শুধু দেবীসরস্বতীর প্রতিমাকে পুষ্পরাশিতে সুশোভিত করিয়া মৌখিক ভক্তি দেখাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেই জ্ঞান বিদ্যা শক্তি ও সুকৃতির অধিকারী হওয়া যায় না।

আজ আমাদের মধ্যে শুদ্ধি পবিত্রতা সুরুচি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার একান্ত অভাব। আজ সমস্ত বাঙালী জাতির হৃদয় ও মন মহাতমোগুণের অন্ধকারে সমাবৃত। পূজার আকুলতা আন্তরিকতা ও অনুরাগ আমাদের মধ্যে নাই। যে পদ্ধতি ও উপায়ের অবলম্বনে দেবী সরস্বতীকে যথাযথভাবে পূজা ও অর্চ্চনা করিলে, মানুষ জ্ঞান বিদ্যা মহত্ত্ব সৌভাগ্য ও শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়, পূজার সেই পদ্ধতি আমরা আদৌ প্রতিপালন করিনা বলিয়া আজ আমরা সমস্ত বাঙালী জাতি অজ্ঞানতা অবনতি দুর্ব্বলতা ও দুর্গতিতে জড়নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছি। শক্তির সাধনা আমাদের মধ্যে আজ নাই, জ্ঞানের তপস্যা করিবার মত আগ্রহ ও সামর্থ্য আমাদের আজ নাই। সেইজন্য বিদ্যাতপস্যার সিদ্ধপীঠ বাঙলা দেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা একেবারে অজ্ঞান বিদ্যাহীন ও শক্তিহীন মুমূর্ষু জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছি। এই দুর্ব্বলতা এই অজ্ঞানতা এই জড়ত্ব ও এই অবনতি হইতে সম্পূর্ণরূপে উত্থিত ও মুক্ত হইতে হইলে আবার আমাদিগকে জ্ঞানের সাধনায়, শক্তির সাধনায়, মহত্ত্বের সাধনায় ও কর্ম্মের সাধনায় সর্ব্বতোভাবে কায়মনোপ্রাণে নিয়োজিত হইতে হইবে। উদ্যোগী দৃঢ়সঙ্কল্প অধ্যবসায়ী ও আত্মবিশ্বাসীরাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়। তাহারাই বিশ্বজননীর আশীর্ব্বাদ ও বর লাভ করে। এই কথা মূলমন্ত্ররূপে সর্ব্বদা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। আজ সর্ব্বসৌভাগ্যদাত্রী মুক্তিদায়িনী জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিভরে বারবার প্রণাম করি। সমগ্র অন্তরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি—হে মাতঃ প্রজ্ঞাস্বরূপিনী সর্ব্বশক্তিপ্রদে! তুমি আমাদের সকলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস পৌরুষ সুরুচি শ্রদ্ধা তপস্যা ও কর্ম্মসামর্থ্য জাগ্রত করো! আমাদের অন্তরে হে জ্ঞানস্বরূপিনী তুমি প্রকাশিত হও। আর দাও সেই তপস্যার শক্তি—যাহার ফলে আমরা নিজেকে ও বঙ্গভূমিকে নবগৌরবে সমুজ্জ্বল করিতে পারি। নমো নমোস্তে সরস্বতৈ নমো নমো নমোস্তে।

দেবতার মন্দির

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য

দেবের দেউলে পূজার লগন,
শংখ, ঘণ্টা বাজে,
দলে দলে চলে শত শত লোক
কত রূপে, কত সাজে।
বেদীমূল ভ'রে যায় উপচারে—
স্বর্ণ, রৌপ্য, ফল, ফুল-ভারে
দেখেনা তো কেহ দেবতার প্রাণ
আছে কি তাদের মাঝে ?

অন্তরবিহীন এমনি কত যে
দেবতারে নিয়ে খেলা,
পূজার আড়ালে তাঁরি অপমান,
মহিমার অবহেলা।
ধনী, সম্রাট, ভাগ্যবানের
দম্ভ-খচিত অর্ঘ্যদানের
নীরব গ্রহীতা মাটির ঠাকুর
মরমে মরে যে লাজে।

সেই তো সাধক, প্রকৃত পূজারী,
যে বুঝেছে এই ফুল,
দেবতার পূজা হয় না কেবলি
চরণে সাজায়ে ফুল।
যতদিন এই পৃথিবীর বুকে
একটিও জীব র'বে নত মুখে,
ধূপ, দীপ, ফুল মিথ্যা সকলি
নিত্য প্রভাতে সাঁঝে।

ভগবান নিজে এসেছেন নেমে
যুগে যুগে দেশে দেশে
বুদ্ধ, নিমাই, নানক, খ্রীষ্ট,
শ্রীরামকৃষ্ণ বেশে।
সবাকার সাথে মিলাতে হৃদয়
পেয়েছেন তিনি প্রেমেরি যে জয়,
সেই তো সেখানে আসন তাঁহার
বিমল বিভায় রাজে,
দীনহীনজন—তাদেরি কুটিরে
তাদেরি চিত্ত মাঝে।

"শেষ-সপ্তকে" সহজবাদ

বীরানন্দ ঠাকুর

(পূর্বসূত্র)

(১)

মনে হয়, যদি ব্যাপক অথচ স্থিরদৃষ্টি নিয়ে বিশ্বসৃষ্টির দিকে তাকান যায় তো জানা যাবে যে বহু বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ শুধু নয়, বহু বিপরীত পদার্থের, অন্ততঃ আপাত-বিপরীত বস্তুর সমাবেশ আছে এই সৃষ্টিতে। জানা যাবে, সৃষ্টির ভিতর যেমন আছে কিছু দুর্লভ, সুতরাং দুঃসাধ্য সামগ্রী, তেমনি আছে কতকগুলো সুলভ বা অনায়াসলভ্য সামগ্রী ; অর্থাৎ, যেমন আছে আয়াসলভ্য রীতিতে প্রাপ্য দুর্লভ বস্তু, তেমনি আছে সহজলভ্য রীতিতে প্রাপ্য সুলভ বস্তু। মানুষের জীবনে এই সহজ ও কঠিনের সমাবেশ বেশ স্পষ্ট হ'য়ে থাকতে দেখা যায়। সুতরাং এই দুটি দিকই সত্য, মানব-জীবনে। রবীন্দ্রনাথের সহজাত ও চর্চিত মানস-শক্তিতে সহজেই উপলব্ধ হ'য়েছে সৃষ্টি তথা মানব-জীবনের এই অন্যতম সত্যটি।

রবীন্দ্রনাথের ভাবসাধনার কতকগুলি মৌল চিন্তা ফিরে ফিরে বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সহজ ভাবনা তার মধ্যে একটি। রবীন্দ্রনাথ সবকিছুকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তাদের যথাযথ মূল্যে। বহু দিকদর্শী ও সর্বদিদৃক্ষু বলা চলে তাঁকে। তাই জীবনের সহজ ভাব ও রূপকেও স্বীকার করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি, যেমন হয়নি কঠিন ভাব ও রূপকে। 'আমি যে সব নিতে চাই রে, আপনাকে তাই মেলব যে বাইরে'—একথা কবির খেয়ালী মনের সাময়িক উচ্ছ্বাসের কথা নয়, এ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর প্রকাশ। 'এ বিশ্বের পানপাত্র হতে নব নব স্রোতে আনন্দদহিরা ধারা পান করে সাধ মেটাতে ইচ্ছা তাঁর।'

কিন্তু যত সাধ থাকে সাধ্য তো থাকেনা তত। মন যে মানেনা তবু। তাই প্রাণপণ কঠিন প্রয়াস করতে হয় নিশিদিন। কিন্তু, কঠিন প্রয়াস তো আর খাটেনা সর্বত্র। তাতে যে সুর কেটে যায় কখনও কখনও, ছিঁড়ে যায় জীবন-বীণার তার। মন তা বুঝে আপন মনে বলে :

'কেন ছিঁড়ে গেল তার।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার।' [দুরাকাঙ্ক্ষা : চিত্রা]

যদিও উচ্চ আশার আলেয়ায় আহূত যৌবন-গর্বী জীবন কণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করতে চায় :

'ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।
• • •
হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য,
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে।' [নগর-সংগীত : ঐ]

তবু সংগ্রাম-ক্লান্ত, সাধন-শ্রান্ত, বিরাম-চাওয়া জীবনকে বলতে হয় এক সময় :

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার মতো থাক থাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি। [উদ্‌বোধন : ক্ষণিকা]

কারণ, গতি ও স্থিতি, কৃতি ও বিরতি—সব

নিয়েই তো জীবন। তাই, এদের কোনোটাকে বাদ দেওয়া যায় না জীবন থেকে।

শুধু মানব-জীবনের সত্য এ নয়। এ সত্য প্রকৃতিরও। সে-উপলব্ধি করেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ :

'আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের ও মুক্তির—একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি : একই সময় একদিকে তার কর্ম আর একদিকে তার ছুটি : বাহিরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।'

[শ্রাবণ সন্ধ্যা]

সহজ তত্ত্বটি কী? প্রত্যেক বিষয়কে তার যথামূল্যদানই সহজতা বা সহজবোধ। জীবনে অনুকূল ও অভিপ্রেত সব বিষয়ের যথাযোগ্য স্বীকৃতিই সহজ স্বীকৃতি। জীবনের চরিতার্থতার জন্যে মান্য এই রীতি, এই তত্ত্ব। সেই প্রতীতির প্রেরণায় কবির এই বাণী :

যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ,
ফুরাইলে দিন ফুরাতে। [উদ্বোধন : ক্ষণিকা]

অন্যত্রও শোনা যায় এ ভাবের প্রতিধ্বনি :

'যেদিনকার যাহা সেদিনকার তাহা এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সাধনার ধারা যখন দশদিকে পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

[বসন্তযাপন : বিচিত্র প্রবন্ধ]

এই সহজ স্বীকৃতি না হ'লে বিকৃতি কি বিপত্তি ঘটে জীবনে। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার প্রকাশ দেখি এখানে :

'যাহা যে পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে, হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয়তো কোনোদিন কোনোদিক দিয়া সুদ শুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।'

[তত্ত্বকথা : ধর্ম]

বনাম্বেবনামে কবি যতই নিজের শান্তিপ্রিয়তার কথা বলুন-না-কেন, যতই বলুন—

'যার যাহা আছে তার থাক তাই
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।'

যতই বলুন তিনি আরও অনেকের মতো—দুর্লঙ্ঘ্য বনের লেগে দুস্তর সাগর উত্তরণ করে অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে যেতে তিনি চাননি, তিনি শুধু বিচিত্রের সুরগুলি গ্রথন করবার প্রয়াস করেছেন, চেয়েছেন শুধু বাঁশরিতে প্রাণের নিশ্বাস দিয়ে তাকে ভরে তুলতে, উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্ছনায় মুগ্ধ রাগিনীতে আমন্ত্রণ করেছেন তিনি কাছের তরুর মর্মবেদনার স্পন্দন, তবু একথা ভোলা যাবেনা, ভোলবার নয় যে এ বড় সহজ ব্যাপার নয় ; ভোলা যাবেনা যে তিনি 'গভীরের স্পর্শ পেয়ে ফিরেছেন', 'তার বেশি কিছু সঞ্চয় করা নাইবা হল'। এও এক অনন্যসাধারণ সাধনা, কেন না, অ-ধরাকে ধরার সাধনা করেছেন তিনি।

কাব্যসাধনার ক্ষেত্রেও অমনি দুঃসাধ্যসাধন করবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে থেকে-থেকে। তার নিদর্শন :

"উঠে দাঁড়ালাম আসন ছেড়ে।
ওরা বললে, কোথা যাও, কবি?
আমি বললেম,
যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।"

[শেষ-সপ্তক : কুড়ি]

কিন্তু, কাব্যেই হোক, জীবনেই হোক, গভীরের স্পর্শ চেয়ে কেরা, অ-ধরার পিছু-পিছু ছোটা, কঠোর দুর্গমের পানে ধাওয়া করা সব সময়ে চলেনা, সম্ভবও

নয় তা। জীবনে এমন এক-এক সময় আসে, যখন সব চেষ্টার হাল ছেড়ে দিয়ে অবস্থা বা পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলতে ইচ্ছা করে :

'যা হবার আপনি হবে, মিছে এই টানাটানি।'

যখন অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ মিলে যাওয়ার ওপর ভরসা করতে চায় মন, সে-বিশ্বাসে মনে হয় :

'শুভদিন হঠাৎ এলে, তখনি পাব দেখা।'

(২)

'শেষ সপ্তক' গ্রন্থে সহজভাবনা ঠাঁই পেয়েছে সহজেই ; অর্থাৎ, এই ভাবনার তাত্ত্বিকতার ভার প্রকট হ'য়ে দেখা দেয়নি। বোধহয়, বহুকাল-পোষিত এই ভাবনা কবির স্ব-ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, মানে, বেশ সহজ হ'য়ে গেছে।

সহজ-দর্শনের প্রয়োজন ও মূল্য স্বীকৃত হ'য়েছে প্রকারান্তরে, তার স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে, তাকে জানার বাসনার প্রকাশে।

বস্তুবিশ্ব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে জানার দুটি রীতি আছে : একটি আত্মনিষ্ঠ, অপরটি বস্তুনিষ্ঠ। দুটিই আংশিক সত্য। যে কোন একটি রীতির সাহায্যে যে জ্ঞান তা বোধহয় একদেশদর্শী, তাই অপূর্ণ। আপন চৈতন্যকে প্রক্ষালিত করে অপর বস্তুর ওপর ফেলে দেখার দর্শনীয় বস্তুর নবরূপায়ণ হবার সম্ভাবনা থাকে বটে, কিন্তু তাতে তেমনি আবার বস্তুর স্বরূপের বা আসল রূপের বিকৃতি ঘটে, তার যথার্থ পরিচয় পাবার উপায় নষ্ট হয়। এই রকম দেখায় সচেতন প্রয়াসের, পরিকল্পনা বুদ্ধির, অতএব শক্তির প্রকাশ থাকে সন্দেহ নেই, কিন্তু, এতে থাকে কৃত্রিমতা। অহমিকা এই দৃষ্টিকে করে থাকে আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, সুতরাং কলুষিত। এমন দেখায় থেকে থেকে ক্লিষ্ট হয়, ক্লান্ত হয় মন ; তৃপ্তি পায়না, পায়না সুখ, কেননা পায়না সত্যকে। তখন প্রার্থনা হয় তার এমনিতরো :

"সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ,
স্মৃতি-বিস্মৃতির নানাবর্ণে রঞ্জিত
সুখ দুঃখের বাষ্পঘনিমা
সরে যাক সন্ধ্যা মেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা করে।"

[শেষ সপ্তক : চার]

একান্ত আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির দুঃখ এই যে, তা সবকিছুকে নিজের সুখদুঃখের অনুপূরক হিসেবে বিচার করে তাদের মূল্যবত্তা নিরূপণ করে ; আত্মপ্রয়োজন-সাধকতা ব্যতীত তাদের স্বতন্ত্র সার্থকতা স্বীকৃতি পায়না। এই যে অহমিকা-সর্বস্ব, অথবা কেবল আত্মপ্রীতিবাহী মনোভাব এতে জগৎ, এমন কি, নিজেকেও ছোট করে দেখা হয়, আর, দেখা হয় সেই পরিমানে তাদের মিথ্যারূপে। এই ভাব, এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বিকৃত এবং অস্বাভাবিক, অসহজ তা বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। এতে সারা সৃষ্টিতে তার আপন মহৎ মহিমায় দেখে নিজেকে ও বহির্বিশ্বকে বৃহত্তর করে পাবার সুখশান্তির সৌভাগ্য যায় নষ্ট হয়ে। সেই প্রমাদ ও বিপত্তির কথা বুঝেই কবি বলতে চেয়েছেন :

"ঝরে-পড়া ফুলের বনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ
চারদিকে তার স্বপ্ন-মৌমাছি
গুন্ গুন্ করে বেড়ায়
কোন অলক্ষ্যের সৌরভে।"

[শেষ সপ্তক : চার]

তাই সৃষ্টিবিমুখ আত্মমুখী দৃষ্টিকে এই বলে ফেরাতে চেয়েছেন তিনি সৃষ্টির পানে :

'অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।'

[শেষ সপ্তক : চার]

সঙ্গেসঙ্গে সংকল্প করছেন সংকীর্ণ দৃষ্টিকে উদার করে তোলার। সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখার, মিলিয়ে নেবার উদার মহৎ ও পূর্ণদর্শী দৃষ্টি। অর্থাৎ, সহজদৃষ্টি লাভের বাসনা ও সাধনা করতে

চান তিনি, যাতে আত্মসর্বস্বতার নির্বাসনে আত্মঘাতী না হতে হয়। কবি বুঝেছেন, এই সহজদৃষ্টির অধিকারী হলে ক্ষুদ্র বৃহৎ সবকিছুকে দেখতে পাবেন তার স্বকীয় মহিমায়; আত্মব্যতিরিক্ত সৃষ্টির বাস্তব সত্যের দিকটিও তার কাছে হবে প্রতিভাত। তাই তার সংকল্প:

'যাব সন্ধ্যাহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।'

[শেষ সপ্তক : চার]

এই যে সহজ দৃষ্টি, এরই প্রসাদে জানা যাবে যে সৃষ্টির বিচিত্র রূপের স্রোতধারা, এমনকি জন্ম-মৃত্যু, সৃজন-প্রলয়-এ সবই সত্য, তাই সবই সহজ। এই শুভ্র নিরঞ্জন দৃষ্টির কল্যাণে বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে দেখা যাবে তাদের স্বরূপে। তখন বোঝা যাবে:

"চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতিপুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-তটের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।"

[শেষ সপ্তক : চার]

রূপ বা সৌন্দর্য আছে দু'রকমের; এক: সহজ বা স্বাভাবিক, অর্থাৎ, যা আপনা-হতে হওয়া। আর, দুই: যা গড়া বা নতুন-করে রচা—যাকে বলা হয় কৃত্রিম। সহজ রূপের অতি-স্বভাবতার দরুণ তা দাগ কেটে বসতে পারেনা মনে। কিন্তু, কৃত্রিম রূপের অতিপরিচয় আবার জাগায় বৈরূপ্য বা বৈমুখ্য। তখন সহজ-স্বাভাবিক রূপের মহিমা দৃষ্টি গোচর হয়।

ছন্দের অতিনিয়মিত বন্ধনে আড়ষ্ট কবিতার কৃত্রিম সৌন্দর্য একঘেয়ে হ'য়ে এলে আস্বাদন করা যায় মুক্তছন্দ গদ্য-কবিতার সহজ সৌন্দর্য, মুক্তির মর্যাদায় যা মহিমাময়। এই আস্বাদনে আনন্দ অনুভূত হ'লে বোঝা যায় কী চাইছিল মন, বোঝা যায়, সহজরূপেও থাকতে পারে কত অকল্পনীয় শ্রীমাধুরী। সে অনুভূতিতে স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি হয় মনের—

"অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা—
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ভ্রান্ত, আচার মুক্ত, ওরা সহজ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে,
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।"

[শেষ সপ্তক : পঁচিশ]

বুদ্ধিমত্তার আধিক্য বা স্পষ্টতা সৃষ্টির মধ্যেই মানুষকে করেছে স্বতন্ত্র। এই বুদ্ধিমত্তার অতি-সচেতনতা অহংকারী করে তোলে মানুষকে। স্বাতন্ত্র্যবোধী হয় সে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই আবার কারণ হয় তার পতনের, আর দুঃখের, যদি তা যায় মাত্রা ছাড়িয়ে। এর ফলে সে বন্দী করে নিজেকে মন-গড়া রাজ্যের কারাগারে। অহমিকার বিকৃতি তাকে ভুলিয়ে দেয় একথা যে সৃষ্টির আর সবকিছুর সঙ্গে থেকে আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাতেই মানুষের সুখ-সৌভাগ্য ও গৌরবের সুযোগ। সেই ভুলে যায়—

"বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী; প্রকৃতি-রাজবাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা।"

[বিচিত্র প্রবন্ধ : বসন্তযাপন]

এও সেই আত্মসর্বস্বতা। এই আত্মৈকময়তার

মরণ হতে বাঁচতে হ'লে, অন্ততঃ মাঝে মাঝে, প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে মানুষকে। নইলে, কত এমন শক্তি আছে মানুষের যে শুধু আপনাকে নিয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে-চলার, বাড়িয়ে-যাওয়ার দায়িত্ব, শুধু আপনাকে নিয়ে থাকার ঝুঁকি নিতে পারবে সে? সে-কথা বুঝেই শুধু কবিচিত্ত নয়, স্বাভাবিক মানবমনও বলে ওঠে :

'আমরা কি এতই একান্ত মানুষ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কিছুই নই?

...মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ স্বয়ম্বরসভা পাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার একথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে একথা বলেনা, আদি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে, স্বাতন্ত্র্যের জ্বালা আমার নহে।'

[বিচিত্র প্রবন্ধ : বসন্তযাপন]

মানুষ যদি ভরসা করে, বিশ্বাস করে প্রকৃতির কাছে সঁপে দিতে পারে নিজেকে তো অনেক নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে বাঁচতে পারবে সে; আপনাকে আগলে আগলে রাখার ভয় আর বিড়ম্বনা হতে সে বেঁচে যাবে। তাই অল্প নিয়ে থাকার দৈন্য, সংকীর্ণ সংকুচিত জীবনের কার্পণ্য হতে মুক্তি পেয়ে উদার, সরল, সরস, সুন্দর জীবনের লোভে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে কবি সহজ করে নিতে চান সমগ্র সত্তাকে, যাতে অকুণ্ঠিত অনবগুণ্ঠিত হয় তার প্রকাশ। এই ভাবের প্রকাশ দেখি এখানে :

"অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চারদিকে আজ প্রয়োজনের কাঙালের দল;
* * *
সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অসুক্ষণ বাণীতে।
তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে যদি সকালে-বিকালে
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বীণা।" [ঐ : ছাব্বিশ]

জীবনে বহু বিপরীত বিষয়ের সমাবেশের মতো আছে কাজ আর বিরাম। কাজকে বাদ দেয়া যায়না জীবন থেকে সত্য, কিন্তু কাজকেই পরম লক্ষ্য বা একমাত্র উপায় বলে মনে করাও সংগত হয় না। মুস্কিল এই যে এমনি এক ভোকাবি কাউকে কাউকে পেয়ে বসে কখনও কখনও, যে ভুলে যাওয়া যায় যে :

"বিরাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা"

শুধু তাই নয়। মনেই করতে পারা যায়না, বিশেষ করে এখনকার কর্ম-সুরাপানমত্ত পৃথিবীতে, যে জীবনে অকাজে-বিনাকাজে কাল কাটানোর, নিসর্গশ্রী উপভোগ করার সহজ আনন্দ-লাভেরও যথেষ্ট দাম আছে।

জীবনে এমন দিনের প্রয়োজন আছে, যখন মন বলতে পারে, 'আজ কোন কাজ নয়'; যখন কাজের তাড়ায় তাড়িত না হ'য়ে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে উপভোগ করতে পাওয়া যায় অখণ্ড অবকাশ। কিন্তু শুধু কাজ-বোঝা সংসারকে বোঝানো যায় না কাজের আঁতাকল থেকে ছাড়া পাওয়া জীবনের ইচ্ছামত অলস আবেশে সময় যাপনের আরামের কথা। সেই খেদেইনা কবিকে বলতে হয় :

"বিনা কাজে উপচে-পড়া সময় খোওয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে?"

[ঐ : সাতাশ]

সৃষ্টির সৌন্দর্যই হোক আর রহস্যই হোক তার মর্ম উপলব্ধি করবার দু'টি উপায় আছে : এক, অনুভূতি, আর, বুদ্ধি। বুদ্ধির দরকার আছে, দাম আছে বৈকি জীবনে, কিন্তু, তাই দিয়েই সবকিছু

জানা যায়না, পাওয়া যায়না। এমন কিছু সৌন্দর্য বা আনন্দ আছে যা অনুভূতি বা হৃদয়ের সহজ পথ দিয়ে পাওয়া যায় যতখানি, ততখানি পাওয়া যায়না বুদ্ধি দিয়ে। তাছাড়া, অনুভূতি বা ইন্‌টুইশানের সহজ উপায়ে যা পাওয়া যায় তার রং, তার স্বাদগন্ধও যে আলাদা। কাজ বা উপকারিতার হিসাবে সে প্রাপ্তির মূল্য স্বীকৃত না হতে পারে, এমনকি, তা অকেজো বা অসত্য বলেও নিরূপিত হতে পারে, কিন্তু, আন্তরিক আনন্দ লাভের ব্যাপারে তার সার্থকতা স্বীকৃত না হ'য়েই পারেনা। এ উপলব্ধির প্রতীকী প্রকাশ দেখি এখানে :

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মান্‌বই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা—
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর—
যেখানে আমাদের
হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি—
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানবপথিককে
নিঃশব্দ সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে। [ঐ : আটাশ]

জীবনকে পরিপূর্ণরূপে যিনি দেখতে জানেন, চাইতে জানেন তার কোন রূপই, পরিমিত মাত্রায় থাকলে উপাদেয় বা অগ্রাহ্য বলে মনে হয় না তাঁর। সর্বদিকদর্শী হতে পারেন যিনি, জীবনের প্রচুর আনন্দসম্পদের অধিকারী হতে পারেন তিনিই; কেননা, সহজ হতে পারেন তিনি। এমনি দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়েছেন কবি। তাই, বলতে তো তাঁর বাধেনা বরং অসংকোচে প্রকাশ করতে পারেন তিনি তাঁর জীবনের লীলাপ্রিয়তার কথা :

"হাল্কা আমার স্বভাব
মেঘের মতো না হোক
গিরি নদীর মতো।
আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামলনা।
বেদীর থেকে নেমে আসি
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নীচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হ'য়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজও সে সংকোচ করেনা।"

[শেষ সপ্তক : একচল্লিশ]

সাধারণত মনে করা হ'য়ে থাকে যে দুঃসাধ্য সাধন এবং কঠিন পণকরে বড়ো-একটা-কিছু হ'য়ে ওঠাতেই জীবনের চরম ও একমাত্র সার্থকতা। এই মনে-করা ভ্রান্ত, কারণ, এ-ধারণা খণ্ডদর্শিতাজাত। বিরাট একটা কিছু হ'য়ে ওঠার দাম যে নেই তা নয়, তবে তাছাড়াও জীবনের সার্থকতা আছে। অতি সাধারণ জীবনের রূপেও সত্য আছে। গভীর প্রজ্ঞা না থাকলে অবশ্য ধরা যায়না এ সত্যকে। জীবনের সহজ রূপের যে সত্য তাও পরিচয়নীয়। সাহিত্যে এই মানুষের দাম কম নয়। কিন্তু সহজ জ্ঞানে লভ্য এই সত্যটুকু অনেক সময় পাণ্ডিত্যের অহংকারে হয় উপেক্ষিত। যেখানেই কবি রবীন্দ্রনাথ এই সহজ বোধের প্রকাশ দেখেছেন সেখানেই সপ্রশংস হ'য়ে উঠেছে তাঁর ভাষ। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা কবিতা-লিপিকায় তার নজির দেখি :

"মানুষের যে পরিচয়
তার আপন সহজ ভাবে,
যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপকের ধারায়
দিনে দিনে যা গাঁথা হ'য়ে ওঠে
সাধারণ হ'লেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিতকর হ'লেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায় কি তোমার দৃষ্টি ?
সেইটে দেখাই সহজ নয়
পণ্ডিতের দেখা সহজ।"

[শেষ সপ্তক : বিয়াল্লিশ]

এই সহজ ভাবের মানুষের কথা সবাই বলতে পারেনা। বলতে তো পারেইনা, বরং মনে করে যে তা বলবার মতো কিছু নয়। কিন্তু :

"তার কথা যে লোক পারে বলতে সহজেই
সেই পারে,
অন্যে পারেনা।" [ঐ : ঐ]

যে পারে সে-ই মানুষের সহজ বন্ধু। এখনকার এই বুদ্ধিদর্পী, কূটতর্কগুরু, হৃদয়হীন, কৃত্রিমতা-বিকৃত যুগে বিশেষ দরকার আছে সেই সহজ-জীবন-রসিকের, যে সহজ-মানুষের কথা বলতে পারবে সহজে। তারই কথা কবি এখানে বলেছেন :

"আজ বিপুল হ'ল সমস্যা
বিচিত্র হ'ল তর্ক,
দুর্ভেদ্য হ'ল সংশয়
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ-বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।"

[ঐ : ঐ]

শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থে সহজবাদ ব্যক্তিত্বের অতি স্বাতন্ত্র্য বর্জন ও সবকিছুকে যথাযথে গ্রহণ, অনতিনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিকরূপেও সৌন্দর্যের অস্তিত্ব-বোধ, প্রকৃতি-প্রীতি ও প্রকৃতি-বশ্যতা, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন বিরাম-বিলাসের আবশ্যকতা, হৃদয়বাদিতা ও ইন্দ্রিয়-স্বীকৃতি, আমোদপ্রিয়তা ও সহজপ্রকাশের সার্থকতা প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি-এল, বিদ্যাবিনোদ

দর্শন শাস্ত্র কাহাকে বলে? মানবাত্মার উন্নতি-মূলক প্রশ্নই দর্শন, ইহা জ্ঞানের সোপান স্বরূপ। ইহা ধর্মের সহায়ক, দৃষ্টিশক্তির উদ্দীপক। ভারত-বর্ষীয় দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মনুষ্যের মুক্তি, মানব জাতির মুক্তিমূলক অবস্থা প্রাপ্তি সম্বন্ধে জ্ঞানদান। পারলৌকিক সদ্গতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ বিষয়ক ব্যাপার ইহাতে বিচার করা হইয়াছে। পরমার্থ তত্ত্ব—অনুসন্ধান দর্শন শাস্ত্রের অঙ্গীভূত বিষয়; জগতের কারণ নিরূপণও এই শাস্ত্রের অন্তর্গত।

জীবন ও জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব যিনি প্রণিধান করিতে পারেন তিনি দার্শনিক। জীবন ও জড় জগতের আদি কারণ নির্ণয় ও পরিণতি নির্দ্ধারণ প্রধানত দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত, জীব জগৎ ও জড় জগৎ সম্পর্কে শাশ্বত সম্বন্ধ, নিত্য বস্তুর সহিত অনিত্য পদার্থের পার্থক্য, সম্পর্ক ও যোগসূত্র যিনি দর্শন করেন, তিনি দার্শনিক নামে সাধারণতঃ খ্যাত। প্রকৃত সত্য, চিরন্তন বিধি যাহা যারা আবিষ্কার ও উপলব্ধি করা যায়, তাহা দর্শন শাস্ত্র নামে অভিহিত।

একথা কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না, যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ প্রকটিত হইয়াছে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র প্রবাহিত হইয়াছে বিভিন্ন চিন্তাধারার স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল স্রোতের সহিত। শাখা বিস্তারে ইহা ছয়টি পথের অনুবর্ত্তন করিয়াছে। যুগ বিশেষের চিন্তাকণা বহন করিয়া এইগুলি মানব মনকে করিয়া তুলিয়াছে উন্নত-পরিপুষ্ট, শিক্ষিত ও সংযত। এইগুলির পরিচয় সাধারণের মধ্যে একণে চড়াইয়া পড়িয়াছে। তবে নিগূঢ় ভাব-ব্যাখ্যা সর্ব্ব-সাধারণের মনে বোধহয় সুস্পষ্ট নহে। ইহাইবার কথা নহে। সাংসারিক ক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন তাহার আবাদ লাভ করিলে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, জাগতিক প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা জানিলে জ্ঞানমার্গে প্রীতি-প্লুত হৃদয়ে বিচরণ করা সম্ভব হইতে পারে। বঙ্গ-গৌরব মহর্ষি

(১) কপিল মুনির সাংখ্য দর্শন,

(২) পতঞ্জলির—যোগ দর্শন,

(৩) কণাদ ঋষির —বৈশেষিক দর্শন,

(৪) মহর্ষি গৌতমের প্রবর্ত্তিত ন্যায়-দর্শন। মহর্ষির অন্য আর একটি নাম অক্ষপাদ বলিয়া—ইহা অক্ষপাদ দর্শন নামেও পরিচিত।

(৫) মহর্ষি জৈমিনী প্রণীত মীমাংসা দর্শন—ইহা প্রবর্ত্তকের নামানুসারে জৈমিনী দর্শন নামেও অভিহিত।

(৬) বেদান্ত দর্শন—ইহা ব্রহ্ম-মীমাংসা নামেও কথিত, কেহবা বলেন উত্তর মীমাংসা; যেমন জৈমিনী-প্রোক্ত দর্শনশাস্ত্রের নাম পূর্ব্ব-মীমাংসা।

এই ষড়্ দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণবন্ত, ভারতীয়গণের চিন্তাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের প্রশস্ত পথ।

সাংখ্য দর্শন

কপিল মুনির তীব্র প্রতিভাপ্রসূত এই সাংখ্য দর্শন মানবচিন্তাধারায় এক নূতন বেগ আনয়ন করিয়াছে। জড় জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, প্রকৃতি বক্ষে গতি-উন্মেষ আছে, সংসার এই গতিশীলতারই বার্ত্তা বহন করিয়া থাকে। মানব-চিত্ত-আবেগ, অনুভূতি চিন্তার স্ফুরণে, হর্ষ-ভয়-মত্ততার স্পন্দনে স্থায়ু হইয়া থাকিতে পারে না। দিবা-নিশি আচার-ব্যবহার সংযোগ-সহবাসে, মিলন-বিচ্ছেদে অপরিহার্য্য ভাব পরিবর্ত্তনের বিপাকে দুর্দ্দমনীয় গতিতে মানব-হৃদয় সম্প্রসারিত হইয়া থাকে বলিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, মহাদেশ! অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইজন্য মনোহারী সমাজ-নীতি, ভাব-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র-নীতি, সুফলপ্রদ দেশ-প্রীতি বিশ্বপ্রেম-মূলক মহাদেশ-বন্ধন-নীতি। বিশ্বশান্তি, বিশ্ব-প্রেমের বীজ নিহিত আছে এই গতিশীল, জীবন্ত চিন্তার মূলে, আত্মার প্রসারতায়, জীবনের উদারতায়।

মহর্ষি কপিল সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও অলোক-সামান্য মেধার বলে প্রবৃত্ত হন জগতের আদি কারণ নির্ণয়ে। তাঁহার অসাধারণ তেজো-গর্ভ প্রজ্ঞা ও প্রতিভার ফলে আমরা লাভ করিলাম সাংখ্য দর্শন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বিচার-পদ্ধতি অন্য কোন স্থানে এমন উজ্জ্বলভাবে দেখা যায় নাই। কারণ অন্বেষণে যে তীব্র বিবেচনা-বোধ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর; সর্ব্বলোক গ্রহণযোগ্য না হইলেও প্রণালী মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অলৌকিক প্রভা-বিশিষ্ট ও অপূর্ব্ব চিন্তা-শক্তির প্রভাবে সজীব, তাঁহার যুক্তিধারার গতি সাবলীল, সহজবোধ্য, যুক্তি-গ্রন্থি সুদৃঢ়।

কপিল মুনির গুরুতর চিন্তার ফলে নিহিত হইয়াছে—সকল বস্তু পূর্ব্বস্থিত কোন না কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন—আদি কারণ অন্বেষণে সাংখ্য দর্শন বলিয়াছে—যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট, তুল্ক হইতে ধনি, সেই প্রকার সকল বস্তুর উৎপত্তি স্থান আছে। প্রত্যেক বস্তুর উপাদান কারণ আছে। কোন বস্তু অবস্থান্তরিত হইয়া অন্য বস্তু উৎপন্ন করিলে—উহা উপাদান-কারণ; যেমন পাটের উপাদান সূত্র, ঘটের উপাদান-

কারণ মৃত্তিকা। মৃত্তিকা পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘটে পরিণত হয়; এইজন্য ঐ প্রকার নাম-করণ। কপিল মুনি চিন্তার প্রাখর্য্য গুণে আবিষ্কার করিলেন —"অসৎ উৎপাদো নৃ-শৃঙ্গবৎ"। (১।১১৪ সূত্র সাংখ্য প্রবচন) অর্থাৎ মানবজাতির শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ কিংবা অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়া বা উহার ধারণাও তদনুরূপ অসম্ভব।

বর্ত্তমান চিন্তাধারা তৎকালে মানবসমাজে প্রবাহিত হয় নাই। সে কারণে মহর্ষির যুক্তি-সঙ্গতি সকলের চিদাকাশে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গেল। সর্ব্ব-বস্তুর, জড় জগতের কারণ-নিরূপণে তন্ময় হইয়া নানা যুক্তি দ্বারা তাঁহার চিরপরিচয় চিন্তা-রাজ্যে তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধ্যান-ধারণায়, তপস্যা-চিন্তায় তাঁহার তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন স্বতঃই উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। বহির্বিশ্বের আহ্বান পাইয়া তিনি কার্য্য-কারণ পরম্পরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, তবে তত্ত্ব নির্ণয়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, যুক্তির সামর্থ্য তাঁহাকে ইষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারিল না। অতীষ্ট সন্ধানে অনুপ্রবেশ করিয়া তিনি প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে স্বাভাবিক মতি ফিরাইলেন। তিনি এই চিন্তায় দিশাহারা হইলেন যে, শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর যখন নির্গুণ ও জগৎ নানারূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ঈশ্বর নির্গুণ হইয়া কিরূপে সগুণ জগতের গুণ-বিশিষ্ট সংসারের সৃষ্টি করিলেন? নির্গুণ ঈশ্বর হইতে সগুণ সংসারের উদ্ভব অসম্ভব। জগতে আমরা দেখিতেছি শীত আছে, আতপ আছে, সংসারে মৃদুতা-কাঠিন্য আছে, আবার দৃঢ়তা-শিথিলতাও আছে। সগুণ পৃথিবীর নির্গুণ সৃষ্টিকর্ত্তা ধারণাতীত। দুইটির মধ্যে একটির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেই হইবে। কেননা যুক্তির সম্মান রাখিতে গেলে বলিতে হয়, বিপরীত গুণাত্মক দুইটি বস্তু একযোগে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। জগৎ-সংসার, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব চক্ষুগোচর, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ দ্বারা বিবেচিত চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিচিত, অতএব ইহা পরিত্যাগ করা যায় না। বিপরীতাত্মক গুণের একটি গ্রহণ করিলে মানবিক বুদ্ধিবলে অপরটি পরিত্যাজ্য, অতএব সাংখ্য দর্শনে উক্ত হইল: ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ [৯২ সূত্র সাংখ্য প্রবচন] যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইল, তবে কিরূপে জগতের সৃষ্টি হইতে পারে এ বিষয়ে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইয়াছিল। বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি পুনরায় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তীক্ষ্ণমেধা-মুনিপুঙ্গব বিচার করিয়া দেখিলেন নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত বস্তু না থাকিলে, কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। পারম্পর্য্য সমাধান সাংখ্যদর্শনের বিশেষ কৃতিত্ব। বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ যেমন বলেন, শূককীট রূপান্তরিত হইয়া প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছে। জলজ কীট হইতে শূককীট তাহা হইতে মূককীট, তৎপরে মশক রূপ জন্মলাভ করিয়াছে—এই বৈজ্ঞানিক তথ্য অধুনা সর্ব্বত্র প্রচারিত।

প্রকৃতি ও পুরুষ

কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনর্ব্বার অন্য কারণ—ইহাই কারণ-পরম্পরার রীতি; তাহা যদি হয় এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবেই। প্রকৃতি সেই আদি কারণের সংজ্ঞাবিশেষ—ইহা সাংখ্য প্রবচনের প্রথম অধ্যায়ের ৬৮ সূত্রে দৃষ্ট হয়। সাংখ্যের মতে, পুরুষ চেতনস্বরূপ তবে সুখ-দুঃখ-জ্ঞানবিরহিত। পুরুষ বিকারশূন্য, কার্য্যহীন; কার্য্য (আগন্তুক কর্ম্ম) সমস্তই সম্পন্ন করিয়া থাকে প্রকৃতি। প্রকৃতিকে মূলীভূত কারণ বলিতে পারা যায়। কপিল মুনি জগতের সচেতন ও অচেতন এই দুই প্রকার পদার্থ দর্শন করিয়া তাহার মূলস্বরূপ ঐ দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, এবং নবনীত

হইতে যত প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, তদনুরূপ সকল বস্তুই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা যোগে ঐ প্রকৃতিরই পরিণাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ জগতের যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতির কার্য্য পরম্পরায় বিভিন্নরূপ বিশেষ। সাংখ্যদর্শন প্রচার করে এই মূল প্রকৃতি, জাগতিক বস্তু সমূহের তিনটি গুণের (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) সাম্যাবস্থা। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে সাংখ্যদর্শনের প্রশংসা দেখা যায়ঃ "নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগ সমং বলম্" সাংখ্য বিদ্যার পর আর বিদ্যা নাই, যোগবলের তুল্য আর বল নাই। সাংখ্য শাস্ত্রের বহুস্থানে বুদ্ধির প্রাধান্য যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য্য।

প্রকৃতি নিয়মের রাজত্বে নিয়ন্ত্রিত। ইহাতে আছে শৃঙ্খলা, শান্তি—শাশ্বত-সনাতন নিত্য রীতি, নিয়ম তান্ত্রিক নীতি, ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। প্রকৃতি স্বয়ং জড় হইলেও পুরুষ সাহায্যে সংসার-ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রকৃতি পুরুষ সন্নিধানবশতঃ বিশ্বরচনা করিয়া থাকে। কপিল মুনি জাগতিক সচেতন ও অচেতন পদার্থের মূল রূপে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পুরুষ প্রাণীদের আত্মা, বিশ্বলীলা প্রকৃতির কার্য্য। তবে পুরুষ-প্রকৃতি মধ্যে লৌহ-চুম্বক তুল্য আকর্ষণী শক্তি আছে।

প্রাচীনত্ব

প্রাচীন পুস্তক উপনিষৎ, মহাভারত ও অন্যান্য বহু ধর্মগ্রন্থে ও শাস্ত্র পুঁথিতে ইহার প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের ৬।১৩ শ্লোকে উক্ত আছে—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

যিনি সমুদয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য ও সমস্ত অচেতন পদার্থের চেতনস্বরূপ এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামনা পূর্ণ করেন, সেই সাংখ্যযোগের অধিগম্য ও কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সাংখ্য-প্রবর্ত্তক কপিল মুনির নাম ঐ উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেও পরিদৃষ্ট হইবে: "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি"—যিনি প্রসূত কপিল ঋষিকে প্রথমে জ্ঞানের দ্বারা পোষণ করেন।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত-পুরাণে উল্লিখিত আছে কপিল ঋষির নাম, তবে পুরাণকার কপিল মুনি সগর বংশ যে ধ্বংস করেন তাহা অবিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, যিনি মুমুক্ষু লোকের ভব-সমুদ্র উত্তরণ উদ্দেশ্যে সাংখ্যরূপ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনিই কিরূপে ক্রোধের বশীভূত হইয়া সগর রাজের পুত্রগণকে কোপানলে দগ্ধ করিতে পারেন?

মনুসংহিতা নামক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নকালে সাংখ্যদর্শন প্রচারের বহুতর নিদর্শন আছে। মনুসংহিতা মহাভারতের পূর্ব্ব-সৃষ্টি বলিয়া জানা আছে।

বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন এক দেহের ক্ষয় হইলে বিজ্ঞান ধারা (Consciousness continuum) অন্য দেহকে আশ্রয় করে, এই কারণে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অবিচ্ছিন্ন। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই চরম সত্য প্রচার করিয়াছিলেন—জগতের সকল পদার্থই অনিত্য ক্ষণমাত্র স্থায়ী। পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় অস্থায়ী চিরচঞ্চল ইহা বেদান্তেও প্রোক্ত হইয়াছে। ক্ষণিকত্ববাদ-জনিত চিন্তাধারা প্রণালিত হইয়াছে এইভাবে—সকল পদার্থ ক্ষণিক বলিয়া জ্ঞানও ক্ষণিক, জ্ঞানের আশ্রয়ও ক্ষণিক। নিত্যবস্তু কিছু নাই, আত্মাও নিত্য নহে, স্থায়ী আত্মা স্বীকৃত হইলে মনের মধ্যে আত্মাভিমান আসিবে, রাগদ্বেষাদি অবিদ্যার কারণের ক্ষয় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইজন্য

চিন্তা-নিসিক্ত মন এই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে যে, মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষায় সকলের সর্ব্বদা চিন্তা করা উচিত "নিত্য আত্মা নাই।" নিত্য কোন পদার্থ নাই, নিত্য আত্মাও নাই—এইরূপ প্রতিপক্ষ চিন্তা যার সাধনা বা অধ্যবসায়ের দ্বারা চিত্তের যে আবরণ তাহার ক্ষয় হইয়া যাইবে।

সার ধর্ম্ম

মহামুনি কপিল দেবের সাংখ্য-প্রবচন বহু তত্ত্ব-কথায় পরিপূর্ণ। তিনি জগতের আদি কারণ নির্ণয়ে বহু গবেষণা, বিচার-বোধের কার্য্য ও তর্ক-বিতর্ক দ্বারা সৃজন-রহস্যের তলস্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্যমে কপিল মুনি জ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধি বিবেচনার অপরিসীম গভীরতা দেখাইয়া প্রকৃতি পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন। আদি-বিজ্ঞানের এই মূলতত্ত্বের তিনিই আবিষ্কর্ত্তা। বর্ত্তমান আভিধানিক শব্দ Evolution (ক্রমঃ-বিবর্ত্তন) তিনিই প্রথম কল্পনা করেন। তৎপূর্ব্বে কেহ করেন নাই বলিয়া বিবর্ত্তনবাদের তিনিই জনক; ইহা ভিন্ন পারম্পর্য্য বিধান Relativity আপেক্ষিক গুরুত্ব রূপ পরিবর্ত্তন, মূল তত্ত্ব, আদি কারণ নির্ণয় প্রভৃতি তাঁহারই চিন্তাপ্রসূত। তর্ক-বিতর্ক, বিচার-সিদ্ধান্তে তাঁহার কৃতিত্ব ও সাফল্য অসামান্য। কপিলমুনির নাস্তিকতাবাদ অনেকে গ্রহণ না করিলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতা ও যুক্তির সূক্ষ্ম তর্কজাল আলোচনা করিলে তাঁহার চিন্তাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সাংখ্যকার কপিলঋষির নাস্তিকতাবাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সাংখ্য-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন, শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর ত' নির্গুণ এবং জগৎ সগুণ অর্থাৎ নানাবিধ গুণবিশিষ্ট; অতএব নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ সংসারের, গুণময় জগতের উৎপত্তি হইল? ইত্যাদি।

সাংখ্য-কারিকায় দেখা যায় প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে:

দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা।

ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের উপায় জিজ্ঞাসা। বিবেক কিংবা তত্ত্বজ্ঞানই এই প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভের উপায়। দুঃখ-যন্ত্রণার মূল কারণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। মূল কারণ তিরোহিত হইলে দুঃখের উপশম হওয়া স্বাভাবিক। জীবের সুখ-দুঃখ, মানবজাতির দুঃখ-ক্লেশ মূল প্রকৃতির কার্য্য। ঐ উভয়ের নিঃশেষে নিবৃত্তি হওয়ার নামই মুক্তি। মুক্তি তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে উদ্ভূত, তত্ত্বজ্ঞানই ঐ মুক্তির কারণ।

সাংখ্য-দর্শন অনুসারে ধর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত: অভ্যুদয় হেতু ও নিঃশ্রেয়স হেতু (১) যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান-ক্রিয়া দ্বারা যে ধর্ম্ম সাধন হয়, তাহাই অভ্যুদয় হেতু, —ইহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিঃশ্রেয়স্ হেতু বলা হয়—ইহা দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং মানব মুক্তি পথে অগ্রসর হয়। সাংখ্যকারিকা প্রকাশ করিয়াছে এইরূপ তত্ত্বানুশীলন করিলে 'আমি নাই' 'আমার শরীর নাই', কেননা আমি ভিন্ন, শরীর ভিন্ন, আমি অহঙ্কার-বর্জিত এই শেষ সিদ্ধান্ত স্বরূপ এবং নিঃসংশয়িতা প্রযুক্ত বিশুদ্ধ একটিমাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানে মুক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী।

সাংখ্যকারিকা রচনা করেন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বর কৃষ্ণ। ইহাতে সাংখ্যের মূল ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কপিল-মুনির সাংখ্য প্রবচন ও তত্ত্ব সমাস ভিন্ন ত্রিহুতনিবাসী বাচস্পতি মিশ্র রচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও নারায়ণ তীর্থ কৃত সাংখ্য-চন্দ্রিকায় সাংখ্য মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়াছেন বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-সার ও সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে। ইহা ব্যতীত শ্রদ্ধেয় গৌড়পাদ তৎ-রচিত সাংখ্যকারিকা-

ভাষ্যে সাংখ্য দর্শনের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া জন-সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সাংখ্য-শাস্ত্র গ্রন্থে সৃষ্টিরহস্য যে ভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার :

"প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হয়, সত্ত্ব-গুণোদ্রিক্ত ঐ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়, রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ : শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ, শব্দ। শব্দ-তন্মাত্র ও স্পর্শ-তন্মাত্র এই উভয় হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ, শব্দ ও স্পর্শ। ঐ দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। ঐ তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে জল হয়, জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ আর রস। ঐ চারিটি তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ —শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তর্বর্ত্তী কার্য্য জাত হয়।"

সাংখ্যকার বুদ্ধি-বিচারে প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশটি পদার্থের নাম তত্ত্ব রাখিয়াছেন। আমরা জানি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ। সাংখ্যের মতে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব এই কয়টি।

পঞ্চ বিষয়—প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, মন।

(মহত্তত্ত্বুদ্ধি)

পঞ্চ মহাভূত—মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক।

" কর্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ।

" তন্মাত্র—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ।

দুঃখ, সাংখ্যকার বলেন, ত্রিবিধ : আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

(১) আধ্যাত্মিক দুঃখ—কাম-ক্রোধাদি রিপু দ্বারা যে সকল দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ।

(২) আধিভৌতিক দুঃখ—অগ্নি, বায়ু জলাদি স্থাবর এবং পশু-পক্ষী কীটাদি অস্থাবর বস্তু হইতে যে সকল দুঃখ সঞ্জাত হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলা হয়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জনিত চারি প্রকার দুঃখকেও আধিভৌতিক বলে। তাহা মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক, উৎকুণ-মৎকুণ, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর ও বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু হইতে সম্ভাবিত হয়।

(৩) আধিদৈবিক দুঃখ—শীত-উষ্ণ-বাত-বর্ষা-বজ্রপাতাদি হইতে সঞ্জাত,—দেবতা বা দিব্, আকাশ হইতে উদ্ভূত যে সকল দুঃখ তাহা আধিদৈবিক দুঃখ।

উপসংহার

সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে আধুনিক জীবতত্ত্ববিৎ বলেন, মশক জাতির কারণ মূককীট (pupa), ইহার আকার কমা'র মত, ইহা এক প্রকার কীট, অপেক্ষাকৃত হাল্কা বলিয়া জলের উপরিভাগে ভাসিয়া বেড়ায়। এই অবস্থায় ইহার মুখ থাকে না বলিয়া ইহা কোন-কিছু ভক্ষণ করিতে পারে না। তবে শ্বাসনল সাহায্যে শ্বাস লইয়া বাঁচিয়া থাকে। দুইদিনের মধ্যে মূক-কীট বা পুত্তলির খোলস ভাঙ্গিয়া পূর্ণাবয়ব মশক বাহির হইয়া যায়। মশক বাহিরে আসিয়া তাহার খোলসের উপর বসিয়া ডানাগুলি শুকাইয়া লয় এবং তৎপরে বল পাইলে উড়িয়া যায়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, এই মূককীট বা পুত্তলির (pupa) আদি কারণ শূককীট (larva)। এই পূর্ণ জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের দর্শনশক্তি এ প্রকার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, স্ত্রী মশক জলের উপর একসঙ্গে একশত হইতে পাঁচশত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ডিমগুলি প্রথমাবস্থায় শ্বেতবর্ণ থাকিয়া পরে কৃষ্ণবর্ণ আকার ধারণ করে। এই

ডিমগুলি জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। বৈজ্ঞানিক দর্শন করিয়াছেন, ডিমপ্রসবের পর দুই দিন যাইতে না যাইতে ডিম ফুটিয়া ভিতর হইতে শূক বা শূককীট (larva) বাহির হইয়া পড়ে। এই নবপ্রসূত শূক জলের মধ্যে দ্রুত সন্তরণ করিয়া বেড়ায় এবং জলজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও কীট সকলকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। কেবল ইহাই নহে, মধ্যে মধ্যে এই কীট জলের উপরিভাগে আসিয়া শ্বাস লইবার দুইটি নল দ্বারা বায়ু গ্রহণ করে দেখা গিয়াছে। শূককীট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আট-দশ দিনের মধ্যে দুই-তিন-বার খোলস ছাড়ে। ইহার পর ঐ কীটের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া কমার আকারে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কীটকে পুত্তলি বা মূককীট বলা হয়। সুতরাং মূককীটের বা মশকের আদি-কারণ শূককীট। এই প্রকারে জীবজগতে কার্য-কারণ পরম্পরা চলিতেছে। প্রকৃতি বা জীবজগৎ একটি রাজ্য—যাহা শৃঙ্খলিত কার্য-কারণ সম্পর্কিত নিয়মাধীন।

অভেদানন্দ স্মৃতি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী

মহাজ্ঞানী, মহাগুণী আরো আছে হেন শুনি,
তবু যেন নহে কেহ তোমার মতন।
বালক বয়সে কেবা রামকৃষ্ণ পদসেবা-
ব্রত করিবারে করে এ-হেন যতন।
গুরু শিষ্যে ভেদ নাই বুঝিয়াছি এবে তাই
অভেদানন্দ-ই শুধু কেন তব নাম।
বুঝিয়াছি অনুমানে শ্রুতি-স্মৃতি আদি জ্ঞানে
পূর্ণের স্বরূপ তুমি মহানন্দ ধাম!
পরম পুরুষ যিনি তাঁরো চিত্ত নিলে জিনি'
শিষ্য রূপে তুমি দেব নহ অপ্রধান।
যথা গুরু তথা শিষ্য ভরালো বিপুল বিশ্ব
কর্ম ভক্তি জ্ঞানমার্গে তব অবদান।
অজ্ঞান, অধম আমি কিবা জানি, কহি স্বামী,
অনন্ত মহিমা তব অনন্তের প্রায়
যতনে বুঝালে যাহা কণা মাত্র বুঝি তাহা,
সুধা ও সৌরভ রহে কতোনা তাহায়।
তাই মনে মনে বলি অসময়ে গেছো চলি'
কর্ম-অবসানে তব ধরণী মাঝার—
কর্মের সন্ধান দিতে, প্রশান্তি অশান্ত-চিতে
মানবের মাঝে প্রভু আসিবে কি আর?

সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, কাব্য-সাংখ্য পুরাণতীর্থ

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' একমাত্র যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ। বেদ-বেদাঙ্গ, স্মৃতি-পুরাণ, কাব্য-নাটক, দর্শন-অলঙ্কার—নানা শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় সংস্কৃতের দান অসামান্য হইলেও ইতিহাসের অনুশীলনে সংস্কৃত গ্রন্থকারের কোন আগ্রহ ছিল না একথা স্বীকার করিতে হইবে। পৌরাণিক বংশানুচরিত এবং মহাভারতের আখ্যানাংশ অবশ্যই ইতিহাসধর্মী, কিন্তু তাহাতে অবিমিশ্র তথ্য-বৃত্তের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। সে ইতিহাস প্রায়ই উপদেশবহুল।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

সংস্কৃত তাম্রশাসন-শিলালিপির প্রশস্তি অংশে কয়েকটি প্রাচীন রাজবংশের নাম-পরিচয় এবং সামান্য কীর্তিকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে একথা সত্য এবং কোন কোন কাব্য-নাটকের আখ্যানে কিছু কিছু প্রাচীন বৃত্তান্তের আভাস পাওয়া যায় সেকথাও ঠিক। কিন্তু সে সকল রচনায় সংস্কৃত কবির উদ্বেল বাক্যধারার বিপুল উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘটনার যাথার্থ্য অপেক্ষা কল্পনার বিলাস অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কল্‌হণের রচনা অন্যরূপ। তাঁহার গ্রন্থ কাব্যের মাধুর্য এবং তথ্যের প্রাচুর্যে সমান সমৃদ্ধ।

রাজতরঙ্গিণী শ্লোকে নিবদ্ধ কাশ্মীর রাজ্যের ইতিবৃত্ত। তরঙ্গিণীর বক্ষে থাকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের অবিচ্ছিন্ন উত্থান আর পতন, এই গ্রন্থে আছে বিভিন্ন রাজবংশের ধারাবাহিক উত্থান-পতনের ইতিহাস। এই ইতিহাস-রচনায় সহজাত প্রতিভা এবং প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা উভয়েই কল্‌হণ কবির পরিপূর্ণ সহায় হইয়াছিল। কল্‌হণ নিজেই বলিয়াছেন—

নির্মাণকুশল কবি ছাড়া আর কেহই অতীতকে প্রত্যক্ষ করাইতে সমর্থ হন না। ক্রান্তদর্শী কবি আপন প্রতিভাবলে লুপ্ত দৃষ্টি লাভ করেন। পরোক্ষ ঘটনার প্রকাশসামর্থ্যেই হয় সেই প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়।

কোঽন্যঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ।
কবিপ্রজাপতীংস্ত্যক্ত্বা রম্যনির্মাণশালিনঃ॥
স পশ্যেৎ সর্বসংবেদ্যান্ ভাবান্ প্রতিভয়া যদি।
তদস্তদ্ দিব্যদৃষ্টীনাং কিমিব স্যাপকং কবেঃ॥

একদিকে কল্‌হণ এই সহজ কবিপ্রতিভার অবিসংবাদিত অধিকারী হইয়াছিলেন, অপরদিকে তিনি স্বয়ং রাজসভাসদ্ না হইয়াও রাজকীয় ব্যাপারের অভিজ্ঞতা অর্জনের অসাধারণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা চম্পক ছিলেন কাশ্মীররাজ হর্ষের বিশ্বস্ত মন্ত্রী। কুখ্যাত হর্ষের অনাচার, অত্যাচার, বুদ্ধিনাশ, ভাগ্যনাশ—সকল বিষয়ই কল্‌হণ বিচক্ষণ দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন। পরবর্তী রাজগণের সংঘট্ট সংক্ষোভ, অভ্যুদয় অবসাদ—এ সকলও তিনি নিপুণ অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে যেভাবে তাৎকালিক ঘটনা-স্রোতের গতি-পরিণতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা কেবল প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই সম্ভবপর।

কল্‌হণ সুদক্ষ চিত্রকরের মত প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা এই দুই তুলিকার সাহায্যে অতিক্রান্তকাল চিত্রণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাজ-সংসারের বিরোধ-বিসংবাদ, অমাত্য-পরিজনের কূট-কৌশল, নাগরিকবর্গের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয়গুলি কল্‌হণের অপূর্ব বর্ণন ভঙ্গীতে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘাত-প্রতিঘাতের যে সুস্পষ্ট ছবি কল্‌হণ সেকালের

প্রাচীন ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বর্তমান কালে চলিত ভাষায় ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাহা সুলভ নয়।

কল্‌হণ ১০৭০ শকে (১১৪৮ খৃষ্টাব্দে) রাজতরঙ্গিণী রচনা আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী বৎসরে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তৎকালে সুস্‌সল ভূপতির পুত্র জয়সিংহ কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুতঃ সুস্‌সলভূভর্তুঃ সম্প্রত্যপ্রতিমক্ষমঃ।
নন্দয়ন মেদিনীমাস্তে জয়সিংহো মহীপতিঃ॥

রাজতরঙ্গিণী অসমান আটটি তরঙ্গে বিভক্ত। সমগ্র গ্রন্থে প্রায় আট হাজার শ্লোক আছে। শেষ দুই তরঙ্গের শ্লোক সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশী। যদিও কল্‌হণ স্মরণাতীত যুগ হইতেই কাশ্মীরের বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি মনে হয়, নিজের সমসময় এবং নাতিদূরবর্তী অতীত এই পরিচ্ছিন্ন কালের ইতিহাসেই ছিল তাঁহার প্রকৃত আগ্রহ।

কল্‌হণ-বর্ণিত প্রথম রাজা তৃতীয় গোনন্দ রাজতরঙ্গিণী রচনার দুই হাজার তিন শত ত্রিশ বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব ১১৮৪ সালে বর্তমান ছিলেন। তাহারও পূর্বে এক অস্পষ্ট পৌরাণিক যুগের কথা কল্‌হণ উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই অতি পুরাতন যুগে ৫২ জন রাজা ১২৬৬ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বৃত্তান্তও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল দূর অতীতের বর্ণনায় স্পষ্টতই প্রাক্তন লেখকদিগের কল্পনাপ্রধান রচনা এবং বিক্ষিপ্ত কিংবদন্তীই ছিল কল্‌হণের সম্বল। যদিও কল্‌হণ সে যুগের সংস্কারসঙ্গত অতিচার ইন্দ্রজাল এবং দৈবোৎপাতের কাহিনী অবিশ্বাস্য বলিয়া বর্জন করেন নাই, তথাপি তিনি যে যথার্থ বৃত্তান্ত সঙ্কলনে সর্বত্রই যত্ন করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি পূর্বসূরিদের এগারখানি গ্রন্থ দেখিয়াছেন, নীলমুনিমত, প্রশস্তিপট্ট, রাজানুশাসন প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রচলিত স্থূল-ভ্রান্তি যথাসম্ভব শোধন করিয়াছেন।—

দৃগ্‌গোচরং পূর্ব-সূরিগ্রথা রাজকথাশ্রয়াঃ।
মম ষেকাদশ গতা মতং নীলমুনেরপি॥
দৃষ্টৈশ্চ পূর্বভূভর্তৃপ্রতিষ্ঠাবস্তুশাসনৈঃ।
প্রশস্তিপট্টৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ শাস্ত্রোহয়ং শ্রমমক্ষমঃ॥

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে দুর্লভবর্ধন কাশ্মীরে কার্কোট বা নাগ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর হইতে কল্‌হণের বিবরণ তথ্যবহুল। নবম শতকের মধ্যভাগে কাশ্মীরে উৎপলবংশীয় অবন্তিবর্মার অধিকার স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে কল্‌হণের আপন কাল অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত—এই তিন শত বৎসরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে নিখুঁত বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

কাশ্মীর কল্‌হণের জন্মভূমি। কাশ্মীরের তীর্থগৌরব কীর্তনে তিনি গর্ব বোধ করেন, প্রাকৃতিক বৈভব বর্ণনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। দেশের জয়গানে তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি। তিনি বলিয়াছেন —ত্রিলোকের মধ্যে রত্নপ্রসবিনী পৃথিবী শ্লাঘ্য, পৃথিবীতে শ্লাঘ্য কুবেরের উত্তর দিক, উত্তরে শ্লাঘ্য গৌরীগুরু হিমাচল এবং সেই হিমাচলের উপর কাশ্মীরমণ্ডল আরও শ্লাঘ্য।

ত্রিলোক্যাং রত্নসূঃ শ্লাঘ্যা তস্যাং ধনপতের্দিশি।
তত্র সৌরীগুরুঃ শৈলো যত্তস্মিন্নপি মণ্ডলম্॥

কাশ্মীরের হ্রদ, প্রস্রবণ, নদী, পর্বত, মন্দির, প্রসাদ কল্‌হণ পরম মমত্ববুদ্ধি লইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিচিত্র বিন্যাসমৃদ্ধি, উত্তুঙ্গ সৌধমালা, রক্তবর্ণ কুঙ্কুমরাশি, শীতল হিমজল এবং সুমিষ্ট দ্রাক্ষাফল যে কাশ্মীর মণ্ডলের অনায়াসলভ্য সম্পদ, কল্‌হণ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—

বিন্যা যেষ্বাসি তুঙ্গাসি কুঙ্কুমং সহিমং পয়ঃ।
দ্রাক্ষেতি যত্র সামান্যমভি ত্রিদিবদুর্লভম্॥

কিন্তু কল্‌হণের রচনায় কাশ্মীরের প্রতি মমত্ববোধ থাকিলেও পক্ষপাত নাই। তিনি জানিতেন অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনায় যে ব্যক্তি বিচারকের মত রাগদ্বেষহীন বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনিই প্রশংসার পাত্র।

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী ॥

সত্যই কল্‌হণ ছিলেন রাগদ্বেষরহিত। তিনি স্বদেশীয়দের শৌর্যবীর্য, ধর্মাধর্ম, বিবেকবৈরাগ্যের কথাও যেমন বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের ত্রুটিবিচ্যুতি, হিংসাদ্বেষ, অত্যাচার অনাচারের কথাও তেমনই প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি পিতৃপ্রভু হর্ষের দোষখ্যাপনেও তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখা যায় না। তিনি কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বিরুদ্ধে কখনও রোষ বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, তাঁহাদের নিন্দার্হ বা প্রশংসার্হ কর্ম-কলাপের সমুচিত নিন্দা বা প্রশংসা করিয়াছেন মাত্র।

কল্‌হণ যশস্বী ব্যক্তির দোষ দেখিলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, শত্রুপক্ষের গুণ দেখিলে তাহারও প্রশংসা করিয়াছেন। মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য একজন দিগ্‌বিজয়ী বীর, প্রাচীন কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা কিন্তু তিনি একসময়ে দেবতার নামে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিদানের পর নিঃশঙ্ক অতিথিগৌড়রাজকে গুপ্ত-পুরুষের সাহায্যে নিহত করিয়াছিলেন। বাংলার বীর পুরুষগণ তাঁহাদের রাজার প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা নির্বিকারে সহ্য করেন নাই। তাঁহারা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নির্ভয়ে কাশ্মীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, এবং অনুচিত প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ চেষ্টায় বীরের মতই সকলে নিঃশেষে মৃত্যু বরণ করেন। কল্‌হণ বলিয়াছেন—তাঁহাদের রুধিরধারায় প্রভুভক্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বসুন্ধরাও ধন্য হইলেন। সে সময়ে গৌড়বাসীরা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিধাতারও অসাধ্য।

তদীয়রুধিরাসারৈঃ সমভূদুজ্জ্বলীকৃতা।
স্বামিভক্তিরসাস্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা ॥
বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা।

বিদেশীর বিপক্ষদলের এমন কুণ্ঠাহীন প্রশংসা কেবল প্রকৃত ঐতিহাসিকই করিতে পারেন।

রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের রাজগণের বিবরণমাত্র নয়। এই গ্রন্থে আছে—রাজ্যের যথার্থ পরিচয় এবং সমগ্র কাশ্মীরী সমাজের ইতিবৃত্ত। কল্‌হণ দেখাইয়াছেন যে, কাশ্মীর রাজ্যের বিপত্তি-বিপর্যয় কেবল রাজগণের ব্যসন-ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা-নির্বুদ্ধিতারই পরিণাম নয়, ইহার মূলে স্বার্থপর সভাসদ, কুচক্রী পুরোহিত, এবং মোহময়ী নারীরও যথেষ্ট হাত ছিল।

একটি বিচিত্র কথা এই যে, সে যুগের ভারতবর্ষে যে বিষয়ে অপর প্রদেশে নিতান্ত ঔদাসীন্য দেখা যায়, সেই ইতিহাসরচনায় কাশ্মীরবাসীদিগের ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। কল্‌হণ এগারখানি প্রাচীন রাজকাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন, সুব্রতের ইতিহাস-'প্রবন্ধ', ক্ষেমেন্দ্রের 'নৃপাবলি', হেলারাজের 'পার্থিবাবলি' এবং ছবিল্লাকরের 'ইতিবৃত্তে'র নাম করিয়াছেন। কল্‌হণের পরেও রাজতরঙ্গিণীর অনুবর্তনে জোনরাজ, শ্রীবর ও প্রাজ্যভট্ট এই তিনজন গ্রন্থকার কাশ্মীর ইতিহাসের ধারা রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাদিগের মধ্যে কোন ঐতিহাসিকই বস্তুবর্ণনায় কল্‌হণের পর্যায়ে উঠিতে পারেন নাই।

রাজতরঙ্গিণী মুখ্যত ইতিবৃত্ত হইলেও কল্‌হণের অপূর্ব বচনকুশলতায় সর্বত্র সরস বলিয়া মনে হয়। অনেকস্থলে কল্‌হণ কালিদাস বাণভট্টের রচনাভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। নিষ্ণাত শিল্পী যেমন আদর্শের সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও তাঁহার চিত্র পটখানি নানাবর্ণের মনোহর রাগে রঞ্জিত করিয়া বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেন, কল্‌হণও তেমন ইতিহাস-তথ্যের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াও তাঁহার গ্রন্থখানি নানারূপ ছন্দে ও বলের স্বাতন্ত্র্যে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণী প্রাক্তন কাশ্মীরের একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। ইহার একদিকে অঙ্কিত হইয়াছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, নৃশংস বৈরসাধন, নির্লজ্জ ব্যভিচার ও ছলনাময় বিশ্বাসভঙ্গ এবং অপরদিকে বর্ণিত হইয়াছে প্রণয়প্রীতি, মধুর স্বজনবাৎসল্য, সুগভীর প্রণয় ও নিষ্কপট প্রভুভক্তি।

কল্‌হণ এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আশা প্রকাশ

করিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিত চরিতকথা নানা দেশের নানা কালের নৃপতিগণের পক্ষে ভেষজের কার্য করিবে, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহাদিগকে কখনও বা প্রোৎসাহিত করিবে, কখনও বা নিয়ন্ত্রিত করিবে।

ইদং নৃপাণামুদ্ভাসে হ্রাসে বা দেশকালয়োঃ।
ভৈষজ্যভূতসংবাদিকথাযুক্তোপযুজ্যতে॥

এক একটি ঘটনা বর্ণনার পর কল্‌হণ তাহা হইতে যথাযোগ্য উপদেশ আহরণ করিয়াছেন এবং পাঠকবর্গের উদ্দেশে এক একটি নীতিগাথা গ্রথন করিয়া রাখিয়াছেন।

(১) জয়াপীড় নামে এক অর্থগৃধ্নু রাজা অন্যায়ার্জিত ধনে তাঁহার কোশাগার পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রাজপুত্রের বালকগণ সমস্ত ধন অপব্যয়ে নিঃশেষ করিয়াছিল। এই ঘটনায় কল্‌হণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—রাজ-কোশ যখন অবৈধ সঞ্চয়ে দূষিত হয়, তখন তাহা অভাব্য উপায়ে সত্বর বিনষ্ট হইয়া যায়।

রাজ্ঞাং কৃপণবিত্তৈর্যৎ প্রবিষ্টৈর্দুষ্কৃতে ধনম্।
অচিরাদ্ধ্বীয়তে শাঙ্কিমপূর্বৈঃ কৈশ্চিদেব তৎ॥

(২) দুর্জন তারাপীড় আপন ভ্রাতাকে আভিচারিক উপায়ে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং কালক্রমে নিজেও অনুরূপভাবেই নিহত হইলেন। এই প্রসঙ্গে কল্‌হণ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি পরের অপকারার্থ উপায় উদ্ভাবন করে, সে নিজেও সেই উপায়েই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অগ্নি ধূম উৎপাদন দ্বারা দৃষ্টির ব্যাঘাত করে, সেই ধূমই আবার মেঘে পরিণত হইয়া বৃষ্টিরূপে অগ্নিকে বিনাশ করে।

যো যং পরাপকরণায় স্বয়ত্নোপায়ং তেনৈব তস্য
নিয়মেন ভবেদ্বিনাশঃ।
ধূমঃ প্রসৌতি নয়নান্ধকরং যমগ্নির্দুরাদ্ধূমঃ স
সময়েৎ সলিলৈস্তমেব॥

(৩) এক সময়ে রাজা হর্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে দয়িত সেনার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি নগরে ফিরিয়া ভয়ঙ্কর প্রজাপীড়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার "আচরণ লক্ষ্য করিয়া" কল্‌হণ মন্তব্য করিয়াছেন—দুর্জনের স্বভাবই এই যে, সে দুরন্ত সঙ্কল্প অনিষ্ট সাধনে অক্ষম হইলে সামান্য দোষে কথারম্ভ ব্যক্তিকেই বিনষ্ট করে। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ দূরস্থিত আঘাতকারীকে না পাইয়া সম্মুখে পতিত উপলখণ্ড দংশনে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

অল্পাকারমপি পার্শ্বগতং নিহন্তি
ন দূরমপ্যাগসমপ্যরিং ক্ষিপন্।
বা নির্দশত্যুপল মস্তিকমাপতন্তং
তত্ত্যাগিনং ন তু বিদূরনুগ্রযোঃ॥

কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী একাধারে কাব্য, নীতিগ্রন্থ এবং ইতিহাস। উত্তরকালে মুসলমান শাসকগণ এ গ্রন্থের মর্যাদা বুঝিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকে জইনুল আবিদিনের আদেশে রাজতরঙ্গিণী ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদ কঠিন বোধ হওয়ায় সম্রাট আকবর আর একখানি সহজ অনুবাদের জন্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বদাউনিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গীরের সময় হাইদার মালিক নামে একজন কাশ্মীরী আরও একবার এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইতিহাস রচনায় শক্তিশালী লেখকগণের শৈথিল্য দর্শনে কল্‌হণ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—সৎ কবিদিগের প্রয়াসের অভাবে কত শত সজ্জন মহাজনের কথা লোকসমাজে চিরদিনের মতই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি এক সময়ে হস্তিকুম্ভে পাদ স্থাপন করিয়া ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন, চন্দ্রিকাতুল্যা নারীগণ যাঁহাদের গৃহ অলঙ্কৃত করিতেন, যাঁহারা ছিলেন পৃথিবীর তিলক স্বরূপ, আজ লোকে তাঁহাদের বিষয় কিছুই জানে না। অধিক আর কি বলিব। সৎ কবিগণ যত্নবান না হইলে জগৎ অন্ধ হইয়া যায়।

যেঽদ্যাসন্নিভকুম্ভপাটিতপদা যেঽপি শ্রিয়ং লেভিরে
যেষামদ্যবনং পুরা যুবতয়ো গেহেষ্বহশ্চন্দ্রিকাঃ।
তান্ লোকোঽয়মবৈতি লোকতিলকান্
স্বপ্নেঽপ্যজাতানিব
ভ্রাতঃ সৎকবিকৃত্য কিং স্তুতিশতৈরন্ধং
জগদ্ বিনা॥ *

* পরং সংখ্যা 'বিবাহিকা' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

স্বামী বেদানন্দ

শ্রীঅমিল কুমার হালদার

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হস্‌পিটাল থেকে স্বামী বেদানন্দের নিষ্ঠুর শেষ সংবাদ যখন প্রচারিত হলো তখন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম—সেই সদাশান্ত, সুন্দরগম্ভীর, মধুকণ্ঠ স্বামিজী আর নেই। 'অবাক্ পৃথিবী অবাক্ করলে আরো।' পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের আশা, আকাঙ্খা, উল্লাস এবং আলোক পরমুহূর্ত্তের নিঃসীম গাঢ় অন্ধকার, অনন্ত নৈরাশ্য ও রহস্যের জগতে বিলীন হয়ে গেল—জীবন আর মৃত্যুর এই লুকোচুরির না আছে বিরাম, না আছে শান্তি।

স্বামী বেদানন্দের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা খুব অল্প দিনের; পরিচয়টা বিশ্ববাণী-সংক্রান্ত হলেও ওখানে সীমিত ছিল না। সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরটা ভেতর থেকে যখন সব সময় বন্ধ থাকতে দেখ্‌তাম, আশ্চর্য্য হতাম সবচাইতে এই ভেবে যে, ভিতরের মানুষটি রাতদিন দরজা ভেজিয়ে করে কি? অন্তর কৌতূহল বেড়ে গেল; একদিন মরীয়া হয়ে কড়া নাড়া দিলাম, প্রথমে আস্তে, তারপর সশব্দে—টুক্ করে দরজা খুলে দাঁড়ালেন স্বামিজী; ভ্রূকুটিমাখা চোখে চাইলেন—ভাবখানা এইরকম—কি চাই?

সেই থেকে সূত্রপাত। ছচার দিন পরেই স্বামিজী হৃদয় খুললেন, সুতরাং কথা আর ফুরতো না। ঘরের মধ্যে বই ছিল স্তরে স্তরে সাজান, চৈতন্য চরিতামৃত থেকে আরম্ভ করে শেলী, কীট্‌স্ এবং ভারতবর্ষ, বসুমতী, হিমাদ্রি পর্য্যন্ত। বিছানার ডানদিকে থাকত বিশ্ববাণীর ফাইল, তার পাশে এক কোণায় একটা কাগজের চৌকোণা বাক্স; অনেকদিন পরে আবিষ্কার করেছিলাম যে ঐ বাক্স তাঁর সবচাইতে মূল্যবান সম্পত্তিতে ভরা: আর তা হলো গোটা দুই আর্ট কাগজ, একটা রঙের কৌটা, তুলি, নানারকম সরু, মোটা পেন্সিল, একখণ্ড রবার—অর্থাৎ একবার ছবি আঁকার সরঞ্জাম। সময় সময় পেন্সিলটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন—খানিকক্ষণ পরে দেখ্‌তাম কাগজে ছবি আঁকা—গঠনটা প্রাচীন শিলামূর্ত্তির মতো; মুখে আঙুল দিয়ে বল্‌তেন—বলোনা কাউকে। আমি যতদূর জানি এই ছিল তাঁর চরিত্রের গোপনতম দিক; অতন্দ্র শিল্পসাধনাকে আপন মনের চিরন্তন বিলাসের বস্তু করে তিনি রেখেছিলেন। রোগশয্যায়ও তার ব্যত্যয় দেখা দেয়নি।

তাঁর সাহিত্যজীবনের হাতেখড়ি হয় কবিতায় এবং সে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ ছিল, তাঁর কাছেই ঐ বিষয়ে দীক্ষা নেন একথা স্বামিজীর নিজের মুখে শুনেছি। অমুদ্রিত একটা কবিতার বই তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন; তুলসী প্রশংসাসম্বলিত যে পত্রখানা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তা' তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন তা' হলো শ্রীইন্দ্রসেন—বিশ্ববাণী পাঠকের কাছে এ নামে অতি প্রিয়; এই নামে তিনি শেলী, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। সেবার বুঝি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' সম্বন্ধে তাঁর একটা লেখা বেরিয়েছিল, জিজ্ঞেস করলেন কি রকম হয়েছে?—'এই একরকম', হেসে বল্লাম। স্বামিজী বল্লেন একটা কথা কি জান, রবীন্দ্রনাথকে জানার মত স্পৃহা আমাদের নেই। রবীন্দ্রনাথ বড় কবি এইটুকু সবাই জানি, কিন্তু তাঁর রূপচেতনা এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, তীক্ষ্ণ মনঃসমীক্ষণের এষণা ও ধৈর্য্য আমরা হারিয়ে ফেলি। তথাকথিত রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রণেতাদের তিনি নমস্কার করে বলেন, এরা সবাই একটা কাজ করেছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই

অসম্পূর্ণ। আমি যোগ করলাম—না হলে উপায় ছিল না। প্রবল হাসিতে তিনি ভেঙে পড়লেন। কথাগুলো আমার অক্ষমতার জন্য ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলাম না, কিন্তু সেদিন স্বামিজীর মধ্যে এমন একটা মনের সন্ধান পেয়েছিলাম, যে-মন সাধারণ-উৎকেন্দ্রিক সে-মন ভূমিতে বিচরণ করে বটে, কিন্তু তিন-অঙ্গুলি উপরে।

শ্রীইন্দ্রসেনের পরিচয় এক কথায় দিতে হলে বলতে হয়—অতি সন্ধানী। ভূয়োবাদ তথা স্মৃতিবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন জাতক্রোধী। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রশীল কে ছিলেন অনেক আধুনিক বঙ্গ-সন্তান তা জানে না, এই ছিল তাঁর আক্ষেপ। বাংলা মাসিক পত্রিকার স্থায়ী অপার, অপদার্থ লেখক-লেখিকার তিনিই নষ্ট কুষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়তেন। তিনি এ সম্বন্ধে প্রায়ই একটী কথা ব্যবহার করতেন Barren. বাংলার যুবকরা নিষ্কর্ম্মা, ভবঘুরে,—এ' ছিল তাঁর দুঃখের কারণ। কিন্তু ব্যথা ছিল আরও গভীরে—বাংলা দেশ ভাবে 'হরি হে পার কর'—অর্থাৎ পার করার যত দায় সব হরির; এঁরা নিজেরা কিছু করবেন না। এঁদের ধারণা, আমরা চুপচাপ বসে থাকব বিবেকানন্দ, বা নেতাজীর মত নেতারা টুপ্ করে আকাশ থেকে পড়ে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে একেবারে ব্রহ্মলোকে। তীব্র ঘৃণায় তাঁর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠত।

স্বামী বেদানন্দের শ্রেষ্ঠতম পরিচয়—'বাগ্মী'। বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি আত্মসম্বিত হারিয়ে ফেলতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বলে যেতে পারতেন, এবং সেই বক্তৃতাকালীন যে প্রবল উত্তেজনা লক্ষিত হত তা অপূর্ব্ব। একদিকে তিনি নীরব, অন্যদিকে কণ্ঠের বীণাধ্বনি; এ সম্মিলন বিরল। রাতদিন নিজের পড়াশুনা নিয়ে কাটাতেন, প্রথমেই বলেছি—দরজা থাকত বন্ধ অর্থাৎ অতিথিরা ছিল সর্ব্বপ্রকারেই অবাঞ্ছিত। এই দিকটা আমার কাছে এখনও রহস্যাচ্ছন্ন। স্বামী অভেদানন্দের অনেক প্রবন্ধ, অনেক গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছিলেন—সেই অনুবাদের বৈশিষ্ট্য দেখেছি 'সংযোজন' অর্থাৎ ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনা ও বিবৃতিগুলো তিনি পাদটিকায় যুক্ত করেছিলেন; যা মূল গ্রন্থে নেই। ফলে সেটা পাঠকের কাছে সরল ও প্রাঞ্জল হয়েছে, সমালোচকের কাছে অনুবাদকের মন জানার সুযোগ হয়েছে। তাঁর ঐ বিশিষ্ট চিন্তাভঙ্গীই বাগ্মিতায় ফুটে উঠত—এক একটা বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে তার সর্ব্ব আঙ্গিক শ্রোতার কাছে চাক্ষুষ করে তুলতেন; আর সেই শ্রোতের কি প্রবল বেগ—কথার পর কথাগুলি একটা সর্ব্বাঙ্গীণ সুর সৌষম্যের অভিমুখে সুবলয়িত হয়ে উঠত।

আজ সে-কণ্ঠ নীরব; সে কোন্ তমিস্রলোকে তাঁর মহাপ্রাণ? কে জানে? কিন্তু বীণা স্তব্ধ হলেও সুরের রেশ অনেকক্ষণ মনের কানে শোনা যায়, তাই ঐ নীরব কণ্ঠের সুর—

"অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যতদূরে দিগন্তে চাহি রে
"নাহি রে, নাহি রে"॥"

"যাঁকে ঈশ্বর বলে শরণ নিতে যাচ্ছো তিনিই তোমার স্বরূপ। তোমার সঙ্গে আসলে তাঁর কোনই ভেদ নাই। নিজের স্বরূপকে জানতে পারলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। তিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। ঈশ্বরকে আর কোথায় খুঁজছো? তিনি তো তোমার ভেতরেই আছেন। বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের অন্তরে রাখো। নিজের ভেতরে যে ঈশ্বরকে দেখতে পায় সে-ই ঠিকভাবে ঈশ্বরকে দেখতে পায়। নিজের ভেতরে ঈশ্বরকে দেখতে পেলেই সব জায়গাতেই তাঁকে দেখতে পাবে।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

কর্ম্মযোগে রূপ জাগে তারি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কর্ম্ম বিনা ধর্ম্ম কোথা ? বিরক্ত বিব্রত মনে
আরাধনা মিছে
কর্ম্মের সমষ্টিমাত্র মানবজীবন মর্ত্তে ;
সদা নিভৃতে নির্জ্জনে
নিথর সাধনা যার, সে শুধু রহিল নীচে
সবাকার পিছে।
নশ্বর খদ্যোতশ্রেণী জ্বলে আর নেভে অবিরল,
আকাশে অসংখ্য তারা মৃত্যুহীন চির সমুজ্জ্বল।

ধীর বিনা, অশ্রু বিনা দুর্লভেরে লভ্য নহে
অপূর্ণতা মাঝে।
কঠিন বেদনা আর শত দুঃখ সাথে লয়ে
ক্রন্দিত পরাণে রহে
যে জন তিমির গর্ভে যত্ন নিত্য নিজ কাজে
সেবকের সাজে
আপনিরাশারে ভুলি অচেনার পথে খেলা করে।
সে জন পাষাণ ভাঙ্গি তুলে আনে শৈলের নির্ঝরে।

এই সব সত্যব্রত সাধকেরে বরাভয়
দিতে আসে প্রভু
অবতার হয়ে বিশ্বে হীন হীন বেশে
সহস্র বেদনাময়,
অতীত ও অনাগত পূর্ণভাবে যারে তবু
চিনিলনা কভু।
তারে শুধু চিনিয়াছে একনিষ্ঠ দুঃখের পূজারী
জন্ম মৃত্যু উর্দ্ধে যাহা, কর্ম্মযোগে রূপ জাগে তারি।

বিচিত্র দুঃখের মাঝে অসংখ্য বাধার সাথে
চলেছে সমর।
সত্যের আলোক রেখা পড়ে শেষে দেবতার
শুভ্রশুভ দৃষ্টি পাড়ে,
মানবের নহে শেষ ক্ষুদ্রতায় নিরন্তর
আপনারে করি পর !
দুঃখ নহে অনন্ত, সৌভাগ্যের উন্নত সোপান,
এনে দেয় মানবতা, দুঃখ পেতে তাই চাহে প্রাণ।

জীবন-সমস্যায় বিবেকানন্দ

স্বামী দুর্গানন্দ

শিকাগো ধর্মমহাসভায়-যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বাণীকে সার্বভৌম ভিত্তিতে প্রচার করিলেন, সেই দিনে সেই মুহূর্তেই সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যশঃপ্রভা শুধু আমেরিকার মহাসভায় নয়, দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। মহাসভায় সেদিন লোকে লোকারণ্য। শত্রুমিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন—এই বৈদ্যুতিক শক্তিশালী প্রতিভাদীপ্ত বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দলে দলে শিক্ষিত নরনারীর দল সেইদিন হইতেই তাঁহার অপূর্ব বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া রহিলেন। চারিদিকে তাঁহার যশ-গীত হইতে লাগিল; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তিনি তাহাতে বিমোহিত হইলেন না; তিনি বুঝিয়াছিলেন এ যশ তাঁহার নয়, এ যশ তাঁহার প্রভুর,—শ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁহার একখানি পত্রে দেখা যায় তিনি কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—"আমি দিন দিন বুঝিতেছি প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমরা জগতে মহৎ কর্ম করিব আর উহা নিঃস্বার্থভাবে করিব, নাম-যশ লাভের জন্য নহে।"

স্বামী বিবেকানন্দের নামে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, স্থানে স্থানে সভাসমিতির মধ্যে তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার আহ্বান আসিতে লাগিল, রাজোচিত অভ্যর্থনা হইতে থাকিল। প্রাসাদোপম গৃহে অবস্থান, রাজভোগের পারিপাটা, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাত্রিযাপন, বিলাস সজ্জার ব্যবস্থা ও বিবিধ ভোগের উপকরণ কিছুরই অভাব রহিল না; কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তাঁহার মন প্রলুব্ধ বা বিচলিত হইল না, বরং এদের তুলনায় ভারতের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। এত ঐশ্বর্যের দেশে আসিয়া তিনি স্বদেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই।

কখন কখন তিনি ভোগ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ঘরের মেজেতে গড়াগড়ি দিতেন এবং বলিতেন—'হায় মা, এদেশের এই রাজভোগ, বিলাস-সজ্জা ও ভোগের চরম উপকরণে রাশি রাশি অর্থব্যয়—আর আমার জন্মভূমি—ভারতের লোক উপবাসে, রোগে, অত্যাচারীর উৎপীড়নে, আর্তকণ্ঠে হাহাকার করিতেছে। মা—একি তোর খেলা! যতদিন ভারতের লোক দীন দরিদ্র থাকিবে ততদিন আমি এই যশ খ্যাতি, রাজভোগ গ্রাহ্য করি না,—চাইনা। ভারতের জনসাধারণের উন্নতি কবে হইবে মা, কে তাহাদের তুলিবে? কে তাহাদের মুখে অন্ন দিবে? দে মা শক্তি, দে মা উপায়—যাহাতে আমার দেশের লোকের মুখে দুই গ্রাস অন্ন দিতে পারি।" এইরূপে একরাত্রি তিনি কাঁদিয়া কাটাইলেন, সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। ক্ষোভে ও দুঃখে কাতর হইয়া তাই তিনি পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতীয় যুবকগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য যে সকল উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহারই কিছু সংগ্রহ করিয়া নিম্নে সন্নিবেশ করা হইল।

"যে জাত সামান্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে সে-জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচামাল) নিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস্। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ বিদেশের লোক তাই নিয়ে, তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈয়ার করে, বড় হয়ে গেল; আর তোরা, তোদের বুদ্ধিটাকে নিন্দুকে পুরে রেখে,

ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা-অন্ন, হা-অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস।

"কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র বল, পরার্থ-তৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করছে—মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। Capital (অর্থ) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের তাড়না নেই।

বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হালচাল বদলে দিচ্ছে অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছেনা। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের উপর এতদিন অত্যাচার করেছিস্—এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা "হা চাকরী, যো চাকরী" করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

তোরা এই mass এর (সাধারণ লোকের) ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে—"তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের এক অঙ্গ,—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করিনা।" তোদের এই সহানুভূতি পেলে, এরা শতগুণ উৎসাহে কর্মতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।"

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ রায়

মাননীয় ধীরেন্দ্রনাথ রায় (জমিদার, নাড়াইল) আর এ জগতে নাই। প্রায় ৭৩ বছর বয়সে গত ৩রা জানুয়ারী তাঁর কাশীপুর-ভবনে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

তিনি জীবনে ছিলেন পরম-আশাবাদী কর্মযোগী, কর্মই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের যেন সাধনা। ব্যারেষ্টারী-পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে যান ও সেখানে থেকে কৃতকার্য হ'য়ে স্বদেশে ফিরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন আইন-ব্যবসায়ে যোগ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সারা দেশব্যাপী অসহযোগ-আন্দোলন যখন শুরু হয়—বিজাতীয় শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ভারতের বুকে যখন বিক্ষোভের অশান্তি-বহ্নি প্রজ্বলিত তখন তিনি সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কিছুকালের জন্য তিনি বিধানসভার সদস্য ছিলেন। দেশ পরশাসনমুক্ত হোক—স্বাধীন ভারত তার ঐতিহ্যবাহী পরমোজ্জ্বল গরিমাকে বরণ ক'রে আবার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক—এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা এবং এই কামনা জাগ্রত ছিল হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

কর্মবীর ধীরেন্দ্রনাথ রায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে যখন

আমেরিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর গৌরবদীপ্ত মনীষা ও কৃতকার্যতা নিয়ে, ঠিক তার কিছুদিন পরেই মাননীয় ধীরেন্দ্রবাবু স্বামিজী মহারাজের সংস্পর্শে আসেন ও যতদিন পর্যন্ত স্বামিজী মহারাজ কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি (পরে মঠ) ও দার্জিলিঙে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও বাণীকে সর্বসাধারণের মধ্যে মূর্ত করার জন্য ব্রতী ছিলেন, ততদিনই গুরুগতপ্রাণ ধীরেন্দ্রবাবু ছায়ার মতো তাঁর অলৌকিকী প্রজ্ঞা-সম্পন্ন অসামান্য আচার্যের সকল রকম কাজের সহকারী ছিলেন। এককথায় ধীরেন্দ্রবাবুর রাজনৈতিক জীবন ও ধর্ম-জীবন প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয় ও পরবর্তী জীবনে সমাজসেবা-রূপ কর্মসাধনায় নিজেকে তিনি একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

তাছাড়া ধীরেন্দ্রবাবু বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং বরাহনগর রামকৃষ্ণ-মিশনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। বরাহনগর রামকৃষ্ণ-মিশন একপ্রকার তাঁরই প্রচেষ্টায় তাঁদের প্রদত্ত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ মিশনের সভাপতি পদেও নির্বাচিত ছিলেন।

কর্মবীর ধীরেন্দ্রনাথ রায় কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন এবং কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সম্পাদক ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় বেদান্ত সমিতির প্রাইমারী বিদ্যালয়টির পুনরায় উদ্বোধন হয় ও প্রধানভাবে তার সর্বপ্রকার পরিচালনার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রাইমারী বিদ্যালয়কে উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের পরিণত করা ও ছাত্র-সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে তাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যক্ষ বাণী ও অপার্থিব আদর্শে তাদের মন-প্রাণকে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের যেন শেষব্রত। তাঁর শরীর যায় গত ৩রা জানুয়ারী। কিন্তু ২রা জানুয়ারীও তিনি যথাবিহিতভাবে সমিতির প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ শেষ করেন ও পরদিন আবার তাঁহার একান্ত প্রিয় ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিলিত হবার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি-ভাবেই হৃদয়ে জাগরূক রেখেছিলেন। কালের নিষ্ঠুর ইঙ্গিতকে তিনি তখনও বুঝতে পারেন নি। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে সেদিন (২রা জানুয়ারী) কল্পতরু-উৎসবের সমারোহ। তিনি সন্ধ্যার সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদ গ্রহণ ক'রে সেখানে প্রায় রাত্র ১০টা পর্যন্ত সঙ্গীতাদি শোনেন ও গৃহে ফেরেন রাত্রি ১০৷৷০ টায়। পথের মধ্যেই তিনি অচৈতন্য হ'য়ে পড়েন ও সেখান থেকে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাভাবিক জ্ঞান ক্রমশ ফিরে আসে; কিন্তু রাত্রি ৪ টার পর আবার তিনি অচৈতন্য হন ও সেই অবস্থায়ই বাকি সময় অতিবাহিত করেন ও তার পরদিন ৩রা জানুয়ারী বেলা ১০৷৷০ ঘটিকার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কর্মযোগী ধীরেন্দ্রবাবু আকুমার ব্রহ্মচারীর মতোই জীবন যাপন ক'রে গেছেন। তিনি অভিজাত জমীদারবংশে জন্মগ্রহণ ও বিপুল আড়ম্বর-ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবনযাপন করলেও পরবর্তী জীবনে তাঁর অনাড়ম্বর সরল স্বচ্ছন্দ সাধারণ জীবন মানুষমাত্রের কাছেই আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি একাধারে ছিলেন নিরহংকারী, বিলাসবিহীন—ধর্ম ও কর্মপ্রাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি যখন গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় অম্বুলে ও টিটাগড়ে দু'টি বিরাট উদ্বাস্তু বালকদের শিক্ষাশিবিরের ভার গ্রহণ করে তখন মহাপ্রাণ ধীরেন্দ্রবাবু ছিলেন সেই বিপুল সেবাকার্য—যজ্ঞের একজন অন্যতম বিশিষ্ট হোতা। অক্লান্ত পরিশ্রম

ও নিবিড় ভালোবাসার আকর্ষণ দিয়ে সকল বালকদেরই অন্তররাজ্য তিনি জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নির্ভীক ছিল তাঁর অন্তর, জীবনে অচল অটুট ছিল তাঁর সংকল্প এবং গভীর বিশ্বাস ও প্রীতি ছিল তাঁর নির্বাচিত সকল কাজে। করুণাসিক্ত ছিল তাঁর মন সকলের জন্য; গরীব-দুঃখীদের জন্য তাঁর প্রাণের দরদও ছিল অপরিসীম।

প্রকৃতপক্ষে কত গুণে সমলংকৃত ছিলেন কর্মযোগী ধীরেন্দ্রনাথ রায় তা সামান্য একটি সমবেদনার প্রকাশে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ শিষ্য ও সেবক, পৃথিবীর বাঁধন ছিন্ন করেছেন তিনি তাঁর কর্মময় জীবনের কর্তব্য শেষ ক'রে, প্রার্থনা করি সকলে,—পরমারাধ্য ইষ্টদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদগণের অমোঘ আশীর্বাদ তাঁর শাশ্বত শান্তিলোকের দ্বার চির-উন্মুক্ত করুক। ওঁ শান্তিঃ।

সংঘবার্তা

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব: গত ৮ই পৌষ রবিবার, (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬) কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১০৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে মঠে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিকে বিশেষ পূজা হোমাদি অনুষ্ঠান ও সমাগত অগণিত ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, অপরদিকে—কথকশিরোমণি সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক কথকতা, সঙ্গীত শিল্পী শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও অন্যান্য গায়ক কর্তৃক ভজনগীতাদি, প্রসিদ্ধ বংশীবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক বংশীবাদন—প্রভৃতি সমস্ত দিনব্যাপী উৎসবের অঙ্গ ছিল। সন্ধ্যায় সাধারণ সভা হয়। স্বামী দুর্গানন্দ শান্তি পাঠ করেন। সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজ এবং প্রবীণ বক্তা শ্রীসুহৃদবন্ধু সেন শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যদর্শন ও সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁহা মায়ের বিষয়ে উঁহাদের বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অধ্যাপক সমরেন্দ্র মুখার্জী শ্রীমায়ের অলোকসামান্য চরিত্রের বিভিন্নদিক আলোচনা করেন। ভক্ত ও প্রবীণ কর্মী শ্রীউপেন্দ্র কুমার দত্ত শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামী অভেদানন্দজীর পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও ভক্তির অপূর্ব প্রকাশের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সভাপতি, বক্তা ও উপস্থিত জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভাভঙ্গ হয়। তৎপরে 'শ্রীশ্রীরাধারমণ কীর্তন-সমাজ' কর্তৃক "মাথুর-লীলা" কীর্তন হয়।

দুই সহোদর ভাই এই কীর্তনের মূল গায়ক। সেজন্য এই কীর্তন সমাজ 'দুভায়ের কীর্তন দল' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্ধ তাঁহাদের সুমধুর কণ্ঠে লীলাকীর্তন শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কীর্তন শুনিতে প্রায় দুই হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। মনে হয় তিলার্ধ জায়গাও ফাঁক ছিল না। স্থানাভাবে পাঁচ ছয় শত লোক ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সাড়ে দশটায় কীর্তন শেষ হইলে উৎসব কার্য সমাপ্ত করা হয়।

দৈনিক ধর্মালোচনা: প্রতি রবিবার শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কথকতা', প্রতি শনিবার শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়ের "রামনাম সঙ্কীর্তন" এবং অন্যান্য দিন শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের "শ্রীমদ্ভাগবত" পাঠ পূর্ববৎ যথারীতি চলিয়াছে।

আগামী ৩রা মার্চ ১৯৭৭ বৃহস্পতিবার শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে তাঁহার বিশেষ পূজাদি হইবে। দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমেও উৎসব হইবে।